

ବୁଦ୍ଧାମ୍ରିତ

# ଶାରନାଥ





# ବ୍ୟାକୁଲୋଗିକ୍ ନ୍ଯାସା

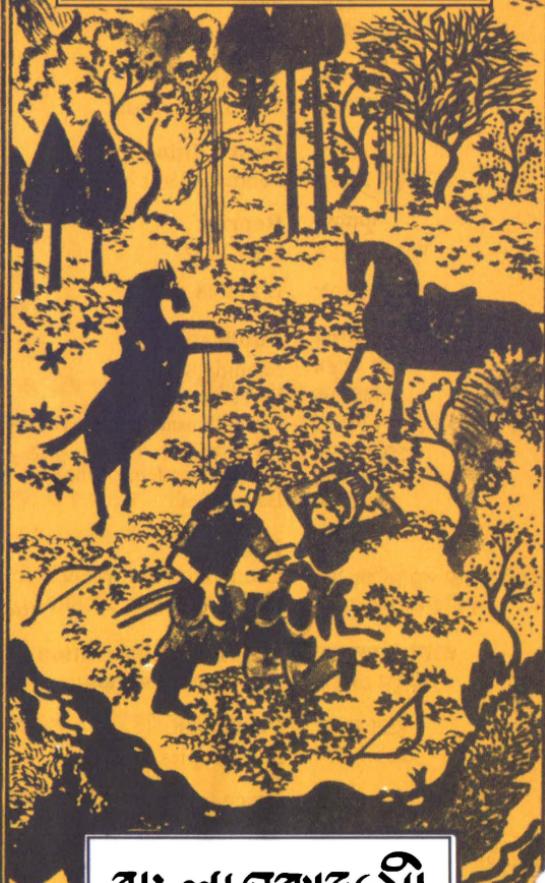


ମନିରୁଦ୍ଧୀନ ଇଉସୁଫ

ଅନୂଦିତ

ପ୍ରେସ୍‌ଟୋମ୍‌ପିଣ୍ଡ

# ଶାରନାୟି



ଶାରନାୟି



## শাহনামা [১ম খণ্ড]

## SHAHNAMA [1st Vol.]

Bangla Translation of Ferdousi's SHAHNAMEH

### রচনা

ফরদৌসী

### Text

Ferdousi

### অনুবাদ

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

### Translation

Maniruddin Yusuf

### প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন ১৩৯৭

### First Edition

February 1991

### পুনর্মুদ্রণ

আষাঢ় ১৪১৯

### Reprint

June 2012

### বা.এ ৫০০৮

### BA 5008

### প্রকাশন

শাহিদা খাতুন

### পরিচালক

প্রতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

[পুনর্মুদ্রণ সেল]

বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বাংলাদেশ

### Publication

Shahida Khatun

### Director

Establishment, Planning & Training Division

[Reprint Cell]

Bangla Academy, Dhaka

Bangladesh

### মুদ্রণ

ক্রিডেন্স প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লি.

১৭ বিজয়নগর, ঢাকা

### Print

Credence Printing & Packaging Ltd.

17 Bijoynagar, Dhaka

### প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

কাইয়ুম চৌধুরী

### Cover and Illustration

Qayyum Chowdhury

### মুদ্রণ সংখ্যা

৩০০০ কপি

### মূল্য

৮৫০ টাকা [প্রতি খণ্ড]

২৭০০ টাকা [প্রতি সেট ৬ খণ্ড]

### Print Run

3000 Copies

### Price

Tk. 450 [Each Vol.]

Tk. 2700 [Per Set 6 Vol.]

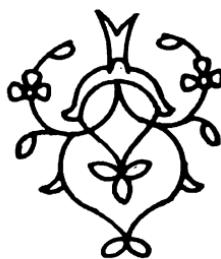
US\$ 100 [Per Set]

### আইএসবিএন

১৯৮৪-০৭-৫০২৬-৭

### ISBN

984-07-5026-7



## প্রসঙ্গ কথা (১)

ভূমিকা

ভূমিকা [১]

বিশ্বপ্রভুর প্রশংসা ১

জ্ঞানের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ২

বিশ্বের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ৪

মানুষের জন্মকথা ৭

সূর্যের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ৮

চন্দের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ৯

প্রয়গম্বর (সাধ) ও তাঁর বদ্ধগণের প্রশংসা ১০

শাহনামা সম্পাদনা প্রসঙ্গে ১৩

কবি দাকীকীর কাহিনী ১৫

গ্রহের ভিত্তি স্থাপন প্রসঙ্গে ১৬

আবু মুহম্মদ বিন মুনসুরের প্রশংসা ১৮

সুন্দতান মাহমুদের প্রশংসন্মায় ২০

কাহিনীর সূচনা ২৪

দানবের হাতে সিয়ামকের নিধন ২৭

কৃষ্ণকায় দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য

কায়মুরস ও হোশঙ্গের যাত্রা ২৯

হোশঙ্গ ৩১

অগ্নি উৎসবের সূচনা ৩৩

তহমুরস ৩৫

জমশোদ ৩৯

জোহাক ও তাঁর পিতার কাহিনী ৪৬

শয়তানের পাচকবৃত্তি গ্রহণ ৫১

জমশেদের যুগের অবসান ৫৪  
জোহাক এক হাজার বৎসর রাজ্য করেছিল ৫৬  
জোহাক ফারেদূনকে স্বপ্নে দেখলো ৫৯  
ফারেদূনের জন্মবৃত্তান্ত ৬৪  
জোহাক ফারেদূন মায়ের কাছে নিজের বংশ-পরিচয়  
জানতে চাইল ৬৭  
লৌহকার কাওয়া ও জোহাকের কাহিনী ৭০  
জোহাকের সঙ্গে মুক্তি করার জন্য ফারেদূনের যাত্রা ৭৭  
ফারেদূন জমশেদের ভগ্নাদ্বয়কে দেখলেন ৮২  
জোহাকের চরের সঙ্গে ফারেদূনের বৃত্তান্ত ৮৫  
ফারেদূন কর্তৃক জোহাকের বন্দী হওয়া ৯০  
ফারেদূনের বাদশাহী পাঁচশো বছর স্থায়ী হয়েছিল ৯৫  
ফারেদূন কর্তৃক জন্মলকে যমন দেশে প্রেরণ ৯৮  
জন্মলকে যমনের রাজার প্রত্যুত্তর দান ১০৩  
শাহে যমনের স্মারণে ফারেদূনের পুত্রদের যাত্রা ১০৭  
সরও ফারেদূনের পুত্রদেরকে হস্তজাল দিয়ে পরীক্ষা করলেন ১০৯  
ফারেদূন কর্তৃক পুত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ ১১২  
ফারেদূন তাঁর রাজ্য তিনি পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলেন ১১৬  
এরজের প্রতি সুলমের ঈর্ষা ১১৭  
ফারেদূনের কাছে সুলম ও তুরের বাচী ১২০  
পুত্রদের প্রতি ফারেদূনের প্রত্যুত্তর ১২৪  
ভাইদের কাছে এরজের যাত্রা ১২৯  
ভাইদের হাতে এরজের নিধন ১৩২  
ফারেদূন কর্তৃক এরজের হত্যার সংবাদ শুবণ ১৩৬  
এরজের কন্যার জন্ম বৃত্তান্ত ১৪০  
মাত্রগৰ্ভ থেকে মনুচেহেরের জন্ম ১৪২  
মনুচেহের সম্পর্কে সুলম ও তুরের অবগতি ১৪৫  
ফারেদূনের কাছে পুত্রদের সন্দেশ প্রদান ১৪৮  
পুত্রদের প্রতি ফারেদূনের প্রত্যুত্তর ১৫০  
ফারেদূন কর্তৃক মনুচেহেরকে তুর ও সুলমের সঙ্গে মুক্তার্থ প্রেরণ ১৫৫  
তুরের সৈন্য দলের উপর মনুচেহেরের আক্রমণ পরিচালনা ১৬২  
মনুচেহেরের হাতে তুরের নিধন ১৬৬  
ফারেদূনের স্মারণে মনুচেহেরের বিজয় লিপিকা ১৭০  
কারেন কর্তৃক আলানা দুর্গ জয় ১৭২  
জোহাকের পোত্র কাকোয়ের অভিযান ১৭৮

- সুলমের পলায়ন ও মনুচেহেরের হাতে তার নিধন ১৮০  
 ফারেদুনের কাছে সুলমের কর্তৃত শির প্রেরণ ১৮৩  
 ফারেদুনের মৃত্যু সম্পর্কে ১৮৭  
 মনুচেহের ১৮৯  
 জালের জন্মের বৃত্তান্ত ১৯২  
 সাম পুত্রের অবস্থা স্বপ্নযাগে দেখতে গেলেন ১৯৭  
 সাম ও জালের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে মনুচেহেরের অবগতি ২০৮  
 জালের ভাগ্যনক্ষত্র গণনা ও তার জাবুলস্থানে প্রত্যাবর্তন ২০৮  
 সাম কর্তৃক জালকে রাজ্য দান ২১১  
 মেহরাব সকাশে জাল ও মেহরাব-তনয়া রুদাবার  
     প্রতি জালের প্রেমাকর্মণ ২১৫  
 দাসীদের কাছে রুদাবার মনোভাব ব্যক্ত করা ২২১  
 জালের সমীপে রুদাবার দাসীদের যাত্রা ২২৬  
 রুদাবা-সমীপে দাসীদের প্রত্যাবর্তন ২৩২  
 রুদাবা সমীপে জাল ২৩৬  
 রুদাবা সম্পর্কে জ্ঞানীদের সঙ্গে জালের পরামর্শ ২৪০  
 সামের নিকট জালের লিপি লিখন ও অবস্থা পরিজ্ঞাপন ২৪৪  
 জাল সম্পর্কে পরামর্শদাতাদের কাছে সামের মত প্রকাশ ২৪৮  
 রুদাবার কার্যকলাপ সম্পর্কে সীদুখতের অবগতি ২৫১  
 কন্যার কার্যকলাপ সম্পর্কে মেহরাবের জানতে পেলেন ২৫৬  
 জাল ও রুদাবার কার্যকলাপ সম্পর্কে মনুচেহেরের অবগতি ২৬২  
 মনুচেহের সমীপে সামের আগমন ২৬৫  
 মেহরাবের সঙ্গে যুক্তার্থ সামের যাত্রা ২৬৯  
 মনুচেহের-সমীপে জালের যাত্রা ২৭৩  
 সীদুখতের উপর মেহরাবের ক্রোধ ২৭৯  
 সাম কর্তৃক সীদুখতের সম্মুক্ত করা ২৮২  
 মনুচেহের সমীপে সামের লিপিকাসহ জালের আগমন ২৮৮  
 জালের কাছে পুরোহিতদের কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ২৯১  
 জাল কর্তৃক পুরোহিতদের কথার উত্তর প্রদান ২৯৩  
 মনুচেহেরের সামনে জালের ক্রতিত্ব প্রদর্শন ২৯৬  
 মনুচেহেরের পক্ষ থেকে সামের চিঠির জবাব ২৯৯  
 সাম সমীপে জালের উপস্থিতি ৩০২  
 রুক্ষমের জন্য বৃত্তান্ত ৩০৭  
 রুক্ষমকে দেখার জন্য সামের আগমন ৩১৪  
 রুক্ষম কর্তৃক শ্বেতহষ্টি নিধন ৩১৯

- সিপদ পাহাড়ের দিকে রুস্তমের যাত্রা ৩২৪  
রুস্তম কর্তৃক জালের নিকট বিজয় সংবাদবাহী লিপিকা লিখন ৩২৮  
সামের কাছে জালের লিপিকা ৩৩১  
পুত্রের প্রতি মনচেহেরের উপদেশ ৩৩৩  
নওজ্জব ৩৩৬  
পিশঙ্গ মনচেহেরের ঘৃত্যুর কথা জ্ঞানতে পারলেন ৩৪২  
আফ্রাসিয়াবের ইরান আক্রমন ৩৪৬  
বারমান ও কোবাদের যুদ্ধ ৪ কোবাদের নিধন ৩৪৯  
নওজ্জবের সঙ্গে আফ্রাসিয়াবের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ৩৫৫  
আফ্রাসিয়াবের সঙ্গে নওজ্জবের তৃতীয় বার যুদ্ধ ৩৫৮  
আফ্রাসিয়াবের হাতে নওজ্জবের বন্দী হলেন ৩৬৩  
ওয়েসা স্থীয় পুত্রকে হত দেখতে পেলেন ৩৬৫  
শমাসাস ও খজরওয়ানের জাবুলস্তান অভিমুখে যাত্রা ৩৬৮  
মেহ্রাবের সহায়তায় জালের উপস্থিতি ৩৭০  
আফ্রাসিয়াবের হাতে নওজ্জবের নিধন ৩৭৪  
নওজ্জবের ঘৃত্যু সম্পর্কে জালের অবহিতি ৩৭৬  
ভ্রাতৃহন্তে আগ্রীসের নিধন ৩৮১  
জওতহসাপ ৩৮৩  
গারশাসপ ৩৮৭  
রুস্তম কর্তৃক রাখশকে গ্রহণ ৩৯৫  
আফ্রাসিয়াবের অভিমুখে জালের সৈন্য চালনা ৩৯৭  
রুস্তম কর্তৃক কায়কোবাদকে আলবুর্জ পাহাড় থেকে আনয়ন ৩৯৯  
কায়কোবাদ ৪০৭  
আফ্রাসিয়াবের সঙ্গে রুস্তমের যুদ্ধ ৪১১  
স্থীয় পিতার সমীপে আফ্রাসিয়াবের আগমন ৪১৮  
কায়কোবাদ সমীপে পিশঙ্গের সঞ্চিপ্রস্তাৱ ৪২২  
পারস্যের অস্ত্রগত ইস্তিখার নগরীতে কায়কোবাদের আগমন ৪২৮  
কায়কাউস ৪৩১  
কায়কাউসকে জালের উপদেশ দান ৪৩৮  
কায়কাউসের মাজিন্দিরান যাত্রা ৪৪৮  
জাল ও রুস্তমের প্রতি কাউসের বণী ৪৫১  
সপ্ত সভ্যকর্টের পথে রুস্তমের অভিযান ৪৫৫  
মাজিন্দিরানের অধিপতির সমীপে কায়কাউসের লিপিকা প্রেরণ ৪৮০  
মাজিন্দিরান-অধিপতির সমীপে দৃতরূপে রুস্তমের আগমন ৪৮৯  
মাজিন্দিরান-অধিপতির সঙ্গে কায়কাউসের যুদ্ধ ৪৯৪

কায়কাউসের ইরান প্রত্যাবর্তন ও কৃত্যকে  
নীমোজের পথে বিদায়-সংবর্ধনা ৫০৬

বার্বারিস্তান কায়কাউসের কীর্তিকলাপ ও অন্যান্য কাহিনী  
হামাওরান অধিপতির সঙ্গে কায়কাউসের যুদ্ধ ৫০৯

কায়কাউস কর্তৃক হামাওরান-রাজ্যের কন্যা সাওদাবার  
পাণিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ৫১৭

হামাওরান-রাজ্য কায়কাউসকে কন্নী করলেন ৫২২

ইরান অভিযুক্তে আফ্রাসিয়াবের অভিযান ৫২৫

হামাওরান-রাজ্যের কাছে কৃত্যমের বার্তা প্রেরণ ৫২৮

তিন দেশের রাজ্বার সঙ্গে কৃত্যমের যুদ্ধ ও কায়কাউসের মৃত্যি ৫৩৫

রোমের কায়সার ও আফ্রাসিয়াবের কাছে  
কায়কাউসের বাণী প্রেরণ ৫৪০

কায়কাউস কর্তৃক দুনিয়াকে সজ্জিতকরণ ৫৪৭

শয়তান দ্বারা কাউসের পথভ্রষ্ট হওয়া ও আকাশে বিচরণ করা ৫৪৯

কৃত্যম কর্তৃক কাউসকে ফিরিয়ে আনা ৫৫৪

সপ্তরঞ্চীয় যুদ্ধ কাহিনী ৫৫৭

তুরানীদের সঙ্গে কৃত্যমের যুদ্ধ ৫৬৩

ইরানীয়দের সঙ্গে শীলসমের যুদ্ধ ৫৬৮

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আফ্রাসিয়াবের পলায়ন ৫৭৪

সোহৱাব ৫৭৬

কৃত্যমের মৃগ্যা যাত্রা ৫৭৮

কৃত্যমের সামান গী নগরে উপস্থিতি ৫৮১

সামান গী-রাজ্যের কন্যা তহমিনার কৃত্যম সকাশে আগমন ৫৮৩

তহমিনার গর্ভে সোহৱাবের জন্ম ৫৮৮

সোহৱাব কর্তৃক তার অশ্ব মনোনয়ন ৫৯১

আফ্রাসিয়াব কর্তৃক বারমান ও হুমানকে সোহৱাব সমীপে প্রেরণ ৫৯৪

শ্বেতদুর্গ-পাদদেশে সোহৱাব ৫৯৭

গিরদ, আফ্রাদের সঙ্গে সোহৱাবের যুদ্ধ ৫৯৯

কায়কাউস সমীপে গাজদাহামের পত্র ৬০৪

সোহৱাব কর্তৃক শ্বেতদুর্গ দখল ৬০৭

কৃত্যমের প্রতি কায়কাউসের লিপি ও তাঁকে  
জ্বারুলস্তান থেকে আস্বান ৬১২

কৃত্যমের প্রতি কায়কাউসের ক্রোধ প্রদর্শন ৬১৮

কৃত্যমের সহযোগিতা কাউসের সৈন্য পরিচালনা ৬২৭

কৃত্যম কর্তৃক খিদ্বারজ্যমের হত হওয়া ৬২৯

হজীরের কাছে সোহরাবের ইরানীয় ধীরগণের নাম জিজ্ঞাসা ৬৩৪  
সোহরাব কর্তৃক কায়কাউসের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ ৬৪২  
সোহরাবের সঙ্গে রুস্তমের যুদ্ধ ৬৪৭  
রুস্তম ও সোহরাবের স্ব স্ব সৈন্যবাহিনীর দিকে প্রত্যাবর্তন ৬৫১  
সোহরাবকে রুস্তমের ভূপাতিত করা ৬৫৬  
রুস্তমের হাতে সোহরাবের নিধন ৬৬৩  
কায়কাউসের কাছে রুস্তমের নওশাদায় প্রার্থনা ৬৭০  
সোহরাবের জন্য রুস্তমের বিলাপ ৬৭২  
রুস্তমের জাবুলস্তান প্রত্যাবর্তন ৬৭৬  
জননী সোহরাবের হত হওয়ার সংবাদ শুনলেন ৬৮০



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

# শুভ ক্রিয়েশন

Please Give Us Some  
Credit When You Share  
Our Books!

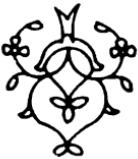
*Don't Remove  
This Page!*

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সকুসিভ



Visit Us at  
[Banglapdf.net](http://Banglapdf.net)

If You Don't Give Us  
Any Credits, Soon There'll  
Nothing Left To Be Shared!



মনিরউদ্দীন ইউসুফ  
অনুদিত  
শাহনামা

# শাহনামা ১ম খণ্ড

মূলঃ ফেরদৌসী  
অনুবাদঃ মনিরউদ্দীন ইউসুফ

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

**Khosnoor Alam Sujon**

**SCAN & EDITED BY:**

**SUVOM**

এই বইটি বাংলাপিড়এফ.নেট

([fb.com/groups/Banglapdf.net](https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net))

বইপোকাদের আজ্ঞাখানা

([fb.com/groups/boiipoka](https://www.facebook.com/groups/boiipoka))

এর সৌজন্যে নির্মিত

**WEBSITE:**

**WWW.BANGLAPDF.NET**



মহাকবি ফেরদৌসী

## প্রসঙ্গ-কথা

শেষ পর্যন্ত বিশ্বের অন্যতম অমর মহাকাব্য সমগ্র ‘শাহনামা’র বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক, ফাসী ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত মনিরউদ্দীন ইউসুফকে বাংলা একাডেমী ‘শাহনামা’র বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ১৯৬৩ সালের শেষের দিকে। অনুবাদের শেষ কিন্তু পাঞ্জুলিপি তিনি দেন ১৯৮১ সালে। ‘শাহনামা’ লেখা শেষ করতে ফেরদৌসীর লেগেছিল তিরিশ বছর। তার অনুবাদ শেষ করতে মনিরউদ্দীন ইউসুফের লাগে সতেরো বছর। তিনি বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে এই অতি বহু ফাসী মহাকাব্যের চিরদীপ্যমান মানিকটিকে বাংলার ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার মহাকীর্তি রেখে গেছেন। ‘শাহনামা’র বহু কাহিনীর মতোই তার রচয়িতা ফেরদৌসীর জীবনালেখ্যও বিচিত্র ও চিন্তাকর্ষক। বহু লেখক বাংলায় বিক্ষিপ্তভাবে তার সম্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ‘শাহনামা’র বাংলা অনুবাদ এই প্রথম। আমাদের আক্ষেপ এই যে, অনুবাদকের জীবৎকালে এই সমগ্র অনুবাদকর্ম নানা প্রতিকৃতিতার কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, কেবল এর প্রথম ক্ষয়দণ্ড দুটি খণ্ড, যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৭৯ সালে, প্রকাশ করা হয়। এবার বিশ্বময় ‘শাহনামা’ রচনার সহস্রবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে অনুবাদকের পরিকল্পনা অনুসারে ছয় খণ্ড সমগ্র ‘শাহনামা’র বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা যথার্থে নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করছি।

ইউনেস্কো এ-বছর ডিসেম্বর মাসে ‘শাহনামার সহস্রবার্ষিক উৎসব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিকভাবে। প্রধান উৎসবটি হচ্ছে তেহরানে। নভেম্বর মাসে কাবুলেও অনুষ্ঠিত হলো একটি বড় সাহিত্য সম্মেলন যাতে বাংলা একাডেমীকে আমত্ত্বণ জানানো হয়েছিল।

বাংলাদেশেও ইউনেস্কো ও ঢাকাস্থ ইয়ানী দ্রৃতাবাসের সাহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ‘শাহনামা উৎসব’ পালন করছেন। এর থেকে ফেরদৌসীর অমর কীর্তি ‘শাহনামা’র গৌরব ও গুরুত্ব উপলক্ষ্মি করতে পারা যায়।

‘শাহনামা’কে বলা হয় ইয়ানের জ্ঞাতীয় মহাকাব্য। ফেরদৌসী দশম খ্রিষ্টাব্দে এই মহাকাব্যের মাধ্যমে ইয়ানের কিংবদন্তি থেকে ইতিহাস, তার শৈঘবীয় থেকে সৌন্দর্যপিয়াসী মানব-হিতেরগাব পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ইয়ানীয় জাতিসন্তুর বিপুল জাগরণে সাহায্য করেছিলেন। তাই আজ পর্যন্ত শুধু ইয়ানীয় নয়, ফাসী-ভাষী মানুষের অস্তিত্বের গভীরে ফেরদৌসী ও তাঁর ‘শাহনামা’র একচ্ছত্র আসন। কিন্তু ‘শাহনামা’কে কালজীরী ও বিশুজ্জনন করেছে এই কাব্যের সরল সৌন্দর্য, সর্বোপরি এর উদার মানবীয় আবেদন ও আবেগসমূহ।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ বাংলায় ‘শাহনামা’র অনুবাদ করেছেন গদ্দে, তাঁকে তাই করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ গদ্দ এ নয়। এতে মুক্ত কবিতার বা ফ্রি ভাসের প্রবাহ ও ছন্দ বয়ে চলেছে। তাই তিনি তাঁর অনুবাদকে টানা গদ্দের মতো না সাজিয়ে সাজিয়েছেন অসম চরণে। মূল ‘শাহনামা’র মক্কেল সাবলীল এই অনুবাদ। কাব্য নয়, কিন্তু কাব্যের ফলুধারা যেন বয়ে চলেছে। মনিরউদ্দীন ইউসুফ ছিলেন অস্তরে চির-কর্বি, সেইসঙ্গে দক্ষ গদ্দ-শিল্পী। ‘শাহনামা’র বঙ্গানুবাদের দায়িত্ব যে সে সময়কার বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ যোগ্য ব্যক্তিকেই দিয়েছিলেন এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাব্য, উপন্যাস, কাব্যানুবাদ, প্রবন্ধ, নাটক, চরিত্কথা, কিশোর-সাহিত্য মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত

গ্রন্থের তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। অন্যান্য পুরস্কার ছাড়াও অনুবাদকর্মের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন ১৯৭৮ সালে। তাঁর জন্ম ১৯১৯, মৃত্যু ১৯৮৭।

প্রবল অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা ও অন্যান্য অসুবিধার মধ্যেই আমরা সম্পূর্ণ ‘শাহনামা’র এই ছয়টি খণ্ড একসঙ্গে প্রকাশ করলাম। এই বিশ্ববিদ্যাত মহাকাব্যের উপর্যুক্ত সৌকর্যবক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ ক্রেতার সুবিধার জন্য শোভন ছাড়াও সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পূর্বে বলেছি, ‘শাহনামা’র এই অনুবাদ প্রকাশের প্রয়াস আগে একবার নেয়া হয়েছিল। সেবার মূল প্রথম খণ্ডটি দুটি অংশে প্রকাশিত হয়। তার প্রথমটি ছিল কঢ়, শ-তিনেক পৃষ্ঠার মতো। অঙ্গ-সৌর্ষতিবও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ইরানে রাষ্ট্রীয় সফরে যান। শাহনামাহের জন্য কী উপহার নিয়ে যাবেন? ‘শাহনামা’র ওই কৃশ প্রথম খণ্ডাংশটি তিনি শাহনামাহের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শুনেছি, শাহনামাহ বলেছিলেন, এর চেয়ে ভালো উপহার আর কী হতে পারে?

এই ‘শাহনামা’ আরো আগে প্রকাশ করা যায়নি বলে আমরা দৃঢ়ৰিত এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এ-বছর এর প্রকাশের প্রতিজ্ঞা করে কাজে নেমে বহু অসুবিধা সংক্ষেপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল ছয়টি খণ্ড যেভাবে প্রকাশ করা গেল সেটিও বিস্ময়কর বলে মনে হয়। আমার সহকারীদের পরিশ্রম ও প্রযত্নের ফলেই সেটা সন্তুষ্ট হলো। তাঁদের আন্তরিক ক্রতৃজ্ঞতা জানাই।

ডিসেম্বর, ১৯৯০

মাহমুদ শাহ কোরেশী  
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী

## ভূমিকা

ইরানের জাতীয় মহাকাব্য – তাঁদের ভাষায়, ‘শাহনামে’ আমরা বলি শাহনামা। নাম থেকেই বোঝা যায় এটি রাজাবাদশাহদের কাহিনি। এই সৌধপ্রতিম মহাকাব্যটি রচনা করেন ইরানের মহাকবি ফেরদৌসী, আনুমানিক ৯৭৭ থেকে ১০১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কোনো কোনো গবেষক অবশ্য আরও সুস্পষ্ট দিন-তারিখ নির্ধারণ করে বলেছেন, ‘ফেরদৌসী এই অবিস্মরণীয় মহাকাব্য রচনা শুরু করেন ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ করেন ৮ই মার্চ ১০১০ খ্রিস্টাব্দে’।<sup>১</sup>

শাহনামা ষাট হাজার পঙ্ক্তির বিশাল ও অমূল্য রত্নপ্রতিম গ্রন্থ। ২০১০ সালে এ গ্রন্থের সহস্রবর্ষ পূর্ণ হলেও সারাবিশ্বে এর আবেদন এখনো একটুও কমেনি। শাহনামাকে বলা যায়, মহৎ কবিতা এবং জাতীয় ইতিহাস পুনর্নির্মাণচর্চার একটি তুলনারহিত সৃজন। কারণ, এতে ইরানের প্রাচীন ইতিহাসের একটি অনুপুর্জ্ঞ কাব্যিক পুনর্নির্মাণই ছিল কবির অভীষ্ট লক্ষ্য। এ ধরনের কাজে পূর্বসূরিদের প্রয়াসকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নবরূপ দিতে হয়। ফেরদৌসী ইতিহাসের দিকে চোখ রেখে সৃজনপটু দক্ষতায় সে কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের একটি অংশ ফেরদৌসীর স্বকীয় সৃজন-উৎস থেকে উদ্ভৃত। অন্যদিকে, সমকালীন গদ্য লেখকদের, বিশেষ করে আবু মনসুর দাকিকির (Abu Mansur Daqiqi) রচনাকে তিনি বেছে নেন বীজসূত্র হিসাবে, বিশেষজ্ঞরা এমনটাই মনে করেন।

শাহনামার ইতিহাস পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে সগুম শতাব্দীতে পারস্যে ইসলামের বিজয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত। শাহনামা প্রধানত ইরানের গৌরাণিক, বীরত্বব্যঙ্গক এবং ঐতিহাসিক যুগসমূহের কীর্তিগাথাকে সমন্বিত করে বিশাল প্রেক্ষাপটে মানবিক আবেদন এবং শাশ্বত মূল্যচেতনাখন্ড মহৎ সাহিত্যিক মাস্টার পিস। শাহনামা ইরানের জাতিতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং ইতিহাসের কালক্রমিক অভিযাত্রায় তুর্ক-মুঘলসহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জাতি-পরিচয়কেও ধারণ করেছে। এ বিবেচনায় এটি বহু-সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করা এক বিশ্ব-মহাকাব্যেরই অস্তর্ভূক্ত।

শাহনামার কাহিনিসূত্র শুরু হয়েছে মধ্যযুগের উপাস্তকালের ফারসি বা পাহলভি ভাষায় রচিত *X<sup>V</sup>atāynamāk* (Book of Kings) থেকে। এটি মূলত পারস্যের কিংবদ্ধিকালের কাহিনি থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় Khosrau'র (590-628)

রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ফেরদৌসী এই কালের সঙ্গে মধ্যযুগের সপ্তম শতাব্দী অর্থাৎ আরবের ইরান বিজয় পর্যন্ত যুক্ত করে দিয়েছেন। ফেরদৌসী সমকালীন গদ্য লেখকদের বিশেষ করে আবু মনসুর দাকিকির রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে দাকিকি মাত্র হাজার পঞ্জি লেখার পরেই মৃত্যুবরণ করেন। ফেরদৌসী দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে এই বিপুল আয়তনের কাব্যে যে অসামান্য কাব্যকীর্তি নির্মাণ করেন তা যেকোনো সূপণিত পাঠককেও অভিভূত করে। দাকিকি Zoroaster-এর উত্থান পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফেরদৌসী দাকিকির কাছে ঝণ স্বীকার করেন। নিজ রচনায় অন্তর্ভুক্ত করেন ৬২টি আখ্যান, ৯৯০টি অধ্যায় এবং ৬০০০০ পঞ্জি। এ এক বিস্ময়কর শক্তির পরিচায়ক। প্রাচীন ইতিহাসনির্ভর মহাকাব্যে মৌখিক এবং লিখিত সাহিত্যের যে পরম্পর প্রবিষ্ট সাহিত্যশিল্পী লক্ষ করা যায় শাহনামায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

শাহনামা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশধারা সংক্রান্ত এক অতুলনীয় আকর গ্রহ্ণ। প্রাক-ইতিহাস, ইরান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সভ্যতা বিকাশের নানা উপাদান যেমন- আগুনের ব্যবহার, রান্নাবান্না, আইনকানুন ও সামাজিক বিধিবিধানসহ বহু বিষয় এতে যুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থে মোটামুটিভাবে কালক্রমিক ইতিহাস এবং মানব সমাজের ইতিহাসের ধারায় পথচলার নানা মূল্যবান বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের কোনো কোনো চরিত্রের জীবন্কাল হাজার বছরের সময়কালে পরিব্যাপ্ত। এঁদের অনেকেই আবার একেবারেই সাধারণ মানুষ। ইতিহাস এবং কিংবদন্তির পরম্পর প্রবিষ্টতা এর ঘটনাপ্রবাহকে কৌতুহলোদীপক ও আকর্ষণীয় করেছে এবং অনন্যতা দিয়েছে। ফেরদৌসীর চরিত্রসমূহ জটিল; তবে প্রাণবন্ত। কোনো চরিত্রই আদিকল্প (Archetypal) বা পুতুলপ্রতিম নয়। এর শ্রেষ্ঠ এবং সর্বগুণে গুণান্বিত চরিত্রেও বিচ্যুতি আছে, আবার কৃত্যাত চরিত্রেও আছে মানবতার ছোঁয়া। এখানেই এই বইয়ের বিশ্বানবিক আবেদন।

তুর্কি ও আরবদের কাছে পারস্য সাম্রাজ্যের পতনে ফেরদৌসী বেদনার্ত হয়েছেন। তাঁর সেই গভীর বেদনা থেকেই পারস্যের স্বর্ণযুগের ইতিহাসকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছে দিয়ে ফেরদৌসী একটি উল্লত পৃথিবী নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।<sup>১</sup> ফেরদৌসী ইতিহাসনিষ্ঠ কাব্যনির্মাতা। পাঠকেরা তাঁর বইয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা উদ্দেশ্যান্বীনভাবে পড়ে যাবেন এমনটি তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পাঠকেরা তাঁর বইয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পুজ্ঞানুপুর্জ জটিল ও

বহুযুগী ধারাপ্রবাহ সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করবেন এবং রাজা-রাজবংশ-ব্যক্তি বা কোনো রাষ্ট্রের কেন পতন ঘটে তা-ও তাঁর এই মহৎ গ্রন্থ থেকে বুঝে নেবেন। এবং এর মধ্য দিয়ে বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি নতুন পৃথিবী নির্মাণে প্রয়াসী হবেন। তিনি যে জায়গাটায় জোর দিয়েছিলেন তা হলো এই পৃথিবী চলমান এবং এই পৃথিবীতে মানুষ ইতিহাসের পথে যুগ্যুগান্তের পথপরিক্রমায় আসে আর যায়। সেজন্যই তাদের বিজ্ঞাতার সঙ্গে নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার এবং সমস্ত অশুভ কল্পনা বর্জন করে সুবিচার, সত্য, ন্যায়, শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য গুণ অর্জন করে বিশ্বসভ্যতায় তার ছাপ রেখে যাবে।

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে শাহনামার একটি পাণ্ডিতপূর্ণ সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে। এটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন টি. ম্যাকান। সতেরটি পাণ্ডুলিপির তুলনামূলক যৌগিক সম্পাদনার মাধ্যমে এটি প্রস্তুত করা হয়। ফ্রান্স, রাশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে শাহনামার বেশ কঠিন গুরুত্বপূর্ণ সংকলন প্রকাশিত হলেও ভারতবর্ষের অন্য কোনো অঞ্চলে এর পূর্ণাঙ্গ, সুসম্পাদিত সংকলনের খবর আমরা পাইনি। তবে মুঘল সম্রাটোরা এ বইটি গুরুত্বের সঙ্গে পড়তেন তার প্রমাণ আছে বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান প্রমুখের শাহনামার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে।  
প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর শাহনামা থেকে কিছু পঞ্জিক উদ্ধৃত করেছিলেন। বাংলার নবাব আলীবেদী খাঁও শাহনামা পাঠ করে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন এমন সংবাদ জানা যায়। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে শাহনামা বিষয়ে কোনো কোনো বই প্রকাশিত হলেও এই মহাগ্রন্থের কোনো সম্পূর্ণ সংকলন ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। সে দিক থেকে বাংলা একাডেমী এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। এই বইয়ের পূর্ণাঙ্গ সংকলন বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় একাডেমীর সাবেক পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

ফেরদৌসী শাহনামা শেষ করেছিলেন যেসব পঙ্কজি উদ্ধৃত করে তার ইংরেজি পাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে

I've reached the end of this great history  
And all the land will talk of me  
I shall not die, these seeds I've sown will save  
My name and reputation from the grave,  
And men of sense and wisdom will proclaim  
When I have gone, my praises and my fame.<sup>3</sup>

ফেরদৌসীর উপর্যুক্ত উক্তিসমূহ পুরোপুরিভাবেই সত্ত্বে পরিণত হয়েছে। কতটা ইতিহাসবোধ থাকলে এরকম উক্তি করা যায় তা সহজেই অনুমেয় ।

বাংলা একাডেমী এ-বছরে শাহনামার মনিরউদ্দীন ইউসুফকৃত পূর্ণাঙ্গ বাংলা গদ্যানুবাদের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করছে একাডেমীর নিজস্ব বাজেটের অর্থায়নে। ইতঃপূর্বে ইরানি সংস্কৃতি কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে এ-কাজ করা হয়েছিল। আমরা এই মহাগ্রন্থের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয়ের ধারাবাহিকতাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই এই বিশাল গ্রন্থের বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ পুনর্মুদ্রণ সম্পন্ন করেছি। নতুন মুদ্রণ-পদ্ধতিতে অতিয়তে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করি, সাহিত্যামোদী পাঠক এই গ্রন্থটি পাঠ করে ঐতিহ্যপ্রীতি, ইতিহাস ও বিশ্ববোধ এবং মানবিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হবেন। এই গ্রন্থ সুচারুভাবে প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক শাহিদা খাতুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই ।

## তথ্যসূত্র

1. Khaleghi-Motlagh, D Jalal, Encyclopaedia Iranica, 2012.
2. Shahbazi A. Shapur, Ferdowsi : A Critical Biography, 1991.
3. Ferdowsi (2006), Shahnameh The Persian Book of Kings.

Translated by Dick Davis. Viking, New York.

শামসুজ্জামান খান  
মহাপরিচালক  
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

## ভূমিকা

[ ১ ]

শাহনামা বচনার পটভূমি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফেরদৌসী তাঁর গ্রন্থমধ্যে কালের অভিযোগ উৎপান করে বলেন —

যুক্তবিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল যুগ,  
অন্বেষণকারীর নিকট দুনিয়া ছিল অতীব সংকীর্ণ।  
এইভাবে কাটিয়েছি এক যুগ  
বাণীকে মুক্তায়িত রেখেছি নিজের মধ্যে।

এই আভ্যন্তরীণ সাক্ষকে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর রাখলে দেখা যায় যে, শ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে ইরান, তুরান ও আরব ভাদ্রের জাতীয়—সন্তান এক সঞ্চারণ সময় অভিক্রম করছে। বাগদাদের খলিফার প্রভাব ক্রত হ্রাস পাওয়ায় ইরানে ও তুরানে (মধ্য এশিয়ায়) যে—সব রাজ্য গড়ে উঠছিল, তাতে তুর্কীদের প্রভাব ক্রমে আরব ও ইরানের উপর ঘনঘটার মতো বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল।

কেন মহৎ কবি-প্রতিভার মধ্যে তার নিজের কাল অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যখন আলোড়নের সৃষ্টি করে, তখন তার প্রকাশ হয় যেমন ব্যাপক, তেমনই গভীর। সে প্রকাশ তখন জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজে নিতে ব্যস্ত হয়। ফেরদৌসীর বেলায়ও তেমন হয়েছিল। তিনি তাঁর স্বদেশ ইরানের সুপু প্রাণ-ধর্মের অনুসঙ্গানে ব্যাকুল হয়ে ফিরেছিলেন ; ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কিংবদন্তী ও ইতিকথার উদ্ভাবে তিনি করেছিলেন নিজেকে নিয়োজিত। পরাজিত নির্যাতিত ইরান কবির কাছে জানিয়েছিল তাঁর মহসুম অতীতের ক্রম—উদ্বোধনের আবেদন।

এই ক্রম—উদ্বোধন যে ইতিহাসের পথ ধরেই অগ্রসর হবে,—একথা নিশ্চিত। কিন্তু ইতিহাসের শিলাস্থি সংগ্রহ ও তাঁর তথ্যের ভাব পরিবহণ তো কবির কাজ নয়। ইরানের হৃৎপিণ্ডে নবরক্ত সঞ্চালনের কাজই করতে হবে ! দায়িত্ব নিতে হবে ইরানকে বুঝিয়ে দেবার যে, তোমার অতীতের মত তোমার ভবিষ্যৎও প্রাণপূর্ণ হতে পারে, হতে পারে তা মহৎ।

ফেরদৌসী ইরানকে পুনরুজ্জীবিত করার সেই কঠিন দায়িত্ব সানন্দে মাথা পেতে নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের প্রচুর পরিশ্রমে সে দায়িত্ব তিনি সম্পূর্ণও করেছিলেন। গ্রন্থ শেষ করে তাই, ‘শাহনামা’র পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেন —

بے رنج بودم درہیں سال سی  
عجم زندہ کردم بداعین بارسی

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বহু পরিশ্রমের পর এই পারসী গ্রন্থ দ্বারা  
আমি ইরানকে পুনরুজ্জীবিত করে গেলাম

কবির প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো কল্পনা। কিন্তু শুধু কল্পনার সাহায্যে মহৎ কবিতা সৃষ্টি হয় না ; সেই কল্পনাকে জ্ঞান ও চিন্তার আশ্রয় নিতে হয় এবং কবির কাল ‘অভিজ্ঞতা’ হয়ে জ্ঞান, চিন্তা ও কল্পনাকে প্রাণধর্মে উজ্জীবিত করে। সে জ্ঞানেই ফেরদৌসীর ‘শাহনামা’ ইতিহাস না হয়ে কাব্য হয়েছে ; তথ্যের সংগ্রহ না হয়ে তা হয়েছে যৌবনপ্রাপ্ত ইরানের প্রাণময় চর্লমান প্রতিছবি। শাহনামা ইতিহাস হলে, জ্ঞানাকের রাজ্যকাল এক হাঙ্গার বৎসর হতে পারতো না ; ইরান-বীর কৃষ্ণ তিমণ্ত বছর ধরে সন্মাটের পর সন্মাটের রাজ্যকাল ব্যেপে এমনভাবে দেশ ও কালের পরিব্যাপ্ত সময়াকে শীয় শৌর্ষ ও আত্মার্থাদা প্রকটিত করার সূর্যোগ পেতেন না।

‘শাহনামা’ কাব্য ; শুধু কাব্যই নয় মহাকাব্য। চরিত্র চিত্রণে, ব্যাপ্তিতে, সমূর্ধিত বিবরণে, শৌর্ষ-বীর্যের প্রকাশে, বৃক্ষভাঙ্গ বেদনায়, শুদ্ধার্থ ও করুণার মানবিক উজ্জ্বাসনে এই কাব্য এমন এক বিরাট চিত্রশালার দ্বারেন্দ্রুক্ত করে, যার অনুরূপ যে কোন দেশের সাহিত্যে দূর্ভিত।

বলা হয়ে থাকে, ফেরদৌসী গজনীর অধিপতি সুলতান মাহমুদের ফরমায়েশে ঝঁঁক এই মহাকাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। গ্রহণ্যে বহুবার ‘সুলতানের’ প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে ; বলা ও হয়েছে, কবি সুলতানের পঞ্চপোষকতায় নিরাপত্তার মধ্যে সানন্দে কাল যাপন করেছেন ; তবুও গ্রহণ্যান্তির্য সুলতান মাহমুদের ফরমায়েশে রচিত হয়নি, তার প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই রয়েছে। বলা হয়েছে, কবি ‘শাহনামা’ রচনা শুরু করার পর তাঁর এক বক্তু তাঁকে উপদেশছলে বলেছিলেন রাজ-রাজড়াদের এই কাহিনী কোন নরপতিকে উৎসর্গ করাই শোভা পায়। বক্তুর উপদেশ কবি শিরোধার্য করেছিলেন। ইতিহাসও বলে, সুলতান মাহমুদের সভায় ফেরদৌসী সদরে গৃহীত হয়েছিলেন।

কিন্তু এ সংবাদ আমাদেরকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করতে পারে না যে, ফেরদৌসী সুলতান মাহমুদেরই আদেশে ‘শাহনামা’ রচনা করেছিলেন। তবে আমরা এতেক্ষণ বুঝতে পারি যে, সুলতানের রাজসভায় একজন বিশিষ্ট কবিকাপে ফেরদৌসী মাহমুদের হাত থেকে প্রচুর পারিতোষিকের আশা করেছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ পারিতোষিক তিনি পাননি। এর কারণ ‘শাহনামা’ কাব্যই।

‘শাহনামা’ ইরানীয় জাতীয়তার উজ্জীবনের কাব্য। ইরানের স্বাধীনতা হরণকারী তুর্কী বংশের মতো গজনী-রাজবংশ এ-কাব্য সম্পর্ক মনে গ্রহণ করতে পারে না। পরবর্তীকালে ‘শাহনামা’র আস্তর্জ্ঞাতিক মূল্য যত বড়ই হোক না কেন, সুলতান মাহমুদের সময়ে তো ইরান-তুরানের (তুর্কীদের) সংবর্ধ বাস্তব ছিল। এই বাস্তবতাকে হস্তয়ন্ত্র করার মতো সচেতনতা সুলতান মাহমুদের ছিল না, এমন ভাবা যায় না।

তাছাড়াও ‘শাহনামা’য় সুলতান মাহমুদের যে সব প্রশংসন্তি রয়েছে, সেগুলি প্রক্রিপ্তের মতো শোনায়। ইরানের শাহদের কীর্তিকথার সঙ্গে গজনী-বংশের কোনই সম্পর্ক নেই। ‘শাহনামা’র কাহিনী মুসলমানগণ কর্তৃক ইরান বিজয়েই সম্পাদ্য হয়েছে, সেখানে ইরানের সিংহাসনে জোহাকের অনুরূপ স্থানে মাহমুদের জন্ম রক্ষিত হয়নি।

‘শাহনামা’ রচনা যখন শৈষ হয়, তখন কবির বয়স আশি বছর। ত্রিশ বছর ধরে তিনি ‘শাহনামা’ রচনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে দেখা যায়। যদি তাই হয়, তবে ফেরদৌসীর জীবনের প্রথম পঞ্চাশটি বছর কোথায় কিভাবে কেটেছিল ? এ প্রশ্ন ওঠে। আরও দেখা যায়, ‘শাহনামা’ শৈষ হয়েছিল ১০১০ সালে ; ত্রিশ বছর আগে যদি তার রচনা শুরু হয়ে থাকে, তবে সেই সূচনা ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি

କୋନ ସମୟେ ହେଲିଛି ବଲେ ଥରେ ନେଓଯା ଯାଏ । ଅଧିତ ଯେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ସିଂହାସନାରୋହଣ କରେନ ୧୯୮ ଖ୍ରୀଟାବ୍ଦୀ, ତୀର ଆଦେଶେ ୧୮୦ ସାଲେ ‘ଶାହନାମା’ର ରଚନା ଶୁଭ ହେଲିଛି, ଏମନ ଭାବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଷ ହୁଏ ନା ।

ଜାନା ଯାଏ ଯେ, କବି ଯୌବନେଇ ତୀର ଜନ୍ମଭୂମିତେ ଇରାନେର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ଯ-ବାଦଶାହେର ଏକ କାହିଁନୀ ଲିଖିଥେ ଶୁଭ କରେନ ଗଦ୍ୟେ ଏବଂ ସଂକଳତଃ ତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣଓ କରେନ । ତାରପର କବି ଦାକୀକୀର ଅନୁବର୍ତ୍ତତାଯ ଫେରଦୌସୀ ତୀର କାହିଁନିକେ ଛନ୍ଦୋବଜ୍ଞ କରାର ଅନୁପ୍ରେରଣ ଲାଭ କରେନ । ଦାକୀକୀର ‘ଶାହନାମା’ ଅଧିକଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେତୁର ପୂର୍ବେ ଯୌବନେଇ ତିନି ଆତତାୟୀର ହାତେ ନିହତ ହନ । ଫେରଦୌସୀ ଯେ ‘ଶାହନାମା’ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରେଛିଲେନ ଅଧିବା ତାର ଖ୍ରୀଟ ତୈରୀ କରେଛିଲେନ ତା ସଂକଳତଃ ‘ଆଲେଫଲାଯଲା’ର (ଆରବ୍ୟୋପନ୍ୟାସ) ଛାତେ ପରିକଳ୍ପିତ ହେଲିଛି ।

ସୁତରାଂ ଦାକୀକୀର ଥିକେ ‘ଆଲୋ ଲାଭ କରେ’ କବି ସ୍ଥାଯି ଜନ୍ମଭୂମିତେ ବସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘ଶାହନାମା’ ରଚନାଯ ହାତ ଦେନ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ବଲେ ଥରେ ନେଓଯା ଯାଏ ; ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରୀଣ ସମେଇ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦେର ଉତ୍ତିର ହାସାନ ମୈମୂଳୀର ସହାୟତାଯ କବି ଗଜନୀର ରାଜସଭାଯ ଗ୍ରହିତ ହନ । ବଲା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ସୁଲତାନ ମାହମୁଦେର ରାଜସଭା ଶୁଣିଜନ ଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ଲଙ୍ଘିତ ଛିଲ । ମହାପଣ୍ଡିତ ଆଲ-ବେରୁନୀ ଛିଲେନ ସୁଲତାନେର ସଭାର ମହତ୍ୟ ମଣି, ଆସଜାଦୀ, ଫରକୁରୀ, ଉନ୍ସୁରୀ ନାମେ ଆରୋ କଯେକଜନ କବିଓ ସୁଲତାନେର ସଭା ଆଲୋ କରେ ରେଖେଛିଲେନ ।

ସୁଲତାନ ମାହମୁଦେର ଉପର ଫେରଦୌସୀର ଲେଖା ଏକଟି ଅପବାଦ୍ସୂଚକ କବିତାକେ ଘିରେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟୋଚକ କାହିଁନିର ଉତ୍ସବ ହେୟଛେ । ଏହି କବିତାଟି ବିଶେଷ କରେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶେ ଅତିଶ୍ୟ ପରିଚିତ । ‘ଶାହନାମା’ର ଅପର କୋନ ଏକଟି ପଂକ୍ତିଓ ସାଦେହ ଜାନା ନେଇ ତୀରାଓ ଏହି ଅପବାଦ-ସୂଚକ କବିତାଟିର ଦୂରାର ପଂକ୍ତିର ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସତି ଦିତେ ପାରେନ । ନିର୍ଦ୍ଦାସିତ ଏହି କବିତାଟିର ଜନପ୍ରିୟତାର କଥା ସ୍ଵରଣ ବେଶେଇ ଏଥାନେ ଆମରା ସେଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁବାଦ ସନ୍ତ୍ରିବେଶିତ କରିଲାମ ।

କବିତାଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ :

ହାୟ, ରାଜ୍ୟଜୟୀ ମାହମୁଦ, ତୋମାର ଜନ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୁଏ

ମାନୁଷକେ ଯଦି ଭୟ ନାଇ କର, ତବେ ଅନ୍ତଃଃ ଖୋଦାକେ ତୋ ଡରାଓ ।

ତୋମାର ପୂର୍ବେ ଦୂନିଯାଯ ରାଜ୍ୟ କରେ ଗେଛେନ ବହୁ ବାଦଶାହ,

ତୀରା ସବାହି ଛିଲେନ ରାଜ୍ୟାୟଧିପତି ଓ ମୁକ୍ତାଧାରୀ ।

ତୀରା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ ନିଃସମ୍ବେଦେହେ ତୋମାର ଚାଇତେ ଉତ୍କତ ଛିଲେନ,

ସମ୍ପଦ, ଦୈନ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ଓ ସିଂହାସନ ତାଁଦେର ମହତ୍ୟ ଛିଲ ।

ତାଁଦେର କର୍ମ କଲ୍ୟାଣ ଓ ସତତାକେ ଆଶ୍ରୟ କରେଇ ବିରାଜ କରାତୋ,

ନୀଚତା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ତାଁଦେର ବ୍ୟକ୍ତିଭ୍ରତେ ଖର୍ବ କରାନ୍ତେ,

ଅନୁଗତ ଜନକେ ତୀରା ଯଶ ଓ ସୁନାମେର ସଜ୍ଜାନୀ ଛିଲେନ ,

ଏବଂ ମେଇ ଅନୁସକ୍ଷଳେର ପରିଣାମ ଛିଲ ମନ୍ତ୍ରଲମ୍ବୟ ।

ଅପରପକ୍ଷେ ଯେ ନରପତି ଶର୍ମମୁତ୍ତାର ଲାଲସାଯ ବନ୍ଦୀ ଛିଲ,

ଆନୀଜନେର କାହେ ତାକେ ହତେ ହେୟାଇ ଅବଜ୍ଞାର ପାତ୍ର ।

হে সুলতান ! যদিও ধরিত্বী এখন তোমারই শাসনাধীন,  
তবুও, ছিঞ্চাসা করছি, এই নির্লজ্জ বাক্য কেন তুমি উচ্চারণ করলে ?  
আমার প্রথর ব্যক্তিত্ব কি তোমার চোখে পড়েনি ?  
আর সেই সঙ্গে তুমি কি ভেবে দেখনি, আমার রক্তপিপাসু  
তরবারির কথা ?

তুমি আমাকে ধর্মহীন অসচ্ছরিত বলে গালি দিয়েছ,  
আমি পুরুষসিংহ, আমাকে তুমি সম্মান করেছ মেষ বলে ।  
অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে তুমি আমায় বলেছ যে,  
আমি নবী ও আলীর উপর সুপ্রাচীন ভক্তি অব্যাহত রেখেছি ।  
যার হস্তয়ে আলীর প্রতি এমন শক্রতাবোধ গুণ্ঠ রয়েছে,  
এই দুনিয়ায় তার চাহিতে অপমানিত আর কে আছে ?  
মনে রেখো, আমি সেই দুই মহাপুরুষের দাস হয়েই থাকবো,  
যতদিন না উপরিত হয় প্রলয়—ঝঝঝা,

এবং যতক্ষণ, হে সন্ত্রাট, তুমি আমার দেহকে ছিন্নভিন্ন করে না ফেলো  
আমি সেই দুই সন্ত্রাটের ভালোবাসা থেকে মুখ ফিরাবো না ।  
ভাববো না, সুলতানের তীক্ষ্ণ তরবারি আমার শিরে উদ্যত হলো কি না ?  
মনে রেখো, এ দের যে শক্ত, সে নিশ্চয় পিতৃপরিচয়হীন,  
বিশ্ব-প্রভু তার দেহকে নরকাশ্বিতে দগ্ধ করবেন ।  
আমি নবীর পরিবার বর্গের দাস,  
আমি মাথায় তুলে নিই ওসী'ব পায়ের ধূলি ।  
আমাকে তুমি ভয় দেখিয়ে বলেছো,—  
তোমার দেহকে আমি হস্তীপদতলে পিট করবো ।  
আমি তোমার এই ভীতি প্রদর্শনকে তুচ্ছ জ্ঞান করি,  
কারণ, আমার হস্তয়ে নবী ও আলীর ভালোবাসায় সমুজ্জ্বল ।  
'ওসী' ও প্রেরণা-প্রাপ্তজ্ঞ কি বলেছিলেন, তা শুনে রাখো,  
সেই মহাপুরুষ যিনি ছিলেন আদেশ ও নিষেধের প্রভু ;  
শুনে রাখ, আদেশ নিষেধের সেই মহাপ্রভু কি উচ্চারণ করেছিলেন —  
তিনি বলেছিলেন, আমি জ্ঞানের নগরী ও আলী তার সিংহদ্বার,  
পয়গম্বরের এই বাণী নিঃসন্দেহে সত্য ।

---

যাঁর সম্পর্কে মৃত্যুকালে অনুজ্ঞা করা হয় তিনিই ওসী । শিয়া মতবাদ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুকালে  
হজরত আলীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন ।

আমি এই সত্যবাণীর সাক্ষ দান করছি,  
বলতে গোলে, সে সত্যবাণী নিয়ত আমার কর্ণে খনিত প্রতিখনিত হচ্ছে।

তোমার জ্ঞান, বৃক্ষ ও সঙ্কল্প যখন পথ পাবে,  
তখন তুমিও অনুসরণ করবে নবী ও আলীর পথ।  
যদি এই বিশ্বাসই আমার অপরাধ হয়ে থাকে,  
তবে জেনে রাখ, এই আমার ধর্ম, রীতি ও বিশ্বাস।  
এই বিশ্বাস নিয়েই আমি জন্ম গ্রহণ করেছি, এই বিশ্বাসের  
উপরই আমি মরবো,

জেনে রাখ, আমার দেহের প্রতিটি অণু হায়দারেরই<sup>১</sup> পায়ের ধূলি।  
অপরদের<sup>২</sup> সম্পর্কে আমার কিছুই করার নেই,  
তাঁদের সম্পর্কে আমার বলারও কোন প্রয়োজন পড়ে না।  
মাহমুদ যদি এই সত্য থেকে নিজেকে দূরে রাখে,  
তবে একটি যবের সঙ্গেও তার বৃক্ষিক পরিমাপ হবে বলে  
আমি মনে করি না।

যদি আল্লাহ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে থাকেন,  
তবে পরলোকে যে নবী ও আলী রয়েছেন, তাঁদেরই তা দান।  
আমি যদি বর্ণনা করি তাঁদের দয়ার কাহিনী,  
তবে তদ্বারা মাহমুদেরই শত পক্ষপাতিত্ব করা হয়।  
দুনিয়া যতদিন থাকবে ও তাতে অবস্থান করবেন নরপতিগণ,  
আমার বাণী তাঁদের কাছে পর্যন্ত শিয়ে শৈছবে।  
তাঁরা বলবেন, তুস নগরের অধিবাসী অভিজ্ঞত ফেরদৌসী  
এই 'শাহনামা' মাহমুদের নামে উৎসর্গ করেন নি।  
জেনে রাখো, নবী ও আলীর নামেই উৎসর্গ করেছি এই 'নামা'<sup>৩</sup>।  
বহু অর্থময় বাণীর মুক্তা আমি এতে গ্রাহিত করেছি।  
যদি পৃথিবীতে ফেরদৌসীর জন্ম না হতো,  
তবে তরুণতে উদ্গত হতো না বদান্যতার কিশলয়।

---

হায়দার — হজরত আলী (রাঃ)র গুণবাচক পদবী।

অপর তিনি খলিফা — হজরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ)।

শাহনামা।

যদি এই কাহিনীর দিকে আমি দৃষ্টিপাত না করতাম,  
তবে তা মিথ্যাবাদীদের দ্বারা অন্যপথে পরিচালিত হতো।  
যারা আমার এই কবিতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে,  
আবর্তমান আকাশ তাদেরকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।  
আমি এই কাব্যে প্রাচীন সম্রাটদের কাহিনীর মাধ্যমে  
নিজেদেরই কথা সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছি।  
আমার বয়স যখন আজ আশির সন্তুষ্টিবর্তী হয়েছে,  
তখনই আমার সকল আশায় ছাই পড়লো।  
আজ মনে হচ্ছে, দুনিয়ার এই সরাইখানায় এত বছর ধরে  
ব্যাখ্যাই আমি শৰ্ষ-সম্পদের আশায় এমন কষ্ট সহ্য করেছি;  
এই কাহিনীতে আমি তিশ হাঙ্গার শ্লাকের পানপাত্র আবর্তিত করেছি,  
তাতে কীর্তিত হয়েছে রণক্ষেত্রের বীতি-নীতি;  
আমি এতে বর্ণনা করেছি তৌরধনূক ও পাশের কথা,  
প্রহরণ ও তরবারির কার্যকারিতার কথা এতে ব্যক্ত হয়েছে।  
এতে আছে বর্ষ, তনুত্রাণ ও শিরস্ত্রাণ,  
আছে অরণ্য ও সমুদ্র, আছে মরুভূমি ও বহুতা নদী ;  
নেকড়ে, সিংহ, হস্তি ও ব্যাষ্ট্রের কথাও এখানে রয়েছে,  
দৈত্য, আজ্ঞাদাহা ও নজের রাপকথা ও স্থান পেয়েছে এতে।  
এতে আছে মন্ত্রোচ্চারণকারীদের মন্ত্র ও দৈত্যদের ইলজাল,—  
যাদের গর্জন বাযুরাশিকে দীর্ঘ করেছে।  
যুদ্ধের দিনে শক্তিপরীক্ষায় যেসব বীর  
তাদের বীরত্ব ও ঔন্ধ্যত্বের পরাকর্ত্তা দেখিয়েছেন,  
সেই সব খ্যাতনামা ও পরম সম্মানিত পুরুষের কাহিনীও  
বর্ণিত হয়েছে এই কাব্যে,  
তাদের মধ্যে রয়েছেন তুর, সূলম ও আফ্রাসিয়াবের  
মতো নরপতি ;  
রয়েছেন ফারেদুন ও কায়কোবাদের অনুরূপ বাদশাহ,  
জ্বোহাকের মতো বিধৰ্মী, অত্যাচারী ও অসভ্য সম্রাটের কথা ও  
এতে আছে।  
আরো আছেন, গারুণ্যসম্পন্ন ও নূরীমান-পুত্র সামের মতো বীর —.  
যাঁরা বিশ্ববিদ্যাত পুরুষদেরকেও পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছেন।  
হেশঙ্গ ও দৈত্যদমন তহমূরসের কাহিনীও এতে আছে,  
আছে মনুচেহের ও সমুচ্ছ সম্রাট জমশেদের কীর্তিগাথা।  
কায়কাউস ও কায়খসরুর মতো মুকুটধারী সম্রাট  
এবং রুক্ষম ও ইস্ফেদিয়াবের অনুরূপ সেনাপতিদের কাহিনীও

বর্ণিত হয়েছে এই ‘নামায়’।

গোদরজ ও তাঁর বীর্যবস্ত আশি পুত্র  
এবং অগণন মুক্তজয়ী বীরাগ্রগণ্যদের কীর্তিগাথা ও বর্ণিত হয়েছে।  
স্বনামধন্য সম্মাট লুহুরাস্প,  
সেনাপতি জরীর ও বাদশাহ গুশ্তাস্প,  
জামাস্পের মতো জ্ঞানী,  
যাঁকে প্রজ্জলস্ত সূর্যের চাইতেও অধিক উজ্জ্বল বলে অভিহিত করা যায়,  
দারাব-পুত্র দারা ও হুমায়-পুত্র বহুমন,  
সিকান্দর, যিনি সম্মাটদেরও সম্মাট ছিলেন,  
নরপতি আরদেশীর ও বাদশাহ শাপুর,  
বাহ্রাম ও পুণ্যশীল নওশেরওয়ান ;  
পাবন্দেজ, হুমুজ ও তৎপুত্র কোবাদ,  
খসক যাকে খসক পাবন্দেজ বলা হতো, —  
এইসব পরাক্রান্ত ও উচ্চশির সম্মাট  
যাঁদের কাহিনী এখানে আমি বর্ণনা করছি ;  
তাঁরা সবাই দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন,  
কিন্তু আমার এই কাহিনীর মধ্যে তাঁরা লাভ করেছেন নবজীবন।  
প্রিসার<sup>১</sup> অনুরূপ আমি এইসব মৃত্যুক্ষিকে  
তাঁদের কীর্তিসহ নতুন জীবন দান করেছি।  
এমন এক দাসত্ব আমি করেছি, হে সুলতান,  
যা তোমার নামের সঙ্গে দুনিয়ায় স্মৃতি হিসেবে রাখিত হবে।  
এব সংবাদ যেখানেই গিয়ে পৌছবে, সেই জনপদই হবে বিনষ্ট ;—  
তা রৌদ্রদীপ্ত হোক কিংবা বর্ষণসিঙ্ক।  
তোমার সমন্বৃত রাজপ্রাসাদের দিকে চেয়ে আমি রচনা করেছি যে কবিতা  
ঘৃতৰ পরিবর্তন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।  
এই কাব্য সম্পূর্ণ করতে অতিবাহিত হয়ে গেছে আমার সারাজীবন,  
এ সত্য স্বীকার করবেন যে কোন জ্ঞানী।  
কিন্তু পরিণাম যে এমন হবে, তার আভাস তুমি দাওনি,  
আর আমার নিজের মনেও সুলতান সম্পর্কে এমন কোন ধারণার  
অস্তিত্ব ছিল না।  
মৃত্যুবাং অকল্যাণকামী ব্যক্তির জন্য কখনো সুদিন আসবে না,

১৯৩০ প্রিসা (আং) যিনি ঘৃতদের জীবন দান করতেন।

প্রশংসাসৃচক বাণী তার জন্য পরিবর্তিত হবে অপবাদে।  
সুলতানের জন্য আমার এই তনুকে আমি বিরূপ করেছি,  
হায় ! অবুধের মতো আমি হাতে নিয়েছিলাম প্রজ্ঞলস্ত অঙ্গার।  
যদি ন্যায়পরায়ণতা তার নির্ধারিত পথ অনুসরণ করতো,  
তবে এই কাহিনীর মধ্যে তুমি অবশ্যই মনোর্নিবেশ করতে পারতে ;  
এবং বলতে পারতে, কিভাবে গ্রাথিত হয়েছে এই বাণীগুলি,  
এবং কিভাবে আমি এদের মধ্যে ঘটনা ও প্রকৃতিকে করেছি সুবিন্যস্ত।  
বাণীর মাধ্যমে ধরিত্রীকে আমি ফুলবনের অনুরূপ করে সাজিয়েছি,  
আমার পূর্বে বাণীর এমন বীজ কেউ আর বপন করতে পারে নি।  
অগমিত কবি জন্মেছেন এই পুরিবীতে,  
তাঁরা সংখ্যায় অনেক ছিলেন তাও স্বীকার করি,  
কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এমন করে কেউ আর বলতে পারেননি।  
দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে পরিশ্ৰমের পর  
এই পারসী গ্রন্থ দ্বারা ইরানকে আমি পুনরুজ্জীবিত করে গোলাম।  
সুলতান যদি (স্বভাবে) দরিদ্র না হতেন,  
তবে আমাকে আজ সিংহাসনে বসানো হতো।  
কাজেই আশা করবো, কোন নরপতির মধ্যে যেন দীনতার অস্তিত্ব মাত্র না থাকে,  
পৌরুষের সঙ্গে যেন দারিদ্র্যের সহ-অবস্থান না ঘটে।  
প্রজ্ঞার উপর সুলতানের ছিল না কোন অধিকার,  
থাকলে তিনি আমাকে আজ নিশ্চিতই সিংহাসনে বসাতেন।  
সিংহাসনের অধিকারী যদি অভিজ্ঞাত না হয়,  
তবে সিংহাসনধারীগণের স্মৃতি তার মনে উদিত হতে পারে না।  
সুলতানের পিতা যদি সুলতান হতেন,  
তবে আমার শিরে আজ রক্ষিত হতো স্বর্ণ-মূরুট  
যদি সুলতানের মাতা কোন রাজপরিবারের কন্যা হতেন,  
তবে আমাকে জর্জাদেশ পর্যন্ত প্রোথিত করা হতো স্বর্ণ-বৌপ্যের সৃপের মধ্যে  
যদি বৎশমধ্যে মাহাত্ম্য না থাকে,  
তবে মহত্ত্বের লক্ষণ সেখানে কেমন করে প্রকাশ পাবে ?  
হে উচ্চবৎশীয় নরপতি মাহমুদ, তোমার মুখে থুথু !  
নবম সংখ্যা ন'য়ের মধ্যেও তিনের সংখ্যা চারের মধ্যেই শান করে নিতে পারে।  
যখন ত্রিশ বছর 'শাহনামা'র উপর পরিশ্ৰম করছিলাম,  
তখন আশা করেছিলাম, সুলতান আমাকে প্রতিদানে দিবেন স্বর্ণসম্পদ।  
এবং মেই সম্পদ দ্বারা দুনিয়ায় তিনি আমাকে অভাবমুক্ত করবেন,  
ও বীরবন্দের মধ্যে সমন্বয় করবেন আমার শির।  
কিন্তু যখন পারিতোষিকের জন্য উষ্ণুক্ত হলো রাজকোষ,

তখন সেখানে থেকে আমার জন্যে এলো না তুল্যমূল্য পারিতোষিক ।  
রাজকীয় সম্পদ থেকে যদি যবহ আমার লভ্য হয়,  
তবে সেই যব দ্বারা আমি পথকেই ক্রয় করে নেবো ।  
এমন এক নরপতির সান্নিধ্যের চাইতে একটি তাম্রমুদ্রার সহবাস শ্রেয়তর,—  
যে—নরপতির না আছে চরিত্র না রীতি না ধর্ম ।  
দাসীর গর্ভে যাব জন্ম, তাব দ্বারা মহৎকাজ সম্ভব হয় না,  
যতই তার পিতা রাজ্যাধিপতি হন না কেন !  
অযোগ্য ব্যক্তিদের শির সমূলীত করা,  
ও তাদের কাছে কল্যাণের আশা করা,  
বস্তুতঃ নিজের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কসূত্র ছিন্ন করারই অনুরূপ,  
এবং স্বীয় বস্ত্রাঙ্গলে লুকিয়ে সর্প প্রতিপালনের ঘতোই ক্ষতিকর ।  
যে বক্ষের সৃষ্টিতেই রয়েছে তিঙ্ক বীজ,  
তাকে যদি স্বর্গোদ্যানেও রোপণ করা হয়,  
এবং স্বর্ণীয় স্ত্রোতৰিনীর পানি যদি তার মৃত্তিকায় সিঞ্চন করা হয়,  
এবং গোড়ায় প্রয়োগ করা হয় মধু ও অম্বত ;  
তবুও পরিণামে তাব স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করবে  
ও তার সকল ফলই হবে তিঙ্ক !  
তুমি যদি সুগন্ধী আত্ম-বিক্রেতার পাশ দিয়ে যাও,  
তবে তোমার পোশাকে আত্মের সুগন্ধ সঞ্চারিত হবে ।  
অন্যপক্ষে, তুমি যদি লৌহকারেব দোকানে গমন কর,  
তবে, সেখান থেকে পাবে শুধু ধূমের কালিমা ।  
মন্দ যার ফুলে রয়েছে, তাব মধ্যে মন্দের অবির্ভাব দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই,  
রাত্রি থেকে অঙ্কারাকে বিযুক্ত করা সম্ভব নয় ।  
অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে কখনো ভালো আশা করো না,  
কারণ, কঁশকায় মানুষ কখনো স্নান দ্বারা শুভ্রতা লাভ করে না ।  
যার মূল ভালো, তারই উপর কর দৃষ্টিপাত,—  
তাতে তোমার দুচোখ আনন্দে ভরে যেতে পাবে ।  
বিশ্বস্তা তাকে যে—ভাবে তৈরী করেছেন, সে তেমনই হবে,  
সুষ্ঠা স্বয়ং যে—দ্বার বক্ষ করেন, তার কৃষিকা তুমি খুঁজে পাবে না ।  
মাহাত্ম্য এমন এক বস্তু যা কথার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে না,  
শত শত উক্তি একটি কর্মের অর্ধেক মর্যাদাও পেতে পারে না ।  
সেই রাজ্যাধিপতি খ্যাতির অধিকারী,  
যিনি প্রজ্ঞাকে তাঁর মহৎ কর্মের পরিচালকরূপে প্রত্যক্ষ করেন ।  
তুমি সম্রাটদের সদাচারের কাহিনী আরো শুনেছো,  
তাঁদের চিচাচরিত রীতিনীতির কথাও সম্ভবতঃ অবগত আছ ।

সে-ভাবেই যদি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতে  
তবে আজ্ঞ আমার দিনগুলি এমন করে ব্যর্থ হতো না।  
এই বলে আমি সুমন্ত যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম,  
যাতে সুলতান এ থেকে গ্রহণ করতে পাবে উপদেশ।  
অতঃপর মানুষ যেন জানতে পাবে, কথার শক্তি কতটুকু,  
গ্রহণ করতে চেষ্টা করে প্রাচীন দিনের বন্ধের উপদেশ

‘এবং অন্যসব কবিকে সে যেন (সুলতান মাহমুদ) প্রতারিত করতে না পাবে,  
আর কবিগণ নিজেরাও তাঁদের সম্প্রদয় সম্পর্কে সচকিত হন।  
কবিগণ যখন বাথা পান, তখন তাঁরা উচ্চারণ করেন নিদাসৃচক-কবিতা,  
এবং রোজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে সেই ব্যঙ্গোক্তি।  
অতঃপর আমি পরিত্ব বিশ্ব-প্রভুর দরবারে নিবেদন করছি আমার রোদন  
এবং স্বীয় মন্ত্রকে নিক্ষেপ করছি ধূলিবাশি।  
হে প্রভু, তার প্রাণকে তুমি অগ্নিতে দগ্ধ কর,  
এবং প্রাপ্যজনের জন্মকে কর তদ্বারা আলোকিত।

অপবাদসৃচক এই কবিতায় ফেরদৌসী এমন কয়েকটি কথা বলেছেন, যা দিয়ে আমরা সুলতানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ‘শাহনামা’ রচনা শেষ করার সময় কবির আযুক্তাল, দুচারাটি শ্লোকে শাহনামার বিষয়বস্তুর পরিধি, ফেরদৌসীর শিয়া মতবাদ, পাবিত্রোষিক দানের সময় বিবেচিত হওয়ার বিষয় ও সর্বোপরি ‘শাহনামা’কে সর্বযুগের একটি মহৎ কাব্যকীর্তি হিসাবে ছেড়ে যাওয়ার প্রত্যয় আর সেই সঙ্গে কবির আত্মর্ঘাদাবোধ ইত্যাদি বহু বিষয়ে জানতে পারি। ষাট হাজার শ্রণমূদ্রার কাহিনীটি সম্ভবতঃ একটি কাহিনীই। কবি বস্তুতঃ তার আশানুরূপ পারিতোষিক না পাওয়ায় যে ক্ষেত্র প্রকাশ করেছিলেন, তাই প্রতিক্রিয়ায় সুলতানের দিক থেকে কবির উপর বর্ষিত হয়েছিল তিরস্কার এবং তার ফলই কবির আত্মর্ঘাদাবোধকে আহত করেছিল। সুলতানের নিদাসৃচক এই কবিতাটি কবির সেই প্রতিক্রিয়াকেই প্রকাশ করছে।

ঐতিহাসিক সৃত থেকেও জানা যায় যে, ১০১০ স্বীকৃতে ফেরদৌসী তাঁর ‘শাহনামা’ শেষ করেছিলেন। কবি যে দীর্ঘদিন ধরে গভীরী অধিপতি মহাপরাক্রান্ত ও গুণগ্রাহী সুলতান মাহমুদের বাস্তু অলঙ্কৃত করেছিলেন, সেটিও পুরাপুরি এর্তিহাসিক সত্য। ফেরদৌসী ইবানের তৃস-নগরে এক সম্প্রস্তু ‘দিহকান’ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ‘দিহকান’ শব্দটির প্রতিশব্দ মূলতঃ চাষী। কিন্তু কালক্রমে ভূমির উপর নির্ভরশীল গ্রাম্যভূষ্মানগণই দেশে গ্রামীণ সভ্যতার চূড়ান্তে স্থীরুত্ব লাভ করেন তাঁরাই হন ভূমধিকারী ও অভিজাত। বিলাস-ব্যসনে গা ঢেলে দিলে এইসব অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারেও অনেক সময় দারিদ্রের অভিশাপ নেমে আসতো; তখন পরিবারের সদস্যগণ জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তেন শহরের দিকে। ফেরদৌসী সম্ভবতঃ তেমনই কোন আত্মর্ঘাদালীল অভিজাত ‘দিহকান’ পরিবারের সন্তান ছিলেন।

আগেই বলেছি, ‘শাহনামায় আছে, ফেরদৌসী তাঁর যুগের অশাস্ত্র পরিবেশের জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত ‘শাহনামা’ রচনায় হাত দিতে পারেননি। ইবানের পুনরুজ্জীবনের মূলমুক্তাকাপে পরিকল্পিত ইবানীয় সম্প্রাট ও বীরবন্দের এই কাহিনী রচনার জন্য ইবানের স্বাধীনতা হরণকারী গজনী-পরিবারের

সুলতান মাহমুদ যদি ফেরদৌসীর জন্য তাঁর রাজসভার দ্বার উত্থৃত করে দিয়ে থাকেন, তবে, মাহমুদ দাসপুত্র হোন কিংবা আরও যাই হোন, তিনি যে উদার ও গুণগ্রাহী ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ‘শাহনামা’র মধ্যে স্থানে স্থানে ফেরদৌসী সুলতানের গুণকীর্তন করেছেন, স্মৃতির অভিবাদ সঙ্গেও সেখানে যে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটেছে, তাতে সন্দেহ করার কিছু নেই।

ফেরদৌসী ১০২০ খ্রিষ্টাব্দে সীয় জন্মভূমি তুস নগরেই শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেন।

কথিত আছে, ভারত থেকে কোন এক যুজ্ঞশেষে প্রত্যাবর্তন করার সময় উজির হাসান মৈমুনী সুলতান মাহমুদের সামনে ‘শাহনামা’র একটি শ্লোক আবণ্ণি করেন। শ্লোকটির কাব্যিক সৌন্দর্য সুলতানকে চমকিত করে; তিনি উজিরকে জিজ্ঞাসা করেন, এ-শ্লোক কার রচনা? মৈমুনী জানান যে, হতভাগ্য কবি অভিমান বশে রাজ্যরোধে পতিত হয়েছিল। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে কবিক গৃহে যাঁটি হাজার স্বর্ণপুরা পাঠিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন।

সুলতানের অনুচরণগ যখন সেই স্বর্ণপুরাসহ ফেরদৌসীর জন্মভূমি তুসে প্রবেশ করেছিলেন, তখন কবির মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রে দিকে এগিয়ে চলছিলেন তাঁর ভক্তগণ।

সুলতানের পারিতোষিক কবিক একমাত্র কন্যার সামনে রাখা হলে, তিনি তা গ্রহণ করেননি বলেও লোক-শুন্তি প্রচলিত আছে।

[ ২ ]

জীবন ও জগৎ ব্যাপকাকাবে চিত্রিত হলেও, হোমারের ইলিয়ড-‘ওডিসি’ কিংবা ‘রামায়ণ’-‘মহাভারত’ যে ধরণের মহাকাব্য, শাহনামা সে ধরণের মহাকাব্য নয়। ‘ইলিয়ড’-‘ওডিসি’ ও ‘রামায়ণ’-‘মহাভারত’-এর নিয়ামকশক্তি কাল নয় — স্থান ; সেখানে গ্রীস ও ট্রুয়, অযোধ্যা ও লক্ষ্মা, হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই ঘটনা আবর্তিত হয়েছে একের পতনে অনের মহিমা সেখানে ভাস্বর। অন্যক্ষে শাহনামাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে মহাকাল। যে-কালের বহমান স্মৃতে ঘটনা ও স্থান মুহূর্তের জন্মে উত্পন্ন হয়ে বলীন হয়ে যায়,— সেখানে রাজ্ঞি ও রাজ্ঞবংশের উপান-পতনে, বীরের শৌর্যে ও স্ম্রাটিদের মহানুভবতায় এক মূল্যবোধের উত্তর ঘটেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তা মানুষের হাতে আসছে উত্তরাধিকারসূত্রে ইতিহাসেই শিঙ্কা হয়ে।

তবুও আগেই বলেছি, ‘শাহনামা’ ইতিহাস নয়, কাব্যই। ইতিহাসের অঙ্গসংস্থান অতিক্রম করে সেখানে দেদীপ্যামান হয়ে উঠেছে কবির কল্পনা। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সহায়তায় জীবনের এমন এক প্রবহমানরূপ সেখানে ফুটেছে, যার পটভূমিতে কখনো সমতমভূমি, কখনো পর্বত, কখনো নদী-উপত্যকা, কখনো মরুভূমি, কখনো দীপাবলী সজ্জিত সমন্বয়ে নগরী। এই পটভূমি ইরান-তুরান-চীন ভারত যাই হোক না কেন, কবি তা অবলীলায় অতিক্রম করে চলেছেন। কালাণ্ডিত হয়েও কালাতীত তেমন মূল্যবোধের উপরই স্থাপিত হয়েছে ‘শাহনামা’র সৌধ। সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয়ের উপরই চিবিন মহৎ কাবোব বিষয়বস্তু সংস্থিত হলেও, ‘শাহনামায় তা মানবীয় প্রজ্ঞার কেন্দ্রস্থলে বিবাজ করে প্রত্যেকটি ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে ; বলকে উজ্জীবিত করছে বীরে।

বাহ্যতৎ, এই কান-প্রাধান ও মূল্যবোধকে ‘ওল্ড টেটামেটে’র অনুগামী বলে মনে হতে পাবে, কিংবা কাব্যকাবে ইরানের ইতিহাস রচনার প্রয়াস বলেও তাকে ভুল করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু

‘শাহনামা’য় ঘটনার বিশ্লেষণ ও বহুস্থানে কাল সম্পর্কে কবির স্বগতোভিত্তির দিকে লক্ষ্য রাখলে, সক্রতভাবেই বলতে হয় যে, উপরোক্ত দুটি অনুমানের একটি সত্য ‘নয়। কারণ, ইতিহাসেও কাল সর্বব্যাপী নয়, স্থানের গুরুত্ব সেখানেও যথেষ্ট প্রকট। কবি, স্থান নয়, কালকেই ঘটনার আধার বলে মনে করেন এবং জীবন যে বস্তুতৎ কালেরই মহাদান, এ বিশ্বাসই তাঁর কাব্যকে কালের উপর এমন করে বিস্তৃত করেছে এবং মূল্যবোধকে দান করেছে এমন মাহাত্ম্য! ইয়োরোপের আধুনিক সমালোচকগণ যে ‘ইতিহাস-চেতনা’র উপর কল্পনার উৎকর্ষকে স্থাপিত করে থাকেন, ফেরদৌসীর মধ্যে সত্ত্ববত্তৎ সেই ‘ইতিহাস-চেতনা’ই সব চাইতে বেশী কার্যকর ছিল।

‘সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পঢ়াতের আমি’ — এই পঢ়াতের আমি কখনো বৃহৎ, কখনো তাৰ অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনেৱ, কখনো তা চকিতে উত্ত্বাসিত বিদ্যুল্লেখৰ মতো। তাই সত্যতা সৃষ্টিকাৰী উত্ত্বুখ মানুষৰ প্ৰথম অৱগণ প্ৰদেশ থেকে বেৱিয়ে আসাৰ ভিতৰ দিয়েই ‘শাহনামা’ৰ শুরু। কতকলা মানুষ অৱগ্নে স্থিৰ হয়েছিল, কবিৰ তা বিবেচ্য নয় ; একটি প্ৰকট বিদ্যুল্লেখৰ অৰ্থাৎ জীবন, কালেরই যা অন্য নাম তা-ই কেবল কবিৰ চোখে আকৃষণীয়। এজন্যে কালেৱ এই সঙ্কোচন বিস্তাৱণকে আমৰা, ইতিহাস না বলে, ইতিহাসচেতনা বলেই অভিহিত কৰতে চাই।

কাব্যকে কবিৰ প্ৰদৰ্শিত পথই অনুসৰণ কৰতে হয় ! ‘শাহনামা’ৰ কৃষ্ণীলবগণেৱ কাউকে যদি হাজাৰ বছৰ রাজত্ব কৰতে দেখি কিংবা কাউকে যদি দেখি, তিনি চীনেৱ খাকানকে পৰাজিত কৰে গোটা চীন সঞ্চল কৰে নিয়েছেন, তবে তাতে কাব্য সত্যাই বিচাৰ্য হবে, ঐতিহাসিক তথ্যেৰ সত্যাসত্য সেখানে আমৰা বিচাৰ কৰতে যাবো না। তবে, কবি কালেৱ যে-স্নেহতে ইবানেৱ শাহীনশাহদেৱ জীবন-তৰী ভাসিয়ে দিয়েছেন, ইতিহাসে তাৰ সমান্তৰাল রেখাটি কেমন এগিয়েছে, কবিৰ অপূৰ্ব নিৰ্মাণ-কৌশল ও প্ৰতিভাকে সম্যকভাৱে বুৱাতে গেলে সে সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

প্ৰত্নতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে প্ৰায় একমত যে, এশিয়া ও ইয়োৱোপেৱ সকল জাতিৱই আদি বাসস্থান মধ্যে এশিয়ায় কৃষ্ণসাগৱ ও কাশ্মীয়ান সাগৱেৱ উত্তৱ-পূৰ্বাঞ্চলৈ এককালে সেমেটিক, হেমেটিক ও আৰ্দ্ধদেৱ পূৰ্বপূৰুষ একই জাতি হিসেবে বাস কৰতোৱেন। সেখান থেকেই শত শত কিংবা হাজাৰ হাজাৰ বছৰেৱ ব্যবধানে এক একটি মানব-গোষ্ঠী বেৱিয়ে এসে এশিয়া ইয়োৱোপেৱ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুগে সত্যতায় উত্পন্ন হয়ে উঠেছিল।

প্ৰত্নতত্ত্ববিদদেৱ এইসব তথ্যানুসন্ধানেৱ স্বৰূপ বিচিৰি। কখনো প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ (যেমন শিলালিখ কিংবা গুহাচিত্ৰ), কখনো ভাষাৰ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, কখনো ধৰ্মীয় বাধা-নিষেধেৰ প্ৰকৃতি, কখনো অৰ্বাচীন কালেৱ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কোন কিংবদন্তী তাঁদেৱ তথ্য সংগ্ৰহেৱ উপকৰণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

‘তাৱৰাতে’ (ওল্ড টেট্টামেটেৱ অস্তৰত তালমুদ) বণিত হয়েছে যে, মহাপ্লাবনেৱ পৰে পৃথিবী নতুন কৰে বসবাসেৱ যোগ্য হলে নৃহেৱ তিনপুত্ৰ সেম, হেম ও জেফেথেৱ বৎশবৰ্কি শুৰু হয়। নৃহেৱ তৰী যেখানে এসে লেগেছিল সেই ‘আৱাৰত’ পৰত কোথায় অবস্থিত, বলা সহজ নয় ; কাৰণ ধৰ্মগ্ৰন্থেৱ সকল কথাকেই বাস্তৱেৱ বৰ্ণনা হিসেবে গ্ৰহণ কৰা চিক নয়, সেগুলিৰ কিছু কিছু কৰ্পক অৰ্থাৎ Symbol ও বটে।

যাই হোক, ইতিহাসে যেসব জাতিকে হেমেটিক, সেমেটিক ও জাফেথীয় অৰ্থাৎ আৰ্য বলা হয়, তাৰা যে কাশ্মীয়ান সাগৱেৱ তীৰবত্তী অঞ্চলৈ এক জাতিৱাপে বসবাস কৰতো, প্ৰত্নতত্ত্বিকগণ সে-বিষয়ে একমত। এইসব গোত্র ও মণ্ডলী ইতিহাস-পূৰ্বেৱ অজ্ঞকাৰ যুগেই জনসংখ্যাৰ চাপে ও খাদ্যেৱ

সজ্জানে ক্রমে তাদের বাসস্থান থেকে স্থানান্তরে সরে যেতে থাকে। সর্বপ্রথম যে-মণ্ডলী তাদের আদি বাসস্থান থেকে বেরিয়ে আসে তারা হলো হেমেটিক। উন্নত আফ্রিকার অধিকাংশ অক্ষণ্ড জাতি এদের অন্তর্গত। প্রাচীন মিসরীয়দের তারা নিকটতম আত্মীয়। হেমেটিক জাতির বিকশিত সভ্যতার কথা জানা যায় না। এদের পরেই যে মণ্ডলী তারা আদি বাসস্থান তেকে বেরিয়ে আসে, তারাই ইতিহাসে সেমেটিক জাতি নামে পরিচিত।

নীলনদীর তীরবর্তী মিসরীয় সভ্যতা, দজলা-ফোরাতের তীরের ব্যবিলনীয় ও এ্যাসুরীয় সভ্যতা এই সেমেটিক জাতিরই দান। জর্ডন-নদী অঞ্চলে যে-হিন্দু গোত্রগুলি প্রাচীন মানুষের ধর্মীয় চিন্তাধারায় এত প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারাও সেই একই সেমেটিক মণ্ডলীর সন্তান। সবশেষে জেফেথিক বা আর্য গোত্রগুলির নিগমন শুরু হয়। আর্য জাতির যে শাখা সর্বপ্রথম আদি বাসস্থান থেকে বেরিয়ে আসে, তারা ইরানের পশ্চিমাঞ্চল মিডিয়াতে এসে উপনিবিষ্ট হয়। এই মিডিয়দের মধ্যেই ‘আবেস্তার’ উন্নত হয়েছিল। আবেস্তারই আলো অঙ্ককারের দুই দেবতার পূজার বিধান রয়েছে — কারণ আবেস্তার মতে, আলো-অঙ্ককার পাশাপাশিই বিরাজমান, একটি অন্যটিকে স্থানচ্যুত করতে পারছে না। ‘আবেস্তা’-যুগের ভাষার কোন নির্দশনই আমাদের হাতে আসে নাই। বহু পরবর্তী যুগের বিখ্যাত জ্বরোয়েষ্টার ‘আবেস্তা’র ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্মই ‘জেন্স’ লিখেছিলেন। এই ‘জেন্স’-এর অস্তিত্ব পরবর্তী যুগে ‘জেন্স’-এর ভাষ্য ‘জেন্সবেস্তা’ থেকে আমরা জানতে পারি।

অনুমান করা হয়, জেফেথীয় অর্থাৎ আর্যদের যে-শাখা মিডিয়ায় উপনিবিষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে আদি বাসস্থানে অবস্থিত আর্যদের বহু যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল, সে যুক্তের চাপে ও অন্যবিধি সমস্যার উন্নবের ফলে আর্যদের শেষ মণ্ডলী সেখান থেকে পূর্ব ইরানে ও তার পূর্বে সিঙ্গু তীরের দিকে সরে যায়। আর্যদের এই প্রাচীন শক্তির কিছু কিছু প্রমাণ তাদের পরবর্তী কালের সাহিত্যে ও ধর্ম-চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। বলা আবশ্যিক যে, ইরানের পূর্বাঞ্চলের আর্যগণ মিডিয়গণের ধর্ম ও সংস্কৃতি থীরে থীরে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেমেটিকদের একেশ্বরবাদী চিন্তার সঙ্গেও কিছুটা আপোস করে নিয়েছিলেন। তাই, প্রাচীন ইরানের ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের ধর্মীয় চিন্তার বিরোধ দেখা যায়। ভাষার মূল এক থেকেও সেখানে অর্থের প্রভাবে বৈলক্ষণ ঘটে গেছে। ‘অসূর বা আহুরমাজ্দা’ যেখানে ইরানীদের প্রাথান পৃজ্ঞ সেখানে ‘আহুর বা অসূর’কে দেব-বিরোধী অসূর বলে চিহ্নিত করেছেন ভারতীয় আর্যগণ ; অপরপক্ষে ইরানীয়গণ ভারতীয় আর্যদের ‘দেবকে ঘৃণিত দেও’ বা দৈত্যরূপে অভিহিত করেছেন।

এদিকে মিডিয়দের সঙ্গে সেমেটিকদের যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই ছিল। কোন এক সময়ে সেমেটিক জাতির অন্তর্গত আসীরিয়গণ কর্তৃক মিডিয়া বিজিত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে শাসিত হতে থাকে। মিডিয়া বা প্রাচীনতর আর্য শাখার এই অধীনতাকালকেই ফেরদৌসী আরব জাতীয় জোহাকের দ্বারা ইরানের অভিভূত থাকার কাল বলে বর্ণনা করেছেন।

আর্যজাতির যে নবতর শাখা পূর্ব ইরানে ও দক্ষিণ ইরানে বিস্তৃত হয়, ‘শাহনামায় তাকেই ইরান ধলে অভিহিত করা হয়েছে। মিডিয়া ‘শাহনামায় বর্ণিত রোম বলে এবং বল্খ বোখারা প্রভৃতি অঞ্চলকে ফেরদৌসী তূরান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

‘শাহনামার’ মতে যে প্রাচীন নরপতি ইরানকে (মিডিয়াসহ) আরবীয় বা সেমেটিক নরপতি মপস্কৰ্ক ঘৃণিত জোহাকের হাত থেকে উক্তার করেছিলেন, তিনি হলেন মহান ফারেদুন। প্রাচীন

ইরানীয় সম্রাট জমশেদেরই বৎশে তাঁর জন্ম, এই বৎশকেই শাহনামায় 'মহান কেয়ানী' বৎশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য, ফারেদুন ইতিহাসের কোন সম্রাটের নাম, তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়। কারণ, ফারেদুন ইতিহাস-পূর্ব কিংবদন্তীর অন্তর্গত বাদশাহ। তাঁর থেকেই সেম, হেম, জেফেথের অনুরূপ মানবধারাগুলি বিনিগত হয়েছে। তাঁর তিন পুত্র, সুল্ম, তৃব ও এরজকে তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করে দেন সুল্ম পায় রোম, তৃব তৃবান ও এরজ ইরান। অর্থাৎ এদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি এদেরই নামে অভিহিত হতে থাকে।

এতিহাসিক মুগে এসে যে দুটি প্রধান সভ্যতা-শক্তির সঙ্গে ইরানের সংঘর্ষ হৈধেছিল, রোম, তৃবান ও ইরানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধগুলিতে তারই ছায়া পড়েছে।

তৃবানের অধিপতি আফ্রাসিয়াব। এই আফ্রাসিয়াবের সঙ্গে ইরানের বাদশা কায়কাউস ও কায়খসরুর যুক্ত-বিগ্রহকে উপলক্ষ করেই 'শাহনামা'র এক বিরাট অংশ রচিত হয়েছে। ইরানের জাতীয় বীর কৃত্ত্বের কার্যকালের প্রধান আকর্ষণ এ যুগেই। বাদশাহ কায়খসরুই রোমসহ তৃবানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর অধিকারে আনয়ন করেন। কায়খসরুই সম্ভবত ইতিহাসের দিহিজয়ী সম্রাট মহান কাইরাস Cyrus the great (খ্রীঃ পৃঃ ৫৪৯-৫২৯)। কায়খসরুর পর থেকে শাহনামার কাহিনী মৌচামুটি ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল বেখায়ই এগিয়ে গেছে।

'শাহনামা'র এই ঐতিহাসিক পটভূমি বিবেচনার পর, আমরা এবার ফারসী ভাষার উৎপন্নি, তার ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তন সম্পর্কে একটা দিক নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হবো। 'শাহনামা'র পটভূমি বিবেচনায় তার অধিক প্রয়োজন নেই। ভাষার মধ্যে একটি জ্ঞাতির পরিচয় যেমন সুপু থাকে, তেমনই তার ধর্মচিন্তার মধ্যেও থাকে তার প্রাণবস ও সংস্কৃতি সংজীবনী শক্তির পরিচয়। প্রাগ্রসর-মানুষ তার ভাষা ও ধর্মীয় চিন্তায় নতুন অনেক কিছু যোগ করে, কিন্তু ঐতিহ্যের খাত বেয়েই যে তার চলা অব্যাহত থাকে, 'শাহনামা' কিংবা তেমন যে কোন জাতীয় কাব্য এ সত্ত্বে শক্তির সঙ্গে প্রকাশ করে থাকে।

### [ ৩ ]

'আবেস্তা' মুগের প্রাচীন ফারসীর কোন নির্দশন নেই। গ্রীসের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডেটাসের (খ্রীঃ পৃঃ ৪৪৮-৪২৪) গ্রন্থে সে মুগের কয়েকটি নাম ও একটিমাত্র শব্দের উল্লেখ আছে, সে-ই শব্দটির অর্থ 'কুকুর'। আবেস্তা মুগের ইরানীয়গণ মিডিয়ায় উপনিবিষ্ট থেকে উত্তরাঞ্চলের আর্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ মুক্তিবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। তারপর আয়ার যখন মিডিয়দের সঙ্গে যুক্ত পরাজিত হয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে পুর দিকে সরে যায়, তখন তারা মিডিয়দের কাছ থেকে নিয়ে যায়, আলো-অঙ্ককাবের দুই দেবতার ধারণা। এই ধারণার মুগেই আর্যদের মধ্যে দুটি শাখার সৃষ্টি হয় ও তারা পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এক শাখা আরো পূর্বদিকে সরে গিয়ে ভারতের সিঙ্গু তীরে গিয়ে উপনীত হয় ও অন্য শাখা আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ-ইরানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবত এই মুগেই পঞ্জনদের পূরে, বৈদিক ভাষা ও বৈদিক ধর্মের উৎপন্নি হয়েছিল; ইরানে প্রাচীন ইরানীয় ভাষার বিকাশও এই মুগেরই ঘটনা। প্রাচীন ইরানীয় ভাষার সকল নির্দশন আলেকজাঞ্চার কর্তৃক শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে হেরোডেটাসের সাক্ষ তার সপক্ষে নয়। কারণ 'পহলবী' নাম নিয়ে সে-ভাষা মুসলিম বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইরানের বাজডামা ও ধর্মীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে-ভাষা নব্য পারসী জরদাস্তের (যরোমেষ্টারের) 'জেন্স'-এর গাথাসমূহ ও তদীয় ভাষা 'জেন্দবেস্তা'ও এই পাহলবী ভাষায়ই বচিত হয়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিকগণ 'জেন্দ'-এর যে

গাথাগুলিকে বৈদিক ভাষায় রচিত খণ্ডের সমসাময়িক বলে গণ্য করেছেন, সেই প্রাচীন পারসিক ভাষার কোন নির্দশন মূলত নেই। ‘জেন্স’-এর গাথা থেকে দুটি শ্লোক ও খণ্ডে থেকে দুটি শ্লোকের অনুবাদ পাশাপাশি রাখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, ‘জেন্সাবেন্তা’র ধর্মীয় চিন্তায় অনেক প্রাগ্রসর যুগের মানস-চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে।

‘জেন্স’-এর গাথা থেকে—

হে আহুরমাজদা! আমি বিবেকের মাধ্যমে আপনার নিকটবর্তী হচ্ছি। আমাকে দান করুন উভয় সত্ত্বার চেতনা — ভৌতিক সত্ত্বা ও আত্মা-সত্ত্বা; এবং আত্মা-সত্ত্বাই উন্নততর সত্ত্ব। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই উভয়ের মাধ্যমেই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সত্ত্বকে সমৃদ্ধিত করে রাখেন।

‘খণ্ডে’ থেকে—

হে ভগবান আপনার সঙ্গে সম্মুক্ষ্যুক্ত হয়ে আমরা যেন রিপুজ্যী হই; রিপুগণের সঙ্গে নিত্য সংযুক্তি সংগ্রামে আমাদের বরণীয় শ্রেষ্ঠগণকে উৎকর্ষের সঙ্গে রক্ষা করুন। হে ভগবান ইন্দ্রদেবে! পরমার্থরূপ শ্রেষ্ঠ ধনকে আমাদের জন্য সুলভ করুন। রিপুগণের বীর্যসমূহকে সর্বথা ভঙ্গ করুন — প্রকৃত্যৱাপে নাশ করুন। রিপুগণের সঙ্গে সংগ্রামে আমাদের জয়যুক্ত করুন এবং আমাদের স্বত্ত্বভাবসমূহকে অবিকৃত রাখেন।

অনুবাদগুলিতে ভাত্সম দুটি আর্জান্তির চিত্তবৃত্তির এমন প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় যে, স্থান ও কালের দূরত্বের মধ্যেও তারা যে পরম্পরের আত্মীয় চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

‘জেন্স’-এর উক্তির মধ্যে দেখা যায় যে, আহুরমাজদাই ইরানীয়দের একমাত্র উপাস্য, — হিন্দু ধর্মের প্রভাবে সেখানে একেশ্বরবাদী মনোভাবের স্থূলণ হয়েছে। ফলে দেহ ও আত্মার সমবিকাশই সেখানে কাম্য। পাপ অর্থাৎ দেহকে সেখানে ধূসংস করার প্রার্থনা জানানো হয় না। প্রার্থনা করা হয় কর্ম ও ন্যায়ের মধ্যে যেন তাকে অবিচলিত রাখা হয়।

অপরপক্ষে, ‘খণ্ডে’র উক্তিতে শক্তরূপ দেহকে বিনষ্ট করে আত্মার উদ্বোধন কামনা করা হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে উপাস্যের (ইন্দ্র) সংজ্ঞান সেখানে শেষ হয়নি বলে, ব্যক্তি-সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত কোন একক উপাস্যের ধারণার জন্মলাভ হয়নি।

বস্তুত ভারতীয় ধর্ম-চিন্তায় অনাবিল একেশ্বরবাদ কোন যুগেই ‘বিকশিত হয়নি। সর্বেশ্বরবাদ ও প্রকৃতিপূজা সেখানে পাশাপাশি চলেছে। ইরানের পশ্চিম সীমান্তবর্তী হিন্দু গোত্রগুলির মধ্যেই সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদী চিন্তা এক সুসংহত দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল শ্রীজগন্ধের প্রায় হাজার বছর পূর্বে।

বেস্তুন পাহাড়ের গায়ে খোদিত মহান দারার যে নির্দেশাবলী অবিকৃত হয়েছে, সেগুলিকে পণ্ডিতগণ প্রাচীন পারসীয় নির্দশন বলে গণ্য করেন, হেরোডেটাস তাঁর গ্রন্থে যার একটিমাত্র শব্দ ব্যাতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব লক্ষ্য করেননি। যাই হোক, পূর্বে বলা হয়েছে যে, জীবিত ভাষা রাপে যে পহলবী মুসলিম-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, তারই নির্দশন ‘জেন্সাবেন্তায় পাওয়া যায়। তাই, মুসলিমানগণ কর্তৃক আলেকজাণোরের মতই পারসীভাষ্য ও তার সাহিত্য সমূলে বিনষ্ট করার যে অপবাদ প্রচলিত আছে, তা সত্য নয়। সত্য এই যে, আরব অভিযানের পর অভিজ্ঞাতগণসহ গোটা ইরানের ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে পাহলবী ভাষায় যে পরিবর্তন আসে, তাকে ভাষ্য-তরুর নব অঙ্গরোদ্গম বলে অভিহিত করা চলে। নতুন ধর্মের উপাসনারীতি ও নতুন-চিন্তার উপকরণের প্রকাশক হিসেবে আরবী শব্দের আমদানী যখন অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে উঠলো তখন নতুন উৎসাহে

বর্ণমালাও নিদিষ্ট হলো পহলবীর জন্যে। দেখতে দেখতে নতুন খাতে প্রবাহিত পাহলবী ভাষা 'শীর-প্লাবনী হয়ে উঠলো। ইরানের জন্য নতুনের প্রবর্তন ও আরবের এই সংশ্বব হলো ডাগ্য-স্পসু। দেখতে দেখতে ফারসী সাহিত্যে সৃষ্টির বান ভাকলো। শ্রীষ্টিয় দশ শতকের পর থেকে ফারসী সাহিত্যের যে ফসল সংগ্রহ শুরু হলো, তা দুনিয়ার যে কোন সম্ভক্ষ সাহিত্যের ঈর্ষার সামগ্ৰী। ইরানের মাঝ প্রদেশে আবকাস নামীয় এক কবি নবম শতকে বাদশাহ হাফনুর রঞ্জিদ ও মামুনের উদ্দেশ্যে প্রশংসিসূচক ফারসী কবিতা রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাহিয়ী-বৎসীয় নৱপতিদের রাজসভায় বহু ইরানীয় কবি ফারসী কাব্যের পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হয়েছিলেন; ইতিহাস তাঁদের বাণীও সংযোগে রক্ষা করেছে। তারপরে, ফেরদৌসীর পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে 'শাহনামার অংশ' বিশেষের আদি রচয়িতা হিসেবে কবি দাকীকীর নাম সুরণীয় হয়ে আছে।

ফেরদৌসীর 'শাহনামা' ইরানীয় সাহিত্যকে যে-প্রকাশভঙ্গী ও মননশীলতার অধিকারী করে গেলো, তারই ধারা অনুসরণ করে গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ওমর বৈয়োম রচনা করলেন তাঁর কালজুয়ী 'রুবাইয়াৎ', নিজামী তাঁর 'সিকান্দরনামা' ও 'মুসুফ-জোলেখা', প্রচ্যের সেক্সপীয়র শেখ সাদী তাঁর 'গুলিঙ্গা', 'বৃত্তা' ও রুশী তাঁর বিখ্যাত 'মসনবী'।

ফারসী ভাষা তখন থেকে এক আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের আধীন খসরু তাঁর গীতি-কবিতার মাধ্যমে ইরানের মহসুম কবিদের অস্তর্গত বলে বিবেচিত হয়েছিলেন শিরাজের কবি হাফেজের গজলরসে সুদূর বাংলাদেশেও রসের বান ডেকেছিল বাংলার এক সুলতানের দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার মর্যাদার দিশারী কবি চাঁদিদাস হাফেজের গজল-সুখ পান করেছিলেন বলেও জানা যায়।

ফারসী ভাষা ভারতের রাজ্যভাষার মর্যাদা পেয়ে প্রায় চার হাজার মাইলব্যাপ্তি এক বিরাট এলাকার মানুষের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে, ইরান থেকে এতদূরে অবস্থিত যে-বাংলাদেশ, ইরানের অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে ফেরদৌসীর 'শাহনামা'ও সেখানে পটুৰী ঘৰে ঘৰে পঢ়িত ও আলোচিত হতো। তার প্রভাবে পটুৰী কবিদের দ্বাৰা 'সোহৱাৰ কুন্তমেৰ' মৰ্মস্তুদ কাহিনী পরিবেশিত হতে থাকে বাংলার ঘৰে ঘৰে। মধ্য যুগের বাংলা-সাহিত্যে যে মানবিক রসের উদ্বোধন হয়ে, তাতেও পড়ে ফারসী সাহিত্যেরই সরাসরি কিংবা অন্যবিধি প্রভাব। বাঙালী-মনে 'শাহনামা'র আবেদন যদি এমনভাবে ঐতিহ্যগত হয়ে না থাকতো, তবে সম্ভবত বর্তমান অনুবাদের তেমন কোন আবশ্যিকতা অনুভূত হতো না। ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ শত শত বছৰ ধৰে পরিচিত।

'শাহনামা'র' কাহিনীও এদেশে কত না রাপে পরিবর্তিত বিবর্তিত হয়ে বিবাজ করছে।

এবার পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 'শাহনামা'র কাহিনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করব।

'শাহনামা'র কাহিনী শুরু হয়, ইরানের প্রথম বাদশা কায়মুরস্ দ্বারা। ব্যাপ্তচর্ম-পরিহিত অবস্থায় পর্বত থেকে তিনি এসেছিলেন। পর্বত থেকেই আসতো তাঁর জীবিকা, নৃতন নৃতন খাদ্য ও পরিধেয়। কবি বলেন,—

সূর্য যখন সিংহরাশির চক্র-সীমায় এসে উপস্থিত হলো,

তখন পৃথিবী প্রদক্ষিণরত হলো সৌভাগ্য, সমারোহ ও  
নিয়ম শৃঙ্খলাকে ঘিরে।

মেষরাশিতে তাঁর শৈক্ষণ্য আরো বর্ধিত হলো,

পৃথিবী উপনীত হলো যৌবন-সীমায়।

পৃথিবীর এই যৌবন, মানুষেরই যৌবন। মানুষ যখন সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্থির হলো, তখনই প্রয়োজন হলো রাষ্ট্রের ও নিয়ম শৃঙ্খলার। কায়মুরস্ এই দুটিকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন,—

সিংহাসনাকাঢ় বাদশার কপ ছিল ভূবন-মোহন,

যেমন দেবদাতুর মাথায় শোভা পায় পূর্ণচন্দ্র।

বাদশার কপ যেমন ভূবন-মোহন, তাঁর দয়াও তেমনই। তাই —

হরিগানি চতুর্পদ তাঁর দৃষ্টি দ্বারা আকর্ষিত হতো,

বনভূমি ছেড়ে তাঁর আসতো তাঁর কাছে বিশ্রাম লাভের আশায়।

তাঁর এসে অবনমিত হতো রাজাসনের পদতলে

আর তাঁর থেকে বাদশার সৌভাগ্য উর্ধগামী হতো সহস্র শিখায়।

প্রকৃতির সঙ্গে তখনো মানুষের সম্পর্ক কর্তিত হয়নি। বাদশার ঐশ্বর্য ও প্রতাপ যে মূলত প্রজাকূলের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের উপর, কবি কাব্যের সূচনাতে প্রথম কয়েকটি শ্লোকেই তা বলে দিলেন।

তিনি বললেন, এই আনুগত্য থেকেই সূচনা ধর্মের —

উপাসনার রীতি সেই থেকেই প্রচলিত হয়েছিল,

সেখান থেকে ধর্ম ছড়িয়েছিল তাঁর শিকড়।

কায়মুরস্ মানুষের রাজা, স্বত্বাত্তই আলোর দিকে তাঁর যাত্রা কিঞ্চ দীর্ঘদিন যেতে না যেতেই অঙ্ককারের পৃজ্ঞারী 'দেও' (সংস্কৃতে 'দেব' শব্দের অর্থ-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্যযোগ্য) বা দৈত্যদের সঙ্গে বাধলো তাঁর বিরোধ। সেই বিরোধে আত্মাদান করলো বাদশার পুত্র সিয়ামক। প্রজাকূলসহ রাজা পরাজয়ের শোকে নিয়মজ্ঞিত হলেন। কিঞ্চ দৈশীদিন নয়, বিশ্বপ্রভু তাঁদের ডাক দিলেন —

শুভসন্দেশবাহী আকাশবাণী হলো,

ক্রদন আর নয়, এবাব আত্মস্থ হও।

সেনাদল সজ্জিত কর, মান্য কর আমার ফরমান,

নিজ নিজ চক্র থেকে বেরিয়ে এসো সঁবাই।

দুষ্ট দানবের অত্যাচার থেকে ধরিত্রীবক্ষ পরিত্র কর,

সজ্জিত কর তাকে সকল সুমায়।

সিয়ামক-পুত্র হোশঙ্গের হাতে নির্জিত হলো দৈত্যরাজ, কিন্তু তখনও মানুষের জীবনরীতি ছিল সভ্যতার আদি স্তরে। তবে কৃষিকার্য নিশ্চিত হলো, মানুষের ইচ্ছাক্ষেত্রেও কিছুটা জয় সূচিত হলো। তবুও এ-সময়ে যে বিষয়টি, ‘শাহনামা’র কবির কাছে সব চাইতে বেশী অর্থপূর্ণ মনে হয়েছে তা হলো, অগ্নি — সকল শিল্প-কৌশলের সৃষ্টির মাধ্যম ও প্রাচীন ইরানীয়দের কাছে দৈব-শক্তির প্রতীক। এই অগ্নি একদিন বহুকণ্ঠী দৈত্যগণের সঙ্গে সংগ্রামরত হোশঙ্গের চোখে, আকস্মিকভাবে প্রকটিত হলো—

বাদশা প্রকাণ্ড এক প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তাকে (সপরুণ্ণী দৈত্যকে) আঘাত করলেন,

ক্ষুদ্র এক পাথরের সঙ্গে তা প্রহত হলো।

দুই পাথরের ঝুকাঝুকিতে নিঃস্ত হলো আলো,

চেতনার দর্পণে পড়লো তার প্রতিবিম্ব।

কিন্তু সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যা, তা হলো এই,

সাপ মরলো না কিন্তু সেই আগুনের রহস্য।

পাথর থেকে জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো মানুষের মনের

সপরিল পথে পথে।

অঙ্ককাবের জীবেরা রয়েই গেল, দুনিয়ায় আলোর সন্তানদেরকে তাদের সঙ্গে যুক্ত সক্রিয় হতে হবে। এরই মধ্যে জন্ম নিবে নীতি, ন্যায়বোধ, কলা-কৌশল, বীর্য-বস্তা ও করুণ। ‘শাহনামা’র পরবর্তী কাহিনী ন্যায়-অন্যায়ের এই দ্রন্দ ও রহস্যকেই বিচ্ছিন্নাবে কৃপায়িত ও বসায়িত করেছে। অন্যান্য ‘মহাকাব্যে’র মতো স্বর্গ-মর্ত্য-নরক নয় ; ‘শাহনামা’র পটভূমি এই পথিকীরী — যেখানে মানুষের প্রেমে স্বর্গ, মোহে মর্ত্য ও অন্যায়চরণে প্রকটিত নরকের বিভীষিকা ! এই পথিকীতেই মানুষকে অর্জন করতে হবে নিজের বৃক্ষি, বিবেচনা, ন্যায়বোধ ও বীর্যস্তার দ্বারা প্রবকালের স্বর্গ। প্রবকালের কোন স্বর্ণের বর্ণনা ‘শাহনামাতে নেই। আছে এই পথিকীরই পরিত্র ঝুলবন ও ঝর্না, আছে মানুষের চিষ্টে ন্যায়বোধ ও প্রেমের ফলস্থারা। বাদশা হোশঙ্গের পর মানুষের মধ্যে তালোমন্দের তারতম্য সূচিত হলো। তারপর জমশেদের মধ্যে মানুষ তার মহিমার পূর্ণ স্বাদ পেলো। বাদশা জমশেদের নাম ছড়িয়ে পড়লো ধরিগ্রীর দিকে দিকে। (পরবর্তী ইরানীয় কবিগণ জমশেদের নাম তাঁদের কবিতায় অক্ষণগভাবে ব্যবহার করেছেন)। বাদশা জমশেদ জ্ঞানী তিনি উন্মুক্ত করেছেন মানুষের জন্য সকল কলা-কৌশলের দ্বারা, তিনি দুরদৃষ্টি-সম্পন্ন, — তিনি তাঁর পানপাত্রে বিশুকে প্রতিফলিত দেখতে পান ; তিনি গর্বিত — তিনি অহঙ্কারী। এই শেষের ‘গুণটিই কাল হলো। শয়তানের মতো তিনি তাঁর সম্মানিত আসন থেকে পতিত হলেন। ইরান কবলিত হলো সর্পস্কন্দ এক আরবীয় যুবকের ; তার অকথিত নির্যাতনের মধ্যে কাটতে লাগলো ইবানের মানুষের কাল ; একদিন নয়, দুদিন নয়, হাজার বছর ধরে চললো সেই অত্যচারীর শাসন। ‘শাহনামা’র কবি এ কাহিনীর মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই বললেন যে, অন্যায়-শাসনের সঙ্গে যুক্ত যে জাতি সে-ও বিশ্বস্মৃষ্টার শাস্তির বিধান থেকে বেহাই পায় না।

কিন্তু কাল যতই দীর্ঘ হোক অন্যায় যতই নিরাকৃত হোক, সময়ে সবই অতিক্রান্ত হবে সন্তানবন্ধুর ক্ষীণ উষাদূনের অঙ্ককাব বাত্রির অবসান সূচিত করবে। ফাবেদূনের জন্ম, তার লালন ভাগ্যের কালো নিকম্বের বুকে তেমনই একটি শীণ রেখা। কিন্তু ‘শাহনামায় অস্ত্রজাপে দেবতাদের আবির্ভাব ঘটে না ; বিশ্বাসযোগ্য মানবিক প্রয়াস কিংবা অপ-প্রয়াস দ্বারাই ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

একবাত্রে জোহাক অশুভ এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো, তাতে তার কলিজার রক্ত মেন পানি হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলো রাজা। জ্ঞানী ও জ্যৈতীর্থীরা গণনা শুরু করে দিল। অবশ্যে একজন সাহস করে জোহাককে বললো গণনার ফল, —

জেনে রাখ, তোমার পরে একজন তোমার এই তখ্তে বসবে,

তোমার এই ভাগ্য একদিন মিশে যাবে শূলায়।

সেই লোক দুনিয়ায় বিখ্যাত হবে ফারেদুন বলে,

আকাশ তাকে দান করবে বহুভাগ্য।

সেই বীরপুরুষ এই মৃহূর্তে মাত্রগৰ্ত থেকে জন্ম নিয়েছে,

কাজেই এই মৃহূর্তে তোমার ভয়ের কিছু নেই।

বৃক্ষিমতী মায়ের শুশ্রায় সে ধীরে ধীরে

বৃক্ষের মতো ফুলস্ত হবে।

জোহাকের চোখে, রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনগুলি অঙ্কনার হয়ে এলো। ফেরাউনের অনুরাপ সে-ও ঝোঁজ করলো ফারেদুনের। অতঃপর ফারেদুনের আবির্ভাব যখন নিকটবর্তী বলে বিবেচিত হলো, তখন জোহাক জনপ্রিয়তার শুভশক্তিকে আশ্রয় করতে চাইলো। সে লিখলো এক দলিল, তাতে বহুলো জনপ্রিয়তার পক্ষে সর্বপ্রধান যে-শর্ত ন্যায়পরায়ণতা, তারই অঙ্গীকার। ভয়ে সবাই তাতে স্বাক্ষর করলো। কিন্তু জনতার মধ্যে 'কাওয়া' নামের এক কর্মকার সে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে অস্থীকার করে বাজসভায় তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলো। স্তুতি সম্মাট তার কোন প্রতিকার করার আগেই 'কাওয়া' বেরিয়ে এসে বিপ্লবের নিশান উড়িয়ে দিলো; দলে দলে লোক এসে সমবেত হতে লাগলো তার চাবদিকে। 'কাওয়া'র যাত্রা এখন ফারেদুনের উদ্দেশ্যে।

ভাগ্যের সব মানবিক শর্ত পূর্ণ করে কবি জোহাকের পতন ঘটালেন। ইরানের সিংহাসনে বসলেন ইরানেরই প্রাচীন কেয়ানী-বাজ্বৎশীয় সন্তান ফারেদুন। জোহাকের উপপত্নীকাপে বন্দী দুই কেয়ানী বৎশুত্রুতা রাজ-কন্যাকে ফারেদুন বিয়ে করলেন। তাদের নাম শাহরনাজ ও আব্রানওয়াজ।

সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর ফারেদুন তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর বিশাল রাজ্যকে ভাগ করে দিলেন —

একজনকে দিলেন রোম ও পশ্চিমের এলাকা,

অন্যকে তুর্কীস্থান ও চীন;

তৃতীয় জনকে দিলেন দিগন্তবিশ্বারী প্রান্তরসহ ইরানভূমি।

এখানে বলা আবশ্যক যে, 'শাহনামা'য় বর্ণিত ঘটনাগুলি কোথায়, কোন্ স্থানে সংঘটিত হয়েছিল, তার মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে হবে।

'শাহনামা'র প্রথম অর্ধাংশের ঘটনা ঐতিহাসিক যুগের নয়, সেগুলি কিংবদন্তী-নির্ভর; সেজন্যে যে সব নাম স্থানে রয়েছে, সেগুলির অবস্থান ঠিক করা কঠিন। তবে ইরান ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার যেসব নাম কবির যুগে প্রচলিত ছিল, সুপ্রাচীন কালের ঘটনায় তাদের হ্রবহ ব্যবহার আমাদের জ্ঞানাশোনাকে চকিত করে। সুতরাং জোহাকের যুগে যখন দজলা-তীরে অবস্থিত বাগদাদ নগরীর উল্লেখ পাই, তখন বুঝে নিতে হবে যে, দজলার তীরবর্তী কোন নগরীর উল্লেখ করেছেন কবি। তেমনই রোম, তুর্কীস্থান, চীন, তৃবান প্রভৃতি এলাকাকে মোটামুটিভাবে মনে মনে চিহ্নিত করে নিয়েই,

কাহিনীর উখান-পতন অনুধাবনে সচেষ্ট হতে হবে। 'শাহনামায় রোম বলতে সিরিয়া, তুরস্ক ও ইরাকের উত্তরাঞ্চলকে সম্প্রসারিতভাবে বুঝিয়েছে বলে মনে হয়। তৃতীয় বা তুর্কীস্থান বললে বুঝতে হবে যে, এই এলাকা ইরানের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ মধ্য এশিয়া, — বর্তমানে যেখানে তুর্কমেনিস্তান, কাজাকিস্তান ও বুখারা-সমরকবদ্দ প্রভৃতি রাজ্য অবস্থিত। 'শাহনামায় চীন বলতে কখনো মূল চীন ভূখণ্ডকে বুঝিয়েছে, কখনো বুঝিয়েছে মধ্য এশিয়ার সীমান্তবর্তী কাশগড়, ইয়ারকবদ্দ প্রভৃতি এলাকাকে। কতকগুলি ভ্রান্তি-প্রামাদপূর্ণ অবস্থানসূচক নামও 'শাহনামায় রয়েছে, যেমন 'আলবুর্জ' পর্বত; এই পর্বতকে যেখানে ভাবতের সীমান্তবর্তী পর্বত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তাকে হিন্দুকুশ পর্বত বলে ধরে নিতে হবে। প্রাচীন ইরানের রাজধানী কি ছিল, তা পরিষ্কার বুঝা যায় না, তবে প্রথম দিকে জোহাকের রাজধানী দজলাতীরে ছিল বলে উল্লেখ থাকায়, আমরা ধরে নিতে পারি যে মিডিয়া আর্দের প্রভাবের যুগে ইরানের সভ্যতা পশ্চিমাঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল। প্রাচীন রাজাদের সেই যুগে আলো অঙ্ককারের দুই দেবতার ধারণা প্রচলিত ছিল, এবং সেকালের যে ধর্মের কথা 'শাহনামায় বর্ণিত তাকে মিডিয়দের 'আবেন্তা'র সঙ্গে এক করে দেখতে হবে। পরবর্তীকালে, বিশেষত কুস্তমের যুগে, যখন ইরানের সামন্ত রাজাদের যুগ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত, তখন 'গোদরজ' প্রভৃতি সেনাপতিকে যুদ্ধশেষে 'ফরসে'র দিকে প্রত্যাবৃত হওয়ার কথায় 'ফরস'কে 'পাসিপোলিস' (প্রতিহাসিক যুগের এন্টেক্ষা) বলে কেউ যদি ধারণা করেন, তবে তাতে অস্ত আমরা আপত্তি করবো না। ইরান-তৃতীয়ের মধ্যবর্তী যেননদীর কথা 'শাহনামায় বলা হয়েছে, সে-নদীটি অবশ্যই আমুদরিয়া। এবং আফ্রিসিয়াবের পশ্চাকাবনের কালে যে সাগরের উল্লেখ রয়েছে, সে-সাগরকে আমরা কাসপিয়ান সাগর বলে চিনে নিতে পারি। সামন্ত রাজ কুস্তমের রাজধানী জাবুল হয়ে তৃতীয়ে অভিযানের কথা যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে বুঝতে বাকি থাকে না যে, গোটা ইরান-সাম্রাজ্যের রাজধানী তখন দক্ষিণ ইরানের কোথাও অবস্থিত। ড্র-সংস্থানের একপ একটা মোটাঘুটি ধারণা নিয়ে 'শাহনামা' পাঠ করলে দিক-ভ্রান্তির আশঙ্কা নেই বলে মনে হয়।

বাদশা ফারেদুন পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলম, মধ্যম পুত্র তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র এরজ। জ্যেষ্ঠত্বীগণ দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করা হলো, তাতে —

সুলমের ভাগ্য লক্ষণে দেখা গেলো যে,

'মুশতরী' তারকা ধনুক রাশির আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়েছে।

ভাগ্যবান তৃতীয়ের নিয়তি লক্ষণে প্রকটিত হলো —

তরুণ সূর্য সূর্যস্ত সিংহরাশির আকর্ষণে আকৃষ্ট।

এরজের ভাগ্য-লক্ষণে দ্রষ্টিপাত করতে দেখা গেলো,

চন্দ্র সেখানে বশিক রাশির বক্ষনে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে।

বাদশা কনিষ্ঠপুত্র এরজের উপর আকাশের বিক্রপতা লক্ষ্য করে তাকে নিজের ঢোকের সামনে রাখাই স্থির করলেন। এরজকে দেওয়া হলো ইরানের সিংহাসন। ফারেদুনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুলম ও তৃতীয় নিজ নিজ রাজ্যে চলে গেলো। পশ্চিমের সিংহাসনে বসে সুলমের মনে এরজের প্রতি জ্বলে উঠলো ঈর্ষার আগুন। সুলম তৃতীয়ের সঙ্গে আলোচনা করে তাকেও নিজের সঙ্গে নিয়ে নিলো। তারপর শুরু হলো এরজকে ধৰ্মস করার ঘড়্যন্ত্র ও আলোচনা। স্থির হলো, বুদ্ধ পিতার কাছে দৃত পাঠিয়ে তাঁর

পক্ষপাতিত্বের উপর কটাচ করা হবে। তারপর উভয়ের মিলিত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে হবে এরজের উপরে। বৃক্ষ সম্মাট বয়সের ভাবে ন্যুন্জ, তিনি এর কোন প্রতিকার করতে পারবেন না। বৃক্ষিমান দৃত উক্ত যুবকদ্বয়ের বাণী নিয়ে ফারেদুনের রাজ্ঞানীতে উপস্থিত হয়ে দেখলো,—

প্রাসাদের এক পাশে শৃঙ্খলিত ব্যাস্ত্র ও সিংহ

অন্যপাশে মদমণ্ড করীদাল।

দৃত সম্মাটের ক্ষমা প্রার্থনা করে, শাহজাদাদের পক্ষুষ্ট-বাণী আদ্যন্ত আবৃত্তি করলো।

সব শুনে সম্মাট দৃতকে বললেন, তোমার ক্ষমা-প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, কারণ সূল্ম ও তূরতো নিজেরই দুই চক্র। তাদেরকে বলো যে, তাদের যতো নির্ণজ্ঞ যুবকের মুখেই এমন বাক্য শোভা পায়। পুত্রদের উদ্দেশ্য করে সম্মাট বললেন —

মনে রেখো যে—কাল আমার দেহকে করেছে ন্যুন্জ

সে এখনও চক্রবৎ ঘূর্ণিত হচ্ছে।

বৃক্ষ বাদশা এরজেকে ডেকে এনে সূল্ম ও তূরের অভিপ্রায় সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। এরজ পিতাকে জানালো সিংহাসনের লালসার চেয়ে আত্মদ্বয়ের সঙ্গে সক্ষি স্থাপনেই সে বেশী উদ্গৃহী। অবশ্যে সম্মাটের লিপিসহ এরজ আত্মদ্বয়ের অভিমুখে যাত্রা করলো।

ভাইদের সমীপে এরজের বিনয় ও শুভাকাঙ্ক্ষা নির্বর্থক প্রমাণিত হলো। নিষ্পাপ শাহজাদাকে হত্যা করে তারা তাঁর কর্তৃত যন্তক পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলো।

এই রক্তের প্রতিশোধেই ইরান ও তূরানের মধ্যে শক্ততাৰ সূচনা হলো। এই শক্ততা যুগ যুগ ধৰে রক্তের নদী বহালো। ‘শাহনামা’ৰ এ অংশেই ‘জাল ও রুদাবা’ ‘সোহরাব-কুস্তম’, ‘সিয়াউশ’, ‘বেবন-মূনীঝা’ এবং ‘রুস্তমেৰ বিভিন্ন শৌর্যমূলক কাহিনীৰ জগতে আমরা প্রবেশ কৱি। ফলে, প্রাচীন ইরানেৰ বৰ্ণনা এক বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতেৰ মধ্যে উজ্জ্বাসিত হয়, এবং কালেৰ এক-একটা ঢেউ এসে যথন সকল মনোযোগেৰ কেন্দ্ৰস্থলকে নিঃশেষে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখনই পাঠক বুঝতে পারেন যে, ফেরদৌসীৰ চোখে স্থান নয়, কালই ইতিহাসেৰ নিয়ামক শক্তি হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

বৃক্ষ সম্মাট ফারেদুন প্রিয়তম পুত্র এরজের মৃত্যুশৈক্ষ ভূলতে পারলেন না, রাজকীয় প্রতিহিস্তা তাৰ সুদিনেৰ প্রতীক্ষায় আত্মগোপন কৱে রইলো। শোকাভিভূত বৃক্ষ সম্মাট এরজেৰ অন্তঃপুরে প্ৰবেশ কৱে দেখলেন, এরজেৰ এক পত্নী সন্তান—সৱ্বজ্ঞবা। সম্মাটেৰ কল্পনা উদ্বীপিত হলো, এরজেৰ পুত্ৰ তাৰ পিতাৰ রক্তেৰ প্রতিশোধ গ্ৰহণ কৱবে। কিন্তু মাহআত্রীদেৰ গৰ্ভে জন্ম নিলো কৰ্ণ্য। সম্মাট সাময়িকভাৱে আশাহত হলেও নিৱাশ হলো না ; পৱন স্নেহে পৌত্ৰীকৈ লালন-পালন কৱে জমশেদ বংশীয় এক অভিজ্ঞাত ছেলেৰ সঙ্গে বিয়ে দিলেন। এই কৰ্ণ্যাৰ গৰ্ভেই জন্ম নিল মনুচেহেৰ — প্রাচীন ইরানেৰ এক প্ৰধান বাদশা।

মনুচেহেৰ বয়ঝোপু হলে সূল্ম ও তূর জানতে পেলো যে, এক তুৰণ তাদেৱ বিৱৰক্ষে সংগ্ৰামেৰ প্ৰস্তুতি নিছে। তাকে সেই প্ৰস্তুতিৰ সময় না দিয়েই ইরান আক্ৰমণ কৱা উচিত হবে। তূর ও সূল্মেৰ সম্মিলিত বাহিনী ইরানেৰ সীমান্তবৰ্তী নদী আমুদৱিয়া পার হলে পৱন সম্মাট ফারেদুনেৰ আদেশে মনুচেহেৰ প্ৰথ্যাত বীৰ সেনাপতিগণসহ তাদেৱ গতিৰোধ কৱে দাঁড়ালেন। উভয়পক্ষে শুক হলো প্ৰচণ্ড যুক্ত। মনুচেহেৰ প্ৰতিকৰ্ষী তূৰকে খুঁজে ফিৱছেন, নৈশ-আক্ৰমণেৰ সুযোগ নিয়েছিল তূর ও সূল্ম। তূর নিহত হলো, সূল্ম পালিয়ে গিয়ে আশুৰ নিলো আলানা নামক এক দুর্গে। পশ্চাজ্ঞাবন কৱে মনুচেহেৰ

সেখানেও গেলেন ও সুলমকে নিহত করলেন। এইভাবে এরজ্জের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পূর্ণ হলে তিনি স্মার্টকপে শিরে তুলে নিলেন কেয়ানী তাজ।

মনুচেহেরের প্রধান সামন্তদের মধ্যে নৃমানপুত্র সামের স্থান ছিল সকলের উপরে। সাম পুত্রাদীন।

একদিন দেখা গেল যে, সামের অঙ্গপুরে তাঁর প্রিয়তমা মহিষী অঙ্গসম্ভা। সাম আশা করলেন, তাঁর পুত্র হবে। কিন্তু পুত্রের জন্ম হলে দেখা গেল যে, এতো সুর্দৰ্শন যে পুত্র হয়েছে, তাঁর মাথার চুল সব সাদা। সামকে এ সংবাদ দিতে সবাই ভীত হলো! অবশেষে এক ধাত্রী সাহসে ভরে সামকে তাঁর পুত্রের জন্মসংবাদ অবহিত করলে, সাম তাকে দেখতে এলেন।

পুত্রকে দেখে সাম বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। তাঁর মনে হলো, এ সন্তান আহরিমান বা শয়তানেরই বংশজাত, তাঁর কিছু নয়। এ ছেলেকে লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন আলবুর্জ পাহাড়ের পাদদেশে ফেলে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। অরণ্যদেরা আলবুর্জ পাহাড়ের উচুনীর্ঘে ছিল ‘সীমোরগ’ নামক বিরাট এক পক্ষীমাতার নীড়।

নির্দয় এক চিঞ্চা সামের মাথায় এলো,— তিনি তাকে অবগে বিসর্জন দেবেন। এই নির্দয়তার জন্য তিনি গভীরভাবে বিশ্ব-প্রভুর সমাপ্তি প্রার্থনা করলেন। তারপর পুত্রকে লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন আলবুর্জ পাহাড়ের পাদদেশে ফেলে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। অরণ্যদেরা আলবুর্জ পাহাড়ের উচুনীর্ঘে ছিল ‘সীমোরগ’ নামক বিরাট এক পক্ষীমাতার নীড়।

‘আরব্যোপন্যাসে’র (আলেফ-লায়লার) ভীষণ-দর্শন ও হিংস্র সীমোরগ এখানে স্নেহময়ী ধাত্রীর রূপে দেখা দিলো। সীমোরগের নীড়ে তাঁর শাবকদের সঙ্গে পরম যত্নে প্রতিপালিত হলেন জাল। তারপর বড় হলে জাল পিতা কর্তৃক গৃহীত হয়ে স্মার্ট মনুচেহেরের দরবারে লাভ করলেন মর্যাদার আসন। এই জালই ‘শাহনামা’র মহানায়ক ইরানের শৌর্য সাহসিকতার প্রতীক রূপস্থিতি। বিদায়কালে স্নেহময়ী ধাত্রী—সীমোরগ জালকে খুলে দিল তাঁর গায়ের একটি পালক। বলে দিলো, কোন বিপদে পড়লে পালকটিকে আগুনে ধরতে হবে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির হবে সীমোরগ। জাল স্নেহময়ী পালিয়াত্তির এই দানকে মহামূল্য সম্পদরূপে নিজের কাছে রেখেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে রুক্ষমও পেয়েছিলেন সেই পালক ও একাধিকবার তাঁর ব্যবহার দ্বারা সীমোরগের সাক্ষাৎও লাভ করেছিলেন।

বাদশাদের যুক্ত যাত্রা, রাজ্য জয় ও শাসন ত্রাসনের মধ্যে ঝটুবদলের আমেজ নিয়ে যেসব প্রগায়োপাখ্যান ও হাদয়-বিদারক ঘটনার আবিভাব ‘শাহনামা’য় ঘটেছে, তা প্রসঙ্গত হয়েও ‘শাহনামা’র আবেদনকে যেমন সর্বব্যাপী করেছে, তেমনই তাঁর পরিপ্রেক্ষিতকে করেছে বিস্তৃতভর। অতি সংক্ষেপে তাঁর কয়েকটির পরিচয় এখানে বিবৃত করার চেষ্টা করছি।

সাম কর্তৃক জাবুল—সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হওয়ার পর জাল তাঁর রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ দেখতে প্রস্তুত হয়ে পাত্রিত্বসহ একদিন স্থীয় রাজধানী থেকে নির্গত হলেন। জাবুল সীমান্তেই কাবুলের অবস্থান। সেখানে রাজ্য করতেন মেহরাব নামে এক সামন্ত রাজা। তিনি উত্থন রাজ্যাধিপতি হিসেবে সামকে কর দিয়ে থাকেন। মেহরাব জোহাকের বংশোদ্ধৃত ও জাতিতে আরব।

কাবুলে প্রবেশ করে জাল এক সুদর উপত্যকায় শিবির সন্নিবেশিত করলেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী সেই শিবিরে চললো অবসর যাপনের সঙ্গীরূপে ভোজ্জ্বাসব ও পানপাত্রের আবর্তন। দিনের বেলায় তাঁরা পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘৃণ্যার জন্য বের হতেন।

জাল একদিন শুনলেন, মেহরাবের অস্তঃপুরে রয়েছে তাঁর এক অনৃতা 'সূর্যমুখী' কন্যা। দুনিয়ায় তাঁর রূপের তুলনা বিরল। কন্যার রূপের বর্ণনা জালকে বিচ্ছিন্ন করলো।

ওদিকে মেহরাব-কন্যা কন্দাবা পিতার মুখে পঙ্কজী-পালিত জালের দৈহিক সৌন্দর্য, শক্তিমন্ত্র ও সুরুচির কথা শুনে তাঁর প্রতি বোধ করলেন প্রেমাসক্তি।

উভয়ের মিলনে দাসীদের দৌত্য কাঞ্জ করে চললো।

এক বাত্রিতে শাহজাদা জাল মেহরাবের অস্তঃপুরে গোপনে প্রবেশ করে কন্দাবার গহের নিকটবর্তী হলেন। পৃষ্ঠচ্ছস সদশ রাজকুমারী প্রিয়তমের জন্য তাঁর দ্বিতীয় গহের অলিন্দে অপেক্ষমাণ। জাল সেখানে উপস্থিত হলে মেহরাব-কন্যা প্রলম্বিত করলেন তাঁর দীর্ঘ কৃষকেশ এবং বললেন, শাহজাদা যেন কেশ ধরে উপরে উঠে আসেন। কিন্তু বীরপুত্র বীরের আচরণ কি এমন হতে পারে? সে কি প্রিয়তমার কেশের সহায়তায় নিজেকে করতে পারে উঁগু উঁগোলিত? জাল তাঁর পাশরজ্জু হুড়ে ফেলে তাকে প্রাসাদ-শীরের সঙ্গে আবক্ষ করলেন ও তদ্বারা উঠে এলেন কন্দাবার দ্বিতীয় কক্ষে।

নীরব বাত্রিতে নীলচতুরে আকাশিক্ষিত চন্দ্রসূর্যের মিলন হলো। প্রেমোৎসবে কেটে গোলো হুস্বাত্রির দ্রুত ধাবমান প্রহরগুলি। প্রভাত প্রত্যাস্তু। সামাজিক মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাল বিদায় নিলেন।

মেহরাব-কন্যার সঙ্গে পরিণয়ে পিতা সামের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু জোহাকের বংশেষ্টুত আবব কন্যার সঙ্গে জালের পরিণয় কিভাবে সম্ভব? ইরান সফ্রাটিও তো এ ব্যাপারে সম্মত হতে পারেন না।

এদিকে মেহরাবের অস্তঃপুরে কন্দাবা অস্তঃসন্ত্ব হলেন। তাঁর গভৰ্ণে রয়েছে 'শাহনামা'র মহানায়ক রুস্তম। সুপুষ্ট শিশুর মাত্রগভৰ্ণ থেকে জাত হওয়ার ব্যাপারে সক্ষত দেখা দিল। ধাত্রীগণ বললো, স্বাভাবিকভাবে এ-শিশু ভূমিত হতে পাবে না। জাল সীমোরগের শবণাপন্ন হওয়ার কথা স্থির করে অগ্নিপাত্রে সীমোরগের পাখা পোড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে মেঘখণ্ডের মতো পঙ্কজীর উদয় হলো। সীমোরগের নিদেশে কন্দাবার উদর দীর্ঘ করে বীর শিশুকে ভূমিত করান হলো, এবং তারই দেওয়া ঔষধির গুণে কন্দাবা সুস্থ ও হয়ে উঠলেন। এই উদর-উন্মোচন যেন আগুনিক যুগের 'সিজাবিয়ান অপারেশনের' অনুকরণ।

পুত্র, পুত্রবধু ও পৌত্র সাম কতৃক সাদরে জাবুলে গৃহীত হলেন। সমন্বিত দেবদারুর মতো বাড়তে লাগলো বালক রুস্তম।

কিশোর রুস্তমের সময় কাটছে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে পানোৎসবে ও ভোজোৎসবে। তৎকালীন বীতি অনুযায়ী তৎকালীন শাহজাদাগণের জন্যও সুন্দরী পরিপূর্ণ হৈরেমের ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু যে-রুস্তম তাঁর সাহসিকতা ও বীর্যগুণে ইরানের ময়াদা ও সম্মান রক্ষার জন্য বিশ্ব-প্রভৃতি কতৃক নিয়োজিত, সে রুস্তম কি নারী সমাজের মধ্যে পানোৎসবে মন্ত হয়ে থাকতে পারে?

সফ্রাট যনুচেহেরের মৃত্যুর পর তৃতীয় সফ্রাট পিশক তাঁর বীরপুত্র আফ্রাসিয়াবকে ডেকে বললেন, ইবানের সিংহাসন শূন্য। ইবানকে আঘাত করার শুভ সময় উপস্থিত, সুতৰাং প্রস্তুত হও।

রুস্তম আফ্রাসিয়াবকে বাধা দেবে। সাম উদ্ধিশ্বু হয়ে বললেন যে, রুস্তম বালক মাত্র। সে কিছুদিন পূর্বে শৃঙ্খলমুক্ত এক মন্ত হস্তীকে শীয় বলে নির্ভিত করতে পারলেও আফ্রাসিয়াবের মতো যুক্তপ্রিয় সদ্বাটের মুখোমুখি হওয়া তাঁর উচিত হবে না।

କୁନ୍ତମ ପିତାକେ ଜ୍ଞାନାଲୋ, ଇରାନେର ଏହି ଦୂରିନେ କେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷାୟ ଦେଶୀୟମାନ ହବେ ? କୁନ୍ତମେର ପକ୍ଷେ ପାନୋଃସବେ ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ ଥାକବାର ଏକି ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ସମୟ ?

ଆଫ୍ରାସିଯାବେର ସଙ୍ଗେ କହେକଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟ-ପରାଜୟ ନିର୍ଧାରିତ ନା ହଲେଓ, କୁନ୍ତମେର ବଳୀର୍ଭେର ଖ୍ୟାତି ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ସାରା ଇରାନେ ।

ଏହିକେ ଇରାନେ ସିଂହାସନେ ଅବିଷ୍ଟିତ ହଲେନ ବାଦଶାହ କାଯକାଉସ । କାଯକାଉସ ଛିଲେନ ଯେମନ ଅଭିଭାବୀ, ତେମନିଇ ଉନ୍ନତ । ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତ୍ୟା ଓ ଯୁଦ୍ଧର କଳା-କୌଣସି ସମ୍ପର୍କେ ତିନି ତୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଟ୍ ଫାବେଦୂନ କିମ୍ବା ମନୁଚେହେରେ ସମକଳ ଛିଲେନ ନା । ସିଂହାସନାବୋହଙ୍ଗେ ପର ଯେ ତୂରାନ ସୀମାନ୍ତ ଓ ଆଫ୍ରାସିଯାବେର ଦିକେ ତୀର ନଜ୍ଞର ଦେଓଯାର କଥା, ତିନି ତା ନା କରେ ମାଜିଦିରାନେର ଅଧିପତିକେ ସ୍ଥିର ଦରବାରେ ଆସନ କରେ ପାଠାଲେନ । ମାଜିଦିରାନ ରାଜ ସ୍ୱାଟ୍‌ରେ ଏହି ଆସନକେ ଅପମାନରେ ନିର୍ଦଶନ ବଲେ ଗଣ୍ୟ କରେ ତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରଲେ । କ୍ରୋଧାନ୍ତିତ କାଯକାଉସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେତ ଗ୍ରୁହଣ ସ୍ୱତିରେକେଇ ମାଜିଦିରାନ ଆକ୍ରମଣ କରେ ସେଥିରେ ବନ୍ଦୀ ହୁଏ ପଡ଼ିଲେନ । ଡାକ ପଡ଼ିଲୋ ଖ୍ୟାନାମା ବୀର କୁନ୍ତମେର । ଇରାନ ସ୍ୱାଟ୍‌ରେ ତୀର ବଦୀଦଶା ଥିକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଆନତେ ହେବ ।

କୁନ୍ତମେର ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ ହଲୋ ମାଜିଦିରାନେର ପଥେ । କଠିନ ସେ-ପଥ, ସେ-ପଥ ବିପଦସଙ୍କୁଳ । କୁନ୍ତମ ଏକାକୀଟି ସେ-ପଥ ପାର ହୁଏ ଚଲିଲେ । ପଥେ ପଡ଼ିଲୋ ଏକ ଦୂର୍ବଲ ସିଂହ କୁନ୍ତମ ତାକେ ବଧ କରିଲେନ । ଅନ୍ତି-ଉଦ୍ଗୀରଣକାରୀ ଆଜଦାହାକେ ପରାଭୂତ କରିଲେନ ଏବଂ ମାୟାବିନୀ ନାରୀର କୁହକ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫେଦ ଦୈତ୍ୟକେ ହତ୍ୟା କରେ ଇରାନ-ଶାହକେ ମାଜିଦିରାନ ଥିକେ ମୁକ୍ତ କରେ ଆନଲେନ ।

ମହାବୀର କୁନ୍ତମ ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ଭାବୁଲାଙ୍ଘାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତନ କରାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେଇ ମାଜିଦିରାନାଧିପତି ଆବାର ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ସଞ୍ଜିତ ହଲୋ । ଏବାରଓ ଡାକ ପଡ଼ିଲୋ କୁନ୍ତମେର । ମାଜିଦିରାନାନ୍ଦେର ସକଳ ବଳୀର୍ୟ ଓ କୁହକ ଛିନ୍ନିଭିନ୍ନ କରେ କୁନ୍ତମ ତାଦେରକେ ଚିରଦିନେର ଜନ୍ୟ ଇରାନ ଶାହେର ପଦାନତ କରେ ଦିଲେନ ।

କିନ୍ତୁ କାଯକାଉସର ଅନୁରୂପ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ବାଦଶା ଆର ହୟ ନା । ତିନି ସେବାଯା ବାର ବାର ନିଜେର ଉପର ଓ ଇରାନେର ଉପର ଟେମେ ଏନେହେନ ଅମଙ୍ଗଲ । ଗ୍ରୀଭର୍ମ, ସମ୍ପଦ ଓ ଶାନ୍ତି ତୀରକେ ସତତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟପଥେ ବିଚରଣେ ପ୍ରୟାସୀ କରେ ତୁଳେ । ସ୍ୱାଟ୍‌ରେ ସେନାପତିଦେର ମଧ୍ୟେ ଗୋଦରଜ ସବ ଚାଇତେ ପ୍ରୀଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ । କାଯକାଉସ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଦିନ ତିନି ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ କରତେ ଗିଯେ ବଲେନ ଯେ, ତିନି ଶିଶୁକାଳ ଥିକେ ବହ ବାଦଶାକେ ଦେଖେଛେନ, ଦେଖେଛେନ ବହ ସିଂହାସନ, ବୀର ଓ ରାଜ୍ୟଧିପତିକେ । କିନ୍ତୁ ତୀରଦେର କେଉଁ କାଯକାଉସର ମତୋ ଆତ୍ସର୍ବତ୍ସ ଛିଲେନ ନା । ପ୍ରତ୍ୟା ବଳତେ କାଯକାଉସର କିନ୍ତୁ ନେଇ; ବିଚାରବୋଧ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିକେ ତିନି ବନ୍ଧିତ । ମନେ ହୟ, ହଦୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରକର କୋନ ଗୁଣେଇ ତିନି ଗୁଣାଦ୍ୱିତ୍ଵ ନନ । ଏହି କାଯକାଉସ ଥିକେଇ 'ଶାହନାମା'ର ଏକ କରଣତମ କାହିନୀର ଉତ୍ସବ ହେଁଲିଲ । ଏକ ସୁନ୍ଦରତମ ପୁଲେର ପରିମ୍ବାନ ହେଁଯାର ଜନ୍ୟ ଦାୟୀ ତୀରଇ ଅବିବେଚନା । ଦୂର୍ଖମ୍ୟ ସେଇ ସିଯାଉସ କାହିନୀ ଶୁରୁ କରାର ପୂର୍ବେ, ତରଣ କୁନ୍ତମେର ପ୍ରଣୟୋପାଖ୍ୟାନ ଓ କୁନ୍ତମ-ଶୁରୁ ସୋହରାବେର ଦୂର୍ଖମ୍ୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କେ ସଂକ୍ଷେପେ ଏକାଟୁ ବଲେ ନେଓଯା ଦରକାର ।

ତୂରାନ ସ୍ୱାଟ୍ ଆଫ୍ରାସିଯାବେର ସଙ୍ଗେ ଚଲଛେ ଦୀର୍ଘ ଅମୀମାଂସିତ ଯୁଦ୍ଧ । କୁନ୍ତମେର ସଙ୍ଗେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଫ୍ରାସିଯାବ ପଲାୟିତ ହୁଏ ଫିରେ ଗେଛେନ ନିଜ ରାଜ୍ୟେ । କୁନ୍ତମ ଓ ଇରାନ-ସୀମାନ୍ତର କାହେ କୋଥାଓ ଶିବିର ସନ୍ନିବେଶିତ କରେଛେନ । ଏକ ପ୍ରଭାତେ କୁନ୍ତମ ପାଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଦୂମିତେ ଯଗ୍ଯା କରେ ମନ-ପ୍ରାଣ ସଜ୍ଜୀବ କରେ ତୁଳବେନ । ସାଥୀମଧ୍ୟେ ତୃତୀୟ ଭାବେ ନିଯେ କୁନ୍ତମ ଅଶ୍ୱକେ ଉତ୍ୟେଜିତ କରିଲେନ । ଘୋଡ଼ା ପ୍ରଭୁକେ ନିଯେ ବାୟୁବେଗେ ଛୁଟିଲେ ଲାଗଲେ । କୁନ୍ତମେର ଖେଲୁ ନେଇ ; କଥନ ତିନି ଚଲତେ ଚଲତେ ତୂରାନ ସୀମାନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରେ

এসেছেন। সামনে বন্যগর্ভ পরিপূর্ণ এক সুন্দর উপত্যকা। শিকারের অনুকূপ প্রান্তর বীরকে মগম্যায় মন্ত করলো। কৃষ্ণ এক বন্যগর্ভ আগুনে দণ্ড করে তাঁর ক্ষুণ্ণবিশ্বি করলেন ও ক্ষীণ স্মোত্তিষ্ঠীর নির্মল জলে নির্বারিত করলেন শ্রান্তি ও তক্ষ। তারপর তৃণভূমিতে রাখ্শকে চৰতে দিয়ে তিনি মখমল সদশ ঘাসের উপর নিপিত হলেন।

এই সময়ে কয়েকজন তুরান সৈনিক পথাতিক্রমে রাখ্শকে দেখতে পেবে তাকে ধৰবার মতলব করলো। এই সুলক্ষণে অশু থেকে নতুন জাতের বীজ পেতে হবে। রাখ্শের চৰণাঘাতে তিনজনের মতু হলেও অবশ্যে রাখ্শ তাদের হাতে কব্জি হলো।

এদিকে কৃষ্ণ জগ্নিত হয়ে রাখ্শকে বহু ক্ষোঁজাবুজি করেও পেলেন না। অবশ্যে স্থির করলেন, অন্তিমদ্বয়ে যে নগরী রয়েছে সেখান থেকেই রাখ্শের অনুসঙ্গান চালাতে হবে। নগরীর নাম সামানগাঁ। এই সামন্ত বাজাটি তুরানের অস্তর্গত। কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে, সামানগাঁ-রাজ তাকে সাদের অভ্যর্থনা জানালেন খ্যাতিমান বীর কৃষ্ণ তাঁর গৃহে অতিথি, এর চাইতে আনন্দের ও সম্মানের কু আছে।

কৃষ্ণের জন্য নিপিত হলো রাজপুরী মধ্যে সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষ। সক্ষ্যার পর প্রাসাদে বসলো ন্তা-গীত ও পানাদির আসর। পথশ্রমে ঝুঁস্ত কৃষ্ণের চোখে ঘূম মেমে আসছে, তিনি উৎসব ছেড়ে শয়নকক্ষে এসে নিপিত হলেন। গভীর বাত্রে মিদ্দাভঙ্গে কৃষ্ণ শুনতে পেলেন, কোমল শব্দে কে যেন গহুবার উশুকু করছে। সবিস্যুরে দেখলেন, এক দাসী প্রদীপ হাতে এগিয়ে আসছে কৃষ্ণের শয়ার দিকে। দাসীর পেছনে প্রদীপাস্তৰালে চাঁদের মতো সুন্দরী এক কন্যা ও বীরবরের দিকে বীরপদে অগ্রসর হচ্ছে। সারা কক্ষ সেই সুন্দরীর তনুগাঙ্কে আমোদিত হয়েছে।

কৃষ্ণ সৃষ্টিকর্তার সহায়তা প্রার্থনা করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

কন্যা জানালো, সে সামানগাঁ রাজের কন্যা তাহমিনা। কৃষ্ণের বীরত্বের কাহিনী তাকে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিনী করে তুলেছে। সুতৰাঁ দুনিয়ার কেন রাজপুত্রাই তাঁর স্বামী হওয়ার যোগ্য নয়। রাজকন্যা রাখ্শকে খুঁজে বের করার প্রতিশূলিতও দিলো। কৃষ্ণ তাহমিনার কথায় প্রীত হয়ে ভাবলেন, কাল সামানগাঁ রাজ্যের কাছে তিনি কন্যার পাণি প্রার্থনা করবেন।

যথারীতি বিবাহ পর্ব সম্পন্ন হলে কৃষ্ণ ও তাহমিনা বাসর ঘরে একত্রিত হলেন। আনন্দে অভিভাবিত হলো রাত্রি। সকালে সূর্য যখন সমুন্তু আকাশে তাঁর সোনালী জাল ছড়িয়ে দেওয়ার উপক্রম করছে, তখন কৃষ্ণ তাহমিনার হাতে একটি মণি-বিশিষ্ট কবচ দিয়ে বললেন, যদি তোমার মেয়ে হয় তবে এই মঙ্গলসৃষ্টক কবচটি চুলে বেঁধে দিয়ো। আর ছেলে হলে তাঁর বাহতে এই কবচই হবে তাঁর পিতার পরিচয়-চিহ্ন।

এরই মধ্যে রাখ্শকে পাওয়া গেল। বীরবর তাঁর প্রিয় বাহনকে পেয়েই তাকে আদর করলেন ও যথা শীঘ্ৰ তাঁর পিঠে আসন যুক্ত করে তাঁতে উঠে বসলেন। বায়ুগতিতে রাখ্শ তুরান পার হয়ে এলো। শুন্মুক্ষ সীক্ষণ হয়ে ফিরে এলেন জাবুলস্তানে। সামানগাঁয়ের পরিগণয়ের কথা দেশে কেউ জানতে পেলো না।

থেমে থেমে তুরানের সঙ্গে যুক্ত চলছেই। প্রতিটি যুক্ত কৃষ্ণ ছিনিয়ে আনছেন তাঁর জন্য খ্যাতির মালা। সারা দুনিয়ায় কৃষ্ণের শৌর্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তুরানাধিপতি আফ্রাসিয়াবের চিন্তা, কেন তুরান বীর এই সিংহ-বীর্য কৃষ্ণের মোকাবেলা করবে?

ওদিকে তাহমিনার গভর্জাত পুত্র সোহরাব তারঞ্জে উপনীত হয়েই প্রকটিত করলো অতুল বলবীয় ও সাহসিকতার পরিচয়। আফ্রাসিয়াব ভাবলো, এই তরুণই কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ হওয়ার যোগ্য। তবে হায়! সোহরাব যে কৃষ্ণের পুত্র। কিন্তু পুত্র কি পিতাকে চেনে? অপরপক্ষে কৃষ্ণমও পুত্রকে কখনো দেখেনি। সুতৰাং এ পরিচয় যে করেই হোক গোপন বাধ্যতে হবে।

‘সোহরাব-কৃষ্ণ’র করণ কাহিনী বাংলাদেশে খুবই পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে ডি. এল. রায় তাঁর ‘সোহরাব-কৃষ্ণ’ নাটিকে কাহিনী dramatic ironyকে বেশ ভাল করেই ফুটিয়ে তুলেছেন। নিয়তির উপকরণ হিসেবে এখানে যা ব্যবহৃত হয়েছে, তা কৃষ্ণের আত্মর্ঘাদাবোধ ও সোহরাবের অনুসর্ক্ষণ। সোহরাব পিতাকে খুঁজছেন। তাই তিনি প্রতিপক্ষ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কৃষ্ণ কি না? কৃষ্ণের আত্মর্ঘাদায় তাতে আঘাত লাগে। এক তৃণ বালক বিশুবিধ্যাত কৃষ্ণের সঙ্গে শৈর্যের যে পরিচয় দিছে, তার কাছে কি কৃষ্ণ বলে নিজের পরিচয় দেওয়া যায়? তারপর অজ্ঞান অবস্থায়ই অত্যন্ত নশৎসভাবে পুত্র নিহত হলো পিতার হাতে। মৃত্যুর পূর্ব মৃত্যুতে সোহরাব তার বাহ্যতে ধীর্ঘ কবচ দেখিয়ে কৃষ্ণকে বলছে, পিতা কৃষ্ণ যখন শুনতে পারবেন তাঁর পুত্রকে তুমি অন্যায় মুক্তে নিহত করেছ, তখন তোমার আর রক্ষা থাকবে না। মৃত্যুপথ্যাত্মী একি বলছে? কৃষ্ণ নিজ হাতে ঘটালেন যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুর হাত থেকে কি এখন পুত্রকে রক্ষা করা যায় না? মানুষের দীর্ঘবক্ষ কি কখনও জ্ঞেড়া লাগে না?

অপত্য স্নেহের এমন করণ প্রকাশ, বিশ্ব-সাহিত্যে আর কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সন্ত্রাট কায়কাউসের প্রধান সেনাপতি তৃস। একদা তৃস ও গোদরঞ্জ-পুত্র গোও মগয়ারত বীরবৃন্দ থেকে দূরে এগিয়ে যান। সেখানে অরণ্যমধ্যে অপূর্ব সুন্দরী এক রমণীর সাক্ষাত লাভ ঘটে। জানা যায় যে, সে নেশাগ্রস্ত পিতার প্রহারের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। সে অভিজ্ঞাত। মহানূভব সন্ত্রাট ফাবেদূনের বংশগোত্রাত্মক সে। তৃস ও গোও-এর মধ্যে কে এই রমণীর পাশি গ্রহণ করবে, তা নিয়ে বচসা দেখা দিলে তৃতীয় ব্যক্তি জানালো, বিষয়টি স্বয়ং সন্ত্রাটসমক্ষে পেশ করা উচিত। অভিজ্ঞাত সেই রমণী-রত্নকে সন্ত্রাট কায়কাউস নিজেই তাঁর পর্ণীরাপে গ্রহণ করলেন। যথাসময়ে সেই পর্ণীর গর্ভে সিয়াউশের জন্ম হলো।

সিয়াউশকে সন্ত্রাট শিক্ষার জন্য কৃষ্ণের হাতে তুলে দিলেন। কৃষ্ণম শুধু বল-বীর্যে অতুলনীয় এবং যুদ্ধবিদ্যায় ও অসি চালনায়ই দক্ষ নন; তিনি রাজকীয় উৎসবের, আনন্দিত আসরের ও গুণীজনের সাহচর্যের রীতিনীতি সম্পর্কেও সর্বাধিক জাজিজ। কৃষ্ণ জানেন, কি ন্যায় আর কি অন্যায়? তিনি রাজ সিংহাসনের সকল তাংপর্য অবগত আছেন। কৃষ্ণ বালক সিয়াউশকে সর্বিধি শিক্ষায় শিক্ষিত করে ফিরিয়ে দিলেন সন্ত্রাটের হাতে। রাজধানীতে তরুণ শাহজাদার দিনগুলি আনন্দেই কাটছে।

এমন সময় একদিন সন্ত্রাটের প্রধানা মাঁধী সওদাবা সিয়াউশকে সন্ত্রাটের পাশে উপরিষ্ঠ দেখে কাম-শরে জঙ্গরিত বোধ করলো। সন্ত্রাজীর মনে হলো, তার মধ্যমল-কোমল বক্ষবাস-যেন কর্তৃশ বস্ত্রে পরিণত হয়েছে, তার বুকের ঘনীভূত ইহম যেন বিগলিত হচ্ছে। একজন দাসী পাঠিয়ে সওদাবা শাহজাদাকে জানালো, শাহজাদা যদি গোপনে সন্ত্রাজীর হেরেমে আগমন করতে চান, তবে সওদাবা আপত্তি করবে না। জবাবে পৃত-চিন্ত শাহজাদা। দাসীকে বললেন, হেরেমে তাঁর কোন প্রয়োজন?

সহজ পথে কার্যসিক্ষি হতে না দেখে সওদাবা সম্মাটের শরণাপন্ত হলো ; তাকে সে জানালো যে, তার মাতৃহাস্যে সিয়াউশের জন্য রয়েছে স্নেহের সংক্ষয়। সুতরাং একবার তাকে হেরেমে পাঠালো খুবই ভালো হতো ; তার বোনেরাও তাকে দেখতে পেতো।

সম্মাট তখন সিয়াউশকে ডেকে এনে বললেন, অস্তঃপুরে যাও, পূর্ব-বরষীগণ তোমাকে দেখে গ্রীত হবেন ও তোমাকে করবেন আশীর্বাদ।

জবাবে শাহজাদা বললেন হে রাজ্যাধিপতি, অস্তঃপুরে আমার কোন্ প্রয়োজন ? আমাকে প্রেরণ করুন জ্ঞানীজনের মজলিসে প্রেরণ করুন তাঁদের মধ্যে থারা জ্ঞানেন বিভিন্ন অস্ত্রের সুনিপুণ ব্যবহার, অথবা আমাকে সঙ্গীত ও পানাহাবের মজলিসে প্রেরণ করুন। নারীগণ আমাকে কোন জ্ঞান বিতরণ করবেন ?

সম্মাট শাহজাদার কথায় গ্রীত হলেন ও বললেন, কিছুক্ষণের জন্য হলেও অস্তঃপুরে যাও, পূরকণ্যাগণ তোমাকে দেখে আনন্দ লাভ করবেন।

সিয়াউশ চিন্তিত মনে অস্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। যবনিকা উত্তোলিত হলে শাহজাদা দেখলেন, সুসজ্জিত কক্ষে সম্মাজীর উপযুক্ত মর্মাদায় সুন্দরী সওদাবা ; চারিদিকে স্ফূরিত হচ্ছে অপার্থিব সৌগন্ধ্য। সিংহাসন থেকে নেমে এসে সওদাবা সিয়াউশকে আলিঙ্গন করে বললো, এমন পুত্র কার আছে !

সিয়াউশ বুঝলেন যে, সওদাবার আলিঙ্গনে পবিত্রতার চিহ্ন মাত্র নেই। তিনি ভূঁটীদের দেখে দ্রুত অস্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন।

এবাবে সওদাবা কায়কাউসকে জানালো, সওদাবার কন্যা সিয়াউশের ভূঁটী, তার প্রতি অনুরভূত। সওদাবা শাহজাদাকে তার কন্যার সঙ্গে বিবাহ বস্তনে বাঁধতে প্রয়াসী (প্রাচীনকালে ইয়ানে আতাভূতীতে বিবাহ প্রচলিত ছিল)।

সম্মাট পুনরায় সিয়াউশকে অস্তঃপুরে পাঠালেন।

এইবাবে সিয়াউশকে আলিঙ্গনবন্ধ করে সওদাবা বললো, শাহজাদা আমি তোমাকে আমার কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই। কিন্তু তার আগে একটি বারের জন্য হলেও তুমি আমার মনোবাস্তু পূর্ণ কর। গোপনে প্রথম দেখেই তোমার প্রেমে আমি মরেছি ; আমাকে তুমি বাঁচাও। তেমন করলে, তোমাকে আমি দান করবো সিংহাসন ও রাজমুকুট। অন্যথায় তোমার ঘৌবরাজাকে আমি ধূলায় লুটিয়ে দিবো।

ঘণায় ভরে উঠলো শাহজাদার অস্তর। ওচিত্য ও শালীনতার উপর মন্তব্য করে শাহজাদা অস্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মর্মাহত সম্মাজী এবাব শীয় বক্ষবাস বিদীর্ণ করে ও কপোল নখরাঙ্কিত করে বিলাপ করতে শোগলো। তার অভিযোগ, সিয়াউশ তার মর্যাদা হানি করেছে।

সম্মাট সব শুনলেন। শুনে বিচলিত বোধ করলেন আর ভাবলেন, সম্মাজীর কথা সত্য হলে সিয়াউশের প্রাণদণ্ড হওয়া আবশ্যিক।

সিয়াউশ সমক্ষে ব্যক্তি করলেন সওদাবার আদ্যোপাস্ত ব্যবহার। কিন্তু সওদাবা অস্থীকার করে জানালো যে, বস্তুতঃ অস্তঃপুরে নারী সমাজের মধ্যে সিয়াউশ তাকেই বেছে নিয়েছিলো। চিন্তিত সম্মাট ন্যায়েব সপক্ষে কার্য করাব জন্য সময়কেই উপযুক্ত সাক্ষীকাপে বেছে নিলেন।

সওদাবার চক্রান্ত শেষ হলো না। জটিল গুষ্ঠিতে সে আবক্ষ করে চললো ঘটনার জাল। শাহজাদা ও স্বার্গীয় মধ্যে কে দোষী তা প্রমাণ করার জন্য সভাসদগণ স্মার্টকে অগ্নি পরীক্ষার উপদেশ দিলেন। অগ্নি-দেবই তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

সিয়াউশের অগ্নি পরীক্ষার কথা ঘোষণা করা হলো। স্তৃপীকৃত কাষ্ঠে প্রজ্বলিত করা হলো অগ্নি। হাজার হাজার দশক সেখানে উপস্থিত। আগুনের লেলিহান শিখা ধখন বিশাল ক্ষেত্রকে আয়ত্ত করে নিয়েছে, তখন সিয়াউশ বিশ্ব-প্রভূর উদ্দেশ্য প্রার্থনা উচ্চারণ করে তার কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। চারিদিকে ধূগতি হলো কোলাহল। সকলের চক্ষু সিয়াউশের উপর। অগুনের লেলিহান শিখা আবৃত করেছে সিয়াউশকে, — তাঁর অশ্ব অগ্নিশিখার ভিতর দিয়ে অব্যাহত রেখেছে তার যাত্রা। এই! ওইতো! অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসছেন যুবরাজ সিয়াউশ।\*

স্মার্ট নিষিদ্ধত্বাপে জানতে পারলেন সিয়াউশ নিষ্পাপ ও সওদাবা অবিশ্বাসিনী। কিন্তু সিয়াউশের অনুরোধে বক্ষা পেলো সওদাবার প্রাণ। মানুষবর যৌন-কামনার অঙ্গুলীয়া স্নোতের গতি বড় বিচ্ছিন্ন! খুব বেশী দিন অতিবাহিত হতে না হতেই সওদাবা পুনরায় সম্মাটের প্রেয়সীর পূর্ব মর্যাদা ফিরে পেলো।

ওদিকে প্রতিহিংসাপ্রায়ণ আফ্রাসিয়াব পুনরায় লক্ষাধিক বীরসহ ইয়ানের দিকে মুখ করেছে। স্মার্ট কায়কাউস স্থির করতে পারছেন না তাকে বাধা দিবাব কি উপায় করবেন? শাহজাদা সিয়াউশ তখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজে নিষ্ঠেকে উৎসর্গ করতে চাইলেন। স্থির হলো, মহাবীর রুক্ষমের অভিভাবকতায় শাহজাদা মুক্ত যাত্রা করবেন।

উভয় শক্তি পরম্পরের মুখোযুধি হচ্ছে। এমন সময় আফ্রাসিয়াব দৃঢ়স্বপ্ন দেখলো। আসন্ন মুক্ত তার ভাগ্যের অনুকূল নয়। জ্যোতিষী ও সুহৃদ্বর্ণের কথায় আফ্রাসিয়াব সক্ষিব প্রস্তাব করলো। শাহজাদা সিয়াউসের মন শাস্তির সপক্ষে। তিনি আফ্রাসিয়াবকে শাস্তির প্রতিশৃতি দিয়ে রুক্ষমকে পিতার কাছে পাঠালেন। কায়কাউস একপ সক্ষি মানতে রাজি নন, তিনি রুক্ষমকে কঠুংক্ষিতি করে বাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ক্রোধে অভিমানে রুক্ষম চলে গেলেন সীমানার দিকে এবং সিয়াউশ পূর্ব প্রতিশৃতি ভঙ্গ হয় দেখে, ইবান গাহীনী ছেড়ে চলে গেলেন তৃবানে। সেখানে যুবরাজ অত্যন্ত আদরের সঙ্গে আফ্রাসিয়াব কর্তৃক গৃহীণ হলেন। সিয়াউশের বীরত্ব ও গুণপণা আফ্রাসিয়াবকে মুগ্ধ করলো। আফ্রাসিয়াব স্বীয় কন্যা ফরেস্টীগাঁও সিয়াউশের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। তৃবান-ভূমিতে সুখেই সিয়াউশের সময় অতিবাহিত হতে লাগলো।

এদিকে যুবরাজের সৌভাগ্যে ঈর্ষাণ্বিত হয়ে আফ্রাসিয়াব-আতা গারসিউজ আফ্রাসিয়াবের কান ভাবী করে তুললো। সে বললো, স্মার্ট শক্তির পুত্রকে কাল-সাপের মতো দুধ-কলা দিয়ে পুষ্টেন। অর্থ একদিন সেই সাপই তাঁকে দংশন করবে।

গারসিউজের প্রবেচনায় আফ্রাসিয়াব নৃংসত্তম অন্যায়ের দিকে এগিয়ে গেল। নিষ্পাপ নিবপ্বাধ সিয়াউশকে অত্যন্ত নির্যমভাবে হত্যা করলো। এবং সেই সঙ্গে বস্তী করলো স্বীয় কন্যা ফরেস্টীসকে। কন্যাকে প্রকাশ্যভাবে অপমান করতেও বৃষ্টিত হলো না আফ্রাসিয়াব। এ-সময়ে তৃবান-রাজ্যের সেনাপতি ও পরামর্শদাতা মহানূভব পীরানা স্মার্টকে এই হাদয়হীন নির্মম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে ফরেস্টীসকে মৃত্যু করে নিলো।

বামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষা স্মরণীয়।

যথাসময়ে পীরানের আশ্রয়ে ফরেস্টীসের গভর্নেন্ট সিয়াউচের পুত্র কায়খসরুর জন্ম হলো। পীরান স্বপ্নে দেখেছিলেন, সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থেকে সিয়াউচ নিজ হাতে একটি প্রদীপ ঝুলিয়ে তাকে উচু করে ধরে বললেন, আর কতদিন অলসেস্য সময়াত্পিতাম করবে? সুপ্তি থেকে উত্থিত কর শির। আজ নতুন ভাগ্য ও নতুন উৎসবের সূচনা হবে। আজ রাত্রে জন্ম নিছেন শাহিনশাহ কায়খসরু।

কায়খসরুর জন্ম হলো। আফ্রসিয়াব সংবাদ শুনে চিন্তিত হয়ে ভাবলো, বড় হয়ে এই শিশু যদি তার পিতৃপ্রতিশোধে কোমর বাঁধে! সুতৰাং, যে অন্যায় সিয়াউচের উপর করা হয়েছে, তা না করে, এমন কি উপায় করা যায়, যাতে সে তার অতীত সম্পর্কে সঠিক মতো অবহিত হওয়ার সুযোগ না পায়।

পীরান স্মার্টকে বললেন, শিশু যদি মেষপালকদের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠে, তবে কিছুই জানতে পারবে না। লোকে বলে, মানুষ পিতামাতার মতো না হয়ে হয় তার প্রতিপালকের মতো।

এইভাবে কায়খসরু মেষপালকদের মধ্যে বড় হয়ে উঠলেও যথাসময়ে কেয়ানী বৎসুলভ সকল গুণেরই আবির্ভাব হলো তার মধ্যে। কিন্তু পীরান, একথা আফ্রসিয়াবকে জানতে দিলেন না। আফ্রসিয়াব বরং জানলেন, সিয়াউচের পুত্র মন-মস্তিষ্ক উভয় দিক থেকেই ভারসাম্যহীন।

ওদিকে পুত্রবৎ সিয়াউচের হত্যার সংবাদ শুনে, সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন রুস্তম। প্রথমেই তিনি সওদাবার কেশাকর্ষণ করে এনে তাকে হত্যা করলেন। তারপর তূরানের বিরক্তে পরিচালনা করলেন এক মহসুম অভিযান। রুস্তমের আক্রমণের সামনে ক্রমে পিছু হটতে লাগলো আফ্রসিয়াব। দীর্ঘ সাত বছর ধরে তূরান ভূমিকে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে খাক করলেন রুস্তম। ওদিকে ইয়ান সেনাপতি গেও কায়খসরুর ধোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। বহু সঞ্জানের পর গেও রাজকীয় ঐশ্বর্য দেখে কায়খসরুকে চিনতে পারলেন ও সাবধানতার সঙ্গে ফরেস্টীসহ কায়খসরুকে ইয়ানে নিয়ে এলেন।

কায়কাউস বৃক্ষ হয়েছেন। কাজকীয় কর্তব্য এখন কায়খসরুকেই করতে হবে। কিন্তু রাজ সিংহাসন এত নিষ্কটক নয়। ফারেদুন ধৃঢ়ীয় সেনাপতি তৃসু বৈকে বসলেন, আফ্রসিয়াবের দৌহিত্রকে তিনি ইয়ানের স্মার্ট বলে মেনে নিবেন না। কায়কাউস পুত্র ফারেবুরজকে তিনি সিংহাসনের দায়ীদার রূপে দাঁড় করালেন। কিন্তু কায়কাউসের কাছে তাঁদের পরাজয় ঘটলো। কায়কাউস কায়খসরুকে সিংহাসন দান করলেন। সিংহাসনে বসে কায়খসরু পিতামহের সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন; আফ্রসিয়াবের কাছ থেকে তিনি যেমন করেই হোক পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিবেন।

সন্তুষ্ট কায়খসরুই ইতিহাস-খ্যাত মহানুভব কাইরাস। ‘শাহনার্মায় এই কায়খসরুর শাসনকালেই ইয়ান-বীর রুস্তম তার শৌর্য সম্যকভাবে প্রকটিত করার সুযোগ পান। হিন্দুস্তান, তূরান, ইয়ান ও চীনের সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে রুস্তমের শৌর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আর সেই সঙ্গে বৃক্ষ পায় ইয়ানের মর্যাদা। এ-কাল ইয়ানের সংম্রাটি-সভ্যতারও পূর্ণ বিকাশের কাল। বেবন্ন ও মুনীবার প্রগয়োপাধ্যানের মাধ্যমে কবি যেন তাকেই ধৰণীয় করে দেখাতে চেয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত কায়খসরুর হাতে পরাজিত হয়ে নিহত হন আফ্রসিয়াব। তূরানের অস্তিত্বে লোপ পেয়ে ইয়ানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। কর্তব্য শেষে দিহিঙ্গয়ী স্মার্ট কায়খসরুর মহাপ্রয়াণের সময় হলো। খসরু যথারীতি বীর-বৃদ্ধকে ডেকে তাঁদের কাছে বিদায় চাইলেন ও লুহরাসপকে নির্বাচিত করলেন, ইয়ানের পরবর্তী স্মার্টরাপে। এইবার তাঁর বিদায়ের পালা। ‘মহাভারতে’র মহাপ্রস্থানের

অনুরূপ কায়খসক তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলেন ও এক তুষার ঝঞ্চার ভিতর দিয়ে  
অদ্য হয়ে গেলেন পৰতাঙ্কলে।

লুহুরাস্প পুত্র গুশ্তাস্প রোম-সংগ্রামের কন্যা কাতায়ুনকে বিবাহ করলেন। সম্মাটকুপে এ-বিবাহ  
হয়নি। আত্মনিবাসিত শাহজাদা কৃত্তি বোমক রাজকন্যার বরমালা লাভের ঘটনাটি আবার  
'মহাভারতের প্রৌপনীর সংযোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই গুশ্তাস্পেরই শাসনকালে জরদারতের (জরোয়েট) আবির্ভাব হয়। এই জরদারতের দ্বারাই  
ইরানে একেশ্বববাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি বলেন যে, অঙ্ককারের দেবতা আহরিমেন আহুরমজ্দার  
সমকক্ষ নয়, আহরিমেন কুপ্রবোচণাদানকারী শয়তান মাত্র। ধর্মক্ষেত্রে আলো-অঙ্ককারের চিরস্তন  
দ্বন্দ্বের অবসন্ন হয়ে আলো নিঃসংশ্রিতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করলো। আহরিমেনের চেলা  
আফ্রাসিয়াবের পতনের পর রাত্রিশেষে ভোরের উদয়ের মতোই জরদারতের আবির্ভাব। এই জরদারতী  
ধর্মের উৎসাহী প্রচারকরণে দেখা দিলেন সম্মাট গুশ্তাস্পের পুত্র শাহজাদা ইসফিদিয়ার। ইসফিদিয়ার  
যেমন সত্যবাদী তেমনই সরল ও বীর-বিক্রম। ধর্মের প্রসার ও ইরানের মর্যাদাবৰ্দ্ধনের আকাঙ্ক্ষায়  
শাহজাদা পিতার কাছে সিংহাসনের প্রাপ্তি হলেন। পিতা তাঁর শক্ত আবজাস্পের পৰাজয় ও তাঁর  
ভগ্নিগণের উক্তারের উপর শাহজাদার সিংহাসনলাভ নির্ভর করে বলে যে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন,  
শাহজাদা তা সম্পূর্ণ করেন। মাতা কাতায়ুন পুত্রকে বুঝালেন—ধৈর্য ধৰ, বৰ্দ্ধ সংগ্রামের পরে তুমিইতো  
সিংহাসনের মালিক হবে। কিন্তু শাহজাদা ইসফিদিয়ার তা মানবার পাত্র নয়।

গুশ্তাস্পের দ্বিতীয় শত ও জাবুলের সামন্তরাজ কুস্তম দীর্ঘকাল ধরে ইরানের রাজসভার দিকে  
পিঠ করে আছে তাকে বন্দী করে বাজসভায় নিয়ে আসতে হবে, এই শত পরিপূর্বিত হলে  
ইনসফিদিয়ারের সিংহাসন প্রাপ্তিতে আর কোন বাধাই থাকবে না।

তরুণেব রক্ত উগবগ করে উঠলো। জগদ্বিখ্যাত কুস্তমকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করা! —  
ইসফিদিয়ার জাবুলের পথে যাত্রা করলো।

কুস্তমের সঙ্গে ইসফিদিয়াবের কথোপকথনে, উভয়ের সঙ্গের ইচ্ছায়, ব্যবহারের সৌজন্যে  
ইরানের সংস্কৃত-সভ্যতার এক অসামান্য চিত্র ঘটে উঠেছে। ইসফিদিয়ার স্বীয় ধর্মে ও সত্ত্বে  
অবিচলিত, — কুস্তম স্বীয় আত্ম-ময়দায়। কুস্তম লোক দেখাবার মতো করেও নিজের পায়ে শেকল  
পরতে পারন না। জীবিতাবস্থার কাবো হাতে বন্দী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। অবশেষে, দ্বন্দ্যমুক্তীই  
এর শীমাংসা হবে, প্রতীকৃত হবে।

একদিকে ইরানের মহান্তম বীর কুস্তম অন্যদিকে ইরানের ভাবী সম্মাট। যে কুস্তম ও তাঁর  
পিতাপতামহের জীবন ইরান-সম্মাটের জন্য উৎসমীকৃত ছিল, সেই কুস্তম আজ ইরান-শাহজাদার  
প্রাতিদ্বন্দ্বী। ইতিহাসের অধ্যোগতি শুরু হয়েছে। যে শৌর্য, চরিত্র, ঐকাণ্টিকতা ও কেন্দ্রীয় সম্ভবকে  
ইরান আশ্রয় করেছিল, তাদের পতন যেন আসন্ন হয়েছে।

দ্বন্দ্যমুক্তী ইসফিদিয়ার নিহত হলেন। মৃত্যুর সময় ইসফিদিয়ার কুস্তমকে অনুবোধ করলেন যে,  
পুত্র বহমনের শিক্ষা-দীক্ষার ডাব কুস্তমকে নিতে হবে। কুস্তম স্বীকৃত হলেন। ইরানের পতন যেন  
কিছুদিনের জন্য স্থগিত রইলো।

এদিকে কবি আমাদের জানালেন যে, জালের ঔরসে দাসীর গর্ভজাত 'শাগাদ' নামে এক ভাই  
ছিল কুস্তমের। সে কাবুল বাজের দুইতাকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করছিল। কাবুলরাজ বস্তুত

জাবুলের অনুগত সামন্ত। কাবুলে বসে শাগাদ স্থীয় প্রাতা কন্তুমের জগৎ-জোড়া যশের কথা শুনতে পেয়ে ইর্ষান্তি বোধ করছিল। ভাইকে ধূংস করে, নিজে খাতি লাভ করবে, এই আশায় শাগাদ কাবুল-রাজের সঙ্গে পোষণ করলো, কি করে কন্তুমকে ধূংস করা যায়। ষড়যন্ত্রের জাল নির্খুতভাবে পাতা হলো। কন্তুমের বৎশমর্যাদাবোধ আঘাত করেই সে ষড়যন্ত্রকে সফল করতে হবে।

উক্ত কাবুল-রাজকে শায়েস্তা করতে কন্তুম স্থীয় বাজধানী থেকে নির্গত হলেন। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী নতি স্থীকার করলো রাজা। এইবার উৎসব ও মণ্যযার পালা। কন্তুম চিরদিন মণ্যয়া-পাগল। আতা জাওয়াবাসহ কন্তুম স্থীয় বাখশকে চালিত করলেন মণ্যয়া ভূমিতে। কাবুল-রাজের বক্ষিত মণ্যযাভূমি শিকারে পরিপূর্ণ। ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন কন্তুম। ভাত্তশক্ত শাগাদ সেখানেই কন্তুম ও বাখশের জন্য কূরধার ছুরিকা, তীক্ষ্ণ-বন্ধু ইত্যাদি পরিপূর্ণ কৃপ খনন করে রেখেছে। নতুন-তোলা মাটির গঞ্জ পেয়ে বৈকে বসলো বাখশ, সে আর এগুতে চায়না। কিন্তু এই রম্য-কাননে কন্তুম কি নির্দিষ্য থাকতে পারেন? কমে চাবুক মারলেন বাখশের পিঠে উত্তেজিত দুরস্ত রাখশ রায়ুবেগে ছুটলো। সামেনই মৃত্যু-কৃপ। বীর ও বাহন কেউ রক্ষা পেলো না। বাখশতো গেলোই, বীরের ও বক্ষদেশ সহ সর্বাঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিবিহীন হলো। কন্তুম চেয়ে দেখলেন, অদূরে দীঁড়িয়ে অবিশ্বাসী শাগাদ তাঁর দিকে চেয়ে আছে। মবতে মবতে বীর টেনে নিলেন স্থীয় তৃণীর থেকে একটি তীব ও তাই ধনুকে সংযোজিত করে শেষ আঘাত হানলেন বিশ্বাসযাতকের প্রতি। শাগাদ মরলো।

ফেরদৌসী যেন কন্তুমের মৃত্যুর দিকে অঙ্গুল নিদেশ করে ইরানের সামাজিক অবক্ষয়কেই দেখিয়ে দিলেন। কন্তুম ইরানের প্রধানতম বীরই নন, কন্তুম ইরানের স্বর্ণযুগের প্রতাক। সেই স্বর্ণযুগের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, সামাজিক চরিত্রের অধোগতি সূচিত হয়েছে। শাগাদ ও কাবুল-রাজের ষড়যন্ত্র যেন বিশাল শাখা কেয়ানী তরুর মূলে কৃঠারাঘাত করলো।

ইস্ফেন্দিয়ার পুত্র বহুমন আরদেশীর উপাধি নিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা হুমায় পরমাসুন্দরী। তৎকালীন সীতি অনুযায়ী আরদেশীর স্থীয় কন্যা হুমাবকে বিয়ে করলেন। এই কন্যাই উত্তরাধিকার সৃতে লাভ করলো পিতার সিংহাসন। আরদেশীরের ঔরসে হুমায়ের গভর্জাত পুত্রের নাম দারাব। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত দারাবের জীবন কপাকথার কাহিনীর মত বিস্ময়কর। মাতা হুমায় নিজ হাতে দারাবকে ইরানের সিংহাসনে বসালেন।

এই দারাবের পুত্রের নামই দারা। ইতিহাসে সিকান্দরের সঙ্গে ইরান-রাজ এই দারারই মুক্ত হয়েছিল। 'শাহনামায় বলা হয়েছে সিকান্দর বা আলেকজাঞ্জারকে গ্রীকবাজ ফীলকুসের (ফিলিপস) উত্তরাধিকারী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলেও, তিনি বস্তুত ফীলকুস কন্যা দুরাবের পরিয়ন্তা স্ত্রীর গর্ভে দারাবেরই ঔরসজ্ঞাত পুত্র ছিলেন। এই কাহিনীর মাধ্যমে ফেরদৌসীর দেশাভ্যাস মন কি আলেকজাঞ্জারকে ইরানীয় বলে আপন করে নিতে প্রলুব্ধ হয়েছিল? কিন্তু সে যা-ই হোক, ইরানীয় সমাজ জীবনের অবক্ষয় বোধ করা সম্ভব হ্যানি। আলেকজাঞ্জার এক বিদেশী আক্রমণকারী কাপেই চিত্রিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে তার সেনাপার্তিগণের হাতেই ইরান নিজীত হতে থাকে। এই সময়টাকে কবি প্রায় তিনি শতকের শূন্যতা বলে অভিহিত করেছেন, এবং বলেছেন যে, এই সময় কালের মধ্যে ইরানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্বাধীন নৰপতি রাজ্য করেছেন।

অতঃপর দারাবের পলায়িত পুত্র সাসান ও বংশানুক্রমে তার অধস্তন চারপুরুষ, নামগোত্রাদীন উত্তের বাখাল ও মেষচারকরূপে হিন্দুস্তানে কাটিয়ে দেয়। অতঃপর সাসান নামেই দারা-বংশীয়

একজনের দ্বারা সামানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় ইরানে। সামানীয়দের অধীনে ইরানের কেন্দ্রীয় শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, দারা-সিকান্দরের আমলেই ইরান ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করেছিল। সামানীয় আমলের চারশো বছর ইতিহাসের আলোয় সম্পূর্ণ আলোকিত। এই আমলের শেষদিকে ইরান ও রোমের শক্রতা চরমে পৌছায়। সামানীয় বংশের মহাত্ম সম্রাট কাসরা নওশেরওয়ানের সময়ে বোমকরা ব্যাপক পরাজয় স্থীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

সামানীয় যুগে ইরানের প্রাচীন শৈর্য স্থিরিত হয়ে এলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইরান স্থীর আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম ছিল। কাসরা নওশেরওয়ানের উজির বুজুরচেমেহেবের মধ্যে ইরানীয় প্রতিভা যেন প্রতীকরণে আরোপিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশ হিন্দুস্তানের প্রেরিত 'শৎবঙ্গ' বা দাবাখেলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই বুজুরচেমেহেরই বুক্তে পেরেছিলেন। নওশেরওয়ানের ন্যায়পরায়ণতা, শৈর্য ও তাঁর দরবারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যেন বিশ্বের সামনে ইরানী সভ্যতা ও সমুদ্রতিকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছিল। নওশেরওয়ানের অস্তর্ধানের পর থেকেই ক্রমাবন্তি শুরু হয়ে যায়।

কাসরার পুত্র হরমুজদের বাজত্বকালে ইরান যুগপৎ তুর্কী ও রোমীয় আক্রমণের সম্মুখীন হয় এই সময় এক সামুরাজ বাহরাম চুবীনা প্রকটিত করেন তাঁর শৈর্য; ইরান আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

বাহরাম চুবীনার সঙ্গে ইরানের সিংহাসন নিয়ে বিবাদ বাঁধে খসক পারভেজের। কবি এখানে শিরী-খসকুর প্রগয়োপাখ্যান বিবৃত করেন। শিরীর যে প্রেমোপাখ্যান বাংলায় প্রচলিত 'শাহনামা'র কাহিনীর সঙ্গে তাঁর সর্বাংশে মিল নেই।

নওশেরওয়ানের পরে দ্রুত সম্রাটের পর সম্রাট ইরানের সিংহাসনে বসতে থাকেন। কুচিব বৈদ্যন্তের সঙ্গে বিলাস ও অন্যায়াচরণ সমাজে বিস্তার লাভ করে চলে। অবশেষে বাদশাহ ইয়াজদেগুরদের সময়ে কাদেসীয়ার রণাঙ্গণে নবোদিত ইসলামী শৈর্যের সামনে ইরান তাঁর দীর্ঘদিনের স্বাক্ষীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হলো। এই যুক্তে হরমুজদের পুত্র দ্বিতীয় কুস্তমকে ইরানবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। কুস্তম নক্ষত্র গণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, কাদেসীয়া-প্রাঙ্গণে আরবগণ যখন যুক্তের দামামা বজায়েছে, তখন ইরানের ভাগ্য নক্ষত্র অপ্রসন্ন। তিনি তখনই জ্যোতিষী গ্রহ টেন নিয়ে আবার নক্ষত্রের অবস্থান পাঠ করে নিলেন, তারপর মাথায় হাত দিয়ে সবিলাপে বললেন, — ইরানের দুর্দিন অত্যাসন্ন এবং সামানীয় বংশের পতনের আব দেবী নেই। কুস্তম (দ্বিতীয়) বীরত্বের সঙ্গে মুক্ত করে কাদেসীয়ার প্রাণত্যাগ করলেন।

ইয়াজদেগুর্দ দজলা তীব্রের রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলেন দূর খোরাসানে, সেখানে থেকেই রাজ্যেকারের সঙ্কল্প নিলেন বাদশাহ। চীনের ফগহুরের সাহায্য ও পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সকল আশায় বাদ সাধলো ভাঁকে তুর্কী অভিজ্ঞত। ইরানের এই দুঃসময়ে ইরানের সিংহাসনের স্বপ্ন দেখলো সে। ইয়াজদেগুর্দ অত্যন্ত নৃশংসভাবে মাহয় নামক সেই তুরানের হাতে নিহত হলেন। এই নৃশংসতার প্রত্যুষে বীর সেনাপতি বেষনের হাতে মাহয় পরাজিত ও নিহত হলো।

'শাহনামা'র কাহিনী এখানেই শেষ হয়েছে। ফেরদৌসী অনাগত ভবিষ্যতের মুখের দিকে চেয়েই মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি ঢানলেন। কবি অবশ্য এখানে কোন আশার বাণীই শোনাতে পারেন না, কারণ বাস্তব তাঁর সমর্থক নয়, — কবির জীবনেরও অস্তগমনের কাল তখন ঘনিষ্ঠে এসেছে। কিন্তু প্রশ্ন

বাইলো, কাল কি স্বত্ত্বানে দাঁড়িয়ে থাকে কোনদিন? সূর্যাস্ত কি সূর্যোদয়ে পরিবর্তিত হয়ে আবার দুনিয়াকে নবজীবনে উত্সাপিত করে না?

[ ৫ ]

বীরবস-প্রধান 'শাহনামা'র মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের ঘনবন্ধনা ও শূর-সিংহদের হৃষ্ণার অব্যাহত থাকবে, তাতে আশৰ্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যুদ্ধ ও রাজনীতির উচ্চনিনাদ মাঝে মাঝে থেমেও গেছে তখন শোনা গেছে উৎসবের কলরব, মগয়া ভূমিতে শিকারের পশ্চাদ্বাবনরত অশু ক্ষুরের ধূনি, বসন্ত-বাসিত উপবনে বিশ্রামালাপ কিংবা কোন জনমনোহারী নায়কের ম্যাতৃতে মর্মাণ্ডিক আর্তনাদ।

'শাহনামা'র জগৎ যেমন বাস্তব, তেমনই বিস্ময়কর। কাব্যময় সেই-জগতে দীর্ঘ পরিভ্রমণ ও তার উপভোগের সকল ব্যবস্থাই যেন কবি করে বেঞ্চেছেন। তাই কাব্যের পবন-উপত্যকায় একবার প্রবেশ করলে আর ফিরে আসতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, আমরা এক সহায় বন্ধুর হাত ধরে কলনাদিনী স্বোত্তরিনীর তীর বেয়ে কত কি দেখে শুনে ও উপভোগ করে এগিয়ে চলেছি।

তাই, আমরা দেখি যে, ইতিহাসের চলমানতা, বর্ণনার আবেদনে, নাটকের বিস্ময়কর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গীত ধূনির নিয়ঙ্গেন ইত্যাদি বৈচিত্র্য একাধারে 'শাহনামা'য় পরিবেশন করা হয়েছে। মনে হতে থাকে, ফেরদৌসী যেন কবি-প্রতিভার গোটা সম্ভাবনাকেই তাঁর মহাকাব্যে উন্মোচিত করেছেন, কোন কিছুই বাকী রাখেননি। কবির উদ্দেশ্য হলো, তাঁর স্বদেশের মহসু, বীরত্ব ও সৌন্দর্যকে ক্রমান্বয়ে উন্মেচিত করা। ইয়ান তাঁর স্বদেশ, কিন্তু সে ইয়ান কালের স্বোতে অবগাহন করে নিয়ত নবীভূত হচ্ছে। এই নবীভবনের সত্যই 'শাহনামা'র সব চাইতে বড় সত্য। তাই মহানায়ক কুস্তমের পরে যখন আলেকজাঞ্চারের আক্রমণের মুখ ইরানভূমি অসহায়, — আলেকজাঞ্চারের জ্ঞানচার্চা ও অনুসন্ধিৎসা কবির সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাঁর মনে হয়, এই বিশ্বব্রহ্মে আলেকজাঞ্চারের সঙ্গে তাঁর স্বদেশের 'যেন' রক্ত সম্পর্ক রয়েছে। অর্ক আবেগে স্থানকে আঁকড়ে থাকার জড়তা নয়, জ্ঞানের পথে কালের প্রবাহ ধরে অগ্রসর হওয়ার আনন্দই 'শাহনামা'র প্রধান আনন্দ। সেজন্যই সম্ভবত 'শাহনামা'য় প্লটের কোন একত্র নেই। শিথিল সৃতে সম্পর্কিত কাল সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপপুঁজের বিরামহীন চলচিত্রই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

সমালোচকগণ 'শাহনামা'কে 'এপিক'-গোত্রের মহাকাব্য বলেছেন। কালের দিক দিয়ে অর্বাচীন ও একক প্রতিভার মহাদান হওয়া সত্ত্বেও 'এপিক' কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততা ও বহুমুখিতা একে 'এপিকে'রই পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বীরবসাশ্রিত এই কাব্যের নায়কগণ কোন নিয়ন্ত্রণ-নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার জন্যে নয়, বাস্তব অবস্থারই চাপে ও মানবিক মূল্যবোধের সংরক্ষণে যুক্তক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংগ্রামকে রহস্যাবৃত রেখে নাট্য-সম্ভাবনাকে ঝুলিয়ে রাখার অভিপ্রায় 'শাহনামা'র কূত্রাপি দেখা যায় না। বরং সত্য না মিথ্যা কেন্টা জয়ি হয়, — জয় সাময়িক না সত্য সমর্পিত? — 'শাহনামা'র নটিকীয়তা এমন সব প্রশ্নের উপরই প্রধানত নির্ভর করে।

আগে বলেছি, ফেরদৌসী তাঁর মহাকাব্যে সকল সম্ভাবনাকেই উন্মোচিত করেছেন। বীর রসের সঙ্গে বাংসল্য বস, করুণ বস, আদি বস, বীভৎস বস সব কিছুই এসেছে। কিন্তু 'শাহনামায় বীর বসের বিপরীত বস হলো করুণ বস। এই করুণ বসই সেখানে বৈচিত্র্য এনেছে। এই বসের অবতারণার

দ্বারাই কবি তাঁর চরিত্রগুলোকে সম্পূর্ণ ও বলয়িত করেছেন। 'রামায়ণে' করুণ বস আছে ; 'মহাভারত' ও 'ইলিয়ড-অডেসীতেও আছে। কিন্তু 'শাহনামা'র বিশাদাত্মক অঙ্গগুলিতে মানবিক আবেদন এত অনাবিল, সার্বজনীনতা এত অবাবিত যে, মানব-জীবনের অনিত্যতার স্মৃতি হয়েও, তা পাঠকের হস্যমনকে সর্বকনুম্যমুক্ত এক সমনুভিতে সমাপ্তিন করে দেয়।

আমরা এরজ ও সিয়াউশের মতৃর মধ্যে যখন ফুলের মত পবিত্র ও নিষ্কলৃষ্ট প্রাণের বক্ত প্রবাহিত হতে দেখি, তখন ত্ব-সূলম ও আফ্রসিয়াবের অন্যায়কে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। যে কোন মানুষের মন তখন পবিত্রতার অস্তর্ধানে হাশাকাব কবতে থাকে। বালক সোহৃদাবের জন্য মাতা তহশিলার বিলাপ দুনিয়ার সকল দেশের মানুষেরই বিলাপ হয়ে দেখা দেয়। কেবলই মনে হতে থাকে, কৃত্তম যদি অহঙ্কারের বশবতী হয়ে তাঁর পরিচয় গোপন না রাখতেন, তবে এই মহাসর্বনাশ ঘটতো না। গুশ্তাসপ্ত-পৃত ইসফিদিয়ারের জন্য দৃঢ় হয় এজন্যে যে, তাঁর বীরত্ব, সৌজন্য ও ধর্মপ্রাণতা অনাবিল। তিনি শুধু স্বাধ্যপ পিতাব আনুগত্যবশেষই তকুণ বয়সে সে-জীবন বিসর্জন দিলেন। পাঠকমাত্রই এরজ ও সিয়াউশের পবিত্রতার, সোহৃদাবের পিতৃ-সঙ্গানী দৃষ্টির ও ইসফিদিয়ারের ন্যায়পরায়ণতার সমনুভিতে মীত হয়। 'শাহনামা'র মধ্যে করুণরসের এই অপূর্ব কপালণ বিশ্ব-সাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে।

চরিত্র-চিত্রণে ফেরদৌসী দক্ষ শিল্পী। দুনিয়ার যে কোন মহাকবির সৃষ্টি চরিত্রের চাইতে সংখ্যায় তাঁরা কম নয় ; মানবিক দোষে-গৃণে হীন নয়, শৈর্য-বীর্যে খাটো নয় ও প্রেমে সহানুভূতিতে অনুজ্ঞল নয়। এইসব চরিত্রের গভিতে কবি মানব-জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আবিত্তি করেছেন। বাইরের ঔশ্যের সঙ্গে ভিতরের দীনতা বাইরের প্রতিকূলতার মধ্যে ভিতরের সৌন্দর্য সমান দক্ষতার সঙ্গে অবাবিত হয়েছে। অবিশ্বাস করাব এতটুকু অবকাশ কোথাও নেই।

কিংবদন্তীর মধ্যমণি বাদশাহ জহমসেদ পৃথিবীকে দান করেছিলেন আইন ও শৃঙ্খলা। জ্ঞান ও শিক্ষের সম্পর্কে তাকে তিনি সাজিয়েছিলেন। অশুভ ও অকল্যাণের শক্তিগুলি তাঁর শাসনে পরাবৃত্ত ও শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এই সরপ্রাপ্তির মধ্যেও তাঁর অস্তরে লুকিয়েছিল যে আদি পাপ — তাই হয়েছিল তাঁর পতনের কাবণ। তিনি নিজেই শুধু তাতে মরেননি, মেরেছিলেন গোটা ইরানকে। সীরাদিনের জন্য ইরানের ভাগ্যসূর্য রাঙ্গাছত্ব হয়েছিল, বিদেশী পাপাচারী জোহাকের দ্বারা।

অতঃপর সর্পস্বক্ষ জ্বালেম জোহাকের পতন হলো তারই দুর্ক্ষর্মের জন্য। তারই কর্মফল থেকে মন্ত্রকে ওলন করলেন মহামতি ফাবেদূন। এই মহানুভব সম্মাট ফাবেদূনের মধ্যেই আবার কেয়ানী বাজ্বৎশেবের জয়ত্বার সম্ভব হলো।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের পতন এই মূল্যবোধের সচেতন প্রয়োগ যে 'শাহনামা'র কোন চরিত্রকেই মানবিক দিক থেকে এতটুকু খাটো করেনি, কবির অসীম শক্তিমত্তা তারই নিদর্শন। গ্রীক মহাকাব্যের নিয়মিতি ও অলিম্পিয়ান দেবতাদের ইচ্ছার স্থান দখল করেছে ফেরদৌসীর মূল্যবোধ। এখানে বাইরের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয়নি, চরিত্রের দুর্বলতাই নায়ক নায়িকার অস্তরে তাদের সবনাশের বীজ উৎপন্ন করেছে, তাকে টেনে নিয়ে গেছে মহাত্মী বিনষ্টির দিকে। শক্তিমান চরিত্রগুলিরও পতন তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এখানে ফেরদৌসীকে সফোক্সিস ও সেৱপীয়বের সমগোত্রীয় প্রতিভা বলে মনে হয়। কোন চরিত্রের প্রতিই কবির কোন পক্ষপাতিত্ব নেই — সৃষ্টির মমত্বোধ ও সহানুভূতি নিয়েই তিনি তাদের অনুসরণ করেছেন। এই তন্মুহ দৃষ্টিই ফেরদৌসীকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ

কবিদের সমর্মযাদা দান করেছে। ইরানের পৰম শক্তি পাপাচারী যে আফ্রাসিয়াব, তাকেও শেষ পর্যন্ত স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুত্পন্ন দেখা যায়। তার অসহায় অবস্থাও পাঠকের মনে সহানুভূতির সঞ্চার করে। কিন্তু পাপ তাকে রেহাই দেয়নি। মূল্যবোধের 'নিয়তি নির্ধারিত' পথে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। এবজের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয়েছে মনুচেহেরের বিজয়ের দ্বারা। সিয়াউশের নিষ্কলৃষ্ট বক্তু প্রকালিত হয়েছে কায়খসকুর মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের স্পর্শে। কায়কাউসের পাপীয়সী মহিমী সুন্দরী মোহিনী সওদাবার শাস্তি কেড়ে ঠেকাতে পারেনি। অর্থচ জোহাকের শোণিত যার ধমনীতে প্রবাহিত সেই কুদাবা পুরুষকৃত হয়েছেন তাঁর নিষ্কলৃষ্ট প্রেমের জন্য। তিনি হয়েছেন 'শাহনামা'র মহানায়ক কৃত্তমের সম্মানিতা জননী। সাহী তহমিনার জন্য কবি আমাদের মনে চিরকালের জন্য জ্বালিয়ে রেখেছেন সহানুভূতির সুর্যকাণ্ঠ মণি।

বিশু যেমন সুন্দর, প্রতিদিনের সৃষ্টিদয় যেমন বাত্রির কালিমাকে বিদ্ৰিত কবে, তেমনই মানব নিয়তি পাপের খোলস ত্যাগ কবে বাববাব নবজীপ আবিৰ্ভূত হয়। আশাবাদী কবির অস্তর যেন এক মৰমীয় অনুভূতির স্পর্শে বাব বাব উজ্জীবিত, জ্ঞাগ্রত। তাই 'শাহনামায় সৃষ্টিদয়ের কত ছবি! প্রত্যেকটি সৃষ্টিদয় বিশিষ্ট, প্রত্যেকটি সৃষ্টিদয় অর্থবহ ও ইঙ্গিতময়।

'শাহনামায় মহানায়ক কৃত্তম। কবি তাঁকে শৌর্যে-বীর্যে, শক্তিমন্ত্রায়, সুবিচেচনায় ও আড়ম্বরে মহিমান্বিত করে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু তাঁকেও মূল্যবোধের কাঠগড়ায় এনে তিনি দাঢ় করিয়েছেন। স্বীয় চরিত্র থেকে উৎসারিত পাপের শাস্তি কৃত্তমকেও পেতে হয়েছে। সোহৰাবের শৌর্যের সামনে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন, অহঙ্কারে জ্বলে উঠে গোপন করেছেন আত্ম-পরিচয়। এ পাপের শাস্তি বড় নির্মম, বড় হস্য-বিদারক — কৃত্তম পুত্রহস্তা ও আত্মানীপিড়ক হয়ে তার ভাব নিজের শিরে বহন করেছেন।

মূল্যবোধের প্রতি এই শুন্ধা 'শাহনামার সর্বত্র অনুস্মৃত। কিন্তু এই মূল্যবোধ কোন চরিত্রেই আবোপিত নয়, অর্থ কোন চরিত্রই তার প্রভাব-বলয় অতিক্রম করতে পারেন।

ইসলামের মূলনীতি একেশ্বরবাদের দিকে ফেরসৌসীর দৃষ্টি ছিল নিনিমেষ। ইরানের প্রাচীন ধর্ম জ্বরয়েন্ত্রীয়বাদও 'শাহনামায় ইসলামী একেশ্বরবাদেই অন্যকপ হয়ে দেখা দিয়েছে। ইরানের সপ্তাটিগণ জ্যোতিষী গণনায় যে-তথ্য প্রকটিত করেন, তা ন্যায়পর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতকেই সৃচিত করে। 'শাহনামার পাপাচারী চরিত্রগুলি নিজের প্রবৃত্তির তাগিদেই পাপ-পথে বিচরণের প্রয়াসী হয় — নক্ষত্রবিচার ও স্বপ্নদর্শনের ইঙ্গিতকে তাবা প্রবৃত্তির বশেই অঙ্গীকাব কিংবা পাশ কাটিয়ে চলতে চেয়েছ।

'শাহনামার বণক্ষেত্রগুলি বিপুল-প্রসাব। সেখানে দক্ষিণ ও বাম — এই দুই বাহুতে সৈন্যদলকে যুক্তার্থ সজ্জিত করা হয়, মধ্যভাগে বিরাজ করেন সম্মুট স্বয়ং কিংবা প্রধান সেনাপতি। যুক্তারস্তের পূর্বে নামকরা বীরদের দৈরিথ যুদ্ধ হয় তাৰপৰ শুরু হয় সম্মিলিত সংগ্রাম। বড় ভয়াবহ সেই বণক্ষেত্র—সেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত হয় ; সৈন্যদেব পদতাড়িত ধুলায় আকাশে মেঘ করে আসে ; প্রহরণ ও তৰবারি বিদ্যুতের মতো চমকাতে থাকে তীব্র ও বশাব বারিবৰণ শুরু হয়ে যায়। দুর্গে সুরক্ষিত থেকে যুদ্ধ কৰাব বৰ্ণনা ও 'শাহনামায় আছে। সে যুক্তে 'মুনজ্জনীক' যন্ত্র দ্বাবা অগ্নিবংশী গোলাগুলীৰ সাহায্যে নগব-প্রাচীৰ ভগ্ন কৰতে হয়। বিজিত নগৱীৰ গহগুলি অগ্নি সংযোগে ভস্তীভূত কৰাব ও সেখানে দোমেৰ শলে বিবেচিত হয় না।

অবসর সময়ে ও যুক্তিয়ের পর যখন পানাহারের উৎসব বসে, তখন সম্মাট ও বীরগণ মগয়ায় বহিগত হওয়ার কথা ও ভাবেন। ‘শাহনামার প্রাকৃতিক দশ্য বড় মনোরম। সেখানে উপত্যকায় ও রম্য উপবনে হরিণদল বিচরণ করে। কোথাও প্রবাহিত হয় কলুকলু নাদে স্নোতশ্বিনী। ঢেউ তোলা বড় নদী আমুদবিয়া পার হতে হলে নৌকার প্রয়োজন হয়। দূর্ঘম অবণ্যে আজদাহাও দৈত্যরা বাস করে বলে প্রকৃতির বদান্যতা কখনো কখনো ভয়ে সঞ্চৃত। কিন্তু মানুষের শৌর্যের সামনে দানবীয় সকল শক্তিই শেষ পর্যন্ত পরাভৃত হয়। পথ চলার জন্য সেকালের লোকে অশ্ব ও উষ্ট্রের ব্যবহার করতো। মুক্তক্ষেত্রে সম্মাটদের ‘জুলুসে’ ব্যবহৃত হতো মদমত করীদল।

ইরানের রাজকল্যাণ ও অভিজাতকন্যাগণ প্রায়শই প্রেময়ী হতেন তাঁরা পরিত্র ও অপাপবিধি। কুটিল ও দুর্চরিতা নারীরা তাদের পাপের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতো। কুমারী কন্যাগণ অঙ্গঘূর্ষণবিস্মী হতেন। সম্মাটের মহিলাগণ মাঝে মাঝে সম্মাটের পরামর্শদাত্রীরাপে কাজ করলেও কখনো যুক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যুক্ত করতেন না। হ্রামের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা কদাচিং সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করলেও সম্মাটের পুত্রগণই উত্তরাধিকারী রূপে বিবেচিত হতেন। উজির, সভাসদ ও সামন্ত রাজগণের মাধ্যমে সম্মাট প্রজাপালন করতেন। ঐতিহাসিক যুগে সম্মাট নওশেরওয়ানের সময় ভূমি-রাজস্ব এক স্থির প্রতিক্রিয়া উপর স্থাপিত হয়েছিল।

‘শাহনামায়’ দরিদ্র ও প্রজাসাধারণ মানবীয় দোষে-গুণে মানুষ। কবি তাঁদের অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। ‘শাহনামায়’ বলা হয়েছে যে, সেকালে সুগন্ধদ্রব্য ও মগনাভি ব্যবহৃত হতো। সম্মাট ও রাজন্যবর্গ রেশমের তৈরী ও স্বর্ণসূত্রে বোনা কিংখাবের পর্য ব্যবহার করতেন। তাঁদের নিপোর জন্য রচিত হতো সুকোমল শয়া। সুবাপান ভোজের অঙ্গস্বরূপ ছিল। ন্যতগীতের জন্য সুন্দরী নারীগণ নিষিট ছিল। হেরেমে তারা রক্ষিতা রূপে অবস্থান করতো। ‘শাহনামায়’ ইরানীয় সম্মাটগণ রোমক দেশীয় কিংখাব, চীনদেশীয় কৌশিক ও হিন্দুস্তানী তরবারিকে মৃল্যবান বলে মনে করতেন। দাস-দাসীদের সঙ্গে সম্মাট ও অভিজাতগণ সহাদয় ব্যবহার করতেন।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের সঙ্গে যুক্ত ব্যাপত থাকলেও হিন্দুস্তানের সঙ্গে ইরানের কোন শক্রতা ছিল না। হিন্দুস্তান জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশ বলে ইরানে পরিচিত ছিল। হিন্দুস্তানের রাজন্যবর্গ শৌমেবীয়ে খ্যাতিমান না হলেও তাঁদের অতিথি-বাস্ত্রে প্রশংসনীয় ছিল। ইরানের কোন শাহজাদা রাজ্য হারালে হিন্দুস্তানে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। সম্মাট নওশেরওয়ানের সময়ে যে-হিন্দুরাজার উল্লেখ দেখা যায়, তিনি যেমন তীক্ষ্ণধী ছিলেন তেমনই ছিলেন শাস্তিপ্রিয়। জ্ঞানীশ্বরে আলবেকনীর হিন্দুস্তান বিবরণ সন্তুত ফেরদৌসীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

‘শাহনামা’ কাব্য ষাট হাজার শ্লোকের এক বিবাটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আগাগোড়া একই ছদ্ম ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি শ্লোক সমিল। এই সমিল ছদ্ম ‘শাহনামায়’ বর্ণনা সংলাপ, স্বগতোক্তি, পত্রালাপ সর্বত্র সমান কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ট্রিচানিকায়’ দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের পাঠ্যকদের কাছে এই ছদ্ম একবৈধেয়ে বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বস্তুত তা কি সত্য? প্রবহমান এই ছদ্মে শব্দের বৈচিত্র্য যে-শুনির ঝঙ্কার ও মাধুর্য সৃষ্টি করেছে, তা সকল রকম বর্ণনা ও ভাব প্রকাশেরই সহায়ক হতে পেরেছে। যুক্তের বর্ণনায় যে-চিত্র নিমিত তার সঙ্গে শুনির সংঘাত এমন করে বেঝেছে’ যে, মনে হয়েছে তরবারির চলন আমরা শুনতে পাচ্ছি; তীরের উড়ে যাওয়া কানে বাজছে, দুর্দুতির আওয়াজ বায়ুমণ্ডলকে প্রকশ্পিত করেছে। ঠিক তেমনি করে শুনিত হয়েছে মগয়াক্ষেত্রে হরিণের

গতিবেগ,— স্মোত্তিষ্ঠনীর কলনাদ ও প্রেমালাপের মাধুর্য। শব্দ সংগঠনের নিপুণতার মধ্য দিয়ে কান ও মন উভয়কেই সচাকিত ও সঞ্চারিত করে শব্দিত ও ঝঞ্চুত হয়েছে 'শাহনামা'র এই প্রবহমান ছবি। তাই, এর বিপুল দৈর্ঘ্য এতটুকুও পীড়িদায়ক বলে আমাদের মনে হয়নি।

কাব্যের ভাষাস্তর সহজ নয়। কাবণ কবির ভাব ও বর্ণনা প্রধানত শব্দকে আশ্রয় করে থাকে। একথা গীতি-কাব্যের বেলায় যেমন সত্য, বর্ণনামূলক মহাকাব্যের বেলায়ও তেমনই। 'শাহনামা' এক বিশ্ব-বিশ্বৃত মহাকাব্য; তার শব্দ ও ছবি-মাধুর্য অনুপম। আমার ধারণা, এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের উচিত, নিজের মধ্যে মূল কাব্যের ভাব-বস্তুর পুনঃনির্মাণ দ্বারা যে ভাষায় অনুবাদ তা করতে হবে তার গোটা শব্দ সম্পদকে কাজে লাগাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। অনুবাদ গদ্দে হোক কিংবা পদ্দে, এছাড়া গত্যন্তর নেই। বর্তমান অনুবাদে আমি প্রতিটি শ্লোক ধরে তেমনভাবেই অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছি।

'শাহনামা'র ভাষা ক্লাসিক্যাল ফারসী। পরবর্তীকালে এই ভাষায়ই নিজামী, রুমী, জামী প্রমুখ কবিগণ তাঁদের কাব্য বচন করেছেন। তবে বিষয়বস্তুর গুণে ফেরদৌসীর ভাষায় আবর্তী শব্দ কর এসেছে। ফারসীর যেসব পারিভাষিক শব্দ মুসলমানী রীতি-নীতির প্রকাশক হয়েছিল, 'শাহনামা'য় সেগুলি মূল অভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'নামাজ' শব্দ। 'নামাজ' দ্বারা ফেরদৌসী বাদশাহের সামনে 'মাথা নত করা' কিংবা 'দণ্ডবৎ হওয়া' অর্থই বুঝিয়েছেন।

অনুবাদে মূলের প্রতিটি শ্লোককে দু পংক্তিতে সাজিয়েছি; তবে কদাচিং অর্থের সংহতির জন্য একটি শ্লোককে চাবটি পংক্তিতে কিংবা দুটি শ্লোককে দুটি পংক্তিতে বিন্যস্ত করেছি; কিন্তু এমন উদাহরণ খুব কম।

ভাষাস্তরে আমরা গাস্তীয় রক্ষার প্রয়োজনে তৎসম শব্দ একটু বেশী ব্যবহার করেছি। প্রাচীন ইরানীয় অস্ত্রশস্ত্র সংস্কৃত মহাকাব্যগুলিতে বর্ণিত আযুধেরই প্রায় অনুরূপ, কাজেই পাশ, গদা, তীর-ধনুক এসেছে। 'মুনজ্জনীকে'র কোন সংস্কৃত আযুধের কথা আমার জান নেই; সেটিকে অন্যরূপে ভাষাস্তর করতে হয়েছে। কৌশিক বস্ত্র ভারতীয় সাহিত্যে পরিচিত হলেও স্বর্ণসূত্র নির্মিত 'কিংখাব' এদেশে প্রচলিত ছিল না বলেই মনে হয়েছে। 'রুস্তম' 'জোহাক' 'জমশেদ' 'তহমিনা' প্রভৃতি 'শাহনামা'র চিরিত্রগুলি বাংলায় পরিচিত। প্রচলিত উচ্চারণগুলিতে গ্রাম্যতা দোষ নেই বলে মনে হয়েছে। তাই 'জোহাক' না লিখে আমি 'জোহাকই' লিখেছি; 'রুস্তাম' না লিখে লিখেছি 'রুস্তম'।

অনুবাদের জন্য আমি 'শাহনামা'র ইরানীয় সংস্করণটিই ব্যবহার করেছি। তবে যেখানে সংশয় দেখা দিয়েছে, সেখানে ভারতীয় সংস্করণ আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

'শাহনামা'র মতো বিরাট এক গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে বাংলা একাডেমী একথাই আবার প্রমাণ করেছেন যে, তেমন দায়িত্ব একমাত্র তাকেই শোভা পায়।

ঢাকা

১২-৪-৭৬

মুনজ্জনীকে

## বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা

প্রাণ ও প্রজ্ঞার প্রভুর নামে শুরু করি,  
অতিক্রম করতে পারে না কল্পনা তাঁর নামের সীমা ।  
প্রভু তিনি নামের, প্রভু তিনি স্থানের,  
তিনিই আহার্য দান করেন, তিনিই পথ দেখান ।  
তিনি প্রভু পৃথিবীর ও ঘৃণ্যমান আকাশের,  
চন্দ্ৰ-সূর্য ও শুক্রতারা আলো পায় তাঁর থেকে ।  
বৰ্ণনা, ইঙ্গিত ও ধাৰণার উৰ্ধে তাঁর অবস্থান,  
চিৰকৱেৰ সৃষ্টিৰ তিনি মূলতত্ত্ব ।  
সৃষ্টি জীবেৰ রক্ষণে তিনি সদাতৎপৱ,  
তাঁৰ অস্তিত্বে সংশয়াপন্ন ব্যক্তিৰ দুঃখও তিনিই দূৰ কৱেন ।  
কল্পনা পথ পায় না তাঁৰ মধ্যে ;  
কাৰণ, নাম ও স্থানেৰ বাইৱে তিনি ।  
কিন্তু বাণী থেকে নাম ও স্থান অন্তর্হিত হলৈ  
প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুই-ই স্তুতি ও নিশ্চল হয়ে যায় ।  
তাই, প্রজ্ঞা ভাষাকে নিয়োজিত কৱে  
অমৃতকে চাক্ষুষ কৱার জন্যে ।  
তিনিই রক্ষা কৱেন প্রাণ ও প্রজ্ঞার ভাৱসাম্য ;  
উষৱ চিন্তায় কি তাঁকে ধাৰণ কৱা সম্ভব ?  
তাঁৰ প্রশংসা কীৰ্তনেৰ রীতি কাৰো জানা নেই,  
সম্পৃষ্ট থাকতে হয় তাঁৰ বন্দেগীৰ মধ্যেই ।  
এইমাত্ৰ উপকৰণ ও ভদুৱ প্রাণকে সম্বল কৱে  
কে পারে রচনা কৱতে প্রশংসাৰ্বাণী স্ফটার জন্য ?  
প্ৰফুল্ল হও তুমি তাঁৰ অস্তিত্বে  
নিৱৰ্থক বাক্-বিস্তাৱ থেকে মুক্ত হয়ে ।

## জ্ঞানের শুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধান্বিত হও ও পথ অনুযোগ কর  
এবং তাদের নির্দেশে গভীর অন্তর্দেশে কর দৃষ্টিপাত।  
জ্ঞান যে আহরণ করেছে সেই হয়েছে ক্ষমতাবান,  
জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানাগ্রস্ত প্রাণ ফিরে পেয়েছে তার ঘোবন।  
কবিতার আসর এই ঘহলের বাইরে নয়,  
কল্পনা জ্ঞানের পরিধির বাইরে কখনো পা রাখতে পারে না।  
এই সীমার ভিতরেই ওগো বুদ্ধিমান,  
বাণীর সঙ্গে কর দৃষ্টি-বিনিময়।  
বল, কি আছে? — নিয়ে এসো জ্ঞান থেকে,—  
শ্রবণ তার সঙ্গে মিলনের জন্য অস্থির।  
বিশ্ব-প্রভুর দানের মধ্যে জ্ঞান সব চাইতে বেশী মূল্যবান,  
জ্ঞানের শুণ-কীর্তন বদান্যতার পথে শ্রেষ্ঠ উপায়ন।  
জ্ঞান সত্যাটদেরও সত্যাট,  
জ্ঞান সম্মানিতগণের অলঙ্কার।  
জ্ঞেনে রাখ, জ্ঞান জীবন্ত ও চিরঞ্জীব,  
জ্ঞেনে রাখ, জ্ঞান জীবনের পুঁজি।  
জ্ঞান পথের দিশারী ও হৃদয়-মুক্তকারী,  
জ্ঞান হস্তধারণকারী বর্তমানে ও ভবিষ্যতে।  
তার থেকে আনন্দ, তার থেকেই দৃষ্টি,  
তার থেকে উৎকর্ষ, তার অভাব থেকেই খর্বতা।  
জ্ঞান অন্ধকার ও জড়ত্বকে দান করে আলো ও চলমানতা,  
কাল উৎফুল্ল হয় না জ্ঞানের স্পর্শ না পেলে।  
কি সুন্দর বলেছেন তত্ত্বজ্ঞ ও ধীমান ব্যক্তিগণ—  
ভাষার পক্ষ তাড়নেই জ্ঞান হয় উর্ধ্বাংতি।  
জ্ঞানকে যে বিদ্যায় করেছে নিজের সামনে থেকে  
সে তার অন্তরকে করেছে দুষ্ক্ষতের আগার।  
ভাবোন্মাদ ও স্থির-বুদ্ধি দুই-ই তাকে করে আহ্বান,  
দুই-ই তার সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবক্ষ।

জ্ঞানের মধ্যে নিহিত রয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাগ  
শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রজ্ঞা তার সাহায্যেই লাভ করে মুক্তি ।  
জ্ঞান প্রাণের চক্ষুস্বরূপ ;  
এই দুনিয়ার ভোগ—নন্দনে জ্ঞান ছাড়া তুমি অক্ষ ।  
প্রত্যক্ষ কর জ্ঞানকে— সৃষ্টির প্রথম দিনেই যার জন্ম ;  
রক্ষক সে প্রাণের, প্রহরী সে ত্রিপথের ।  
তোমার ত্রিপথ চক্ষু কর্ণ ও রসনা,  
এই তিন পথেই পুণ্য ও পাপ প্রবেশ করে অন্তরে ।  
চেতনা ও প্রাণের প্রশংসা কে কীর্তন করবে ?  
যদি আমি করি, তবে কে করবে তা কর্ণগত ?  
প্রকাশহীন জ্ঞানরাজি কোন কাজে লাগবে না,  
আনো তবে বাণী ;—সৃষ্টি তো প্রকাশেরই নামান্তর ।  
ওগো উদ্বৃলিত বাণী তুমি বিশ্ব-স্মৃষ্টার শিল্প-কর্ম,  
গোপন ও প্রকাশ উভয়কেই তুমি আলিঙ্গন করে আছ ।  
জ্ঞানের সহায় চিরকাল তুমিই,  
অজ্ঞানতার অক্ষমতাকে তুমিই কর বিদুরিত ।  
বাণীর সহায়তায় জ্ঞানীগণ করেন নৃতন পথের অন্বেষণ—  
পথ হাঁটেন পথিকীর, ও মানুষের চেতনাকে করেন আলোকিত ।  
তাই জ্ঞানীদের মুখ থেকে যখন বাণীর সম্পদ কর কর্ণগোচর  
তখন গুণ্ঠিত কর কালকে সুললিত সঙ্গীতের ধ্বননে ।  
বাণীর শাখা যখন ফুল্ল দেখ  
তখন জেনো, জ্ঞান আর সংগোপনে থাকবে না ।

## বিশ্বের সৃষ্টি প্রসঙ্গে

সৃচনাতে জেনে রাখা চাই  
সৃষ্টির মূলতত্ত্ব।  
প্রকটিত করেছেন প্রভু সৃষ্টিকে অনন্তিত্ব থেকে,  
অপ্রাপ্য থেকে উত্তৃত করেছেন প্রাণ ও শক্তিকে।  
তার থেকে এসেছে চারটি মূলবস্তু —  
লালিত হয়েছে তারা নিরালম্ব নিঃসম্বল।  
প্রথমটি অগ্নি-উজ্জ্বল ও তাপ বিকীরণকারী,  
দ্বিতীয় বাতাস, তৃতীয় পানি, চতুর্থ অঙ্ককার মৃত্তিকা।  
প্রথমে অগ্নিতে সৃষ্টি হলো কম্পন ও সে হলো গতিমান,  
তার তাপে পানিতে জাগলো শুক্ষ তটভূমি।  
তার থেকে ধীরে ধীরে শীতলতা মাথা তুললো,  
পরে জন্ম নিলো আর্দ্রতা — ছড়িয়ে পড়লো সে দিকে দিকে।  
যখন এই চারটি মূল বস্তু স্থিতি লাভ করলো এইভাবে,  
তখন বসবাসের যোগ্য হলো এই ধরিত্রী।  
একটি মূলবস্তু অন্যটিতে প্রবিষ্ট হলো,  
ফলে মাথা তুললো আরো অনেক নব নব বিশ্ময়।  
জন্ম নিলো এই অচিস্ত্যনীয় গতিশীল গগন-গম্বুজ,  
বিকশিত হয়ে চললো কত না নতুন কীর্তি !  
সজ্জিত হলো ধূমায়মান মেঘমালা বরের বেশে,  
উপযুক্ত ধরিত্রী-কন্যাদের করলো পাণিগ্রহণ !  
বেদনা করুণা ও বদান্যতা জন্ম নিলো,  
বদান্যতা দানের হস্ত প্রসারিত করলো দুর্বলের দিকে।  
মহাকাশ তার মহা আলিঙ্গনে ধারণ করলো শুরুপরম্পরা,  
তাদের ঘূর্ণনের সঙ্গে দৃঢ়বন্ধ হলো কর্ম ;  
নদী পর্বতমালা সমভূমি ও মরুপ্রান্তর—  
ধরিত্রী সুশোভিত হলো শিল্প-সুষমায়।  
পর্বত-শৃঙ্গে লগ্ন মেঘের নীচে মাথা তুললো  
সবুজ পত্রমঞ্জরীতে সুশোভিত বৃক্ষরাজি।

পৃথিবীর ছিল না কোন আকাশ,  
সে ছিল অদ্বিতীয় ও কৃষ্ণতার এক কেন্দ্রবিন্দু।  
গ্রহ-নক্ষত্র তার মাথার উপরে যখন ফুটলো  
তখন আলোর বিভায় হেসে উঠলো সে।  
জলের নীচে থেকে উঠে এলো অগ্নি,  
সূর্য শুরু করলো তার রোজকার প্রদক্ষিণ পৃথিবীকে ঘিরে।  
কত না বিচ্ছিন্ন বৃক্ষ সুপুষ্পি ছিল,  
তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো সূর্যের কিরণ-সম্পাতে।  
এই শক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট ছিল না কোন বিকাশ,  
সন্তুষ্ট ছিল না প্রাণের ইতিষ্ঠত বিচরণ।  
এই শক্তি থেকেই জন্ম নিলো প্রাণ,  
উদ্ধিদ-জগৎ পা রাখলো প্রাণের সীমায়।  
প্রাণ তখন উদ্ধিদের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখলো না,  
দৃষ্টি উন্মুক্ত করলো কঠিন প্রয়াসের দিকে।  
ভোগ বিশ্বাম স্বপ্ন সে আকাঙ্ক্ষা করলো,  
আকাঙ্ক্ষা করলো জীবনের আনন্দ।  
রসনায় ছিল না ভাষা, জ্ঞানে ছিল না অন্঵েষণ,  
কন্টক ও আবর্জনা থেকেই মিটাতে হতো দেহের প্রয়োজন।  
ভালো-মন্দ ও কর্মের পরিণাম ছিল অঙ্গাত,  
স্মৃষ্টার উপাসনার ইচ্ছাও জাগতো না কারো মনে।  
যখন জ্ঞান ও শক্তি বিনিময় করলো পরম্পরের মধ্যে নিজেদের ভাব,  
তখন উঠে এলো গুপ্ত ছিল যে কলা-কৌশল।  
তা থেকে জন্ম নিলো কর্ম ও তার পরিণাম,  
জন্ম নিলো গোপন ও প্রকাশের অঙ্গাত মহিমা।

## ମାନୁଷେର ଜନ୍ମ-କଥା

ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଏହି ଯୁଗେଇ ଜନ୍ମ ହଲୋ ମାନୁଷେର,  
ଏବଂ କଳାକୌଶଳେର ବନ୍ଦ ଦୂୟାର ଶେଳ ଖୁଲେ ।  
ଅଞ୍ଜୁ ଦେବଦାର ବସ୍ତରେ ମତୋ ସୋଜା ହଲୋ ପ୍ରାଣେର ମେରଦଣ୍ଡ,  
ଖୁଲେ ଗେଲୋ କର୍ମେର ପ୍ରୋତ ବାକ୍ ଓ ଜ୍ଞାନେର ସହୟତାଯ ।  
ଆପନ କରେ ନିଲୋ ସେ ଅନୁଭୂତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକେ,  
ତାରପର ଫରମାନ ଜାରି କରଲୋ ହରିଗାନ୍ଦି ଚତୁର୍ବୀଦ୍ଵାରା ଉପର ।

ଜ୍ଞାନେର ପଥେ ତୁମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖତେ ପାବେ,  
ମାନବ-ଜନ୍ମେର ସାର୍ଥକତା କୋଥାଯ ।  
ତୁମି ଜାନବେ, କି କରେ ଦିକହାରା ମାନୁଷ  
ଜ୍ଞାନେର ସାହାଯ୍ୟ ପେଲୋ ପଥେର ନିଶାନା ।  
କି କରେ ତୋମାକେ ସେ ଜ୍ଞାନ କରଲୋ ମାହାତ୍ୟ ଦୁଃଖଗତେର ଉପର,  
ଏବଂ ଲାଲନ କରଲୋ ତୋମାର ପ୍ରତିଭାକେ ବାଣୀ ବହନେର ଉପଯୁକ୍ତ କରେ ।  
ପ୍ରକୃତି ତାର ଆଦିମତମ ସୃଷ୍ଟିକେ ଗଣନା କରେ ଶୈଷତମ ପରିଣତିର ଦିକ ଥେକେ,  
କାଜେଇ ତୁମି ତୋମାର ଜୀବନକେ ଖେଳାଙ୍ଗପେ ଗ୍ରହଣ କରୋ ନା ।  
ଶୁନେଛି, ଅତୀତକାଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନରା ବଲତେନ,  
ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୁର ସୃଷ୍ଟି-ରହ୍ୟ ଗୋପନ ରଯେଛେ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ମଧ୍ୟେ ।  
ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କର ପରିଗାମେର ଦିକେ, ନିଜେକେ ଦେଖ,  
ତାହଲେଇ ହତେ ପାରବେ ସଫଲକାମ ଓ ବରଣୀୟ ।

ଦୁଃଖକେ ବରଣ କର, ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଵାଶ୍ୟ ଫିରିଯେ ଆନ ଦେହେର ;  
ଦୁଃଖେର ଆଗୁନେଇ ଜ୍ଞାନ ହୟ ପରିପକ୍ଷ ଓ ବିକାର-ମୁକ୍ତ ।  
ଯଦି ସକଳ ଅକଳ୍ୟାନ ଥେକେ କାମନା କର ମୁକ୍ତି,  
ଓ ବିପଞ୍ଜାଲ ଥେକେ ରେହାଇ ପେତେ ଚାଓ,  
ତବେ ଝାପ ଦାଓ ଦୁଃଖ ଓ ବିପଦରାଶିର ମଧ୍ୟେ  
ଦୁଃଖ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରେଯୋଲାଭ ସନ୍ତୋଷ ନମ୍ବ କାରୋ ଜନ୍ୟେ ।  
ଚୟେ ଦେଖ ଦ୍ରୁତ ଘୁର୍ଣ୍ୟମାନ ଆକାଶେର ଦିକେ,  
ତାର ଥେକେ ଆସଛେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଃଖେର ପ୍ରତିକାର ଦୁଇ-ଇ ।  
କାଳ ବିନଷ୍ଟ ହୟ ନା ତାର ଘର୍ଷଣେ  
ବିନଷ୍ଟ ହୟ ନା ଦୁଃଖ କିଂବା ସୁଖ ।

তার ঘূর্ণনের ফলে আনন্দ ও শ্রীবৃক্ষি চিরস্থায়ী হয় না,  
এবং দুঃখ ও অধঃপতনও নিত্যকালের ব্যাপার নয়।  
তার থেকে যেমন বৃক্ষি তেমনি তার থেকেই ক্ষয়,  
মঙ্গল-অঙ্গলের রহস্য দুই-ই তার কাছে প্রকটিত।

## সূর্যের সৃষ্টি প্রসঙ্গে

নীল আকাশ লাল কান্তমনির আভায় উজ্জ্বল হলো,  
এই উজ্জ্বলতা বাতাস পানি কিংবা ধূম্রাশি থেকে নয়।  
এতো দীপ্তি ও দীপান্বিতা নিয়ে  
সে যেন বসন্তের উপবনে পরিণত হয়েছে।  
মনোরঞ্জনী রত্নাবলী তার অস্তর থেকে উৎসারিত হয়ে  
আলোময় করছে দিনকে।  
প্রতিটি উষা যেন সুর্বণ নির্মিত ঢালের মতো মাথা তোলে  
প্রাচীমূল থেকে,  
আর ধরিত্রী আলোর পরিধেয় গায়ে পরে অঙ্ককার থেকে  
আবির্ভূত হয়।  
পূর্বদিক থেকে সে যখন অগ্রসর হয় পশ্চিমের দিকে,  
তখন কাজলা রাত পূবের পথে মস্তকোন্তোলন করে।  
একজন করে না আরেকজনের পথরোধ,  
এর চাইতে ক্ষটিহীন পর্যায়ক্রম আর সম্ভব নয়।  
ওগো, সূর্য,  
তুমি কি আমাকে দান করবে না তোমার আলো ?

## চন্দ্রের সৃষ্টি প্রসঙ্গে

একটি প্রদীপ অঙ্ককার রাতের পথ ধরেছে ;  
ওগো, নৈরাশ্যের আবরণে আর নিজেকে টেকে রেখো না ।  
দুই দিন ও দুই রাত্রি সে গোপন রাখবে তার মুখ,  
কালের ঘর্ষণে সে তখন ক্ষীণ—প্রাণ ।  
তারপর শীর্ণতা ও হলুদ বর্ণের আলম্বনে তার আবির্ভাব হবে,  
যেন কারো বিছেন্দ—বেদনায় কৃশ হয়ে যাচ্ছে তার সুন্দর তনু ।  
দূর থেকে কেউ তখন তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে  
মনে হবে, এই বুঝি সে মিলিয়ে গেলো ।  
পরের রাতে তার দর্শন হবে পূর্ণতর,  
দান করবে সে অধিকতর আলো ।  
দু সপ্তাহ গত হলে পরিপূর্ণ হবে তার অবয়ব.  
তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে সে তার জন্মলগ্নে ।  
দিন দিন সে সরু হবে,  
এবং নিকটবর্তী হবে উজ্জ্বলতম সূর্যের ।  
এই বিচিত্র চলনভঙ্গি তাকে দান করেছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা,  
এই চাল তার অব্যাহত থাকবে চিরদিন ।

## পয়গম্বর (সাঃ) ও তাঁর বন্ধুগণের প্রশংসা

তোমার জ্ঞান ও ধর্মকে কর কুসংস্কার থেকে মুক্ত,  
মুক্তির পথ অন্বেষণ করাই হলো তোমার কাজ।  
অধিপতিত জীবন থেকে উঠে আসার যদি বাসনা থাকে  
যদি বাসনা থাকে চিরদিনের দুঃখ থেকে রেহাই পাওয়ার,—  
তবে তোমার পয়গম্বরের বাণী নিয়ে কর পথের অন্বেষণ—  
হৃদয়ের অঙ্কনার গুহা সকলকে কর তার আলোয় আলোকিত।  
ওহী! ও প্রেরণার প্রভু—

আদেশ ও নিষেধের বিধিকর্তা কী সুন্দর বলেছেন,—  
সূর্যসদৃশ পয়গম্বরগণের পর কোন চন্দ্রই  
আবুবকরের মতো এতো দীপ্তি ছড়ায়নি মানুষের উপর।  
ওমর ইসলামকে করেছেন প্রকটিত দূর দূরাত্তে—  
এবং ধরণীকে করেছেন সজ্জিত বসন্তের ফুলবনের মতো।

ঠিকের পরে নির্বাচিত হয়েছেন ওসমান—  
লজ্জার প্রতিমূর্তি ও ধর্মের অধিষ্ঠানভূমি।  
চতুর্থ আলী—সংসার-বিরাগিনী ফাতেমার স্বামী,  
ঘাঁর গুণকীর্তন করেছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ।  
“আমি জ্ঞানের শহর ও আলী তার সিংহদ্বার”—  
রসূলের এই বাণী সত্য ও সন্দেহাতীত।  
আমি সাক্ষ্য দিছি, এই বাণী বহন করে তাঁর চরিত্রের মর্ম,  
এর ব্যাখ্যা পূর্ণ করে আমার শ্রবণদ্বয়।  
উপযুক্ত সম্ভব ও উক্তির সঙ্গে গ্রহণ কর তোমরা  
আলীকে এবং তাঁদেরকেও,  
কারণ, এঁদেরই সাহায্যে ক্রমান্বয়ে শক্তিলাভ করেছে ধর্ম।  
নবীবর সূর্য ও তাঁর সাহাবীগণ চন্দ্রসদৃশ,  
সবাই তাঁরা সরল পথের সহ্যাত্ত্বী।  
আমি নবী-পরিবারের দাস,

আমি প্রশংসাকীর্তনকারী আলীর<sup>\*</sup> পদধূলির।  
অন্যকে অঙ্গীকার করা আমার কাজ নয়;  
আমার বাণী সহজেই ধাবিত হয় তাঁর পথে।  
এই জগৎকে জ্ঞান কর এক সমুদ্র বলে,  
যেখানে গর্জন করে ফিরছে প্রবল ঝঞ্চা ও ক্রুদ্ধ উর্মিদল;  
যেখানে সত্ত্বরটি অর্ণবযান অনুকূল হাওয়ায়  
তুলে দিয়েছে তাদের প্রসারিত বাদবান।  
তার মধ্যে একটি জলযান সজ্জিত কনের বেশে  
রাজহংসের গতিতে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।  
তার মধ্যে রয়েছেন মুহূর্মদ ও আলী  
এবং নবী ও আলী-পারিবারের সকলে।  
দূরে দাঁড়িয়ে জ্ঞানীজন দেখতে পায়—  
এই সমুদ্র অসীম—তার তটরেখা অদ্য্য।  
তারা বুঝতে পারে উত্তাল তরঙ্গ যখন হানবে তার অভিঘাত,  
তখন হয়ত নিমজ্জন থেকে কেউই রক্ষা পাবে না।  
কিন্তু হাদয়ের অধিবাস যদি হয় নবী ও আলীর সঙ্গে,  
যদি নিমজ্জনান আমি সম্পূর্ণরাপে নির্ভরশীল হই  
তাঁদের সাহায্যের উপর  
তবে অবশ্যই তাঁরা বাড়িয়ে দিবেন আমার দিকে তাঁদের হত—  
তাঁরাই মালীক সিংহাসন ও রাজকীয় ঝাণ্ডার।  
তাঁরা সুপুর্বিত্ব সুরা, সুপেয়-জলরাশি ও সুধার অধিকারী,  
সঞ্জীবনী পানীয় ও অম্বতের উৎসও তাঁরাই।  
যদি থাকে অন্তদৃষ্টি তবে আর সব পাঞ্চশালা ছেড়ে—  
বসবাস প্রতিষ্ঠিত কর নবী ও আলীর মধ্যে।  
আমার পাপের মার্জনা তাঁদের থেকেই আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি,  
এই আমার ঈমান এই আমার ধর্ম।

মূলে 'ওসী' শব্দ আছে। 'ওসী অর্থ—যার উপর 'ওসীয়ত' (মত্ত্যুর বা যাত্রার প্রাক্কালে যে আদেশ করা হয়) করা হয়েছে। শিয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, মত্ত্যুকালে রস্মুন্নাহ আলীকেই তাঁর প্রতিনিধি নির্বাচিত করে যান। ফিরদৌসী শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন।

জন্ম আমার অভিজ্ঞাত, মৃত্যু আমার সম্মানিত,—  
যেহেতু আমি জেনেছি, আমি আলী হায়দরের পদধূলি।  
তোমার হৃদয় যদি হয় তাঁর প্রতি অসম্ভব-যুক্ত,  
তবে জেনো, এই দুনিয়ায় তুমিই তোমার দুশ্মন।  
অজ্ঞাত পিতৃ-পরিচয় ছাড়া আর কেউ হতে পারে না তাঁর শক্ত,  
কারণ, তেমন লোকের দেহকেই বিশ্ব-প্রভু করবেন আগুনে দণ্ডিভূত।  
যার হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আলীর প্রতি শক্রতা  
কে তার চেয়ে বেশী অপমানিত এই দুনিয়ায় !  
দেখ, এই জগৎকে মনে করো না মায়া কিংবা লীলা বলে,  
এখানে পথাতিক্রম করো না সৎ সহ্যাত্মীদের সঙ্গ ব্যতিরেকে।  
সততা সর্বত্র সফলকাম ও বিজয়ী হয়,  
সততার সঙ্গে কর জীবন যাপন ও পাপাচার থেকে লজ্জায়—  
ফিরিয়ে নাও তোমার মুখ।  
সর্বরকম সততার সূচনা হোক তোমার মধ্যে।  
যাতে যশস্বীদের সঙ্গে করতে পার তোমার যাত্রা শুরু।  
এই অল্প দুয়েকটি কথা বলে শুরু করলাম আমি আমার পথ যাত্রা,  
জানি না, কোথায় রয়েছে এই পথের শেষ।

---

এই দুটি পংক্তি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাণ শাহনামার কোন সংস্করণে নেই; ইরানীয় সংস্করণে  
আছে।

## শাহনামা সম্পাদনা প্রসঙ্গে

বাণী উৎসারিত হয়েছে অনেক, কিন্তু একটি অন্যটির অনুরূপ নয়,  
আমি তোমাদের কাছে যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি তা তোমাদের মধ্যে প্রচলিত।  
যা কিছু আমি বলবো, সব বলা হয়েছে আগেই,  
জ্ঞানের নন্দন-কাননে সবাই করেছেন ভ্রমণ।  
যদি যুই গাছের ফুলভারনয় শাখার উপর করি দৃষ্টিপাত  
তবে হবো বঞ্চিত।

কিন্তু কেউ যদি আশ্রয় নেয় উচ্চ কোন বিটপীর তলায়—  
তবে তার সুশীতল ছায়া অচিরেই দূর করবে তার ঝাঁক্সি।  
আমি উড়স্ত জলধর, কিন্তু পদযুগ বিন্যস্ত করেছি  
সেই ছায়াছন্দ দেবদারুর উন্নত শাখায়।  
কারণ, যশস্বী নরপতিগণের এই ইতিকথা  
দুনিয়ায় আমার স্মারক হয়ে থাকবে।

তুমি একে অলীক কাহিনী বলে মনে কর ন,  
গণ্য করো না তাকে যুগ-চিহ্নের উৎসার মাত্র বলে।  
এর কিছু কাহিনীতে রয়েছে বুদ্ধির ও জ্ঞানের দীপ্তি,  
অন্যরা নিজেদের মধ্যে বহন করছে রহস্যময় তাৎপর্য।  
অতীত কালে ছিল পূরাকীর্তি সম্মুলিত এক গাথা,  
তার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল অনেক উপাখ্যান।  
প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির মুখে মুখে তা ছড়িয়েছিল,  
সেগুলি থেকে তারা সংগ্ৰহ করত প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের সম্পদ।  
কোন নিভৃত গ্রামাঞ্চলের এক বীর সন্তান  
বর্ষীয়ান সাহসী জ্ঞানী ও দানশীল—  
আদিম যুগের সেই ইতিকথার খৌজে তৎপর হলো,  
কাহিনীগুলোর উদ্ভাব মানসে সে ঘুরে বেড়ালো বহুদিন।  
ফিরলো সে বহু নগরীর পথে পথে,  
ফলে সংগৃহীত হলো এই গাথা।  
সবারই কাছে সে জিজ্ঞাসা করেছে কেয়ানী বৎশের আদিম ইতিহাস,

জেনেছে সে তাদের থেকে যশস্বী সেই নক্ষত্রের পরিচয়।  
জেনেছে, সেই আদিম যুগে রাজারা কেমন করে শাসন করতেন পৃথিবী,  
আর আজ কেমন করে লুপ্ত হয়েছে সেই কীর্তিকলাপ ?  
প্রশ্ন করেছে সে, কেমন করে অস্ত গেলো সেই সূভগ নক্ষত্র,  
কাল কেমন ছিল সেই বীরবন্দের উপর ?  
দলপতিগণ একে একে বিবৃত করেছেন তার কাছে  
রাজ-রাজডাদের কীর্তিগাথা ও জগতের পরিবর্তনের ইতিহাস।  
সেই বীর-জ্ঞানী তাঁদের কাছ থেকে জেনেছে অতীতের সব কীর্তি,  
তারপর সেই সংগ্রহ থেকে রচিত হয়েছে এক মহান পুরাণ কথা।  
জগতে সেই গাথাই হয়ে আছে অতীতের স্মৃতি,  
সর্বত্র জ্ঞানী ও ধর্মবেত্তা জানিয়েছে তাকে স্বাগতম্।

## কবি দাকীকীর কাহিনী ০

এই সংগ্রহ থেকে অনেক কাহিনী

কথকগণ তাদের শ্রোতাদেরকে পড়ে শোনাতো ।

জগতের হৃদয় যেন এই সব উপাখ্যানের মধ্যে সমত্বে রক্ষিত ছিল,

তাই জ্ঞানী ও মুর্ধ সবারই মনোরঞ্জন করতো এই গাথা ।

একদা এক মুক্ত—রসনা যুবকের আবির্ভাব হলো,

সে ছিল কবি, সুন্দর স্বভাব ও উজ্জ্বলমন ।

আমাকে সে বললো, এই গাথাকে আবি সাজিয়েছি কবিতার মালায়,

সেই কবিতা মনোরঞ্জন করছে আসর ও মণ্ডীর ।

কিন্তু কবির ঘোবন ছিল সেই অসৎ বন্ধুবর্গের অনুরক্ত—

যারা সর্বদা লিপ্ত থাকতো ঝগড়া ও কলহে ।

একদিন সহস্র তারা কবিকে আক্রমণ করলো এক লৌহদণ নিয়ে

ও তদ্বারা মাথায় আঘাত করে করলো তার প্রাণ সংহার ।

এইভাবে অসত্তের প্রতি আনুরক্তির মূল্য শোধ হলো এক মধুময়

জীবনের বিনিময়ে,

জগতের সুখ—ভোগ সেই কবির ভাগ্যে স্থায়ী হলো না দীর্ঘদিন ।

সহসাই যেন অস্তমিত হলো তার ভাগ্যের সূর্য,—

এক উন্মাদের হাতে হলো তার জীবনের অবসান ।

গুণ্ঠাসপ ও আরজাস্পের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত

কত না লোক হয়েছে গত,

দিয়েছে তারা বাণী, আর প্রয়াণপর হয়েছে কালের পথে ।

দাকীকীও চলে গেলো আর রেখে গেলো এই অসমাপ্ত গাথা ;

তার জাগ্রত ভাগ্য হলো চিরনিদ্রায় অভিভূত ।

হে খোদা, তুমি তার স্পর্শলন ও ক্রটি মার্জনা করো,

এবৎ সম্মুত করো তার পদমর্যাদা হাশরের দিনে ।

- 
- কবি দাকীকীর রচিত অসম্পূর্ণ শাহনামার অংশবিশেষ ফিরদৌসী তাঁর শাহনামার অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলে জানা যায় । তবে কোনু অংশটি দাকীকীর রচিত তা জানা যায় না । মনে হয়, সেই রচনা ফিরদৌসী কর্তৃক সংস্কৃত হয়ে আত্মগত হয়েছে ।

## গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপন প্রসঙ্গে

আমার অন্তর আলো লাভ করলে দাকীকীর থেকে,  
এবং বাদশার সিংহাসনের দিকে করলো দৃষ্টিপাত।  
তার গথা যখন আমার হাতে এলো  
তখন উপাখ্যানদল গ্রন্থ থেকে উঠে এসে সমাপ্তীন হলো

আমার রসনায়।

আমি জ্ঞান লাভে তৎপর হলাম কত না লোকের কাছ থেকে,  
এবং সন্তুষ্ট হলাম কালের গতির দিকে চেয়ে।  
আমার বিলম্বের কথা চিন্তা করে  
এই কর্তব্য অন্যকে সমর্পণ করতে চাইলাম।  
কিন্তু কারো জন্যে অনুকূল হোল না নক্ষত্র,  
দেখলাম, আমার দৃঢ়খের ক্রেতা কেউ নেই।  
যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল যুগ,  
অনুষ্ণবকারীর জন্য দুনিয়া ছিল অতীব সংকীর্ণ।

এইভাবে কাটিয়ে দিয়েছি এক যুগ,  
বাণীকে লুকায়িত রেখেছি নিজের মধ্যে।  
পাইনি কাউকে সহানুভূতিশীল,  
পাইনি কাউকে আমার কাব্যের সমবাদার।  
সুন্দর বাণীর আদর আছে কি এই জগতে ?  
সম্মানিতগণ কি জানান তাকে সাদর সন্তানণ ?  
বিশ্ব-প্রভূর কাছ থেকে যদি না আসতো বাণীর সমবাদর,  
তবে নবীবরের আশীর্বাদ কবে আমাদের ভাগ্যে ঘটতো ?  
আমাদের নগরীতে ছিলেন আমার এক সহাদয় বন্ধু ,  
লোকে বলে আমরা ছিলাম এক-দেহ-এক-আত্ম।  
একদিন তিনি বললেন, তোমার বাসনাকে  
আমি স্বাগত জানাই,  
আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কর তুমি এই দায়িত্ব।

এক পহলবী গাথা<sup>০</sup> তুমি রচনা কর আমার জন্যে,  
আমি তোমার সামনে এনে উপস্থিতি করছি আগের দিনের সকল গীতিকা।  
তুমি মুক্ত-রসনা ও নব-যৌবনশালী,  
বীররসমূলক কাব্য-বাণী কর উৎসাহিত।  
বাদশাদের প্রাচীন কীর্তি আবার তুমি নতুন করে কর উজ্জীবিত,  
এবং তদ্বারা সম্মানিতগণের কাছ থেকে লাভ কর সম্মান ও মর্যাদা।  
এইভাবে সেই গাথা যখন আমার সামনে এলো,  
তখন সহসা উদ্বীপ্ত হলো আমার প্রাণের অঙ্ককার গুহা।

---

প্রাচীন ফারসীকে পহলবী বলা হয়। ফিরদৌসী তাঁর রচনাকে আবৃ-প্রভাব মুক্ত করে প্রাচীন  
পহলবীর মর্যাদায় অতিষ্ঠিত করেছেন বলে দাবী করতেন। ফরাসী ভাষাকে সাধারণভাবেও  
পহলবী বলা হয়ে থাকে।

## আবু মুহম্মদ বিন মনসুরের<sup>১</sup> প্রশংসায়

এই গাথা রচনায় যখন আমি হাত দিয়েছি  
তখন এদেশে বাস করতেন এক আত্মপ্রত্যয়শীল সম্মানিত ব্যক্তি।  
তিনি ছিলেন যৌবনের অধিকারী ও বীর-বৎশোষ্টুত,  
তাঁর সজাগ এবং উজ্জ্বল হাদয় ছিল জ্ঞানের আকর।  
তাঁর বিবেকবান ব্যক্তিত্ব ছিল লজ্জার প্রতিমূর্তি,  
তাঁর বাক্ভঙ্গি ছিল মন্দু ও মনোরম।  
একদিন তিনি আমায় বললেন, তোমার বর্ণনা শক্তি যদি  
কাব্যকেই করে থাকে আশ্রয়, তবে বল, কি আমায় করতে হবে?  
আমার নিকট রয়েছে এক মূল্যবান মুক্তা সেই আমার পুঁজি,  
তোমাকে তাই করছি সমর্পণ— এ বন্ধু আমি কোন মানুষের থেকে, পাই নি।  
এই মুক্তা ঠিক একটি তাজা আপেলের মতো—  
বিশ্বাস করো, লুঠন কিংবা রাজকোষ থেকেও আসে নি সেই রঞ্জ।  
আমি মৃত্তিকাতল থেকে উথিত হলাম সপ্তাকাশের শনি গ্রহে,  
সেই ভাগ্যবান মহাপুরুষের স্পর্শ যেন আমাকে রূপান্তরিত করলো।  
তাঁর দৃষ্টিতে পরিবর্তিত হলো আমার ধূলি রঞ্জতে ও কাঞ্চনে,  
মাহাত্ম্য তাঁর থেকে সংক্রমিত হয়ে হলো সুন্দর মহনীয়।  
পৃথিবী যেন তাঁর তুলনায় তুচ্ছ মনে হলো,  
আহা, তিনি ছিলেন যৌবনশালী ও প্রেমদাতা !  
এইকাপ যশস্বী মহাপুরুষে একদিন আসর থেকে অন্তর্ধান করলেন,  
যেন বাতাঘাতে উন্মুক্ত হলো সুদর্শন দেবদাকু।  
হায়, আর তাঁকে দেখতে পেলাম না — জীবন্ত কি মৃত,  
মানুষ-ধরা কুমীরদের হাতে তাঁকে দিতে হলো প্রাণ।  
তখন থেকেই হৃদয়ে আমার হতাশা প্রবিষ্ট হলো,  
উচ্চাশা প্রকশিপ্ত হলো স্বোত্থত বেতসের মতো।

---

কবির জন্মভূমি তুম নগরের ক্ষান ধনিন ব্যক্তি—ফিরোজীর প্রথম পৃষ্ঠপোষক। তুম নগরেই কবি  
শাহনামা রচন য হাত দেন। সুলতান মাহমুদের আদেশে শাহনামা রচনার যে-ধারণা প্রচলিত আছে, এই  
কারণে তা সংশয়াজ্ঞিত নয়।

ধিক্ সেই অশুভ লগ্ন ও বর্ষ,  
ধৰ্মস হোক সেই স্থান যেখানে এই রাজ-সদৃশ মহাপুরুষের উপর  
পতিত হয়েছিল শত্রুদল।  
সেই মহাপুরুষের একটি উপদেশ আজ আমার মনে পড়েছে,  
তারি সাহায্যে আমি উত্তীর্ণ হলাম নিরাশা থেকে আশার উপকূল।  
তিনি বলেছিলেন, বাদশাদের এই গাথা  
যদি কাব্যাকারে লিখবার বাসনাই করে থাক,  
তবে বাদশাদেরই করো তা উৎসর্গ  
যখন তাঁর এই উপদেশ-বাণী স্মরণে এলো  
তখন ধরলাম সেই পথ,  
হৃদয় আমার শাস্ত হলো, হলো তা আবার সুখী ও স্বচ্ছন্দ।  
এই নামা (শাহনামা) তখন উৎসর্গ করলাম  
সেই উচ্চশির বাদশার নামে—  
যিনি অধীশ্বর তাজ ও তথ্তের  
তিনি বিজয়ী ও শাহনশাহ এবং অধিকারী এক জাগ্রত ভাগ্যের।

## সুলতান মাহমুদেরং প্রশংসায়

বিশু-স্বষ্টা যখন থেকে সৃষ্টি করেছেন এই বিশু

তখন থেকে এমন বাদশা আর আবির্ভূত হয়নি।

কালের দিগন্তে সূর্যের মতো তাঁর রাজমুকুট যখন মাথা তুললো

তখন তাঁর কীর্তির আভায় শুঙ্গোজ্জ্বল হলো ধরণী।

কে এই দীপ্তিমান সূর্য —

যার থেকে ধরণীতে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে আলোকরাশি ?

তিনি জাগ্রত-ভাগ্য সন্ন্বাট আবুল কাসেম —

সূর্যসদৃশ রাজমুকুট শিরে তিনি তখ্তে সমাপ্তীন।

পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র তাঁর রাপের আভায়

প্রকটিত হয়েছে সোনার খনি।

আমার ঘুমস্ত নক্ষত্রও হয়েছে জাগ্রত,

মন্ত্রক্ষে আমার চিন্তারাশি হয়েছে চঞ্চল।

বুঝলাম, কবিতার যুগ সমাগত হয়েছে,

প্রাচীন ও বৃক্ষ কাল এখন লাভ করবে নবযৌবন।

এই দুনিয়াপতির কল্পনায় যেন আমি ঘূর্ণিয়েছিলাম

এক অন্ধকার রাত্রির মতো, ভোরের সঙ্গাবনা নিয়ে।

সেই কুহেলী রাতে প্রবিষ্ট হলো তাঁর আলো,

খুলে দিলো তা আমার ঘুমের বাতায়ন ও মুক্ত করলো রসনার গুহ্বি।

স্বপ্নে আমায় দেখা দিল তাঁর উজ্জ্বল দিঠি,

যেন সাগর থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে এক প্রভাময় প্রদীপ।

সারা পথিবীর জমরন্দ বরণী রাত

- 
- সুলতান মাহমুদের উপর অপমান-সূচক যে-বিষ্যত ব্যক্ত কবিতাটি কবি লিখেছিলেন দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাণ সকল সম্প্রকরণেই তা শাহনামার ভূমিকা হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ইরানীয় সম্প্রকরণে তেমন নেই। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মাজালিয়ানের অধিগতি শাহরিয়ার সুলতানের দুর্নীয় অপনোদনের প্রয়াসে কবির কাছ থেকে কবিতাটি মূল্য দিয়ে ফিনে দেন। বন্ধুত শাহনামা রচনার পরবর্তী এক দুর্দিনা থেকেই তার উৎপত্তি বলে গ্রহ মধ্যে তা সন্নিবেশিত করার পক্ষপাতী আমরাও নই। কিন্তু এই অনুবাদের ভূমিকায় শাহনামার ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে কবিতাটির পুরোপুরি অনুবাদই দেওয়া হলো।

সেই দীপালোকে ফুটে উঠলো সূর্যকান্ত মণির মতো ।  
সমস্ত দ্বার বাতায়ন সজ্জিত হলো উৎসব-সাজে —  
আরোহণ করেছেন বিজয়ী রাজা তাঁর রত্ন সিংহাসনে ।  
তিনি বসেছেন যেন পূর্ণচন্দ্ৰ,  
তাঁর শিরে শোভিত হচ্ছে আভাময় মুকুট ।  
সৈন্যদল ক্রোশাবধি পথ জুড়ে সারি বৈধে দণ্ডায়মান রয়েছে,  
এবং তাঁর বাঁয়ে সজ্জিত রয়েছে সাতশো মদমত করী ।  
তাঁর সমীপে কাৰ্যকৰী হচ্ছে এক পবিত্র বিধি —  
ন্যায়পৱতা ও ধৰ্মের পথে সে-ই হলো সম্ভাটের পথ-প্ৰদৰ্শক ।  
বাদশার এই সমারোহ দেখে আমাৰ মন্তিক্ষ ঘূৰ্ণিত  
ও চক্ষু অন্ধকাৰ হলো,—

এতো মদমত হষ্টী এতো সৈন্য !  
বাদশার প্ৰভাবশালী মুখ সন্দৰ্শন কৰে  
আমি একজনকে প্ৰশ্ন কৰলাম,—  
একি পূর্ণচন্দ্ৰ শোভিত আকাশ না রাজসভা  
একি তাৰাদল না সৈন্যশ্ৰেণী ?  
বন্দী উচ্চারণ কৰলো, ইনিই রোম ও হিন্দুস্তানেৰ সম্ভাট,  
রাজ্য তাঁৰ বিস্তৃত কনোজ থেকে সিঙ্গুনদেৱ পাদদেশ পৰ্যন্ত ।  
ইৱান ও তুৱান তাঁৰ পদানত,  
তাঁৰই ফৰমান থেকে তাৰা লাভ কৰছে জীবন ।

তাঁৰ ন্যায়বিচাৰে ধৰণীতল সুন্দৰ হয়েছে,  
শোভিত হয়েছে তাঁৰ শিরে ন্যায়েৰ রাজমুকুট ।  
জগৎপতি মহান বাদশা মাহমুদ —  
তাঁৰ শাসনে একই জলাশয়ে জলপান কৰে নেকড়ে ও মেষ শাবক ।  
কাঞ্চীৰ থেকে চীন সাগৰ পৰ্যন্ত  
সকল রাজা কীৰ্তন কৰেন তাঁৰ গুণাবলী ।  
শিশু তাৰ মাতৃসন্ন-জাত দুগ্নে সিক্ষ ওষ্ঠাধৰে  
দোলনা থেকে প্ৰথমবাৰ উচ্চারণ কৰে যে-শব্দ তা মাহমুদ ।

যদি হয়ে থাক কবি তবে তুমি ও কীর্তন করো তাঁর গুণাবলী,  
সেই চিরজীবীর নাম নিয়ে তৎপর হও তোমার প্রচেষ্টায়।  
কেউ মুখ ফিরায় না তাঁর আদেশের আনুগত্য থেকে,  
তাঁর শাসনকালে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি ধ্বন্দ্ব কিংবা বরবাদী।  
আমি জাগ্রত হয়ে শুরু করলাম আমার অনুরোধ তাঁরই সমীপ থেকে,  
আহা, আমার অমানিশি কি সম্পদই না রেখেছিল গোপন করে।  
এই মহান সম্ভাটের প্রতি আমি কি জানাব না স্বাগত সম্ভাষণ ?  
আমার প্রাণের ঐশ্বর্য কি ঢেলে দেব না তাঁর পদতলে ?  
হৃদয়কে বললাম, ওগো হৃদয়, তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে,  
কেননা তাঁর সম্ভাষণ দুনিয়ায় সূচনা করে সৌভাগ্যের।  
সম্পূর্ণ করো তোমার আমন্ত্রণসূচক গুণকীর্তন তাঁরই উপর,  
ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাঁর প্রতি — তিনি রাজমুকুট ও অঙ্গুরীয়ের স্তুষ্টা।  
তাঁর সমারোহে ধরণী রূপাস্তরিত হয়েছে মাধবী বনে,  
বাতাসে ভাসমান হয়েছে মেঘদল ও পৃথিবী হয়েছে  
সূচিত্রিত বর্ণ-সুষমায়।

মেঘেরা টেনে এনেছে সজল প্রাবৃট  
আর পৃথিবীকে দিয়েছে নন্দন বনের ঘনগৌরব।  
ইরানের সকল সৌন্দর্য তাঁরই বদান্যতায় সুরঞ্জিত।  
আসরে তিনি বিশৃঙ্খলা ও উদারতার মহাকাশ,  
রণভূমিতে তিনি আজদাহার ভয়ঙ্কর থাবা।  
দেহে তিনি মদমত করী — প্রাণে স্বর্গীয় দূত জিবাইল,  
হাতে তাঁর বসন্ত কালের শুভ বাদল — অন্তরে প্রবাহিত  
নীলনদের ধারা।

অসূয়ক তাঁর ভয়ে পলায়নপর,  
স্বর্ণমুদ্রা তাঁর চোখে ধূলিবৎ।  
কোন বীরই ছিনিয়ে নিতে পারে না তাঁর থেকে রাজমুকুট  
ও রাজসম্পদ,  
কোন দুখ কিংবা যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর হৃদয়কে করতে  
পারে না অন্ধকার।

প্রজাদের মধ্যে সবাই —

স্বাধীন নাগরিক কিংবা অনুগত দাস

সম্মাটকে ভালবাসে অন্তর দিয়ে,

সবাই উদৃদ্ধ হয় তাঁর আদেশে ।

নিশ্চিত মনে রাজ্য শাসন করে তাঁর নাম নিয়ে ।

তাঁর অনুজ — সুলতানের এক বছরের ছোট তিনি ;—

অনুপম তাঁর চরিত্র ও গুণাবলী ।

বাদশার গুণকীর্তন করাই নসরের<sup>১</sup> বৈশিষ্ট্য,

যুগ—সম্মাটের রাজদণ্ডের ছায়াতলে নিত্য বর্ধিত হয় তাঁর আনন্দ ।

তিনি ছিলেন পিতা নাসিরুল্লাহের বুকের মানিক —

সেই নাসিরুল্লাহের যাঁর সিংহাসন ছিল সপ্তর্ষির শিরোপা ।

তিনি বীর ঝানী ও প্রতিভাবান,

তাঁর সান্নিধ্যে আনন্দ লাভ করেন আমীর ও মরাগণ —

বিশেষ করে তুসের সেনাপতি তাঁর প্রিয়পাত্র,

সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে যে প্রদর্শন করেছিল অস্তুত ক্রীড়াকৌশল ।

যোগ্যদের সবাইকে তিনি দান করেছেন স্বর্ণমুদ্রা,

এবং যারাই আকাঙ্ক্ষা করেছে কীর্তি তারাই পেয়েছে তাঁর

পৃষ্ঠপোষকতা ।

বিশ্ব—প্রভুর কাছ থেকে আসবে নির্দেশ মানুষের প্রতি,

সেই নির্দেশকে তারা লাভ করবে বাদশার সমীপ থেকে ।

হে খোদা, পৃথিবী যেন সম্মাটের রাজমুকুট থেকে কভু বঞ্চিত না হয়,

বাদশা যেন যুগ যুগ ধরে তরুণ ও উৎফুল্ল থাকেন ।

তাজ ও তখ্ত নিয়ে তিনি চিরকাল জীবিত থাকুন,

দূর হোক তাঁর থেকে দুঃখ বেদনা, হোন তিনি চিরজয়ী ।

এবার আমি প্রত্যাবর্তন করছি আমার কাহিনীর সূচনার দিকে,

মশশ্বী বাদশাদের কীর্তিমূলক শাহনামা শুরু করছি ।

---

তাঁর নাম আমীর নসর। তিনি সুলতান মাহমুদের অনুজ ছিলেন। বারোটি পংক্তিতে কবি তাঁরই<sup>১</sup> প্রশংসন কীর্তন করেছেন।

## କାହିନୀର ସୂଚନା

ଇରାନେର ପ୍ରଥମ ବାଦଶା କାୟମୂରସ ତ୍ରିଶ ବହୁ ରାଜସ୍ତ କରେଛିଲେନ

ଆଦିମ କାଳେ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ କବି ପ୍ରଶ୍ନ କରେଛିଲ,  
ପୃଥିବୀତେ କେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତେୟ କରେଛେ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ରାଜମୁକୁଟ ?  
କେ ସେ, ଯାର ଶିରେ ଶୋଭିତ ହେଯେଛିଲ ତାଜ ?  
ସେଇ ସୁଦୂର ଅତୀତେର କଥା ଆଜ କି କାରୋ ମନେ ଆଛେ ?  
କିନ୍ତୁ ଛେଲେ ତାର ପିତାର ମୁଖ ଥିକେ ଶୋନେ ବିଗତ ଦିନେର କଥା,  
ତାରପର ସେ ତୋମାକେଓ ବଲେ ଯାଯି ହ୍ୱର୍ଷ ସେ-ମତୋହି ।  
କୋନ୍ ସେଇ ପୁରୁଷ ଯିନି ମାହାତ୍ମ୍ୟକେ କରେଛିଲେନ ଲୋକ-ଚକ୍ରର ଗୋଚର ?  
କାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ସୁନାମ ସକଳକେ ଛାଡ଼ିଯେ ଗିଯେଛିଲ ?  
ଓଗୋ ପ୍ରାଚୀନ ଦିନେର ସତ୍ୟ ଅନ୍ତେସଗକାରୀ,  
ବଲ, ବୀରଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନ୍ ମହେ ପ୍ରତିଭା ସୂଚନା କରେଛିଲ କାହିନୀର ?  
ଲୋକ ବଲେ, ଏଇ ତଥ୍ତ ଓ ତାଜ ଦୁଇ-ଇ ଏନେଛିଲେନ କାୟମୂରସ,  
ତିନିଇ ଛିଲେନ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବାଦଶା ।  
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଥନ ସିଂହରାଶିର ଚକ୍ର-ସୀମାଯ ଏସେ ଉପାସିତ ହଲୋ,  
ତଥନ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣରତ ହଲୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମାରୋହ ଓ ନିୟମ  
ଶୃଙ୍ଖଲାକେ ଘିରେ ।  
ମେଷ ରାଶିତେ ତାର ଓଞ୍ଜଳ୍ୟ ଆରୋ ବର୍ଧିତ ହଲୋ,  
ପୃଥିବୀ ଉପନୀତ ହଲୋ ଯୌବନେର ସୀମାଯ ।  
କାୟମୂରସ ହଲେନ ପୃଥିବୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ମୀ,  
ପ୍ରଥମେ ପର୍ବତ ଛିଲ ତାର ନିଲଯ ।  
ସେଇ ପର୍ବତ ଥିକେଇ ସୂଚନା ହେଯେଛିଲ ତାର ସୌଭାଗ୍ୟେର  
ଏବଂ ସିଂହାସନେର,  
ବ୍ୟାସ୍ରଚର୍ମ-ପରିହିତ ଅବଶ୍ୟ ଏସେଛିଲେନ ତିନି ଓ  
ତାର ସାଙ୍ଗେପାଞ୍ଜ ।  
ପର୍ବତ ଥିକେଇ ଆସତୋ ଜୀବିକା, ନୂତନ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପରିଧ୍ୟେ ।  
ଧରଣୀ-ବକ୍ଷେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପେ ତିନି ରାଜସ୍ତ କରେଛିଲେନ  
ତ୍ରିଶ ବହୁ ଧରେ —

যেমন সূর্য শাসন করে তার অধিকৃত অঞ্চল।  
সিহোসনাকাঠ বাদশার রূপ ছিল ভূবন-মোহন,  
যেমন দেবদারু বনের মাথায় শোভা পায় চতুর্দশ যামিনীর পূর্ণচন্দ্র।  
হরিণাদি চতুর্পদ তাঁর দৃষ্টি দ্বারা আকর্ষিত হতো,  
বনভূমি ছেড়ে তারা আসতো তাঁর কাছে বিশ্রাম লাভের আশায়।  
তারা এসে অবনমিত হতো রাজাসনের পদতলে,  
আর তার থেকে বাদশার সৌভাগ্য উর্ধ্বগামী হতো সহস্র-শিখায়।  
উপাসনার রীতি সেই থেকেই প্রচলিত হয়েছিল,  
সেখান থেকেই ধর্ম ছড়িয়েছিল তার শিকড়।

কায়ুমূরসের এক সুদর্শন পুত্র ছিল,  
পিতার মতোই সে ছিল বুদ্ধিমান ও যশকামী।  
সেই ভাগ্যবানের নাম ছিল সিয়ামক,  
তার দর্শনে কায়ুমূরস্ পেতেন জীবনের স্বাদ।  
পৃথিবী তার সুন্দর মুখ দেখে ফুল্ল হতো,  
এবং বৃক্ষশাখা অবনমিত হতো ফুলভারে।  
তার প্রশংস আকর্ষণ করে আনতো ধরণীতে সজল বর্ষাঞ্চতু,  
তার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তাপদণ্ড হতো প্রান্তর ও উপত্যকা।  
দুনিয়ার রীতি অনুযায়ী এই পুত্রের দ্বারা  
পিতার বাহু অধিকতর শাঙ্কিশালী হয়েছিল ;  
এবং দীর্ঘদিন ধরে কৃতকার্যতা ও উজ্জ্বলতা  
তাকে অনুসরণ করেছিল বিশৃঙ্খল বন্ধুর মতো।  
দুনিয়ায় তার কোন শক্র ছিল না,  
কেবল অন্তরালে গুপ্ত ছিল এক কৃটিল দানবের নখ-দন্ত।  
অনিষ্টকামী সেই দানবের মধ্যে একদিন ঈর্ষার সঞ্চার হলো,  
যুদ্ধ-মানসে সে উদ্বেলিত করলো তার কেশর-কলাপ।  
দানব-দলপতির এক পুত্র ছিল — নেকড়ের মতো বিদ্যুৎগতি ও বলবান,  
অভিজ্ঞ সৈনিকের কাছেও তার সাহস ও বীর্যবস্তা লক্ষণীয় হতো।  
সেই দানব-সন্তান একদিন যুদ্ধবেশে সজ্জিত হয়ে দের হলো,

এবং অভিযান করলো বাদশার দেশ ও সিংহাসনের অভিমুখে।  
দানবের পদধূলিতে ধরণীর আকাশ অঙ্ককার হলো,  
অঙ্ককার হলো সিয়ামক ও বাদশা দুয়েরই ভাগ্য।  
পথে পথে সে ব্যক্তি করে চললো তার গৃহ অভিপ্রায়,  
পৃথিবীর সর্বত্র সে প্রতিধ্বনিত করলো তার কষ্টস্বর।  
কায়মূর্স্ত তার অভিযানের কথা জানতে পেলেন,  
জানতে পেলেন তার অসাধু অভিপ্রায়ের লক্ষ্যের কথাও।  
এমন সময় সহসা আকাশ-বাণী হলো,  
এবং সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হলো পরীদল ও ব্যাঞ্চচর্মধারী দেবযোনীগণ;  
তারা রাজ-পিতাকে বললো,  
শক্র তোমার পুত্রের দেখা চায়।

## দানবের হাতে সিয়ামকের নিধন

এই সংবাদ সিয়ামকের কর্ণগোচর হলে  
সে দুষ্ট দানবের অভিপ্রায় বুঝতে পারলো ।  
সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় উদ্বেলিত হলো যুবরাজের অস্তর,  
সৈনিকদের উপস্থিতিতে সে ধারণ করলো যোদ্ধাবেশ ;  
দেহ সজ্জিত করলো ব্যাঘাতর্মে,  
কারণ, বর্মদ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করা সেকালে যুদ্ধের রীতি ছিল না ।  
তারপর যুদ্ধকামী দানবকে সে আহ্বান করলো,  
প্রতিপক্ষও রণসাজে সজ্জিত ছিল ।  
সিয়ামক নেমে এলো,— তনু তার অনাচ্ছাদিত ;  
দানব-সন্তানকে সে ধারণ করলো যুদ্ধালিঙ্গে ।  
কৃষ্ণকায় দানব তখন পাঞ্জা বিস্তার করে কুমারকে ধরলো,  
আর উবু হয়ে তুলে নিলো তাকে শুন্যে ।  
তারপর সে ছাঁড়ে মারলো কুমারের দেহ মাটির উপরে,  
এবং তীক্ষ্ণ নখেরে ছিন্নভিন্ন করে দিল তার কলিজা ।  
এইভাবে সিয়ামক দুষ্ট দানবের হাতে নিহত হলে,  
তার বক্ষ-আসর নিঝীব ও প্রাণহীন হলো ।  
বাদশা শুনতে পেলেন পুত্রের মরণ সংবাদ  
তাঁর চোখে অস্ফুর হলো দশদিক । —  
তিনি কাঁদতে কাঁদতে সিংহাসন থেকে নেমে এলেন,  
ও স্বীয় বক্ষ নথের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করলেন ।  
তাঁর দুগণে প্রবাহিত হলো অশ্বর ধারা  
তাঁর দেহ ও রাজ্য হতশ্বী হলো ।  
সৈন্যগণ উথিত করলো বিলাপধ্বনি ও অশুব্নন্যা  
প্রবাহিত করলো,  
শোকের আগুনে পুড়ে খাক হলো তাদের কলিজা ।  
তাদের মধ্যে হতাশা নেমে এলো ।  
সারি বৈধে তারা এসে দণ্ডয়মান হলো প্রাসাদের দ্বারে ;—

পরিচ্ছদ তাদের শোক-চিহ্ন প্রকাশক নীলবর্ণে চিত্রিত,  
চোখে রজাক্ষ ও মুখমণ্ডলে গভীর বেদনার ছায়া।  
হরিণাদি চতুর্পদ ও বিহঙ্গদল একত্রিত হয়ে  
কৃন্দনরত অবস্থায় পর্বতাভিমুখে এগিয়ে গেলো।  
শোক ও বেদনা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে  
সৈন্যদল রাজপ্রাসাদ থেকে নির্গত হলো।  
দীর্ঘ একটি বছর সবাই শোকে মৃহুমান হয়ে বসে রইলো,  
তারপর বিশ্ব-প্রভূর কাছ থেকে এলো সান্ত্বনা।  
শুভসন্দেশবাহী আকাশবাণী হলো,—  
কৃন্দন আর নয়, এবার আত্মস্থ হও।  
সেনাদল সজ্জিত করো এবং মান্য করো আমার ফরমান,  
নিজ নিজ চক্র থেকে বেরিয়ে এসো সবাই।  
দুষ্ট দানবের অত্যাচার থেকে ধরিত্রীবক্ষ পবিত্র করো,  
সজ্জিত কর তাকে সকল সুষমায়।  
আকাশ-বাণী পোয়ে বাদশা আকাশকে উৎসর্গ করলেন  
তাঁর সকল দুঃখ ও বেদনার ভার।  
তিনি বিশ্ব-প্রভূর মহান নাম উচ্চারণ করলেন,  
আর সেই নাম-মহিমায় মুছে নিলেন চোখ থেকে অক্ষ।  
তারপর সিয়ামকের রক্তের প্রতিশোধ-প্রয়াসে ত্বরান্বিত হয়ে  
তিনি দিবা-রাত্রির বিশ্বাম ও ঘুমকে বিসর্জন দিলেন।

## কৃষ্ণকায় দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কায়ুমূরস ও হোশঙ্গের যাত্রা

সিয়ামকের এক ভাগ্যবান পুত্র ছিল,  
পিতামহের কাছে সে-ই ছিল যুবরাজস্থানীয়।  
তার নাম ছিল হোশঙ্গ,—  
সে ছিল জ্ঞান বুদ্ধিমত্তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।  
পিতামহের চোখে সে তার পিতার স্মৃতি,  
পিতামহের অস্তরে তার স্থান ছিল পুত্রেরই মতো  
কখনো তিনি চোখের আড়াল করতেন না।  
যখন বাদশার হাদয়ে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা প্রবল হলো,  
তখন তিনি সুশি হোশঙ্গকে কাছে ডাকলেন।  
এবং তার কাছে বিবৃত করলেন সকল বৃত্তান্ত,  
তার অজ্ঞান সকল গোপন কথা অবারিত করলেন।  
তারপর বললেন, এক সৈন্যদল আমি তোমায় সোপার্দ করতে চাই,  
আমার শোক সমর্পণ করতে চাই তোমার উপর।  
তুমি গ্রহণ করবে আমাদের নেতৃত্ব,  
নৃতন সেনাপতির অধীনে আমরা যুদ্ধযাত্রা করবো।  
পরীদল ও ব্যাপ্ত আমরা জয়যোগ্য করবো,  
হিংস্র নেকড়ে ও সিংহদল করবে তোমার অনুগমন।  
বাদশার আদেশে সবাই এলো —  
এলো সৈন্যদল ও বন্য পশুবল, এলো উড়ন্ত বিহঙ্গ শক্তি ও  
দ্রুতধাবমান অশ্ব।  
সৈন্য-সামন্ত ও পশুদল, উজ্জীয়মান বিহঙ্গ ও পরীদল —  
অভিজ্ঞ সেনাপতি ও সাহসী বীরবৃন্দ নিয়ে যুবরাজ যাত্রা করলেন।  
সৈন্যদলের পশ্চাতে রাইলেন বাদশা কায়ুমূরস,  
আর বীরবৃন্দের মাঝখানে শোভাবর্ধন করলো স্নেহশীষ-শিরে  
স্বয়ং রাজ-পৌত্র।  
ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কৃষ্ণকায় দৈত্য বেরিয়ে এলো,

সেই দৃশ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলো ধূলিরাশি ।  
হিস্ত পশুদলের ভীম গর্জনে দৈত্যের তীক্ষ্ণ নখর  
নৈরাশ্যে থাবার মধ্যে প্রবিষ্ট হলো ।  
পশুদলের বীর্যবস্তায় পর্যুদস্ত হলো দৈত্যদল ।  
যুবরাজ হোশগের হাতে ব্যাঘ-নখর দৈত্য-রাজ বন্দী হলে  
দুর্জয়-দানবের জন্য ধরণী আবার সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ হলো ।  
যুবরাজ দৈত্যকে কঠিন বক্সনে বন্দী করলেন,  
এবং অচিরেই তাঁর আদেশে দৈত্যের কষ্টচ্ছেদ পর্ব  
সমাপ্ত হলো ।

পদদলিত অপমানিত ও ছিন্নভিন্ন দৈত্যরাজ ;—  
বিদ্রোহের পরিণতি স্বরূপ মাটির উপর পড়ে রইলো তার  
নিষ্পাণ দেহ ।

এইভাবে জিঘাংসা পরিত্পু হলে  
কায়মুরসের জীবন-সূর্য অস্তমিত হওয়ার লগ্ন এলো ।  
তিনি চলে গেলেন । তাঁর মতো প্রজানুরঞ্জক কোন্ নরপতি  
এবার তখ্তে আসীন হলেন, চল তাই আমরা  
এখন দেখতে যাই ।

দুনিয়া কপটাচারীর আড়ম্বরকে ধূলিসাধ করে,  
সে লাভের পথে পা বাড়ায় কিন্তু পরিণামে তাকে হারাতে হয় মূলধন ।  
জগৎ কাহিনী বৈ নয়,  
ভালো-মন্দ দুই-ই এখানে অচিরস্থায়ী ।

## হোশঙ্গ

বাদশা হোশঙ্গ চলিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন

বাদশা হোশঙ্গ জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে

পিতামহের তাজ নিজের শিরে ধারণ করলেন।

তাঁর মন্তকের উপর আবর্তিত করলো আকাশ চলিশটি বছর,  
এই দীর্ঘ-সময় বিজ্ঞতা ও হৃদয়ের উদারতায় ভরপূর হয়ে রইলো।

জাতির নেতার আসনে বসে

তথের উচ্ছতা থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন,—

আমি সপ্তরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি,

সর্বত্র আমি জয়ী, সকল দেশে আমি ফরমান-দাতা।

বিশ্ব-প্রভুর আদেশে আমি বিজয়ী,

তাঁর করণা ও দয়ায় আমি সকল কাজে উৎসাহী।

তারপর তাঁরই ইচ্ছায় তিনি ধরণীকে আবাদ করেছিলেন,

বদান্যতায় উৎফুল্ল করেছিলেন তাঁর সুন্দর মুখ।

প্রথমেই এক মূল্যবান বস্তু তাঁর লাভ হয়েছিল

শিখেছিলেন তিনি লৌহের ব্যবহার,— প্রস্তর থেকে বিলক্ষণ করে।

সেই ধারালো লৌহের সাহায্যে

কর্তিত হয়েছিল কঠিন শিল।

এইভাবে লৌহের সাক্ষাৎ পেয়ে লোহজীরী কর্মকার

সম্প্রদায়ের উত্তুব হলো,

তৈরি হলো কুঠার কাস্তে প্রভৃতি উপকৰণ।

তারপর ফসলের উপযোগী পানি

নদী ও জলাশয় থেকে নীত হলো মাঠে ও প্রান্তরে।

স্বোতন্ত্রনীর কোল ছেড়ে জলধারা পথ ধরলো প্রান্তরে,

বাদশার সৌভাগ্যের দীপ্তিতে মানুষের দুঃখ লঘু হলো।

এইভাবে মানুষ বস্তুর গুণাগুণ অবহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো জলে-স্থলে

ও নিজের বৎশ বৃক্ষি করে চললো।

প্রত্যেকেই তখন তৎপর হলো স্বীয় জীবিকার অন্বেষণে,

সাধনা এনে দিলো তার হাতে বিভিন্ন সামগ্রী।

জীবিকায় সে প্রতিষ্ঠিত করলো নিজের কর্তৃত্ব,

স্বীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অধিকার ও কৃষিকর্ম হলো নিশ্চিত।

এর পূর্বে মানুষের ইচ্ছার ভূমিকা ছিল নগণ্য,

খাদ্য ছিল তার গাছের ফলমূল মাত্র।  
সমস্ত কর্মেই তখন উপকরণের অভাব ছিল,  
ব্যক্ষপত্র ছিল মানুষের পরিধেয়।  
পিতামহের কালেও, জীবন-রীতি এমনি ধরনের ছিল,  
মানুষ পূজা করতো বিশ্ব-প্রভুকে।  
কিন্তু যখন পাষাণের উপর প্রতিহত হলো আঘাত  
তখন তা থেকে বেরিয়ে এলো নৃত্যপরা অগ্নিশিখা।  
তার রূপ-গৌরব তখন থেকেই  
দুনিয়ার দিক-দিগন্তে আলোকিত করে ছুটলো।

## অগ্নি-উৎসবের সূচনা

বাদশা একদিন তাঁর পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে  
পর্বতসঙ্কল এক অরণ্য-প্রদেশে ভরণত আছেন,  
এমন সময় সহসা দূরে এক দীর্ঘ বন্ধু পরিদৃষ্ট হলো,—  
কৃষ্ণবর্ণ, অঙ্ককার-কায় ও দ্রুতগতি।  
তার দুই চক্ষ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তের দুই ধারা,  
আর মুখ-গহ্বর থেকে বিনির্গত ধূম্রাশিতে ধরণী অঙ্ককার হচ্ছে।  
হোশঙ্গ স্থিরমস্তিক্ষে ও দৃঢ়চিত্তে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন,  
এবং একটি প্রস্তর খণ্ড নিয়ে অবর্তীণ হলেন সংগ্রামে।  
তখন বিশ্ব-অন্বেষণকারী বাদশার সামনে থেকে  
বিশ্ব-দহনকারী সর্প লম্ফ প্রদানে প্রয়াণপর হলো।  
বাদশা প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করলেন,  
ক্ষুদ্র এক পাথরের সঙ্গে তা প্রহত হলো।  
দুই পাথরের ঠুকাঠুকিতে নিঃস্ত হলো আলো,  
চেতনার দর্পণে পড়লো তার প্রতিবিম্ব।  
সাপ মরলো না, কিন্তু সেই আগুনের রহস্য  
পাথর থেকে জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো মানুষের মনের  
সর্পিল পথে পথে।

তারপর থেকে যে-কেউ পাথরে মারলো লৌহদণ  
তার থেকেই বিনির্গত হলো আলো।  
পৃথিবীর বাদশা বিশ্ব-প্রভুর সমক্ষে  
উচ্চারণ করলেন স্তোত্র ও প্রশংসাবাণী।  
ভাবলেন, বিশ্ব-প্রভু স্বয়ং আলোময়, এ তাঁরই দান,  
আমাদের পৃজার উপকরণ রূপেই তিনি তা আমাদের দিয়েছেন।  
খলেন, জ্যোতি তাঁরই জ্যোতির প্রকাশ ;  
এই আগুনের পৃজাই বিধেয়।  
তারপর রজনী সমাগত হলে প্রজ্ঞালিত করা হলো অগ্নিকুণ্ড,  
বাদশা ও তাঁর লোকজন এসে জমায়েত হলো তার চারদিকে।  
সেই রাত্রে এক উৎসবের গোড়াপস্তন হলো, সুরা পানে  
নিরত হলো সবাই,  
এবং সেই প্রখ্যাত উৎসবের নাম রাখা হলো সদা বা অগ্নি-উৎসব।  
এই উৎসব গাঁথা হয়ে রইলো হোশঙ্গের নামের সঙ্গে,

পরবর্তী বহু বাদশা এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন নিজেদের নাম।  
এইভাবে দুনিয়াকে আবাদ করে তিনি লোকরঞ্জনের কারণ হলেন,  
দুনিয়া তাঁকে মনে রাখলো যুগ যুগ ধরে।  
বিশ্ব-প্রভুর থেকে জ্ঞান লাভ করে বাদশা দুনিয়ায় পত্তন করলেন  
নিয়ম-শৃঙ্খলার,  
বিভক্ত করলেন হিংস্র-ব্যাঘাদির থেকে হরিণাদি চতুর্পদকে।  
দলে দলে আলাদা করলেন গবাদি পশু, খরগোশ ও গদ্দভ  
এবং প্রয়োজনীয় পশুকে গ্রহণ করলেন চাষাবাদের উপরকরণ রূপে।  
পৃথিবীর বাদশা হোশঙ্গ বললেন,—  
এইসব পশুকে তোমরা জাতে জাতে আলাদা করে রাখ।  
এইগুলো তোমরা খাবে আর এইগুলো দ্বারা চাষাবাদ করবে,  
আর এইগুলো রাজস্ব হিসেবে রাজসরকারে সমর্পণ করার জন্য  
পালন করবে।

পশুদের মধ্যে যাদের লোম সুন্দর ও উত্তম,  
তাদেরকে মেরে তাদের চর্ম আকর্ষণ করে নিবে।  
সেইসব পশু হলো সঞ্জাব, কাকুম এবং সমূর—  
এদের লোম মসৃণ ও তাপ-সঞ্চারক।  
এদের চর্ম দ্বারা তৈরি করে নিবে  
মানুষের দেহ-সংজ্ঞাকুপী সুদর্শন পোশাক।  
এইভাবে মানুষকে খাদ্য, পরিধেয় ও জীবন ধারণোপযোগী  
উপকরণাদি দান করে  
হোশঙ্গ পরলোকগামী হলেন, পেছনে পড়ে রইলো তাঁর সুনাম ও যশোরাশি।  
তাঁর চল্লিশ বছরের রাজত্ব দক্ষতা ও সফলতারনির্দর্শন হয়ে রইলো;  
বদন্যতা ও মহানুভবতা সম্পৃক্ত হলো তাঁর নামের সঙ্গে।  
বহু ক্লেশ ও যত্নে রচিত এক সংহিতা তিনি রেখে গেলেন —  
মন্ত্র ও জ্ঞানগর্ত সন্দর্ভে তা ভরপুর।  
এইভাবে মহাপ্রয়াণের শুভলগ্ন সমাগত হলে  
রাজ-সিংহাসন তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হলো।  
কাল আর তাঁকে মুহূর্ত মাত্র অবসর দিলো না,  
আহা, জ্ঞানী গুণী শ্রিচিত্ত বাদশা হোশঙ্গ !  
দুনিয়া আর তোমায় প্রেমের সঙ্গদান করবে না,  
সে আর দেখতে পাবে না তোমার সুদর্শন বদনমণ্ডল !

## তহমূরস

দানব-দমন বাদশা তহমূরস ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন

বাদশা হোশঙ্গের এক বুদ্ধিমান পুত্র ছিল,  
তার নাম ছিল দানব-দমন তহমূরস।  
পিতার সিংহাসনে অধিরাজ্য হলেন সেই সুযশ নায়ক  
রাজকার্য পরিচালনায় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রস্তুত হলেন।  
দেশের জ্ঞানী, গুণী ও সৈন্যদেরকে তিনি ডাকলেন,  
তারপর বাগীতার সঙ্গে সম্বোধন করলেন তাদেরকে।  
বললেন, আজকের এই দিন, এই সিংহাসন, এই আলয়,  
এই রাজদণ্ড ও রাজমুকুট আমার জন্য শোভন হয়েছে।  
এদের সাহায্যে আমি দুনিয়াকে সুপথে পরিচালিত করবো,  
এবং এই সিংহাসন থেকেই পৃথিবীকে করবো আমার পদানত।  
দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্ত সঙ্কুচিত করবো দৈত্যদের জন্য,  
কারণ, আমিই হবো দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি।  
এই পৃথিবীর প্রতিটি কল্যাণকর বস্তুকে,  
অঙ্গানতার বন্দীদশা থেকে আমি মুক্ত করে আনবো।  
ফলে, ভেড়া ও দুম্বার চিকন লোমরাজি  
কর্তিত হয়ে প্রবর্তিত হলো পরিধেয় তৈরির শিল্প।  
নিয়ত অনুশীলনে পরিদ্রষ্ট হলো তার নব নব বিকাশ,  
গালিচা ও সুদর্শন আচ্ছাদনী নির্মিত হলো।  
পশ্চদের মধ্যে যারা ছিল দ্রুতগামী,  
তাদের খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট হলো সবুজ ঘাস, নাড়া ও ঘব।  
হরিগাদি চতুর্সু যা-কিছু দৃষ্টিগোচর ছিল,  
তাদেরকে বেছে নেওয়া হলো নেকড়ে ও চিতাদি হিংস্র জন্ত থেকে।  
ফাঁদ পেতে তাদেরকে ধরা হলো পর্বত ও বনভূমি থেকে,  
দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা হলো তাদেরকে বন্ধন রঞ্জুতে আবদ্ধ করে।  
বিহঙ্গদল থেকে আনা হলো সৌভাগ্যমূলক হমাপঞ্চী,  
উন্নতশির শ্যেন ও শিকারী বাজপাখি।  
আনা হলো বুলি-কওয়া শুক ও কাকাতুয়া —  
মানুষের জগতে তাবা রচনা করলো আবেক জগৎ  
তাদের আওয়াজে সৃষ্ট হলো সুরের মধুরিমা,  
মাধুর্য ও মিষ্টত্ব হলো রসনার লক্ষ্য।

যখন এই পোষা সুকষ্ট পাখিদল লোকালয়ের বাশিন্দা হলো,  
তখন ক্ষত-লাঙ্গিত মানুষের বেদনা-চিৎকার পেলো  
সান্ত্বনার স্পর্শ।

এইভাবে যেখানে যা সাজে তা উপস্থিত করে  
গুপ্ত কল্যাণকর বস্তু সকল একত্রিত করা হলো।  
তারপর বলা হলো, এই সব দানের জন্য শোভন হবে  
মৃষ্টার প্রতি প্রণিপাত,

বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসনাবাণী উচ্চারণ করা হবে মানুষের ধর্ম।  
কারণ, তিনিই আমাদের দিয়েছেন হরিণ ও গবাদি চতুর্ষদ,  
তাঁরই স্তোত্রপাঠ নীতিই হবে আমাদের স্মরণীয়

কারণ সেই নীতি কর্মের অঙ্গস্ল থেকে আমাদের রক্ষা করবে।

তাঁর নামে তোমরা আনন্দিত হও সর্বত্র,  
সৎকার্য দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভ করে নির্ভর্যে বিচরণ কর,  
যাত্রির গভীরতার মধ্যে হও তাঁর সমীপবর্তী।

যাঁর হাদয়ে আছে তাঁর জন্য প্রেম,  
দিবা-রাত্রির উপাসনা তার পক্ষে কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়েছে।  
বাদশার ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন,—

অচিরে দেশ থেকে দূর হলো দুনীতি ও দুশ্চারিতা।

বাদশার সমীপ হতে নির্গত হয়ে চললো সততার ধারা,  
সরল নীতিজ্ঞান থেকে সদিচ্ছা অগ্রগতির পথ ধরলো।

এইভাবে বাদশা নিজেকে পবিত্র করলেন সমস্ত কৃটি থেকে,  
বিশ্ব-প্রভুর সমারোহ ও দীপ্তি তাঁর উপর প্রতিবিনিষিত হলো।

এমনি করে তাঁর সৎকর্মের কাফেলা যখন এগিয়ে চললো ধর্মের পথে,  
তখন জ্ঞান তাঁর কাছে আরো সুলভ হলো।

একদিন তিনি আহুরিমন্ত্ৰ (শয়তান)-কে পদচ্যুত করে  
মন্ত্র দ্বারা তাকে বন্দী করলেন,

সে তখন অত্যন্ত দ্রুতগামী এক ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল।

---

জ্ঞেয়োয়েষ্ট্রীয় ধর্মমতে ভালো-মন্দ আলো-অঙ্ককারের দুই দেবতা কল্পনা করা হয়েছে।  
আহুরমজ্ঞন সৎ ও আলোর দেবতা এবং আহুরিমন অসৎ ও অঙ্ককারের দেবতা। সেইমতে সৎ-  
অসৎ ও আলো-অঙ্ককারের দৃশ্য চিরস্তন।

যুগ যুগ ধরে কালকে তার অনুগামী করার জন্যে  
পৃথিবীর চারদিকে সে ছুটিয়ে নিয়ে চলছিল তার বাহন।  
দৈত্যদল যখন বাদশার এই কৌতির কথা শুনতে পেলো,  
তখন তারা তাদের গ্রীবা সরিয়ে নিলো তাঁর আনুগত্যের থেকে।

সকল দৈত্য একত্রিত হয়ে বললো,  
খসিয়ে আনতে হবে বাদশার সুবর্ণ মুকুট তাঁর শির থেকে।  
তহমূরস দৈত্যদের এই কথা শুনতে পেয়ে  
অত্যন্ত ক্ষেত্রান্তিত হলেন ও তাদের পরাভূত করতে তৎপর হলেন।  
দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি

শাহী জাঁকজমকের সঙ্গে;

এবং কাঁধে তুলে নিলেন ভারী গদা।  
বর্ষীয়ান দৈত্য ও জাদুকরণ মিলে  
জাদুর বলে গড়ে তুললো এক বিরাট দানব-বাহিনী।  
ক্ষণকায় দৈত্য হলো তাদের সেনাপতি,—  
এই দৃশ্য হতাশ দৈত্যদের মনে সাহস এনে দিলো।  
তাদের পদধূলিতে বাতাসের রঙ হলো ক্ষণবর্ণ, ধরণী হলো অন্ধকার,  
চক্ষু ও বাতায়ন সকল অক্ষ হলো  
বাদশা তহমূরস সৈন্যদল সহ  
রোষ-কশায়িত দৃষ্টিতে রণভূমিতে অবতীর্ণ হলেন।  
একদিকে গর্জনরত দানবদল,  
অন্যদিকে পৃথিবী-পতির সাহসী সেনাদল।  
অন্তিমিলম্বে মুক্ত শুরু হলো,  
কিন্তু শীঘ্ৰই হলো জয়-পরাজয়ের দ্বিধা-দৃন্দের অবসান।  
দৈত্যদলের একাংশ মন্ত্র দ্বারা বন্দী হয়ে পড়লো,  
অন্য অংশ গুরুভার মুষলের আঘাতে ধ্বংস হতে লাগলো।  
আহত, বন্দী ও অপমানিত দৈত্যদল তখন  
প্রাণভিক্ষা চেয়ে সন্তুষ্টির প্রস্তাব পেশ করলো।  
বললো, হে রাজন, আমাদের প্রাণ-সংহার করো না,  
আমরা তোমার অনুগত শিক্ষার্থীরূপে তোমার সমীক্ষে নতশির হচ্ছি।  
সুযশ বাদশা দৈত্যদের প্রার্থনা মঙ্গুর করে তাদের দান করলেন  
শীয়ায় শরণ,  
ফলে তাদের ভাবের গভীরতায় সাড়া জাগলো।

বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে দৈত্যগণ  
বাদশার সমীপে মিত্রতার প্রার্থনা জানালো  
বাদশার বরাবরে তারা এক প্রার্থনাপত্র লিখলো,  
তাদের হাদয় বাদশার জ্ঞান থেকে আলো লাভ করার জন্য  
ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

বাদশার আদেশে এক হকুমনামা লিখিত হলো,—  
রোমক, আরবীয় ও ইরানের সকল দৈত্যের উপর  
তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

সমরকন্দী, চীনদেশীয় কিংবা পহ্লবী ভাষী,  
যে এই হকুমনামা শুনলো সে-ই বিনা বাক্যব্যয়ে আনত করলো  
তার মস্তক।

এইভাবে দুনিয়াপতি হোশঙ্গ ত্রিশটি বছরকে  
শিল্প ও জ্ঞান-গরিমার সামগ্ৰীতে ভরে তুললেন।

তাৰপৰ তিনি পৱলোকণ্ট হলে  
তাঁৰ স্মৃতিৰ বেদনায় ভৱপূৰ্ব হলো সকলেৰ অস্তৱ।

যদি লোকেৱ আশীৰ্বাদ তোমাৰ কাম্য হয়,  
তবে, ঘনে রেখো, দুনিয়া অবশ্য পূৰ্ণ কৰবে তোমাৰ কামনা।

কৰ্ম কাউকে নিয়ে যায় আকাশেৱ উত্তুঙ্গতায়,  
আৱ কাউকে অপমানিত অবস্থায় নিষ্কেপ কৰে ধূলিতলে।

## জামশেদ

বাদশা জামশেদ সাতশো বছর রাজত্ব করেছিলেন

সুযশ বাদশা হৈশদের পর

পিতার স্থানে এলেন কীর্তিমান পুত্র।

তাঁর সুভগ নাম জামশেদ,

তিনি বীর্যবান ও বুদ্ধিমান।

কেয়ানী বৎশের রীতি অনুযায়ী তাঁকে পরানো হলো সুবর্ণ মুকুট,  
যশস্বী পিতার সিংহাসন হলো তাঁর উপবেশন।

রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর বাদশাহী শুরু হলো,  
সারা দুনিয়া তাঁর জন্য খুলে দিলো তার শরণ।

কাল উৎফুল হলো তাঁর সামনে,

তাঁর আদেশের অনুগামী হলো দৈত্য, বিহঙ্গ ও পরীদল।  
দুনিয়া তাঁর থেকে লাভ করলো বৃক্ষি,

রাজসিংহাসন তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে উজ্জ্বল হলো।

তিনি বললেন, আমি বিশ্ব-প্রভুর ঔজ্জ্বল্যের প্রতিবিম্ব,  
বাদশাহী আমারই বাহবলে নিঝীব হয়েছে,

কল্যাণ আমার ইঙ্গিতে হয়েছে সম্মুখবর্তী।

প্রথমে যুক্তাম্বসকল উদ্ভাবনের মানসে

রাজকীয় প্রচেষ্টা করলো বহু বহু দিগ্নেশ যাত্রা।

তারপর বাদশার তেজ়দীপ্তিতে লৌহ কোমল হলো,

তদ্বারা নির্মিত হলো লৌহ-শিরস্ত্রাণ বর্ম ও সাঁজোয়া।

আরো তৈরি হলো তনুত্রাণ, কবচ ও প্রতিরোধ ফলক,—

উদ্ভাসিত-হৃদয় বাদশার নির্দেশে তৈরি হলো এইসব সমরোপকরণ।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এইভাবে বহু ক্লেশে

তিনি রাজকীয় কোষাগারের ভিত্তি প্রস্তুন করলেন।

পরবর্তী পঞ্চাশ বছর তিনি মগ্ন রাইলেন পোশাকের আবিষ্কারে,—

মানুষ যা পরবে উৎসবের দিনে ও বিজয়ের শুভলগ্নে।

তৃতোকার লালাজাত তন্ত্র থেকে তৈরি হলো রেশম,

যা দিয়ে প্রস্তুত হতে পারে মূল্যবান কৌশিক পরিধেয়।

শিক্ষা দিলেন তিনি প্রজাগণকে সুতাকাটা ও কাপড় বোনার কৌশল,—  
কি করে তাঁতের উপর পরিয়ে দিতে হয় তানা পড়েন।

যখন লোকে এইসব কৌশল শিখে নিলো,  
তখন রেশমী পরিধেয় তৈরি ও সীবন বিদ্যাও তিনি তাদের আয়ত্ত করালেন।  
এই কাজ সমাপ্ত করে তিনি অন্যান্য উপকরণ

‘আবিষ্কারের দিকে মন দিলেন,  
কাল তাঁকে নিয়ে ও তিনি কালকে নিয়ে সুধী ও আনন্দিত হলেন।  
প্রতিটি শিল্প গড়ে তুললো এক-একটি সম্প্রদায়,  
এবং এই পর্যায় সৃষ্টিতে চলে গেল আরো পঞ্চাশটি বছর।  
তারপর পূজারীদের এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করা হলো,  
প্রচলিত হলো তাদের দ্বারা ভগবৎ-পূজার রীতি।  
অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে আলাদা করে  
পূজকদের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হলো পর্বতের নির্জন হান  
সেই থেকে পূজা-উপাসনা হলো তাদের কর্ম,  
বাদশার আদেশে এই জীবন-বিধানই তাদের জন্য নিষিদ্ধ হলো।  
গোড়াপত্ন হলো আরো এক সম্প্রদায়ের,  
তার নাম হলো শূর সম্প্রদায় বা ক্ষত্রিয়।  
এই সম্প্রদায় থেকেই এলো রণভূমির সাহসী বীরবৃন্দ,  
জন্ম নিল সৈন্য ও সেনাবাহিনী।  
এদেরই শৌয়বীর্যে নির্বিশু হলো বাদশার সিংহাসন,  
এদেরই মধ্যে চিরজীবী হয়ে রইলো বীর্যবত্তা ও পৌরষের সুনাম।  
সামাজের তৃতীয় অংশ,  
যার উপস্থিতি ব্যতিরেকে মানুষের সুখ নেই —  
সে হলো কারিগর, কৃষিজীবী ও পণ্য নিয়ে ভ্রমণকারীদল,  
এদের প্রচেষ্টায় জীবিকা হলো নিশ্চিত।  
বাদশার নির্দেশের ফলে নগু ও ছিন্নকস্থাধীরী মানুষ  
দেখলো সুখের মুখ ;  
তাঁর কঠস্থ ঘুটিয়ে দিল অপমানিতের মর্মপীড়া।  
বাদশার এইসব বিধানের ফলে মানুষ অভাব থেকে মুক্ত হলো,  
তাঁর শাসনে ও বাণীতে দুনিয়া পেলো নিরাপত্তার সাক্ষাৎ।  
মুক্ত মানুষের কবি কি সুন্দর বলেছেন,—  
নিষ্ক্রিয়তাই স্বাধীন মানুষকে করে রাখে বন্দী।

---

এই শ্রেণীবিভাগ প্রাচীন ভারতীয় শ্রেণীবিভাগের অনুকরণ।

সমাজের চতুর্থ অংশ — যারা মানুষকে দান করে আনন্দ ও সেবা,  
তাদের দ্বারা কৃষককুল লাভ করলো নিরাপত্তা।

এইভাবে সর্বত্র মানুষ গ্রহণ করলো কোন না কোন বৃত্তি,  
সর্বত্র প্রবাহিত হলো জীবনের ধারা জ্ঞান ও কৌশলকে  
আয়ত্ত করে।

এইভাবে আরো পঞ্চাশ বছর কেটে গেলো,  
এলো বহু সামগ্ৰী ও অনেক রকম খাদ্যবস্তু  
এক খেকে দুই — এইভাবে এগিয়ে গেলো সভ্যতা,  
গৃহীত হলো যেখানে যা সাজে, এবং দেখো দিলো এগিয়ে চলার পথ।  
মানুষ দেখতে পেলো স্বীয় প্রয়োজনের সামগ্ৰী,  
এবং জানতে পেলো অল্প ও বেশীর পার্থক্য।

অপবিত্র দৈত্যদের উপর আদেশ হলো  
পানিৰ সঙ্গে মাটি একত্রিত করে কাদা তৈরি কর।  
কাদাৰ সঙ্গে পৰিচয় হওয়াৰ পৰ  
তাকে কাঠামোতে রেখে তৈরি কৱা হলো পাতলা ইট।

পাথৰ ও গাড়োৱ সাহায্যে তখন দৈত্যদের দ্বারা তৈরি কৱান হলো প্রাচীৱ,  
এবং তাৱই সঙ্গে গোড়াপত্ন হলো স্থাপত্যেৰ।

এলো স্নানাগার, এলো উচু অট্টালিকা,  
তৈরি হলো প্রাসাদ ও দুর্গ যাতে আশ্রয় নেওয়া যায়  
বিপদেৱ দিনে।

একদিন আবিষ্কৃত হলো কঠিন মাটিৰ বুক থেকে মূল্যবান মণি,  
যাব ফলে উজ্জ্বলিত হলো বাসনাৰ মণ্ডুষা।

হাতে এলো কত—না রত্ন,—

নীলা, সূর্যকান্ত মণি, রংজত ও কাঞ্চন।

একবাৰ যখন মানুষেৰ মন্ত্ৰশক্তিতে কঠিন মাটিৰ বক্ষ

উন্মুক্ত হলো,

তখন একেবাৰেই খুলে গেলো রত্নগহেৰ বৰ্দ্ধ দুয়াৰ।

কত—না সুগন্ধ হিল্লোল তুললো বাতাসেৰ বুকে,

মানুষেৰ আনন্দ হলো তাতে শতগুণ বৰ্ধিত।

লোৰান, কৰ্পূৰ ও অপ্রাপ্য মৃগনাভি,

ধূপ—ধূনা ও সুদৰ্শন গোলাপ ছড়ালো তাদেৱ সুৱভি নিৰ্যাস।

চিকিৎসা ও আৱোগ্য—বিধি

খুলে দিল স্বাস্থ্য ও বেদনা—নিৱসনেৰ বাতায়ন।

সকল গোপন তথ্য প্রকাশিত হলে  
দুনিয়া তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুরাশির সাক্ষাৎ পেলো।  
জলে ভাসলো নৌকা — পথ হলো বারিরাশির উপর,  
সুগম হলো এক দেশ থেকে অন্য দেশের সফর।  
সফলতায় ভরে উঠল আরো পঞ্চাশটি বছর  
শিল্প-কলা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারে সে আর কোন বস্তুকেই  
লুকায়িত দেখল না।

এইভাবে যখন সব কিছুর আবিষ্কার সম্ভব হলো,  
তখন বাদশার ঢোখ পড়লো নিজের উপর — তিনি দেখলেন  
নিজেকে অদ্বিতীয়।

সীয় মাহাত্ম্যের উর্ধ্বে উঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁতে প্রবল হলো।  
তখন শাহী আড়ম্বরের উপযুক্ত করে রচিত হলো এক রত্নসিংহাসন,  
বহু মূল্যবান মণিমাণিক্য তাতে খচিত হলো।  
বাদশার হৃকুমে দৈত্যগণ বহন করতো এই সিংহাসন,  
বনভূমি ছেড়ে গতি হতো তার আকাশ-পথে।

উজ্জ্বল সূর্যের মতো বায়ুমণ্ডলে  
সেই রাজাসনে উপবিষ্ট থাকতেন দণ্ডধারী বাদশা।  
জগৎ তাঁর সভামণ্ডপ আর তিনি সেই সিংহাসনে সমাসীন,  
ফলে তাঁর ভাগ্যের দীপ্তি আরো বর্ধিত হতো।

মুক্তা বর্ষিত হতো জ্যোতিসের সামনে  
প্রতিটি দিন নৃতন দিনকে ডাক দিয়ে যেতো।  
বছরের শুরুতে পয়লা মাসের প্রথম দিন আসতো,—  
শুচি-দেহ সুস্থ-মন ও সর্বদুঃখহর।

সেই নওরোজের দিনে বাদশা আবির্ভূত হতেন —  
তখ্তে সমাসীন — বিজয়ী সফলকাম ও আনন্দ-চিত্ত।  
দলপতিগণ আনন্দিত চিত্তে এসে সমবেত হতো,  
গায়কদল বিস্তার করতো সুরের উন্মাদনা।

এই শুভ উৎসব তখন থেকেই  
বাদশাদের জন্য তাঁর স্মারক হয়ে রইলো।  
এইভাবে অতিবাহিত হয়ে গেলো তিন শো বছর,  
এই সময়ের মধ্যে কেউ দেখলো না কোন মৃত্যু।  
রইলো না কেউ অকর্মণ্য বেকার,  
রইলো না কারো দুঃখ কিংবা রোগ-শোক।

দুষ্টলোকের আঘাত কিংবা কোনরূপ বেদনা থেকে

মানুষ আজাদ হলো,

দৈত্য দানব রাজভয়ে দাসদের মতো অনুগত হয়ে রইলো ।

সর্বত্র বিস্তৃত হলো মহান সিংহাসনের প্রভাব,

পৃথিবীর বন-প্রান্তর সম্মাটকে বরণ করে নিলো শাসকরূপে ।

আহা ! তখ্ত সমাসীন বাদশা জমশেদ,—

তাঁর পদতলে নন্দিত হতো বাদ্য, ছন্দিত হতো সুরাপাত্র ।

দৈত্যরা বহন করে নিয়ে যেতো তাঁর তখ্ত,

উজ্জীবন হতো তা মেঘমালার উর্ধ্বে ।

লোকালয় ছেড়ে সে উত্থিত হতো —

ছাড়িয়ে যেতো সেই পরিধি যথানে বিহঙ্গদল পাখা বিস্তার করে

উড়ে বেড়ায় ।

তাঁর ফরমানে তৃপ্ত হতো মানুষের শ্রবণ

তাঁর মধুর গুঞ্জনে ধরিত্রী পান করতো সঞ্চীবনী সুধা ।

যুগ যুগ ও বর্ষ বর্ষ ধরে

ধরণী এইভাবে আলোকিত হয়ে রইলো তাঁর বাদশাহীর উজ্জ্বল দীপ্তিতে ।

সেই সফলকাম নরপতির বদৌলতে জগতে বিরাজিত রইতো শান্তি,

বিশ্ব-প্রভুর দিক থেকে আসতো তাঁর কাছে নব নব বাণী !

তাঁর শাসনকালের দিকে তাকালে

বাদশার সৌজন্য ও সফলতা ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ত না ।

ইরান তুরান ও চীনের নরপতিগণ

সবাই তাদের মোহরে অক্ষিত করতেন তাঁর নাম ।\*

পৃথিবীর সবাই আনন্দ করতো মস্তক তার আনুগত্যে

তাঁর সমারোহ সকলকে রাখতো বিস্মিত করে ।

এক দিন বাদশা তার দৃষ্টি প্রসারিত করলো দিকে দিকে,

কিন্তু কোথাও সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না ।

ভগবৎ-ভক্ত বাদশার হাদয়ে তখন উদ্বিদ্ধ হলো অন্ধকার,

বিমুখ হলো সে ঈশ্বরের প্রতি, হলো অক্তজ্ঞ ।

সৈন্যদল সহ ডাকলো সে দলপতিগণকে,

এবং তাদের সামনে দান করলো এক গুরুতর ভাষণ ।

---

এই দুটো পংক্তি দক্ষিণ এশিয়ায় কিংবা ইরানীয় কোন সম্পর্করণে নেই। শাহনামার এক প্রাচীন পাঞ্জলিপির প্রতিলিপি থেকে তা নেওয়া হলো ।

সেই অক্তজ্ঞ বর্ষায়ন নরপতি বললো,—  
 আমি ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ নেই;  
 শিল্প আমারই সৃষ্টি,  
 আমার মতো নরপতি জগতে আর কেউ কোনদিন দেখেনি।  
 আমিই সংজ্ঞিত করেছি ধরিত্রীকে নব নব সজ্জায়,  
 আমারই আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ হয়ে আজ তার এই মনোরঞ্জিনী রূপ !  
 সুখাদ্য, সুনির্দা ও শাস্তি আমারই দান,  
 আমিই তোমাদেরকে দিয়েছি বহুবিধ অঙ্গাবরণ।  
 মাহাত্ম্য রাজমুকুট ও রাজত্ব আমাতেই হয়েছে শোভন,  
 কে বলবে যে, আমি ছাড়া আর বাদশা কেউ আছে ?  
 আমারই উজ্জ্বলিত চিকিৎসা ও ঔষধাদির দ্বারা দুনিয়া লাভ করেছে স্বাস্থ্য,  
 রোগ ও মতু হয়েছে অজ্ঞাত।  
 আমি ছাড়া কে আর মতুকে করেছে পরাজিত,  
 অথচ কতো বাদশাই দুনিয়ায় বাদশাহী করে গেছে।  
 তাই, স্বাস্থ্য ও সুবৃক্ষিণে গণ্য করো আমারই দান বলে,  
 যে আমার থেকে মুখ ফিরায় সে আহরিমন বা শয়তানের চেলা।  
 সুতরাং, যদি বুঝে থাক যে, আমি সব করি,  
 তবে আমাকেই সম্বোধন করো বিশ্ব-প্রভু বলে।  
 এই ভায়ণ শুনে সমস্ত জ্ঞানীজন আনত করলো তাদের দৃষ্টি,  
 টু শব্দটি করতেও সাহস পেলে না কেউ।  
 কিন্তু বাদশার মুখ থেকে বিশ্ব-প্রভুর উপযোগী

অহকার-বাণী শুনে

ব্যথায় ভেঙে পড়লো মানুষের মন ও দুনিয়া পূর্ণ হলো  
 সমালোচনায়।

সুবাই মুখ ফিরালো বাদশার দরবার থেকে,  
 মানুষের মতো মানুষ একজনও রইল না তাঁর সামনে।  
 এইভাবে মাত্র তেইশটি বছরের মধ্যে শূন্য হয়ে গেলো রাজসভা,  
 ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো বেশুমার সৈন্যদল।  
 অহকার একমাত্র বিশ্ব-প্রভুর জন্যই শোভন,  
 বিদ্রোহীর জন্য সে নিয়ে আসে ধ্বংস ও বরবাদী।  
 কি সুন্দর বলেছেন, জ্ঞানী ও বৃক্ষিমান কবি —  
 বাদশার জন্যও উচিত হবে অটল থাকা বিশ্ব-প্রভুর আনুগত্যে।  
 ভগবানের অনুবর্তন থেকে যে মুখ ফিরায়

তার হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয় ভীতি ।  
তাই, একদিন যে ছিল পৃথিবীর জন্য আলো  
সেই জমশেদের চারদিকে আজ ঘূর্ণিত হচ্ছে অঙ্ককার ।  
পরম পবিত্র বিশ্ব-প্রভুর ক্রোধ  
তার হৃদয়কে করে তুলেছে ভয়ে কম্পিত ।

সে অনুধাবন করতে পারছে তাঁর রোষ,  
বুঝতে পারছে কিজন্যে এই দুঃখের সকল প্রতিকারণ অনুপস্থিত ।  
তাই চোখ থেকে তার ঘরে পড়ছে রজাকুশ,  
অনুতাপ আচ্ছন্ন করেছে তার সকল মন ।  
প্রভুর গৌরব-দীপ্তির যে-প্রতিফলন তার উপর ছিল  
তার অস্ত হয়েছে,  
অমঙ্গলের অঙ্ককার এসে গ্রাস করেছে তাকে ।

## জোহাক ও তার পিতার কাহিনী

সেই কালে অশ্বারোহী ও বর্ণাধারী মরুচারীদের মধ্যে  
বাস করতেন এক পুরুষ পুঁজি।  
সৌভাগ্য তিনি ছিলেন নরপতি ও চরিত্রে সাধু,  
বিশ্ব-প্রভূর ভীতি তার অহংকে রেখেছিল অবনমিত করে।  
তাঁর নাম ছিল মরদাস,  
দান ও বদান্যতায় তিনি ছিলেন বিখ্যাত।  
তাঁর দুগ্ধবতী চতুর্ষদ ছিল  
এক হাজারের চারগুণ।  
ছাগী উদ্ধী ও ভেড়ী ইত্যাদি সমুদয় পয়স্বিনী  
ধর্মপথে তাঁর সহায় হয়েছিল।  
দুগ্ধবতী গাভীদল তাঁর অনুগত হয়েছিল,  
দ্রুত ধাবমান আরবী ঘোড়া উদ্যত হতো  
তাঁর ইঙ্গিতে।

তাদের দূধে দরিদ্রের অভাব দূর হতো,  
এই সম্পদ তাঁকে দান করেছিল উন্নত মর্যাদা ও করেছিল  
তাঁকে বিজয়ী।

এই মহাপুরুষের এক পুত্র ছিল,  
বিশ্ব-প্রভূর দয়ার অংশ সে-ও কর পায়নি।  
সেই যশকামীর নাম ছিল জোহাক —  
সে ছিল তীক্ষ্ণবী বীর ও চটুল।  
তার আদেশের অনুগত ছিল দশ হাজার ঘোড়া,  
এবং তার থেকেই পাহলবী ভাষায় তার নাম হয়েছিল  
দশহাজারী।

সর্বত্র সে গণ্য ছিল বীর বলে,  
দরী\* ভাষায় বীরত্ব দাঁড়িয়েছিল দশ হাজারের সমার্থক  
শব্দ বলে।

এইসব সুসজ্জিত আরবী ঘোড়ার প্রতাপে  
তার নাম দূর দূরাস্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

---

\*ফারসী ভাষার এক বিশিষ্ট রূপ যাকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা হতো।

তার জিনের (অশুরোহীর আসন) দুই পাশে সংলগ্ন ছিল দিন ও রাত্রি,  
মাহাত্ম্যের পথেই ছিল তার বিচরণ।

একদিন এক প্রভাত বেলায়

দুষ্ট শয়তান তার কাছে এক সুহৃদের বেশে এসে উপস্থিত হলো।

সুপথ থেকে দুর্ক্ষিতির পথে চালিত হওয়ার জন্যই যেন

যুবরাজ তার শ্রবণ উন্মুক্ত করলো সুহৃদরূপী সেই

শয়তানের বাগীর দিকে।

তার কথা যুবরাজের মনোরঞ্জন করলো,

কারণ সে শয়তানের এমন ছলনা সম্পর্কে অবহিত ছিল না।

যুবরাজ ধীরে ধীরে তার হৃদয়, চেতনা ও পবিত্র প্রাণ সব সমর্পণ

করলো তার হাতে —

সে যেন স্বীয় মন্তিক্ষে ভরে নিলো নিষ্কিপ্ত ধূলিরাশি।

শয়তান যখন বুঝতে পারলো, যুবরাজ তার কুক্ষিগত,

তখন সে অবতারণা করলো বহু সুন্দর আজগুবি কাহিনীর।

সেইসব মনোমুগ্ধকর অস্তুত কাহিনী দ্বারা।

সে যুবরাজের মন্তিক্ষকে তার ছলনার সম্পূর্ণ অধীনে নিয়ে এলো।

এইবার সে বললো, এমন অনেক কথা আমার জানা আছে

যা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

যুবরাজ তখন অধীর হয়ে বললো, আরো বল — এতো শিগগির

চলে যেয়ো না,

ওগো সুপরামর্শদাতা, তুমি আমাদের নতুন কথা শিখাও।

জবাবে শয়তান বললো, তার আগে তুমি আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও,

পরে আমি তোমার কাছে খুলবো আমার রসনার যত ঐশ্বর্য।

যুবরাজ সরল চিঠ্ঠে গ্রহণ করলো সেই প্রস্তাব,

এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

বললো, তোমার কথার গোপনীয়তা আমি রক্ষা করবো সারাজীবন,

যা শুনবো কাউকে তা কোনদিন বলব না।

শয়তান তখন বললো, এই রাজপ্রাসাদে তুমি ছাড়া

আর কাউকেই মানায় না,

তুমিই সত্যিকার ভাবে প্রভুত্বের অধিকারী,— তুমিই যশস্বী।

তোমার মতো পুত্রই বাস্তবিক পক্ষে পিতৃস্থানীয়,

তাই, আমার একটি উপদেশ তোমার শ্রবণ করা উচিত।

এই বৃক্ষ নরপতির জন্য কাল অতি দীর্ঘ হয়েছে,

এবং সেই দীর্ঘ কালই হয়েছে তোমার দুশ্মন।  
ছিনিয়ে নাও তুমি এই সম্পদ তার থেকে,  
তার মর্যাদা দুনিয়ায় একমাত্র তোমাকেই সাজে।  
আমার এই উপদেশের সম্মান যদি তুমি রক্ষা কর,  
তবে তুমি অবশ্যই অলঙ্ঘিত করবে

বাদশাহীর আসন।

শয়তানের এই কথায় জোহাক গভীরভাবে চিন্তান্তিত হলো,  
পিতার রক্তপাত সম্ভাবনায় তার হৃদয় হয়ে উঠলো বেদনাপুত।  
শয়তানকে সে বললো, এই কাজ করা অন্যায়,  
অন্য কোন কথা বল, এমন নৃৎসত্তার প্রয়োজন নেই।  
শয়তান বললো, এই কাজ থেকে যদি তুমি মুখ ফিরাও  
তবে যেনো, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে তুমি কেবল দুঃখকেই  
ডেকে আনবে।

আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞায় তুমি আবদ্ধ,  
যদি তা ভঙ্গ কর তবে অপমানিত হবে তুমি এবং  
তোমার পিতার ভাগ্যও হবে অঙ্ককারাচ্ছন্ন।

এইভাবে সেই আরবী যুবকের গ্রীবা শয়তানের  
ফাসির জালে আবদ্ধ হলো

সে মেনে নিলো শয়তানের আদেশ;  
এবং বললো, আমাকে তবে বল  
কি উপায়ে সেই কাজ সমাধা করি,  
তোমার উপদেশ ছাড়া আমার গত্যস্তর নেই  
শয়তান তখন বললো, তোমার জন্য অবশ্যই আমি

উপায় বের করবো,  
তোমার মন্তক আমি উত্তোলন করবো সূর্যেরও উপরে।  
তুমি শুধু নীরবে আমাকে অনুসরণ করবে,  
আমার সখ্যই হবে তোমার জন্য সর্বোত্তম বস্ত।  
যা কিছু প্রয়োজন সব আমিই তোমার জন্য করবো,  
তুমি শুধু তোমার বাক্যরূপ তলোয়ার কোষ্ঠবদ্ধ রাখবে।

নরপতির প্রাসাদাভ্যন্তরে এক উপবন ছিল —  
সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর।  
মহান নরপতি রাত্রির শেষ যামে গৃহ থেকে বহিগত হতেন,

এবং উপাসনার জন্য আসতেন এই উপবনে।  
সেখানে সবার চোখের আড়ালে তিনি স্নান করে শুচি হতেন,  
এবং একটি প্রদীপের সামনে এসে নিমগ্ন হতেন বিশ্ব-প্রভুর উপাসনায়।  
দুষ্ট দৈত্যদল সেই মহাপুরুষের গমন-পথের একপাশে  
এক কৃপ খনন করে রেখেছিল।  
শয়তান সেই কৃপের উপরে ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে  
তার উপরে টেনে দিলো পথের রেখা।  
অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও নিশ্চিতি রাত এলো,  
আরবদের দলপতি অভ্যাস মতো মীরব উপবনের পথ ধরলেন,—  
সেই গভীর কৃপের নিকট আসতেই  
সহসা তাঁর সৌভাগ্যের শির অবনমিত হলো।  
তিনি পতিত হলেন গভীর কৃপের তলদেশে—  
হায় ! সহদয় খোদাইত্ব মহাপুরুষের হলো জীবনাবসান !  
সদসৎ সকল মানুষই নরপতির মৃত্যুতে শোকে  
আত্মহারা হলো,  
কিন্তু স্নেহপুত্রলী পুত্রের অন্তর থেকে শুধু বিনির্গত হলো  
এক শীতল নিঃশ্঵াস।  
আহা, পরম আদরে ও যত্নে প্রতিপালিত সন্তান—  
যে ছিল দলপতির আনন্দ ও যার মঙ্গলের জন্য তিনি দান করেছেন  
অজস্র সম্পদ;  
সেই দুশ্মনের মতো ঔদ্ধত্বের সঙ্গে  
ভালবাসার বাহ্যিক ছিন্ন করে নিলো, অবলীলায় !  
প্রবাদ আছে,—  
পিতার রক্তে হস্ত প্রক্ষালন করার মতো জঘন্য পাপ থেকে  
রক্তপিপাসু দৈত্যও বিরত থাকে,  
তেমন বীরত্ব প্রকাশে তারাও বোধ করে  
নিজেদের অপমানিত।  
কিন্তু এই প্রবাদ বহন করে আরো এক তাৎপর্য,—  
যার সূত্র মাত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত।  
পুত্র তখনই পিতার স্নেহবন্ধন অবলীলায় ছিন্ন করে  
যখন সে অস্বীকার করতে পারে স্বয়ং পিতৃকেই।  
নীচ ও অত্যাচারী জোহাক সেই প্রবাদকেই সত্যে পরিণত করে  
পিতার আসনে এসে বসলো।

ଆରବ ଦଲପତିଗଣ ତାର ମନ୍ତ୍ରକେ ରାଖଲୋ ରାଜମୁକୁଟ,  
ଏବଂ ତାକେ ସମର୍ପଣ କରଲୋ ତାଦେର ସକଳ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ।  
ଏହିକେ ଶୟତାନ ଯଥନ ତାକେ ସ୍ଵପ୍ରତିଜ୍ଞାଯ ଅଟଲ ଦେଖଲୋ  
ତଥନ ମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଧୁ-ରଙ୍ଗୁ ତୁଲେ ଧରଲୋ ତାର ଶ୍ରୀବାର ଉପର ।  
ମେ ବଲଲୋ, ତୁମି ଯଥନ ଆମାରଇ ଦିକେ ମୁଖ କରେଛ  
ତଥନ ଏହି ଦୁନିଆ ଥିକେ ସବ କିଛୁଇ ତୋମାର ଲଭ୍ୟ ହବେ ।  
ଆବାର ଯଦି କୋନ ନତୁନ ଆଦେଶ ତୋମାର ଉପର ଆପତିତ ହୟ —  
ତବେ ତାଓ ପାଲନ କରବେ ନୀରବେ, ଆର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିକେ ମୁଖ ଫେରାବେ ନା ।  
ତାହଲେଇ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବେ ତୋମାର ବାଦଶାହୀ,  
ହରିଣାଦି ଚତୁର୍ପଦ, ବିହଙ୍ଗ ଓ ମଂସ୍ୟାଦି ହବେ ତୋମାର ଅନୁଗତ ।  
ଏହି କଥା ବଲେ ଶୟତାନ ଅନ୍ୟ କୌଶଳ ଆବିଷ୍କାରେ ମନୋନିବେଶ କରଲୋ,—  
ବିଚିତ୍ର ପଥେ ଧାବିତ ହଲୋ ତାର ଉତ୍ସାବନୀ ଚିତ୍ତା ।

## শয়তানের পাচক বৃক্তি গ্রহণ

একদিন শয়তান এক বাকপটু সুবেশ ও বৃক্ষিমান

যুবকের সাজে সজ্জিত হয়ে

জোহাক রাজার দরবারে এসে উপস্থিত হলো;

রাজা তাকে হাষ্টচিঠে শুভ সন্তানসহ গ্রহণ করলো।

শয়তান বললো, ছজুরের কি পাচকের প্রয়োজন আছে?

আমি একজন যশস্বী পাচক।

পাচকের কথা শুনে জোহাকের মন নেচে উঠলো,

সে তৎক্ষণাত তাকে রান্নার জন্য জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলো।

যথাসময়ে রাজকীয় রক্ষনশালার চাবি সোপার্দ করা হলো শয়তানের হাতে,  
এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে নিযুক্ত করা হলো রাজকর্মে।

সেই আদি যুগে কোন কিছুরই প্রাচুর্য ছিল না,

খাদ্যের জন্য বধযোগ্য প্রাণীর সংখ্যা ও ছিল কম।

সুতরাং দুষ্ট শয়তান রাজাকে পরামর্শ দিয়ে বললো,

খাদ্যের জন্য অবাধে প্রাণী বধ করা হোক।

ফলে বিচিত্র বর্ণের পাখি ও নানা চতুর্শিদ,

প্রত্যহ রাজার খাদ্যের জন্য বর্ধিত হতে লাগলো।

জীবের শেশিতে জীবনধারণ করে বনের ব্যাঘ যেমন প্রাণী হত্যায় তৎপর  
রাজার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি প্রাণের নিধনে মেতে উঠলো।

সেদিন থেকে পাচকের কথা রাজকীয় ফরমানের মর্যাদা পেলো,

তার কথার খণ্ডে আবদ্ধ হয়ে চললো রাজা স্বয়ং

পাচক প্রথমে ডিমের কুসুম দিয়ে তৈরি করলো সুস্বাদু এক ভোজ্য

সেই ভোজ্য শক্তি ও স্বাস্থ্য দান করলো রাজার দেহে।

রাজা ত্পু হয়ে পাচককে পারিতোষিক দান করলো,

খাদ্যের স্বাদ পেয়েছে ভাগ্যবান রাজা।

এই দেখে মায়াবী শয়তান চাটুবাক্য উচ্চারণ করে বললো,

উন্নতশির রাজার ভাগ্যে নিদিষ্ট হোক চির যৌবনের জৌলুস।

আগামী কাল এর চেয়েও সুস্বাদু ভোজ্য আমি রাখবো,

তাতে আপনার রসনা পরিপূর্ণ ত্পুর সঙ্কান পাবে।

সেদিন সারারাত জেগে শয়তান শুধু একটি কথাই চিন্তা করলো —

কাল কি ভোজ্য সে ধরবে রাজার সামনে?

ପରଦିନ ନୀଳ ଗଗନ-ଗମ୍ବୁଜେ  
 ସୂର୍ଯ୍ୟ-କାନ୍ତ ମଣି ସଦୃଶ ଲାଲ ତପନ ଉଦିତ ହଲେ  
 ସେ ଶୁଭ ଚକୋର-ଚକୋରୀର ମାଂସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ  
 ଏକ ରସନା-ତ୍ରୁପ୍ତକର ଭୋଜ୍ୟ ନିୟେ ଆଶାନ୍ଵିତ ଅନ୍ତରେ  
 ରାଜାର ସାମନେ ଏସେ ଉପଶିତ୍ତ ହଲୋ ।

ଆର୍ବୀଯଦେର ରାଜ୍ଞୀ ଭୋଜ୍ୟ ଗଲାଧଳକରଣ କରେ  
ଖୁଶି ହେଁ ପାଚକକେ ମୋହରାଦି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିଲୋ !  
ତୃତୀୟ ଦିନେ ମୋରଗ ଓ ହରିଣ-ଶିଶୁର ମାଙ୍ସ ଦୁଆ  
ଦସ୍ତରଖାନା ସଜ୍ଜିତ କରା ହଲୋ ।

ଚତୁର୍ଥ ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଶନ କରାର କାଳେ  
ଦେଖା ଗେଲୋ ରାଜାର ସାମନେ ଏସେହେ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟମ୍କ ଗାଭୀର ସୁଷ୍ଠାଦୁ ମାଂସ,  
ତାତେ ଦେଓଯା ହେଁଛେ ଜାଫରାନ, ଗୋଲାପଜଳ ଓ ସୁଗନ୍ଧୀ ମୃଗନାଡି,  
ବହୁଦିନେର ପରାନୋ ସରାଓ ତାତେ ସିଖିତ କରା ହେଁଛେ ବହୁ ଯତ୍ନେ ।

জোহাক যখন ভোজন শুরু করে ঠিক সেই ঘন্টে—

চতুর্ব পাচক সহস্য বৃদনে বাজাৰ সামনে এসে দাঁড়ালো।

ରାଜୀ ତାକେ ଦେଖେ ବଲିଲୋ, ବଲିଲୋ କି ତୋମାର ଆକାଶକ୍ଷା,—  
ଯା ତୋମାର କାମ୍ୟ ତାଇ ଆମାର କାହେ ଅକପଟେ ନିବେଦନ କର

পাচক বললো, হে রাজাধিরাজ —

আপনি চিরসুখী হোন, আপনার রাজ্য হোক চিরপ্রতিষ্ঠিত।

আমাৰ হৃদয় আপনাৰ দয়ায় পৱিপূৰ্ণ,

আমার প্রাণের সম্পদ আপনারই বদনমণ্ডলের অনগ্রহ।

রাজার সমীপে আমার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা,

যদিও আমি সেই সৌভাগ্যের উপর্যুক্ত নই

আমাৰ বাসনা রাজাৰ স্কন্দদুয় চম্বন কৰি,

ଆମାର ନୟନଦୟ ଓ ମୁଖ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭେ ଧନ୍ୟ ହୋକ ।

জোহাক পাচকের কথা ঘনোয়োগ দিয়ে শুনলো

କିନ୍ତୁ ମେ କଥାର ତାଙ୍ଗ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମେ କିଛିଟି ବସନ୍ତେ ପାରିଲୋ ନା ।

ମହାତ୍ମାଙ୍ଗଲିତେର ମତୋ ରାଜା ବଲଲୋ, ତୋମାର ଆବେଦନ ଗୁହୀତ ହଲୋ ପାଚକ,  
ଉନ୍ନତ ଘୟାଦା ଲାଭ କରକ ତୋମାର ନାମ ।

এই সময় পাচকের সঙ্গী মানুষবেশী দৈত্য তাকে ইঙ্গিতে বললো, আর বিলশ্ব না করে সত্ত্ব চুম্বন করো রাজার স্ফক্ষদুয়।

চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে এমনি এক অত্যাশ্র্য ব্যাপার সংঘটিত হলো  
দুনিয়ার কেউ যা কোনদিন দেখেনি।

রাজার কাঁধে ফণা তুলে দাঁড়ালো দুটি কালো সাপ,  
আর চক্ষের নিমেষে পাচক ও তার সঙ্গী অস্তর্ধন করলো।  
অবিলম্বে উদ্যত সর্পদুয়কে অস্তাঘাতে নির্মূল করা হলো,  
উদ্ভৃত প্রাণের এই পরিণতিই শোভন।  
কিন্তু সর্পদুয় যেন গাছের কর্তৃত শাখা,  
আবার দুই কাঁধে তা তেমনিভাবে বেরিয়ে এলো।  
চারদিক থেকে জ্ঞানী চিকিৎসকদলকে এনে জমায়েত করা হলো,  
তারা নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে অবতারণ  
করলো নানা কাহিনীর।

তারা উচ্চারণ করলো নানা মন্ত্র ও প্রয়োগ করলো বিচিত্র ইন্দ্রজাল;  
কিন্তু এই ব্যাধির কোন প্রতিকারই সম্ভব হলো না  
তাদের দ্বারা।

শয়তান তখন এক চিকিৎসকের বেশে  
জ্ঞানি-সদশ গুরুগন্তির চালে জোহাকের-সমীপে এসে উপস্থিত হলো।  
সে বললো, এটি এমন এক ব্যাপার  
যার সাদৃশ্য কোথাও নেই, এবং সেই হেতু এর প্রতিকারও সাধারণের  
নিকট অস্ত্রাত।

এদেরকে দিতে হবে এদের উপযোগী খাদ্য এবং এইভাবে তাদেরকে  
শান্ত করতে হবে।

এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।  
মানুষের মগজ ছাড়া আর কিছুতেই এরা তুষ্ট হবে না।  
এই খাদ্য পেলেই তারা শান্ত হয়ে থাকবে।

দেখ, শয়তানের এই প্রতিকার চিন্তনে নিহিত রয়েছে  
কি নিরাকৃশ কৃৎসিত মতলব।  
একটিমাত্র বিধানের মধ্যে কি করে সে গোপন করে রেখেছে  
দুনিয়াকে মনুষ্য শূন্য করার হীন ষড়যন্ত্র।

## জামশেদের যুগের অবসান

এই সময় ইরানের সর্বত্র দেখা দিল অসন্তোষ,  
চারদিকে যুদ্ধ ও কলহ মাথা উচু করলো ।  
শুভ্র আলোকিত দিনগুলোকে এসে গ্রাস করলো অঙ্ককার,  
এবং জামশেদের ভাগ্য—সুত্র ছিন্ন হলো ।  
বিশু—প্রভুর দয়ার আলো তার উপর ক্রমে নিঃশেষ হয়ে এলো,  
জটিলতা সরলতার ও অজ্ঞানতা অধিকার করলো জ্ঞানের স্থান ।  
বাদশার চতুর্দিকে ধ্বনিত হতে লাগলো একটি নাম —  
পাহলভী ভাষায় মুখরিত হতে থাকলো সেই যশকামীর কথা ।  
বাদশা তখন সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলো,—  
কিন্তু হায়, জামশেদের ভাগ্য যে আজ কল্প্যাণহীন !  
ইরানের সৈন্যদল যুদ্ধসভে সজ্জিত হয়ে আরবের পথ ধরলো;  
কিন্তু যখন তারা শুনলো সে—দেশে এমন এক  
নরপতির বাস, সে আজ্ঞাহার মতো বীর্যবান;  
তখন ইরানের বীর অশুরোহী দল সেই নরপতির দিকেই মুখ ফিরালো,  
জোহাককে তারা জানালো তাদের আনুগত্য ।  
তাকেই স্বাগত জানিয়ে আবাহন করলো নিজেদের দেশে,  
এবং তাকেই বরণ করে নিলো ইরানের বাদশা বলে ।  
সেই অজগর—সদশ্ব নরপতি সাড়ম্বরে এসে সমাগত হলে  
ইরান তার শিরেই রাখলো রাজমুকুট ।  
ইরান ও আরবের সৈন্যদল সমবেতভাবে তাকে নির্বাচিত করলো  
তাদের প্রভু বলে ,  
এবং সমস্ত নগরী তার সামনে মন্তক অবনত করলো ।  
জামশেদের তখ্তের দিকে যখন সে পা বাঢ়ালো  
তখন সমস্ত পৃথিবী যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করলো তার দিকে ।  
দেখালো, নিয়তি জামশেদের জীবন শূন্য করে কি ভাবে  
সাজঘরে নিয়ে এসেছে এক নতুন বাদশাকে;  
তার শিরে রেখেছে রাজমুকুট, দিয়েছে তাকে রাজসিংহাসন,  
দিয়েছে মাহাত্ম্য, রাজ্য, সম্পদ ও সৈন্যদল ।  
সেই দিন থেকে জামশেদের উপর পৃথিবীটা অঙ্ককার হলো,  
তখ্ত ও রাজমুকুট শোভন হলো জোহাকের জন্য ।

একশো বছর ধরে কেউ জানতেই পেলো না  
কোথায় রয়েছে বাদশা জামশেদ।

একশো বছর পরে সহস্র চীনদেশের এক নদী-তীরে  
সেই নাস্তিক বাদশা জামশেদকে দেখা গেলো।

কিন্তু অচিরেই সে ধৃত হলো জোহাকের হাতে,  
জোহাক তাকে আর মুহূর্তমাত্র জীবিত থাকতে দিল না।

ধারালো অস্ত্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করলো সে জামশেদের দেহ  
এবং দুনিয়াকে তার নাস্তিক্য ও ভয় থেকে মুক্ত করলো।

তারপর কিছুদিন ধরে অজগর-তনু জোহাকের পরিণামও গোপনে  
অপেক্ষা করে রইলো,

সে পরিণাম থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।

এই শাহী তথ্ত ও সুন্দর মস্নদ —

কাল একদিন তার হাত থেকেও শুকনো ঘাসের মতো  
উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

তার পূর্বেও বহু বাদশা অলঙ্কৃত করেছিল এই সিংহাসন—  
রাজেশ্বর দূর করেছিল তাদের দুঃখ সাময়িক ভাবে।

জামশেদের ম্যাট্যুতে তার সাত শো বছরের রাজত্বের অবসান হলো,—  
এই দীর্ঘকালের মধ্যে কত ভালো ও কত মন্দই না হয়েছিল উত্তাপিত।

কিন্তু তার এই দীর্ঘ জীবনের কিইবা সফলতা,  
যদি জগৎ উদ্ঘাটিত না করে থাকে তার চোখে জীবনের গৃঢ় রহস্য।

কি হবে, যদি পৃথিবী তোমাকে প্রতিপালিত করে মধু ও পানীয় দ্বারা।

আর তোমার কানে না শোনায় জ্ঞানের বাণী ?

কিন্তু জেনে রাখ, একদিন যখন ছড়িয়ে পড়বে বাণীর সম্পদ —

তখন আমাদের উপর উদিত হবে সফলতার সূর্য।

তোমরা সবাই তখন সুখী হয়ো, ও আনন্দ লাভ করো এই বাণী থেকে,  
উন্মুক্ত করো, তোমাদের হৃদয় জ্ঞানের দ্বারা।

অমূল্য এক অবদান বলে মনে করো সেই বস্তুকে —

যা তোমার হৃদয় থেকে ঝরায় রক্ত।

এই দুনিয়া বড় অস্থায়ী,

এখানে তুমি সৎকর্মের বীজ ছাড়া আর কিছুই বপন করো না।

আমার হৃদয় দুদিনের এই সরাইখানায় খুব তৎপুর হয়েছে,  
হে খোদা, শীত্র তুমি এই দুঃখ থেকে আমাকে মুক্তি দান কর।

## জোহাক এক হাজার বছর রাজত্ব করেছিল

জোহাক তখ্তে সমাচীন হয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলো,  
তার জন্যে বহুগুলো হাজারো আসরের রূপ নিলো।

কাল প্রশংস্ত হলো তার ভাগ্যে,  
দীর্ঘদিন ধরে চললো তার শাসন।

জ্ঞানীদের রীতিনীতি ও আইন বিদায় নিলো,  
হৃদয়বানদের নাম পদদলিত হলো সর্বত্র।

শিল্প ও জ্ঞান উপেক্ষিত হলো, ইন্দ্রজাল পেলো

সম্মানের আসন,

স্বাস্থ্য মুখ লুকালো, সর্বত্র দেখা দিলো রোগ-শোক।

অন্যায় কাজে দৈত্যদের হাত জয়যুক্ত হলো,  
ভেদবুদ্ধিময় কারুকার্য ছাড়া বাণী থেকে আর সব

সদুদেশ্য বিদায় নিলো।

জামশেদের পরিবার থেকে দুজন শুক্রা নারীকে  
ধরে আনা হলো,

কম্পিত বেতসের মতো তারা ভয়ে মুহৃষান হলো।

জামশেদের এই দুই বোন,—

একদিন সমস্ত মহিলা সমাজের মাননীয়া ছিল।

অসূর্যস্পর্শ্য এই মহিলাদ্বয়ের একজনের নাম শাহুনাজ,  
দ্বিতীয় জনের নাম আর্নওয়াজ।

যথাসময়ে তাদেরকে জোহাকের প্রাসাদে আনা হলো,

এবং সেই অজগর-তনুর হাতেই তাদেরকে করা হলো সমর্পণ।

জোহাক সেই মহিলাদ্বয়কে গ্রহণ করলো তার বাস্তিতা রূপে,

এবং তাদের উপর পাঠ করলো জাদুমন্ত্র।

অমঙ্গলের সূচনা এইভাবেই সে করলো,

পৃথিবী যেন তার হাতে হলো এক মোমের পুতুল।

অন্যায় ছাড়া আর কিছুই সে জানতো না,

হত্যা ধৰ্ষণ ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই সে করতো না।

প্রত্যেক রাত্রিতে সে দুজন যুবককে ধরে আনতো,—

কখনো সাধারণ জনতার মধ্যে থেকে, কখনো বীরবৃন্দের সন্তানদের থেকে  
পাচক সেই যুবকদ্বয়কে বাদশার প্রাসাদে হত্যা করতো,

ও এইভাবে বাদশার চিকিৎসার ব্যবস্থা হতো।

তাদেরকে মেরে মগজ টেনে বের করে আনা হতো,  
এবং তা দিয়ে সর্পদুয়ের রোজকার খাদ্যের সংস্থান হতো।  
বাদশার স্বদেশের দুই গণ্যমান্য ব্যক্তি —  
ধর্মপ্রাণ ও শুভ্রচিত্ত,—  
তাদের একজনের নাম ধার্মিক আরমায়েল,  
অন্যজনের নাম দুরদৰ্শী কারমায়েল।  
কথায় কথায় একদিন তারা  
অত্যাচারী রাজা আর তার সৈন্যদল  
এবং তাদের রীতি-নীতি ও অসন-বসনের উপর আলোচনা তুললো।  
একজন বললো, পাচকের বৃত্তি নিয়ে  
রাজার সংস্পর্শে এলে মন্দ হয় না।  
সেখানে যেতে পারলে তার এই অত্যাচারের প্রতিকারের  
একটা উপায় বের করা সম্ভব হবে।  
যে-দুজন লোককে প্রত্যহ হত্যা করা হয়  
তাদের মধ্যে অস্তত একজনকে বাঁচানো সম্ভব হবে।  
এইরূপ চিন্তা করে তারা একদিন রাজদরবারে গিয়ে  
পাচকের বৃত্তি গ্রহণ করলো,  
এবং সুন্দর পরিপাঠি করে নানা ভোজ্য প্রস্তুত করে  
রাজার মনোবঙ্গনে ব্যাপ্ত হলো।

সেই থেকে রাজার রক্ষনশালায়  
দুই জাগ্রত-চিত্ত ব্যক্তির স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেল।  
যথাসময়ে শোণিতপাতের সেই ভয়ানক মুহূর্ত এলো,—  
দেখা গেল দুজন মানুষকে বেঁধে নীচে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।  
এমনি করেই জলাদগণ দুই হতভাগ্যকে  
প্রত্যহ টেনে নিয়ে আসতো;  
তারা তাদেরকে আঘাতে আঘাতে জজ্জরিত করে টেনে আনতো  
পাচকদের সামনে,  
এবং সেইভাবে ঠেলে দিতো উপর থেকে নীচের দিকে।  
এই করণ দৃশ্যে পাচকদুয়ের হৃদয় কানুয় ভরে এলো,  
তাদের চোখে বইলো উষ্ণ ধারা, ও অস্তর ঘণায় পূর্ণ হলো।  
কিন্তু তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে যেতে হলো  
অত্যাচারী রাজার নিষ্ঠুর কার্যকলাপের এইসব জাগ্রত চিত্ত।

একদিন মৃত্যুপথযাত্রী দুই হতভাগ্যের মধ্যে একজনকে  
তারা লুকিয়ে মুক্ত করে নিলো,  
অবশ্য এর চাইতে বেশী কিছু করার উপায় ছিল না।  
তারপর মানুষের পরিবর্তে একটি গাধার মগজ টেনে বের করে  
সেটিকে অপর হতভাগ্যের মগজের সঙ্গে মিশিয়ে  
সাপের খাদ্য প্রস্তুত করা হলো।

মুক্ত লোকটিকে তারা চুপি চুপি বললো,  
খুঁজে নাও এমন কোন জায়গা যেখানে নিজেকে  
লুকিয়ে রাখতে পারবে।

পালিয়ে যাও নগর ও লোকালয় ছেড়ে দূরে,  
এবং নিজের বসবাস খুঁজে নাও কোন পাহাড়ে কিংবা জঙ্গলে।

পরদিনও আবার তারা মানুষের মগজের বদলে  
গাধার মগজ দিয়ে প্রস্তুত করলো সাপের খাদ্য।

এইভাবে প্রতি মাসে ত্রিশজন যুবক  
মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেতে লাগলো।  
পাচকদুয় তাদেরকে দেখিয়ে দিতে লাগলো  
মরুভূমির পথ।

সেই থেকে মরু এলাকায় এক মরুচারী গোত্রে  
পত্রন হলো,

তারাই ইতিহাসে কুর্দ জাতি নামে পরিচিত।  
এরা মোটা কাপড়ের এক প্রকার তাঁবুতে বাস করতো,  
এবং ভয় বলে কোন জিনিস তারা জানতো না।

এইভাবে জোহাকের অন্যায় কার্য্যকলাপই  
তার বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তির সমাবেশ করলো।

সেই পলায়িত মানুষগুলির মধ্যেই এক দুর্ধর্ষ  
যুদ্ধপ্রিয় জাতির পত্রন হলো,

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তারা দৈত্যকেও পরাস্ত করতো।  
কাল্পনিক এক নারীর পূজা তাদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল,  
তারা বিশ্বাস করতো, সেই নারী অস্তরাল থেকে তাদের রক্ষা করছে।  
তারা মানত না কোন নীতি ও নিয়ম,  
জানতো না আর কোন ধর্মের কথা।

## জোহাক ফারেদুনকে স্বপ্নে দেখলো

যখন জোহাকের রাজত্বের চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো,  
তখন ঘটলো এক অত্যাশ্র্য ঘটনা ।  
একদিন সে গভীর রাত্রে মহলের মধ্যে  
শাহজাদী আরনেওয়াজের সঙ্গে নির্দিত ছিল ।  
স্বপ্নে দেখলো, বাদশাদের মহল থেকে  
সহসা তিনজন সৈনিকের আবির্ভাব হয়েছে ।  
তাদের মধ্যে দুজন বর্ষীয়ান ও একজন বালক,  
সেই বালক খুজু দেহ ও কেয়ানী বৎশ-সুলভ গৌরবের অধিকারী ।  
যুদ্ধ-সাজে সঙ্গিত হয়ে সে ঘোড়ার উপর সওয়ার রয়েছে;  
হাতে তার ভীমতম এক প্রহরণ  
ক্রোধে গর্জন করে সে জোহাককে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালো,  
ও তার মন্ত্রকে হানলো সেই গদার আঘাত ।  
ক্ষিপ্তার সঙ্গে সেই বালক,  
তার ঝুঁটি ধরে আকর্ষণ করলো ;  
তারপর পাথরের মতো শক্ত হাত দুটি দিয়ে  
তাকে সে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে ফেললো ।  
জোহাকের শিরোভূষণ লুক্ষিত হলো ধূলায় ;  
এবং এই ভাবে অপমানিত ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায়  
সে তাকে দামাওন্দ<sup>১</sup> পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে চললো,—  
দৌড়িয়ে লোকলস্করের পেছনে !  
এই স্বপ্ন দেখে জোহাক বড় ভয় পেলো,  
দুচিন্তায় তার কলিজার রক্ত যেন পানি হয়ে যাচ্ছে ।  
স্বপ্নের মধ্যেই সে এমন এক চিংকার দিয়ে উঠলো যে,  
সেই শব্দে শত স্তুম্ভের প্রাসাদ প্রকম্পিত হতে লাগলো ।  
সুন্দরিগণ জেগে উঠে  
বিস্মিত হয়ে বাদশাকে জিজ্ঞাসা করলো, এই চিংকারের কারণ কি ?  
তারা বললো, হে বাদশাহ, আপনি আপনার প্রাসাদে আরামে নির্দিত ছিলেন,  
নিজের ঘরে আপনার এই প্রাণ ভয় কেন ?  
সপ্তরাজ্য আপনার ফরমানের অধীন,  
দৈত্য, পশু ও মানুষ আপনার প্রহরায় সদাজাগ্রত ।

প্যালেন্টাইনের সীমান্তবর্তী সেই পর্বতশ্রেণী যার মধ্যে সিনাই বা তুর পাহাড় অবস্থিত ।

সমস্ত দুনিয়ায় বিস্তৃত রয়েছে আপনার বাদশাহী,  
চন্দ্রলোক থেকে তা ছড়িয়ে আছে আকাশে সর্বত্র।  
কি কারণে আপনি সুখ-শ্যাম থেকে এমন ভাবে চমকে উঠলেন ?  
হে ভূবনেশ্বর, আমাদের তা খুলে বলুন।  
পুর-সুন্দরীদের প্রশ্নের জবাবে বাদশা বললো,  
আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা পরে তোমারদের কাছে বলবো।  
কারণ তা যদি তোমরা এখন শোন,  
তবে আমার জীবন সম্পর্কে তোমরা নিরাশ হয়ে পড়বে।  
প্রবল-প্রতাপ বাদশার এই কথা শুনে আরনেওয়াজ বললো,  
আপনি বলুন, হয়তো স্বপ্নের অর্থ আমরা আপনাকে বলতে পারবো।  
আমরা এর একটা প্রতিকারও বের করতো পারবো,  
কারণ, কোন অমঙ্গলই প্রতিকারের বাইরে নয়।  
বাদশা তখন স্বপ্নের সকল বৃত্তান্ত  
একে একে তাদের কাছে খুলে বললো।  
শুনে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আরনেওয়াজ বললো,  
শতপথে খুঁজতে হবে এর প্রতিকার।  
কালের অঙ্গুরীয় আপনারই তখ্তের নীচে,  
জগৎ আপনারই সৌভাগ্যের প্রভায় আলোকিত।  
আপনার হৃকুমের অধীন সমস্ত পৃথিবী,  
মানুষ, চতুর্ষদ, বিহঙ্গ ও পরীদল আপনারই  
আদেশের অপেক্ষা করে আছে।  
প্রত্যেকটি দেশ থেকে জ্ঞানীদেরকে এনে জড়ে করুন,  
ডেকে আনুন জ্যোতিষ ও গণকদের।  
তাদের কাছে বলুন স্বপ্নরাজ্যে যা সংঘটিত হয়েছে,  
তারপর জিজ্ঞাসা করুন তাদেরকে তার প্রতিকার।  
জেনে নিন, কার হাতে রয়েছে আপনার প্রাণ,  
সে কি মনুষ্যজাত, দৈত্যজাত না পরীজাত ?  
যখন তা জানতে পারবেন তখনই করতে পারবেন  
তার প্রতিবিধান,  
অঙ্ককারে ভয় করে লাভ কি, সংশয়ে  
সন্তুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন কি ?  
সুন্দরী শ্রেষ্ঠার রজতশুভ-মুখ-নিঃস্ত এই বাণী  
বাদশার মনঃপৃত হলো।

শীঘ্ৰই কাকপক্ষ সদৃশ রাত্ৰিৰ অন্ধকাৰ ছিন্ন কৰে  
উদয়াচলে পৃথিবী এক প্ৰদীপকে উচু কৰে ধৰলো।  
সুৰ্য নীল আকাশে ছড়িয়ে দিলো  
হলুদ বৰ্ণেৰ অসংখ্য মণি কাঞ্চন।

বাদশা ডেকে পাঠালো যেখানে যত জ্ঞানী গুণী ছিল সবাইকে —  
কবি, জ্যোতিষ ও দার্শনিক।

সকলকে একত্ৰিত কৰে  
বাদশা তাৰ দুংখেৰ প্ৰতিকাৰ চিন্তা কৰতে বললো।  
তাদেৱ কাছ থেকে সে জ্ঞানতে চাইলো স্বপ্নেৰ রহস্য ও  
তাৰ ভালো-মন্দেৱ কথা।

বললো, তোমৰা আমাকে বল, কখন আমাৰ দিন শেষ হবে ?  
আমাৰ পৱ কে এই তথ্ত ও তাজেৰ অধিকাৰী হবে ?

এইসব রহস্যেৰ উত্তৰ আমি তোমাদেৱ কাছে চাই,  
অন্যথায় তোমাদেৱ মন্তকে নেমে আসবে অপমান।

এই কথা শুনে জ্ঞানীদেৱ ওষ্ঠাধৰ শুক্ষ হলো ও মুখমণ্ডল হলো আৰ্দ্র,  
তাৰা পৰম্পৰেৰ মধ্যে কথা বলতে শুৰু কৰলো।

বললো, যদি আমৰা অকপটে সত্য কথাই বলি,  
তবে অবিলম্বে আমাদেৱ মন্তক কৰ্তৃত হবে।

আৱ যদি সত্য কথা না বলি,  
তাহলে ত্যাগ কৰতে হবে প্ৰাণেৰ মায়া।

এইভাবে তিন দিন পৰ্যন্ত জ্ঞানিগণ চূপ কৰে রইলো,  
কেউই মুখ খুলতে সাহস কৰলো না।

চতুর্থ দিন বাদশা প্ৰকাশ কৰলো তাৰ ক্ৰোধ,  
জ্ঞানীদেৱকে স্পষ্ট বলে দিল,—

জীবন যদি তোমাদেৱ প্ৰিয় হয়ে থাকে,  
তবে প্ৰকাশ কৰ তোমাদেৱ জ্ঞানেৰ মধ্যে যা আছে।

বাদশাৰ কথা শুনে জ্ঞানীদেৱ দৃষ্টি আনত হলো,  
যেন তাদেৱ চোখ থেকে রক্ত ঝৰছে।

বিশিষ্ট এই জ্ঞানীদেৱ মধ্যে  
এক ব্যক্তি ছিল বড়ই সৱল ও সত্যবাদী।

সেই জ্ঞানী ও সজাগ ব্যক্তি  
সকলেৰ মধ্যে থেকে বেৱিয়ে এসে এগিয়ে গেলো বাদশাৰ দিকে

এবং নির্ভর্যে জোহাকের সামনে  
তার রসনা মুক্ত করলো ।

বললো, বিছিন্ন কর আমার তনু থেকে মস্তক —  
মৃত্যু নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে মায়ের উদর থেকে ।

তোমার আগেও অনেক বাদশা রাজত্ব করে গেছে,  
অলঙ্কৃত করেছে তারা রাজসিংহাসন ।

বহু আনন্দ ও বেদনা তারা প্রত্যক্ষ করেছে,  
এবং তাদের দীর্ঘ যুগেরও হয়েছে অবসান ।

তুমি যদি তোমার চারদিকে লৌহ প্রাচীরও নির্মাণ কর,  
তবু কাল তা পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো করবে ।

জেনে রাখ, তোমার পরে একজন তোমার এই তখ্তে বসবে,  
তোমার এই ভাগ্য একদিন মিশে যাবে ধূলায় !

সেই লোক দুনিয়ার সর্বত্র বিখ্যাত হবে ফারেদূন বলে,  
আকাশ তাকে দান করবে বহু ভাগ্য ।

সেই বীর-পুরুষ এই মুহূর্তে মাত্র্গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে,  
কাজেই এই মুহূর্তে তোমার ভয়ের কিছু নেই ।

বুদ্ধিমতি মায়ের শুশ্রায় সে ধীরে ধীরে  
বৃক্ষের মতো ফুলস্ত হবে ।

তারপর যখন সে বড় হবে,  
তখন রাজমুকুট, সিংহাসন ও রাজত্বের জন্য সে কোমর বাঁধবে ।

ফুলস্ত দেবদারু বৃক্ষের মতো উন্নত হবে তার মস্তক,  
কাঁধে সে তুলে নিবে পোমুখ চিহ্নিত এক লৌহ প্রহরণ ।

সেই ভীম প্রহরণ দুর্বাসা সে তোমার শিরে আঘাত হানবে ও  
তোমাকে বেঁধে প্রাসাদ থেকে টেনে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাবে ।

এই কথা শুনে জোহাক বললো,  
কেন সে আমাকে বাঁধবে, তার সঙ্গে আমার কি শক্রতা ?

সেই সাহসী জ্ঞানী তখন বললো, যদি বুদ্ধিমান হও —

তবে জেনে রাখ, অনর্থক কেউ কারো অঙ্গল কামনা করে না ।

তোমার হাতেই তার পিতার জীবনাবসান হয়েছে,  
সেই দৃঢ়থেই তার অস্তর হবে বিদ্রোহপূর্ণ ।

এক কান্তিময় গাভী হবে তার ধাত্রী,  
সেই পান করাবে তাকে দুঃখ ।

সেই গাড়ীও তোমারই হাতে প্রাণ হারাবে,  
এবং তারই প্রতিশোধ গ্রহণে সে টেনে নিবে সেই ভীমগদা।  
এই কথা শোনামাত্র সিংহাসনের উপর জোহাকের  
জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলো,  
এবং উচু তখ্তে সমাসীন প্রতিপত্তিশালী বাদশার মুখমণ্ডল  
ভয়ে পাণ্ডুর হলো;  
কিন্তু মুহূর্তেই স্থান-কাল সম্পর্কে সচেতন হয়ে  
সে নিজেকে সামলে নিলো।  
এবং আদেশ করলো ফারেদুন যেখানেই আছে—প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে,  
তাকে খুঁজে বার করতে হবে।  
এর পর থেকে জোহাকের না রইলো শাস্তি, না নিদ্রা, না আহার,  
রৌদ্র করোজ্জ্বল দিনগুলো যেন তার চোখে অঙ্ককার হয়ে এলো।

## ফারেদুনের জন্মবৃত্তান্ত

যদিও দীর্ঘ দিন ধরে জোহাক সর্বত্র বিজয়ী রইলো  
তবু তার অজগর-তনুর অন্তরে যে প্রাণ তা রইলো, ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে।  
ওদিকে মাত্গর্ত থেকে জন্ম নিলো সুলক্ষ্মুণে ফারেদুন,  
দুনিয়ায় একটির পর একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে চললো।  
সেই বিশ্ব-অন্বেষণকারীর মধ্যে প্রকটিত হলো মাহাত্ম্য,  
একদিন যা তার কর্মের মধ্যে প্রতিভাত হবে সূর্যের মতো।  
সরল দেবদারু যেমন করে বাড়ে তেমনি করে বেড়ে চললো শিশু,  
রাজকীয় গুণাবলী ধীরে ধীরে তার মধ্যে প্রকটিত হলো।  
বৃষ্টি যেমন ধরণীকে সাজায়  
জ্ঞান যেমন জীবনকে করে ঐশ্বর্যশালী—  
তেমনি ফারেদুনের মস্তকে ঘূর্ণিত হলো সৌভাগ্য,  
প্রেম তাকে জানালো তার আনুগত্য।  
সুদর্শন বীর তার মাত্গর্ত থেকে জাত হাওয়ার মুহূর্তেই  
ধেনুদের মধ্যে সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন  
এক কাস্তিময় গাভীর  
প্রতিটি লোম খিলিক দিয়ে উঠলো নতুন রঙের বিভায়।  
সেই মুহূর্তে দুনিয়ার জ্ঞানিগণ আসর করে বসলো  
মিলিত হলো জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ ও ধর্মবেত্তাগণ।  
এদিকে জোহাক সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করলো আলোচনায়,  
দুনিয়ার সর্বত্র অন্বেষণ চালালো সে ফারেদুনের জন্য।  
ফারেদুনের পিতা আবতীন,  
একদিন ধরণী যার জন্যে সঙ্কুচিত হয়েছিল।  
সেই আবতীন জোহাকের ভয়ে পালিয়েছিল দূরে,  
কিন্তু সহসা ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায়  
বন্য পশুর মতো  
আনীত হয়েছিল জোহাকের সামনে।  
ফারেদুনের বুদ্ধিমত্তী মাতা সব দেখেছিল—  
তাই ফারেদুনকে দেখে তার স্মরণে উদ্বিদিত হলো স্বীয় স্বামীর  
দুর্ভাগ্যের কথা।  
এই মহিমময়ী নারী যেন যুগের অলঙ্কার,  
সে যেন সেই বৃক্ষ যার থেকে কর্তিত হয়েছে সমারোহ।

এই নারীর নাম ছিল ফারানক,  
ফারেদুনের রক্ষায় উদ্বিগ্ন হলো তার মাত্মন।  
কালের গতি তার অস্তরকে ভেঙে খান খান করলো,  
তাই ক্রন্দনরত অবস্থায় সে ধরলো বনের পথ।  
বহু পথ হেঁটে সেই কান্তিময় গাভী যেখানে থাকে, সেখানে এসে সে  
উপস্থিত হলো,  
দেখলো, সেই গাভীর রঙ উজ্জ্বল ও তনু লাবণ্যযুক্ত।  
বন-রক্ষকের সামনে এসে দাঁড়ালো দৃঢ়খনী ফারানক,  
তার বুক বেয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।  
ফারানক বললো, মহাত্মন, এই দুঃখপায়ী শিশুর দায়িত্ব আপনি  
কিছুদিনের জন্য গ্রহণ করুন।  
মায়ের হাত থেকে আপনি তাকে পিতৃবৎ কোলে তুলে নিন,  
ও এই কান্তিময় গাভীর স্তন্যরসে তাকে পালন করুন।  
বন ও কান্তিময় গাভীর পূজারী সেই গো-রক্ষক,  
সার্থকী ফারানককে বললো,  
আমি আপনার সন্তানের সামনে অনুগত-দাসের মতো  
অবস্থান করবো ও আপনার উপদেশ রক্ষা করবো।  
এই কথা শুনে ফারানক পুত্রকে তার হাতে সমর্পণ করে  
তাকে কিঞ্চিৎ উপদেশাদি দান করলো।  
তিন বছর সেই গাভীর দুধে বন-রক্ষক পিতৃবৎ স্নেহে শিশুকে  
পালন করলো, ও এইভাবে রক্ষা করলো তার প্রতিজ্ঞা।  
এদিকে জোহাক তার অনুসন্ধানে তৃণ না হয়ে  
সর্বত্র ঘোষণা করে দিল সেই কান্তিময় গাভীর কথা।  
মা তখন ত্বরিতে ধাবিত হলো বনের দিকে,  
ও সেই প্রতিজ্ঞাবন্ধ-রক্ষককে এসে বললো,  
বিশু-প্রভূর দিক থেকে আমি বাণী পেয়েছি,  
হাদয়ে আমার উদ্দিত হয়েছে এক আশঙ্কা।  
আমার প্রিয় সন্তান ও আমাকে একই জায়গায় থাকতে হবে,  
এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।  
এই ইন্দ্রজালের দেশ ছেড়ে  
আমরা চলে যাব সুদূর হিন্দুস্থানের দিকে।  
লোকালয় থেকে দূরে

আমি আমার সন্তানকে নিয়ে আলবুর্জ\* পাহাড়ে চলে যাব।

এই কথা বলার সঙ্গে রূপবতী রমণীর

মুখভাব শীতল হলো—কঠিন হলো তার সংকল্প,  
মুহূর্তে যেন সে মুছে নিয়েছে তার হাদয়ে ছিল রক্তের যত দাগ।

তারপর দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো সে তার সন্তানকে নিয়ে

প্রয়াণপর হলো,—

এবং ক্রুক্ষ বাধিনীর মতো সে তাকে নিয়ে এলো পাহাড়ের এক

নির্জন এলাকায়।

সেই পাহাড়ে এক ধার্মিক পুরুষ বাস করতেন,

দুনিয়ার সকল কাজে তিনি ছিলেন উদাসীন।

ফারানক তাঁকে বললো, ওগো মহাত্মন,

আমি ইরান দেশের এক দৃঢ়বিনী।

এই মহান শিশু আমারই সন্তান,

সে একদিন বহু আসরের নায়ক হবে,

জোহাকের রাজমুকুট সে—ই একদিন করবে ভূলুঁচিত,

এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করবন,

পিতার মতো তার প্রাণের মায়ায় কম্পিত হোক আপনার অন্তর।

সেই মহাপুরুষ ফারানকের সন্তানকে গ্রহণ করলেন,

ভয় কিংবা দুর্ভাবনা কিছুই তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করলো না।

একদিন জোহাক জানতে পেল,

সেই গাভী ও সেই বনের সন্ধান।

সে তখন মন্ত হস্তীর মতো প্রবেশ করলো সেই বনে

এবং সংহার করলো গাভীর প্রেণ।

চারদিকে যা দেখলো তাই সে ধ্বংস করলো

তচনছ করে দিল সেই সুন্দর উপবন।

খোঁজ চললো, কোথায় আছে ফারেদুন।

কিন্তু কোথাও সে কাউকে দেখতে পেলো না।

অতঃপর বনে আগুন দিয়ে দাবানলের সৃষ্টি করে,

জোহাক নিজের উন্নত প্রাসাদে ফিরে এলো।

---

মাঝিন্দিরানের অস্তর্গত এক পাহাড়ের নাম। ফকেশাদের একটি চূড়াকেও আলবুর্জ  
হয়।

## ফারেদুন মায়ের কাছে নিজের বৎশ-পরিচয় জানতে চাইল

অতঙ্গের শোলাটি বছর অতিক্রান্ত হলে  
ফারেদুন আলবুর্জ-পাহাড় ছেড়ে উপত্যকায় নেমে এলো ।  
একদিন সে মায়ের কাছে বললো,  
মা, আমার রহস্যময় অতীত তুমি খুলে বল ।  
বল, কে আমার পিতা,—  
কার ওরসে আমার জন্ম ?  
মানুষের কাছে আমি কি বলবো, তা বলে দাও,  
উদ্ঘাটিত কর এক বোধ্য কাহিনী ।  
ফারানক তখন বললো, হে যশকামী,  
তুমি যা জানতে চাও সব বলবো ।  
শোন, ইরান দেশে এক বীরপুরুষ ছিলেন  
তাঁর নাম ছিল আবতীন ।

তিনি ছিলেন কেয়ানী । বৎশ-সন্তুত ও জাগ্রত-চিত্ত,  
তিনি ছিলেন জ্ঞানী, বীরপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান ।  
তাঁর বৎশের আদি পুরুষ ছিলেন বিখ্যাত তহমুরস,  
পিতা থেকে পুত্র এইভাবে সেই বৎশের ধারা প্রবহমান রয়েছে ।  
তিনিই তোমার পিতা ও আমার পূজনীয় স্বামী,  
আহা, তাঁকে হারিয়ে আমার উজ্জ্বল দিন হয়েছে অঙ্ককার !  
জোহাককে জ্যোতিষীরা বলেছিল,  
ফারেদুনের হাতে তোমার যুগের অবসান হবে ।  
এই কথা শুনে ইন্দ্ৰজালের পূজারী জোহাক  
ইরান থেকে তোমার প্রাণ সংহারের জন্য হাত বাঢ়ালো ।  
সেই দুষ্টের হাত থেকে তোমাকে লুকিয়ে রেখে  
কি করে যে আমার দিনগুলো কেটেছে তা কি বলবো ।  
তোমার পিতা যৌবনের অধিকারী সেই পুরুষ পুঁগব—  
তোমার প্রাণের বদলে বিলিয়ে দিয়েছিলেন নিজের মহামূল্য জীবন ।

---

ইরানের সর্বগাচীন রাজবৎশের নাম ছিল কেয়ানী । সেই থেকে কায় বলতে সন্তুষ্ট বা বাদশা বুঝিয়ে থাকে ।

জোহাকের দুঃবাহুতে ফণাধর সাপের জন্য  
ইরান থেকে আসতো মানুষের মগজ।  
তোমার পিতার মন্তিক্ষেত্রে তেমনি  
সেই সর্পদুয়ের খাদ্য তৈরি হয়েছিল।  
আমি তখন তোমাকে নিয়ে চলে এলাম এক বনে,  
যাতে করে তোমার সম্পর্কে কারো মনে কোন  
সন্দেহের উদয় না হয়।  
সেখানে দেখতে পেলাম বসন্তের মতো কান্তিময় এক গাভী  
তার আপাদমস্তক নানা সুন্দর বর্ণে চিত্রিত।  
সেই গাভীর রক্ষক তার পাশেই  
রাজার সমারোহে বসেছিল।  
তার হাতেই আমি তোমাকে সমর্পণ করলাম,  
দীর্ঘ দিন ধরে সেই তোমাকে পরম সন্মুখে লালন করেছিল।  
সেই শিখী-বৰ্ণ গাভীর স্তনজাত দুগ্ধে  
তুমি গড়ে উঠেছিলে যেন দুরস্ত তলোয়ার।  
হঠাতে একদিন সেই গাভী ও সেই বনের সংবাদ  
বাদশার কানে গিয়ে পৌছলো।  
আমি তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে তোমাকে নিয়ে  
বেরিয়ে পড়লাম সেই বন থেকে,  
প্রিয় স্বদেশ ইরান ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম দূরে।  
ওদিকে সেই কান্তিময় গাভীও জোহাকের হাতে বধিত হলো —  
আহা, অবলা সেই দয়াবতী তোমার ধাতী !  
আমাদের গৃহ থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত  
উপ্রিত হলু বেদার ধূলিরাখি।

ମାୟେର ମୁଖେ ଏହି କାହିନୀ ଶୁଣେ କୋଧେ ରଜ୍ଵବର୍ଣ୍ଣ ହଲୋ ଫାରେଦୁନ,  
ଆବେଗେ ତାର ଅନ୍ତର ମଥିତ ହତେ ଲାଗଲୋ;  
ହଦ୍ୟେ ବେଦନା ଓ ମଞ୍ଚିକେ ଜିଘାଙ୍ଗା ନିଯେ  
କୋଧେ ତାର ଭାୟୁଗଳ କୁଷିତ ହଲୋ ।  
ଫାରେଦୁନ ମାକେ ବଲଲୋ, ସିଂହ କଥନୋ  
ତାର ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପରିଚଯ ନା ଦିଯେ ଥାକତେ ପାରେ ନା ;  
ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲେର ପୂଜାରୀ ଯା କରତେ ପାରେ କରକ,  
ଆମାକେ ତୁଲେ ନିତେ ହବେ କୋଷୋନ୍ଧୁକୁ ତଲୋଯାର ।

পরম পবিত্র বিশ্ব-প্রভুর ইচ্ছায় আমি ধাবিত হবো,  
এবং জোহাকের প্রাসাদ থেকে উথিত করবো ধূলিবাশি।  
মা তখন অধীর হয়ে বললেন, বাছা, এমন করা ঠিক হবে না,  
এই দুনিয়ায় তোমার সাহায্যকারী কেউ নেই।  
জোহাক বিশুপতি, সে তাজ ও তখ্তের মালিক,  
তার আদেশে সৈনিকগণ প্রস্তুত হয় যুদ্ধযাত্রায়।  
সে যদি চায় তবে প্রতিটি দেশ থেকে শত সহস্র  
সৈনিক প্রস্তুত হয়ে আসবে যুদ্ধক্ষেত্রে।  
প্রেম ও শক্রতার রীতি এই কথাই ঘোষণা করে যে,  
দুনিয়াকে যৌবনের ঢাঁকে কখনো চেয়ে দেখো না ;  
যৌবন-সুরার স্বাদ যে গ্রহণ করেছে  
নিজেকে ছাড়া দুনিয়ায় সে আর কাউকে দেখতে পায় না।  
কামনা তোমার মস্তিষ্কে সেই উন্মত্তাকেই জাগিয়ে তুলেছে,  
বৎস, তুমি শাস্ত হও, তুমি চির সুখী হও।  
হে আমার প্রিয় পুত্র, আমার এই উপদেশ স্মরণে রেখো,  
মায়ের কথা শুনে বাসনাকে উন্মত্ততা বলে স্বীকার করে নাও।

## ଲୌହକାର କାଓୟା ଓ ଜୋହାକେର କାହିନୀ

ଏହିଭାବେ ଜୋହାକ ଦିନରାତ  
ଫାରେଦୁନେର ଚିଞ୍ଚାୟ କାଳାତିପାତ କରେ ।  
ଉପରେ ନୀତେ ସର୍ବତ୍ର ସେ ଦେଖତେ ପାଯ ଫାରେଦୁନେର ଶୌର୍ଯ୍ୟର ବିଭା,  
ହଦୟେ ତାର ଭଯେର ଶଲାକା ବିନ୍ଦ ହେଁ ଥାକେ ।  
ଏକଦିନ ସେ ତାର ଉଚ୍ଛ୍ଵଳ ସିଂହାସନେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଁ  
ଶିରେ ତୁଳେ ନେଯ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ।  
ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଦେଶ ଥେକେ ସେଇସବ ଦଲପତିକେ ଡେକେ ପାଠ୍ୟ  
ଯାରା ତାର ରାଜତ୍ତେର ମେରୁଦ୍ଧନ୍ତକେ ସୋଜା କରେ ରେଖେ ।  
ତାରପର ଦଲପତିଗଣ ଓ ଜ୍ଞାନୀଦେରକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ସେ ବଲେ,  
ତୋମରା ସବାଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ କୁଶଳୀ ;  
ଜ୍ଞାନୀଦେର କାହେ ଏ କଥା ଆର ଅଜାନା ନେଇ ଯେ,  
ଆମାର ଏକ ଦୁଶମନ ଗୋପନେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଛେ ।  
ସେଇ ଦୁଶମନ ବୟସେ ଛୋଟ ହଲେ ଓ ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରବୀଗ,  
ସେ ଅଭିଜାତ, ବୀର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର ।  
ଯଦିଓ ଏହି ଯୁବକ ବସ୍ତେ ତରଣ  
ତବୁ ଓ ଜ୍ଞାନିଗଣ ବଲେଛେ,  
ଶକ୍ତ ଯଦି ଛୋଟ ଓ ଦୁର୍ବଲ ହୟ  
ତଥାପି ତାକେ ତୁଳ୍ଚ କରା ଉଚିତ ନୟ ।  
ଆମିଓ ଆମାର ଶକ୍ତକେ ତୁଳ୍ଚଜ୍ଞାନ କରି ନା,  
କାଲେର ଅମଙ୍ଗଳ ଆମାକେ ଭୀତ ଓ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ କରେଛେ ।  
ଶକ୍ତର ଚାଇତେ ଆମାର ସୈନ୍ୟଦଳ ଅନେକ ବଡ଼ —  
ସେଇ ସୈନ୍ୟଦଳେ ରଯେଛେ ମାନୁଷ ଦୈତ୍ୟ ଓ ପରୀ ।  
ଆମି ଆରୋ ତତ ବଡ଼ ଏକଟା ସେନାବାହିନୀ ଗଡ଼େ ତଳତେ ଚାଇ  
ଯାତେ ସମ୍ପଲିତ ଭାବେ ଥାକବେ ମାନୁଷ ଦୈତ୍ୟ ଓ ପରୀ ।  
ତାରା ସବାଇ ଏକମତ ହବେ ଆମାର ସଙ୍ଗେ,  
ସୁତରାଏ ଶକ୍ତର ସୁଖ୍ୟାତି ଆମି ଆର ଶୁନନ୍ତେ ଚାଇ ନା ।  
ଆମି ଏକ ଅଞ୍ଚିକାରନାମା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତେ ଚାଇ  
ଯାତେ ଲେଖା ଥାକବେ, ବାଦଶା ସଂକାଜ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁଇ କରେନ ନା ।  
ସତ୍ୟଭାଷଣ ବ୍ୟତିରେକେ ଆର କିଛୁଇ ଶୋଭା ପାଯ ନା ତାଁର ମୁଖେ,  
ଅପରେର ବିପଦେ ଦାନ କରାଇ ତାଁର ଚରିତ୍ରେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

বাদশার ভয়ে সবাই চুপ করে রইলো,  
সম্পাদিত হলো সেই অঙ্গীকারনামা।  
সেই অঙ্গীকারনামায় তখন সাক্ষী হিসেবে  
গৃহীত হতে লাগলো যুবক বৃক্ষ সকলের স্বাক্ষর।  
এমন সময় সহস্রা বাদশার দরবারে  
এক প্রার্থনাকারীর আগমন হলো !

বাদশা প্রার্থীকে কাছে আসার অনুমতি দিলো,  
দরবার গৃহে তখন যশস্বী দলপতিগণ সকলেই সমাজীন।  
বাদশা প্রার্থীকে জিঞ্জাসা করলো,  
বল কি তোমার দৃঢ়খ, কে তোমার উপর জুলুম করেছে ?  
প্রার্থনাকারী মন্তকে করাঘাত করে জবাব দিলো,  
হে বাদশা, আমি কাওয়া নামক লৌহকার ;

আমার দৃঢ়খের প্রতিকার প্রত্যাশায় আমি এখানে দৌড়ে এসেছি,  
আমার বিলাপ-ধ্বনি ধাবিত হয়েছে আপনার সিংহাসনের দিকে।  
যদি দান করাই হয়ে থাকে আপনার রীতি,  
তবে ওগো নরপতি বর্ধিত করুন তার পরিমাণ।

আমারই উপর সূচিত করুন আপনার দানের প্রসার,  
আমার বুকে বিন্দু করুন তীক্ষ্ণ ছুরিকা।  
অত্যাচারকে যদি আপনি উচ্ছেদ করতে চান,  
তবে আমার সন্তানের উপর থেকে উঠিয়ে নিন আপনার হাত।

আমার আঠারোটি সন্তান ছিল,  
তন্মধ্যে এখন মাত্র একটিই রয়ে গেছে।  
তার প্রাণ আপনি দান করুন, অন্যথায় —

সারা জীবন আমার বুকে জুলবে শোকের আগুন।  
হে বাদশা, অবিলম্বে আমার দৃঢ়খের প্রতিকার করুন,  
যদি আমি নির্দোষ হয়ে থাকি, তবে দয়া করে খুঁজবেন না কোন অজুহাত।  
ওগো রাজমুকুটধারী, আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখুন,  
আমার হাদয়-বেদনার উপশমে তৎপর হন।

আমার জন্য দিনগুলো অঙ্ককার হয়েছে,  
হদয়ে নেমেছে হতাশা ও মন্তিকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অসহ্য বেদনা।  
যৌবন আমার বিগত এবং সন্তানও আমার আর নেই  
দুনিয়ায় সন্তানের মতো বন্ধু আর কে আছে ?  
আমার দৃঢ়খ এখনও তার সীমা অতিক্রম করেনি,

এখনও তার প্রতিকারের উপায় আছে।

যদি কোন অজুহাত না থাকে তবে এখনই তা প্রয়োগ করুন,  
নিয়তির উদ্যত শক্তাকে আমার উপর থেকে নিবারিত করুন।

আমি এক দরিদ্র কর্মকার,

অর্থ আমারই উপরে আপত্তি হয়েছে বাদশার আশুন।

আপনি বাদশাহ, আপনি অমিত শক্তির অধিকারী।

বদান্যতার সুখ্যাতিতে পূর্ণ করুন আপনার শাসনকাল।

আপনি সপ্তরাজ্যের অধীশ্বর,—

তবে কেন থাকবে আমাদের দুঃখ।

আপনার গণনা যখন আমার উপর পর্যন্ত গড়িয়ে এলো,  
তখন তা দেখে সারা জগৎ বিস্ময়ে হতবাক হলো !

সেই গণনায় আমার পুত্রের পালা এলো,

ও তার কানে পৌছলো আপনার আদেশ,—

অর্থাৎ আমার পুত্রেরই মগজে খাদ্য প্রস্তুত হবে

আপনার সর্পদুয়ের ক্ষেত্রান্তির জন্যে।

এইটুকু মাত্র বলতেই বাদশা তার দিকে চেয়ে

স্বীয় মুখমণ্ডলে টেনে দিলো কপট বিস্ময়ের ছায়া।

তারপর কাওয়ার পুত্রকে তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে

বাদশা তার আনুগত্যের আহ্বান জানালো।

সাক্ষীরপে অঙ্গীকারনামায়

স্বাক্ষর করার আদেশ হলো কাওয়ার উপর।

কাওয়া ঐ অঙ্গীকারনামা পড়ে শেষ করে

রাজ্যের সকল তরলমতি বৃন্দাদের ডেকে

চিংকার করে বললো, হে দৈত্যের পদলেহনকারিগণ,

রাজার ভয়ে কি তোমাদের হৃদপিণ্ড ছিন্ন হয়ে গেছে ?

সবাই কি মুখ করেছ নরকের দিকে,

সবাই কি নিজেদের অস্ত্র সমর্পণ করেছ অন্যায়কারীর আদেশের নীচে ?

আমি কিছুতেই এই অঙ্গীকারপত্রে সাক্ষী হবো না,

কিছুতেই আমি বাদশার ইচ্ছার মুখে আত্মসমর্পণ করব না।

এই বলে সে কম্পিত কলেবরে উঠে দাঁড়ালো,

ও সেই অঙ্গীকারপত্র ছিড়ে টুকরো টুকরো করে পদতলে মাড়িয়ে দিলো।

তারপর প্রাণপ্রিয় পুত্রকে সঙ্গে করে

ও চিংকারে গগন বিদীর্ণ করে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বাইরের পথ ধরলো।

দলপতিগণ তখন বাদশার গুণকীর্তন করে বললো,  
হে যশস্বী দুনিয়াপতি,  
ঘূর্ণমান আকাশ আপনার মন্ত্রকের উপর নিঃশ্বাস রুক্ষ করে অবস্থান করে,  
আপনার সুসংহত সেনাবাহিনীর উপর দিয়ে বাতাস পর্যন্ত বইতে সাহস পায় না,  
অথচ মিথ্যাবাদী লৌহকার কাওয়া কি করে  
আপনারই সামনে সমকক্ষের মতো রক্তচক্ষু হয় ?  
আপনার দেওয়া অঙ্গীকারপত্র, যাতে রয়েছে আমাদেরও সকলের স্বাক্ষর,  
কি করে সে তা ছিন্ন করতে পারে ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে  
করতে পারে আপনার বিরোধিতা ?

সে যেভাবে বৈরীভাব নিয়ে বিনির্গত হলো,  
তাতে মনে হয়, সে ফারেন্দুনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।  
এর চেয়ে অন্যায় কাজ আমরা আর কিছুই দেখিনি,  
এমন ব্যবহার আমাদের চক্ষু অক্ষকার হয়েছে।  
বাদশা তখন বললো,  
আমার কাছে তোমরা শোন এক আশ্চর্য বিবরণ।

কাওয়া যখন আমার দরবারের দ্বারদেশে এসে উপনীত হয়েছে  
তখন আমার দুই কানে ধ্বনিত হচ্ছিল শৃগালের অশুভ চিৎকার।  
আমারই প্রাসাদের মধ্যে তার ও আমার মাঝামাঝি

উঠে এসেছিল এক ইস্পাতের দেয়াল,  
এই অস্তুত দৃশ্যে হাদয়ে আমার আতঙ্ক প্রবিষ্ট হয়েছিল।  
জানি না, এরপর কি ঘটনা ঘটবে,  
জানি না, আকাশ কি রহস্য লুকিয়ে রেখেছে তার মধ্যে ?

এদিকে কাওয়া বাদশার দরবার থেকে বেরিয়ে  
বিপণি-শ্রেণীর সামনে এসে লোকজন জমায়েত করলো।  
সেখানে সে চিৎকার করে জানালো তার অভিযোগ,  
এবং সমস্ত দুনিয়াকে আহ্বান করলো অত্যাচারের প্রতিকারের দিকে।  
যে চর্ম দিয়ে লোহকারণ ডঙ্কায় আঘাত করে,  
কাওয়া সেই চর্ম তার বর্ণায় বৈঁধে নিলো,  
এবং তারপর বাজার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো পথে।  
সেই বর্ণ হাতে সে চিৎকার করে বললো,  
ওগো বিশ্ব-প্রভুর পূজারী জনগণ,  
যদি ফারেন্দুনের কাছে যেতে চাও, তবে এসো,

যদি জোহকের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে চাও তবে এসো।  
আমি সবাইকে নিয়ে যাব ফারেদুনের সমীপে,  
সেই মহস্তের ছায়ায় জমায়েত করবো আমি সবাইকে।  
এইভাবে সে শয়তান-রাজার রাজ্য ছেড়ে প্রয়াণপর হলো,  
যে রাজা অন্তরের অঙ্গস্থলে বিশ্ব-স্বষ্টার দুশমন।  
এই প্রকাশ্য অপযশ কীর্তন শুনে  
বঙ্গদের মধ্যে থেকেও বেরিয়ে এলো দুশমনের কঠস্বর।  
এক বীর সৈনিক জমায়েত থেকে বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।  
সে জানতো কোথায় আছে ফারেদুন,  
মন্ত্রক উন্নীত করে সে সকলকে পথ দেখিয়ে চললো।  
লোকজন নতুন নায়কের সমীপবর্তী হয়ে  
দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে উচ্চকষ্টে উত্থিত করলো হর্ষধ্বনি।  
কেয়ানী বৎশের সুযোগ্য সন্তানের দৃষ্টি যখনই সেই  
ঝাঙ্গা-যুক্ত বর্ণার দিকে পড়লো,  
তখনই মঙ্গলচিহ্নপ এক ব্যাঘ উদিত হলো তাঁর নজরে।  
তিনি সেই ঝাঙ্গাকে সঞ্জিত করলেন রোমক দেশীয়  
সুদৃশ্য রেশমী বস্ত্র দ্বারা,  
ও তাতে খচিত করলেন সোনা ও মণিমুক্ত।  
তারপর সেই ঝাঙ্গা তিনি টেনে নিলেন মাথার উপরে—  
সুহাসিনী চাঁদের মতো,  
ফলে সুমঙ্গল যেন রূপ ধরে দাঁড়ালো সেখানে।  
সেখানে যারা ছিল  
তারা ফারেদুনের মাথার উপর রাখলো রাজমুকুট।  
এবং সেই বহুমূল্য চর্মের উপর  
পাঠ করলো স্বতিমূলক কবিতা।  
সেই সুদৃশ্য রেশমী ঝাঙ্গা থেকে যেন  
কেয়ানীদের সৌভাগ্য নবরূপে উদীয়মান হলো।  
যেন অঙ্ককার রাত্রে উদয় হলো সূর্যের,  
যা দেখে দুনিয়াবাসীর অন্তরে আশা জাগলো।  
ঐ মুহূর্তে দুনিয়া যেন সচকিত হলো,  
তার অন্তরে প্রচন্দ ছিল ঈশ্বর্য এইবার সে তা উন্মুক্ত করবে।  
ফারেদুন পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি আনত করলেন, দেখলেন

আর জোহাকের সামনে ধরণী প্রকটিত করলো যতো

অমঙ্গলের লক্ষণ।

ফারেদুন কেয়ানী তাজ পরে

যুদ্ধবেশে সজ্জিত হয়ে মায়ের কাছে এলো।

বললো, ঘা, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি,

তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে বারণ করো না।

বিশুদ্ধিষ্ঠা আছেন,

তিনিই সকল বিপদে সাহায্য করবেন।

মায়ের চোখ থেকে অশ্রু ঝরলো,—

বেদনাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বিশুপ্রভুকে ডেকে বললেন,

ওগো দয়াময়, তোমারই কাছে এই ধন আমি গচ্ছিত রাখলাম,

প্রভু, তোমারই হাতে আমি সঁপলাম আমার সন্তানকে।

অকল্যাণকে তুমি তার থেকে দূর করো,

দুনিয়াকে করো মূর্দের থেকে মুক্ত।

ফারেদুন হাস্তা মন নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু করলেন,

এবং রসনাকে সংযত করে রাখলেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

তাঁর দুই ভাগ্যবান সহোদর ছিল,

দুজনই ছিল বয়সে তাঁর চেয়ে বড়।

একজনের নাম ছিল কেয়ানুশ।

দ্বিতীয় জনের নাম ছিল পরমায়।

ফারেদুন তাদেরকে বললেন,

তোমরা আনন্দ করো ও সুখী হও।

ভাগ্যের এই পরিবর্তন মঙ্গলের জন্যই,

সে অচিরেই আমাদের মস্তকে রাখবে মাহাত্ম্যের মুকুট।

কুশলী কর্মকারণগনকে ডেকে আনো,

ও আমার জন্য তৈরি করাও এক মহসুম প্রহরণ।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দুই ভাই,

কর্মকারদের বিপণি অভিমুখে ধাবিত হলো।

কর্মকারদের মধ্যে ঘারা ছিল সবচেয়ে কুশলী,

তারা ফারেদুনের কাছে এসে উপস্থিত হলো।

বুদ্ধিমান নায়ক তখন তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন,

কি ভাবে তৈরি করুতে হবে সেই প্রহরণ।

নক্ষা তৈরিকারক তখনই তাঁর সামনে মাটিতে নক্ষা খঁকে দেখালো —

অঁকলো প্রহরণের মাথায় এক ধনুর মস্তক।  
সেই নকশা হাতে নিয়ে কর্মকারগণ ফিরে এসে  
এক ভারী প্রহরণ তৈরি করলো।  
সেটি যখন ফারেদূনের সামনে এনে রাখা হলো,  
তখন তার উজ্জ্বলতায় লজ্জা পেল স্বয়ং তরুণ মুখ।  
সেই প্রহরণ ফারেদূনের মনঃপূত হলো,  
তিনি কর্মকারদের পুরস্কৃত করলেন পোশাক ও রজত-কাঞ্চন দিয়ে;  
তারপর সবাইকে শোনালেন আশার কথা; দলপতিগণকে সুসংবাদ।  
বললেন, যদি এই আজদাহাকে (জোহাককে) আমি পরাম্পর করতে পারি,  
তবে তোমাদেরকে মুক্ত করবো সকল দুঃখ থেকে।  
সমস্ত দুনিয়াকে ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসবো,  
এবং সকলকে আবার স্মরণ করাবো সত্য ও সাধুতার কাহিনী।

## জোহাকের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ফারেদুনের যাত্রা

সূর্য মাথায় নিয়ে ফারেদুন  
পিতৃ প্রতিশোধে কোমর বাঁধলেন।  
সপ্তাহের ষষ্ঠি দিনে তিনি প্রসন্ন মনে বের হলেন —  
শুভ নক্ষত্র ও কল্যাণের মাহেন্দ্র ক্ষণে।  
তাঁর সমীপে এসে সমবেত হলো সৈন্যগণ,  
এবং তাঁর ছাউনীর উপর ছত্র ধারণ করে দাঁড়ালো একখণ্ড মেষ।  
গম্ভীর-চাল হাতী, ধনু ও মেষাদি পঞ্চ  
লওয়া হলো সৈন্যদের জন্য।  
নায়কের বিশৃঙ্খল কেয়ানুশ ও পর্মায়া  
তাঁর কল্যাণকামী রূপে পাশে রইলো।  
তাঁরা পার হয়ে চললেন মঞ্জিলের পর মঞ্জিল,—  
মস্তিষ্কে জিঘাংসা ও হৃদয়ে বদান্যতা নিয়ে।  
পথে পড়লো আশুরোহী আরবীয়দের এক জনপদ,  
সেখানকার সবাই বিশু-প্রভূর পূজারী।  
পুণ্যবানদের সেই ভূমিতে প্রবেশ করে  
ফারেদুন সবাইকে জানালেন তাঁর শুভেচ্ছা।  
ক্রমে রাতি হলো—অঙ্ককার হলো দ্বিগুণতর,  
এমন সময় সেখানে শুভার্থীর বেশে এক ব্যক্তির আগমন হলো —  
সে যেন ছড়িয়ে দিলো তার চারদিকে মগনাতির সুগন্ধ —  
বিকশিত হলো তার চলন ভঙ্গিতে হরের সৌন্দর্য ও তার বদনে  
হাস্যচ্ছটা বিছুরিত হলো।  
এমন সময় সহস্রা ধ্বনিত হলো এক স্বর্গীয় বাণী,  
তাতে বলা হলো, খুলে বলো তার কাছে মঙ্গল অমঙ্গলের গৃঢ় রহস্য।  
নায়কের সামনে তখন সেই পরী-সদৃশ সৌন্দর্য প্রতিমা  
মন্ত্রশক্তির নিগৃত গুণরাজির কথা বললো।  
ভাণ্যের মণিকোঠার চাবি যার সাহায্যে  
আয়ত্ত করা যায় শিখালো তাঁকে সেই মন্ত্র।  
ফারেদুন বুঝতে পারলেন, এই মহাপুরুষের আগমন হয়েছে  
বিশু-প্রভূরই কাছ থেকে,  
তিনি শয়তান কিংবা অমঙ্গলের অগ্রদুত নয়।

আনন্দে ফারেদূনের মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ হলো,  
তিনি তাঁর জাগ্রত ভাগ্য ও যৌবন শক্তিকে সামনে দেখতে পেলেন।

এদিকে পাচকগণ অতিথির জন্য খাদ্যদ্রব্য

প্রস্তুত করে সামনে নিয়ে এলো।

খানাপিনার পর সহজেই

ফারেদূনের দুচোখে নেমে এলো রাজ্যের যত ঘূম।

তিনি ঘূমিয়ে পড়লেন, চলে গেল সেই স্বর্গীয় দৃত।

ফারেদূনের দুভাই এখন বুঝতে পারলো, ফারেদূনের ভাগ্য

এই মুহূর্তে পূর্ণজাগ্রত।

ঈর্ষান্বিত অস্তরে চুপি চুপি তারা আসর ছেড়ে উঠে গেল,  
এবং চিন্তা করতে লাগলো কি করে ফারেদূনকে ধ্বংস করা যায়।

সেই উপত্যকার মাথার উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল এক উচু পাহাড়,

দুই ভাই তারি অভিমুখে বেরিয়ে গেল,—দল ছেড়ে সবার অগোচরে।

পাহাড়ের নীচেই রাত্রির সুদীর্ঘ শ্রান্তি স্বপ্নে

নিমগ্ন হয়ে আছেন ফারেদূন।

সকলের অলঙ্ক্ষে অতি সন্তর্পণে সেই জালেম ভাত্তদুয়

পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল

এবং পর্বত-গাত্র থেকে কেটে বার করলো

এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড।

সেই পাথর দিয়ে ফারেদূনের মস্তক

চূর্ণ করে দেওয়ার সঙ্কল্প করলো তারা !

ও সেই সংকল্প নিয়ে প্রস্তর খণ্ডকে পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে দিলো —

তাদের আগ্রহী ঢোকে ভেসে উঠলো ঘূমস্ত ফারেদূনের

মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার চিত্র।

বিশু-প্রভুর আদেশে সেই মুহূর্তেই প্রস্তরের

গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ

ঘূমস্ত ফারেদূনকে জাগিয়ে দিলো।

তিনি উচারণ করলেন স্বর্গীয়দৃতের শিখানো মন্ত্র, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর খণ্ড

স্বস্থানে দাঁড়িয়ে গেলো,— এতটুকুও সে স্থানচূর্ণ হলো না।

ভায়েরা বুঝতে পারলো —এ স্বর্গেরই চক্রান্ত,

তাই তাদের ইচ্ছ্য কিংবা অমঙ্গলের হাত এখানে অক্ষম হয়েছে।

ফরেদূন তখনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন, কিন্ত কিছুই বললেন না,

এবং এ-সমুক্ষে কাউকে কিছুই অবহিত করলেন না।

কাওয়ার সামনে এসে সবাইকে ডেকে  
বাদশা জোহাকের প্রতি সকল জিঘাংসা নিয়ে প্রস্তুত  
হওয়ার আহ্বান জানালেন।

উড়ীন করলেন কাওয়ামী ঝাণা,  
এবং সেই সুলক্ষণে ঝাণাকেই দিলেন শাহী পতাকার মর্যাদা।  
অতঃপর ফারেদুন আরওয়ান্দ নদীর দিকে মুখ করলেন,  
কারণ, ঐ দিকেই ছিল জোহাক বাদশার রাজ্য।  
যদি পাহ্লবী ভাষ্য তোমার জানা না থাকে  
তবে আরবী ভাষ্য আওয়ান্দকে তুমি দজলা নদী বলতে পার।  
চলতে চলতে ফারেদুন দজলা নদীর সংলগ্ন  
বাগদাদ শহরের কাছে এসে থামলেন।  
নদীর নিকটবর্তী হয়ে  
আরওন্দ নদীর রক্ষকদের তিনি ডেকে বললেন,  
শিশীর করে নৌকা ও ডিপ্পি সকল  
ছেড়ে দাও জলের উপর —

এবং অবিলম্বে ভিড়িয়ে দাও সেগুলোকে আমাদের দিকে ;  
সৈন্যদের নিয়ে আমরা ওপারে যাব,  
এখানে আমাদের একজনও কেউ থাকবে না।  
কিন্তু নদী—রক্ষকরা তাঁর ডাকে সাড়া দিলো না,  
ফারেদুনের কথায় একজনও নেমে এলো না জলে।

ববং উষ্টো বললো, দেশের বাদশাহ  
আমাদেরকে গোপনে বলে দিয়েছেন,  
তাঁর আদেশনামা যার হাতে নেই,  
তেমন লোককে যেন আমরা নৌকা না দিই।

নদী—রক্ষকদের কথা শুনে ফারেদুন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন,  
এবং সেই গভীর নদীর দিকে মুখ করলেন।  
কেয়ানী বৎশ—সুলভ ক্ষিপ্তার সঙ্গে  
সিংহের সৌর্য নিয়ে তিনি অশ্বের উপর চড়ে বসলেন।  
তাঁর সমস্ত অঙ্গে এবার প্রতিহিংসার জ্বালা দ্বিগুণ হয়ে উঠলো —  
তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন নদীর মধ্যে।  
তাঁর দেখাদেখি বন্ধুগণও কোমর বেঁধে  
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।  
জয়ধ্বনি উচ্চারণ করে

জলরাশি ভেদ করে ছুটে চললো তারা ।

হ্রকুম অমান্যকারী রক্ষকদের চোখে এই দৃশ্য

স্বপ্নবৎ পরিদ্রোধমান হলো,

তারা দেখলো, পানিতেই সেই দূরস্থ অশুণ্ডলি ছুটে চলেছে ।

সঙ্গীদল জলের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই

(মন্ত্রবলে) জলরাশি বিভক্ত হয়ে গেলো, সূর্য যেমন বিদীর্ণ করে দেয়

অঙ্ককার রাত্রির বুক ।

এই ভাবে তারা স্থলপথেই নদীর পরপারে গিয়ে পৌছলো,

এবং মুখ করলো বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ।

পাহলবী ভাষায় এই প্রাচীর-নগরীর

নাম ছিল জোহাকের নগরী ।

বর্তমানে আরবীতে সে শহরকেই পবিত্রগৃহ বলা হয়,

জোহাক তৈরি করেছিল সে-নগরীতেই তার প্রাসাদ ।

প্রাস্তর ছেড়ে নগরীর কাছে আসতেই দেখা গেল,

গোয়েন্দাদল বেরিয়ে আসছে নগর থেকে ।

এক মাইল দূরে থেকেই ফারেদুন

নগর-মধ্যে বাদশার প্রাসাদ দেখতে পেলেন ।

সেই প্রাসাদের চূড়া মন্তক উন্নত করে আছে শনিগ্রহের উপরে —

যেন ইচ্ছা করলেই সে আকাশ থেকে পেড়ে আনতে পারে গ্রহদল ।

সপ্তর্ষি নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল সেই প্রাসাদ,

সেখানে কত না সুখ ও আনন্দ জড়াজড়ি করে আছে ।

ফারেদুন বুঝতে পারলেন, এটিই আজদাহরণী জোহাকের গৃহ —

মাহাত্ম্য ও আধিপত্যের অচলায়তন ।

তিনি তাঁর বন্ধুদের বললেন, এই সেই স্থান, যার কুহেলিকা থেকে

বেরিয়ে আসে উন্নত মর্যাদা ।

হৃদয় আমার কাঁপছে; এখানেই ধরিত্রী লুকিয়ে রেখেছে নিয়তির রহস্য ।

এখন আমার কর্তব্য হলো, অবিলম্বে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া ।

এই বলে তিনি ভারী প্রহরণ তুলে নিলেন,

এবং অশু-বল্কা শুখ করে অশুকে দ্রুত ধাবিত করালেন ।

অবিলম্বে বেগবান অগ্নিগোলকের মতো

প্রাসাদ-রক্ষীদের সামনে এসে পৌছে গেলেন ফারেদুন ।

যোড়ার উপর থেকেই তিনি উত্তোলন করলেন প্রহরণ,

সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদল মাটিতে শুয়ে পড়লো ।

ফারেদুন অশৃপ্তে আরোহী হয়েই প্রবেশ করলেন প্রাসাদের মধ্যে,  
তাঁর যৌবন-শক্তির কাছে ধরণী যেন মস্তক অবনত করলো।  
সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত কোন মানুষ  
যেখানে পৌছতে পারেনি।  
সেখানে এসে ফারেদুন উচ্চারণ করলেন বিশ্ব-স্বষ্টার নাম।

## ফারেদুন জামশেদের ভগিনীয়কে দেখলেন

জোহাক যে—সব ইন্দ্রজাল সেখানে বিস্তার করে রেখেছিল,  
এবং নিজের শিরকে যেখানে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত উঠিয়েছিল,  
সেখানে এসে ফারেদুন  
এক বিশ্ব-প্রভুর নামের সাহায্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না।  
যে—কেউ তাঁর সঙ্গে বিরোধিতা করতে এলো,  
তারই মন্ত্রক তিনি চূর্ণ করে দিলেন সেই প্রহরণের আঘাতে।  
যতো জাদুকর সেই প্রাসাদে ছিলো  
যতো ভীমবাহু দৈত্য ছিল —  
সবারই মন্ত্রক গদাধাতে চূর্ণ করে  
ফারেদুন ঐন্দ্রজালিক বাদশার সিংহসনে এসে বসলেন।  
জোহাকের তখ্তে পা রেখে  
তিনি স্বীয় মন্ত্রককে তুলে নিলেন কেয়ানীবংশের বিখ্যাত তাজ।  
তারপর প্রাসাদের সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলেন,  
কিন্তু কোথাও তিনি জোহাককে দেখতে পেলেন না।  
শুধু তার শয়ন—কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছে  
কঢ়—চক্ষু সূর্যমুখী সুন্দরিগণ।  
ফারেদুন তখন বললেন, প্রথমে এদের দেহ ধোত করো বিশুদ্ধ পানিতে,  
যে—ময়লা তাদের দেহে লেগে আছে তা পরিষ্কার করো।  
পবিত্র শাসনকালের নতুন পথ তাদের দেখাও —  
তাদেরকে মুক্ত করো পাপের কালিমা থেকে।  
এরা মৃত্তি—পূজকের প্রতিপালিতা,—  
এরা বিক্রত—মন্তিক্ষের মতো ভাবালুতার দ্বারা উন্মাদ।  
তখন বাদশা—জামশেদের দুই বোন  
সতেজ গোলাপ ও নার্গিসের মতো —  
ফারেদুনের সামনে উন্মুক্ত করলো তাদের রসনা,  
বললো, তোমার নবযৌবন অক্ষণ্ণ থাক যতদিন বৈচে থাকে  
এই প্রাচীনা ধরণী।  
হে ভাগ্যবান, তুমি কোন্ আকাশের নক্ষত্র,  
কোন্ বৃক্ষের ফল তুমি, আমাদের তা বলো।  
কে তুমি সিংহের সিথানে এসে উপস্থিত হয়েছ,—

কে তুমি আগমন করেছ বীর-দলনকারী জোহাকের প্রাসাদে ?  
এই সর্প-স্কঙ্ক শয়তান-চরিত্রের গহে  
আমরা কত না দৃঢ়খ ও বিপদ বরণ করেছি।  
কত অন্যায় সয়েছি  
এই দুষ্ট ইন্দ্রজালিকের হাতে ।  
কাউকে আমরা এমন সাহস প্রদর্শন করতে দেখিনি,  
কাউকে দেখিনি এখানে এসে বীরত্বের এমন পরাকাষ্ঠা দেখাতে ।  
বল, তুমি কি তখতের আকাঙ্ক্ষা হয়ে এখানে এসেছো ?  
তুমি কি কামনা কর রাজ্য ও মাহাত্ম্য ?  
ফারেদূন জবাবে বললেন, ভাগ্য ও রাজ-সিংহাসন  
কারো জন্যে চিরদিনের নয় ।  
আমি পুণ্যবান আবতীনের পুত্র,  
ইরান থেকে এসেছি জোহাককে বন্দী করার অভিপ্রায়ে ।  
তাকে বধ করার জন্য জিঘাংসার প্রবৃত্তি নিয়ে  
তার সিংহাসনের দিকে মুখ করেছি।  
এক কাস্তিময় ধেনু আমার ধাত্রী ছিল,  
যার তনু ছিল চিত্রের মতো সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত,—  
সেই অবলা চতুর্পদের শোণিত-পাতে  
কেন উদ্যত হয়েছিল এই অপবিত্র রাজার হাত ?  
তাই নিষ্কলঙ্ক আমার সংগ্রাম-পিপাসা ! এবং তারই

### চরিতার্থতার জন্য —

ইরান থেকে আগমন করেছি আমি ।  
গাভীর মুখাঙ্গিত এই ভীম প্রহরণ দিয়ে চূর্ণ করবো তার মস্তক,  
এতটুকু দয়া কিংবা ক্ষমা তাকে দেখাবো না ।  
এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আর্মেণওয়াজ  
সেই পুণ্যবানের দিকে মুখ করে উন্মুক্ত করলো রহস্য;  
বললো, সত্য করে বলুন, আপনিই কি সেই বাদশা ফারেদূন —  
যে ছিন্নভিন্ন করবে ইন্দ্রজাল ও ধ্বংস করবে এই জাদুপুরী ?  
আপনারই হাতে রয়েছে জোহাকের প্রাণ,  
আপনারই বীরত্বে ধরণী আবার উৎফুল্লা হবে ।  
আমরা দুই বোন কেয়ানী বংশেরই দুই নারী ।  
প্রাণ-ভয়ে বশীভূত হয়ে এই দৈত্যপূরীতে অবস্থান করছি।  
আমাদের নিদ্রা ও জাগরণ সংঘটিত হয় দুই সাপের সঙ্গে,—

আমাদের জীবনের তিক্ততা আপনিই অনুমান করুন ওগো নরপতি !  
এই বথা শুনে ফারেদুন বললেন,  
যদি আকাশ দান করে আমাকে ভাগ্যের সমুন্তি  
তবে, অবশ্যই ধরণীকে আমি মুক্ত করবো এই আজদাহার কবল থেকে  
এবং তার পাঞ্চিলতা ধুয়ে-মুছে সাফ করবো।  
এখন তোমরা সত্য করে বল,  
কোথায় সেই আজদাহা (জোহাক) ?  
তারা জবাবে বললো, এই জাদুপুরীর সংরক্ষণের উপায় করতে  
সে হিন্দুশানের দিকে গেছে।  
দুর্ভাগোর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সর্বদা সে সন্তুষ্ট,  
এবং তার জন্য সংহার করে চলেছে সে হাজারো নিরপরাধ-প্রাণ।  
একবার এক গণক তাকে বলেছিল,  
এই দেশ শক্র দ্বারা বিজিত হবে।  
ফারেদুন অধিকার করবেন তোমার সিংহাসন,  
এবং তোমার ভাগ্য-প্রসূন হবে শুক্র ও পরিম্লান।  
সেই থেকে তার হাদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে অগ্নি,  
তার সমস্ত জীবন হয়ে উঠেছে বিস্মাদ।  
সেই থেকে সে পশু এবং নর-নারীর শোণিতপাত করে চলেছে,  
এবং তা দিয়ে নির্বাপিত করতে চেয়েছে সেই আগুন।  
কিন্তু যতই সে তার আপাদমস্তক ধৌত করুক শোণিতে,  
গণকদের কথিত ভবিষ্যদ্বাণী তেমনি উদ্যত হয়ে আছে তার  
মাথার উপরে।  
সেই দৃঢ়খে তার স্কঙ্কোপরি সর্পদুয়  
দীর্ঘকায় হয়ে এক অস্ত্রুত দশ্যের অবতারণা করে।  
দুই কঢ়কায় সর্পের ফুসফুসানি বহন করে  
সে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ দেশ থেকে দেশান্তরে।  
মনে হয় এতদিন তার দেশে ফিরে আসবার সময় হয়েছে,  
কারণ, দীর্ঘ দিন ধরে সে অনুপস্থিত।  
এই গুপ্ত সংবাদ উদ্ঘাটিত করে  
তারা উন্নতশির নায়কের সামনে নীরবে অবস্থান করলো।

## জোহাকের চরের সঙ্গে ফারেদুনের বৃত্তান্ত

জোহাকের রাজ্য এক ধনবান ব্যক্তি  
রাজাৰ বশৎবদ রূপে বাস কৱতো।  
সে তার অনুগ্রহে লাভ কৱেছিল  
ধনসম্পদ ও মর্যাদা।

লোকে তাকে কুন্দরো বলে ডাকতো,  
ধীৱ-গভীৰ চলনে সে অত্যাচারী জোহাকের দৱবাবে আগমন কৱতো।  
সংবাদ শুনে কুন্দরো দৌড়ে এলো রাজপুরীৰ দিকে,  
এবং প্রাসাদে রাজমুকুট শিৱে এক নতুন লোককে দেখতে পেলো।  
দেখলো সেই লোক আনন্দেৰ সঙ্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছে —  
উন্নত দেবদারুৰ মাথায় যেন শোভা পাছে পূৰ্ণচন্দ্ৰ।

তার একপাশে রয়েছে সুতনু শাহৰনাজ,  
অন্য পাশে আলো কৱে আছে চন্দ্ৰমুখী আৱন্নেওয়াজ।  
সমস্ত নগৱী তার সৈন্যদলে পৱিপূৰ্ণ হয়েছে  
এবং রক্ষীদল সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে দ্বুৱদেশে।

কুন্দরো কাউকে জিজ্ঞাসা কৱলো না ব্যাপার কি, কিংবা ব্যথিতও হলো না,  
নতুন বাদশার বন্দনা উচ্চারণ কৱে সে শুধু আভূমি প্ৰণত হলো।

তারপৰ তাকে স্বাগত জানিয়ে বললো, বাদশা, আপনি চিৱজীবী হোন।  
আপনাৰ সিংহাসনাবোহণ মঙ্গলময় হোক,  
তখ্তেৰ সমাৰোহ — বাদশাহীৰ মর্যাদা আপনাকেই শোভা পায়।

ধৰণীৰ সপ্তরাজ্য আপনাৰই দাসানুদাস,  
আপনাৰ শিৱ বৰ্ষণমুখী বাদলেৰ উৰ্ধৰ্ব।

ফারেদুন কুন্দরোকে তার সমীপবৰ্তী হতে আদেশ কৱলেন,  
এবং নিজেৰ পৱিচয় ব্যক্ত কৱলেন।

তারপৰ তাকে বললেন যাও,  
এক শাহী মজলিসেৰ আয়োজন কৱ।

নিয়ে এসো সুগন্ধি সুৱা, ও গায়কদেৱ ডেকে আন,  
সুৱাপ্ত সাজিয়ে রেখে আয়োজন কৱো সুখাদ্যেৱ।

এমন সব গায়ক এনে জন্মায়েত কৱবে যাবা  
নন্দিত কৱতে পারবে আমাৰ মন  
এবং আসৱ কৱতে পারবে আমোদিত।

সেই সব গুণীদেরও এনে সমবেত করো আমার সিংহাসনের পদতলে,  
যাঁরা আমার সৌভাগ্যের জন্য শোভন হবেন সর্বতোভাবে।

আদেশ শুনে কুন্দরো অবিলম্বে  
সব কিছুর জোগাড়ে মনোনিবেশ করলো।

উজ্জ্বল সুরা আহরিত হলো, ডেকে আনা হলো গায়কদেরকে,  
সুখাদ্য সংগৃহীত হলো এবং জড়ে করা হলো

সম্মানিত দলপতিগণকে।

ফারেনুন সুরা পান করে অস্তর নান্দিত করলেন সুমধুর সঙ্গীতে —  
রাত্রি এক সুরম্য উৎসবের আনন্দে উজ্জ্বলিত হলো।

প্রভাত হলে কুন্দরো  
নতুন বাদশার সমীপ থেকে নির্গত হয়ে  
ঘোড়ায় চেপে অনতিবিলম্বে  
মুখ করলো জোহাকের দিকে।

এবং তার সমীপে উপস্থিত হয়ে  
যা কিছু দেখে এসেছে সব একে একে নিবেদন করলো।

বললো, হে আত্মস্তরী বাদশা,  
আপনার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ প্রকটিত হচ্ছে।

তিন জন উচ্চশির ব্যক্তি এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে  
কোন এক দেশ থেকে আগমন করেছে।

তিন জনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ জনের শির  
দেবদারুর মতো উচু এবং তার চেহারায়  
প্রকটিত রয়েছে কেয়ানী বৎসুলভ মর্যাদা।

বয়সে কনিষ্ঠ হলেও  
সম্মান ও ক্ষমতায় সে সর্বোচ্চ।

তার হাতে রয়েছে এক প্রহরণ—সেটি যেন এক লোহ গিরি,  
জনসমাবেশ তা সূর্যের মতো জুল জুল করেছে।

ঘোড়ায় চড়ে সেই তরুণ প্রবেশ করেছে শাহী মহলের মধ্যে,  
অপর দুই ব্যক্তি তেমনি করে তাকে পথ দেখিয়ে এসেছে।

প্রাসাদে প্রবেশ করেই সে হস্তগত করেছে রাজ-সিংহাসন,  
ও আপনার সমস্ত ইল্লজালকে পরাভূত করেছে।

আপনার প্রাসাদে যত লোক ছিল  
মানুষ কিংবা দৈত্য —

সবাইকে সে তার অশ্বের মুখে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে,

এবং তাদের মগজ তাদের শোণিতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।  
কুন্দরোর কথা শুনে জোহাক বললো, সে হয়তো আমার কোন  
সম্মানিত মেহমান,  
তাকে সাগ্রহে স্বাগতম জানানো তোমাদের উচিত ছিল।  
রাজার কথা শুনে কুন্দরো বললো, সে লোক যদি মেহমানই হতো,  
তবে তার হাতে গোমুখ চিহ্নিত প্রহরণ থাকবে কেন?  
যদি সত্যই সে মেহমান হতো তবে যত শৌধ্র সন্তুষ্ট  
সে সংবরণ করতো তার অস্ত্র !  
কিন্তু এসব কিছুই না করে সে দণ্ডভরে  
আপনারই সিংহাসনে গিয়ে বসেছে,  
এবং তুলে নিয়েছে আপনার তাজ তার নিজের শিরে এবং কোমরে  
বেঁধেছে আপনারই কোমরবন্ধ।  
এমন জনকে যদি আপনি মেহমান বলতে চান তবে বলুন।  
জোহাক বললো, হয়তো এতো সুখের সামগ্ৰী হাতের কাছে পেয়ে  
মেহমানের মাথা বিগড়ে গেছে।  
কুন্দরো তখন জোহাককে বিদ্রূপ করে বললো,  
হাঁ, শুনলাম ; এখন আরো শুনুন।  
সেই যশকাহী যদি আপনার মেহমানই হতো,  
তবে আপনার শয়ন-কক্ষে তার কি প্ৰয়োজন ছিল ?  
কেন সে জামশেদের ভগ্নিদুয়কে নিয়ে  
এমন ঢলাতলি করে বসলো আপনারই আসনে ?  
আমি স্বচক্ষে দেখলাম, এক হাতে সে চিবুক স্পর্শ করে আছে শাহ্ৰনাজেৰ,  
অন্য হাত আবেশে বুলিয়ে দিয়েছে আৱেণওয়াজেৰ রঞ্জিন ঠোটে।  
আৱ অৰুকাৰ রাত্ৰিৰ মতো লজ্জানত হয়ে  
কন্যাদৃয় নিজেদেৰ কস্তুৰী-বাসিত চূলে রঁচনা কৰেছে তার সিথান।  
বাজা ! আপনার সেই-চন্দ্ৰমুখ প্ৰিয়া-যুগলেৰ সেই-সুবাসিত অলক !  
আহা ! আপনারই চিৰদিনেৰ আকাঙ্ক্ষিত সেই যুগল প্ৰতিমা !  
এই কথা শোনামত্ৰ জোহাক কুন্দ নেকড়েৰ মতো লাফিয়ে উঠলো  
এবং এমন অবস্থায় নিজেৰ মৃত্যুকেই সে জ্ঞান কৰলো শ্ৰেয় বলে।  
অশ্লীল কটু বাক্য ও নিদাৰণ চিৎকাৰে ফেটে পড়ে  
দুঃস্বপ্নেৰ ভাৱী বোৰা যেন সে নামিয়ে দিতে চাইলো।  
কুন্দরোকে ধৰক দিয়ে জোহাক বললো, তুই আৱ কোনদিন  
আমাৰ ঘৱেৱ খবৰ নিতে যাস্বনে।

কুন্দরো প্রত্যুষেরে বললোঁ, বাদশা,  
আমার সম্পর্কে এই বুঝি আপনার ধারণা হয়েছে ?  
যে ভাবে আপনি আজ আমাকে তিরস্কার করলেন  
তাতে মনে হয়, অতঃপর আপনার ভাগ্যে সুদিন  
আব কখনো কিরে আসবে না ।

আপনি বিশ্বত হচ্ছেন আপনার শাহী মর্যাদা,  
তাই আমার গোয়েন্দাগিরি আপনার তিরস্কারের লক্ষ্য হয়েছে ।  
আপনার শক্তি আপনারই সিংহসনে উপবিষ্ট হয়ে  
হাতে তুলে নিয়েছে গোমুখ চিহ্নিত ভীম প্রহরণ ।  
আপনার সকল শক্তি ও ইন্দ্রজালকে বিপর্যস্ত করে  
সে সুখে আপনার শানে সমাসীন হয়েছে ।

রাজা, কেন আপনার বুঝি আজ টেনের অনুধাবনে পরাজিত হচ্ছে ?  
এমন ব্যাপার কি আব ঘটবে বলে আপনি মনে করেন ?

## ফারেদুন কর্তৃক জোহাকের বন্দী হওয়া

এই কথোপকথনের পর বাদশা জোহাক  
উদ্বেলিত অন্তরে রাজধানীর দিকে মুখ করলো।  
রাজপথ ছেড়ে সংকীর্ণ পথে  
এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলো সে সৈন্যদেরকে।  
দৈত্য ও যুদ্ধবাজ সৈনিকদের এক বিরাট দল এমনিভাবে  
কুকু গর্জনে এগিয়ে চললো সামনের দিকে।  
অবশ্যে চোরাগলি পথে তারা প্রাসাদের দ্বারদেশে এসে  
উপস্থিত হয়ে

ঙৰ্ষ-দীর্ঘ অন্তর নিয়ে মাথা গলিয়ে দিলো শহরের ভিতরে।  
ফারেদুনের সৈন্যরা যখন এই সংবাদ পেলো  
তখন তারাও সকলে সেই পথহীন পথের দিকে মুখ করলো।  
দূরস্থ জঙ্গী ধোঢ়া ছুটিয়ে দিয়ে  
অবিলম্বে তারা সেই সংকীর্ণ পথ ছেয়ে ফেললো।  
যে কেউ শুনলো যুদ্ধের খবর  
সে-ই তার গৃহের অলিন্দে ও জানালা পথে এসে ভিড় করলো।  
নগরীর সবাই কামনা করলো ফারেদুনের বিজয়,  
কারণ, সবাই জোহাকের অত্যাচারে জজরিত ছিল।  
তারা তাদের গৃহ-প্রাচীর ও অলিন্দ থেকে  
জোহাকের সৈন্যদের প্রতি প্রস্তর, লোট্ট, তীর ও বর্ণা নিষ্কেপ  
করতে লাগলো।

এই অস্ত্র নিষ্কেপে মনে হলো, কালো মেষ থেকে যেন  
শিলা-বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে,  
এবং তার ফলে মাটিতে কেউ আর এতটুকু নিরাপদ জায়গা  
খুঁজে পাচ্ছে না।

শহরের সকল যুবক  
অভিজ্ঞ প্রবীণ সৈনিকের মতো  
ফারেদুনের সৈন্য দলে এসে যোগ দিলো,  
তারা আজ জোহাকের ইন্দ্ৰজাল থেকে মুক্ত।  
সৈন্যদের চিংকারে পাহাড় প্রকল্পিত হলো,  
অশ্বের পদাঘাতে ধৱণী অসহায় বোধ করলো।  
সিপাহীদের পদধূলিতে মেষ করে এলো আকাশে,

এবৎ তাদের বর্ণাঘাতে পাষাণের হৃদয় বিদীর্ঘ হতে লাগলো ।  
অগ্নিপূজকের মন্দির থেকে কষ্টস্বর ধ্বনিত হলো,—  
রাজা অক্ষম—সে তার সিংহাসনে জরাগ্রস্ত ;  
তোমরা তরুণ বৃন্দ সকলে বল,—  
আমরা তার আদেশ আর মান্য করব না ।  
আমরা যাব না আর জোহাকের দরবারে,  
আমরা সেই অজগর-স্কন্ধ রাজার দিক থেকে মুখ ফিরালাম ।  
এই কথা শুনে সৈন্য ও নগরবাসী সকলে মন্ত হস্তীর মতো এসে  
প্রবেশ করলো যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ।  
রৌদ্রকরোজ্জ্বল নগরীর আকাশ যেন মেঘে ছেয়ে ফেললো,  
সূর্য ম্লান হলো ।  
এই দৃশ্য অসহ্য হলো জোহাকের চোখে,  
সে সৈন্যদল ছেড়ে একাকীই প্রাসাদের দিকে মুখ করলো ।  
লৌহ-বর্মে আপাদমস্তক আবৃত করলো সে,  
যাতে কেউ তাকে চিনতে না পাবে ।  
এইভাবে সে প্রাসাদের নিকটে এসে পৌছলো —  
রঞ্জু-বন্ধ-সোপানের সাহায্যে সে প্রাচীর লঙ্ঘন করবে ।  
নীচে থেকেই পুরীমধ্যে সে শাহরনাজকে দেখতে পেলো,  
ফারেদুনের প্রেমের মন্ত্রে বন্দিনী হয়ে সে কাল যাপন করছে ।  
তার মুখ যেন সূর্য, তার অলকদাম রাত্রি —  
ঘণায় জোহাকের অধরোঢ় বিস্ফারিত হলো ।  
সে বুঝলো, বিশ্ব-প্রভুরই এই মড়যন্ত,  
পাপের শাস্তি থেকে আর রেহাই পাওয়া যাবে না ।  
তার মনে দৈর্ঘ্যার আগুন আরো বেশী করে জুললো,  
সে ঘূরিয়ে মারলো সেই রঞ্জু-সোপান প্রাচীরের উপরে —  
তার মনে সিংহাসনের আশা কিংবা প্রাণেয় মায়া কিছুই রইল না ।  
রঞ্জু-সোপানের সাহায্যেই আবার প্রাচীর থেকে নীচে নেমে এসে  
উন্মুক্ত করে নিলো জোহাক তার খঞ্জে ;  
সে কে কিছুই বললো না, উচ্চারণ করলো না নিজের নাম,  
শুধু সেই উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ খঞ্জের হাতলে হাত রেখে  
সুন্দরীদের শোণিত পিপাসায় সামনের দিকে এগিয়ে চললো ।  
জোহাক যখন প্রাচীর বেয়ে নীচে নামছিল  
ফারেদুন তখনই অবহিত হয়েছিলেন তার আগমনের কথা ;

তাই বিদ্যুৎগতিতে তিনি গো-মুখ চিহ্নিত প্রহরণ নিয়ে  
এগিয়ে গেলেন,

এবং তা দিয়ে আঘাত করলেন জোহাকের মস্তকে।  
এমন সময় সহসা আকাশ-বাণী হলো,—সংযত হও,  
দ্বিতীয় আঘাত এখনই তাকে করো না —এখনও তার  
মৃত্যুর সময় হয়নি।

এখন তাকে শক্ত করে বেঁধে  
দুই পাহাড় যেখানে খুব সংকীর্ণ হয়ে সামনা—সামনি এসেছে  
সেখানে নিয়ে যাও।

সেই পাহাড়েই তাকে বেঁধে রাখো,  
সেখানে কেউ নেই তার আপনজন।  
ফারেদুন এই বাণী শুনে ব্যাষ্টচর্ম-নির্মিত  
রঙ্গু দিয়ে জোহাককে বেঁধে ফেললেন।  
এমন বজ্ঞ-ফাঁসে তিনি তাকে আবক্ষ করলেন যে,  
মস্ত হাতীও সেই বক্ষন খুলতে অপারগ হবে।

অতঃপর মণি-মুক্তা-নির্মিত জোহাকেরই সিংহাসনে বসে  
ফারেদুন উচ্ছেদ করলেন জোহাকের আমলের সকল আইন।  
সকলকে ডেকে উচ্চকঠো ঘোষণা করলেন,—  
শোন, তোমরা জ্ঞানীগুণী ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ,  
যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই, অস্ত্র সংবরণ কর;  
তোমাদের স্ফীতি-নাসা অশু যেন আর কারো সুনাম ও ষশ  
পদদলিত না করে।

বৃত্তিধারী ও সিপাহী উভয়ের কাজ করুক,  
প্রত্যেকে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করুক নিজের ক্ষেত্রে।  
বৃত্তিধারী ও প্রহরণধারী  
নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সৃষ্টি করুক নব বিশ্ময়।  
একজনের কাজে অন্যজনের মাথা গলানোর ফলেই  
দুনিয়া দুঃখে পরিপূর্ণ হয়েছিল।  
এতদিন অপবিত্র ইন্দ্রজালের বক্ষনে দুনিয়া বন্দী ছিল,  
আজ সেই প্রভাব থেকে সে মুক্ত হলো।  
তোমরা প্রতীক্ষা করেছ দীর্ঘদিন; আজ তোমরা সুখী হও,  
এবং আনন্দিত চিত্তে গমন কর স্ব স্ব কাজে।

সকলেই জ্ঞানী ও শক্তিশালী বাদশার  
এই বাণী শুনলো ।

নগরীর সকল বিষ্টবান ও সম্মানিত  
নিজেদের অস্তর থেকে ঘেড়ে ফেললো অতীতের কলুষ ।

তারা আজ সুখী আনন্দিত,  
তাদের হৃদয় আজ রাজার বাণীতে পরিপূর্ণ ।

বুদ্ধিমান ফারেদুন সংজ্ঞিত করলেন তাদের অস্তর,  
জ্ঞানের স্বাদ দান করলেন তাদেরকে ।

এমন উপদেশ তাদেরকে দিলেন যে,  
আবার সকলের মনে পড়লো বিশ্ব-প্রভুর কথা ।

তিনি বললেন, আমার এই মর্যাদার আসন  
তোমাদের সকলের সৌভাগ্যে আজ নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল,  
এরই জন্য বিশ্ব-প্রভু আমাকে নির্বাচিত করেছেন —  
তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন সুদূর আলবুর্জ-পাহাড় থেকে ।  
যার ফলে দুনিয়া মুক্ত হয়েছে আজদাহার (জোহাকের)  
অত্যাচার থেকে —

এবং আমার শক্তি তোমাদের শৃঙ্খল দ্বাৰা করেছে ।

তাঁর এই দয়ার উপযুক্ত কাজ তোমাদের করা উচিত,  
এই শৃঙ্খল মুক্তির জন্য নিবেদন করা উচিত সংকর্মের ডালি ।

আমি দুনিয়ার একচ্ছত্র নৱপতি,  
কিন্তু তাই বলে অহকারে প্রমত্ত হওয়া আমার জন্য শোভন নয় ।

যদিও আমি এই সিংহাসনে বসে  
প্রত্যহ তোমাদেরকে নিয়ে মগ্ন হতে পারি সুরা পানে  
কিন্তু তা আমি কবর না ।

এই ভাষণ শুনে সম্মানিত দলপতিগণ মৃত্যুকা চুম্বন করলো,  
দুন্দুভি-নিনাদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করলো দশদিক ।

সেদিন গোটা নগরীর আয়ত দৃষ্টি ফিরলো  
রাজ-প্রাসাদের দিকে,

তাদের উল্লাস-ধ্বনিতে দিগন্ত সঙ্কুচিত হয়ে এলো ।

আজ আজদাহাকে (জোহাককে) বাইরে আনা হবে —  
রঞ্জুতে বাঁধা অপমানিত নিঙ্গীৰ ।

একের পর এক সৈন্যশ্রেণী বিনির্গত হলো নগরীর দ্বার-পথে ;  
নগরীর সবাই বেরিয়ে এলো —একটি লোকও ঘরে রইল না ।

সবাই দেখলো জোহাককে অত্যন্ত অপমানিতভাবে বেঁধে নিয়ে  
আসা হচ্ছে,  
উটের পায়ের সঙ্গে রঞ্জুতে আবদ্ধ করে।

এইভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো শীরখানা<sup>\*</sup> পর্যন্ত,  
সেন্দিনই মানুষ প্রথম জানতে পারলো এই প্রান্তরের নাম।  
অনেকে কক্ষরময় বালুপথ পার করে  
ফারেদুন জোহাককে শীরখানের নিকটবর্তী এক পাহাড়ে নিয়ে এলেন।  
অতঃপর তাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন এক পর্বত গুহায়,  
এবং উল্টোমুখ করে তাকে সেখানে বাঁধবার আয়োজন করলেন।  
এই সময় আবার সহসা আকাশ-বাণী হলো  
সেই বাণী তাঁর কানে কানে বললো,—  
এখানে নয়, দামাওন্দ পাহাড়ে নিয়ে যাও,  
এবং সেখানেই এই দলচুত আবর সন্তানকে বেঁধে রাখ।  
লক্ষ্য রেখো, কেউ যেন তার মুক্তির জন্য তোমাকে অনুরোধ না করে;  
তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কেউ যেন তোমার কাছে  
তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী না হয়।  
সেই বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী জোহাককে ঘোড়ার পায়ের সঙ্গে বেঁধে  
দামাওন্দ পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বন্দী করা হলো।  
তারপর পাহাড়ের গুহামুখ বন্ধ করে  
তাকে মানুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো।  
এইভাবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে গেল জোহাকের নাম,  
পৃথিবী পবিত্র হলো তার মালিন্য থেকে।  
দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সে  
একাকী বন্দী হয়ে রইলো পাহাড়ের গুহায়।  
পাহাড়ের সংকীর্ণ গুহাই যেন সে পছন্দ করে নিলো,  
সেই অঙ্ককারেই যেন তার দৃষ্টি খুঁজে পেলো তার  
উপযুক্ত দশনীয় বস্তু সকল।

ভারী লৌহ-কীলকে আবদ্ধ হয়ে  
খুলে রইলো সে —মাথা নীচু করে।  
বাঁধা হাত দুটো প্রসারিত রইলো ঘতটা সন্তুব,

• প্রাচীন ইরানের একটি প্রান্তরের নাম।

যেন শাস্তিকে সে দীর্ঘায়িত করতে চায় বহুদিন ধরে।  
এইভাবে উল্টোমুখী হয়ে সে ঝুলে রইলো  
আর তার হৃদয় শোণিত বিন্দু বিন্দু ঘরে পড়তে লাগলো মাটির উপর।

এসো আমরা দুনিয়ায় মন্দের পরিণতি প্রত্যক্ষ করি,  
এসো, সয়ত্বে আমরা শক্তি নিয়েজিত করি সংকার্যের দিকে।  
যদিও ভালো ও মন কিছুই চিরকালের নয়,  
তবুও ভালোই সংক্ষিত থাকে স্মৃতির মণিকোঠায়।  
স্বর্ণমুদ্রা, সম্পদ ও উন্নত প্রাসাদ  
তোমার জন্য লাভবান বস্তু বলে প্রমাণিত হবে না।  
কথা বেঁচে থাকবে তোমার স্মৃতি রূপে,  
কথাকে তুমি অল্পমূল্য জ্ঞান করো না।  
মহামতি ফারেদুন ফেরেশতা ছিলেন না,  
তাঁর সুনাম কস্তুরী ও অম্বুর থেকে হয়নি।  
ন্যায়পরতা ও বদান্যতা দিয়েই তিনি অর্জন করেছিলেন যশ  
তুমি ও তা করো, কারণ অস্তরের অস্তঃস্থলে তুমি ও ফারেদুন।  
ফারেদুন যে সব কাজ করে বিশ্ব প্রভুর করণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন,  
তন্মধ্যে দুনিয়াকে মালিন্যমুক্ত করা ছিল প্রথম।  
অন্যায়কারী অত্যাচারী জোহাককে বন্দী করে  
তিনি রক্ষা করেছিলেন দুর্বলকে।  
দ্বিতীয়, তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে  
দুনিয়ার জন্য ও নিজের জন্য কল্যাণের পথ করেছিলেন নিষ্কন্টক।  
তৃতীয়, পৃথিবীকে অজ্ঞানতার কলুষ থেকে মুক্ত করে  
অন্যায়ের শক্তিকে তিনি করেছিলেন শৃঙ্খলিত।  
দেখ, যেখানে রাজত্ব করতো বৃক্ষ জোহাক  
সেখানেই আজ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফারেদুনের শাসন।  
দীর্ঘ পাঁচশো বছর বাদশাহীর পর  
তাঁর কালেরও অবসান হয়েছিল।  
দুনিয়া অন্যের হাতে সমর্পণ করে তিনি ও করেছিলেন অস্তর্ধান,  
এবং পেছনে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর জন্য দুনিয়াবাসীর শোক।  
সেইমতো উচুনীচু সর্বজন  
ইচ্ছা করলে হতে পারে যশস্বী কিংবা অপরিজ্ঞাত।

## ফারেদুনের বাদশাহী পাঁচশো বছর স্থায়ী হয়েছিল

ফারেদুন সিংহাসনে বসে দেখলেন  
তিনি ছাড়া রাজাধিরাজ আর কেউ নেই।  
কেয়ানী প্রথানুযায়ী তখ্ত ও তাজ  
যথাসময়ে প্রস্তুত করে রাখা হলো সজ্জিত প্রাসাদে।  
সুমঙ্গল দিনে বাজের যত গণ্যমান্য দলপতি  
সেই কেয়ানী তাজ তুলে দিলো তাঁর মাথার উপরে।  
সেই মুহূর্ত থেকে কাল শোকোন্ধুক্ত হলো  
এবং সবাই ধরলো ধর্মের পথ।  
সবাই তাদের হাদয় অনুরাঙ্গিত করলো তাঁর কালের হর্ষে,  
এবং আয়োজন করলো এক নতুন উৎসবের।  
জ্ঞানিগণ প্রীতিপূর্ণ হাদয়ে আসুন করে বসলেন,  
এবং সবাই তাদের হাতে তুলে নিলো রঙিম সুরাপাত্র।  
উজ্জ্বল সুরা ও নতুন বাদশার জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল,—  
দুনিয়া উজ্জ্বল হলো পৃষ্ঠিমার চাঁদের মতো।  
তাঁর আদেশে তারা আগু প্রজ্জ্বলিত করলো  
এবং সুগন্ধি ধূপ ধূনা জ্বালিয়ে দশদিক আমোদিত করলো।  
দলপতিগণ গ্রহণ করলো রাজার ধর্ম—  
মানসিক স্বাস্থ্য ও নিষ্কলুষ ভোগকে করলো তারা জীবনের অলঙ্কার।

এখনও সেই চন্দ্রমুখ মহাজনদের স্মৃতি চোখে ভাসে  
আহা, কোন দুঃখ-কষ্ট পরিষ্পান করেনি তদের অকলঙ্ক বদনমণ্ডল।  
দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে দুনিয়া ছিল এমনি সহাস্য-স্বরিত।  
তার একটি দিনকেও স্পৰ্শ করেনি কোন অঙ্গল।  
কিন্তু বৎস্য, মনে রেখো, দুনিয়া চিরকাল এমনি থাকে না,  
তাই, বিষয়-তৎক্ষণ ও বিরাগ দুই-ই এখানে অথইন।  
জেনে রাখো, দুনিয়া কারো জন্য চিরস্থায়ী নয়,  
কেউ এখানে চিরসুখ প্রত্যক্ষ করেনি।

এদিকে ফারানক (ফারেদুনের মাতা) এখনও জানতে পারেননি  
তাঁর সন্তান দুনিয়ার বাদশা হয়েছে।  
তাঁর কাছে এ সংবাদও অজ্ঞাত যে জোহাকের রাজত্বের হয়েছে অবসান

এবং ভেঙে খান খান হয়েছে তার শাহী তথ্ত।

শেষে ভাগ্যবান সন্তানের কাছ থেকেই মায়ের কাছে খবর এলো,  
পুত্র শাহী তাজের অধিকারী হয়েছে।

মা রাজাধিরাজ পুত্রের কাছে আগমন করে  
তার মাথা ও অঙ্গ ধৌত করে তাকে আশীর্বাদ করলেন।  
তারপর মুখ টেনে নিয়ে রাখলেন নিজের বুকের উপর,  
ও উচ্চারণ করলেন জোহাকের অমঙ্গল।

তারপর বিশ্ব-প্রভুকে ডেকে বললেন,  
হে খোদা, কালের আবর্তনকে আমার পুত্রের জন্য মঙ্গলময় কর।  
যে-সব লোক দুর্দিনে তার সহায় হয়েছিল,  
এবং তাকে দিয়েছিল অন্তর নিংড়ানো ভালবাসা —  
যারা গুপ্তকে প্রকাশ করেনি ও ব্যক্ত করেনি

কারো কাছে উদ্দেশ্যের গোপনতা —

যারা ফারেদুনের সকল রহস্যই স্যাত্ত্বে রক্ষা করেছিল নিজেদের মধ্যে —  
মা এক সপ্তাহ ধরে তাদের সকলকে দান করলেন বহু সামগ্রী,  
ফলে তাদের মধ্যে কেউ আর দরিদ্র রইল না।

দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি আয়োজন করলেন এক আসরের,  
সেখানে এসে জমায়েত হলো উন্নত-শির দলপতিগণ।  
এইবার সমস্ত মণিমুক্তা জওয়াহেরাত  
এতদিন যা গোপন ছিল, বের করে আনা হলো,  
রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো।  
দান করা হলো বহু সম্পদ।

মার সামনে অবারিত করা হলো অস্তহীন সম্পদে

পরিপূর্ণ রাজকোষ,

কিন্তু পুত্রের সামনে সব কিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ বোধ হলো।

তিনি সেই সব ভূষণ, মণিমুক্তা ও জওয়াহেরাত,  
যুদ্ধাশু, সুসজ্জিত আরবী ঘোড়া —

সকল শিরস্ত্রাণ বর্ম ও বর্ণা

মুকুট ও কোমরবন্ধ সব সম্পদ

উটের পিঠে বোঝাই করে

পবিত্র-চিত্ত সম্মানের সমীক্ষে পাঠিয়ে দিলেন।

সম্পদরাজি প্রেরণ করে

মা উচ্চারণ করলেন বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা।

মাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন।

উপস্থিত দলপতিগণ স্মাট-জননীকে চিনতে পেরে

তাঁর প্রশংসা উচ্চারণ করলেন ও কীর্তন করলেন বাদশার শুণাবলী।

তাঁরা বললেন, এই শুভদিন অনন্ত হোক আপনার জন্য,

আপনার অমঙ্গলকামীরা নিপাত যাক।

আপনার বিজয় আকাশ কর্তৃক সমর্থিত হোক,

এবং কল্যাণ ও বদান্যতায় শোভিত হোক আপনার ব্যক্তিত্ব !

দেখতে দেখতে দেশদেশান্তর থেকে এসে জমায়েত হলেন

বহু অভিজ্ঞ দূরদর্শী মহাত্মা।

বাদশার সিংহাসনের চারদিকে সূপীকৃত হতে লাগলো

অসংখ্য মণি ও মুক্তা।

সামন্ত ও দলপতিগণ রাজ্যের দুরদুরান্তর থেকে এসে

সমারোহের সঙ্গে শ্রেণীবন্ধ হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর দরবারে।

তাঁরা সবাই বাদশার জন্য বিশু-প্রভূর আশীর্বাদ কামনা করলেন।

ও তাঁর দয়া ভিক্ষা করলেন তাজ, তথ্য ও রাজ-অঙ্গুরীয়ের উপরে।

সবাই আকাশের দিকে হাত তুলে

রাজার সৌভাগ্য কামনা করলেন।

তাঁরা রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করলেন এবং কামনা করলেন রাজার চিরযৌবন।

অতঙ্গের ফারেনুন দৃষ্টি প্রসারিত করলেন দুনিয়ার দিকে দিকে,

পৃথিবীর প্রকট ও গোপন সকল অবস্থা তিনি জ্ঞাত হলেন।

রাজার পক্ষে শোভন হয় এমন ক্ষিপ্তার সঙ্গে

তিনি অন্যায় ও অত্যাচারের হাতকে পরাভূত করলেন।

দুনিয়াকে তিনি সজ্জিত করলেন নন্দন-কাননের মতো,

শুক্ষ ঘাসের জ্বায়গায় মাথা তুললো দেবদারু ও গোলাপের বন।

বাদশা একদিন আমল<sup>১</sup> থেকে যাত্রা করে তামেশায়<sup>২</sup>

এসে উপস্থিত হলেন,

এবং ছাউনী ফেললেন সেই বিখ্যাত হিংস্র-জন্ত পরিপূর্ণ বনভূমিতে।

গুরপর সেখান থেকে সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করলেন

তাঁর দুন্দুভির আওয়াজ,

যা শুনে অভয় পেলো সকল লোক।

১. ২০ মাঝিন্দিরানের অস্তর্গত দুটো জ্বায়গায় নাম। এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে হিংস্র-জন্ত পরিপূর্ণ একটি বিরাট বনভূমি ছিল।

## ফারেদুন কর্তৃক জন্মলকে যমন দেশে প্রেরণ

ফরেদুনের রাজত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে  
তাঁর তিনি পুত্রের জন্ম হলো।  
বাদশার সৌভাগ্যশালী তিনি পুত্রই  
মায়ের দিক থেকেও হলো অভিজাত।  
দেখতে দেখতে তারা উন্নত দেবদারুর মতো বড় হয়ে উঠলো,  
তাদের মুখে দেখা দিলো যৌবন-বসন্তের শোভা।  
এই তিনি পুত্রের দুর্জন শাহীনাজের গর্ভজাত,  
কনিষ্ঠ-জন সুন্দরী আরনেওয়াজের বুকের মানিক।  
পিতা এতদিন পুত্রদের প্রতি নজর দেওয়ার সময় পাননি,  
আজ তিনি তাদেরকে সুসজ্জিত হাতীর উপর চড়িয়ে দেখলেন  
পরম স্নেহে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন তাদের দিকে,  
দেখলেন, তারা প্রত্যেকেই তাজ ও তখ্তের যোগ্য।  
ফারেদুন তখন তাঁর যশস্বী বশৎবদগণের মধ্যে থেকে  
একজনকে তাঁর কাছে ডাকলেন।  
তার নাম ছিল জন্মল — সে বহুদশী —  
সকল কাজেই সে বাদশার মনোরঞ্জন করতে পৈরেছে।  
তিনি তাকে বললেন, দুনিয়ার সর্বত্র খোঁজ করে  
তুমি তিনটি সদৃংশজাত কন্যা মনোনীত করবে।  
তারা যেন আমার তিনি পুত্রের জন্য সঙ্গত হয় সর্বকাপে  
এবং সব দিক থেকেই হয় আমার আত্মীয়তার যোগ্য।  
দ্বিতীয় শর্ত, সেই তিনি কন্যা একই পিতামাতার সন্তান হবে,  
হবে তারা পরমা সুন্দরী সৌভাগ্যবত্তী ও পবিত্রা।  
তারা নিজেই দেখতে একমতো হবে — সমান হবে,  
কেউ যেন কারো চেয়ে এতটুকু কম না হয়।  
বাদশার কথা শুনে জন্মল  
মনস্থির করে নিলো।  
তার হন্দয় ছিল জাগ্রত, বৃদ্ধিমুণ্ড,  
সে ছিল বাক্পটু ও কর্মে তৎপর।  
অধিক বিলম্ব না করে বাদশার দরবার থেকে  
বেরিয়ে এলো সেই সুহন্দয়;

এবং ইরান ছেড়ে যাত্রা করলো বহির্বিশ্বের দিকে,—  
 অবিরাম চললো তার অনুসন্ধান,— অনেক সে বললো, অনেক শুনলো।  
 যে রাজ্যেই কোন রাজা ছিল  
 আর তার অস্তঃপুরে ছিল কন্যারত্ন,  
 জন্মল গোপনে সেখানেই খবর নিলো,  
 কন্যাদের নাম জানলো, শুনলো তাদের কষ্টস্বর।  
 কিন্তু গ্রামীণদের মধ্যে এমন অভিজাত সে কাউকে পেলো না,  
 যার সঙ্গে ফারেদুনের আঙ্গীয়তা হতে পারে।  
 শেষ পর্যন্ত সেই বুদ্ধিমান রাজদূত  
 যমন দেশের রাজা সর্বওয়ের দরবারে এসে উপস্থিত হলো।  
 লক্ষণ মিলিয়ে দেখলো — আঙ্গীয়তার উপযুক্ত জ্ঞান বটে,  
 ফারেদুন যেমন চান তেমনই তিনি রাজকন্যা আছে এই অস্তঃপুরে।  
 প্রফুল্লচিঠ্ঠে মনুমন্দ গমনে জন্মল রাজার  
 সামনে এসে উপস্থিত হলো —  
 বুলবুল যেমন আনন্দের সঙ্গে গোলাপের সমীপবর্তী হয় তেমনিভাবে।  
 সে প্রথমতো মৃত্তিকা চুম্বন করে রাজার আনুগত্য প্রকাশ করলো।  
 এবং উচ্চারণ করলো রাজার গুণাবলী।  
 বললো, রাজার উন্মত্তির লাভ করুক চিরদিনের মর্যাদা,  
 চিরকাল তাঁর জন্য উজ্জ্বলিত থাকুক মুকুট ও সিংহাসন।  
 জবাবে যমনের রাজা বললেন,  
 আপনার রসনা প্রশংসা-শূন্য না হোক।  
 কি সন্দেশ নিয়ে আপনার আগমন বলুন,  
 হে মহাত্মন, অকপটে প্রকাশ করুন আপনার অভিপ্রায়।  
 জন্মল বললো, আপনি চিরসুখী হোন,  
 অমঙ্গল চিরদিন আপনার থেকে দূরে থাকুক।  
 ইরান থেকে আমি পূজারীর মতো  
 যমন-রাজের কাছে শুভ-সন্দেশ নিয়ে আগমন করেছি।  
 মহান ফারেদুনের সন্তানণ নিয়ে এসেছি আপনার জন্য,  
 আপনার প্রশ্নেরও সঙ্গত প্রত্যুত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।  
 ধীরশ্রেষ্ঠ ফারেদুন আপনাকে জানিয়েছেন তাঁর সন্তানণ,  
 তাঁর মাহাত্ম্য সর্বলোকে বিদিত।  
 আমাকে তিনি বলেছেন, শাহেয়মনের কাছে আমার  
 বাণী পৌছিয়ে দিয়ে

তাঁর প্রাসাদে কস্তুরীর মতো ছড়িয়ে দিয়ো সুগন্ধ।  
তিনি বলেছেন, আমি কামনা করি শাহের চিরস্থান্ধু  
তাঁর বেদনার নিরসন ও সম্পদের প্রাচুর্য।  
ওগো আরবদের রাজা, যদিও আমার (ফারেন্দুনের) নক্ষত্র  
অপরিম্মান, আমার সম্পদ প্রচুর;  
সন্তানের মতো কোন বস্ত্রই মানুষের কাম্য নয়।  
কোন কিছুই যেমন সন্তানের মতো আদরণীয় নয়।  
তেমনি তাদের আত্মীয়ের মতো আত্মীয়ও আর কেউ নয়।  
এই দুনিয়ার কারো যদি তিনটি চোখ থেকে থাকে  
তবে সে আমার — আমার তিনটি পুত্র।  
ওগো মহাত্মা, আপনি তাদেরকে আমার দৃষ্টির চেয়েও অধিক বলে  
প্রত্যক্ষ করলু,  
কারণ, দৃষ্টি তাদেরকে দেখেই প্রাণ হয় করুণা।  
পবিত্র-চিত্ত কবি কি সুন্দর বলেছেন,—  
সুজন আত্মীয় রচনা করে মনোমুগ্ধকর কাহিনী।  
এই আত্মীয়তা তখনই হয় শোভন সুন্দর  
যখন আত্মীয় আত্মীয়ের কল্যাণকে স্থান দেয় নিজের স্বার্থের উপরে।  
বুদ্ধিমান ও সংব্যক্তি সর্বদা কামনা করে  
সমকক্ষের বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা।  
মানুষের জন্য সৌভাগ্য তখনই অনুকূল বলে গণ্য হয়  
যখন তাঁর পুত্রের জন্য ভবিষ্যতের দিনগুলো হয় সন্তানবন্ধন পূর্ণ।  
আমার বাদশাহী ধনেজনে পরিপূর্ণ,  
সৈন্যসামন্ত, ধনদৌলত ও শক্তি সব কিছুই আমার রয়েছে।  
চাঁদের মতো সুন্দর আমার তিন পুত্র,  
তাঁরা সবাই রাজ্য, তথ্য ও তাজের উপযুক্ত।  
কোন বাসনা ও সম্পদ তাদের অনায়াস নয়,  
সকল বাঞ্ছনীয় বস্ত্র উপরই অধিকার তাদের অব্যাহত।  
কিন্তু এই তিনি শাহজাদারই অস্তরে গোপন রয়েছে  
তিনি যুগলের কামনা।  
তাদের সেই গোপন কামনা আমি অবহিত হয়ে  
প্রেরণ করছি আমার এই দৃত।  
জানি আপনার অসংগুরে রয়েছেন  
তিনি পরম পবিত্রা রাজকন্যা।

কিন্তু যখন শুনতে পেলাম যে, তারা প্রত্যেকেই অনৃতা ।  
তখন মন আমার পূর্ণ হলো আশার আনন্দে ।  
আমার তিনি পুত্রও অবিবাহিত,  
তারা কৈশোরের সীমা অতিক্রম করেছে প্রভাতী সুর্মের মতো ।  
এখন প্রত্যেকটি যুগল মুক্তাকে  
পরম্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আপনার হাতে ।  
পরমা সুন্দরী তিনি অন্তঃপুরবাসিনীকে আপনি দিতে পারেন  
তিনটি রাজ্যের মহিষীর মর্যাদা ।

জন্মল জানালো, ফারেদুন আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এই বাণী,  
এখন আপনার প্রত্যুষের কি, তা নিবেদন করুন ।  
যমনের বাদশা ফারেদুনের এই প্রস্তাব শুনে  
বর্ষণ প্রত্যাশী চামেলী ফুলের মতো পরিচ্ছান হলেন ।  
তিনি মনে মনে বললেন, যদি আমার শিয়ারের কাছে  
আমার এই তিনি চন্দ্রকে আমি না দেখতে পাই  
তবে আমার আলোকিত দিন রাত্রির মতো অঙ্ককার হয়ে যাবে;  
সুতরাং, জবাবের জন্য অধরোচ্ছ এই মৃহৃতে উন্মোচিত করা উচিত নয় ।  
কিন্তু এই রহস্য দৃতের কাছে প্রকাশ করা মাত্র  
ভালো মন্দ দুই-ই আমার সঙ্গী হয়ে পড়বে ।  
সত্ত্বের আমি জবাব দিব না, আমার মঙ্গলকামীদের সঙ্গে এখন পরামর্শ করাই  
আমার জন্য সঙ্গত হবে ।

মনে মনে এই স্থির করে ফারেদুনের দৃতের জন্য রাজা এক স্থান  
নিবাচিত করলেন, এবং নিজে মগু হলেন উপায় চিন্তায় ।  
দরবারের দ্বার রুক্ষ করে তিনি জ্ঞানীদের নিয়ে বসলেন ।  
জ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মরম্বাসী বর্ণাধারী, এবং পরীক্ষিত স্বজন ।  
রাজা তাদের সামনে ব্যক্তি করলেন তাঁর অন্তরের কথা !  
বললেন, দুনিয়ার সঙ্গে আমাকে সম্পর্কিত করে রেখেছে ।  
আমার তিনি উজ্জ্বলিত প্রদীপ ।  
বাদশা ফারেদুন আমার কাছে এক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন,  
যা আমার সামনে বিস্তৃত করেছে মারাত্মক এক ফাঁদ ।  
আমি তোমাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছি,  
সেই প্রদীপ্তিয়কে কি আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিব ?  
দৃত ফারেদুনের উক্তি এইভাবে নিবেদন করেছে —  
আমার তিনি শাহজাদা আছে, তারা সবাই রাজ-মসনদের যোগ্য ।

আমি সেই তিন পুত্রের জন্য  
আপনার অস্তঃপুরবাসিনী তিনকন্যার পাণি প্রার্থনা করছি।  
যদি এই প্রস্তাবের প্রত্যুষ্মনে হাঁ বলি তবে দলিল করা হয় আমার হাদয়কে,  
মিথ্যা প্রতিপন্থ করা হয় আমার রাজকীয় মর্যাদাকে। যদি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করি,  
তবে আমার নিজের অস্তরে প্রজ্ঞালিত করা হয় আগুন ও দুচোখে

প্রবাহিত করা হয় দরবিগলিত ধারা।

পক্ষান্তরে যদি, ফারেদুনের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করি  
তবে তাঁর অত্যাচারে হতে হবে জজরিত।  
এখন তোমরাই বল, একজন রাজার পক্ষে কি কারো ভয়ে

ভীত হওয়া শোভা পায় ?

যদিও তোমরা সবাই শুনেছো সেই কাহিনী —  
কি ভাবে জোহাক পরাভূত হয়েছিল ফারেদুনের হাতে।

তবুও আজ আমার কাছে তোমাদেরকে বলতে হবে,  
এক্ষেত্রে সত্যিই আমার কি করা উচিত ?  
রাজার এই কথা শুনে পরীক্ষিত—বীরগণ  
একে একে দান করলো প্রত্যুষে।

তারা বললো, আমরা সবাই একমত,—  
আপনার গর্ব ভূলুষ্টি হচ্ছে, আমরা তা দেখতে পারব না।  
ফারেদুন হতে পারে একজন বড় বাদশা,  
কিন্তু তাই বলে আমরা তার দাস নই, কিংবা নই তার সামন্ত।

সুস্পষ্ট উক্তি ও দান আমাদের বৈশিষ্ট্য,  
বর্ণ হাতে অশু—বল্লা শুখ করাই আমাদের ধর্ম।  
খঞ্জের হাতে আমরা ধরণীকে শোণিত—সুরায় রঞ্জিত করি,  
উন্নত বর্ণা—ফলকে আকাশকে কন্টকিত করি বেণুবনের মতো।

যদি আপনার কন্যাত্রয়—ই আপনার সম্পত্তি হয়,  
তবে উচিত হবে রত্নদ্বার উম্মোচিত করা ও ওষ্ঠাধর বন্ধ করা।  
যদি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করেন  
এবং মূল্যবান জ্ঞান করেন স্বীয় রাজকীয় মর্যাদা —  
তবে জামাতাত্রয়—কে দেখার প্রস্তাব উথাপন করুন,  
তাদেরকে না দেখা পর্যন্ত বিয়ে হবে না, তা ঘোষণা করে দিন।  
ডঃ.নিগণের এই উপদেশের মধ্যেই  
রাজা তাঁর গর্ব ও মর্যাদার সমর্থন দেখতে পেলেন।

## জন্মলকে যমনের রাজাৰ প্ৰত্যুষ্টিৰ দান

ফারেদূনেৰ দৃতকে ডেকে এনে  
ৱাজা অনেক সুন্দৱ সুন্দৱ কথাৰ অবতাৱণা কৱলেন।  
তাৰপৰ বললেন, আমি ৱাজা, আপনি আৱেক দেশেৰ ৱাজদৃত,  
আপনাৰ প্ৰভুৰ বক্তব্য আপনি আমাৰ কাছে নিবেদন কৱেছেন।  
আপনি বলেছেন, সকল সম্পদেৰ কথা,  
ব্যক্তি কৱেছেন, আপনাদেৱ তিন শাহজাদাৰ গুণাবলী।  
পুত্ৰ পিতাৰ কাছে সকল কিছুৰ চাইতেই প্ৰিয়,—  
সে তাৰ ঘৱেৰ সজ্জা ও সৌন্দৰ্য।  
এসব যা কিছু আপনি বলেছেন, সব আমি স্বীকাৰ কৱে নিলাম,  
আমিও সন্তানেৰ পিতা, তাই এসব আমি বুৰতেও পাৰি।  
যদি আপনাৰ বাদশা আমাৰ কন্যাত্ৰয়েৰ পাণি প্ৰাৰ্থনা কৱেন  
এবং এই মৰণপ্রাপ্তিৰে আগমন প্ৰত্যাশা কৱেন,  
তবে এই অবস্থায় আমাৰ চেয়ে বেশী অপমানিত কে বোধ কৱবে —  
যদি আমি তাৰ সন্তানদেৱকে স্বচক্ষে না দেখেই বিবাহে  
সম্মতি দান কৱি ?

কাজেই আপনাৰ বাদশা যদি এই আত্মীয়তা কামনা কৱেন,  
তবে আমাৰ দেশে তাৰেকে না পাঠালে চলবে কেন ?  
আমাৰ সন্তানত্ৰয়েৰ সঙ্গে যারা  
আবদ্ধ হবে পৱিগঘ—সুত্রে তাৰেকে নিয়ে আসুন,  
আমি স্বচক্ষে তাৰে দেখবো,  
দেখবো, তাৰা কেমন তাজ ও তথ্তেৰ উপযুক্তি।  
তাৰেকে মুখোমুখী দেখলে  
হয়তো আমাৰ অকৰ্কাৰ মন আলোকিত হবে।  
হয়তো তাৰে দৰ্শনে আমাৰ নয়নদৃঢ় আনন্দ পাবে,  
এবং আমাৰ ঘূমন্ত বাসনা হবে জাগ্ৰত।  
তখন আমি আমাৰ নয়নপুত্তলিগণকে  
সমৰ্পণ কৱতে পাৱবো তাৰে হাতে আমাদেৱই  
ৱীতি—ৱেওয়াজ অনুযায়ী।  
আমাৰ নয়ন তৃপ্তি কৱে তখন তাৰা  
অবিলম্বেই তাৰেকে নিয়ে যেতে পাৱবে পিতৃসমীক্ষে।

রাজ্বার এই প্রত্যুষের শুনে জন্দল তাঁর প্রশংসাকীর্তন করলো  
এবং আরবদের বীতি অনুযায়ী চুম্বন করলো তাঁর সিংহাসন।  
তারপর প্রচুর প্রশংসাকীর্তন করে রাজপ্রাসাদ থেকে  
দুনিয়াপতি ফারেদুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।  
ফারেদুনের সমীপে উপস্থিত হয়ে  
যমনের রাজ্বার প্রত্যুষের ও যা কিছু শুনে এসেছে তা নিবেদন করলো।  
বাদশা তখন তাঁর তিনি পুত্রকে  
প্রাসাদস্তর থেকে ডেকে পাঠালেন।  
তারপর জন্দল যা বলেছে ও সেই সঙ্গে নিজের মত  
পুত্রদের সামনে উপস্থিত করলেন।  
বললেন, যমনের নরপতি  
উন্নত দেবদারু সদৃশ দলপতিগণের সর্দার।  
তাঁর তিনি কুমারী কন্যা আছে — অনবিক্ষ মুক্তার মতো,  
তাঁর কোন পুত্র নেই।  
তাদেরকে বধু রূপে পেতে হলে  
তোমাদেরকে সেখানে যেতে হবে।  
তাঁর এই তিনি কন্যার জন্যই আমরা বিবাহের প্রস্তাব করেছি,  
এবং অবতারণা করেছি বহু সৌজন্যমূলক বাণীর।  
এখন তোমাদেরকে সেখানে যেতে হবে,  
এবং তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।  
বাক্পটু ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণ সেখানে  
রাজ্বার আদেশে তোমাদের সমীপবর্তী হবে।  
তাদের প্রশ়্নের জবাব তোমাদেরকে দিতে হবে —  
অবলীলায় ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে।  
বাদশার প্রতিপালিত যে,  
তাকে হতে হয় জ্ঞানী।  
কবি, জাগ্রত-চিত্ত কিংবা ভবিষ্যদ্বৃক্তা  
যে-কেউ প্রশ্ন করুক  
ঠিক ঠিক জবাব দিতে হবে;  
প্রমাণ করতে হবে, জ্ঞানই তোমাদের সম্পদ—ধনদৌলত নয়।  
আমি যা বলছি তা মনোযোগ দিয়ে শোন,  
যদি তা মনে রাখতে পারো, তবে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে।  
যমনেরই এই বাদশাহ গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন,

সে কখনো একা থাকে না ।

তার পাশে সর্বদা অবস্থান করে

কবি, জ্ঞানী-গুণী ও প্রশংসাকীর্তনকারিগণ ।

তার ধনদৌলত ও সৈন্যসামগ্র্যে প্রচুর

জ্ঞানী ও দৃষ্টিমান দলপতিগণ সর্বদা তাকে ঘিরে আছে ।

তারা যেন তোমাদেরকে কোন অবস্থাতেই হীন

প্রতিপন্ন না করতে পারে,

তারা যেন তাদের জ্ঞান ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্ম দ্বারা

তোমাদেরকে অভিভূত করে না দেয় ।

প্রথমে সে এক আসর সজ্জিত করবে,

এবৎ তোমাদেরকে নিয়ে বসাবে সেখানে ।

তিন জন সুন্দরী সূর্যমুখী ললনাকে আনা হবে,

তাদের সৌন্দর্যে ও শোভায় আমোদিত হবে সভামণ্ডপ;

তারপর সুন্দরিগণকে এনে

বসানো হবে তিনটি সুসজ্জিত আসনে ।

মাথায় ও মুখের আদলে তারা তিন জনই দেখতে একমতো হবে,

কেউ কারো চেয়ে খাটো নয় ।

এদের মধ্যে যে কনিষ্ঠা সেই থাকবে আগে

এবৎ জ্যেষ্ঠা যে সে সবার পিছনে ।

কনিষ্ঠা কন্যা পিতার পাশেই বসবে,

জ্যেষ্ঠজন রাজার কাছ থেকে একটু দূরে,

এবৎ মধ্যমা জন বসবে দূয়ের মাঝখানে —

জ্ঞেনে রাখ ; এটি তোমরা ভুল করোনা যেন ।

তোমাদেরকে তখন রাজা প্রশু করবে, বল এই তিন জনের মধ্যে

কে বয়সে বড় ? কে মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ?

রাজ্ঞপুত্রগণ, তোমরা নির্দেশ কর ক্রম ।

তোমরা তখন বলবে, কনিষ্ঠ জন মর্যাদায় সর্বোত্তম,

জ্যেষ্ঠজনের সফলতা তার চাইতে কম ।

মধ্যমা অবস্থান করছেন মধ্যপথে

কারণ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সংযত ।

এইভাবে তোমরা সরওয়ের বাগিচায় সূর্যমুখীদের সম্পর্কে

অবলীলায় বলে যাবে ।

আমাৰ এই উপদেশ তোমৰা স্মৰণে রেখো ।  
এবং এই রহস্যেৰ চাবিকাঠি আয়ত্তে রেখো ।  
বুদ্ধিকে সবচাইতে মূল্যবান সামগ্ৰী বলে মনে কৰো,  
এবং সৰ্বত্র তাকে সঙ্গী কৰে নিয়ো ।  
তিন পুত্ৰই বাপেৰ এই কথা  
অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলো,  
তাৱপৰ ফাৰেদূনেৰ সমীপ থকে যখন তাৰা বেৱিয়ে এলো  
তখন হৃদয় তাৰেৱ জ্ঞান ও চেতনায় পৱিপূৰ্ণ ।  
পিতা পুত্ৰকে পালন কৱেন কুটি দিয়ে  
কিন্তু সবচাইতে মূল্যবান যে-সামগ্ৰী তিনি তাকে দান কৱতে পারেন  
তা জ্ঞান ।

তিন পুত্ৰই বাপেৰ কাছ থকে বেৱিয়ে এসে  
নিজ নিজ ঘৱেৱ দিকে মুখ কৱলো,  
এবং রাত্ৰি সমাগত হলে প্ৰফুল্লচিষ্টে নিদ্রার হাতে  
নিজেৰকে সঁপে দিলো ।

## শাহে যমনের সমীপে ফারেদুনের পুত্রদের যাত্রা

পরদিন তিন শাহীয়াদা সজ্জিত হয়ে বের হলো  
সঙ্গে নিলো কতিপয় জ্ঞানীজ্ঞনকে।

তখন সূর্য সবেমাত্র তার প্রতিবিম্ব আকাশের উপর ফেলেছে,  
এবং মীলের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে লালিমার আভা।  
শাহীয়াদাগণের সঙ্গী লোকলক্ষ্মণ ও অনুরূপভাবে  
আকাশের পটভূমিকায় সূর্যের মতো বেরিয়ে এসে  
যমনের পথ ধরলো।

সর্বও তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে  
হংস-বলাকা সদৃশ এক সৈন্যদল সজ্জিত করলেন।  
রাজা সেই সৈন্যদলকে মেহমানদের অভিনন্দন জানানোর  
জন্য পাঠালেন —  
তারা জ্ঞানী কিংবা আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয় তা প্রশ্ন নয় —  
তারা নবাগত অতিথি।

তিন তরুণ শাহীয়াদা যমনে প্রবেশ করতেই  
সেখানকার নারী—পুরুষ তাদেরকে দেখবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।  
তারা তাদের মন্ত্রকে মুক্তা বর্ষণ করলো—ছড়িয়ে দিলো সুগন্ধি জাফরান,  
ধরলো তাদের সামনে কস্তুরীবাসিত সুরাপাত্র।  
তাদের সকল অশ্বের গ্রীবা—কেশের আর্দ্র হলো সেই সুগন্ধি সুরায়,  
অশু—পদতলে নিষ্ক্রিয় হয়ে রাইলো কত না সোনা কুপা !  
নন্দন—কাননের মতো সুসজ্জিত এক প্রাসাদ তাদের নজরে পড়লো,  
সেই প্রাসাদের ইঁকেগুলো সোনার ও রূপার।  
রোমক—দেশীয় সুচিত্রিত কিংখাবে তার মেঝে সজ্জিত,  
এবং বহু মূল্যবান আসবাবে তা পরিপূর্ণ।  
সহসা সেই প্রাসাদে যেন  
রাত্রির অঙ্ককার বিদীর্ণ করে প্রগলত সূর্যের আগমন হলো।  
ফারেদুন যেমন বলেছিলেন, তেমনি তিন কন্যাকে নিয়ে  
যমন—রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।  
এই তিন পূর্ণ চন্দ্রের দিকে চোখ তুলে চাওয়ার  
যোগ্যতা যেন কারো নেই।  
তারা তিন জন সেই ভাবেই তাদের আসন গ্রহণ করলো  
যেমন বলেছিলেন বাদশা ফারেদুন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, এই তিনটি নক্ষত্রের মধ্যে  
কনিষ্ঠ কোনটি তা তোমরা বলতে পারো ?  
বলতে পারো এদের মধ্যে কে মধ্যমা ও কে জ্যৈষ্ঠা —  
যার দ্বারা আমরা তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেতে পারি ?  
শাহ্যাদাগণ বাপের কাছে যা শিখে এসেছিল  
তা অবলীলায় বলে দিল।

উত্তর শুনে যামনের রাজা সরওয়ের মুখে হাসির রেখা ফুটলো,  
এবং উপস্থিত সবাই তুষ্ট হলো।

জ্ঞানী রাজা যখন বুঝতে পারলেন যে,  
রঙের পাঁচমিশালীতে ফায়দা কিছু হলো না।

তখন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি বিবাহে সম্মতি দান করলেন,  
এবং কনিষ্ঠা কন্যাকে কনিষ্ঠা শাহ্যাদা ও জ্যৈষ্ঠাকে জ্যৈষ্ঠ শাহ্যাদার  
হাতে সমর্পণ করার বাসনা প্রকাশ করলেন।

অবিলম্বে বিবাহের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা হলো,  
বৈবাহিক আচরণাদিতে তাঁরা দান করলেন তাঁদের নীরব সম্মতি।

তিন কন্যাকে তিন শাহ্যাদার হাতে সমর্পণ করা হলো,  
পিত্তসমীক্ষে কন্যাদের মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিম হলো।

লাজনম্ব গমনে বাসরের দিকে তারা স্বামীদের অনুগমন করলো —  
মুখমণ্ডলে রঙের খেলা, অধরোঢ়ে সুমধুর কল্ধবনি।

## সরও ফারেদুনের পুত্রদেরকে ইন্দ্রজাল দিয়ে পরীক্ষা করলেন

আরবদের অধিপতি যমনের বাদশা সরও  
মদ্য ও মদ্যপায়ীদের এক আসর সজ্জিত করলেন।  
রাত্রি গভীর হল গায়কগণ এসে সমবেত হলো সেখানে,  
রাজা আনন্দিত মনে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন।  
ফারেদুনের তিন পুত্র তাঁর জামাতাগণ  
রাজার সন্তুষ্টির জন্য পান করলেন সুরা।  
অচিরেই মদের নেশা তাঁদের বুদ্ধিকে অভিভূত করলো,  
তাঁরা সারা অঙ্গে অবসাদ বোধ করলেন ও তাঁদের চোখে  
নেমে এলো ঘূমের আমেজ।  
তাঁদের চেতনায় সুন্দর স্বপ্নের পদধ্বনি শোনা গেল,  
নিদ্রার জন্য উপযুক্ত স্থানের আকাশক্ষা জানালেন তাঁরা।  
এবং অচিরেই তিন মহাদশয় শাহসুন  
সুগন্ধি ফুলবরী এক গাছের তলায় গিয়ে ঘূমে অচেতন হয়ে পড়লেন।  
জাদুকরণের সর্দার তখন  
এক অভিনব কৌশল চিন্তা করে  
রাজার উপবন ছেড়ে বাইরে এলো,  
এবং বিস্তার করলো এক ইন্দ্রজাল।  
নিয়ে এলো শীতের মৌসুম ও প্রবাহিত করলো ঝঞ্চা বায়ু,  
এবং তা দিয়ে শাহসুনাগণের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালো।  
সেই শীতে কাঁপতে লাগলো প্রাত্র ও উপবন,  
মন্ত্রকোপরি কাকপঙ্কী উড়য়নে অপারণ হলো।  
এই জাদুতে বাদশা-তনয়গণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে  
কঠিন শীতের হাত থেকে রক্ষার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।  
এমন সময় বিশু-প্রভুর নিকট থেকে এলো সাহায্য—  
প্রকটিত হলো তাঁদের পুরুষকার ও প্রতাপ।  
ইন্দ্রজালের প্রভাব তাঁদের উপর কার্যকরী হলো না,  
শীত ঝাতু তাঁদের উপর দৃষ্টিপাতে অশক্ত হলো।  
সূর্য যেমন তার শাণিত তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে  
পাহাড়ের মাথায়,  
তেমনি জাদুশক্তি ও তাদের হাতে ঘায়েল হয়ে মন্ত্রক

অবনত করলো ।

রাজা তখন পুরুষকারের প্রতীক জামাতাগ্রয়ের নিকটে এসে  
উপস্থিত হলেন,

দেখলেন, তাঁদের মুখে প্রতিভাত হচ্ছে আকাশের নির্লিপ্ততা ।  
অথচ তাঁর কন্যাত্মক হিমানীর আকৃমণে

স্বামী-চিন্তায় সূর্যমুখীর মতো পরিম্লান হয়েছে ।

অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে রাজা জামাতাগ্রণের দিকে চাইলেন,  
তাঁর নয়নযুগল যেন ত্রপ্ত হলো চন্দ্রসূর্যের দর্শনে ।

রাজা দেখলেন, তিন শাহ্যাদা তিনটি চাঁদের মতো  
রাজার নতুন উপবন আলো করে আছে ।

ইন্দ্রজাল তাঁদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি —  
সময় তাঁদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে ।

যমন-রাজ তখন দরবার করে,  
সেখানে সকল দলপতিকে জামায়েত করলেন,

তারপর খুলো দিলেন রাজকোষের দুয়ার —

দীর্ঘদিন যা ছিল লোকচক্ষুর কাছে এক অজ্ঞাত রহস্য ।

তিন শাহ্যাদা যেন তিনটি সূর্য আলো করে আছে সারা যহফিল,  
তারা যেন এমন তিনটি দেবদারু কোন চাষীই যা কোন দিন

জন্মাতে পারেনি ।

রাজকোষের সেই অনস্পষ্ট মণিমাণিক্য ও রাজমুকুট যেন  
অধীর হলো শাহ্যাদাগ্রণের স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ।

রাজা সে সব দান করলেন তিন জামাতাকে —  
চাঁদের মতো সুন্দর অথচ বীরভূতের প্রতিমূর্তি ।

তারপর আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় অধীয় হয়ে রাজা বললেন,  
আহা, বাদশা ফারেদুন যদি আমার কাছে না আসতেন ;

যদি তিনি না পেতেন আমার সন্ধান,  
কিংবা এই পরিণয়ের কন্যাপক্ষ যদি কেয়ানী বংশোঙ্গব হতো

তবে কতই না আনন্দের হতো !

যার কন্যা নেই তার উপর সৌভাগ্যের নক্ষত্র

দৃষ্টিপাত করে না,

কন্যার কল্যাণেই মানুষের ভাগ্য-তারা হয় উজ্জ্বলিত ।

তারপর উপস্থিত সকলকে সম্মোধন করে সর্ব বললেন,  
আমার চন্দ্রগণ তাদের উপযুক্ত স্বামী পেয়েছে ।

আমার বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী কন্যাত্রয়কে আমি  
তাদের হাতে সমর্পণ করেছি আমারই দেশের প্রচলিত  
রীতি অনুযায়ী।

আমার দুই নয়নের আলো আমার প্রাণের প্রাণ  
সোপর্দ করেছি তাদের সৌজন্য ও ভালবাসার হাতে।

এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কানুয় ভেঙে পড়লেন  
ও কন্যাত্রয়ের শুভ যাত্রার ব্যবস্থা করলেন,  
দ্রুতগতি অশ্ব ও প্রমত্ন উটের পিঠে তুলে দিলেন  
কন্যাদের জন্য ঘোতুক।

যমন থেকে বিদায় হতে চললো তাঁর মহামূল্য মুক্তা,  
প্রস্তুত হলো শিবিকার পর শিবিকা।

সন্তান সে পুত্র হোক কিংবা কন্যা —

পিতামাতার কাছে উভয়ই সমান।

দ্রুতগতি উটের পিঠে প্রস্তুত হলো হাওদা,  
রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী তাদেরকে করা হলো সুসজ্জিত।

প্রত্যেক কন্যার জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হলো  
মনোরম ঘোতুক,

ও তাদেরকে সেই ভাবেই সুবিন্যস্ত করে রওয়ানা করা হলো।

রাজকীয় ছত্র ও সুসজ্জিত ঘোড়ার পিঠে চড়ে

যাত্রীদলের মধ্যে শোভা পেলেন তিন জামাতা !

এইভাবে ঘোবন সমৃদ্ধ শাহিযাদাগণ

যাত্রা করলেন পিতা ফারেদুনের উদ্দেশে।

## ফারেদুন কর্তৃক পুত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ

পুত্রদের ফিরে আসার খবর পেয়ে  
ফারেদুন পথে বেরিয়ে এলেন।

অস্ত্র থেকে তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করলেন,  
ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উচ্চারণ করলেন প্রার্থনা।  
তারপর এক বিরাট আজদাহার\* রূপ ধরে

পুত্রদের সমীপবর্তী হলেন —

কৃতান্তরক্ষী ব্যাঘ্র ও তেমন আজদাহার মুখোমুখী হতে ভয় পায়।  
ভীষণ গর্জনে মেদিনী কম্পিত করে আজদাহা ধাবিত হলো,  
তার মুখ থেকে নির্গত হতে থাকলো ধূমায়মান অগ্নিশিখা।  
তিন পুত্র এই দশ্য দেখে সহসা আতঙ্কিত হলো,  
এবং তাদের চারদিকে দেখতে পেলো অক্কার পর্বত গুহা।

আজদাহারক্ষী পিতা প্রথম বড় পুত্রের শৌর্য পরীক্ষার জন্য

তার খুব কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

পুত্র এই ভীমকায় আজদাহার সঙ্গে সংগ্রামে পরামুখ হলো,  
সে হতবুদ্ধি হয়ে হারিয়ে ফেললো সকল সাহস ;

এবং অবিলম্বে পৃষ্ঠপৰ্দশন করে প্রয়াণপর হলো ;

পিতা তা দেখে দ্বিতীয় পুত্রের দিকে মুখ করলেন।

মধ্যম পুত্র আজদাহাকে দেখেই

অত্যন্ত সপ্তশংসভাবে টেনে নিলো ধনুক ও তাতে দিলো

আকর্ণ-বিস্তারী টক্কার।

এবং বললো, যুদ্ধ যুদ্ধই,

তা সৈনিকের সঙ্গেই হোক কিংবা ক্রুদ্ধ সিংহের সঙ্গে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও তার সাহস অব্যাহত রাখতে পারল না,

মুখ ফিরিয়ে প্রয়াণপর হলো পেছনের দিকে।

এইবার বাদশা ছোট ছেলের নিকটবর্তী হলেন,

সে আজদাহাকে দেখেই চিৎকার করে এগিয়ে এলো।

এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্তার সঙ্গে তলোয়ার কোষোম্মুক্ত করে

---

এক কাল্পনিক বিকট-দর্শন সাপ। অজগর আজদাহার সমার্থক নয়। আজদাহার মুখে বিঃ  
দাত আছে। তার পাখা ও পা আছে এবং তার মুখ থেকে লেলিহান অগ্নিশিখা নির্গত হয়।

ଅଶ୍ଵବନ୍ଦ୍ରା କଠିନ ହାତେ ସଂୟତ କରଲୋ, ଏବଂ ଧ୍ୱନିତ କରଲୋ  
ସଂଗ୍ରାମୀ ହୁକ୍କାର ।

ଆଜଦାହାକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ସେ ବଲଲୋ, ପୃଷ୍ଠପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଆମାଦେର  
ସାମନେ ଥେକେ,  
ବ୍ୟାସ ହଲେଓ ସିଂହେର ପଥେ ଆଗମନ କରା ଥେକେ ବିରତ ହ ।

ତୋର କାନେ ଯଦି ଫାରେଦୁନେର ନାମ ପୌଛେ ଥାକେ  
ତବେ ଏମନ କରେ ଆମାଦେର ସାମନେ ଆସତେ ଭୟ ପା' ।

ଆମରା ତିନ ଜନଇ ତା'ର ପୁତ୍ର,  
ଆମରା ତିନ ଜନଇ ଭୀମତମ ପ୍ରହରଣଧାରୀ ।

ଯଦି ଭାଲ ଚାସ ତବେ ସରେ ଯା ଆମାଦେର ସାମନେ ଥେକେ,  
ନୟତୋ ତୋର ଭାଗେ ଏଖୁନି ନେମେ ଆସବେ ଚୂଡାନ୍ତ ଦୁର୍ଦିନ ।

ଭାଗ୍ୟବାନ ଫାରେଦୁନ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱାରା  
ପୁତ୍ରଦେର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ପେଲେନ ଓ ତଥୁନି ଅଦ୍ଦ୍ୟ ହଲେନ ।

ତାରପର ପୁନରାୟ ସ୍ନେହମୟ ପିତାର ବେଶେ  
ତା'ର ସ୍ଵକୀୟ ରାଜ-ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସଙ୍ଗେ ତାଦେର ସାମନେ ତିନି ଆବିର୍ଭୂତ ହଲେନ ।

ଦୁନ୍ଦୁଭି ନିନାଦିତ ହଲୋ, ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତିଦିଲ ତା'ର ଅନୁଗମନ କରଲୋ,  
ଏବଂ ତା'ର ହାତେ ଶୋଭା ପେଲ ମେହି ଗୋମୁଖ ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରହରଣ ।

ସୈନିକ ଓ ଦଲପତିଗଣ ଶ୍ରେଣୀବନ୍ଦଭାବେ ତା'ର ଅନୁଗାମୀ ହଲୋ,  
ସର୍ବତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହଲୋ ସାଗତମ ।

ଅଭିଜାତ ଓ ଜ୍ଞାନିଗଣ ବାଦଶାକେ ପଥେ ଦେଖତେ ପେଯେ  
ପଦବ୍ରାଜେ ଏଗିଯେ ଏଲୋ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା —

ତାରା ବାଦଶାର ସାମନେ ଏସେ ଆଭୂତି ପ୍ରଣତ ହୟ ମୃତ୍ତିକା ଚୁମ୍ବନ କରଲୋ,  
ହସ୍ତିର ବୃଂହଣେ ଓ ଦୁନ୍ଦୁଭିର ଆୟାଜେ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ ହଲୋ

ଏକ ସଘନ ଶ୍ରୁତା ।

ପିତା ପୁତ୍ରଦେର ହସ୍ତଧାରଣ କରେ ତାଦେର ଆନନ୍ଦିତ କରି  
ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁୟାୟୀ ତାଦେର ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରଲେନ ।  
ତାରପର ପ୍ରାସାଦେ ଫିରେ ଏସେ  
ତାଦେରକେ ସମବେତ କରଲେନ ତା'ର ସିଂହାସନେର ପାଶେ ।  
ମୁୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନେର ମଧ୍ୟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରଲେନ  
କାଳ ସମ୍ପର୍କେ ତା'ର ଭାଲୋମନ୍ଦେର ଅଭିଭୂତା ।  
ତାରପର ପୁତ୍ରଦେର ସୁମଜିତ ଆସନେ ବସିଯେ  
ତାଦେର ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲଲେନ,  
ଓହି କୃଦ୍ରୁ ଆଜଦାହା

যে তার নিঃশ্বাসে জ্বালিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছিল ধরিত্রী —  
সে আর কেউ নয় তোমাদেরই পিতা—তোমাদের ব্যক্তিত্বের অন্বেষণে  
সেখানে গিয়েছিল এবং তার পরিচয় পেয়ে হচ্ছিল ফিরে এসেছে।  
এখন আমরা তোমাদের নামকরণ করবো—  
তোমাদের প্রকৃতির প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে।

তুমি সকলের বড়, তোমার নাম সুলম\* রাখা হলো,  
আকাশক্ষত বস্তুরাশিতে তুমি পূর্ণ করবে ধরিত্রী।  
তুমি নিরাপত্তার অনুসন্ধান কর অস্ত্রের বাঞ্ছনা থেকে,  
সময়ে পলায়নেও তুমি তৎপর।

যে-বীর মন্ত হাতী কিংবা সিংহের সামনেও পিছু হয় না,  
তুমি তাকে পাগল বলে গণ্য কর, তাকে বীর বলে সম্মোধন কর না।  
আমার মধ্যম পুত্র যে শুরুতে অত্যন্ত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিল,  
আজদাহার আগুন তার মধ্যে উন্মেষিত করেছিল বীরত্বের দর্প;

তার নাম রাখলাম তুর\*\* সাহসী সিংহ  
কখনো মন্তহস্তীর পদতলে পিট হবে না।

বুদ্ধি নিজেই নিজের জায়গায় বীর,  
উপযুক্ত সময়ে কখনো সে আত্মহারা হয় না।

আমার কনিষ্ঠ পুত্র সংকল্প ও সংগ্রামের প্রতিমূর্তি,  
তার মধ্যে ক্ষিপ্রতা ও মষ্টকতা সমভাবে বিরাজ করে।

মৃত্তিকা ও অগ্নির মধ্যপথ সে বেছে নেয়,  
সাবধানতার সঙ্গে সে পদচারণা করে।

সে ঘোবন-দীপ্তি, জ্বালী ও বীর  
প্রশংসা তাকেই শোভা পায়।

তার নাম রাখা হলো এরজ\*\*\*,  
সম্ভূষণ ও মর্যাদাই তবে তার পরিগাম।

সে সময়ে প্রকাশ করবে আনন্দ,  
অসময়ে প্রকটিত করবে ভীষণতা।

শক্তি ও সৌন্দর্যের তুলাদণ্ড রঞ্জিত হবে তার সিদ্ধান্তের উপর,  
কিন্তু সর্বত্র সে প্রদর্শন করবে তার চরিত্রের স্মৃত্য।

এখন আমি আরবের সৌন্দর্য প্রতিমাগণের

\*., ., .,. প্রাচীন পাহলবী অর্থাৎ আবেষ্টীয় ভাষায় এইনামগুলোর হয়তো আভধানিক অর্থও ছিল।  
কিন্তু বর্তমান ভাষায় এগুলি নিছক নাম। 'এরজ' শব্দটি ভারতীয় আর্য শব্দের সমার্থক শব্দ  
হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

নামের মাহাত্ম্যে প্রকটিত করবো আমার আনন্দ।  
সুলমের পত্নীর নাম রাখলাম আরজু  
আর তূরের পত্নীর নাম মাঝ আজাদা।  
এরজের ভাগ্যবতী পত্নীর নাম রাখলান সহী,  
স্বাতী। সর্বদা অনুচরীর মতো করবে তার অনুগমন।  
ভাগ্যের সূচক নক্ষত্রগণ সর্বদা আবর্তিত হয় আকাশে,  
সুতরাং, জ্যোতিষিগণকে এনে জড়ে করা হলো প্রাসাদে।  
তারা তাদের গমনা লিখিতভাবে পেশ করলো,  
শাহমাদাগণ তার মধ্যে দেখতে লাগলো নিজেদের ভাগ্যের নক্ষত্র।  
সুলমের ভাগ্য-লক্ষণে দেখা গেল যে,  
‘মৃগ্নতরী’ তারকা ধনুক রাশির আলিঙ্গনে আবদ্ধ রয়েছে।  
ভাগ্যবান তূরের নিয়তি লক্ষণে প্রকটিত হলো,  
তরণ সূর্য সুমঙ্গল সিংহ রাশির আকর্ষণে আকৃষ্ট।  
এরজের ভাগ্য-লক্ষণে দৃষ্টিপাত করতেই দেখা গেল  
চন্দ্র সেখানে বৃশিক রাশির বন্ধনে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে।  
এই লক্ষণ যার নিয়তির মধ্যে প্রকটিত হবে  
তার আয়ুক্ষাল চিহ্নিত হবে দুশ্চিন্তা ও যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা।  
এই ভাগ্য-লক্ষণ দেখে বাদশা অন্তরে ব্যথিত হলেন,  
তাঁর কলিজা ছিন্ন করে যেন এক হিম নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।  
তিনি বুঝতে পারলেন, এরজের উপর আকাশ বিরূপ,  
ভাগ্য প্রসন্ন নয় তার উপরে।  
বাদশা এরজের উপর আকাশের এই চক্রান্ত দেখে  
তাকে সর্বদা ঢোকের সামনে রাখবার সঙ্কল্প করলেন।  
উজ্জ্বল-হৃদয় এই পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কা  
তাঁর হৃদয়ে তৌরের ফলার মতো গেঁথে রইলো।

---

সৌভাগ্যের সূচক নক্ষত্র বিশেষ।

## ফারেদুন তাঁর রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলেন

ফারেদুন চিঞ্চ-বিক্ষেপ দূরে সরিয়ে দিয়ে বাইরে এলেন

এবং তিন পুত্রকে বেঁটে দিলেন দুনিয়া।

একজনকে দিলেন রোম ও পশ্চিমের এলাকা,

অন্যকে তুর্কিস্থান ও চীন,

তৃতীয়-জনকে দিলেন দিগন্তবিষ্টারী প্রান্তরসহ ইরানভূমি।

প্রথমে সুল্ম চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলো,

রোম ও পশ্চিমের সকল এলাকা তার উপযুক্ত বিভাই হয়েছে।

সে সমস্ত গৌরবসহ কেয়ানী তথ্যে সমাপ্ত হয়

তুরকে তুরান ভূমি দান করার ফলে

সে তুরান ও চীনের সর্বময় প্রভুপদে বরিত হলো।

বাদশা তার জন্য নির্দিষ্ট করলেন যে সৈন্যদল,

সে তাকে অবিলম্বে তুরান অভিমুখে যাত্রার আদেশ দিলো।

তারপর শাহী তথ্যে বসে

সে বাঁধলো তার কোমর ও হস্ত প্রসারিত করলো।

সামন্তগণ তার শিরে বর্ষণ করলো মুক্তাবাজি,

ও তাকে সম্বোধন করলো তুরানের বাদশা বলে।

তারপর পালা এলো এরজের,

পিতা তার জন্য নির্বাচিত করলেন ইরানকে।

তাকে দিলেন সমস্ত ইরানভূমি ও বর্ণাধারীদের

বিচরণ ক্ষেত্র সকল মরণপ্রাপ্তব,

তাকে দিলেন নিজের তথ্য ও তাজ।

তার যোগ্যতার জন্যই বাদশা তার হাতে সমর্পণ করলেন

এই তাজ, তথ্য, তলোয়ার ও রাজ-অঙ্গুরীয়।

জ্ঞানী বৃদ্ধিমান ও সংকল্প-সিদ্ধ সামন্তগণ

তাঁকে সম্বোধন করলেন ইরানের প্রভু বলে।

এইভাবে তিন অভিজাত নরপতি

তিন দেশে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

## এরজের প্রতি সুলমের ঈর্ষা

সময়ের দীর্ঘ পথ-যাত্রায়  
কাল প্রকটিত করে চললো তার রহস্য।  
জ্ঞানী ফারেদুন বার্ধক্যের সীমায় এসে উপস্থিত হলেন,  
বসন্তের উপবনে হেমন্তের শুক্র বাতাসের আনাগোনা শুরু হলো।  
কাব্য-কবিতার সুন্দীনের অন্ত হলো,  
প্রাচীনত্বে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লো শক্তি।  
শিল্প ও কলার জগতে নেমে এলো অঙ্ককার,  
ফলে বিজ্ঞানদের হাদয়ে প্রবেশ করলো দুর্চিন্তা।  
সুলমের চরিত্রে প্রকটিত হলো বিকার,  
এরজের রক্তপাতের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠলো  
তার প্রতিটি রক্তবিন্দু।

সুলমের হাদয়ের ঘটলো স্থানচূড়াতি,  
তার চিন্তাধারা ও ধরন-ধারণে এলো  
বিরাট পরিবর্তন।

লালসার সমৃদ্ধে ডুব দিল সে,  
এবৎ পরামর্শ-দাতাগণকে নিয়ে বসলো উপায়-চিন্তায়।  
সে পিতার দানে সন্তুষ্ট হতে পারছে না,  
কেননা তিনি কনিষ্ঠ জনকেই দিয়েছেন তাঁর সুবর্ণ সিংহাসন।  
এই চিন্তায় অন্তর তার ঈর্ষায় পূর্ণ হলো ও ললাটে  
দেখা দিল বিরক্তির রেখা,  
অবিলম্বে এক দৃতকে চীন অভিমুখে  
পাঠাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করে

দূতের কাছে সে তার অন্তরের বিশোদগার করলো,  
এবৎ তার জন্য সজ্জিত করলো দ্রুতগামী অশু।  
অনুজ তূর — যার মধ্যে চিরকাল ছিল ন্যায়পরতা ও সংবুদ্ধির অভাব  
তারই কাছে পাঠালো সে বাণী —  
বললো, তুমি লাভ কর চিরযৌবন এবৎ চিরসুখী হও।  
ওগো চীন ও তুর্কীস্তানের অধিপতি,  
জ্ঞানী, জাগ্রত-চিন্ত ও মঙ্গল-সন্ধানী —  
জ্ঞেনে রাখ, পৃথিবীতে ক্ষতিকেই আমরা করেছি নির্বাচিত,

যদিও স্বভাবে আমরা উন্নত দেবদারুর মতোই মহীয়ান।  
জেগে উঠো, শোন এই কাহিনী,  
এমন কাহিনী কেউ শোনেনি কোন দিন।  
আমরা ছিলাম বাদশার তিন সন্তান — তিন জনই সিংহাসনের যোগ্য  
কিন্তু তার মধ্যে ছেটজনের জন্যই শুধু  
উদ্দিত হলো সৌভাগ্যের চাঁদ।  
বয়সে ও জ্ঞানে বড় হয়েও আমি বঞ্চিত হলাম কালের আনুকূল্য থেকে।  
চলে গেল আমার হাত থেকে পিতার তাজ ও তখ্ত  
এবং তোমাকেও বঞ্চিত করা হলো সেসব থেকে।  
পিতার অত্যাচারের পরাকর্ষ্ণ লক্ষ্য কর,  
তিনি আমাদের দান করেছেন দুই নিরানন্দ দেশ।  
এরজ যেখানে পেয়েছে ইরান, যমন ও বীরপ্রসূ প্রান্তর,  
সেখানে আমার লাভ হয়েছে রোম ও পশ্চিমের এই এলাকা।  
তুর্কিস্তান ও চীনের মর অঞ্চল পড়েছে তোমার ভাগে,  
এবং সামন্ত-শোভিত ইরান ভূমি থেকে আমরা হয়েছি বঞ্চিত।  
পিতার এই অসম ব্যবহারে  
আমি অস্তরের অস্তঃস্থল থেকে ক্ষণ ও অসুখী।  
সুল্মের এই বাণী বহন করে ধাবিত হলো অশু,  
এবং তুরান-পতির নিকটে এসে উপস্থিত হলো।  
দৃত সালকারে বর্ণনা করলো সুল্মের বাণী,  
তা শুনে আপদার্থ তুরের মস্তিষ্ক পূর্ণ হলো লালসায়।  
বাণীর তাৎপর্য তার মধ্যে হিসার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো,  
এবং সে লাফিয়ে উঠলো কুকু নেকড়ের মতো।  
বললো, রাজাকে তুমি আমার এই জবাব জানিয়ো  
আমার মুখে যা শুনবে, হ্বহু তাই তাঁকে বলো।  
পিতা আমাদেরকে যৌবনের সূচনায়ই  
এমনভাবে প্রতারিত করেছেন যার উপমা  
স্বহস্তে রোপিত একটি বৃক্ষ —  
কোথাও তার শাখা কোথাও তার পত্র।  
আপনাকে এখনই আমাদের এই আলোচনা  
পিতার সামনে পেশ করতে হবে।  
এই সুচিত্তিত অভিমত লিপিকায় লিপিবদ্ধ করে  
দ্রুতগামী অশু-পঞ্চে কোন সৈনিককে দিয়ে

পাঠাতে হবে বাদশার কাছে।

তাতে লিখতে হবে অব্যর্থ বাণী  
এবং জ্ঞাত করতে হবে আমাদের সকলের দৃঢ়তা।  
হে দৃত, তাঁকে উপরন্ত এই বাণীও দিবে,  
ওগো দৃষ্টিমান নরপতি,  
সম্পদের জায়গায় প্রতারণা  
সহ্য করে না কোন বীরপুরুষ।  
তেমন অবস্থায় গৌণও অনুচিত,  
তাতে ব্যর্থ হয় উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা।  
দৃত এই জবাব নিয়ে ফিরে এলো,  
সঙ্গে সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে পড়লো বহুদিনের গুপ্ত রহস্য।  
সুল্ম অবিলম্বে রোম থেকে যাত্রা করে চীনে এসে ভাতার সঙ্গে  
মিলিত হলো,  
যেন সুরার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলো হলাহলের তীব্র জুলা।  
সেখানে একে অপরের দ্বারা হলো উৎসাহিত,  
এবং তাদের মধ্যে চললো প্রকটিত ও গুপ্ত সকল কথার আলোচনা।

## ফারেদুনের কাছে সুলম ও তূরের বাণী

অতঃপর তারা এক স্মৃতিশক্তি-ধারী  
বাক্পটু ও স্পষ্টভাষী জানী লোককে দৃত রূপে নির্বাচিত করলো।  
এবং নিতান্ত অনুগত ও বিশৃঙ্খল লোকদের ছাড়া অন্যদের  
বের করে দিয়ে,

তার সঙ্গে মিলিত হলো এক পরামর্শ সভায়।  
প্রথমে কথা বললো সুলম,  
পিতার প্রতি পুত্রের দৃষ্টিতে মে-সম্ভ্রম থাকে  
সে-ই প্রথমে তা মুছে ফেললো।

দৃতকে বললো, তুমি এমনভাবে পথাতিক্রম করবে  
যে বাত্যা কিংবা ধূলিবাড় তোমাকে কিছুতেই ধরতে না পারে;  
ত্বরিত তোমাকে গিয়ে পৌছতে হবে ফারেদুনের কাছে —  
যতক্ষণ সেখানে না পৌছবে ততক্ষণ চলাই তোমার একমাত্র কাজ।

তারপর ফারেদুনের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে  
প্রথমে দুই পুত্রের সন্তানগণ তাঁকে জানাবে।  
পরে বলবে, ইহ-পরকালের মঙ্গল যার কাম্য  
তার মধ্যে থাকা চাই বিশ্ব-প্রভুর ভয়।  
যৌবনের স্বাভাবিক গতি বার্ধক্যের দিকে,  
শুক্ল কেশ কখনো প্রত্যাবর্তন করে না কৃষ্ণ বর্ণে।  
বয়সের সংকীর্ণতায় আপনার অবস্থান বিলম্বিত,  
এই বিলম্বিত দিন আপনার জন্য হয়েছে কারাগার সদৃশ।  
আপনাকে বিশ্ব-প্রভু দান করেছিলেন এই দুনিয়া —  
উজ্জ্বলিত সুর্যের দেশ থেকে অঙ্ককারের গহনতা পর্যন্ত।  
আপনি বাসনার মোহে ও আরাম আয়েশের মধ্যে নিমগ্ন থেকে  
বিশ্ব-প্রভুর আদেশ উপেক্ষা করেছেন।  
কুচিলতা ও অপচয়ের পথেই আপনি বিচরণ করেছেন,  
সরল পথে করুণার সন্ধান আপনি কোন দিন করেননি।  
আপনার তিন পুত্র ছিল — সবাই ধীর ও বুদ্ধিমান,  
সবাই মহস্তে মহীয়ান ও চেতনায় জানী।  
কিন্তু আপনি শুধু একজনের মধ্যেই যোগ্যতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন,  
অন্যদের মন্তক ঠেলে দিয়েছিলেন মীচের দিকে।

একজনকে নিষ্কেপ করেছিলেন আজদাহার করাল গ্রাসের মুখে,  
অন্যের শির উন্নত করেছিলেন মেঘমালারও উর্ধ্বে।  
আপনারই শিয়রের কাছে একজনকে শোভিত করেছেন তাজ দ্বারা,  
এবং রেখে দিয়েছেন তাকে চোখের মণি করে।  
আমরা পিতা-মাতা কোন দিক থেকেই তার চেয়ে খাটো ছিলাম না,  
কিন্তু আপনার তখ্ত ও তাজ থেকে আমরা দুয়েই হয়েছি বঞ্চিত।  
হে বদান্য বাদশা,

এই বদান্যতাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।  
সেই তাজ যদি তার শির থেকে নামিয়ে না আনুন  
ও দুনিয়াকে তার থেকে রেহাই না দেন —

এবং তার বদলে তাকে দুনিয়ার সেই অংশ দান না করুন  
যেখানে অঙ্গাত ও অবহেলিত অবস্থায় আমরা বসে আছি  
তবে অচিরেই তুর্কীস্তানের ও চীনের অশ্বারোহিগণ  
রোমের অঞ্চল থেকে দৈশীন্বিত অন্তরে বেঁকবে।  
এবং সেই সৈন্যদল নিয়ে আমি অভিযান করে  
ইরান ও এরজকে সমূলে বিধ্বস্ত করে দিব।  
জ্ঞানবান দৃত এই পৌরুষ বাক্য শোনামাত্র  
মাটি চুম্বন করলো ও অবিলম্বে তার সামনে থেকে প্রস্থানোদ্যত হলো।  
এইভাবে সেই স্থান সে ত্যাগ করে গেল  
যেমন বাতাসের ঝাপটায় দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে দাবানল।  
দৃত ফারেদুনের রাজধানীতে পৌছে  
দূর থেকেই দেখতে পেল এক উন্নত রাজপ্রাসাদ।  
সেই প্রাসাদের শীর্ষ মেঘমালার উর্ধ্বে স্থাপিত,  
তার বিস্তৃতি জুড়ে আছে এক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে অন্য পাহাড়ের  
পাদদেশ পর্যন্ত।

সেই প্রাসাদে উপবিষ্ট রয়েছেন মহৎ সভাসদগণ,  
এবং অন্তরালে উপবিষ্ট রয়েছেন স্বাধীনা নারী-সমাজ।  
প্রাসাদের একপাশে শৃঙ্খলিত ব্যাঘ ও সিংহ,  
অন্য পাশে মদমত করীদল।  
যখন বীরবৃন্দ সেখানে সমবেত হয়  
তখন সেখান থেকে বহিগত হয় সিংহের গুরুগর্জন।  
প্রাসাদে সর্বদা প্রহরারত রয়েছে  
একদল সুদর্শন নারী-সৈনিক।

তারা সর্বকাজে সদাজগ্নত, তারাই বাদশাকে গিয়ে জানালো,  
কোন এক সুজন দৃত উপটোকনসহ  
রাজদ্বারে দর্শনপ্রাপ্তি ।

বাদশার অনুমোদন নিয়ে প্রহরীগণ যবনিকা উত্তোলন করে  
দৃতকে তাঁর সমীপে নিয়ে এলো ।

ফারেদূনের দর্শন লাভে দৃতের আশা পূর্ণ হলো,

ও তার হৃদয় মন ভরে উঠলো তৃপ্তির আনন্দে ।

বাদশা বসেছেন, যেন উন্নত দেবদাকুর

মাথায় সূর্যের উদয় হয়েছে,

অথবা রক্ত গোলাপের চারপাশে বিস্তৃত রয়েছে  
কর্পূর সদশ শুভ ফুলের সমারোহ ।

তাঁর অধরোঞ্চে স্ফুরিত হচ্ছে ঈষৎ হাসির রেখা —

গঙ্গদেশে ফুটে বেরুচ্ছে সৌজন্য সূচক লজ্জায় রক্তিমাভা,

আর সেই সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে

কেয়ানী বংশ—সুলভ মৃদুমল্ল বচন-ধ্বনি ।

এই দৃশ্য দেখামাত্র দৃত সাষ্টাংগে প্রণত হলো,

ও মৃত্যুকার উপরে অক্ষিত করলো অসংখ্য চুম্বনের রেখা ।

ফারেদূন তখন তাকে তার উপযুক্ত এক উন্নত আসনের

উপর বসবার আদেশ করলেন ।

প্রথমেই তিনি তাঁর স্নেহাস্পদ দুই পুত্রের

কুশল ও স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন ।

তারপর মরু-প্রান্তরময় দূর পথের দুর্গম যাত্রায়

দৃতের ক্লান্তি ও বিপদ-আপদের কথা জানতে চাইলেন ।

দৃত বললো, মহান বাদশা,

সর্বত্র আপনারই শাসনের সুমঙ্গল চিহ্নগুলো ছড়ান রয়েছে ।

প্রতিটি মানুষ কীর্তন করেছে আপনার যুগের সফলতা,

এবং সকলে জীবন পাচ্ছে আপনার নামের থেকে ।

হে বাদশা, আমি আপনারই এক অযোগ্য দাস,

পাপী ও জ্ঞানহীন ।

আপনার সমীপে এক পরুষবাণী নিয়ে আমার আগমন,

আমি দৃতমাত্র — বাণীবাহক,

আমার অপরাধ আপনি মার্জনা করুন ।

আমি তাই বলবো, যা বলবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি  
এবং বাণী বহন করে এনেছি দুই অবিবেচক মুবকের কাছ থেকে।  
এই বলে সে আবৃত্তি করে চললো  
আদ্যন্ত শাহিদাগণের সেই পরুষবাণী।

## পুত্রদের প্রতি ফারেদুনের প্রত্যুক্তি

ফারেদুন দৃতের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন  
ও আবেগে মর্দিত করলেন নিজের অস্তর।  
দৃতকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, হে বিচক্ষণ,  
নিজের কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন তোমার নেই।  
এতো আমারই নিজের দুই চোখ — আমারই অস্তর।  
তুমি সেই অপবিত্র অকর্মণ্যদের গিয়ে বলো —  
বলো সেই শয়তানদৃয়কে,— যারা স্বীয় মন্ত্রিকে  
করেছে মালিন্যযুক্ত —  
তোমাদের মতো যুবকের মুখেই এমন বাণী শোভা পায়  
যারা মণিমুক্তা ও বাইরের উজ্জ্বলতাকেই জ্ঞান করেছে  
চরম ও পরম বলে।  
আমার উপদেশ যদি ভুলেই গিয়ে থাক,  
তবে স্বীয় বুদ্ধিরই দ্বার স্থ হওয়া তোমাদের উচিত ছিল।  
তোমরা নির্লজ্জ ; বিশ্ব-প্রভূর ভয়ও তোমাদের অস্তরে নেই ;  
জ্ঞান ও বিবেচনা দুই খেকেই তোমরা হয়েছ বঞ্চিত।  
তরুণ বয়সে আমারও কেশরাঙ্গি কৃষ্ণবর্ণ ছিল,  
দেহ ছিল দেবদারুর মতো সোজা ও উন্নত, মুখমণ্ডল  
পূর্ণ চাঁদের মতো !

মনে রেখো, যে-কাল আজ আমার দেহকে করেছে ন্যুন্ত,  
সে এখনও চক্রবৎ ঘূর্ণিত হচ্ছে।  
সেই কাল উপহাসছলে হাসিছে আজ তোমাদের দিকে চেয়ে,  
মনে রেখো, তোমাদের হাসিও একদিন আপনিই মিলিয়ে যাবে,  
সেই বিশ্ব-প্রভূর নামই চির সমন্বন্ত থাকবে,  
যিনি জ্যোতিশান সূর্য ও অঙ্ককার পৃথিবী দুয়েরই আলোর উৎস !  
এই তাজ ও তখ্ত, চন্দ্ৰ ও শুকতারার শপথ —  
আমি অন্যায় করিনি তোমাদের উপর।  
আমি জ্ঞানীদের এক সভা আহ্বান করেছিলাম,  
তাতে জমায়েত করেছিলাম সকল জ্যোতির্বিদ ও জ্ঞান বৃদ্ধদের।

---

কুরানের ভাষায় আল্লাকরণ লক্ষণীয়। এই ভাষা ফারেদুনের নির্বিকার মনোভাবের দ্যোতক  
পরে ফারেদুন পুত্রদের সঙ্গে যে কঠোর ব্যবহার করবেন, এই ভাষায় মেন তাই ভূমিকা হয়ে  
রইলো।

বহুদিন অতীত হয়েছে সেদিন থেকে —

যেদিন আমি দান করেছিলাম তোমাদেরকে এই ধরিণী।

আমার সেদিনের ইচ্ছায় সত্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না,

ছিল না কুটিলতা, অসৎ উদ্দেশ্য কিংবা আর কিছু।

ছিল শুধু বিশ্ব-প্রভুর ভয়,

এবং পৃথিবীতে ন্যায়ের পথ অনুসরণের ঐকাণ্টিক কামনা।

যে-ধরণীকে আমি সুশোভিত করেছিলাম ফুলে শস্যে —

তার সৌন্দর্য কি আর্মি নিজ হাতে বিনষ্ট করতে পারি?

তাই আমারই রাচিত তথ্ত আমি বিতরণ করেছিলাম

আমার পুণ্যবান তিন ছেলের মধ্যে।

সেই তোমরাই আজ আমার সিদ্ধান্ত বাতিল করে

মুখ ফিরিয়েছ শয়তানের প্রয়োচনার দিকে।

মনে রেখো এইবার স্বয়ং বিশ্ব-প্রভু নির্বাচিত করবেন

তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে।

যদি মনোযোগ দিয়ে শোন, তবে এক কাহিনী তোমাদেরকে বলবো,

যে যেমন করে তার পরিণামও ঠিক তেমনিই হয়।

একবার আমাকে এক জ্যোতিষ বলেছিল,

আমার সিংহাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

যদি তোমরা লালসাকে পদদলিত করতে না পার

তবে দৈত্যদল তোমাদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে।

আমার হাদয় আজ এই আশঙ্কায় কম্পিত হচ্ছে,

পরিণামে হয়তো এই আজদাহারই প্রাসে তোমরা পতিত হবে।

দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার কাল আমার সমাগত,

তার জন্য ভয় কিংবা ভাবনা আমার নেই।

কিন্তু সেই জ্যোতিষীর কথামতো

আমার মুক্ত-প্রাণ পুত্রদের মধ্যে যখন

দেখা দিবে লালসা,

তখন তাদের সম্পদ ও সিংহাসন সমস্তই ধূলায় মিশে যাবে।

মনে রেখো, যে ধৰ্ম করে তার নিজের ভাইকে,

একদিন সেই এক ভঙ্গার শীতল পানির জন্য মাথাকুটে মরবে।

দুনিয়াকে তোমরা আজ যেমন করে দেখছ, তেমনভাবে দেখেছে অনেকেষ্ট,

কিন্তু দুনিয়া কারো বশীভূত হয়নি কোনদিন।

তাই, এখনও সময় আছে, বিচারের দিনে

ରେହାଇ ପାଓୟାର ସମ୍ବଲ ବିଶ୍ଵ-ପ୍ରଭୂର ସମୀପ ଥେକେ  
ଏଥନେ ହାତ ପେତେ ନାଓ ।

ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ମୁକ୍ତିର ସେଇ ପାଥେୟ,  
ସତ୍ତ୍ଵବାନ ହୋ, ଯାତେ ଦୁଃଖକେ ଲାଘବ କରତେ ପାର ।  
କୁନ୍ଦ ନିଃଶ୍ଵାସେ ଦୂତ ବାଦଶାର ଏଇ କଥାଗୁଲୋ ଶୁଣଲୋ,  
ଓ ମୃତିକା ଚୁମ୍ବନ କରେ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କରଲୋ ।  
ଏବଂ ଏମନ ଦ୍ରତ୍ତଗତିତେ ସେ ପଥାତିକ୍ରମ କରେ ଚଲଲୋ  
ଯେନ ସାଧୁ ତାର ଯାତ୍ରାସଙ୍ଗୀ ହେଁଯେ ।  
ଶୁଲମେର ଦୂତ ଚଲେ ଗେଲେ  
ଶାହିନଶାହ ବ୍ୟକ୍ତ କରଲେନ ତାର ଆଗମନେର ଗୃହ ତାଂପର୍ୟ ।  
ପୁଏକେ ଡେକେ କାଛେ ସମୟେ ସବ କଥା ତାକେ ବଲଲେନ ।  
ବଲଲେନ, ଆମାର ଦୁଇ ଯୁଦ୍ଧକାମୀ ପୁତ୍ର  
ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଥିକେ ମୁଖ କରେଛେ ଆମାଦେର ଦିକେ ।  
ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଦେରକେ ଏମନଭାବେ ଅନ୍ଧ କରେଛେ ଯେ,  
ତାରା ତାଦେର ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକେ ଆର ଅସ୍ତ୍ର ବଲେ ଚିନତେଓ ପାରଛେ ନା ।  
ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ଥିକେ ତାରା ଅଗ୍ନି-ଗୋଲକେର ମତୋ ଉତ୍ଥିତ ହେଁଯେ ।  
ଏବଂ ତାଇ ପ୍ରକାଶ କରେଛେ ତାରା ତାଦେର ବାଣୀତେ ।  
ଏମନ ଭାଇ ଭାଇ-ନାମେର ଅଯୋଗ୍ୟ,  
ଏବଂ ତୋମାର ମାନ୍ୟବରେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପେତେ ପାରେ ନା ।  
କାରଣ, ତୋମାର ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ମଲିନ ହଲେ  
ଏରା କଥନୋ ତୋମାର ଶିଯାରେର କାଛେ ଉପଶିତ ହବେ ନା ।  
ତୁମି ତାଦେର ସାମନେ ପ୍ରେମେର ତଳୋଯାର ନିଯେ ଉପଶିତ ହଲେଓ  
ତାରା ତାଦେର ମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷକକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରବେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ପରିକଳ୍ପନାଯ ।  
ଦୁଇ ଦୂର ଦେଶ ଥିକେ ଆମାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର  
ଏହି ଗୃହ ଇନ୍ଦ୍ରିତିହି ଯେନ ଆମାର କାଛେ ବାଣୀରାପେ ପାଠିଯେଛେ !  
ତାଇ, ଯଦି ଭୋର ବେଳାଯ ତୁମି ହାତେ ଲାଗୁ ସୁରା ପାତ୍ର  
ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାନ ନା କରେ ହାତେଇ ଧରେ ରାଖ —  
ତବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲବାର କିଂବା ସୁଖ ପାବାର ଜନ୍ୟେ  
ତେମନ ବସ୍ତ୍ରର ଝୋଜ କରୋ ନା ।  
ଏହି କଥା ଶୁଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏରଜ  
ସମ୍ମାନିତ ପିତାର ଦିକେ ଚାଇଲେନ,  
ଏବଂ ବଲଲେନ, ଓଗୋ ଦୁନିଆପତି,  
କାଲେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଦିକେ ଚେଯେ ଦେଖୁନ !

যদি অনুকূল হাওয়া আমাদের উপর দিয়ে বয়ে যায়,  
তবে বুদ্ধিমানের তাতে মনো-দৃঢ়ের কি কারণ থাকবে ?  
বরং গোলাপের রঙিন মুখ মলিন হলেই তো  
শুন্ধিত মানুষের দৃষ্টিতে অঙ্ককারের ছায়াপাত হয়।  
সূচনায় সম্পদ ও পরিণামে দুঃখ —  
দুনিয়ার এই পর্ণ কুটির থেকে বেদনা নিয়েই তো ফিরে যেতে হয়।  
মাটিতে শয়ন ও পাথরে সিথান দিয়ে  
যে বক্ষ-শিশু আজ শোলো —  
কাল তারই মাথার উপরে ঘূর্ণিত হবে মহাকাশ —  
শিকড় দ্বারা যে শোগিত-রস সে পান করবে, তাই একদিন  
রক্তের ফল হয়ে ফলবে।

তাজ, তলোয়ার ও অঙ্গুরীয়ের অধিকারী নরপতি,  
আপনি আমাদের দেখছেন ও দেখেছেন এই দুনিয়া।  
কোথায় গেলেন অতীত কালের সেই সব নরপতি  
ঘাঁরা নিজেদের অস্তরে উপ্ত করেছিলেন ঈর্ষার বীজ ?  
মহান বাদশার হাত থেকে যে—রাজ্য আমি দানরাপে লাভ করেছি,  
তাকে অমঙ্গলের মধ্যে নিক্ষেপ করা কি আমার জন্য শোভন হবে ?  
চাই না আমার তাজ, তথ্ত ও রাজ্য,  
সৈন্যসমস্ত না নিয়ে একাকীই আমি ভাইদের কাছে যাবো।  
তাঁদেরকে গিয়ে বলবো, আপনারা আমার নমস্য, আপনারা গুরুজন,  
আপনারা আমার উপর রাগ করবেন না, ঈর্ষান্বিতও হবেন না,  
ধর্মানুগামী মানুষের জন্য ঈর্ষা শোভন নয়।  
এই দুনিয়া থেকে এত কি আশা আপনারা করেন,  
ভেবে দেখুন জামশেদের কথা, কি সে দিয়েছিল তাকে ?  
পরিণামে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল সে দুনিয়া থেকে  
দুনিয়া কেড়ে নিয়েছিল তার তাজ ও তথ্ত।  
আপনাদের সঙ্গে সেই ভয়ঙ্কর পরিণামের স্বাদ  
আমারও গ্রহণ করা উচিত হবে না।  
চলুন, আমরা একে অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি,  
এবং শক্তির মুখে রচনা করি এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর।  
এইভাবে আমি তাঁদের শক্তির সম্মুখীন হব,  
এবং তাঁদের হৃদয় থেকে ঈর্ষা কন্টক কর্তিত করতে যত্নবান হবো।

পুত্রের এই কথা শনে ফারেদূন সুখী হলেন,  
 তাঁর স্নেহার্ত মুখে তিনি দেখলেন আশার আলো।  
 তবু তাকে বললেন, হে আমার ধীমান পুত্র,  
 ভায়েরা যেখানে যুদ্ধসাজে সজ্জিত, তুমি সেখানে শান্ত।  
 আমার কথা মনে রেখো,  
 চাঁদ থেকে আলো ছাড়া আর কি আশা করা যায় !  
 তোমার মুখ থেকেও তেমনি এমন বাণীই সন্তুষ্ট  
 আমি বুঝলাম, প্রেমের সম্পর্কেই তুমি ভাইদের সঙ্গে  
 সম্পর্কিত হতে চাও !

কিন্তু আজদাহার মুখের সামনে যদি  
 তুমি পেতে দাও তোমার মাথা,  
 তবে সে তোমার উপর বিষেদগার ছাড়া আর কি করবে ?  
 তেমন করাই তো তার প্রকৃতি।  
 হে বৎস, তবু ভাইদের সঙ্গে যদি আপোষই তোমার কাম্য হয়ে থাকে  
 তবে আর বিলম্ব করো না।  
 সৈন্যদের মধ্যে থেকে কতিপয় বিশৃঙ্খলা ও অনুগত জনকে ডেকে বলো,  
 তারা প্রস্তুত হয়ে এসে তোমার যাত্রাসঙ্গী হোক।  
 হৃদয়-বেদনায় সিঙ্গু করে এক লিপিবন্ধ  
 অমিতাদের কাছে লিখছি, এবং তোমাকে পাঠাবার আয়োজন করছি।  
 অচিরেই তুমি ফিরে আসবে সুস্থ দেহে,  
 তোমার দর্শনে আমার হৃদয় আবার আলোয় ভরে উঠবে।

## ভাইদের কাছে এরজের যাত্রা

পশ্চিমের নরপতি ও চীনের নায়কের কাছে  
বাদশা এক লিপি লিখলেন।  
প্রথমেই লিখলেন বিশ্ব-প্রভুর গুণগান,  
সর্বত্র যিনি বিদ্যমান, সর্বকালে যিনি অনুসৃত।  
তারপর লিখলেন, আমার এই উপদেশমূলক লিপি  
উদীয়মান দুই সূর্যের প্রতি —  
দুই পাষাণ-হাদয় যুদ্ধকামী নর-নায়কের প্রতি —  
একজন পশ্চিমাঞ্চলের প্রভু, অন্যজন চীনের অধিপতি।  
এই লিপি তেমন এক অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে যাচ্ছে  
যে দেখেছে দুনিয়ার বহু পরিবর্তন ও জেনেছে তার অস্তর বাহির,  
যার জন্য শোভন হয়েছে খরশান কৃপাণ ও ভারী প্রহরণ,  
সম্ভ্রান্ত সামন্তদল যাকে সর্বদা ধিরে আছে।  
যে দিনের আলোর মধ্যেও রাত্রির অঙ্ককারকে দেখতে পায়,  
যে ভয় থেকে আশাকে ও অভাব থেকে সম্পদকে  
বের করে আনতে পারে।

সমস্ত দুরুহ কাজ তার জন্য হয়েছে সহজসাধ্য,  
এবং ফলে তার লাভ হয়েছে অস্তরের আলো।  
মনে রেখো আমারই জন্য আমি রাজমুকুট কামনা করিনি,  
পূর্ণ করিনি রাজকোষ ও রচনা করিনি সিংহাসন ও সৈন্যদল।  
আমার তিন পুত্রেরই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আমি কামনা কৈরেছি,  
এবং তারই জন্য নিজের উপর টেনে এনেছি দীর্ঘদিনের পরুষ বিরাগ।  
যে-ভায়ের জন্য তোমাদের অস্তরে জুলছে ঈর্ষার আগুন,  
সে হয়তো কারো জন্যে সুচীতল বসন্ত বায়ু।  
সেই ভাই তোমাদের মনোদৃঢ়খের কথা শুনে এসেছে,  
এবং তোমাদের দর্শনের জন্য হয়েছে অস্থির।  
তার রাজ-মর্যাদা ও শক্তি কখনো তোমাদের দৃঢ়খের কারণ হবে না,  
ঐ দেখ তার উদ্যত ফণা কি করে সে নামিয়ে দিয়েছে।  
সিংহাসন ছেড়ে সে সোপানের উপর এসে বসেছে,  
এবং সেইভাবে সে প্রকাশ করছে তোমাদের প্রতি তার আনুগত্য।  
সে বয়সে তোমাদের ছেট,  
তোমাদের স্নেহের প্রত্যাশী সে।

তোমরা তার মাননীয় ও সর্বদা মান্যবর,  
আমি যেমন তাকে করি, তোমরাও তাকে তেমনি করবে।  
তোমাদের সহবাসে কয়েকটি দিন যাপন করার জন্য  
আমি তাকে পাঠাচ্ছি।

দৃত বাদশাদের যত্ন লাভ করে সর্বত্র,  
ওগো, মনে রেখো, এরজ আমার দৃতরাপে নির্গত হচ্ছে প্রাসাদ থেকে।  
তার সঙ্গে যাচ্ছে কতিপয় বৃক্ষ ও যুবক,  
যাতে পথাতিক্রম তার জন্য বিরস না হয়।

এরজ ভাইদের সমীপে পৌছে অশু-বল্কা টেনে ধরলো,  
তাদের মনের অঙ্ককার সম্পর্কে সে কিছুই আঁচ করতে পারল না।  
কারণ, প্রথানুযায়ী তাকে জানানো হলো সাদর সন্তানণ,  
এবং সৈনিকরা তাকে আগু বাড়িয়ে নিয়ে এলো।  
ভায়েরা পরম্পরের মুখ দেখে  
আনন্দে ফুল্ল হলো।

দুই অমঙ্গলকামী ও এক শুভাকাঙ্ক্ষী  
পরম্পর বিনিময় করলো শুভ সন্তানণ —  
তৎপর দুইজন ঈর্ষাণ্বিত ও একজন সরলান্তঃকরণ —  
এই তিন জন বাহুতে বালু সংলগ্ন করে প্রবেশ করলো রাজপ্রাসাদে।  
সৈর্যরা এরজের দিকে চেয়ে ভাবলো,  
সত্যিই এমন লোক তাজ ও তখতের যোগ্য।

তার দর্শনে তাদের অস্পষ্টিকর চিত্তে ফিরে এলো এক স্বাচ্ছন্দ্য,  
এবং হৃদয় পূর্ণ হলো এক অপার্থিব করণায়।  
দলে দলে সৈনিকরা হোথায় হোথায় দাঁড়িয়ে  
এরজের কথা অস্ফুট কর্তৃতে বলাবলি করতে লাগলো।  
বললো, ইনি সর্বতোভাবে সম্মাট পদের যোগ্য ;  
ইনি ছাড়া আর কারো শিরে শাহী মুকুট শোভা পায় না।  
সুল্ম অপাসে দৃষ্টিপাত করে সৈনিকদের এই কীর্তিকলাপ দেখতে পেলো,  
এবং তাতে ভারী হয়ে উঠলো তার মন্ত্রিক।  
সে সজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো —  
হৃদয়ে তার শোণিত ঝরছে, ললাট কুক্ষিত হয়েছে দুর্ভাবনায়।  
তারপর সে ও তূর আসর ছেড়ে  
অস্তপুরে এসে বসলো।

রাজধানীর সকল দ্বার-বাতায়নে  
আলোচনা চলছে রাজা, রাজ্য ও রাজমুকুটের উপর।  
সুল্ম তূরুক বললো,  
দেখ, সৈন্যরা আজ কেমন দলে দলে বিভক্ত হয়েছে।  
তারা কি বিচুত হয়ে পড়েছে তাদের স্ব স্ব পথ থেকে?  
তুমি কি তাদের দিকে লক্ষ্য করে দেখনি?  
কত লোক পথ দিয়ে যাচ্ছে,  
কিন্তু একটি দৃষ্টিও এরজের মুখের উপর থেকে সরে যাচ্ছে না  
আমি কতই না ফন্দি এঁটেছিলাম,  
কেউ যেন তার মুখের দিকে না চায়।  
এরা যদি তার জনপ্রিয়তা ও মাহাত্ম্য এইভাবে অবলোকন করে,  
তবে অচিরেই এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে তাদের মধ্যে।  
দুই রাজার সৈন্যদলই তার আনুগত্যের জন্য  
সরে দাঁড়াবে তাদের প্রভুদের পাশ থেকে।  
এরজের আগমনের ফলে আমার হৃদয় অঙ্ককারে ছেয়ে গেছে,  
আশঙ্কার পর আশঙ্কাই বেড়ে চলছে আমার অস্তরে।  
দুই রাজ্যের সৈন্যদলের দিকেই আমি লক্ষ্য করে দেখেছি,  
তারা যেন তাকে ছাড়া আর কাউকে বাদশা বলে গণ্যই করছে না।  
যদি তার মূলোচ্ছদ এখুনি না করা হয়  
এবৎ এই উচ্চাসন থেকে তাকে মাটিতে নামিয়ে আনা না যায়,  
তবে সৈন্যদল আমাদেরই বিরুদ্ধে উথিত হবে,  
এবৎ রাতারাতিই আয়োজন করে ফেলবে এক অভ্যুত্থানের।

## ভাইদের হাতে এরজের নিধন

সুর্যের মুখের উপর থেকে যবনিকা উঠে গেল  
পূর্ব দিকে উদিত হলো এক স্বপ্নময় আলো।  
দুই অপদার্থই সে মুহূর্তে কর্মচাল হয়ে উঠলো,  
এবং চোখ থেকে ধুয়ে মুছে নিলো সমস্ত লজ্জা।  
সাপের মতো ফণা উদ্যত করে তারা নির্গত হলো,  
এবং এরজ যে শিবিরে রাত্রি যাপন করেছে তার দিকে  
মুখ করলো।

এরজ তখন ঘুম থেকে উঠে পথের দিকে চেয়েছিল,  
ভাইদের আসতে দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে সে দৌড়ে গেল তাদের কাছে।  
তারপর একথা-ওকথা বলতে বলতে  
তাদেরকে নিয়ে ফিরে এলো শিবির-মধ্যে।  
এই সময় তুর তাকে বললো, তুমি যদি নিজেকে

আমাদের কনিষ্ঠ বলে মনে করো

তবে কেন এই রাজমুকুট মাথার উপর তুলে নিয়েছ?  
তোমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ইরান ও কেয়ানী সিংহাসন,  
আর আমাকে বৈধে দেওয়া হয়েছে তুর্কিস্তানের সিংহদ্বারের সঙ্গে।  
আমাদের জ্যৈষ্ঠ ভাতাকে পরানো হয়েছে পশ্চিমের হাতকড়ি,  
আর স্থাপন করা হয়েছে তোমার শিরে মাহাত্ম্য এবং পদতলে বিছিয়ে  
দেওয়া হয়েছে স্বর্ণ-সম্পদ।

বাদশা এমনই বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন যে,  
তাঁর সমস্ত দান নিঃশেষিত হয়েছে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রের উপরে।  
তুরের মুখে এই কথা শুনে

এরজ সুন্দর এক প্রত্যুত্তর উপস্থাপিত করলো ;  
বললো, ওগো যশস্বানী মহাত্মান,  
আপনি যদি সন্তুষ্ট হন ও আপনার হৃদয় যদি শাস্তি বোধ করে,  
তবে চাই না আমি কেয়ানী তাজ কিংবা রাজ্য,  
চাই না যশ এবং ইরানীয় সৈন্যবাহিনী।  
ইরানে আমার প্রয়োজন নেই, চীন কিংবা পশ্চিমাঞ্চলও  
নয় আমার কাম্য,—

বাদশাহী কিংবা প্রান্তর-শোভিত ধরণীতেও  
আমার কোন আগ্রহ নেই।

যে-গৌরবের পরিণতিতে আছে অঙ্ককার,  
তেমন গৌরব থেকে পলায়নই আমার কাম্য।  
এই উন্নত আকাশ মাথার উপরে রাজচ্ছত্র ধরলেও  
পরিণামে দেখা দিবে মৃত্তিকায় শয়ন।  
আমার ইরানীয় সিংহসনও একদিন লয়প্রাপ্ত হবে,  
তাই এখনই আমি তাকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত আছি।  
আমার মুকুট ও অঙ্গুরীয় আমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করছি,  
আমার প্রতি আপনারা আর শক্রভাব পোষণ করবেন না।  
আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সংগ্রাম কিংবা কলহ নেই,  
আমার প্রতি কোন ঈর্ষ্যা আপনারা রাখবেন না  
আপনাদের মনে দৃঢ় দিয়ে দীর্ঘজীবন আমি কামনা করি না,  
যদি আমার দূরত্ব আপনারা কামনা করেন তবে তাও আমি  
করতে সম্মত আছি।

বিনয় ছাড়া আমার আর কোন রীতি নেই,  
মনুষত্ব ছাড়া নেই আমার আর কোন ধর্ম।  
তুর আদ্যন্ত সবকথা শুনলো,  
কিন্তু কোন কথারই কোন জবাব সে দিলো না !  
এরজের একটি কথাও মনঃপূত হলো না তার,  
কোন রকম সঙ্গি কিংবা মিটামাটের চিন্তাই সে করতে পারল না।  
শুধু ক্রোধান্তি মনোভাব নিয়ে সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো,  
ও অত্যন্ত অশান্তভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো।  
তারপর সহস্র ঘূরে দাঁড়িয়ে  
অতর্কিতে চেপে ধরলো গুরুভার স্বর্ণ-আসন  
ও তা দিয়ে আঘাত করলো এরজের মন্তকে,  
এরজ তখন তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বললো —  
আপনার প্রাণে কি খোদাই ভয় নেই,  
কোন লজ্জায় আপনি পিতার কাছে মুখ দেখাবেন, নিজের  
বিবেককেই কি বলবে

ଆମାକେ ହତ୍ୟା ନା କରେ ଆମାର ପ୍ରାଣର ବିନିମୟେ  
କାଳେର କରୁଣା ଲାଭ କରେ ସୁଖେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଣ ।  
ନିଜେକେ ଭାତୃହତ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୂତ କରବେନ ନା  
ଏର ଫଲେ ଆମାର ସିଂହାସନ ଆପନାର ଲଭ୍ୟ ହବେ ନା !  
ତାର ଚେଯେ ଆନନ୍ଦ ଓ ସାହୁର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥାଦ ଉପଭୋଗ କରୁଣ

জীবনধারী হয়ে জীবনের সন্তুষ্টি বিধানে তৎপর হউন।  
যে জ্ঞানী সে একটি পিপিলিকাকেও কষ্ট দেয় না,  
আপনি জীবনের অধিকারী জীবনেরই প্রশংসা উচ্চারণ করুন।  
আমি আজ থেকে দুনিয়ার নির্জন কোন স্থান খুঁজে নিব,  
এবং চেষ্টা করবো যাতে দূর হয় আপনাদের মনোকষ্ট।  
ভায়ের রক্তে হস্ত প্রক্ষালনের জন্য কেন উদ্যত হয়েছেন !  
কেন বৃক্ষ পিতার অস্তরে প্রজ্জ্বলিত করতে চাইছেন

শোকের আণন ?

যদি দুনিয়া-ই আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তবে তাই গ্রহণ করুন,  
শোণিতপাত থেকে বিরত হোন,  
সর্বজয়ী বিশ্ব-প্রভুর সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন না।  
এরজের এত কথার কোন উত্তর সে দিল না,  
শুধু অস্তর পরিপূর্ণ করলো ক্রোধে ও মস্তিষ্ক গর্বোদ্ধৃত

বাসনা-রাজিতে।

তারপর পদাচ্ছাদনী থেকে উন্মুক্ত করলো এক উজ্জ্বল খঙ্গের  
এবং স্থীয় উত্তরায় শোণিতে অনুরঞ্জিত করলো।  
সেই বিষাক্ত খরশান অম্বে  
মুহূর্তমধ্যে সে বিদীর্ণ করে দিলো কেয়ানী বক্ষ।  
এইভাবে উন্নত দেবদারু সদৃশ রাজ-ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে  
সে তার বুকের উপর থেকে নেমে দাঁড়ালো।  
এরজের বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে  
ভিজিয়ে দিতে লাগলো তার ঘৌবন-ফুল সুন্দর মুখমণ্ডল।  
. তারপর সেই নৃশংস হস্তা রাজার দেহ থেকে  
মস্তক বিছিন্ন করে তার কাজ শেষ করলো।

হায় রে দুনিয়া, যাকে তুমি বুকে করে লালন করেছিলে,  
আজ তার প্রাণচুকু রক্ষা করতেও অপারাগ হলে,  
জানি না কে তোমার বৃক্ষ ? — এই রহস্য  
কোন দিন তুমি উন্মেচিত করলে না !

এ দিকে এরচের মতক কস্তুরী ও অন্যান্য সুগক্ষি দ্রব্যে  
সিঁক করে রাজ নানকারী  
বৃক্ষ বাদশার সমীপে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।  
তাঁকে বলে পাঠান হলো, এই আপনার প্রিয়জনের শির,

ইচ্ছা হয় আবার তাতে পরিয়ে দিন মাহাত্ম্যের রাজমুকুট।  
এই সেই ছায়াদানকারী কেয়ানী বৃক্ষ,  
অভিলাষ হয় আবার তাকে দান করুন তাজ এবং তখ্ত !  
তারপর দুই পাষাণ—হাদয় মূর্তিমান অকল্যাণ —  
একজন চীনের ও অন্যজন রোমের পথ ধরলো।

## ফারেদুন কর্তৃক এরজের হত্যার সংবাদ শ্রবণ

ফারেদুন তাঁর দুচোখ পেতে রেখেছেন পথের উপর,  
সৈন্যদল বাদশার<sup>১</sup> প্রত্যাগমনের প্রহর গুনছে।  
সময় যাচ্ছে, এখনও বাদশা ফিরে আসছেন না,  
পিতার মনে কত কি ভাবনা !

তিনি বাদশার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন তাঁর বিজয়ী সিংহসন,  
মুকুটে গেঁথে রেখেছেন মণিমুক্তা।  
প্রতুদ্গমনের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখা হয়েছে,  
সুরা ও পানীয় প্রস্তুত, গায়কদল, সমাগত।  
বাদ্যকরণ দুন্দুভিসকল হস্তীপৃষ্ঠে বাঁধছে,  
ও সমস্ত নারী সজ্জিত হয়েছে উৎসব-সাজে।  
এমন সময় ফারেদুন ও সৈন্যদল দেখতে পেলো  
পথে এক কৃষ্ণবর্ণ ধূলিমেঘের উদয় হয়েছে।  
তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক উটের কাফেলা  
তার আরোহিগণ সবাই বিষ্ণু ও শোকাচ্ছাদিত।  
তারপর সেই শোকাকুল যাত্রীদের মধ্যে উথিত হলো ক্রন্দন-ধ্বনি,  
এবং তাদের মধ্যে দেখা দিল এক সুবর্ণ-মণিত শবাধার।  
মূল্যবান কৌশিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত সেই শবাধারের মধ্যেই  
রক্ষিত আছে এরজের শির।  
বিলাপ ও আহাজারির সঙ্গে পুণ্যাত্মা বাহক  
ফারেদুনের সমীপবর্তী হলো।  
শবাধারের ডালা উত্তোলন করার পর  
সকলে বুঝতে পারলো বাহকের বিলাপের কারণ।  
তারপর কৌশিক আচ্ছাদনী সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
প্রকাশ হয়ে পড়লো এরজের কর্তৃত মন্তক।  
এই দৃশ্য দেখে ফারেদুন লুটিয়ে পড়লেন অশুপষ্ঠ থেকে মাটিতে,  
এবং সৈন্যগণ শোকাবেগে বিদীর্ণ করলো তাদের বক্ষবাস।  
সকলের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হলো, চোখ হলো সাদা,  
কারণ, তারা আর কোন দৃশ্য অবলোকনেরই প্রত্যাশী ছিল।

---

এরজই তখন ইরানের বাদশা।

କିନ୍ତୁ ହାୟ ! ରାଜ୍ଞୀ ଫିରେ ଏସେହେ ଅନ୍ୟଭାବେ,  
ସୁତରାଂ ତାର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଓ ହବେ ତଦନୁରାପ ।  
ପତାକା ଛିନ୍ନ କରା ହଲୋ, ଦୁନ୍ଦୁଭି ନିମାଦ ହଲୋ ମନ୍ଦୀଭୂତ,  
ସାମଙ୍ଗଶେର ମୁଖମୁଳ ଶୋକେ ଅନ୍ଧକାର ହଲୋ ।  
ହଣ୍ଡୀଯୁଥେର ମୁଖେ ଏକେ ଦେଓୟା ହଲୋ କାଲିମା-ଚିହ୍ନ,  
ଅଶ୍ଵଦଳ ବଦନେ ନୀଲାଞ୍ଜନ ମେଥେ ପ୍ରୟାଣପର ହଲୋ ।  
ସେନାପତି ଓ ସେନାଦଳ ପଦସ୍ରଜେ  
ମାଥାଯ ଧୁଲିମାଟି ମେଥେ ନେମେ ଏଲୋ ।  
ସୀରଗଣ ଶୋକେ ଉଥିତ କରଲୋ ବିଲାପେର ରୋଲ,  
ଏବଂ ଦୁଃଖେ ଦଂଶନ କରତେ ଲାଗଲୋ ନିଜେଦେଇ ବାହୁଦେଶ ।  
ଓଗୋ, କାଲେର କାହେ କଥନେ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୋ ନା,  
ବାଁକା ଧନୁକ କାରୋ ପ୍ରତ୍ୟାଶାୟ ଝଜୁ କୋନଦିନ ହୟ ନା ।  
ଆମାଦେର ମନ୍ତ୍ରକେର ଉପର ଆକାଶ ଏମନଭାବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହୟ ଯେ,  
ଆକାଶିକ୍ଷିତ ଜନେର ମୁଖ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ମାତ୍ର ସେ ତାକେ  
ଛିନିଯେ ଲାଯ ।

তুম যদি তার প্রতি শক্রভাবাপন্ন হও তাহলেও  
তার মুখ সে দেখাবে  
আর যদি প্রত্যশী হও তার বক্ষত্বের তবে সে বঞ্চিত করবে  
তাই একটি উপদেশ আমি তোমাকে দিব যদি তা গ্রহণ করো,  
দুনিয়ার সৌজন্য-প্রত্যাশা থেকে প্রক্ষালন করো তোমার হাত।

ଶୋକାକୁଳ ବାଦଶା ପରମ ପରିତାପେର ସଙ୍ଗେ  
 ଏରଙ୍ଜେର ଉପବନେର ଦିକେ ମୁଖ କରଲେନ ।  
 ଆହା, ଏକଦିନ ସେଥାନେ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗେର ଆସର ବସତେ,  
 ଆର ଆୟୋଜନ ହତୋ ଉତ୍ସବେର,  
 ଆଜ୍ ଫାରେଦୂନ ଯୁବକ ପୁତ୍ରେର ମନ୍ତ୍ରକ ବୁକେ ଧାରଣ କରେ  
 କାନ୍ଦତେ କାନ୍ଦତେ ସେଇ ଉପବନେ ପ୍ରବେଶ କରଲେନ ।  
 ସେଥାନେ ଦେଖଲେନ, ତେମିନି ଠାୟ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆଛେ ରାଜ୍ଞୀସନ,  
 ଆହା, ରାଜଶୂନ୍ୟ ମେ ଆସନ ଆଜ ଅମାବସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ।  
 ଐ ରାଜକୀୟ କେଲି ସରୋବର, ଐ ସରଲ ଉନ୍ନତ ଦେବଦାର,  
 ଐ ପାପଡ଼ି-ଘରାନୋ ଗୋଲାପ ତର, ଐ ଗଞ୍ଚ-ଛଡ଼ାନୋ ବେତସକୁଞ୍ଜ  
 ବାଦଶା ଛୁଡ଼େ ଦିଲେନ ଧୂଲି-ମୁଣ୍ଡ ଆସନେର ଦିକେ,  
 ସୈନିକଦେର ଡ୍ରଲନଧନିତେ ବିଦୀର୍ଘ ହଲେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ।

অন্তঃপুর থেকে নির্গত হলো ক্রন্দন, চুল ছিড়তে লাগলো সকলে  
ঝরে পড়লো অশুর ধারা, বিষণ্ণ হলো চৰাচৰ।  
বাদশা তাঁর কোমরে জড়ালেন রক্তমাখা উপবীত;  
এবং তাঁর আসনের উপর ছড়িয়ে দিলেন জুলন্ত অঙ্গার।  
ফুলবন পরিপ্লান হলো, শুকিয়ে গেল সতেজ দেবদার,  
সারা দুনিয়ার সৌন্দর্য-পিয়াসী চোখের তারা যেন সহসা মুদে এলো।  
ফারেদুন এরজের মস্তক বুকে নিয়ে  
বিশ্ব-প্রভুর দিকে মুখ তুলে বললেন,  
হে প্রতিদানের প্রভু — বিশুচ্রাচরের শাসনকর্তা,  
এই নির্দোষ হতজনের দিকে চেয়ে দেখ !  
তার শির কর্তৃত করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমার কাছে,  
এবং তার দেহকে করা হয়েছে ছিন্নভিন্ন।  
হে প্রভু, সেই দুই নিষ্ঠুরের প্রাণে দান করো তুমি এমন জ্বালা —  
যাতে জীবনে তারা কুদিন ছাড়া সুদিনের মুখ দেখতে না পায়।  
প্রভু, তুমি তাদের হৃদয়কে লাঞ্ছিত করো দুরারোগ্য ক্ষতচিহ্ন দ্বারা,  
যেন ক্ষমা বার্ধক্যের রূপ ধরে আসে তাদের সামনে।  
ওগো বিশুচ্রাচরের একচ্ছত্র শাসনকর্তা,  
আমাকে তুমি দান করো আরো কয়েকটি দিনের অবসর —  
যেন আমি এরজের বংশোদ্ধৃত কোন মহামতিকে  
পিতৃ প্রতিশোধে কোমর বাঁধতে দেখে যেতে পারি।  
যেন এই নির্দোষ জনকে যে-ভাবে তারা মস্তকইন করেছে  
তেমনিভাবে সে-ও করতে পারে তাদের শিরচ্ছেদ।  
এই দৃশ্য দেখার্হ পরই আমার সকল ত্রঃঘার অবসান হবে,  
আমি তখন সমান মনে করতে পারবো প্রাসাদ এবং মৃত্তিকা উভয়কে।  
এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে ফারেদুন পুত্রকে বুকে নিয়ে  
সমাধি সমীপে এসে উপস্থিত হলেন।  
পুত্রের জন্য প্রস্তুত করলেন মাটির শয়ন ও সিথান,  
তারপর সেই নয়নের আলোকে চিরদিনের জন্য আড়াল করে দিলেন  
চোখের সামনে থেকে।

বললেন, হে যুবক বীর,  
কোন মুকুটধারীর মতুই  
তোমার মতুর মতো এমন করুণ নয় !  
শয়তানরা কি নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে তোমার শির,

দেহকে তোমার সঁপে দিয়েছে বাধের মুখে ।

এই বলে আবার কাঁদতে লাগলেন — ঝরাতে লাগলেন দরবিগলিত অশ্বর ধারা  
তাঁর বিলাপে হরিণাদি চতুর্শদের চোখ থেকেও উঠে গেল নিদ্রা ।

রাজ্যের আবাল—বন্ধ নরনারী

নিজ নিজ ঘরে ঝটলা করে বসলো ;

তারা নিজেদের বসন রাঙালো নীল ও কালো রঙে ।

নিজেদের বাদশার বিয়োগ—ব্যথায় তারা নিমজ্জিত করলো তাদের

আপাদ—মস্তক ।

কি অমূল্য মণিই না তাদের হারিয়ে গেছে,

যার জন্য তাদের জীবন আজ হয়ে উঠেছে এমন বিষময় ।

## এরজের কন্যার জন্ম-বৃত্তান্ত

কিছুদিন গত হলে

ফারেদুন এরজের মহলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

একটি একটি করে তিনি মহলের কক্ষগুলো ঘূরে দেখতে লাগলেন,—  
এরজের পরে সেখানকার সুন্দরীদের কি অবস্থা হয়েছে

তা পরখ করার জন্য।

হঠাতে তাঁর দৃষ্টি পড়লো এক পরমা সুন্দরী নারীর উপর,

নাম তাঁর মাহাফরীদ।

এই মহিলা এরজের খুবই প্রিয় ছিল;

ভাগ্য তাকে তারই দ্বারা গর্ভবতী করে রেখেছিল।

পরীসদৃশ এই সুন্দরীকে অন্তঃস্বত্ত্ব দেখে

বাদশার হৃদয় আনন্দে উদ্বৃলিত হলো।

তাঁর অন্তরের দিগন্দেশে উদিত হলো আশার আলো,

তিনি যেন পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধবাহী এক শুভ সন্দেশবাণী শুনতে পেলেন।

কিছুদিন পরেই সত্তান-জন্মের লগ্ন উপস্থিত হলো,

দেখা গেল, মাহাফরীদ এক কন্যার জন্ম দিয়েছে।

এতে বাদশার দীর্ঘ আশার সুত্র কিছুটা খর্ব হলেও

অত্যন্ত আদর-যত্নের সঙ্গেই তিনি তাঁর লালন-পালনের ব্যবস্থা করলেন।

সারা দুনিয়া তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত হলো,

তাঁর বয়োবদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাদশার স্নেহও বেড়ে চললো চন্দ্রকলার মতো।

সে হলো পিতামহের বুকে শোকের সাত্ত্বনা —

তাঁর চোখে পুত্রের স্মৃতির মহাত্ম অবলম্বন।

এই লালাফুল-সদৃশ সৌন্দর্যময়ীর মধ্যে বাদশা দেখতেন

এরজেরই অবিকল প্রতিমূর্তি।

দেখতে দেখতে তাঁর সারা অঙ্গে ছেয়ে এলো যৌবনের সমারোহ,

তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণ হলো উজ্জ্বল পারবীন তাঁর মতো —কেশদাম

হলো ভ্রম-কৃষ্ণ।

পিতামহ আর বিলম্ব না করে

তাকে পিশঙ্গের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

পিশঙ্গ ছিল তাঁরই এক ভাইয়ের পুত্র —

আভিজাত্য-গৌরবের অধিকারী ও স্বভাবে মুক্তাত্ম্য।

তার বৎশ-সুত্র বাদশা জামশেদের সঙ্গে যুক্ত,  
সে রাজ্য ও ভাজ-তখ্তের যোগ্যতার অধিকারী।  
ফারেন্দুন এমনি যোগ্য বরের হাতে নাতনীকে দান করলেন ;  
আনন্দের সঙ্গে নব-দম্পতির সময় অতিবাহিত হতে লাগলো ।

## মাতৃগর্ভ থেকে মনুচেহেরের জন্ম

নীল আকাশে নয়টি পূর্ণ চাঁদের আবর্তন সমাপ্ত হলে  
আনন্দের দিন এলো ।

সেই বৃদ্ধিমতী রাজকন্যা এক পুত্রের জন্ম দিলো —  
তাজ ও তখ্তের যোগ্য সমস্ত সুলক্ষণের অধিকারী ।

মাতৃগর্ভ থেকে জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই  
দৃত দৌড়ে গেল বাদশার সমীপে —

তাঁকে গিয়ে বললো, হে মুকুটধারী, আসুন  
এসে একবার এরজের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করুন ।

সৎবাদ-শ্রবণে রাজ্যদানকারী বাদশার ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটে উঠলো,  
তাঁর বিশ্বাস হলো, এরজ আবার নব-জন্ম লাভ করেছে ।

শিশুকে বুকে নিয়ে বাদশা  
বিশ্ব-প্রভুর দিকে মুখ করে বললেন,  
হে প্রভু, তুমি আমাকে দান করো এমন দৃষ্টি,  
যেন আমি তার উপর ভবিষ্যৎ আনুকূল্যের লক্ষণসমূহ প্রত্যক্ষ করতে পারি ।

বিশ্ব-প্রভু তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ করলেন,  
ও তাঁকে দান করলেন দৃষ্টি ।

ফারেদুন দেখলেন বিশ্ব উজ্জ্বলিত হয়েছে স্বর্গীয় প্রভায়,  
তিনি দৃষ্টি ফিরালেন নবজাতকের প্রতি ।

তারপর বললেন, শুভ হোক এই উজ্জ্বল দিন,  
আমাদের শক্রদের অস্তর হোক পরিম্লান !

বাদশার আদেশে মূল্যবান সুরাপাত্রে উজ্জ্বল সুরা আনিত হলো,  
বাদশা নবজাতকের নাম রাখলেন মনুচেহের ।

বললেন, পুণ্যশীল পিতামাতার বক্ষ থেকে উদ্গত  
এই শিশুবৃক্ষ পল্লবিত ও ফুলু হোক !

তার পরিচর্যার ব্যবস্থা হলো এমনি নিখুঁত যে,  
মুক্ত বাতাস তার উপর দিয়ে শাস্ত হয়ে বইলো ।

পূজনীয় প্রতিমার মতো সে বুকে বুকে বিচরণ করতে লাগলো ।  
কস্তুরী ও সুগন্ধী অস্ত্র ছড়িয়ে দেওয়া হলো তার চলার পথে,  
কারুখচিত রাজছত্র তুলে ধরা হলো তার মাথার উপরে ।

এইভাবে অতিক্রান্ত হয়ে গেল কয়েকটি বছর —

নিয়তি-সমর্থিত, সুন্দর ও সুমঙ্গল।

এই সময়ের মধ্যে রাজযোগ্য সকল বিদ্যা

তাকে শিখানো হলো।

বাদশা দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন,

দুনিয়া আবার তাঁর যশ কীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছে।

পিতামহ তখন তাকে দান করলেন রত্ন সিংহাসন ও গুরুভার প্রহরণ,  
দিলেন তাকে নিজের বিজয়ী রাজমুকুট।

সমস্ত মণিগ্রহের দ্বার অর্গলমুক্ত করে দিলেন,

যাতে রয়েছে মূল্যবান আসন, বর্ম, মুকুট ও কোমরবন্ধসমূহ।

প্রাসাদের দ্বার-সজ্জা রূপী বিচিত্র বর্ণের কিংখাৰ-যবনিকা,

ব্যাঘচর্ম বিখচিত শিবিরসমূহ,

সুবর্ণ ঝালর সমন্বিত অশ্ব-সজ্জা,

স্বর্ণ কোষযুক্ত হিন্দুস্তানী তলোয়ার ;

তুর্কীস্তানী সাঁজোয়া, রোমদেশীয় বর্ম —

সব বের করে আনা হলো।

তুরানের অস্তর্গত চাচ প্রদেশের সুবিখ্যাত তৌর-ধনু ও তৃণীর,

চীনের ঢাল ও বর্ণা —

সমস্ত সম্পদ এনে স্তুপীকৃত করা হলো।

বাদশা দেখলেন, এগুলো মনুচেহেরেই যোগ্য ;

আরো দেখলেন নিজের অস্তঃকরণকে — সন্তোষ ও করুণায় পরিপূর্ণ।

তিনি মণিগ্রহের চাবি ও কূঞ্জিরক্ষক

দুই-ই দান করলেন তাকে।

তারপর ডাকলেন সৈন্যদলের মধ্য থেকে পাহলোয়ানগণকে\*

এবং রাজ্যমধ্য থেকে সামন্তগণকে।

তাদের সবাইকে তিনি জড়ো করলেন মনুচেহেরের চারপাশে —

এরা সবাই কুশলী যোদ্ধা ও সমর-পিপাসু।

আনন্দিত মনে তারা যুবরাজকে জানালো তাদের অভ্যর্থনা,

এবং তাঁর মুকুটে মণি-বৃষ্টি করলো।

উৎসবের এই নতুন দিনে কার্যকরী হলো নতুন আইন,

দেনাপতিগণ। এই অথেই রুস্তমকে পাহলোয়ান বলা হয়। ফ্লুয়োকা অর্থে পাহলোয়ান শব্দের  
ব্যবহার পরবর্তী কালের।

মেষদল ও নেকড়ে একত্রিত হলো একই স্থানে।  
জোহাকের যুগের যোদ্ধুগণ — বীরপ্রবর কারেন,  
সেই খরশান কৃপাণধারী গার্ণাস্প,  
সেই বীরবরেণ্য সামনুরীমান,  
সেই সুবর্ণ মুকুটধারী কোবাদ —  
সকল বিশ্ব-রক্ষক বীরবৃন্দই সারি বেঁধে এসে দাঁড়ালেন  
যুবরাজকে দান করা হলো তাঁদের নেতৃত্ব।

## মুচেহের সম্পর্কে সুল্ম ও তূরের অবগতি

সুল্ম ও তূরের কানে সংবাদ পৌছলো,  
ইরানের শাহী তখ্ত আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।  
এই সংবাদে তাদের সজাগ মনে ভয়ের সঞ্চার হলো,  
তাদের ভাগ্যের নক্ষত্র বুঝি এইবার অস্তগমনের পথে।  
দুজনই অত্যন্ত চিন্তাকুল মন নিয়ে বসে পড়লো,  
চোখের সামনে তাদের যুগের অবসান তারা দেখতে পাচ্ছে।  
সহসা একটি সিদ্ধান্ত তাদের চিন্তায় চমক দিয়ে উঠলো  
সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ থেকে মুছে গেল অস্বিন্দির কালিমা।  
ফারেদুনের কাছে কোন লোককে পাঠাবার কথা তারা ভাবলো,  
ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায় নেই।  
এই ফন্দী এটে সারা রাজ্য থেকে বেছে  
এক বাকপটু সাহসী লোককে তারা নির্বাচিত করলো।  
সেই জ্ঞানী ও সম্ভ্রমশালী লোকের সামনে  
নিজেদের সৌজন্য ও প্রীতিমূলক এক লম্বা-চওড়া ভাষণ তারা  
দান করলো।  
তারপর প্রাচীন রাজকোষ থেকে বের করে আনলো মণিমুক্তাসম্পদ ও  
স্বর্ণ-মুকুট,  
ও হস্তীযুথকে সজিত করলো।  
রথ-যানের উপর তুলে দিল কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য,  
এবং থারে থারে সাজিয়ে দিল তাতে কিংখাব, পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণমুদ্রা।  
তারপর সেই হস্তীদল ও রথ-যান রং ও গন্ধের সঞ্চার নিয়ে  
পশ্চিমাঞ্চল থেকে যাত্রা করলো ইরানের অভিমুখে।  
দরবারে যারা উপস্থিত ছিল  
সহসা তাদের স্মৃতিতে জেগে উঠলো অন্য এক দূতের ছবি  
সভাগৃহ শূন্য হলে পরে তারা তাদের মনের কথা  
দূতের কাছে বললো।  
বললো, ফারেদুনের কাছে পৌছাতে হবে এই বাণী,  
প্রথমে তারা উচ্চারণ করলো, বিশ্ব-প্রভুর নাম।  
তারপর বললো, মহাবীর ফারেদুন চিরজীবী হউন,  
বিশ্ব-প্রভু তাঁকেই দান করেছেন শাহী গৌরব বহনের  
পরিপূর্ণ যোগ্যতা।

মন্তক তাঁর চির সবুজ ও দেহ অটুট থাকুক,  
উন্নত আকাশ সঞ্চারিত করুক তাঁর প্রকৃতিতে চির-উদারতা।  
তাঁর দুই দাসের বিনীত আবেদন  
শাহিনশাহের দরবারে যাচ্ছে।

দুই অপরাধীর মতো তারা  
পিতার সামনে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে অশ্রুর ডালি।  
কত অপরাধের কলঙ্কে তাদের হাদয় অনুতপ্ত,  
তাই ক্ষমার পথে আজ তারা অসহায় পাথিক।  
তাদের মর্মের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে  
এমন কেউ কোথাও বর্তমান ছিল না।  
জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন, অন্যায় যে করে,  
শাস্তি তার অবশ্য প্রাপ্য।

বেদনার্ত যেমন প্রতিকারের প্রত্যশায় দিন গুণে,  
হে বাদশা, আমরাও তেমনিভাবে করেছি কালক্ষয়।  
প্রথমত, আমাদের নিয়তির লিখন  
আমরা খণ্টাতে পারিনি ;  
কালাস্তক ব্যাঘ ও যমদূতাকৃতি আজদাহার  
জাল থেকে মুক্তিলাভে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম।  
দ্বিতীয়ত, অপবিত্র দৈত্যদের প্রোচনায়  
আমাদের হাদয় থেকে পলায়ন করেছিল বিশ্ব-প্রভুর ভয়।  
তাদের সেই প্রোচনা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল,  
আমাদের সুচেতনা হয়েছিল তাদের কবলগ্রস্ত।  
বাদশার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ঘোগ্যতা আমাদের নেই,  
অনুত্তাপে আমরা সতত নত-দৃষ্টি।  
তবু অজ্ঞতার অজুহাত নিয়েই আপনার সমীপে উপস্থিত হচ্ছি।  
অন্য কারণ, এই নিয়ত পরিবর্তনশীল আকাশ,  
কখনো সে দান করে আশ্রয় — কখনো দেয় দুঃখ।  
তৃতীয় কারণ, শয়তান, দুরস্ত অশ্বের মতো  
সে সর্বদা অনর্থ সৃষ্টিতে তৎপর।  
বাদশা যদি স্বীয় অন্তর থেকে দূর করে দেন ক্রোধ,  
ও তাঁর হাদয়ের আলোতে রক্ষা করেন আমাদের প্রার্থনা,  
তবে অবিলম্বে মনুচেহরকে বিপুল সেনাবাহিনীসহ  
আমাদের কাছে প্রেরণ করে আমাদের কৃতকৃতার্থ করুন।

আমরা তার সামনে দাসের মতো কৃতাঞ্জলী হয়ে  
সর্বদা অবস্থান করবো।  
যে বৃক্ষ আমাদের প্রতি শক্রতা নিয়ে বেড়ে উঠেছে,  
চোখের জলে আমরা তার পাদপীঠ ধূয়ে সজল করে দিব।  
আমরা সর্বস্থান থেকে খুঁজে আনবো রং ও রূপের সন্তার,  
যাতে বৃক্ষ পায় তার মাহাত্ম্য ও চিরহরিৎ থাকে  
তার রাজ্য, মুকুট ও সিংহসন।

## ফারেদুনের কাছে পুত্রদের সন্দেশ প্রদান

বাণীবাহক দৃত হস্তী, স্বর্গমুদ্রা ও উপটোকনসহ  
বাদশার দরবারে এসে উপস্থিত হলো।  
সুভাষী দৃতের অন্তরে গুঞ্জিত হতে লাগলো  
বাদশার জন্য আনীত বাণীর সন্তার।  
ফারেদুনের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছলো,  
তখন তিনি শাহী তথ্ত  
রোম-দেশীয় কিংখাব দ্বারা সজ্জিত করার,  
ও কেয়ানী তাজ প্রস্তুত করে রাখার আদেশ দিলেন।  
তারপর বিজয়ী বাদশাহ বসলেন তাঁর সিংহাসনে,  
যেন উন্নত দেবদারুর মাথায় শোভা পেল জ্যোতির্ময় চন্দ্রমণ্ডল।  
মুকুট, কঠমালা ও অন্যান্য রাজযোগ্য আভরণ  
তিনি তুলে নিলেন অঙ্গে।  
পাশে বসালেন ভাগ্যবান মনুচেহেরকে,  
এবং তার শিরে তুলে দিলেন রাজমুকুট।  
দুই সারিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হলো সামন্তবর্গ,  
তাদের সারা অঙ্গে সুবর্ণ-খচিত পরিধেয়।  
দরবার কক্ষের ছাদ ও স্তম্ভসমূহ স্বর্ণমণ্ডিত —  
সর্বত্র যেন বিকীর্ণ হচ্ছে সূর্যের আলো।  
একদিকে শৃঙ্খলিত রয়েছে সিংহ ও ব্যাঘা,  
অন্যদিকে মদমন্ত্র করীদল।  
এই সময় বীরপ্রবর শাপূর সুল্মের দৃতকে নিয়ে  
প্রাসাদে প্রবেশ করলো।  
দৃত বাদশার দরবারের এই আড়ম্বর দেখে  
অভিভূত অন্তরে পদব্রজে দ্রুত ধাবিত হলো সিংহাসনের দিকে।  
ফারেদুনের সমীপবর্তী হয়ে  
১. তেও মুকুট-চূড়া ও উন্নত সিংহাসনের দিকে দৃষ্টিপাত করলো।  
সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি মেমে এলো উপর থেকে নীচের দিকে,  
এবং আনত হয়ে সে চুম্বন করলো মৃতিকা  
ধরণীর অধীশ্বর মহান বাদশাহ তখন  
তাঁর উন্নত স্বর্ণসন থেকে দৃতকে বসবার অনুমতি দিলেন।

দৃত উচ্চারণ করলো বাদশার গুণগ্রাম,  
বললো, হে তাজ, তখ্ত ও অঙ্গুরীয়ের শোভাদানকারী,  
আপনার সিংহাসনের পদস্পর্শে ধরণী হয়েছে উজ্জ্বলিত,  
আপনার সৌভাগ্যের সম্পদে কাল হয়েছে উৎফুল্ল।  
আমরা সবাই আপনার পদধূলির তুল্য,  
আমরা সবাই প্রাণ পাছি আপনার অনুগ্রহ থেকে।  
এইভাবে গুণকীর্তন দ্বারা বাদশার মনোরঞ্জন করে  
দৃত তাঁর সামনে বিছিয়ে দিলো বাঁসল্যের উত্তরীয়।  
তারপর সতর্ক দৃত তাঁর রসনা উন্মুক্ত করে  
বাদশার মনোযোগ আকর্ষণ করলো।  
বর্ণনা করলো দুই হস্তার বাণী,  
সরলভাবে প্রকট করলো তাদের অভিপ্রায়।  
বললো, তাঁরা তাঁদের অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করে  
মনুচেহেরকে তাঁদের কাছে পাওয়ার ঐকাস্তিক কামনা ব্যক্ত করেছেন।  
দাসের মতো ক্রতাঞ্জলী হয়ে তাঁরা মনুচেহেরের সামনে অবস্থান করবেন,  
এবং তাঁকেই দান করবেন রাজমুকুট ও সিংহাসন।  
মনুচেহেরকে পিতৃ-শোণিতের মূল্যরাপে দান করবেন  
রাজ্য, সম্পদ, স্বর্ণ-মুদ্রা ও সকল বিত্ত।  
দৃত এইভাবে তার কাজ সমাপ্ত করে  
জবাবের প্রত্যাশী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

## পুত্রদের প্রতি ফারেন্দুনের প্রত্যুত্তর

বাদশাহ তাঁর দুই অপবিত্র পুত্রের  
অভিপ্রায় শ্রবণের পর  
জ্ঞানী দৃতকে সম্বোধন করে বললেন,  
সূর্য কখনো নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।  
এই দুই অপবিত্র ব্যক্তির মনের কথা  
সূর্যের চেয়েও অধিকতর প্রকটিত হয়েছে আমার কাছে।  
তুমি যা বললে সব আমি মনোযোগ দিয়ে শুনেছি,  
এখন তুমি শুনে নাও আমার প্রত্যুত্তর।  
সেই দুই নির্লজ্জ কলুষ-অস্তর নবাধমকে বলো,  
বলো সেই অক্তত্ত্ব উদ্ভাবনকে —  
কলুষিত বাণীর কোনো মূল্য নেই,  
তা দিয়ে দুনিয়ায় কিছুই কেনা যায় না।  
মনুচেহেরের প্রতি তোমাদের যে-স্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠেছে,  
এরজের বেলায় কোথায় তা ছিল ?  
তোমাদের সেই পাশব আকাঙ্ক্ষা আজো লুকিয়ে আছে,  
যার বশবর্তী হয়ে তোমরা তার মস্তক পুরে দিয়েছিলে এক সঙ্কীর্ণ  
শবাধারের মধ্যে।

যেভাবে তোমরা দুনিয়াকে এরজ-শূন্য করেছিলে,  
আজ মনুচেহেরের রক্তে তারই পুনরাবৃত্তি করতে চাইছ।  
কিন্তু মনে রেখো, কেবল লৌহ-শিরস্ত্রাণধারী  
প্রবল সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই তোমরা তার সাক্ষাৎ পাবে।  
তোমরা তাকে দেখবে ভীমতম প্রহরণধারীদের সঙ্গে কাওয়ানী  
নিশানের ছত্রচায়ায়,—  
তাকে দেখবে, যখন তার অগণিত অশ্ব-খুরে বেদনা-নীল  
হয়েছে ধরিত্রী, তখন।

তার সঙ্গে থাকবে কারেনের মতো সংগ্রামী সেনাপতি,  
সৈন্যদলের রক্ষক বীরপ্রবর শাপূর ও নন্দোহ,  
একদিকে থাকবে মহাবীর শৈদাশ  
অন্যদিকে সিংহ-বিক্রম শিরোয়া।  
আরও থাকবে, সৈন্যদলের পরামর্শদাতা  
মহাসামস্ত তলীমান ও যমেনের নরপতি সরও।

এরজের শোণিত প্রতিশোধের সঙ্কল্প নিয়ে যে বক্ষ মাথা তুলেছে,  
সে তার অঙ্গ ধোত করবে শক্রবই শোণিত-সিঙ্ঘনে।  
দীর্ঘদিনের সেই শক্রতা কেউ কি ভুলতে পারে কখনো ?  
কালের বাঁকা পিঠ তো আমরা সোজা হতে দেখিনি কোনদিন !  
নিজের সন্তানের সঙ্গে যুদ্ধ কি আমার কাছে সুখের বলে মনে হতে পাবে ?  
শক্র ছেদন করেছিল যে-বক্ষ,  
গজিয়েছে তাতেই নতুন প্রশাখা এবং আজ তা' অবনত হয়েছে  
ফুল ও ফলভারে।

মনুচেহের আজ ক্রুদ্ধ সিংহের মতো  
পিত্ত-প্রতিশোধে কোমর বেঁধেছে;  
তারু সঙ্গে রয়েছে যশস্বী সেনাপতিগণ —  
রয়েছেন সামনুরীমান ও গর্শাস্পের মতো মহাবীরগণ।  
তার সৈন্যদল এক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে  
অন্য পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে,  
তাদের পদভারে দলিত হচ্ছে ধরণীতল।

অথচ তোমরা বলছ যে, বাদশা যেন  
অন্তর থেকে মুছে ফেলে দেন শক্রতার সকল চিহ্ন।  
কিন্তু আজ অবস্থা দাঁড়িয়েছে অন্যরূপ ; আকাশের আবর্তনে  
সর্বত্র ছেয়েছে অঙ্ককার — তলিয়ে গেছে তাতে দয়া আর অনুগ্রহ।  
আমরা শুনেছি, অসহিষ্ণুর উপর ক্ষমা  
অনুচিত ও অথবীন।

কারণ, অত্যাচারের বীজ যে বপন করেছে,  
সে দেখবে না শান্ত দিন, পাবে না আনন্দিত নন্দন-কানন।  
বিশ্ব-প্রভুর অনুগ্রহ লাভ যদি তোমাদের ভাগ্যে থাকতো,  
তবে ভ্রাতৃকে অনুরঞ্জিত করতে না তোমরা তোমাদের হাত।  
বুদ্ধি যাই আছে সে তেমন অপরাধই করবে  
যা ক্ষমার যোগ্য।

তোমরা প্রদর্শন করেছ নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা,  
অন্তরে ঈর্ষার বিষ গোপন রেখে প্রকাশ করেছ বিনয়-বাণী।  
এর বিনিময় তোমরা বিশ্ব-প্রভুর কাছ থেকে  
লাভ করবে উভয় লোকে।  
তোমরা পাঠিয়েছ উজ্জ্বল তথ্ত,  
পাঠিয়েছ মদমত করী ও সুবর্ণ মুকুট ;

আশা করেছ এই বিচ্ছি উপটোকন পেয়ে  
আমরা ভুলে যাব শক্তা ও ধূয়ে ফেলবো রক্তচিহ্ন !  
মুকুটধারীর শির বিক্রী করে দেব সোনার বদলে,  
ফলে না থাকবে তাজ না থাকবে তথ্ত !  
কে বলেছে যে, মহামূল্য পুত্রকে পিতা স্বর্গমূল্যে বিক্রী করে দিয়েছেন ?  
কাজেই এই উপহার আমার জন্য নয় —  
ফিরিয়ে নিয়ে যাও তুমি এসব।

তোমার বার্তা আমি শুনেছি, আমার বার্তা তুমি শুনলে,  
এখন এই বার্তা নিয়ে অবিলম্বে তুমি প্রত্যাবর্তন কর।  
দৃত এই ভয়ানক বার্তা শুনে  
ও মনুচেহেরকে রাজাসনে উপবিষ্ট দেখে  
ভয়ে কম্পিত-কায় হলো, ও অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করে  
অশু-পৃষ্ঠে প্রয়াণপর হলো।  
তার সারা অস্তিত্বে সেই পুরুষ প্রবরের  
যৌবন-দীপ্ত প্রভাবের ক্রিয়া অণুরণিত হতে লাগলো।  
সে দেখতে পেলো, সুলম ও তুরের উপর  
ঘূর্ণিত হচ্ছে গগনচক্র।  
দুরান্ত বাতাসের গতিতে সে এগিয়ে চললো —  
তার মস্তিষ্কে আছড়ে পড়ছে বাদশার প্রত্যুত্তর  
ও অন্তর পরিপূর্ণ হচ্ছে দুশ্চিন্তায়।

ক্রমে সে এসে উপস্থিত হলো পশ্চিমের অঞ্চলে,  
এবং প্রান্তর উপত্যকার উপর দিয়ে চেয়ে দেখলো অদূরে রাজপ্রাসাদ।  
দেখতে দেখতে সে প্রাসাদের দ্বারদেশে প্রলম্বিত  
যবনিকার পাশে এসে দাঁড়ালো,  
এই যবনিকারই অন্তরালে অবস্থান করছেন পশ্চিমের অধিপতি।  
সেখানে রেশমী বস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে এক পট্টাবাস,  
এবং তাতে খচিত করা হয়েছে সোনালী নক্ষত্র।  
দুই রাজ্যের দুই বাদশা আসন গ্রহণ করেছেন সেই শিবিরে,  
তারা বলাবলি করছেন দৃত ইরান থেকে ফিরে এসেছে।  
এমন সময় এক সেনাপতি দৃতকে নিয়ে  
দরবারে উপস্থিত হলো।  
দৃতের জন্য পূর্বেই নতুন আসন তৈরি করে রাখা হয়েছিল,

সেখানে তাকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো ইরানের  
নতুন বাদশার রীতিনীতির কথা।

দূতের কাছে তারা সকল কথা জানতে চাইলো —

সেখানকার রাজ্য, তাজ ও তখ্ত — সকল কিছুর সংবাদ !

জানতে চাইলো, বাদশা ফারেদনের কথা, তাঁর সৈন্যবাহিনীর কথা,

তাঁর যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের কথা, তাঁর রাজ্যের কথা।

পরিবর্তনশীল আকাশের অন্য সব কীর্তির কথাও তারা

জানতে চাইলো —

যে—আকাশ মনুচেহেরের প্রতি এত করশ্বাপ্রবণ ।

কোন্ কোন্ বীর আলো করে আছে ইরানের রাজপ্রাসাদ, কী রীতি

সেখানে প্রচলিত আছে ?

রাজকোষ ও প্রাসাদে কোন্ কোন্ মূল্যবান সম্পদ আছে রক্ষিত ?

সেনাপতি কারা — তাদের মধ্যে মহত্তম কে ?

কে কে সংগ্রামে অর্জন করেছেন যশ — সব সব তারা

জানতে চাইলো।

উত্তরে দৃত জানালো, বসন্তের এমন সমারোহ

সে কোথাও দেখেনি, যেমন দেখে এসেছে ইরানের প্রাসাদে।

স্বর্গোদ্যানে যেন বসন্ত এসেছে,—

তার সমন্ত মাটি সুগন্ধিত অম্বুর ও তার সকল কঙ্কর

মুঠি মুঠি সোনা।

প্রাসাদের আকাশ পাখিদের কলগুঞ্জনে মুখরিত,

তার প্রশান্ত মাঠ ফুলবনে সুসজ্জিত।

যখন সেই উন্নত প্রাসাদের সমীপে এসে উপস্থিত হলাম,

তখন দেখতে পেলাম, তার শীর্ঘ নক্ষত্রদের সঙ্গে রহস্যালাপে নিরত রয়েছে।

প্রাসাদের একপাশে সিংহ, অন্যপাশে হস্তি;

তখ্তের নীচে যেন বিস্তৃত রয়েছে এক সুবিশাল দেশ।

তার স্বর্ণময় পাদপীঠ রক্ষিত আছে হস্তিপৃষ্ঠ সদৃশ মেঘদলের উপরে,

তার পদতলে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রয়েছে কত না সিংহ।

হস্তীদলের নিকটে দণ্ডায়মান রয়েছে বাদকদল,

তাদের বাদ্যধ্বনিতে বধির হয়ে যাচ্ছে জগতের কান।

যেন মনে হচ্ছে, যুদ্ধভূমির মততা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র,

আকাশ ও মাটির শূন্যতা পূর্ণ হয়ে গেছে প্রমন্ত চিৎকারে।

মৃদুমন্দ গতিতে আমি এগিয়ে গেলাম সেই মহত্তম নরপতির দিকে; দেখলাম

চোখের সামনে উন্নীত রয়েছে এক মূল্যবান  
নীলাল সিংহাসন।

তাতে উপবিষ্ট রয়েছেন বাদশা পূর্ণচন্দ্রের সমারোহে,  
এবং তাঁর সূর্যকান্ত মণি-সদৃশ মুখগুলের উপরে  
শোভা পাছে মহিমময় রাজমুকুট।

কর্পুরের মতো সাদা তাঁর কেশরাঙ্গি, শোলাপ পাপড়ির মতো  
তাঁর মুখের বর্ণ,

তাঁর বাণীতে বৃদ্ধি পাছে ভাষার মর্যাদা।

জগৎ তাঁর থেকে লাভ করছে যুগপৎ আশা ও শক্তা,  
যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছেন স্বয়ং বাদশা জামশোদ।

উন্নত শির মনুচেহেরকে দেখলে মনে হয়,  
যেন আবার জন্ম নিয়েছেন দৈত্য-দমন তহমুরস।

তিনি বসে আছেন বাদশার ডান পাশে,  
যেন তিনি বাদশার জীবন ও প্রাণ দুই-ই।

সামনে উপস্থিত রয়েছে বঙ্গ-যুক্তজয়ী  
কুশলী কাওয়া কর্মকার।

সর্বত্র সে বাদশার সহযোগী বলে পরিচিত,  
আরো রয়েছে বাদশার আইন সম্পর্কে পরামর্শদাতা যমনের স  
বাদশার কোষাধ্যক্ষ বিজয়ী গারশাস্প।

গারশাস্পের বামে দণ্ডায়মান রয়েছে  
তার দুই শয়নী পুত্র।

সংগ্রামী সামনুরীমান সহাস্য-বদনে সেখানে উপস্থিত,  
যিনি সিংহ ও হস্তীর নিকট থেকেও আদায় করে নিতে  
পারেন স্বীয় কাস্তিক্ষত বস্ত্র

হাজার হাজার রোমক ও চীন দেশীয় দাস  
সোনার তকমা পরে সেখানে উপস্থিত রয়েছে।

তারা একের সঙ্গে অন্যে কাঁধ মিলিয়ে  
ক্রতাঞ্জলীপুটে গারশাস্পের পেছনে দণ্ডায়মান।

তারপর সেনাপতি জাহান,—সে যুদ্ধরত হলে  
সারা দুনিয়া তার সঙ্গে টিকে থাকতে পারে না।

সেই সংগ্রামী নায়ক যদিনানে অবতীর্ণ হলে  
হাতে তুলে নেয় ছয় শত মণি ভারী গদা।

সে যখন ক্রুক্ষ হয়ে পদাঘাত করে মাটির উপর

তখন ভয়ে কাল শিহরিত হয় ও কম্পিত হয় ধৰণী।

তার সামনে শৃগাল ও হিংস্র ব্যাঘ দুই-ই সমান;

এক ব্যক্তি কিংবা তিন শো বীর উভয়কেই সে গণ্য করে একভাবে।

সামনুরীমান যখন হাতে নেয় তলোয়ার,

তখন তার ভয়ে সর্বত্র ক্ষরিত হয় রক্তবিন্দু।

বাদশার সম্পদের হিসাব কারো জানা নেই,

সম্পদের এমন আধিক্য দুনিয়ায় কেউ দেখেনি কোনদিন।

তাঁর প্রাসাদের সর্বত্র বিচরণ করছে সারিবদ্ধভাবে সৈন্যদল,

প্রাসাদের সকল স্তুর্ত স্বর্ণমণ্ডিত, সকল মণ্ডপই স্বর্ণচূড়।

তাঁর সেনাপতিগণ সবাই সহযোগী কাওয়ানী কারেনের মতো

কুশলী ও কর্মদক্ষ।

শিরোয়া সে যেন কালান্তক ব্যাঘ,

বীরপ্রবর শাপূর — সে যেন মদমত হাতী।

তাঁর বাদ্যকরণ, — যখন তারা হস্তীপৃষ্ঠে সংস্থিত রণ-দামামায় আঘাত করে,

তখন তার আওয়াজে বাতাস হয় ঘোর কঞ্চবর্ণ।

যখন এইসব বীর দলবদ্ধভাবে অবতীর্ণ হয় সংগ্রামে

তখন পর্বত পরিণত হয় প্রাস্তরে, আর প্রাস্তর হয় পর্বতের মতো

অরণ্যসঙ্কুল।

এদের সবারই অন্তর জিঘাংসায় পরিপূর্ণ ও ললাটদেশ কুঞ্চিত

যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই তাদের কাম্য নয়।

এইভাবে দৃত যা কিছু দেখে এসেছে সব তাদের বললো,

আরো বললো ফারেদুনের সেই ভয়ানক ভাষণ যা সে শুনে এসেছে।

দৃতের কথা শুনে অত্যাচারী দুই রাজার হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হলো,

দুশ্চিন্তায় ও ভয়ে নীল বর্ণ হলো তাদের মুখমণ্ডল।

বিপদোন্তীর্ণ হওয়ার নানা উপায় তারা চিন্তা করতে লাগলো,

কিন্ত এই সমস্যার কোন আদি-অন্তই তারা দেখতে পাচ্ছে না।

সহসা তূর বড় ভাই সুলামকে বললো,

আনন্দ ও বিশ্রামকে এখন বিদূরিত করুন।

জ্ঞানী হয়েও আমরা মিথ্যাই ক্ষমা প্রত্যাশা করেছিলাম

ফারেদুনের কাছ থেকে।

যেখানে একত্রিত হয়েছে পৌত্র ও পিতামহ

সেখানে সৃষ্ট হয়েছে অস্তুত রসায়ন।

আমাদের উচিত, আর অধিক বিলম্ব না করে  
এখনই সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়।  
এই সিংহ শিশুকে আর বাড়তে দেওয়া হবে না,  
যাতে সে তার দাঁত আরো তীক্ষ্ণ করার ও সাহস আরো  
বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ না পায়।

এই চিঞ্চা করে তারা সজ্জিত করলো অশ্বারোহী দল,  
ডেকে আনলো সৈন্যবাহিনী চীন ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে।  
তারপর ধরণী আলোচনায় পূর্ণ করে  
বিশুকে যেন সামনে ঠেলে নিয়ে চললো।  
সীমাইন সৈনিকে পূর্ণ করলো সেনাদল,  
অসংখ্য নক্ষত্রও যার উপমা নয়।  
ঠিক হলো, দুই দেশের সম্মিলিত এই বিরাট বাহিনী  
বর্ম ও শিরস্ত্রাণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে তুরান থেকে যাত্রা করবে  
ইরানের দিকে।  
তারপর বিশাল সেনাবাহিনী, মদমস্ত করীদল ও প্রভৃতি সম্পদ নিয়ে  
দুই জিঘাঃসাপরায়ণ নরপতি করলো তাদের অভিযান।

## ফারেদুন কর্তৃক মনুচেহেরকে তুর ও সুলমের সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রেরণ

ফারেদুনের কাছে সংবাদ এলো যে,  
ওদের সৈন্য জেঁহুর তীরে এসে পৌছে গেছে।  
তখন সম্বাটের আদিশে মনুচেহের  
স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে রাজধানী থেকে প্রান্তর পথে চালিত করলেন।

পরম অভিজ্ঞ সম্বাটের উপদেশ  
তরঞ্জ বীরের জন্য আকর্ষণ করে আনবে সৌভাগ্য।  
শক্তি অনভিজ্ঞ মেষ তার জালে আবদ্ধ করবে  
পশ্চাদ্বিক থেকে ব্যাঘকে ও সামনে থেকে শিকারীকে।  
ধৈর্য, সচেতনতা, সঙ্কল্প ও বিজ্ঞতার দ্বারা  
সে দুরস্ত সিংহকে ফাঁদে আবদ্ধ করবে  
অন্যদিকে দুর্চিরিত অমঙ্গলকামীদুয় —  
শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে পশ্চাদ্বিকে মুখ করবে।  
প্রতিশোধ গ্রহণে সে তৎপর হবে,  
সে যেন প্রজ্ঞলস্ত করবে লোহদণকে।

মনুচেহের বললেন, হে সমুন্নতশির সম্বাট !  
শক্ততার উদ্দেশ্যে কে আপনার নিকটবর্তী হতে চাচ্ছে ?  
অমঙ্গলকামিগণ অবশ্যই অতিশীঘ  
স্বীয় দেহ প্রাণের জন্য নতজানু হবে আপনার সামনে ।  
আমি এখনই রোমক তনুগ্রাণে আবৃত্ত করছি বক্ষদেশ,  
এবং এমনভাবে কঠিদেশ বক্ষন করছি যাতে তার গ্রন্থি উন্মোচিত  
করা সহজ না হয়।

রংক্ষেত্রে এমন সংগ্রাম আমি উথিত করবো,  
যাতে সৈন্যদের পদতাড়িত ধূলি স্পর্শ করে সূর্যলোক।  
বিপক্ষদলে এমন কোন পূরুষ আমি দেখতে পাইছি না,  
যিনি যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হতে পারেন।

রাজধানীর বাইরে স্থাপিত হলো সম্বাটের (মনুচেহেরের) শিবির,  
এবং প্রোথিত করা হলো সৌভাগ্য-সূচক পতাকা-দণ্ড।

দলে দলে সৈন্যগণ সেখানে আসতে লাগলো,  
মনে হলো যেন, পর্বত ও প্রান্তরে উজ্জ্বলিত হচ্ছে বন্যাক্রান্ত নদী।  
তাদের পদক্ষিণপু ধূলায় উজ্জ্বল দিন অঙ্ককার হয়ে এসেছে,  
মনে হচ্ছে প্রজ্ঞলন্ত সূর্য বুঝি রাখুন কবলগ্রস্ত হলো।  
সৈন্যদলের মধ্যে থেকে উথিত হলো এমন কোলাহল যে,  
তাতে, প্রথম শ্রবণের অধিকারীগণও বধির হয়ে গেলো।  
প্রান্তর জুড়ে জেগে উঠলো প্রকৃষ্ট আরবীয় অশ্বের হোৰ্ধবনি,  
এবং সেই সঙ্গে বেজে চললো অবিরত রণদামামা।  
সৈন্যদলের পুরোভাগে সেনাপতিগণ  
দুই সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রমত্ন হস্তীদলকে।  
এইসব হাতীর ঘাটটির পিঠে স্বর্ণসন স্থাপিত করা হলো,  
সেই স্বর্ণসনগুলি কত-না মণিমুক্তায় বিখচিত ও বিচ্চিত্রিত !  
তিন শত হাতীর পিঠে বোঝাই করা হলো খাদ্যদ্রব্য,  
আর তিন শত হাতীর পিঠে রাখা হলো যুদ্ধের উপকরণ।  
এইসব হাতীর প্রত্যেকটি পরিপূর্ণভাবে বর্মা বৃত্ত,  
একমাত্র চক্ষু ব্যতীত সারা দেহ তাদের আচ্ছাদিত হয়েছে ইম্পাতের আবরণে।  
এইবার সম্মাটের শিবির উথিত হলো,  
এবং সম্মন্যে তিনি তামেশা থেকে প্রান্তর অভিমুখে ধাবিত হলেন,  
কারেনের মতো প্রতিশোধকামী সেনাপতি  
ত্রিশ হাজার অশ্বারোহীর পুরোভাগে রইলেন।  
তারা সবাই খ্যাতিমান যোদ্ধা ও তনুত্রাণধারী,  
সবাই ভারী প্রহরণ হাতে অগ্রসর হলো।  
বীরবৃন্দ প্রত্যেকে দুরন্ত সিংহের মতো  
এরজের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হলেন।  
বীরবৃন্দের হাতে ধরা রয়েছে সমুজ্জ্বল তরবারি।  
মনুচেহের এখন বীরাগ্রগণ্য কারেনসহ  
নারওয়ানের বনভূমি থেকে নির্গত হলেন।  
তিনি সৈন্যদলের সামনে এসে প্রবৃক্ত হলেন তাদের নির্বাচনে,  
এবং বিপুল প্রান্তরে সজ্জিত স্থীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্যুহবন্ধ করলেন।  
সৈন্যদলের বাম বাহুর ভারাপূর্ণ করা হলো গারশাস্পের উপর,  
দক্ষিণ বাহুর সংরক্ষণে থাকলেন কোবাদল বীরপ্রবর সাম।  
সৈন্যগণ সারি বেঁধে দণ্ডয়ামান হলে  
মনুচেহের সর্বওসহ বাহিনীর মধ্যভাগে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

তিনি স্বীয় নক্ষত্রদের মধ্যে চাঁদের মতো শোভা পেতে লাগলেন,  
অথবা সমুজ্জ্বল সূর্যের মতো উদ্দিত হলেন পর্বত প্রদেশে।  
সৈন্যদলনকারী কারেন ও সামের মতো যোদ্ধা  
এইবার স্বীয় তরবারি কোশোন্মুক্ত করলেন।  
রক্ষাদলের পুরোভাগে রহিলেন কোবাদ,  
এবং অভিজাত তলীমান গুপ্ত বাহিনীর দেখাশোনায় নিযুক্ত হলেন।  
এইভাবে নবপরিণীতা বধুর অনুরূপ করে সজ্জিত করা হলো ইরানীয়

সৈন্যদলকে

রণেন্মুখ, সিংহ দুন্দুভির আওয়াজে নিদারশ্ন উৎসবের আভাস সূচিত  
করলো।

ওদিকে সুল্ম ও তূরের কাছে সংবাদ পৌছলো যে,  
ইরানীয়গণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়েছে।  
তারা বনভূমি থেকে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত সারিবদ্ধ করেছে সৈন্যদল,  
ফেনরূপে তাদের হাদয়রক্ত অধরোষ্ঠে উচ্ছুসিত হচ্ছে।  
সংবাদ পেয়ে দুই খুনি সম্ভাট —  
হৃদয় শক্রতার বিষে পরিপূর্ণ করে অগ্রসর হলো ;  
এবং আলানা ও নদীকে পশ্চাদ্বৃত্তি করে  
যুদ্ধার্থ সজ্জিত করলো তাদের সেনাদল।  
সহসা একজন রক্ষী কোবাদের কাছে  
দৌড়ে এসে তূর সম্পর্কে সংবাদ দিলো,  
এবং বললো, আপনি এখুনি মনুচেহের সমীপে গমন করুন,  
গিয়ে বলুন, হে পিতৃহীন তরুশ সম্ভাট !  
যদি এরজের ঔরসে কন্যারই জন্ম হয়ে থাকে,  
তবে আপনাকে কে দিয়েছে এই অসি তনুআগ ও প্রহরণ ?  
তাঁকে বলবেন, অবশ্যই তাঁর বাণী আমি পৌছে দিবো,  
স্বীয় পরিচয় সম্পর্কে তিনি যা বলবেন তা প্রতিপক্ষকে অবগত করাবা।  
কিন্তু যদি সন্দেহ দীর্ঘস্থায়ী হয়,  
তবে প্রজ্ঞা আপনার রহস্যের সঙ্গে হাত মেলাবে না।  
জেনে রাখুন, সামনে যে কর্তব্য তা ধারণার অতীত,  
সুতরাং নিজের সম্পর্কে কোন বাজে কথা বলা সমীচীন হবে না।  
যদি দিনরাত আপনাদের উপর বনের হরিণাদি চতুর্পদ ক্রন্দন করে,  
তবুও তাতে আশৰ্য হওয়ার কিছুই থাকবে না।  
কারণ, নারওয়ানের বনভূমি থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত —

যুদ্ধার্থী অশ্বারোহী ও প্রতিশোধকামী বীরবৃন্দ প্রস্তুত রয়েছে।  
তাদের সমুজ্জ্বল তরবারি সূর্যালোকে ঝকঝক করছে,  
আপনারা দেখবেন যে, তাদের সম্মুখে উজ্জীন রয়েছে কাওয়ানী পতাকা।  
এই দৃশ্য দেখলে আপনাদের হৃদয় ব্যথা ও ভয়ে পরিপূর্ণ হবে,  
সানু থেকে আপনারা কখনো আর শীর্ষের পথ দেখতে পাবেন না।  
রক্ষী সৈনিকের এই কথা শুনে মহামতি কোবাদ  
অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হলেন কিন্তু কোনুকপ প্রত্যুষ্টি করলেন না।  
তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্মাট সমীপে আগমন করে  
যুদ্ধার্থী-প্রতিপক্ষের বক্তব্য যা শুনেছেন, তা নিবেদন করলেন।  
শুনে মনুচেহের হাস্য করে বললেন যে,  
মূর্খ ব্যতীত এমন কথা আর কেউ বলতে পারে না।  
সেই প্রভুর প্রশংসা যিনি দুই জাহানের প্রতিপালক,  
গুপ্ত ও প্রকট উভয়ের রহস্যই যিনি সত্যায়িত করেন।  
কে না জানে যে, এরজ আমার মাতামহ?  
পরম সম্মানিত ফরেদূন আমার সাক্ষী।  
অনতিবিলম্বে যখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করবো,  
তখনই লোকে আমার বৎসাভিজ্ঞাত্য ও ব্যক্তিত্ব  
সম্পর্কে অবহিত হবে।

চন্দ-সূর্যের প্রভূর ঐশ্বর্যের সহায়তায় —  
তাদের ঐ বিপুল সমাবেশকে আমি ধ্বংস করবো;  
আমি তাদের সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলাকে ওলট-পালট করে দিবো  
এবং সেই বাহিনীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবো তার শির।  
সমুন্নত পিতার রক্তের প্রতিশোধে —  
তাদের সম্মাজ্যকে আমি তছনছ করে ফেলবো,  
এই বলে সম্মাট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন,  
এবং বললেন সে জন্যে উৎসব-কক্ষ, সুরা ও পানপাত্র প্রস্তুত করা হোক !

## তুরের সৈন্যদলের উপর মনুচেহেরের আক্রমণ পরিচালনা

ধরিত্বী যখন অন্ধকার রাত্রি থেকে আলোকে বহুগত হলো,  
তখন অগ্রগামী সেনাদল ছড়িয়ে পড়লো পর্বত-প্রান্তের সর্বত্র  
সৈন্যদলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী কারেন  
এবং বিজ্ঞ উপদেশদাতা যমনের অধিপতি সর্বও  
সৈন্যদের উচ্চকষ্টে ডেকে বললেন,—  
হে সম্ভাটের যশস্বী সিংহদল !  
আপনারা জেনে রাখুন এই যুদ্ধ শয়তানের বিরুদ্ধে ; —  
যে—শয়তান বিশ্ব-স্মৃষ্টির শক্তি।  
আপনারা বন্ধন করল কটিদেশ ও জাগ্রত হোন !  
এবং আসুন বিশ্ব-প্রভুর সাহায্যের ছায়াতলে !  
যে—ব্যক্তি এই যুদ্ধক্ষেত্রে নিঃত হবে,  
সে হবে স্বর্গবাসী, তার সমস্ত পাপ ধূয়ে—মুছে যাবে।  
যে সব ব্যক্তি এই যুদ্ধক্ষেত্রে  
রোম ও চীনের সৈন্যদের রক্তপাত করবে,  
তারা চিরকালের জন্য অর্জন করবে খ্যাতি  
এবং পুরোহিতদের সম্মানে সম্মানিত হবে।  
তদুপরি তারা সম্ভাটের হাত থেকে লাভ করবে  
রাজ্য ও সিংহাসন।

তারপর যখন উজ্জ্বল দিন দ্বিখণ্ডিত হলো,  
এবং দিবসের দুই প্রহর হলো অতিবাহিত,  
তখন বীরবৃন্দ তাদের কটিদেশ বন্ধন করে  
হাতে তুলে নিলো প্রহরণ ও কাবুল দেশীয় তরবারি  
এবং প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব স্থানে এসে দাঁড়ালো  
কেউ অপরের জায়গায় পা রাখবার প্রয়াস পেলো না।  
সেনাপতিগণ ও বীর সামন্তবর্গ  
সিংহ-সদৃশ সম্ভাটের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডয়মান হলো।  
এবং সর্বাধিনায়ক সম্ভাটকে সম্মোধন করে বললো, আমরা সবাই  
আপনার দাস,  
আপনার জন্যই আমরা পৃথিবীতে জীবন ধারণ করি।

আপনি যে-মুহূর্তে আমাদের আদেশ করবেন, সে-মুহূর্তেই  
এই ধরিত্রীকে আমরা তরবারি দ্বারা প্রবহমান জ্ঞেহ নদীতে  
পরিবর্তিত করে দিবো।

এই বলে সেনাপতিগণ স্থীয় শিবিরের দিকে প্রজ্ঞাপ্ত হলো,  
তাদের হাদয়ে বৈরনির্যাতন স্পৃষ্ট রইলো প্রবল হয়ে।

এদিকে দিনের আলো স্বস্থান থেকে প্রয়াণপর হয়ে  
তির্যক্ভাবে প্রবিষ্ট হলো রাত্রির অঙ্ককারে।  
অতঃপর উষার উদয়ে দিনের আলো যখন  
রাত্রির অঙ্ককার থেকে বাঁকা দিগন্তরালে বেরিয়ে এলো,  
তখন মনুচেহের তাঁর রাজকীয় শিবির থেকে  
তনুত্রাণ, তরবারি ও রোমীয় শিরস্ত্রাণে সংজ্ঞিত হয়ে বেরিয়ে এলেন।  
সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদল রণধনি উথিত করলো,  
এবৎ আকাশের দিকে তুলে ধরলো তাদের বর্ণারাজি।  
তাদের মন্তিক্ষ ক্রোধে পূর্ণ হলো ও ললাটে  
দেখা দিলো কৃঞ্জন রেখা,  
পৃথিবীর উপর যেন লিখিত হয়ে গেলো তাদের অভিপ্রায়।  
ডাইনে বাঁয়ে ও সৈন্যদলের মধ্যস্থলে  
সম্মাট স্থীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী সেনা-সন্মিবেশ করলেন।  
তাঁর বাহিনী যেন জলের উপরে ভাসমান সুদর্শন  
তরীর অনুরূপ শোভা পেলো  
এবৎ দ্রুত এগিয়ে চললো রণাভিমুখে।  
সঙ্গে সঙ্গে মন্ত হাতীর পিঠে রক্ষিত রণ দামামায় বাঢ়ি পড়লো,  
আর তাতে ধরিত্রী দুলে উঠলো নীলনদের মতো উর্মিছন্দে।

হস্তীদলের সম্মুখে দুন্দুভিবাদকগণ  
দুরস্ত সিংহের মতো উচ্ছুসিত আবেগ নিয়ে অগ্রসর হলো।  
এই-অভিযানকে একটি উৎসবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে,  
এখানে বেজে উঠেছে তৃৰ্য ও নিনাদিত হচ্ছে বিষণ।  
এইভাবে তারা একটি দুর্ভেদ্য পর্বতের মতো এগিয়ে চললো,  
তখন প্রতিপক্ষ থেকেও আসলো বাধা।  
দেখতে দেখতে বন-প্রান্তের বয়ে গেলো রক্তের নদী,  
মনে হলো যেন, ধরিত্রীর বুকে লালাফুলের কানন জেগে উঠেছে।

মত হস্তীদলের পদরাজি রক্তের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে,  
মনে হচ্ছে, সুর্যকান্ত মনির স্তুতরাজি যেন সম্মুখে বিরাজিত।  
তুরানীয় পক্ষে শিরোয় নামের এক সেনাপতি ছিল,  
সে ছিল বীর, সম্মুতশির ও যশ—অন্বেষী।  
সে স্থীয় দল থেকে একটি গিরিচূড়ার মতো বেরিয়ে এলো,  
তার আগমন প্রত্যক্ষ করে কেঁপে উঠলো বীরবৃন্দের হৃদয়।  
কারেনের দৃষ্টি যখন তার উপর পড়লো  
তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেনে নিলেন স্থীয় তরবারি।  
শিরোয় তখন পুরুষ—সিংহের অনুরূপ গর্জন করে  
কারেনের কঠিদেশ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো বর্ণ।  
ভয়ে কারেনের হৃদয় পরিম্লান হলো,  
তিনি সহ্য করতে পারলেন না সেই আঘাত।  
এই দৃশ্য যখন সেনাপতি সামের চোখে পড়লো,  
তখন তিনি মেঘগর্জন উথিত করে অগ্রসর হলেন।  
শিরোয় সামকে দেখেই ক্ষিপ্রগতি ব্যাপ্তের অনুরূপ  
যুদ্ধার্থ বীরবরের দিকে এগিয়ে এলো।  
এবং সামের মস্তক লক্ষ্য করে প্রহরণের আঘাত হানলো  
তার ফলে সামের মুখমণ্ডল হলো হলুদবর্ণ;  
তাঁর শিরস্ত্রাণ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো,  
অতঃপর অসি দ্বারা শক্রজয়ে নিরত রাইলো শিরোয়।  
অবশেষে দুই সম্মুতশির ও দুরন্ত বীরই  
ষ ষ বাহিনীর অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।  
এইবার শিরোয় স্থীয় সৈন্যদলের বৃহৎ—সম্মুখে এসে  
মহামতি মনুচেহেরকে ডাক দিয়ে বললো,—  
আপনাদের সেই সেনাপতি কোথায়,  
দুনিয়া যাকে গারশাস্প বলে সম্বাধন করে থাকে ?  
তিনি আসুন, এসে এখনই আমার সঙ্গে ধূঁক্ষে প্রবৃত্ত হোন,  
তাহলে আমি তাঁকে রক্তবর্ণ তনুত্রাণে পরিশোভিত করতে পারি।  
ইরানে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ আমার সমকক্ষ নন  
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিও আমার পরাক্রম সহ্য করতে অক্ষম।  
ইরানে ও তুরানে কোথাও কোন লোক আমার সমকক্ষতার যোগ্য নয়,  
কেউ আমার প্রতিদুর্দুল্মী নেই, নেই আমার মতো কোন বীর।  
আমার তরবারি সিংহাদির রক্ত পান করে,

আমার প্রহরণ সাহসী পুরুষদের মগজ আস্থাদন করে থাকে ।  
যখন আমার তরবারি কোষোন্তুকু হয়,  
তখন সপ্তরাজ্য রূপান্তরিত হয় রক্তের নদীতে  
গারশাস্প এই আহ্বান শুনে বেরিয়ে এলেন,  
এবং পশ্চিমের সেনাপতির দিকে অগ্রসর হয়ে,  
গর্বিত শিরোয়াকে সম্বোধন করে এমন গর্জন উথিত করলেন যে,  
তাতে প্রকম্পিত হয়ে উঠল যুদ্ধক্ষেত্র ।  
বললেন, ওহে অপ্রকৃতিত্ব শৃঙ্গাল,  
সম্মুতশির বীরদের মধ্যে থেকে তুই আমাকেই স্মরণ করেছিস ?  
তোর সামনে আমার শক্তি ও যুদ্ধকৌশল  
এখনই তোর সরোদন ক্ষমা প্রার্থনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে ।  
জবাবে প্রতিপক্ষ বললো, আমি শিরোয়া  
প্রমত হস্তীসকলের দেহ থেকে আমি অবলীলায় বিছিন্ন  
করি শির ।

এই বলেই শিরোয়া স্থীয় অশু উত্তেজিত করে অগ্রসর হলো,  
মনে হলো যেন সচল হয়েছে এক গিরিচূড়া  
তুর্কী শিরোয়াকে এইভাবে আসতে দেখে  
সম্মুতশির গারশাস্প হাস্য করলেন ।  
শিরোয়া তখন বললো, হে শক্তিমান,  
সাহসী বীরবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধে এমন করে হাসবেন না ।  
গারশাস্প বললেন, ওরে দৈত্য-সদশ পুরুষ,  
যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কখনো এমন করে হাসতাম না ।  
যদি তুই এভাবে না আসতিস আমার সামনে ;  
তোর ঔদ্ধত্যাই আমাকে হাসিয়েছে ।  
গারশাস্পের কথা শুনে শিরোয়া বললো, রে বৃন্দ ভাগ্যহত,  
তাজ ও তখ্তের দিন তোর শেষ হয়েছে,  
তাই, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এমন ব্যাকুল হয়েছিস,  
চল তবে, তোর রক্তে সেই ব্যাকুলতার অবসান করি ।  
এই কথা শোনামাত্র গারশাস্প টেনে নিলেন  
তাঁর ভারী প্রহরণ ;  
ও সেই গোমুখ-চিহ্নিত গদার আঘাতে  
তাকে ধরাশায়ী করে দিলেন ।  
মুহূর্ত মধ্যে শোণিতে একাকার হয়ে গেলো,

এবং শিরোয়ের করোটি শূন্য করে বেরিয়ে এলো তার মগজ।  
এমনভাবে তাকে নিশ্চিহ্ন করা হলো  
যেন শিরোয় কখনো জন্মই নেয়নি তার মাতৃগর্ভ থেকে।  
এমন সময় তুরানের বীর সেনানীগণ  
সমবেতভাবে গারশাস্পের দিকে ধাবিত হলো।  
গারশাস্প উথিত করলেন ভীষণ রং হৃকার,  
সেই হৃকারে কেঁপে উঠলো আকাশের চন্দ্ৰ-সূর্য।  
সঙ্গে সঙ্গে তীর, বৰ্ষা ও সুতীক্ষ্ণ তলোয়ারের ঝঞ্জনায়  
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রলয়ের দৃশ্য প্রকটিত হলো।  
রংক্ষেত্রের দিকে দিকে সূচিত হতে লাগলো মনুচেহেরের বিজয়,  
যেন বিশ্বের মন তার প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে গেছে।  
এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত চললো, ক্রমে নেমে এলো অঙ্ককার,  
উজ্জ্বল সূর্য রাত্রির পর্দায় তার মুখ লুকালো।  
বেলীক্ষণ কালের গতি এক রকম থাকে না,—  
কখনো বিৱাজ করে উৎসব কখনো দেখা দেয় আনন্দহীনতা।  
তুর ও সুলমের হৃদয় দৃঢ়ৰে উদ্বৃলিত হলো;  
রাত্রির অঙ্ককারে এক অতর্কিত আক্রমণের সঙ্কল্পে তারা কোমর বাঁধলো।  
তাই পরদিন সকালে দেখা গেল, তুরানীয়গণ যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত;  
দুই ঈর্ষাপুরায়ণ নরপতি দীর্ঘ সময় ধৰে আলোচনায় মগ্ন হয়ে রইলো।

## মনুচেহেরের হাতে তূরের নিধন

বিরতির মধ্যদিন অতিবাহিত হতে চলেছে,  
এমন সময় দুই দীর্ঘপ্রায়ণ নরপতির হাদয়ে জুলে উঠলো শক্রতার আগুন।  
তারা পরম্পরের সঙ্গে আলোচনায় নিরত থেকে  
তখনও কৌশলের পর কৌশল চিন্তা করে চলেছে।  
তারা বলছে, রাত্রি হলে আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করে  
সারা প্রান্তর রক্তে রঞ্জিত করে দিবো।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিনের অন্ত হলো,  
এবং ধরণী পরিপূর্ণ হলো অঙ্ককারে।  
দুই অত্যাচারী তাদের সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করলো,  
এবং অতর্কিত আক্রমণের সকল প্রস্তুতি নিলো।  
গোয়েন্দাগণ তা জানতে পেরে  
ত্বরিতে উপস্থিত হলো মনুচেহেরের কাছে।  
এবং প্রতিপক্ষের সৈন্যদের প্রস্তুতির সংবাদ  
বাদশার কাছে নিবেদন করলো।  
মনুচেহের মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন,  
এবং কি কৌশলে আক্রমণ প্রতিহত করা যায়, তা ভেবে নিলেন।  
গোটা সৈন্যবাহিনীকে কারেনের হাতে সমর্পণ করে  
ঘাত তৈরির স্থল নির্বাচনে স্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন।  
সঙ্গে নিল ত্রিশ হাজার বীর,  
পৌরুষ ও বীরত্বে এই অসিধারীগণ অর্জন করেছেন যশ।  
মনুচেহের নিজে দেখলেন, গুপ্ত স্থানটি  
সুনির্বাচিত হয়েছে,  
এবং সৈন্যগণও প্রস্তুত।  
রাত্রি আরো অঙ্ককার হলে তূর একলক্ষ সৈন্য নিয়ে  
যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মুখ করলো।  
অতর্কিত আক্রমণের অভিপ্রায় নিয়ে  
তুনীর থেকে আকর্ষিত করে নিলো তীর ও ধনুকে জ্যাযুক্ত করলো।  
কিন্তু সহসা তার সৈন্যদের থেমে দাঁড়াতে হলো,  
তারা দেখলো, সামনেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক উজ্জ্বল নিশান।  
বুঝালো, যুক্ত ছাড়া এখন গত্যস্তর নেই,

সৈন্যদের মধ্যে তখন উথিত হলো চিৎকার ধ্বনি ।  
অশুরোহীদের পদধূলিতে বাতাস ঘেঁষের মতো ভারী হয়ে উঠলো,  
ইস্পাতের তলোয়ারগুলি বিদ্যুতের মতো চমকাতে লাগলো ।  
বাতাস ঝঞ্চার বেগে প্রবাহিত হলো,  
যেন হীরার আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে মৃত্তিকার মুখ ।  
অস্ত্রের ঝঞ্চনা মস্তিষ্কের মধ্যে সৃষ্টি করছে প্রমত্ত কলরোল,  
আগুন ও দীর্ঘশূস যেন দীর্ঘ করছে ঘেঁষের বুক ।  
দুই পক্ষের সৈন্যদল পরম্পর মুখোমুখী হয়ে লড়ছে,  
উভয়েরই কাঁধের উপর উথিত হচ্ছে যুগপৎ বিলাপ ও হঙ্কার ।  
রাত্রি অন্ধকার ও প্রান্তর কালি ঢালা —  
চতুর্দিক থেকে অবিরাম বয়ে চলেছে বাণ-বৃষ্টি ।  
এমন সময় তুর্কদের অধিপতি গর্জন করে  
তলোয়ার হাতে রণবজ্রমিতে প্রবেশ করলো ।  
সংগ্রামী কারেন তখন পাগলা হাতীর মতো রণবজ্রমিতে প্রবেশ করে  
ধরিত্রীকে শোণিতের নীলনদে পরিণত করছে ।  
মরুভূমিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে রক্তের নদী,  
এবং আকাশ পরিপূর্ণ হয়েছে আহত সৈনিকদের বিলাপ-চিৎকারে ।  
এমন সময় বাদশা গুপ্ত ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এলেন ;  
সঙ্গে সঙ্গে তূরের অগ্র-পশ্চাত বেকুবার পথ রুক্ষ হয়ে গেলো ।  
তার সামনে ও পেছনে দুদিকেই রণন্ধন সৈন্যদল,  
এবং স্বয়ং মনুচেহের খুঁজে ফিরছেন শক্রকে ।  
বাদশা চিৎকার করে তাকে ডাকছেন,  
কোথায় তুমি অত্যাচারী শক্র ।  
অবস্থা দেখে তুর বিচলিত হয়ে পড়লো  
সে বুঝতে পারছে, তার ভাগ্যের দুর্দিন সমাগত ।  
তার সামনে পেছনে দুদিকেই রণন্ধন সৈন্য,  
আর মনুচেহের এগিয়ে আসছে তার দিকে ।  
এবং তাকে ডাক দিয়ে বলছে,  
ওরে নির্বোধ অত্যাচারী শক্র, একটু সবুর করে থাক ।  
অবস্থা দেখে তূরের অস্তরে প্রবিষ্ট হলো ভীতি,  
সে বুঝতে পারলো, তার অস্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে ।  
সে তখন অশু-বল্কা টেনে অন্যদিকে মুখ ফেরালো,  
কিন্তু সৈন্যদের হাহাকার ছাড়া সে আর কিছুই শুনতে পেলো না ।

এমন সময় মনুচেহের সবেগে ধাবিত হয়ে  
সেই বিখ্যাত ঈর্ষাপরায়ণের সামনে এসে উপস্থিত হলেন,  
এবং তাকে ডেকে বললেন,  
ওরে নির্বোধ অত্যাচারী শক্ত, একটু সবুর কর।  
নির্দোষ ব্যক্তির মন্ত্রক যখন কর্তন করেছিলে  
তখন কি জানতে পারিসনি যে দুনিয়া পোষণ করে রেখেছে  
তোর উপরও শক্রতা !

এই বলে তিনি তার পৃষ্ঠে বর্ষা দিয়ে আঘাত করলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে ছিটকে পড়লো তলোয়ার।  
মনুচেহের ঘোড়ার উপর থেকেই বাযুগতিতে তাকে  
আকর্ষণ করে ধরলেন,

এবং চক্ষের নিমিষে আছড়ে ফেললেন মাটির উপরে।  
তারপর অবলীলায় বিছিন্ন করে নিলেন তার শির,  
এবং দেহটি ১৫০পদ্মের উৎসবের জন্য সেখানেই ফেলে রাখলেন।

নিয়তি অবোধ্য, কোনদিন বুঝতে পারলাম না, কি তোর উদ্দেশ্য ;  
কারও প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব সে গ্রহণ করে না।  
কাউকে যদি সে বহু বর্ষ ধরে প্রতিপালনও করে  
তবু তার শেষ নিঃশ্বাসটুকুর সময় সে তার দিকে ফিরেও দেখে না।  
সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে সে কাউকে করে পথের ভিখারী,  
অথচ এমন কাজে শিউরে উঠে না সে,

অন্তরে তার দেখা দেয় না মমতা।  
হে বন্ধু, তার দয়ার আশা করো না কোনদিন —  
সে যদি তোমাকে দান করে অস্তীন সুসংবাদ, তবুও।  
মনুচেহের এইভাবে তার বিজয় সম্পূর্ণ করে  
তুরের মন্ত্রক নিয়ে ফিরে এলেন।  
ফিরে এলেন তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনীর কাছে,  
তাকালেন বিজয়ী ঝাওয়ার দিকে — ও দৃষ্টি প্রসারিত করলেন,  
পাহাড় প্রান্তর সর্বত্র।

## ফারেদুনের সমীপে মনুচেহেরের বিজয় লিপিকা

মনুচেহের যুদ্ধের উত্থান-পতন বর্ণনা করে  
ফারেদুনের কাছে লিপি লিখলেন।  
প্রথমেই তিনি স্বষ্টার গুণকীর্তন করলেন,  
তিনি জাগ্রত করেছেন তার ঘূমস্ত ভাগ্যকে।  
তিনি গ্রহণ করেন মানুষের করুণ প্রার্থনা,  
এবং ধারণ করেন তার হাত ; —  
তিনিই পথ দেখান, তিনিই উন্মোচন করেন হৃদয় ;  
তিনি চিরঞ্জীব ও চির-প্রতিষ্ঠিত।  
পরে লিখলেন, ফারেদুনের গুণাবলী।  
যিনি সিংহাসন ও প্রহরণের অধিপতি  
ঘাঁর থেকে উৎসারিত হয় দান, ধর্ম ও গৌরব,  
এবং ঘাঁকে শোভা পায় মুকুট, সিংহাসন ও রাজত্ব।  
সত্য ও সৌন্দর্য তাঁরই ভাগ্যের দান,  
গৌরব ও শোভা তাঁর সিংহাসন থেকেই বিকীরিত হয়।  
তাঁর আদেশে সর্বত্র সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,  
সমস্ত জগৎ পূর্ণ হয়েছে তাঁর জয়জয়কারে।  
আপনারই শক্তির মহিমায় আমি লাভ করেছি তুরান ভূমি,  
আপনারই আদেশে চালিত করেছি এই সৈন্যবাহিনী।  
দুদিনের মধ্যে তিনটি বড় বড় যুদ্ধ আমাকে করতে হয়েছে —  
কখনো আলোকিত দিবা-ভাগে, কখনো রাত্রির অঙ্ককারে।  
তারা করেছিল রাত্রিযোগে অতর্কিত আক্রমণ, আমরা ছিলাম গুপ্ত  
ঘাঁটিতে তাদের প্রতীক্ষায়,—  
প্রচণ্ড হিংস্তার সঙ্গে আমরা উভয়েই করেছি সংগ্রাম।  
বাদশার নামে আমরা পূর্বদিন লাভ করেছিলাম বিজয়,  
ও শক্তিদেরকে বহিক্ষৃত করেছিলাম রণক্ষেত্র থেকে।  
কিন্তু যখন শুনলাম যে, পাপাচারী ভাগ্যহত তূর  
এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে  
রাত্রির অঙ্ককারে অতর্কিত আক্রমণের মতলব করেছে —  
সম্মুখ-যুদ্ধে হেরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তন্ত্র-মন্ত্রের —

তখন আমি তার সামনে—পিছনে রচনা করলাম গুপ্ত ঘাঁটি,  
ও পশ্চ করে দিলাম তার সঙ্কল্প।  
তারপর যখন সে যুক্তভূমি ছেড়ে পলায়নের উদ্যোগ করছে  
তখন তাকে ধরে ফেললাম প্রচণ্ড শক্তিতে ;  
ও তার বর্ম লক্ষ্য করে বর্ণা ছুঁড়লাম,  
এবং দমকা বাতাসের মতো উঠিয়ে আনলাম তাকে তার অশ্ব—পঞ্চের  
আসন থেকে।

তারপর ঘৃণিত আজদাহার মতো তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে  
তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলাম শির।  
সেই শির এখন আপনার কাছে পাঠাচ্ছি,  
আর সূল্মের জন্য তৈরি করেছি তার উপযুক্ত রসায়ন।  
যেভাবে এরজের শিরকে শবাধারে পূরে  
অপমানিত অবস্থায় পাঠানো হয়েছিল —  
যেভাবে বাস্তিত করা হয়েছিল তাঁকে তাজ ও তখ্ত থেকে নির্লজ্জভাবে,—  
তেমনই আমিও বিচ্ছিন্ন করেছি তার মস্তক দেহ থেকে,  
ও ধ্বৎস করেছি তার রাজ্য ও গহ;  
এবং তার মস্তক বর্ণফলকে বিন্দু করে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি,  
যাতে মৃক্তি পায় আপনার হাদয়ের অন্তরীণবন্ধ বেদনা।  
এখন জ্যেষ্ঠ সূল্মের ব্যবস্থায় নিজেকে নিয়োজিত করেছি,  
নেকড়ে যেভাবে মেষের অনুধাবন করে তেমনিভাবে তৎপর  
রয়েছি তার মস্তকের কামনায়।

সুল্ম যদি সমুদ্রের গভীরতায়ও ডুব দেয়  
কিংবা প্রয়াণপর পর হয় সপ্তর্ষির নক্ষত্র মণ্ডলে,  
তবু তাকে নিশ্চয় ধরবো ও বিচ্ছিন্ন করবো তার মস্তক,  
এবং রচিত করবো তার জন্য তার উপযুক্ত শবাচ্ছাদনী।  
লিপিকায় এইভাবে সব কথা লিখে  
মনুচেহের বায়ু—গতি অশ্বে করে তা ফারেদুনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।  
দৃত সেই লিপি নিয়ে সলজ্জভাবে ফারেদুনের দরবারে উপস্থিত হলো,—  
তার দুচোখে উৎক্ষ অশ্বের ধারা বইতে লাগলো।  
সে ভাবতে লাগলো, কোন্ মুখে সে চীনের অধিপতির কর্তৃত মস্তক নিয়ে  
ইরান শাহের সমীক্ষে উপস্থিত হবে ?  
পুত্র যদি ধর্মচুত্যত ও হয়,  
তবু তার মৃত্যুতে পিতার প্রাণে জুলে উঠে শোকের আণন।

তার অপরাধ ছিল গুরুতর তাই ক্ষমা সে পায়নি,  
তদুপরি, নতুন বাদশার প্রতিও সে হয়েছিল ঈর্ষাণ্ডিত।  
উদ্ভৃত দৃত এইরূপ ভাবতে ভাবতে বাদশার সমীপে এসে উপস্থিত হলো,  
ও তাঁর সামনে রাখলো তুরের মস্তক।  
ফারেদুন তা দেখলেন এবং ঘনুচেহেরের উপর  
বর্ষণ করলেন আশীর্বাদ-বাণী।

## কারেন কর্তৃক আলানাৎ দুর্গ জয়

সুলম যুদ্ধের বিপর্যয়ের কথা জানতে পারলো,—  
জ্যোৎস্নারাতে যেন প্রবেশ করলো অমাবস্যার অন্ধকার।  
কালের এই প্রতিকূল ব্যবহারে সমস্ত মন তার দৃঢ়খে ভরে এলো,  
ভায়ের মৃত্যুতে সে আবোরে রোদন করলো বহুক্ষণ ধরে।

তার প্রত্যাগমনের পথে এক দুর্গ ছিল,  
যার শীর্ষ নীল আকাশের সঙ্গে কথা কইছে।  
সেই দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার সঙ্কল্প করলো সে,  
সময়ের উচু-নীচুতে এমন একটু অবসরের প্রয়োজন আছে।  
এদিকে মনুচেহের ভাবলেন,  
সুলম যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে থাকে  
তবে আলাদা দুর্গে সে আশ্রয় নিবে;  
কাজেই আমাদেরকে এখনি সেই পথ ধরতে হবে।  
কারণ, নদী তীরের এই দুর্গে ঠিক হয়ে বসতে পারলে  
তাকে হটানো কঠিন হবে।  
জলের গভীরতা থেকে উঠে এসেছে  
কঠিন পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই দুর্গ।  
সে দুর্গে প্রয়োজনীয় সকল বস্তু ও সম্পদাদি রয়েছে,  
হ্যাপক্ষী<sup>১০</sup> তার উপর ছায়া ফেলে না।  
সত্ত্বর আমাকে সেখানে যেতে হবে,  
অশু-বল্কা ও রেকাব এখনি করতে হবে উদ্যত।  
এই চিন্তা করে তিনি কারেনকে ডাকলেন,  
ও তার কাছে ব্যক্তি করলেন সেই কথা।

---

তুরানের অর্ণগত এক প্রাচীন নগরীর নাম।

প্রবাদ আছে যে, হ্যাপক্ষীর ছায়া যাই উপর পড়ে সে হয় ভাগ্যবান কিংবা রাজা।  
কিন্তু এখানে দুর্গের উচ্চতা কিংবা দূর্ঘাত্মক সম্পদের প্রাচুর্য নির্দেশ করার  
অন্য হ্যাতো কবি হ্যাপক্ষীর অত্যাবশ্যক ছায়া না ফেলার কথা বলেছেন।

কারেন বাদশার কথা শুনে বললেন,  
হে অমিততেজা অধিনায়ক,  
এই যদি আপনার অভিপ্রায় হয় , তবে দাসের অধীনে  
সোপর্দ করুন একদল সৈন্য।  
আপনার সুমঙ্গল পতাকা হাতে নিয়ে  
ও তূরের অঙ্গুরীয় সঙ্গে করে অবিলম্বে আমি সেই দুর্গের পথ ধরবো ।  
এবং সুকৌশলে সৈন্যদলসহ প্রবেশ করবো দুর্গ মধ্যে ।  
কারেনের জবাব শুনে মনুচেহের বললেন, আমি সম্মত,  
আপনি প্রস্তুত হোন, খোদা আপনার সহায় হবেন ।  
তারপর মনুচেহের সৈনিকদের মধ্য থেকে সাহসী ও অভিজ্ঞ  
ছয়-হাজার বীরকে এই অভিযানের জন্য মনোনীত করলেন ।  
কালি-চালা অঙ্ককার রাত্রিতে তাঁরা যাত্রা করলেন,  
হাতীর পিঠে বসিয়ে নিলেন রণ-দামামা ।

কিছুদূর গিয়েই সৈন্যগণ স্থলপথ ছেড়ে  
জলপথে এগিয়ে চললো ।  
তারপর বীরবৃন্দ দুর্গের নিকটবর্তী হলে  
সেনাপতি সৈন্যদলকে শিরোয়া র হাতে সমর্পণ করে  
বললেন, আমি এখন আমার পরিচয় গোপন রাখবো ।  
দূতের বেশে দুর্গরক্ষীর কাছে উপস্থিত হয়ে  
এই অঙ্গুরীয় দেখাব ।  
এবং এই কোশলে দ্বার অতিক্রম করে  
সর্ববিধ ব্যবস্থা সম্পন্ন করবো ।  
দুর্গে প্রবেশ করে আমি পতাকা উড়িয়ে দিব,  
তারপর তলোয়ারগুলো উচু করে ধরবো ।  
তোমরা সবাই তখন দুর্গের দিকে মুখ করবে,  
আমি যখন ভৃক্তার দিব, তখন তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে তাতে যোগ দিবে ।  
সৈন্যগণ নদীতীরে রয়ে গোলেন,  
সেনাপতি তাদেরকে শিরোয়ার হাতে সমর্পণ করে গেছেন ।  
দুর্গ-দ্বারের নিকটবর্তী হয়ে দ্বাররক্ষীর সঙ্গে কথা বললেন কারেন,  
ও তাকে অঙ্গুরীয় দেখালেন ।  
বললেন, আমি তূরের নিকট থেকে এসেছি,

---

মনুচেহেরের এক সেনাপতির নামও শিরোয়া ছিল ।

এই দুর্গে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিব।  
 তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি গিয়ে দ্বাররক্ষীকে বলবে,  
 সে যেন দিনরাত অতন্ত্রভাবে পাহারা দেয়।  
 তুমি দ্বাররক্ষীর সঙ্গে বন্ধুভাবে অবস্থান করবে,  
 দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণে তুমি ও তৎপর ও সজাগ থাকবে।  
 এবং যখনই মনুচেহেরের পতাকা তোমার নজরে পড়বে,  
 তখনই সকল সৈন্যসহ দুর্গ রক্ষায় এগিয়ে আসবে।  
 তোমরা অক্ষত ও ক্ষমতার অধিকারী,  
 মনুচেহেরের সৈন্যদলকে তোমরা পরাস্ত করতে পারবে,  
 এ বিশ্বাস আমার আছে।

দ্বারী এই কথা শুনে,  
 ও তরের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখে,  
 তখুনি দুর্গদ্বার খুলে দিলো --  
 চোখের দেখায় সে গোপন রহস্য কিছুই বুঝতে পারলো না।

শোন, দিহকান কবি<sup>১</sup> কি সুন্দর বলেছিলে  
 হন্দয় রহস্য সম্পর্কে সে এতেটুকুই বুঝে যে, হন্দয় অজ্ঞাত  
 এবং আমার ও তোমার কর্তব্য হলো আনুগত্য ;  
 কিন্তু সে আনুগত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগাযোগ চাই।  
 শুভ-অশুভ যাই ঘটুক না কেন,  
 কাহিনীর গ্রন্থি উষ্মোচনের জন্যে বুদ্ধির প্রয়োজন আছে।

দ্বাররক্ষী তখনি কারেনকে সঙ্গে করে  
 দুর্গে প্রবেশ করলো :  
 একজন সরল ও একজন কৃটিল, —  
 সেনাপতির মন স্থীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকেই উন্মুখ হয়ে রয়েছে।  
 তিনি শক্রর সঙ্গে ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে  
 তার মস্তক ও দুর্গ নির্মূল করার চিন্তায় মগ্ন হলেন।  
 কবি বলেছেন, হে তৌক্ষনখরধারীর শাবক,  
 তুমি অন্য এক ব্যাঘ্রাবকের সঙ্গে

• ফেরদৌসীর পূর্বেও শাহনামার কাহিনীগুলো 'দিহকান' বা গ্রাম কবিদের দ্বারা গীত হতো।  
 সামন্ত মুগে দিহকান গ্রাম অভিজ্ঞাত বা জয়মিদার শ্রেণী গঠন করেছে।

না জেনে শুনে ভৱিত কোনো কর্ম-পস্থা বেছে নিয়ো না,  
এর আগে ভালো করে নিরীক্ষণ করো তাকে আপাদমস্তক।  
সুলিলিত কথায় ভুলে যেয়ো না,  
বিশেষ করে যুদ্ধ ও গোলযোগের সময়ে।  
অনুসন্ধান করো ; গুপ্ত ঘাঁটি সম্পর্কে সতর্ক হও,  
যে-কথাই শোনো, তার তলকূল মেপে দেখ।  
লক্ষ্য করে দেখ, একজন বহুদশী সেনাপতি  
কিভাবে করেন প্রহেলিকার সমাধান।  
তিনি শক্তির সকল চক্রান্ত উপলব্ধি করে  
তার চারদিকের বেষ্টনকে করে দেন ব্যর্থ।

রাত্রি প্রভাত হলে সংগ্রামী কারেন  
উড়িয়ে দিলেন পতাকা।  
রণবাদ্য ও অন্যান্য ইঙ্গিত করে  
শিরোয়ার কাছে তিনি ব্যক্ত করলেন তাঁর অভিপ্রায়।  
শিরোয়া কেয়ানী পতাকা উড়ীন দেখে  
সৈন্যগণসহ দুর্গের দিকে মুখ করলেন।  
দুর্গন্ধির অধিকার করে সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি।  
এবং শক্রপক্ষের সেনানীগণের মস্তক রক্তে অনুরঞ্জিত করলেন।  
একদিকে কারেন ও অন্যদিকে শিরোয়া —  
তাঁদের তলোয়ার থেকে যুগপৎ আগুন ও রক্ত ঝরাতে লাগলেন।  
এইভাবে সূর্য যখন গম্বুজ-চূড়ার উপরে উঠলো  
তখন না রইলো দুর্গ না রইলো দুর্গ রক্ষক ; —  
শুধু এক ধূমপুঞ্জ উথিত হলো মেঘমালার দিকে,  
নদীর উপরে কোন নোকোর আর দুর্মাত্রও  
দৃষ্টিগোচর হলো না।  
আগুনের লেলিহান জিঞ্চা বাতাসের তাড়নায় তীব্রতর হলো,  
অশুরোহীদের হঞ্চার ও আহতদের বিলাপে চতুর্দিক পূর্ণ হলো।  
সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে  
ক্রমে ক্রমে ধূঁয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো দুর্গ ও বিশাল প্রাস্তর।  
দেখা গেল বিপক্ষের দ্বাদশ সহস্র সৈনিক হত হয়ে পড়ে আছে,  
আগুন থেকে বিনির্গত কালো ধূঁয়া সরে যাচ্ছে নদীর দিকে।

সেই ধূঘায় কালিবর্ণ হয়ে গেছে জলতল,  
এবং প্রান্তর রূপান্তরিত হয়েছে রঞ্জের নদীতে।  
নারী ও শিশুদল কাঁদতে কাঁদতে  
সেনাপতির পাশে এসে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো।  
মহামতি কারেন তাদেরকে সম্মাটের বিজয় গৌরবে  
প্রাণের আশ্বাস দিলেন।

## জোহাকের পৌত্র কাকোয়ের অভিযান

এইভাবে শক্রদলন করে সংগ্রামী কারেন  
বাদশার সমীপে ফিরে এলেন।  
তারপর নতুন বাদশার কাছে যুদ্ধের উত্থান-পতন  
এবং তার কৈশলাদির কথা একে একে বর্ণনা করলেন।  
মনুচেহের তা শুনে তাকে সংবর্ধনা করে বললেন,  
চির অব্যাহত থাক আপনার জন্য অশু, প্রহরণ ও সাজসজ্জা।  
বীর কারেনের উপর এইভাবে তাঁর সন্তুষ্টিজ্ঞাপন করে  
বাদশা বললেন,  
আপনাকে এখনি আবার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করতে হবে।  
এক নতুন শক্র আবার বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে  
আমাদের উদ্দেশে উন্মুক্ত করেছে খরশান তরবারি।  
শুনেছি, সে জোহাকের পৌত্র ;  
তার অপবিত্র নাম কাকোয়।  
সে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে —  
তাদের মধ্যে রয়েছে দুরস্ত অশুরোহী দল ও বর্ণাধারী বীরগণ।  
আমাদের বীরবৃন্দের মধ্যে যারা যুদ্ধে বীরত্বের  
পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে

তাদেরকে নিয়ে আপনি যাত্রা করন।  
বন্ধুকে দিজ্ব্রহ্ত\* ও গুঙ্গ\*\* থেকে যাত্রা করতে দেখে  
সুল্মণ্ড এখন যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধবে।  
লোকে বলে সে যুদ্ধে এক সংগ্রামী দৈত্য  
বাহুবলে পথ করে নিয়ে সে আমাদের সম্মুখবর্তী হবে।  
সমস্ত রণক্ষেত্রে সে বীরদর্পে বিচরণ করবে,  
এবং গদাহাতে পরিক্ষা করবে আমার সৈন্যদের বাহুবল।  
যদি সে যুদ্ধ করতে আসে  
তবে তাকে আক্রমণ করবো আমি নিজে।  
কারেন বাদশাকে বললো, হে নরপতি,  
কার এমন সাধ্য যে যুদ্ধে আপনার সম্মুখীন হয় ?

\* বায়তুল মুকাদ্দাসের পাটীন ইরানীয় নাম।

\*\* সিরিয়ার অস্তর্গত এক পাহাড়ী এলাকা।

ভীষণতম ব্যাঘ্রও যদি আপনার প্রতিদুন্দু হয়,  
তবে তার গাৰ্ত্ত-চৰ্ষণও আপনি অবলীলায় উন্মোচন কৰবেন।  
কাকোয় সে কে ? কি তার সাধ্য ?  
আপনার সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি দুনিয়ায় ?  
আমি শ্বিৰ মস্তিষ্কে চিন্তা কৰে রেখেছি এক সুন্দর কোশল :  
যাতে দিজহৃথ্ত ও গুঙ্গ থেকে  
কাকোয় যুক্তার্থ এগিয়ে না আসে।  
এই কথা শুনে বাদশা কাৰেনকে বললেন,  
মন থেকে দুশ্চিন্তা দূৰ কৰুন।  
যুদ্ধেৰ ক্লেশ বহন কৰবাৰ জন্য প্ৰস্তুত হোন,  
এবং তার জন্য সমস্ত হিস্তুতা নিয়ে প্ৰস্তুত কৰুন সৈন্যবাহিনী।  
আমাৰ জন্য যুদ্ধকাল এখানেই সমাগত হয়েছে,  
হে সমুন্নতশিৰ বীৰ, আপনি প্ৰসাৰিত কৰুন আপনার প্ৰচেষ্টা  
এইকল বলাৰ সঙ্গে সঙ্গে শিবিৰ প্ৰাঙ্গণে  
উথিত হলো রণদামামাৰ গুৰুগঙ্গীৰ নিনাদ।  
যথাসময়ে সৈন্যদেৱ পদধূলিতে ও দুন্দুভিৰ আওয়াজে  
বাতাস কঢ়াবৰ্ণ ও ধৰণী অন্ধকাৰ হলো।  
সেই অন্ধকাৰে যেন হীৱকখণ্ডগুলো প্ৰাণ পেয়েছে,  
এবং ইতস্তত বিচৱণ কৰছে বৰ্ণা ও প্ৰহৱণ।

চাৰদিকে উথিত হচ্ছে চিংকাৰ ও যুদ্ধ শুৰু হয়ে গেছে,  
শৱজালে ছেয়ে গেছে আকাশেৰ আডিনা।  
ঠাণ্ডা রক্তেৰ শৈল্যে হাতে-ধৰা অসি কাঁপছে,  
এবং অন্ধকাৰ মেঘ থেকে ঝিৱে রক্তেৰ ফেঁটা।  
পায়েৰ তলায় যেন রক্তেৰ বান ডেকেছে,  
তাৰ ঢেউ এসে প্ৰহত হচ্ছে উচ্চতৰ ভূমিতে।  
দুই প্রতিদুন্দু সৈন্যবাহিনী জাপ্তে ধৰেছে একে অন্যকে,  
কালো হাবশীৰ মুখেৰ মতো ঘসীলিষ্পি হয়েছে জগতেৰ মুখ।  
এমন সময় প্রতিদুন্দুকে আহ্বান কৰে ভীষণ চিংকাৰ কৰে মহানায়ক কাকোয়  
যুদ্ধ ক্ষেত্ৰে এক দৈত্যেৰ মতো প্ৰবেশ কৱলো।  
মনুচেহেৱও তা দেধে সৈন্যদলেৰ মধ্যে থেকে বেৱিয়ে আসলেন,  
তাঁৰ হাতে ধৰা রয়েছে খৰশান হিন্দুস্তানী তলোয়াৰ।

দুঃজনই যুগপৎ উদ্ধিত করলেন রণ-চিৎকার,  
সেই চিৎকারে যেন পাহাড় ফেটে গেল, ও মানুষের হন্দয় হলো ভয়ে প্রকশ্পিত।  
দুই বীর দুই প্রমত্ত হস্তীর মতো পরম্পরের নিধনে  
নিজেদের কোমর বাঁধলেন।

প্রথমেই কাকোয়় বাদশার কোমরবন্ধ লক্ষ্য করে বর্ণা ছুড়লো,  
সেই আঘাতের তীব্রতায় কেঁপে উঠলো তাঁর রাজমুকুট।  
এবং তাঁর বর্ম কোমর পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেলো,  
ফলে লৌহাবরণ সরে গিয়ে প্রকটিত হয়ে পড়লো কটিদেশ।  
এই সময় মনুচেহের কাকোয়ের শ্রীবাদেশে তলোয়ার মারলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গাবরক সাঁজোয়া ভেদ করে তা ভুক স্পর্শ করলো।  
এইভাবে দুই প্রতিদৃষ্টী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লড়তে লাগলেন,  
তাঁদের মাথার উপরে গতিমান রইলো উজ্জ্বল সূর্য।  
ততক্ষণে দুই পক্ষের ব্যাঘদলের লড়াইয়ে  
নদী প্রান্তর ও পাহাড় রক্তে ভেসে গেল।  
বাদশা তখন এই দীর্ঘ-সূত্রী সংগ্রামে বিরক্ত হয়ে  
যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত করার জন্য তাঁর পাঞ্চা প্রসারিত করলেন;  
এবং অত্যন্ত শক্ত মুঠিতে কাকোয়ের কোমরবন্ধ আকর্ষণ করে  
তাকে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন।  
তারপর ক্ষিপ্ত-গতিতে খঞ্জের টেনে নিয়ে তার বক্ষদেশ বিদীর্ঘ করে দিলেন।  
এইভাবে তেজস্বী আরব-বীরের সকল গর্ব চিরতরে নির্মূল হয়ে গেল;  
এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হলো, যেন মাত্গৰ্ভ থেকে কাকোয়  
জন্মই নেয়নি কোনদিন।

## সুলমের পলায়ন ও মনুচেহেরের হাতে তার নিধন

কাকোয়ের ম্তুর সঙ্গে সঙ্গে

সুলমের আশা-ভরসার প্রধান স্তম্ভ ভেঙে পড়লো ।

তার অস্তর থেকে ক্রোধ দূরীভূত হলো,

এবং সে পলায়ন করলো সেই দুর্গের দিকে ।

নদীর তীরে পৌছে সে দেখলো,

সেখানে একটি নৌকার চিহ্ন পর্যন্ত নেই ।

কিংকর্তব্যবিমৃত হয়ে আবার সে প্রাঞ্চরের দিকে মুখ করলো,

কিন্তু সৈনিকের রক্তে ও শবে পলায়নও কঠিন হয়ে পড়েছে ।

মনুচেহেরের অস্তর ক্রোধে পূর্ণ করে —

দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে বসলেন ;

এবং অঙ্গে তুলে নিলেন যুদ্ধসাজ,

তারপর সৈন্যদলের পদধূলিতে আকাশ পূর্ণ করে এগিয়ে গেলেন ।

রোমের অধিপতির সম্মুখীন হয়ে মনুচেহের তাকে ডাক দিয়ে বললেন,  
হে অপয়া-অত্যাচারী !

তুমি রাজমুকুটের জন্য আপন ভাইকে হত্যা করেছিলে,

একটু এগিয়ে এসে রাজমুকুট লও ।

হে সিংহসনধারী, আমি তোমার জন্য রাজমুকুট বয়ে এনেছি,

সেই রাজকীয় বৃক্ষকে এসে আলিঙ্গন করো ।

মাহাত্ম্যের রাজমুকুট রেখে পালিয়ে যেয়ো না,

ফারেনুন তোমার জন্য এক নতুন সিংহসন তৈরি করে রেখেছেন ।

যে-বৃক্ষ তুমি নিজের হাতে রোপন করেছিলে তাতে ফল ধরেছে,

এসো, ফল এখন বুকে তুলে নাও ।

সেই ফল যদি কণ্টকপূর্ণ হয়, তবু সে তোমারই হাতের

রোপিত বৃক্ষের ফল

আর যদি রেশম হয় তবুও সে তোমারই ।

সংকীর্ণ গোরের মধ্যে তারাই তোমাকে মাহাত্ম্য দান করবে,

সমস্ত ভালো ও মন্দ এনে দিবে তোমার বুকের উপরে ।

এইরূপ বলতে বলতে মনুচেহের অশ্ব চালিত করে

তার মুখোমুখী এসে উপস্থিত হলেন ।

এবং সবেগে তার গ্রীবাদেশে তরবারির আঘাত করলেন,

সঙ্গে সঙ্গে সুলমের রাজকীয় তনু দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে গেলো।  
মনুচেহেরের আদেশে সৈন্যগণ সুলমের কর্তৃত মস্তক  
বশাশিরে গেঁথে উপরে তুলে ধরলো।  
বাদশার এই অস্তুত বাহবল দেখে  
সৈন্যরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলো।  
সুলমের সৈন্যরা ভয়ে  
ইতস্তত পলায়ন করতে লাগলো।  
তারা দলে দলে পথহীন পথে,  
বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের দিকে ছুটে চললো।  
এমন সময় এক বুদ্ধিমান ও বাক্-কুশল ব্যক্তিকে  
সৈন্যরা বললো,  
তুমি মনুচেহেরের কাছে গিয়ে  
আমাদের পক্ষে কিছু বলো।  
সেই ব্যক্তি তখন বাদশাকে বললো, আমরা সবাই বিজিত,  
আপনার আদেশ ও অনুশাসন আমাদের শিরোধার্য।  
আমরা শক্রতা নিয়ে যুদ্ধ করতে আসিনি,  
আমাদের বাদশার আদেশেই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি।  
সৈন্য রাখেই আমাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগমন,  
কোন রকম দ্রীষ্টি কিংবা শক্রতার বশবর্তী হয়ে নয়।  
এখন আমরা পুরোপুরি আপনারই দাস,  
আপনারই দয়া ও করুণার প্রার্থী।  
আমরা সমবেতভাবে মস্তক অবনত করছি আপনার সামনে,  
আমরা নিরপরাধ ও সেইভাবেই এখানে দণ্ডায়মান।  
বাদশা আদেশ করুন, কি তাঁর বাসনা, আমরা তাই করবো।  
আমাদের প্রাণ-মন এখন তাঁরই ইচ্ছার অধীন।  
বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই কথাগুলো  
বাদশা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।  
তারপর বললেন, আমার কামনা-বাসনা  
আমি ধূলায় নিক্ষেপ করেছি।  
বিশ্ব-প্রভুর পথে যা কিছু ভালো  
এবং শয়তানের পথে যা কিছু মন্দ —  
সব আমি আমার চোখের সামনে আনতে চাই,  
মন্দ দৈত্যদেরই দৃঢ়খের কারণ হোক।

যদিও তোমরা আমার শক্রভাবাপন্ন ছিলে,  
 এখন বস্তুভাবাপন্ন হয়ে থাক,  
 এবং আনুগত্যের প্রকাশ স্বরূপ পরিত্যাগ করে থাক অস্ত্র —  
 তবে পাপ থেকে উত্থিত হয়ে নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ঘ হও।  
 আজ ক্ষমার দিন,  
 হত্যা ও রক্তপাত থেকে মুক্ত করো তোমাদের শির।  
 মন্দ কাজ থেকে তোমরা তোমাদের হস্ত প্রক্ষালন করো,  
 জ্ঞানীগণ জ্ঞানের পথে বিচরণ করুন।  
 প্রেম ও ভালবাসার মন্ত্র উচ্চারণ করো সকলে  
 অঙ্গ থেকে দূর করো সকল যুদ্ধাস্ত্র।  
 জ্ঞান ও বিবেচনার পথ ধরো, ধর্মকে অবলম্বন করো,  
 অমঙ্গল ও অসুয়াকে পরিত্যাগ করো সর্বান্তকরণে।  
 তোমরা যে যেখানকার অধিবাসী —  
 তুরান, চীন কিংবা রোম যে-দেশেরই হও —  
 আনন্দের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করো  
 ও সেখানে গিয়ে সুখে বসবাস করো।

বাদশার এই ঘোষণা শুনে সকল সামন্ত  
 প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করলো সত্যনিষ্ঠ রাজার।  
 শিবিরের যবনিকাস্তরাল থেকে ঘোষিত হলো বাণী —  
 হে পৃত-হৃদয় বীরগণ,  
 আজ থেকে ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কেউ করো না শোণিতপাত,  
 কারণ, অন্যায় ও উৎপীড়নের ভাগ্য আজ থেকে অবনত হয়েছে।  
 সঙ্গে সঙ্গে চীনের সকল সংগ্রামী সেনা  
 তাদের শির অবনত করলো।  
 এবং পিশঙ্গ-নন্দনের সামনে এসে  
 পরিত্যাগ করলো তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম।  
 দলে দলে এগিয়ে এসে সৈন্যগণ বাদশার সামনে  
 পর্বতের মতো স্ফুটাকার করে দিল অস্ত্রের রাশি।  
 তাদের মধ্যে রয়েছে তুর্কী-বর্ম ও সাঁজোয়া,  
 রয়েছে প্রাস, গদা ও হিন্দুস্তানী তলোয়ার।  
 সর্বাধিনায়ক মনুচেহের তখন সামন্তগণকে  
 তাদের র্যাদা অনুযায়ী দান দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন।

## ফারেদুনের কাছে সুল্মের কর্তৃত শির প্রেরণ

যেসব দৃত বাইরে অপেক্ষা করছিল

সুল্মের কর্তৃত শির তাদের হাতেই সমর্পণ করা হলো ।

মনুচেহের এবার পিতামহের সমীক্ষায় লিখলেন এক লিপি,

তাতে বর্ণিত হলো যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা, যুদ্ধের কৌশল ও তার সফলতা !

প্রথমেই তাতে নিখিত হলো বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা,

তারপর স্মারণ করা হলো স্বনামধন্য সম্মাটের কথা ।

বিজয়-প্রদাতা বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা,—

তাঁরই কাছ থেকে লাভ করা যায় রাজৈশুর্য, কৌশল ও বীরত্ব ।

সকল ভালোমন্দই তাঁর নির্দেশের ফল,

সকল বেদনাও তাঁরই আদেশে প্রশমিত হয় ।

এখন বর্ষিত হচ্ছে তাঁরই থেকে সম্মাট ফারেদুনের উপর আশীর্বাদ,

কারণ তিনিই এখন জাগ্রত-চিত্ত ও জ্ঞানী সম্মাট রাপে

পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছেন ।

হে সম্মাট, অমঙ্গলের বক্রন-জাল আপনার হাতেই উন্মোচিত হয়,

বিশ্ব-প্রভুর মাহাত্ম্যের প্রতিচ্ছায়া বিস্মিত হয় আপনারই উপর ।

প্রাণের মৃষ্টা বিশ্ব-প্রভুর ইচ্ছায়

চীনের অশুরোহীদের শক্রতাকে আমি আকৃষ্ট করে নিয়েছিলাম ।

এখন সম্মাটের সৌভাগ্য-শক্তিতে

তাদের দুশক্তিকেই তছনছ করে দিয়েছি ।

সম্মাটের শক্তিতে সেই দুই অত্যাচারীকে

যারা পান করেছিল পিতৃরক্ত —

তাদের উভয়ের শির আমি কর্তন করেছি শক্রতার তলোয়ারে,

এবং ইম্পাত দ্বারা ধোত করেছি ধরিত্বার মুখ ।

এই লিপির পিছনে পিছনে আমি বায়ু বেগে প্রধাবিত হবো,

এবং সম্মাট-সমীক্ষায় এসে সব কিছু নিবেদন করবো ।

এইবার মনুচেহের শিরোয়াকে দুর্গাভিমুখে প্রেরণ করলেন,

শিরোয়া ছিলেন যেমন অভিজ্ঞ তেমনি বীর ।

মনুচেহের বললেন, দুর্গমধ্যস্থ সব সম্পদ আহরণ করবেন

এবং দৃষ্টি রাখবেন সেসব যেন প্রেরণ করা হয় সম্মাট-সমীক্ষায় ।

হস্তীপৃষ্ঠে বোঝাই করতে হবে সব ধনরত্ন,  
এবং সুসজ্জিত প্রদশনীরূপ তা দরবারে পাঠাতে হবে।  
অতঃপর মনুচেহেরের আদেশে নিনাদিত হলো দুন্দুভি,  
কাংস্য ঘণ্টা ও বিষাণ,  
তিনি রাজকীয় শিবির-অলিন্দ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।  
সৈন্য-বাহিনীকে নদীতীর থেকে প্রান্তর অভিমুখে পরিচালিত করা হলো,  
বিদেশ ছেড়ে মনুচেহের চললেন ফারেদুনের কাছে।  
মনুচেহের বাহিনী যখন তামেশায় প্রত্যাবৃত্ত হলো,  
তখন পৌত্রকে দেখার বাসনা প্রবল হলো পিতামহের মনে।  
সঙ্গে সঙ্গে দুগুশিরে শুক্ত হলো বিষাণের ধৰনি,  
এবং সৈন্যদল স্বস্থান থেকে বিচলিত হলো।  
সকল হস্তীপৃষ্ঠেই বিজয়ীর আসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে  
সকল-ভাগ্য সম্ভাট নির্দেশ দান করলেন।  
স্বর্ণ-শিবিকাণ্ডলিকে চৈনিক কিংখাব দ্বারা সজ্জিত করা হলো,  
সেগুলিতে ঝালরঞ্জপে দোদুল্যমান রইলো মুক্তারাজি।  
বিভিন্ন বর্ণের পতাকা উড়তে লাগলো,  
দুনিয়ার আকাশ লাল, হলুদ ও বেগুনী রঙে চিত্রিত হলো।  
গীলাং নদীর তীর থেকে মেঘের মতো  
সেই সৈন্যদল সারী অভিমুখে উড়ে চললো।  
স্বর্ণসাজে সজ্জিত অশু ও স্বর্ণকটিবন্ধপরা বীরবৃন্দ  
স্বর্ণ ঢালে বক্ষ আবৃত্ত করলেন।  
সেই সঙ্গে প্রভৃত সম্পদ ও মাতঙ্গদল সহ  
মনুচেহেরের প্রত্যুদ্গমনের ব্যবস্থা করা হলো।  
এইভাবে সম্ভাট ও সৈন্যদল আগমনকারী দলের নিকটবর্তী হলে,  
সম্ভাট ফারেদুন স্বীয় বাহন থেকে নীচে নেমে এলেন।  
পদব্রজে এগিয়ে চললেন সম্ভাট ও তাঁকে ঘিরে  
সিংহসদ্শ বীরবৃন্দ স্বর্ণসাজে সজ্জিত হয়ে অগ্রসর হলেন।  
সম্ভাটের সামনে ও পেছনে ইরানী বীরগণ  
দুরস্ত সিংহের মতো ধাবিত হলেন।  
সৈন্যদলের সম্মুখভাগে রয়েছে রণহস্তী ও শৃঙ্খলিত সিংহ,  
পেছনেও মদমস্ত হস্তীযুথ ও সাহসী বীরগণ।  
ওদিকে ফারেদুনের পতাকা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র  
মনুচেহের তাঁর সৈন্যদলকে কাতারবন্দী করলেন।

তরুণ নরপতি সঙ্গে সঙ্গে অশৃপ্তি থেকে অবতরণ করে অগ্রসর হলেন,  
মনে হলো, নববিধানের এই তরু যেন নবফলভাবে অবনত ।

তিনি মৃত্তিকা চুম্বন করে উচ্চারণ করলেন —

সম্মাটের সিংহাসন, মুকুট-শিরস্ত্রাণ ও অঙ্গুরীয়ের প্রশংসা ।

ফারেদুনের আদেশে উঠে দাঁড়ালেন মনুচেহের

ও পরম ভক্তিভরে চুম্বন করলেন তাঁর হস্ত ।

ফারেদুন পৌত্রসহ সিংহাসনে ফিরে এসে একজনকে বললেন,  
নুরীমান পুত্র সামকে দ্রুত এখানে আসতে বলা হোক ।

কারণ, সাম এইমাত্র হিন্দুস্তান থেকে ফিরে এসেছেন,

যুদ্ধশেষে তিনি প্রত্যাগত হয়েছেন সেই জাদুর দেশ থেকে ।

সেখান থেকে তিনি প্রভূত শৰ্ণ-সম্পদ এনেছেন,

যা এখন সম্মাটের সামনে পেশ করা হবে ।

শৰ্ণমুদ্রা ও মুক্তা তিনি যা এনেছেন তা হাজারের

পরিমাণে গণনা করতে হবে,

কারণ অন্য কোন গাণিতিক অঙ্গে তা হিসাব করা সম্ভব নয় ।

সাম সম্মাট-সমীক্ষে উপস্থিত হয়ে

তরুণ ও বর্ষীয়ান উভয় সম্মাটের গুণকীর্তন করলেন ।

সামকে দেখেই দুনিয়ার অধিপতি ফারেদুন

তাঁকে কাছে বসালেন ।

তারপর বললেন, আমার পৌত্রকে তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি,

কারণ, দুনিয়ার সরাইখানা থেকে আমার যাত্রার সময় হয়ে গেছে ।

তুমি সর্বকাজে তার সহায়ক হবে,

তোমার কৌশল ও দূরদর্শিতা কাজে লাগাবে তার সহায়তায় ।

এইবার সম্মাট স্থীয় পৌত্র মনুচেহেরের হাতখানি ধরে

জগদ্বিদ্যাত সেনাপতি সামের হাতে তুলে দিলেন ।

অতৎপর আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন,—

হে করুণাময় প্রভু, তোমার বণী সত্য ।

তুমি বলেছ, আমি ন্যায়পরায়ণ প্রভু,

অত্যাচারিত ও হতভাগ্য লোকের আমি সাহায্যকারী ।

আমিই করুণাময়, আমিই দান করি সহায়তা,

আমিই রাজাঙ্গুরীয় ও রাজমুকুটের প্রদাতা ।

হে প্রভু, আমার সকল বাসনা তোমার পদতলে উৎসৃষ্ট,

এখন আমার পরলোক-যাত্রা সহজ করে দাও ।

অধিক দিন আৱ এখানে থাকা আমাৰ জন্য প্ৰশংস্ত নয়,  
আমি আৱ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাই না।  
এমন সময় সেনাপতি শিরোয় সকল ধন-সম্পদ  
সম্ভাটেৱ সামনে সাজিয়ে এনে উপস্থিত কৱলো।  
সম্ভাট সকল সম্পদই সিপাহীদেৱ মধ্যে বণ্টন কৱে দিলেন,  
সে-দানেৱ সামনে দুদিন ধৰে নিষ্পত্ত হয়ে রইলো চন্দ্ৰ-সূৰ্য।  
অতঃপৰ সম্ভাটেৱ নিৰ্দেশকৰ্মে মনুচেহেৱ  
স্বৰ্ণ-সিংহাসনে গিয়ে বসলেন।  
সম্ভাট নিজ হাতে পৱিয়ে দিলেন পৌত্ৰেৱ শিরে তাজ,  
তাৱপৰ তাঁকে দান কৱলেন প্ৰচুৱ উপদেশ।

## ফারেদুনের মতু সম্পর্কে

মনুচেহেরকে সম্বাটপদে অভিষিঞ্চ করার পর থেকে

ফারেদুনের ভাগ্যে শেষের দিন ঘনিয়ে এলো,  
কেয়ানী-বৃক্ষের পাতাগুলি হয়ে এলো জীৰ্ণ ও পরিমুান।

ফারেদুন সিংহাসন ও রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে নির্জনে

স্থায়ী স্থান করে নিলেন,

তাঁর চিন্তায় সেখানে ভিড় করে এলো তিন রাজকুমার।

সারাক্ষণ তিনি অবোরে ক্রন্দন করতেন,

তাঁর দেহে প্রাণের শক্তি ক্ষীয়মান হয়ে আসছিল।

সারাদিন সেই স্বনামধন্য সম্বাট বিলাপে অতিবাহিত করতেন,

এবং বলতেন,—

আমার হৃদয় উজ্জ্বলকারী সেই তিন রাজকুমারের দুর্ভাগ্যে

আমার দিনগুলি অঙ্ককার হয়েছিল এবং ভাগ্য ফিরিয়েছিল মুখ।

হায় ! এখন নির্দয়ভাবে ওরা আমারই সামনে হত হয়েছে,

আমারই প্রতিশোধ কামনা ও তাদের ঈর্ষার কারণে।

তাদের মন্দ স্বভাব থেকে জাত হয়েছিল দুর্ক্ষর্ম,

ফলে যৌবনের উপর আপত্তি হয়েছিল অননুকূল ভাগ্য।

ওরা আমার নির্দেশ পালন করেনি,

তাই জগৎ সেই তিনজনের থেকেই মুখ ফিরিয়েছিল।

এইভাবে ক্রমে হৃদয়-রক্ত ঝরিয়ে ও চোখের জলে বুক ভাসিয়ে

ফারেদুন শেষ করে আনলেন তাঁর জীবনের দিনগুলি।

অবশ্যে রয়ে গেলো শুধু ফারেদুনের নাম,

দীর্ঘকাল ধরে তা জাগ্রত থাকবে মানুষের মনে ।

হে বৎস্য ! এমনই সুনাম ও ন্যায়পরতা দ্বারা

জীবনের ঝণকে পরিণত করো মুনাফায়।

পিতামহের মতুতে মনুচেহের খুলে রাখলেন তাঁর তাজ

এবং রক্তাঙ্গ পৈতাত্য স্থীর কঠিদেশ বক্ষন করলেন।

সম্বাটদের রীতি-অনুযায়ী তৈরি করালেন তিনি সমাধি,

স্বর্ণ, সূর্যকান্ত মণি ও জমরুদ পাথরে করা হলো তা বিখচিত।

সমাধি-গর্তে অতঃপর রাখা হলো হস্তীদস্তুনির্মিত শুভ সিংহাসন,

এবং সেই তথ্যের শিরোদেশে স্থাপিত করা হলো রাজমুকুট।

তারপর প্রথানুযায়ী মনুচেহের পিতামহের শবাধার বয়ে

শোভাযাত্রা করে এগিয়ে গেলেন সমাধির দিকে।  
সবশেষে বন্ধ করা হলো সমাধির দ্বার,  
ফলে ক্রম্বন্দরত পৃথিবী থেকে সম্মাট চিরদিনের জন্য  
বিযুক্ত হয়ে গেলেন।

পিতামহের শোকে সাত দিন অতিবাহিত করলেন মনুচেহের  
একদিন তাঁর চক্ষু ছিল জলভারানত ও গওদেশ পরিম্মান।  
সম্মাটের এই সপ্তাহব্যাপী শোকের সঙ্গে  
নগরী ও বিপণিরাজি ও শোকাভিভূত হয়ে রইলো।  
হে পৃথিবী ! তুমি দিতে পারো শুধু অনুশোচনা ও তাপ,  
কাজেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি তোমাকে নিয়ে উল্লাসে মন্ত হন।  
তুমি তরুণ বৃক্ষ সবাইকে আদরের সঙ্গে প্রতিপালন কর,  
তারপর যখন বিশ্ব-প্রভু তাদের নিয়ে যান,  
তখন তুমিই আবার সানন্দে তাদেরকে টেনে নাও তোমার মৃত্তিকায়।  
সম্মাট হোন কিংবা দাস,  
প্রত্যেক প্রাণকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয় এ-দুনিয়া থেকে।  
তখন দৃঢ় ও আনন্দ সবই স্বপ্নসম প্রতীয়মান হয়  
দুনিয়াকে চিরস্তন মনে করে তাই, দৃঢ় করো না।  
ভাগ্যবান সে-ই যার স্মৃতি সদাচারে পূর্ণ,  
সে দাস কিংবা সম্মাট যেই হোক না কেন।

## মনুচেহের

তাঁর রাজ্যকাল একশো বিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল

অতঃপর অতিবাহিত হলো একটি সপ্তাহ

যে সময়ের মধ্যে স্মাটের জন্য ছিল শুধু শোক ও বিলাপ।

অষ্টম দিনে স্মাট মনুচেহের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে

মাথায় তুলে নিলেন কেয়ানী তাজ।

ইন্দ্রজাল ও তুক্তাকের দ্বারণালি তিনি রুদ্ধ করলেন শক্ত হাতে,  
ফলে কাল তাঁর হাতে বেজে উঠলো বীগাতন্ত্রীর মতো,

পথিবী-বক্ষের সকল বীর-সেনাপতি এসে

উচ্চারণ করলেন তাঁর প্রশংসা-বাণী।

দুই সাম্রাজ্যের আধিপত্যসূচক মুকুট তিনি ধারণ করলেন,

এবং বিশুকে শোনালেন শুভ-সন্দেশ।

স্থীয় সৈন্যবাহিনী ও রাজ্যের উচ্চ নীচ সকলকে

সম্বোধন করে স্মাট বললেন, —

ধর্ম, দানশীলতা ও পৌরুষে

পবিত্রতা, সদাচার ও বুদ্ধিমত্তায়

আমি আবর্তমান আকাশের নীচে সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছি,

আমার ক্রোধ জন্ম দেয় যুদ্ধকে আর সেই সঙ্গে আমার করুণা

দানশীলতাকে অবারিত করে।

পথিবী আমার দাস এবং আকাশ আমার সহায়ক,

মুকুটধারী রাজন্যবর্গের শির আমার ঘণ্টায়।

আমি ধর্ম, আমি বিশ্ব-প্রভূর ঐশ্বর্যের ছায়া,

অশুভ শক্তি ও শুভভাগ্য দুইই আমার করায়ত।

অন্ধকার রাত্রি আমার জিঘাসাকে অনুসরণ করে,

আমার অশ্বাসনের নীচে আমি প্রজ্জ্বলিত করি অগ্নি।

আমি অমিত বলে ধারণ করি তলোয়ার, আমার পদদুয় মহিমামণ্ডিত

স্বর্গ পাদুকায় শোভিত।

আমি কাওয়ানী পতাকাকে দান করি বর্ণাত্যতা।

আমি সিংহাসনের আলো ও তেজস্কর অসির মালিক,

যুদ্ধের ময়দানে প্রাণকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।

সৌজন্যের আসরে আমার দুই হাত হয় সোতধারা,

আবার আমারই সিংহাসন থেকে অগ্নি-উচ্চাস নির্গত ধ্য

অন্যায়ের হাতকে আমি সঙ্কুচিত করি,  
এবং প্রয়োজনবোধে ধরিত্বাবক্ষকে করি রক্তরঞ্জিত।  
প্রহরণের আঘাত আমার থেকেই উৎসারিত হয়, রাজমুকুটের রশ্মি  
বিচ্ছুরিত হয় আমার থেকে,  
শুভ-সিংহাসনে বসেই আমি উজ্জ্বলিত করি সারা রাজ্য।  
এই সব গুণাবলী নিয়ে ও আমি অবস্থান করি দাসবৎ,  
আমি হস্তদ্বারা রোদনধারাকে স্পর্শ করি,  
আমি বিশ্ব-প্রভূর সমীপ থেকেই বহন করি সকল কাহিনী।  
তাঁর থেকেই আমি লাভ করেছি মুকুট-সিংহাসন, তাঁর থেকেই  
সৈন্যবাহিনী,  
তাঁর থেকেই লাভ করেছি প্রশংসা ও তার কাছেই আমার আশ্রয়।  
ফারেদুনকে অনুসরণ করেই আমি সৌভাগ্যের মুখ দেখেছি,  
যদিও আমার পিতামহ ছিলেন প্রবীণ আর আমি নবীন।  
দুনিয়ার এই সপ্তরাজ্য যারাই বিপথে গমন করে  
ধরিত্বাকে দান করে দৃঢ়খ ;  
এবং দরিদ্রের জন্য হয় বিপদের কারণ ;  
আর স্থীয় আত্মীয়-স্বজনকে দেখে দীর্ঘার চোখে,  
তারা সবাই আমার কাছে অবিশ্রাসী কাফেরের অনুরূপ  
এবং শয়তান থেকেও তারা অধিক দুষ্ট ।  
এই সব দুষ্ট প্রকৃতির লোক ধর্ম বিশ্ব-প্রভু স্বয়ং  
ও আমার থেকে লাভ করছে ধিক্কার।  
আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রসারিত করেছি আমার হাত ;  
এবং ধরিত্বাকে সম্পূর্ণরূপে ধোত করেছি অন্যায় থেকে।  
এই কথা শুনে সকল সেনাপতি সুউচ্চে কীর্তন করলেন  
মনুচেহেরের প্রশংসা এবং বললেন,—  
হে মঙ্গলকামী সম্রাট, অপনার পিতামহও ছিলেন ভাগ্যবান,  
তিনিই আপনাকে দিয়ে গেছেন প্রশাসন, সিংহাসন ও রাজমুকুট।  
মহামান্য সম্রাটদের সিংহাসন আপনার জন্য চিরস্থায়ী হোক,  
চিরস্থায়ী হোক ঈশ্বর-প্রদত্ত ঐশ্বর্য ও রাজমুকুট।  
আমাদের হাদয় সম্পূর্ণভাবেই আপনার আদেশের অনুগত,  
আপনার নির্দেশের অধীনেই আমরা উৎসর্গ করেছি আমাদের প্রাণ।  
এমন সময় বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতি সাম উঠে দাঁড়ালেন,  
এবং সম্রাটকে সম্মোধন করে বললেন, হে সত্যসন্ধি শাহিনশাহ !

আমার এই দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে সম্মাটদের,  
আপনার থেকে তাঁরা কেউ বদান্যতায় অধিক নন।  
পিত্তপুরুষ-পরম্পরায় ইরানের সম্মাট আপনিই,  
সিংহ-পুরুষদের মধ্যে আপনি অবশ্যই সুনির্বাচিত।  
আপনার দেহ-আত্মার রক্ষক হোন বিশ্ব-প্রভু,  
আপনার অস্তর আনন্দিত থাকুক, ভাগ্য হোক জাগ্রত।  
আপনি প্রাচীন শৌর্য ও ঐশ্বর্যের স্মৃতি,  
এই কেয়াণী সিংহাসনের উপর আপত্তি হোক অভয়।  
হে সম্মাট, যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি অপরাজিত সিংহ,  
এবং আসরে আপনি সমুজ্জ্বল সূর্য।  
কাল ও মৃত্তিকা আপনার পায়ের ধুলা হোক,  
বিজয়-চিহ্নিত সিংহাসন আপনার উপবেশন।  
হিন্দুস্তানী তরবারি দ্বারা যখন আপনি ধরিত্রী বিধোত করবেন,  
তখন প্রজাকুল অবস্থান করবে নিশ্চিত শাস্তির ক্ষেত্রে।  
আজ থেকে রণক্ষেত্রেই হবে আমার কর্মক্ষেত্র,  
যাতে আপনার সিংহাসনের চারপাশে বিরাজ করে আনন্দিত  
আসর ও শাস্তি।

আমার পিত্তপুরুষ সবাই ছিলেন সম্মাটের সেনাপতি,  
তাঁরা ছিলেন সম্মাট ও সামন্তদের রক্ষক।  
গারশাস্প থেকে খ্যাতিমান নুরীমান পর্যন্ত —  
তাঁরা সবাই ছিলেন সেনাপতি ও তরবারিধারী।  
পৃথিবীর দিকে দিকে আমি ভ্রমণ করেছি ও বিস্তার করেছি প্রভুত্ব  
শক্তির প্রতিপত্তিজাল অঙ্গসই আমাকে অভিভূত করেছে।  
সেনাপতির পদ আমাকে দান করেছিলেন আপনার পিতামহ,  
তাঁর শক্তিদের বিরক্তে আমি সর্বদা কটিদেশ বন্ধন করে রেখেছি।  
এই কথা শুনে সম্মাট প্রচুর প্রশংসায় উদ্দীপিত করলেন সামকে,  
এবং তাঁকে রাজকীয় উপটোকনে করলেন সজ্জিত।  
অতঃপর সাম যথারীতি সিংহাসনের সামনে থেকে বিদায় নিয়ে  
অন্যান্য সেনাপতির সঙ্গে অশুরোহণে প্রস্থান করলেন।  
এইবার সম্মাটও ধীরে ধীরে তাঁর শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হলেন,  
সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর আইন ও প্রশাসন ক্রমে বিস্তৃত হতে লাগলো।

## জালের জন্মের বৃত্তান্ত

এখন প্রাচীনকালের কাহিনী থেকে  
এক রহস্যপূর্ণ কাহিনী আমি বিবৃত করবো।  
হে বৎস, দেখ কাল সামের উপর  
কি লীলা প্রকটিত করে? মন দিয়ে তা শোন।

সামের কোন সন্তান ছিল না  
তাঁর হৃদয়ে সন্তানের কামনা ছিল প্রবল।  
তাঁর অস্তঃপুরে ছিল পরম সুন্দরী এক নারী,  
সে-নারীর গওদেশ ছিল গোলাপ-পাপড়ি ও কেশরাজি ঘনক্ষণ্ণবর্ণ।  
এই চন্দ্রমুখী ছিল সন্তান-সন্তোষা,  
তার মুখ থেকে বিকীরিত হতো সূর্যরশ্মি, কারণ সন্তান জন্মের  
দিন নিকটবর্তী হয়ে আসছিল।

নুরীমান পুত্র সামের সন্তানই ছিল তার উদরে,  
তারই ভারে দেহ তার আজ এমন আনন্দ।  
কিছুদিন পরেই ম.ত.-উদর থেকে ভূমির্ষ হলো এক শিশু,  
ভূবন-উজ্জ্বল কণা সূর্যের মতো তার রূপ।  
প্রভাতের সৌন্দর্য ও সন্তাবনা যেন তার মুখাকৃতিতে,  
কিন্তু তার মাথার চুল সব সাদা।  
মাত্রগৰ্ভ থেকে যখন এমন আস্তুত শিশুর জন্ম হলো এক শিশু,  
তখন এক সপ্তাহ ধরে এ সংবাদ গোপন রাইলো সামের কাছে।  
সুবিখ্যাত বীরের শয়নকক্ষে  
সবাই এসে দেখে গেলো শিশুকে  
কিন্তু সামের কাছে কেউ একথা বলতে সাহস করলো না যে,  
আপনার সুন্দরী পান্তীর গর্ভে জাত হয়েছে এক বৃক্ষ সন্তান।  
অস্তঃপুরে এক ধাত্রী ছিল, সিংহের সাহস নিয়ে সে  
সেনাপাত্রের সামনে গিয়ে হাজির হলো,  
এবং তাঁকে জানালো তাঁর পুত্র-জন্মের সুসংবাদ,  
আর সেই সঙ্গে মুক্তকষ্ঠে উচ্চারণ করলো তাঁর প্রশংসা।  
বললো, আজকের দিন শুভ হৈক বীরবর সামের জন্য,  
তাঁর অমদ্দলকামীদের প্রাণ ধ্বংস হোক।

আপনি যেমন কামনা করতেন, তাই এসেছে বিশ্ব-প্রভুর  
সমীপ থেকে,  
তিনি আপনার আকাঙ্ক্ষা পরিপূরিত করে আপনাকে  
করেছেন সুসংজ্ঞিত।

হে যশস্বী, আপনার অন্তঃপুরে,  
আপনার চন্দ্রমুখী ভার্যার গভৰ্ণ জাত হয়েছে এক পবিত্র পুত্র ;  
সিংহ-প্রাণ এক বীরশিশু যেন  
সানন্দে সেই পুত্রের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন।

তার দেহ বজতের মতো ও মুখমণ্ডল বসন্তের অনুরূপ,  
তার দেহে কোন অমঙ্গলের চিহ্ন আপনি দেখতে পাবেন না।

দোষের মধ্যে দোষ শুধু একটি, শিশুর চুল সব সাদা,  
হে যশস্কাম, একে আপনি বিশ্ব-প্রভুর উপহার বলে গণ্য করুন।

এই দান নিশ্চয় আপনার মনঃপুত হবে,  
এ-জন্য আপনি অক্তজ্ঞ হবেন না, কিংবা মন খারাপ করবেন না।

সংবাদ শুনে সাম অবতরণ করলেন স্বীয় আসন থেকে,  
এবং অন্তঃপুরে নব বসন্তের আগমন প্রত্যক্ষ করতে অগ্রসর হলেন।

এসে দেখলেন, তাঁর এক বৃক্ষ পুত্র হয়েছে,  
এমন শিশু না তিনি কখনো দেখেছেন, না কোথাও শুনেছেন এমন কথা।

শুভক্রেশ সন্তানকে দেখে  
সাম দুনিয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন।

ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পিত হতে লাগলো,  
ফলে, প্রজ্ঞার পথ থেকে সরে গেলো তাঁর মন।

তিনি আকাশের দিকে মাঝা উচু করে  
এমন সন্তান থেকে বিশ্ব-প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন ;

বললেন, হে প্রভু, আপনি ন্যূনতা বক্রতা থেকে পবিত্র,  
আপনি ইচ্ছ করলে প্রাচুর্য থেকে আনয়ন করতে পারেন মঙ্গল।

যদি আমি কোন বড় রকমের পাপ করে থাকি,  
কিংবা অজ্ঞানিতভাবে গ্রহণ করে থাকি আহারিমনের ধর্ম,  
তবে হে বিশ্ব-স্বষ্টা, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন,

এবং সংগোপনে অভিষিক্ত করবেন আমাকে আপনার কর্ম্মার দ্বারা।

আমার সারা দেহে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে তপ্ত শোণিত।

---

আহরিমনের প্রতিশব্দ শয়তান।

আমার সারা দেহে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে তপ্ত শোণিত।  
 হে খোদা, এ-শিশু আহরিমনের বাচার অনুরূপ,  
 তার অক্ষিতারা কঢ়বর্ণ কিন্তু চুল সম্পূর্ণ সাদা।  
 যখন বীরগণ আগমন করবেন,  
 এবং এসে জিজ্ঞাসা করবেন এই অমঙ্গলচিহ্নিত শিশু সম্পর্কে  
 - তখন আমি কি বলবো? কার সন্তান বলে নির্দেশ করবো তাকে?  
 সে যে দুরঞ্জ বাঘের মতো, কিংবা দৃষ্টাত্মা পরীদের অনুরূপ!  
 দুনিয়ার অভিজ্ঞাতগণ তখন আমার উপর হাস্য করবেন,  
 উপহাসের সঙ্গে এই শিশুর অস্তর-বাহিরে করবেন দৃষ্টিপাত।  
 সুতরাং, এই কলঙ্ক পরিহার করার জন্য, হে প্রভু আমি  
 ছেড়ে যাবো ইরানভূমি,  
 তারপর আর কোনদিন এদেশে ফিরবো না।  
 এইকথা বলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হলেন নিজের দিকে ও  
 ক্রোধে আগ্নিবর্ণ হলেন,  
 এবার শুরু হলো নিজের সঙ্গে তাঁর প্রশ়্নাত্তর।  
 অবশেষে, স্বীয় গৃহরক্ষীকে ডেকে সাম শিশুটিকে  
 তুলে নিতে বললেন,  
 এবং আদেশ করলেন লোকালয় থেকে দূরে  
 কোথাও তাকে ফেলে আসতে।  
 আলবুর্জ নামে এক পাহাড় ছিল —  
 মানুষের আবাস থেকে দূরে, সূর্যের কাছাকাছি।  
 সেই পর্বতের উপরে ছিল সীমোরগের ॥ নীড়,  
 মানুষ সেই নীড় সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অনবিহিত।  
 আলবুর্জের সানুদেশেই গৃহরক্ষী শিশুকে রেখে এলো,  
 তারপরে এখানেই কাটিবে তার দীর্ঘকাল।  
 খ্যাতিমান সেনাপতির নিষ্পাপ শিশু —  
 সাদা-কালোর পার্থক্যটা যে জানতো না,  
 তার থেকেই পিতা ছিন্ন করে নিলেন তাঁর বাঃসল্য ও  
 তাকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করলেন,  
 নির্জনে পরিত্যক্ত সেই শিশুর ভায় গ্রহণ করলেন  
 তখন স্বয়ং বিশু-প্রভু।

০০ প্রবাদোক্ত এক বিরাট পাখী।

এইভাবে শিশুকে পরিত্যাগ করে সাম সৃষ্টি করলেন এক কাহিনী,  
 যাকে তখন মাতৃদুগ্ধ দ্বারা পরিত্পূর্ণ করার কথা ছিল।  
 সাম বললেন, যদি আমি তোমাকে দান করতাম আমার বক্ষ-রক্ত,  
 তবে তার জন্য কোন প্রশংসনও কামনা করতাম না।  
 কিন্তু বস্তুত দুনিয়ার যে-কোন পশুপাখিও  
 স্থীয় সন্তানের প্রতি সামের চেয়ে অধিক সন্তুষ্টরায়ণ।  
 অসহায় শিশু অরক্ষিতভাবে  
 সেখানেই পড়ে রাখলো।  
 সে তার মুখে তুলে নিলো স্থীয় অঙ্গুষ্ঠ ও তাই চুষতে লাগলো,  
 তার চিংকারে বনভূমি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো।

একদিন সীমোরগ তার শাবকদের ক্ষুধার্ত দেখে  
 খাদ্যের অন্বেষণে আকাশে উড়ৌয়মান হয়েছে,  
 এমন সময় সে দেখলো, একটি দুধের শিশু কাঁদছে,  
 তার কান্নায় মাটির বুক নদীর মতো উচ্ছসিত হচ্ছে।  
 পাথর তার দোলনা, মাটি তার ধাত্রী,  
 তনু তার দিগন্বর এবং ওষ্ঠাধর দুধের অভাবে পরিশুষ্ক।  
 পাথুরে মাটির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শিশুটি,  
 তার মাথার উপর ধীরে উন্নীত হচ্ছে খরতাপ সূর্য।  
 যদি সে শুপদ-শাবক হতো  
 তবে সূর্য থেকেই সে পেতে পারতো তার প্রয়োজনীয় আবরক।  
 কিন্তু সে যে মানব-সন্তান,  
 প্রকৃতির আদুরে দুলাল।  
 বিশু-প্রভূর ক্ষণায় সিঞ্চ হলো সীমোরগের মন,  
 শিশুটিকে তার খাদ্যরাপে গ্রহণ করলো না !  
 সীমোরগ এইবার মেঘের দেশ থেকে পাখা বিস্তার করে নেমে এলো,  
 ও শিশুটিকে তুলে নিলো তপ্ত পাথরের উপর থেকে।  
 আলবুর্জ পাহাড়ের চূড়ায় ছিল তার নীড়,  
 সে নীড়েই সে শিশুটিকে নিয়ে গেলো।  
 সীমোরগের বাচ্চাগুলি শিশুটিকে মগয়া মনে করে  
     শুরু করে দিলো চেঁচামেঁচি,  
 ও লোভাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কিন্তু বিশ্ব-প্রভু যার রক্ষক,  
 কে তার অনিষ্ট করতে পারে ?  
 এই সময় সীমোরগ আকাশবাণী শুনতে পেলো,  
 সে-বাণী যেন তাকে বলছে, হে ভাগ্যবতী পাখি,  
 তুমি এই দুগ্ধপাপী শিশুকে প্রতিপালন করো,  
 এই মানব-শিশু তোমারই সন্তুষ্টকোড়ে বর্ধিত হোক !  
 এক বীরপূরুষের ওরসে তার জন্ম,  
 বিশ্ব-বিখ্যাত সেনাপতিদের বৎশোষ্টৃত সে।  
 এই পাহাড়ে আমরা তাকে সমর্পণ করলাম,  
 দেখো, সময়ের আবর্তনে কি সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত ইয়।  
 সীমোরগ তখন শাবকদের সঙ্গে শিশুটির দিকে দৃষ্টিপাত করলো,  
 করশায় তার চোখ থেকে ঝরে পড়লো অশ্রু।  
 সকল স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তারা তাকে গ্রহণ করলো,  
 বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে রাখলো সেই সুবিদনা শিশুর উপর।  
 সীমোরগ যেসব প্রাণী শিকার হিসেবে ধরে আনতো  
 তার মধ্যে সবচাইতে নরম ও সহজপায় শিকারটিকে  
 নির্বাচন করতে শিশুটির জন্য,  
 ..... অতিথিও দুধের পরিবর্তে রক্ত চেটে চেটে থেতো।  
 এইভাবে অতীত হয়ে চললো দিনের পর দিন,  
 শিশুটি সীমোরগের নীড়ে বড় হতে লাগলো।  
 অবশেষে সেই ছোট শিশু যখন যৌবনের সীমায় পা বাঢ়ালো,  
 তখন ওই পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে যাতায়াতকারী  
     কয়েকটি যাত্রীদল তাকে দেখতে পেলো।  
 তারা দেখলো সেখানে ঘুরে বেড়ায় এক মুক্ত পুরুষ —  
 তার চুল সাদা ও কোমর সিংহের মতো ক্ষীণ !  
 উন্নতশির দেবদারুর মতো ঝজু সে, তার মুখ  
     যৌবনের সমারোহে ফুল্ল,  
 এবং তার অবয়বে সেনাপতি সামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের  
     সাদৃশ্য প্রকট রয়েছে।  
 সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এই সংবাদ,  
 ভালোমন্দ কোনটাই গোপন থাকে না দুনিয়ায়।  
 সাম-নুরীমানের কাছে এই সংবাদ পৌছলো,  
 তিনি শুনতে পেলেন তাঁর ভাগ্যবান পুত্রের ঐশ্বর্যের কথা।

## সাম পুত্রের অবস্থা স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন

এক রাত্রে সাম অন্তরে দৃঢ়খের কালিমা নিয়ে সুপ্ত ছিলেন,  
কালের আবর্তনে বিশাদে পূর্ণ ছিল তাঁর মন ।

তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এক অশুরোহী পুরুষ  
হিন্দুস্তান থেকে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে সামের সমীপে এসে  
উপস্থিত হয়েছে ।

সেই পুরুষ উন্নতশির, পথাতিক্রমণের ফলে  
তার সারা দেহ ধূলিমলিন হয়ে আছে ।

সেই সামকে তাঁর ভাগ্যবান পুত্রের সংবাদ দিলো,—  
বললো, তাঁরই দেহ-তরুণ সেই শাখার কথা যা আজ  
ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠেছে ।

নিদ্রা ভঙ্গ হলে সাম জ্ঞানীদের ডেকে পাঠালেন,  
যাতে সকল কথা তাদের কাছে খুলে বলা যায় ।

জ্ঞানীদের কাছে সাম স্বপ্ন-বৃত্তান্ত  
ও যাত্রীদলের কাছে যা শুনেছেন সব বর্ণনা করলেন।  
বললেন এই কাহিনীর সঙ্গে আপনাদের জ্ঞান কি কোন  
সামঞ্জস্য খুঁজে পায় ?

সেই শিশু কি প্রচণ্ড শীত ও দারুণ গ্রীষ্মের তাপ সহ্য করে,  
এখনও বেঁচে আছে ?

প্রশ্ন শুনে জ্ঞানীদের মধ্যে যুবক বৃক্ষ নির্বিশেষে  
সবাই সেনাপতিকে বললেন,—

যে-লোক বিশ্ব-প্রভুর প্রতি অক্তত্ত্ব,  
কোন কাজেই সে কল্যাণ দেখতে পায় না ।  
পাথরের উপর কিংবা মাটিতে, সিংহ কিংবা বাধের সঙ্গে  
জলের মধ্যে কিংবা কুণ্ঠীরের সহবাসে —

সর্বত্রই সকলের দ্বারা শিশুর প্রতিপালন সম্ভব,  
কারণ, সকল স্থানেই পরিকীর্তিত হয় বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা ।  
আপনি ভঙ্গ করেছেন কল্যাণের প্রতি আপনার

করণীয় অঙ্গীকার,  
আপনি নির্দোষ শিশুকে পরিত্যাগ করেছেন ।  
তার সাদা কেশ দেখে আপনি হৃদয় পূর্ণ করেছেন বিরাগে,

অথচ পবিত্র শিশু নিষ্কলঙ্ক ছিল।  
দেখুন, সে জীবিত নেই এমন কথা আর উচারণ করবেন না,  
বরং তার অনুষ্মণে এখনই কোমর বাঁধুন।  
বিশু-প্রভু যার রক্ষক,  
শীত-গ্রীষ্ম তাকে ধ্বন্স করতে পারে না।  
অবিলম্বে ক্রত্কর্মের জন্য বিশু-প্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হোন,  
কারণ তিনি দান করেন মঙ্গল ও তিনিই পথ দেখান।

রাত্রে সাম আবার স্বপ্ন দেখলেন,  
তাঁর মনের চিঞ্চা যেন রূপ ধরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।  
দেখলেন, হিন্দুস্তানের কোন এক পাহাড়ে  
উন্নীত রয়েছে একটি উজ্জ্বল ধ্বজা।  
সহস্র এক সুদর্শন দাস এসে সেখানে উপস্থিত হলো,  
তার সামনে পেছনে বিরাট সৈন্যদল।  
সে-লোকের বামে একজন পুরোহিত।  
ডান দিকে এক যশস্বী দাশনিক।  
তাঁদের মধ্যে থেকে একজন সামের দিকে এগিয়ে এসে  
পরুষ বাকে তাঁকে সম্মোধন করে বললেন,—  
হে উদ্বিত অপবিত্র পুরুষ,  
তুমি তোমার চোখ থেকে ধূয়ে ফেলেছ বিশু-প্রভুর প্রতি  
সকল সংকোচ।  
তাই তোমার বীরত্বের মুখে ছাই দিয়ে,  
তোমার ছেলেকে প্রতিপালন করেছে এক পাখি।  
সাদা চুল যদি মানুষের জন্য কলক হয়,  
তবে তোমার শৃঙ্খলাজির দিকে একবার চেয়ে দেখ না কেন?  
সাদা আর কালো দুই-ই বিশু-প্রভুর দান,  
হে নিষ্ঠুর, সেই দান তুমি অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছ।  
বিমুখ হয়েছ তুমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি,  
তাই তোমার প্রকৃতিতে নিত্যনতুন রঙের পরিবর্তন।  
মনে রেখো, তুমি যে-পুত্রের উপর নিষ্ঠুর হয়েছিলে,  
তাকে প্রতিপালন করেছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা।  
তাকে তিনি দান করেছেন অধিকতর স্নেহময়ী এক ধাত্রী,  
সেই স্নেহের সামনে তোমার ভালোবাসা তুচ্ছ হয়ে আছে।

স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যেই এক বিকট চিংকার দিলেন সাম,  
যেন ক্রুদ্ধ সিংহ জালে আবদ্ধ হয়েছে।  
ঘুম থেকে উঠে তিনি জ্ঞানীদের ডাকলেন,  
এবং সৈন্যাধ্যক্ষদের জড়ে করলেন।  
তারপর কালবিলম্ব না করে সকলকে নিয়ে যাত্রা করলেন  
সেই পর্বতের দিকে,  
পরিত্যক্ত পুত্রের কামনা এইবার মনে প্রবল হলো।  
যথাস্থানে এসে সাম দেখলেন, সপ্তমিমণ্ডলে মাথা তুলে  
দাঁড়িয়ে আছে এক পর্বত,  
যেন আকাশ থেকে নিয়ত সে পেড়ে আনছে গ্রহ-নক্ষত্র।  
পর্বত-শিখরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক নীড়,  
শনি গ্রহ থেকে আনীত আবলুস, চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ দিয়ে  
তৈরি করা হয়েছে সেই নীড়।  
কঠিন পর্বতোপরি সেই নীড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন সাম,  
এবং প্রকস্পিত বিশ্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন তার নির্মাণ-কৌশল।  
সেখানে যে-যুবককে তিনি বিচরণ করতে দেখলেন,  
আকৃতিতে সে তাঁরই মতো ; ঘুরে ঘুরে সে নীড় পাহারা দিচ্ছে।  
এই দৃশ্য দেখে সাম উচারণ করলেন বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা,  
এবং তাঁর উদ্দেশে মৃত্তিকা চূবন করলেন।  
তিনি বিশ্মিত হয়ে ভাবলেন, বিশ্ব-প্রভু পাহাড়ে এমন পাখিও  
সৃষ্টি করেছেন,  
যার মণ্ডক উন্নীত রয়েছে সুরাইয়া তারার উর্ধ্বে।  
তিনি বুঝালেন, সেই দয়ালু পাখিই এখানকার রাজা,  
মহত্ত্বমগণের চেয়েও যে মহৎ ও শক্তিশালী।  
এইবার তিনি নীড়ে যাওয়ার পর অনুসর্কানে ব্যস্ত হলেন,  
কিন্তু পথ কোথায় ? শূপদ ও হরিণাদি চতুর্সুদে  
পরিপূর্ণ এই স্থান।  
কিংকর্তব্যবিমৃঢ় সাম তখন বিশ্ব-প্রভুর উদ্দেশে  
উচারণ করলেন প্রশংসা ;  
তাঁকে সম্মোধন করে বললেন, হে স্থান ও কালের বহির্ভূত প্রভু !  
তোমার আলোকেই হৃদয় আলোকিত হয়, চন্দ্ৰসূর্য তোমার থেকেই  
লাভ করে দীপ্তি।  
মার্জনার জন্য তোমারই দরবারে আমি মণ্ডক অবনত করছি,

তোমার ভয়ে প্রাণ আমার বিভাসিত ।  
প্রভু হে, এই সন্তান যদি আমারই ঔরসজ্ঞাত হয়,  
কোন সম্পর্ক যদি তার না থাকে শয়তানের সঙ্গে,  
তবে দয়াময় ! তুমি তোমার দাসের হাত ধরে তুলে নাও উপরে,  
এবং তার পাপাসক্ত অস্তরে দান করো শাস্তি ।  
তোমারই অপার করুণায় ফিরিয়ে দাও আমাকে  
আমার পরিত্যক্ত সন্তান ।  
মার্জনা ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই  
তা সৃষ্টিকর্তার দরবারে গৃহীত হলো ।

এই সময় সীমোরগ পাহাড়ের উপর থেকে  
নীচে দৃষ্টিপাত করে  
সাম ও তাঁর দলবলকে দেখতে পেলো ।  
সে বুঝতে পারলো, সেনাপতি তাঁর পুত্রের খৌজেই  
এখানে এসেছে,  
সীমোরগের অন্বেষণ তাঁর কাম্য নয় ।  
সীমোরগ তখন সামের পুত্রকে ডাক দিয়ে বললো,  
ওগো দীঘিদিনের নীড়বাসের দুঃখ সহনকারী !  
আমি তোমার প্রতিপালনকারী ধাত্রী,  
স্নেহ আর সৌজন্যের সঞ্চয় ।  
আমি তোমাকে সেই কাহিনী<sup>১</sup> নামেই সম্বোধন করছি,  
তোমার পিতা যে-কাহিনীকে করেছিলেন সংক্ষিপ্ত ।  
এই নামই তোমাকে দান করবে তোমার যোগ্য আসন,  
এবং তোমাকে দেখাবে বীরত্ব ও মহেন্দ্রের পথ ।  
ওই দেখ তোমার পিতা, বীরশ্রেষ্ঠ সাম ।  
নিজ পুত্রের সঙ্কানে তিনি পর্বতে এসেছেন  
সসম্মানে তাঁকে তুমি সংবর্ধনা করো ।  
তাই হবে তোমার পক্ষে সৌজন্যের প্রকাশ ;  
তোমাকে নিরাপদে তাঁর হাতে সমর্পণ করাই আমি আমার  
কর্তব্য বলে মনে করি ।  
সীমোরগের মুখে এই কথা শুনে

\*\*\* সীমোরগ শিশুর নাম রেখেছিল দাত্তান বা কহিনী।

যুবক হৃদয়ে বেদনা বোধ করলো, তার চক্ষু হলো বাঞ্ছাকুল।  
যুবক যদিও কখনও মানুষ দেখেনি,  
তবু কথা বলার রীতি সে সীমোরগের কাছেই শিখেছিল।  
স্পষ্ট ও বিবিত্ত স্বরে বলতো সীমোরগ,  
প্রচুর বুদ্ধি ছিল তার, প্রাচীন দিনের কথাও তার জানা ছিল।  
এই পাখির ভাষা, বুদ্ধি ও জ্ঞান ছিল পরিপক্ষ,  
কারণ, সর্বদা সে বিশ্ব-প্রভুর আনুকূল্য কামনা করতো।  
সাম দূরে থেকে দেখলেন, ‘কাহিনী’ যেন সীমোরগের কাছে  
                            কিছু বলছে,  
নিজের পুত্র ও পাখিকে একত্রে দেখে আশার আলো  
                            চমকালো সামের মনে।

‘কাহিনী’ বললো তোমার নীড় আমার আলোকিত গহ,  
তোমার পাখাদ্বয়ই আমার মুকুটরূপী ঐশ্বর্য।  
বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসার পরেই তোমার প্রশংসা,  
তুমিই আমার কঠিন দিনগুলিকে করেছিলে সহজ ও সাবলীল।  
জবাবে পাখি বললো, যদি মানবীয় মুকুট ও সম্মান  
                            তোমার লাভ হয়,  
এবং কেয়ানী রাজপ্রাসাদে তুমি করতে পার অবস্থান;  
তবে এই নীড়ের আর প্রয়োজন নেই,  
সম্পদ ও সংস্কৃতির মধ্যেই তুমি চিরকাল অবস্থান করবে।  
কালের হাত থেকে তুমি ভাগ্যের এই সুযোগ গ্রহণ করো,  
স্নেহ-সৃত্র কেটে তোমাকে আমি দূর করে দিচ্ছি বলে  
                            মনে করো না।

আমি তোমাকে রাজত্বের পথে এগিয়ে দিয়ে আসছি,  
আমার কাছে থাকার চেয়ে ওখানে যাওয়া  
                            তোমার জন্য মঙ্গলতর।

তুমি আমার দেহ থেকে একটি পালক নিয়ে যাও,  
মনে করো, আমারই পাখার ছায়ায় তুমি রয়েছ।  
যদি তোমার কোন বিপদ দেখা দেয়,  
ভালোমন্দ কোন কারণ ঘটে কিংবা কারো সঙ্গে বচসা হয়,  
তবে আমার সেই-পালক আগুনে ধরো,  
সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রেতে তুমি দেখতে পাবে।  
আমারই পাখার ছায়ায় তোমাকে আমি প্রতিপালন করেছি,

আমার শাবকদের সঙ্গে একই মমতায় বড় করেছি।  
 দেখবে, আগুনে পালকটি ধরতেই চক্ষের নিম্নে  
     কালো মেঘের মতো এসে উপস্থিত হবো,  
 এবং তোমাকে নিরাপদে এখানে নিয়ে আসবো।  
 বৎস্য, তোমার এই হতভাগ্য ধাত্রীর কথা বিস্মিত হয়ে না,  
 আমার অস্তরে তোমার স্নেহমুখ সর্বদা জ্ঞাত থাকবে।  
 এইরূপে সাঙ্গনার পর সীমোরণ তাকে নিয়ে  
     মেঘের উপরে উজ্জীব হলো ;  
 তারপর উড়ে এসে সামের কাছে মাটিতে তাকে রাখলো  
 সাম পুত্রের মন্তক স্বীয় বুকে ধারণ করলেন।  
 তার সুগঠিত দেহ ও সুন্দর মুখ দেখে  
     কাঁদতে শুরু করলেন সাম।  
 তারপর সীমোরণের সামনে মাথা নত করে  
     বীরবর উচ্চারণ করলেন তার প্রশংসা।  
 বললেন, হে পক্ষীকুলের রাজা,  
 আপনার বদান্যতার দান এই স্বাস্থ্য, শক্তি ও জ্ঞান।  
 আপনি অসহায়গণের রক্ষক,  
 আপনার মঙ্গলময় রাজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত।  
 আপনার অমঙ্গলকামিগণ পরাভূত হোক !  
 আপনার শক্তি লাভ করুক চিরযৌবনের সাক্ষাৎ।  
 এইবার সীমোরণ ফিরে যাওয়ার জন্য আকাশে উজ্জীব হলো,  
 দেখতে দেখতে সাম ও তাঁর সৈন্যদলের সামনে থেকে  
     সে অদ্ভ্য হয়ে গেলো।

সাম পুত্রকে আপদমন্তক চেয়ে দেখলেন,  
 তিনি নিশ্চিত হলেন, এই তরুণ তাজ ও তথ্ত্বের উপযুক্ত।  
 তার বাহুদুয় সিংহের মতো, মুখ সূর্যসদৃশ,—  
     বক্ষদেশ বীরতুল্য ও হাত তলোয়ার সন্ধানী।  
 তার পক্ষরাজি সাদা কিন্তু চোখ দুটি ভোমরা-কালো,  
 তার ওষ্ঠাধর ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ।  
 শুন্দ কেশ ব্যতীত আর কোন কৃতি তার নেই,  
 কোন ন্যূনতাই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।  
 পুত্রকে একেবারে দেখে সাম মনে মনে স্বর্গসুখ অনুভব করলেন,

বাহ্যিক প্রসারিত করে তাকে তিনি জানালেন অভ্যর্থনা ।  
বললেন, হে পুত্র, আমাকে ক্ষমা করো  
অতীতের কথা ভুলে গিয়ে উৎফুল্ল করো মন ।  
আমি বিশ্ব-প্রভূর পূজারীদের মধ্যে ইনতম,  
কিন্তু তাঁরই দয়ায় আমি তোমাকে ফিরে পেয়েছি ।  
আমি মহান খোদার কাছে প্রার্থনা করাই :  
তোমার প্রতি হৃদয় যেন আমার চিরতুষ্ট থাকে ।  
আমি তোমার জন্য কল্যাণ কামনা করছি উন্নত আকাশের কাছ থেকে,  
তোমার সকল অভিলাষ যেন সে পরিপূর্ণ করে ।  
তারপর পুত্রকে বীরযোগ্য পোশাকে সজ্জিত করে  
সাম পর্বতাঞ্চল থেকে নির্গত হলেন ।  
উচ্চভূমি ছেড়ে সমতলে অবতরণ করে  
পুত্রকে তিনি যথাযীতি রাজপরিছদে ভূষিত করলেন ।  
সাম তার নাম রাখলেন জাল,  
সীমোরণ আদর করে যার নাম রেখেছিল কাহিনী ।  
সৈন্যগণ সারিবদ্ধভাবে এসে জালের সামনে  
দণ্ডায়মান হলো,  
তারা আনন্দে হৃদয় উন্মুক্ত করলো ও পরিতুষ্ট হলো ।  
দামামাবাদক নিনাদিত করলো বিপুলায়তন দুন্দুভি,  
তার আওয়াজে নীলাচল যেন আকাশে মাথা তুললো ।  
বিষাণ দুন্দুভি ও কাংস্যঘটার নিনাদ,  
হিন্দুস্তানী ডাক ও সুবর্ণ থালিকার নিক্ষণের সঙ্গে  
মিলিত হলো সৈন্যদের হর্ষধ্বনি ;  
তারা আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করলো স্বদেশাভিমুখে ।  
অবশ্যে সকলে এসে প্রবেশ করলো স্বীয় নগরীর সিংহদ্বারে,  
বীরবৃন্দের সহর্ষ পদধ্বনিতে নদিত হলো নগর-চতুর ।

## সাম ও জালের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে মনুচেহের অবগতি

জাবুল থেকে বাদশার কাছে খবর এলো,  
সাম সফলকাম হয়ে পাহাড় থেকে ফিরে এসেছেন !  
এই শুভ সংবাদে আনন্দিত হয়ে মনুচেহের  
বারবার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করলেন।

মনুচেহেরের দুই পুত্র ছিল,—  
জ্ঞানী, ধর্মপ্রাণ ও সাহসী।  
তাদের একজনের নাম নওজর অন্যজনের নাম জরস্প,  
যুক্তক্ষেত্রে তাঁরা বিদ্যুতের মতো গতিমান হতেন।  
যশস্বী নওজরকে ডেকে বাদশাহ বললেন,  
দ্রুতগতি আরবী ঘোড়াসহ তুমি সামকে  
ধন্যবাদ জ্ঞাপনে এগিয়ে যাও।  
সামের সঙ্গে তাঁরই মতো এক যুবককে দেখবে,  
এই যুবক প্রতিপালিত হয়েছে পাখির নীড়ে।  
কেয়ানী রীতি অনুযায়ী তাকে তুমি সন্তান্ত জানাবে,  
এবং তাকে দেখামাত্র প্রকাশ করবে আনন্দ।  
বাদশার ফরমান পেয়ে নওজর যথারীতি তাঁকে কুর্নিশ করে  
জাবুলস্থানের পথ ধরলেন।  
সামের নিকটে পৌছে শাহজাদা  
এক তরুণ বীরকে সেখানে দেখতে পেলেন।  
শাহজাদাকে দেখেই সাম অশু থেকে অবতরণ করলেন,  
এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে !  
নওজর তখন বাদশাহ ও তাঁর পাত্রমিত্রের পক্ষ থেকে  
সামকে সন্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বাদশার বাণী শোনালেন।  
সাম মহামান্য বাদশার ফরমান পেয়ে  
সসম্মানে মৃত্তিকা চুম্বন করে প্রকাশ করলেন স্বীয় আনুগত্য ;  
তারপর এতটুকু বিলম্ব না করে মুখ করলেন বাদশার দিকে,

- 
- জাবুল বা জাবুলস্থান ; সীমান্তের নিকটবর্তী শহর !

এবং দ্রুত রাজধানীর দিকে ধাবিত হলেন।  
সাম—পুত্র জাল এক সুউন্নত হাতীর পিঠে চড়ে  
তাঁদের অনুগমন করলেন।  
রাজধানীর উপকর্ত্ত্বে যখন তাঁরা এসে পৌছলেন,  
তখন বাদশা স্বয়ং সৈন্যসমষ্টিসহ এগিয়ে এলেন তাঁদের প্রত্যুদ্গমনে।  
মনুচেহেরের পতাকা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
সাম অশ্ব থেকে অবতরণ করে পদব্রজে এগিয়ে চললেন।  
তারপর মৃত্তিকা চুম্বন করে বললেন,  
বাদশাহ চিরসুখী হোন, সর্বদা প্রফুল্ল থাকুক তাঁর অন্তর !  
মনুচেহেরের আদেশে চিরানুগত সেনাপতি  
আবার ঘোড়ায় আরোহণ করলেন।  
তারপর রাজ্যপতি বাদশাহ ও রাজাসনমুখী সেনাপতি  
উভয়ে এগিয়ে চললেন প্রাসাদের দিকে।  
যথাসময়ে বসলো সন্ত্রাট মনুচেহেরের সভা  
তিনি মাথায় তুলে নিলেন কেয়ানী তাজ।  
তাঁর একপাশে বসলেন বীরপ্রিয় কারেন,  
অন্যপাশে আনন্দিত—চিত্ত সাম।  
এইবার স্বর্ণসাজে সজ্জিত করে ও মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে  
জালকে বাদশার সমীপে আনা হলো।  
তার সুন্দর চলন ও দৃশ্যভঙ্গিমা দেখে  
বিস্মিত হলেন বাদশাহ।  
তিনি সামকে বললেন,  
এর সমকক্ষ বীর আমি দেখতে পাছি না।  
এমন সুউন্নত দেহ, এমন দৃশ্যভঙ্গিমা, এমন সুন্দর মুখ —  
তাকে দেখে আমার প্রাণমন ত্প্রিতে ভরে উঠেছে।  
হে সাম, আমার গচ্ছিত ধন হিসাবে  
আপনি তাকে গ্রহণ করুন।  
কোন কারণেই আপনি তাকে দুঃখ দিতে পারবেন না,  
অন্তরের সকল স্নেহ দিয়ে তাকে নিষিক্ত করে রাখবেন।  
সিংহের পাঞ্চা তার, কেয়ানী তাজের শ্বেগ্য হবে তার মাহাত্ম্য,  
তার সতর্ক—ইন্দ্রিয়গ্রাম জ্ঞানীদের সমতুল্য হবে, বৃক্ষদের মতো  
হবে তার সিদ্ধান্ত।  
তাকে যুদ্ধের কৌশল ও রীতিনীতি শিক্ষা দিবেন,

রাজসভার আদব-কায়দা ও উৎসবের আনন্দ সঞ্চারিত করবেন  
তার মধ্যে।

সে তো শুধু দেখেছে পাহাড়, পাখি ও নীড়,  
রাজ্য, রাজা ও তার মাহাত্ম্য সে কি করে অনুধাবন করবে ?  
বাদশার এই আদেশ শুনে  
সাম আদ্যস্ত সীমোরগ ও পাহাড়ের কথা  
বাদশার কাছে নিবেদন করলেন,—  
কোন কথাই তিনি গোপন রাখলেন না।  
জালকে পরিত্যাগ করার কাহিনী,  
তার উপর উন্নত আকাশের অনুগ্রহ,  
সীমোরগের আপত্য-স্নেহ  
সব একে একে তিনি বললেন।  
বললেন, একদিন আমি বিশ্ব-প্রভুর আদেশ পেয়ে  
আলবুর্জের সেই ভয়ানক অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হলাম।  
যেখানে পর্বতের চূড়া স্পর্শ করছে মেঘমালা,  
সেখানে আকাশ বারিধারার ভাষায় শক্ত পাথরের সঙ্গে কথা কইছে।  
উন্নত দুর্গের মতো এক নীড় সেখানে আমি দেখতে পেলাম,  
কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথ চারিদিক থেকেই অবরুদ্ধ।  
সীমোরগের শাবকদের সঙ্গে জাল সেখানেই অবস্থান করছিল,  
খেলার সাথীরা যেন সেখানে রসালাপে নিরত রয়েছে।  
তাদের বঙ্গসুলভ প্রেমালাপ বায়ুভরে আমার কানে এসে পৌছাচ্ছিল,  
তাদের মনের আনন্দ যেন আমি স্পর্শ করতে পারছিলাম।  
কিন্তু সেখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার কোন পথ ছিল না,  
আমি ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি কত-না পথ।  
হারানো পুত্রের জন্য তখন স্নেহ আমার উদ্বেল হয়ে উঠেছে,  
বেদনায় উপচে উঠে এসেছে আমার অস্তর।  
আমি তখন বিশ্ব-প্রভুর উদ্দেশে বলে উঠলাম,  
ওগো, সকল জগতের আশ্রয়, তুমি অভাবহীন ;  
তোমারই আদেশ প্রতিপালিত হয় সর্বত্র,  
তোমার ইঙ্গিত ছাড়া ঘূর্ণিত হয় না এই মহাকাশ।  
আমি তোমার এক পাপী বান্দা,  
ওগো, চন্দ্রসূর্যের একমাত্র প্রভু !  
আমার একটিমাত্র আকাশক্ষা, সেটি তুমি পূর্ণ করো,

আমার আর কোন প্রার্থনা নেই।  
 সীমোরগের প্রতিপালিত আমার পুত্রকে  
 এনে দাও তুমি আমার কাছে।  
 হে প্রভু, হয় তাকে এনে দাও, নয় পথ করে দাও আমার জন্য,  
 এই দৃঢ়খ আমি আর সহিতে পারছি না।  
 প্রভু হে, বিছেদের জুলায় আর দহন করো না আমার অস্তর,  
 আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার অস্তরে দাও আলো।  
 আমার এই প্রার্থনা গৃহীত হলো বিশ্ব-প্রভুর দরবারে,  
 তিনি মার্জনা করলেন আমার অপরাধ।  
 সীমোরগ পাখা বিস্তার করে উজ্জীন হলো মেঘের উপরে,  
 ও আকাশে চক্রকারে ধূরতে লাগলো।  
 তারপর জালকে বুকে নিয়ে বসন্তকালীন মেঘখণ্ডের মতো  
 বেরিয়ে এলো সে পাহাড় থেকে।  
 তার গায়ের সুগন্ধ কস্তুরীর মতো পূর্ণ করলো দিকদিগন্ত,  
 আমার দুচোধের বারিধারা নিবারিত হলো ও ওষ্ঠাধর  
 হলো পবিত্রস্ত।  
 সীমোরগের ভয়ে ও ন ন র পুত্রের দেহের ধ্বাণে  
 আমার বোধ-বুদ্ধি লুপ্ত হওয়ার উপকৰ্ম হলো।  
 কিন্তু সেই মহিমময়ী ধাত্রী এমনভাবে পেশ করলো নিজেকে,  
 যেন মনে হলো করশাই তার অস্তরের একমাত্র পূজি।  
 স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো প্রশংসা,  
 আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সীমোরগের বন্দনা উচ্চারণ করলাম।  
 কেননা, তারই সহায়তার ফিরে পেয়েছিলাম আমি আমার পুত্রকে,  
 যেন আমি যুক্ত হয়েছিলাম আমারই ভাগ্যের সঙ্গে।  
 এখন সেই পুত্রকে নিয়ে এসেছি বাদশার সমীক্ষে,  
 আর সেই সঙ্গে নিবেদন করছি আমার এতদিনকার  
 অকথিত কাহিনী।

## জালের ভাগ্যনক্ষত্র গণনা ও তার জাবুলস্থানে প্রত্যোবর্তন

বাদশাহ জ্ঞানী ও নক্ষত্রবিদগণকে ডেকে বললেন,—  
আপনারা জালের নক্ষত্র অনুসন্ধান করে  
তার ভাগ্যের কথা আমাকে বলুন।  
যখন তার নক্ষত্র উৎধর্ঘামী হবে  
তখন কি কি ঘটনা ঘটবে তা দেখুন গণনা করে।  
বাদশার আদেশ পেয়ে জ্ঞানী ও জ্যোতিষিগণ  
একটি একটি করে নক্ষত্রের লক্ষণ বিবেচনা করে দেখলেন।  
তারপর বাদশাকে বললেন, সম্রাট, আনন্দিত হোন,  
আমরা সূলক্ষণসমূহ দেখতে পাচ্ছি।  
এই যুবক অত্যন্ত যশস্বী হবে,  
সে হবে মহৎ, বীর, জ্ঞানী ও সংগ্রাম কুশলী।  
গণকদের কথা শুনে বাদশাহ যেমন আনন্দিত হলেন,  
সেনাপতির মন থেকেও তেমনই নেমে গেলো দুষ্টিতার ভার।  
বাদশাহ এইবার জালের জন্য নির্বাচিত করলেন এক খেলাত, \*  
সকলে তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো।  
তাকে দেওয়া হলো, দ্রুতগামী আরবী ঘোড়া।  
তার উপযুক্ত স্বর্ণ-সাজ,  
দেওয়া হলো হিন্দুস্তানী তলোয়ার ও তার স্বর্ণ-কোষ।  
স্বর্ণ ও সূর্যকান্তমণি শোভিত কিংখাবের পোশাক  
তাকে দেওয়া হলো,  
আর সেই সঙ্গে উপহাত হলো মূল্যবান গালিচাসমূহ।  
কিংখাবের সুন্দর পোশাক পরিহিত  
সুন্দর ও সংস্থভাবের দাসবন্দও তাকে দেওয়া হলো।  
জরুর্দ-বরণী ভৃঙ্গার ও সুরাপাত্র,  
এবং আরও সোনা রূপার পাত্রাদি,  
কর্পূর, কস্তুরী ও কুকুমে পূর্ণ করে  
ধরা হলো তার সামনে !  
সেই সঙ্গে দেওয়া হলো তনুত্রাণ, কবচ ও বর্ম,

\* বাদশার তরফ থেকে উপহার স্বরূপ যে মূল্যবান পোশাক, অলঙ্কার ও অস্ত্রাদি দেওয়া হয়।

দেওয়া হলো ভল্ল, গদা, তীর-তুনীর ও ধনুক।  
দান করা হলো মীলাক্ষিত আসন, স্বর্ণময় তাজ,  
সুর্যকাঞ্চমণি বিখচিত মোহর ও সোনালী কটিবন্ধ।  
এইসব সম্পদ দান করে মনুচেহের এক ফরমান লিখালেন,  
এবং তাতে সন্নিবেশিত করলেন তাঁর সহর্ষ আশীর্বাদ।  
সামকে দান করলেন সমস্ত কাবুলভূমি ও হিন্দুস্তানের রাজ্যখণ্ড,  
এবং সেই সঙ্গে চীনসাগর\* থেকে সিঙ্গুনদের পাদদেশ

পর্যন্ত সকল ভূমি ও করলেন তাঁর রাজ্যাঞ্চলগত।

এইভাবে জাবুলস্তান থেকে বোস্তাম পর্যন্ত গোটা রাজ্য  
বাদশাহর আদেশে হৃকুমনামার অন্তর্গত করা হলো।  
সাম ও জালকে খেলাত ও হৃকুমনামায় সজ্জিত করে  
বাদশা সেনাপতির জন্য দ্রুতগতি অশু সাজাবার আদেশ দিলেন।  
সেনাপতি এইবার উঠে দাঁড়িয়ে বাদশাকে সম্মোধন করে বললেন,  
হে সত্যসন্ধি বদান্য নরপতি,  
যত দিন ধরে চন্দ্রসূর্য আলো দিচ্ছে  
আপনার মতো কোন সম্মাট জন্ম গ্রহণ করেন নি।  
এমনই প্রজানুরঞ্জন, কল্যাণ ও প্রজ্ঞার সঙ্গে  
আপনি কালকে আপনার অস্তিত্বের মধুর সঙ্গীতে

অনুরণিত করে রাখুন।

দুনিয়ার সম্পদরাশি আপনার চোখে তুচ্ছ,  
ধরিব্রী চিরকাল আপনার স্মৃতি বহন করবে।  
তারপর উঠে সাম সিংহসনের পদচূম্বন করলেন,  
এবং হস্তীপৃষ্ঠে রক্ষিত দামামায় আঘাত করার আদেশ দিলেন।  
থথাসময়ে তাঁদের যাত্রা শুরু হলো জাবুলস্তানের পথে,  
নগর ও জনপদবাসীর দৃষ্টি তাঁদের দিকে নির্নিমেষ হয়ে রইলো।

সীস্তান সীমান্তে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে  
সেখানকার শাসক সাম্রে কাছে দৃত পাঠিয়ে বললেন,—  
হে ভাগ্যবান, খেলাত ও স্বর্ণমুকুটে সজ্জিত হয়ে  
শাহী ফরমান ও সৈন্যদলসহ রাজ্য প্রবেশ করুন।

- চীন সাগর বলতে সম্ভবত আরল হৃদ বুধানো হয়েছে। সিরদরিয়া নদীকেও চীন সাগর বা দরয়ায়ে চীন ভাবা যেতে পারে।

সীমান্ত নদনকাননতুল্য সজ্জিত হয়ে প্রতীক্ষা করছে আপনার জন্য,  
এখানকার ফুলবন কস্তুরীবাসিত এবং লোক্তুরাশি  
স্বর্ণথণ্ডের মতো মূল্যবান।

তাঁদের আগমনে সীমান্তের সর্বত্র আনন্দের হিল্লোল উঠলো,  
ছোটবড় সকলে জানুলো সহায় অভিনন্দন।

রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে যশষ্মী দলপতিগণ  
সামের সমীপে আসতে লাগলো।

তারা বললো, ভাগ্য প্রসন্ন হোক এই তরুণের উপর,  
তার দ্বারা ফুল হোক যশষ্মী বীরবরের অন্তর।

দলপতিগণের এই প্রশংসা শুনে  
জালের বদনমণ্ডলে ঝল্সে উঠলো মুকুরাজি।

খেলাতের সজ্জা তাকেই শোভা পায়,  
যে রাজপদের যোগ্য ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

এইভাবে পিতাপুত্র উভয়ে সম্মাটের দেওয়া উপহারে সজ্জিত হয়ে  
পূর্ণ সমারোহের সঙ্গে অধিষ্ঠিত হলেন স্ব স্ব আসনে।

## সাম কর্তৃক জালকে রাজ্যদান

সাম তাঁর ভাগ্যবান পুত্রকে  
শিক্ষা দিলেন রাজ্যপর্যোগী জ্ঞান ও কলাকৌশল।  
তারপর রাজ্যের বিচক্ষণ দলপতিদের ডেকে  
দান করলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ।  
বললেন, হে বিচক্ষণ  
ও যশস্বী জ্ঞানীবৃন্দ;  
জাগ্রত-চিন্ত বাদশার আদেশে  
সৈন্যদলসহ এক্ষুনি আমাকে যাত্রা করতে হবে।  
বিপুল বাহিনী নিয়ে কিরগিজদের দেশে  
ও মাজিন্দিরানে পরিচালিত করতে হবে অভিযান।  
আমি আমার পুত্রকে দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের হাতে,  
একে আপনারা আমার প্রাণ ও হৃদয়তুল্য জ্ঞান করবেন।  
যৌবনকালে ওক্তৃত্যের পরবর্শে  
আমি এক অন্যায় করে ফেলেছিলাম।  
আল্লাহর দেওয়া পুত্রকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম,  
সেদিন বুঝতে পারিনি তার মূল্য।  
কিন্তু পরম দয়ালু বিশ্ব-প্রভু তাকে ত্যাগ করেন নি,  
মহান সীমোরগ তাকে প্রতিপালন করেছিল।  
আমার কাছে যে ছিল তুচ্ছ,  
সীমোরগ তাকেই মহামূল্য বস্ত্ররপে লালন করে বড় করেছিল।  
তারপর যখন মার্জনার সময় হয়েছিল,  
তখন বিশ্ব-প্রভু আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমার পুত্র।  
কাজেই, আপনারা তাকে আমার উত্তরাধিকারীরপে বরণ করুন,  
আপনাদের হাতে আমি তাকে আমানত হিসাবে রেখে গেলাম।  
আপনারা তাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবেন,  
কলাকৌশল দ্বারা তার অন্তরকে করবেন আলোকিত।  
আপনারা মহৎ উপদেশ দ্বারা তাকে সাহায্য করবেন,  
নব নব সিদ্ধান্তে প্রদর্শন করবেন তাকে উন্নতির পথ।  
আমি বাদশার ফরমান অনুযায়ী  
সৈন্যদের নিয়ে যাত্রা করছি দুশমনদের দিকে।  
অতঃপর সাম জালকে সম্বোধন করে বললেন

বদান্যতা ও উদারতা অবলম্বন করে শাস্তিতে বসবাস করো ।  
 জ্বালান্তানকে তোমার ঘর বলে মনে করো,  
 এই রাজ্ঞের সকলকে জ্ঞান করো তোমার অনুবর্তীজন ।  
 তোমার ঘরদোর টির হাস্যময় থাকুক,  
 তোমার বক্ষ-স্বজ্ঞন হোক তোমার চিঞ্চানল্দের উৎস ।  
 এই ধর, রাজভাণ্ডারের কুঞ্জিকা,  
 হৃদয় উৎফুল্ল করো, দূর করো চিন্তা ।  
 তোমার মন যা কামনা করে—  
 যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা বক্ষ আসরে, সব তোমার লভ্য হোক ।  
 সামের কথা শুনে জাল বললেন,  
 যে-জীবন আমার কাম্য তার সম্ভাবনা আমার সামনে অবারিত ।  
 মাত্রগৰ্ত থেকে পাপ নিয়ে যে জ্ঞাত হয়,  
 আমি তেমনই একজন ; নিদারশ কান্তাই আমাকে শোভা পায় ।  
 কখনো আমি পাখির পায়ের কাছে ছড়ানো  
 খাদ্যকণা কুড়িয়ে থেয়েছি, কখনো লেহন করেছি রক্ত ।  
 নীড় ছিল আমার বাসস্থান — পক্ষী বক্ষ,  
 তখন আমি বিহগের মধ্যেই গণ্য হতাম ।  
 এখন সৃষ্টিকর্তা আমার জন্য নির্বাচিত করেছেন অন্য এক  
     জীবন-ব্যবস্থা,  
 এ-জীবনই এখন আমার বরণীয় ।  
 কিন্তু আমি জানি, গোলাপের কাছ থেকে কণ্টকই আমার লভ্য,  
 বিশু-প্রভূর কাছে অন্য প্রার্থনা আমার শোভা পায় না ।  
 পুত্রের জবাব শুনে সাম বললেন,  
 দেখো হৃদয়কে সংজ্ঞিত করাই শোভন,  
 উচ্চাকাঙ্ক্ষা পাপ নয় ;  
 ভালো বস্তু কামনা করায় অন্যায় কিছু নেই ।

আকাশের নক্ষত্র গণনা করা কিংবা গ্রহদল ভূপাতিত করাই পৌরুষ,  
 তোমার সৌভাগ্য থেকে আকর্ষণ করে নাও জীবনের সম্পদ ।  
 এই প্রাসাদই তোমার বাসস্থান,  
 মুকুট তোমার ভূষণ ও সৈন্যদল সাথী ।  
 আকাশের বিধান তোমাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে.  
 সে এখন তোমার উপর বর্ষিত করছে করুণা ।

তুমি তোমার চারপাশে এনে সমবেত করাও  
 সৈন্যদল, সামন্ত ও জ্ঞানিগণকে ।  
 তাদের কথা শোন, আহরণ করো তাদের থেকে জ্ঞান,  
 সববিধি নৈপুণ্য ও কলাকৌশল আয়ত্ত করো ।  
 ভোগ ও বদান্যতা কোনটাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না,  
 সকল সৎবস্ত্র ও দানের সামর্থ্য সর্বান্তকরণে কামনা করো ।  
 বিচরণ করো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে,  
 কারণ, প্রকৃত জ্ঞানী নীতি-ধর্মের বিগর্হিত কাজ করেন না ।  
 মূর্খকে তোমার প্রাণের শক্তি বলে গণ্য করো,  
 মূর্খের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চাইতে নিঃসঙ্গতা অনেক ভালো ।  
 তুমি আমার সন্তান ও বন্ধু, আমার সকল কাজে তুমি আমার সহায়ক ।  
 বিশ্ব-প্রভুর সন্নিকটে শৈষের দিনে তুমিই আমার আশা,  
 প্রার্থনা করি, সম্পদ ও সৌভাগ্যসহ তুমি চিরঝীব হও ।  
 এইভাবে উপদেশ দিয়ে সাম যাত্রারসূচক দামামায় আঘাত করলেন,  
 সে-আওয়াজে বাতাস হলো অঙ্ককার — ধরণী কঢ়বর্ণ ।  
 সঙ্গে সঙ্গে নিনাদিত হলো হিন্দুজ্ঞানী কাড়ানাকাড়া ও হাবশী দুন্দুভি  
 সেনাপতি প্রাসাদের অলিঙ্গ ছেড়ে নীচে নেমে এলেন ।  
 তাঁর সঙ্গে যোগ দিলো ত্রিশ হাজার জঙ্গী-জোয়ান,  
 যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বাধের মতো যুগ্মৎ সাহসী ও ক্ষিপ্ত ।  
 এই সব যুদ্ধান্বুখ বীরবৃন্দ নিয়ে  
 সেনাপতি মুখ করলেন রণক্ষেত্রের দিকে ।  
 জাল পিতার সঙ্গে সঙ্গে দুই মঞ্জিল\* পথ অতিক্রম করলেন,  
 এবং সৈন্যদলের মধ্যে থেকে অনুভব করলেন পিতার সান্নিধ্য ।  
 পিতা এইবার জালকে বুকে জড়িয়ে ধরে  
 বিছেদ বেদনায় ভেঙে পড়লেন ।  
 জালের দিকে চেয়ে সাম যেন  
 শীয় মুখে উদ্গারিত করলেন হৃদয় রক্ত ।  
 বললেন, তুমি এখন ফিরে যাও, সিংহাসন ও রাজমুকুটে হৃদয় অনুরঞ্জিত করো ।  
 জালের মনে অনুরণিত হতে লাগলো পিতার কথাগুলি  
 তাঁর অনুপস্থিতে কি করে তিনি সুর্যী থাকবেন, তাই  
 চিন্তা করতে লাগলেন ।  
 যথাসময়ে জাল সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে

\* যাত্রীদলের বিশ্রাম স্থান ।

শিরে তুলে নিলেন উজ্জ্বল রাজমুকুট !  
রাজকীয় বসন-ভূষণ ও গোমুখাক্ষিত প্রহরণসহ  
তিনি গলায় পরলেন সুবর্ণমালিকা ও কোমরে বীধলেন কোমরবন্ধ ।  
তারপর রাজ্যের সকল অঞ্চল থেকে জ্ঞানী গুণীদের ডেকে  
তাদের কাছে প্রার্থনা করলেন পরামর্শ ।  
নক্ষত্রবিদ ও ধর্মবেত্তাগণ,  
যুদ্ধজয়ী সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ ;  
দিনরাত তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে  
তাঁকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতেন ।  
এইভাবে জাল তাঁদের থেকে অনেক জ্ঞান আহরণ করলেন,  
তাঁর ভাগ্যের তারা দিন দিন উজ্জ্বলতর হতে লাগলো ।  
জ্ঞানে ও গুণে জাল এমনভাবে অলঙ্কৃত হলেন যে,  
সেকালে তাঁর মতো গুণান্বিত আর কেউ রইলো না ।  
তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্যে তুষ্ট হলো সকল নরনারী,  
তাঁর উপস্থিতিতে ফুল্ল হলো সকল আসর ।  
দূরের ও নিকটের সবাই তাঁর গুণরাজি  
কস্তুরীবাসের মতো আত্মাণ করে ধন্য হলো ।  
পরিবর্তনশীল আকাশ যেন তাঁর পদতলে  
বিছিয়ে দিলো অনুকম্পার মেঘ-ছায়া ।

## মেহরাব-সকাশে জাল ও মেহরাব-তনয়া রূদ্বাবার প্রতি জালের প্রেমাকর্ষণ

একদিন ঠিক হলো, জাল রাজ্যের বাইরে  
কোথাও বেড়াতে যাবেন।  
দলবলসহ রাজ্যসীমা অতিক্রম করে  
তিনি জনৈক পরামর্শদাতার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন  
কি করা উচিত ?

পরামর্শদাতা বললেন, কাবুলের পথে  
হিন্দুস্তানের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে !  
রাজ্যের ভ্রমণ-পথে সর্বত্র থাকবে সাজসজ্জা,  
থাকবে সুরা, সুধা ও গায়কদল।  
সরাইয়ের দ্বারে বিতরিত হবে মণিমুক্তা,  
ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত করে দূর করতে হবে দৃঢ়েজনের দুঃখ।  
পরামর্শ মতো রাজা জাবুল থেকে যাত্রা করে কাবুল  
এসে পৌছলেন,  
সারা পথ আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে কেটে গেলো।  
এই সময়ে কাবুলে রাজত্ব করতেন মেহরাব নামে এক রাজা,  
তিনি ছিলেন পরাত্মান্ত, সম্পদশালী ও বহুকাজে সফলকাম।

তাঁর দেহ ছিলো দেবদারুর মতো সুউন্নত সুঠাম,—  
মুখমণ্ডল বসন্তের মতো ফুল্ল এবং চলন রাজহাসের মতো !  
তাঁর হাদয় ছিলো জ্ঞানীজনের ও মন্তিক দাশনিকের  
তাঁর দুইপাশে বিরাজ করতেন বীর, ধর্মবেত্তা ও পুরোহিতগণ।  
তিনি ছিলেন বাদশাহ জোহাকের বংশোদ্ধৃত,  
কাবুলই তাঁর মাত্তুমি ও রাজ্য।  
প্রতি বছর তিনি সামরে সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিলেন।  
একদা এক প্রভাতে সাম-পুত্র জালের কথা শনে  
তিনি কাবুল থেকে সামের দরবারে আগমন করেছিলেন।  
সঙ্গে এনেছিলেন বহু সম্পদ ও সজ্জিত অশু,  
অনেক গোলাম ও মনোমুগ্ধকর বস্তুরাজি।

দীনার\*, যাকুত\*\* মুসাক\*\*\* ও আবীর\*\*\*\* সহ  
কিংখাৰ\*\*\*\*\* , ও পশ্চিমী রেশমী পরিচ্ছদও এনেছিলেন।  
এবং মহামূল্য ভেটৱাপে এনেছিলেন মণিমুক্তাবিখচিত

এক রাজযোগ্য মুকুট,  
আৱ একটি কাঞ্চনময় মণিমালা — নীলাভ নীলা যাতে জড়িত ছিল।  
এই সঙ্গে মেহৰাব কাবুল-বাহিনীৰ সেনাপতিগণকেও  
পেশ কৱেছিলেন সামনে।  
কাবুলৱাজ প্ৰত্যুদ্গমনে এগিয়ে আসছেন শুনে,  
জালও স্বীয় সামন্তবৰ্গসহ সকল ব্যবহাৰ সম্পূৰ্ণ কৱলেন।  
তাঁকে সভাষণ জানাবাৰ জন্য  
তৈৰি কৱালেন এক সুদৃশ্য সভামণ্ডপ।  
কাবুল-ৱাজ এসে উপস্থিত হলে জাল তাঁকে এনে আসনে বসালেন,  
এবং অত্যন্ত হষ্টচিতে আয়োজন কৱলেন এক আসৱেৱ।

যথাসময়ে এক সেনাপতি সুস্থাদু ভোজনদ্বয় এনে  
পৱিবেশন কৱলো তাঁৰ সামনে,  
তিনি প্ৰসন্ন মনে হাত রাখলেন।  
তাৱপৰ এলো সুৱাপৱিবেশনকাৱিগণ, এলো সুৱা ও সুৱাপাত্ৰ,  
মেহৰাব ইইবাৰ সাম-পুত্ৰেৰ দিকে চোখ তুলে তাকালেন।  
জালেৰ দৰ্শনে পৱিত্ৰ হলো মেহৰাবেৰ নয়নদ্বয়  
তাঁৰ ব্যবহাৰে মুগ্ধ হলো মেহৰাবেৰ অস্তঃকৱণ।  
মেহৰাব যখন ভোজন সমাপনাত্তে উঠে দাঁড়ালেন,  
তখন তাঁৰ মাহাত্ম্য ও বিভূতিৰ দিকে নিনিমেষ হলো জালেৰ দৃষ্টি !  
তিনি পাৰ্শ্বস্থ সামন্তগণকে বললেন, এই পুৱৰষপ্ৰবৱ  
যে-কোন যোদ্ধাৰ চাহিতে মহত্ত্ব।  
তাঁৰ দৈহিক সৌষ্ঠব ও সমন্বয়তি তুলনাহীন,  
তাঁৰ প্ৰতিদুন্দুতা কৱতে পাৱে এমন যোদ্ধা আমি দেখি না !  
এই সময় সামন্ত ও দলপতিগণেৰ মধ্যে থেকে একজন  
জালকে সম্বোধন কৱে বললেন, হে বীৱপ্ৰবৱ !  
ঁৰ অস্তঃপুৱে রয়েছেন এক সুন্দৱী কন্যারঞ্জ,  
যাঁৰ মুখমণ্ডল সূৰ্যেৰ চেয়েও দীপ্তমান।

\* স্বৰ্ণমুদ্রা । .. সূৰ্যকান্ত মণি । ... . কন্তুৱী । ..... কৃত্তুম । ..... স্বৰ্ণ অথবা রঞ্জতসূত্র নিৰ্মিত প

তাঁর দেহ হস্তীদণ্ডনির্মিত সৌন্দর্য-প্রতিমার মতো,  
তিনি সেগুন তরমু মতো দীর্ঘাস্তী, তাঁর মুখমণ্ডল বসন্তের  
ফুলবনের অনুরূপ।

তাঁর রজতশুভ্র বদনমণ্ডলে মেঘ-কালো কেশফাঁস  
মন-বিহঙ্গের পদযুগল বন্দী করার জন্য দিবারাত্রি উন্মুক্ত রয়েছে।  
তাঁর গশ্চন্দুয় গোলাপ-পাপড়ির মতো ও ওষ্ঠথর দাঢ়িম্বফুল সদৃশ,  
তাঁর রজতশুভ্র বক্ষদেশে উদগত হয়েছে দুটি সুগঠিত নারাসী।  
তাঁর চোখ দুটি যেন কুঞ্জবনে প্রস্ফুটিত দুটি নার্গিস,  
তাঁর নয়ন-পাতা কাকপক্ষের বর্ণসুষমা চুরি করে এনেছে।  
তাঁর জ্যুগল যেন আকর্ষিত ধনু,  
তাতে সংগোপন রয়েছে কটাক্ষের তীক্ষ্ণ শর।  
যদি পূর্ণচন্দ্রের আকাশক্ষা থাকে, তবে অবলোকন করল্ল তাঁর মুখ,  
যদি কস্তুরী-সুবাস আত্মাণ করতে চান তবে তাঁর কেশে মুখ লুকান।  
তাঁর কংশবর্ণ কুণ্ঠিত কেশরাজি যেন প্রহেলিকা,  
উন্মুখ বাসনাকে করে তা আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান।  
তাঁর দশটি অঙ্গুলী যেন দশটি রজতলিখনী,  
সেগুলি থেকে উৎসারিত হয় শত রকমের সুবাস।  
তাঁর সর্বাঙ্গ কোমল ও সুষমামণ্ডিত,  
সকল কামনার তা লক্ষ্যভূমি, সকল আনন্দ ও সঙ্গীতের উৎস।

হে ষশাংকী বীরপ্রবর, এই বরাঙ্গনা আপনারই যোগ্য,  
আকাশেই শোভা পায় পূর্ণচন্দ্রের মহিমা।  
জাল সামন্তের মুখে এই বর্ণনা শুনে  
চন্দ্রমুখীর প্রেমে পাগলপ্রায় হলেন।  
তাঁর হন্দয়-সমুদ্র যেন স্ফীত হলো জোয়ারের আকর্ষণে,  
নিদ্রা ও শান্তি প্রয়াণ করলো তাঁর মন্তিষ্ঠ থেকে।  
তিনি মনে মনে বললেন, এই সুন্দরী  
নিঃসন্দেহে চাঁদ ও সূর্যের অনুরূপ।  
পুরুষ এমন সৌন্দর্যের আকর্ষণেই প্রাণ পায়,  
এমন সৌন্দর্যই জন্ম দেয় পৌরুষের।

রাত্রি আগমনে জাল চিঞ্চামগ্ন হলেন,  
অদেখা রাজকন্যার জন্য বেদনায় পূর্ণ হলো তাঁর অস্তর।

অবশেষে যখন সূর্যালোক রাত্রির কালো পাহাড়ে আঘাত হানলো,  
 এবং ধরিত্বীর মুখ সাদা হয়ে গেলো কর্পূরের মতো,  
 তখন জালের দরবার আবার জনসমাগমে পূর্ণ হলো,  
 চারদিকে ঝলসে উঠলো স্বর্ণময় অসি-কোষ।  
 বীরবরের সভাকক্ষের দ্বার নতুন করে সজ্জিত করা হলো,  
 তাতে একে একে প্রবেশ করলেন দলপতিগণ।  
 এই সময় কাবুলাধিপতি মেহুরাব শীয় প্রাসাদ থেকে নির্গত হয়ে  
 জালের দরবারের অভিমূখী হলেন।  
 তিনি জালের সভাকক্ষের সন্নিকটবর্তী হতেই  
 উচ্চকচ্ছে ধ্বনিত হলো এক আদেশ — দ্বার খোল, পথ করে  
 সরে দাঁড়াও।  
 এক বীর অপর বীরের সমীপবর্তী হলেন,  
 যেন বৃক্ষ অবনত হলো নবফলভারে।

মেহুরাবকে দেখে জালের অন্তর আনন্দে উদ্বৃলিত হলো,  
 তিনি তাকে জানালেন সবিনয় অভিনন্দন।  
 তারপর বললেন, আপনার অভিপ্রায় কি বলুন,  
 অকপটে ব্যক্ত করুন আপনার কাম্য।  
 জবাবে মেহুরাব বললেন,  
 হে উন্নতশির, সফলকাম ও অনুজ্ঞাদানকারী রাজা,  
 আমার একটিমাত্র কামনা,  
 আর সে—কামনা আপনি পূর্ণ করতে পারেন।  
 আপনি সানন্দে আগমন করুন আমার গৃহে,  
 এবং সূর্যের উদয়ের মতো আমার হৃদয়কে আলোকিত করুন।  
 মেহুরাবের এই প্রার্থনা শুনে জাল বললেন,  
 এ—কামনা পূর্ণ করার সাধ্য আমার নেই, আপনার গৃহ  
 আমার স্থান নয়,  
 কেননা আপনার ধর্ম ও সামের ধর্ম এক নয়।

একথা সম্ভাটের বেলায়ও প্রযোজ্য —  
 তিনি যদি এ—কাহিনী শোনেন যে,

উপস্থিত সকলে মেহরাবের উপর থেকে ফিরিয়ে নিলেন দৃষ্টি,  
 তাঁরা তাঁকে গণ্য করলেন অনাত্মীয় বলে।  
 যেহেতু তিনি ধৰ্ম ও রীতিনীতিতে ভিন্ন  
 সেইহেতু তাঁরা দ্বিরত রাইলেন তাঁর প্রশংসা-কীর্তনে।  
 কিন্তু তাঁর প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব  
 সবারই অন্তরে এঁকে দিল এক ছাপ।  
 প্রত্যেক দলপতিই অনুচ্ছ কঢ়ে  
 বললেন তাঁর গুণের কথা।

সবার উপরে জাল হলেন প্রভাবিত,  
 তাঁর মনে জ্ঞান অপেক্ষা প্রেম প্রবল হলো ।  
 আরবদের দলপতি এবার উপস্থিত সকলকে  
 সম্বোধন করে বললেন,  
 যতদিন প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকবো,  
 ততদিন আমি পরিত্যাগ করবো না পিতৃপূর্খের ধর্ম ;  
 ততদিনই আমার গহে অব্যাহত থাকবে আমার উপাস্য প্রতিমা,  
 আর বক্র গগনমণ্ডলে প্রচন্দ থাকবে আমার ভাগ্য ।  
 আমি নববধূ নই যে, কারো মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে  
 সংজ্ঞিত করবো ।  
 এবং তেমন করে হাস্যাস্পদ হবো জ্ঞানীদের কাছে ।  
 মেহরাবের উক্তিশুলি জালের অন্তরে প্রবিষ্ট হলো,  
 তাঁর মন কেন কানি বিশাল পূর্ণ কর্ম উঠলো ।

আকাশ-পাতাল কত কি তিনি ভাবতে লাগলেন,  
সব সম্পদ-সমারোহ তাঁর চোখে অথইন হয়ে উঠলো।

আকাশ আবর্তিত হয়ে চললো জালের মাথার উপরে,  
তিনি দেখলেন, তাঁর হৃদয়কুণ্ড প্রেমবারিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

## দাসীদের কাছে ঝুঁঠাবার মনোভাব ব্যক্ত করা

প্রভাতকালে মেহরাব বেরিয়ে এলেন জালের দরবার থেকে ।

মনে মনে তিনি জালের তারিফ করে বলতে লাগলেন,

এমন সুপুরুষ, এমন বীর ও এমন মহৎ আর হয় না ।

যথাসময়ে স্বীয় প্রাসাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন,

দুই সূর্যমুখী ললনা তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা করছে ।

তাদের একজন ঝুঁঠাবতী ঝুঁঠাবা,

অন্যজন দয়াবতী সীদুখ্ত ।

তাঁরা বসন্তের ফুলবনের মতো আপনিই

রঙ ও গঞ্জের সমারোহে সজ্জিতা ।

মেহরাব স্বীয় কন্যা ঝুঁঠাবার মধ্যে এক বিস্ময়কর বস্তু

প্রত্যক্ষ করে উচ্চারণ করলেন বিশু-প্রভুর প্রশংসা ।

তিনি দেখলেন, ঝুঁঠাবার বক্ষ থেকে উদগত হয়েছে এক দেবদার,

তার শিরে শোভা পাছে চন্দ্রমণ্ডলের মতো এক সমুজ্জ্বল মুকুট ।

দেখতে দেখতে সেই বৃক্ষ এক মহৎ মানব-মূর্তিতে ঝোপান্তরিত হলো,  
স্বর্ণ-পরিচ্ছদ ও মুক্তার ভূষণে সে-মূর্তি যেন স্বর্গের নিছনি ।

এই সময় সীদুখ্ত তাঁর রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত করে

মেহরাবকে জিজ্ঞাসা করলেন,

আপনি কেন আজ এভাবে গেলেন, আর কেনই বা ফিরে এলেন  
এমন করে ?

আমাকে সব খুলে বলুন ; অঙ্গল আপনার কাছ থেকে দূর হোক !

সামের শুভকেশ পুত্র কেমন ?

সিংহাসন না নীড়,— কোন্ স্মৃতি তার মনে প্রবল ?

মানুষের স্বভাব কি তার মধ্যে আছে ?

সে কি নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে যশস্বীদের সঙ্গে ?

বলুন আমাকে সীমোরগ সম্পর্কে জাল কি বলেছে ?

জালের মুখের আকৃতি কেমন, তার কেশরাজি বা কিরণ ?

মেহরাব পত্নীর কথার জবাবে বললেন,

হে রজতবক্ষা চন্দ্-মুখ সুন্দরী ,

দুনিয়ার বীরগণ কেউই বীরত্বে জালের সমকক্ষ নয় !

সে যদি অশু-বক্ষা ধারণ করে এগিয়ে আসে এই প্রাসাদের দিকে,

তবে তোমাকে বলতেই হবে, এমন অশ্বারোহী কুঠাপি দেখিনি ।

বক্ষদেশ তার সিংহের মতো, শক্তিতে হাতীর সমকক্ষ সে,  
তার দুটি হাত যেন ডর্মিদোলায়িত নীলনদী।  
আসরে সে যখন অবতীর হয়, সে-হাত থেকে ঝরে স্বর্ণমুদ্রা,  
এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তা শক্র শির ঝরিয়ে চলে !  
মুখ তার আরগাঞ্জয়ান\* ফুলের মতো,  
সে যৌবনশালী, জাগ্রতচিত্ত ও ভাগ্যবান ।  
যদিও তার কেশরাজি সাদা,  
তবুও বীর সে অতুলনীয় ।  
শক্রতায় উদ্যত হলে সে হয় ভীষণ শক্র,  
এবং তার পাঞ্জা হয় ভয়াবহ আজদাহার পাঞ্জার অনুরূপ ।  
তখন সে মাটিকে রক্তে অনুরঞ্জিত করে,  
এবং তার তলোয়ার থেকে ঝরায় শোণিতের ধারা ।  
সবচাইতে বেশী যে অপবাদ প্রচার করে  
সেও তার সাদা চুলের দোষ ছাড় আর কোন অপবাদই  
দিতে পারবে না ।

বরং বলা যায়, তার কেশের শুভতা  
 মনকে আকর্ষণই করে।  
 পিতার মুখে জালের এই বর্ণনা শুনে  
 ঝুদাবা প্রেমরাগে রঞ্জিত করলো তার হৃদয় — লজ্জায় তার  
 মুখমণ্ডল রক্তিম হলো।  
 সেদিন থেকে ঝুদাবার অস্তরে জালের জন্য জুললো যে প্রেমানন্দ  
 তা তার দিনের শ্রান্তি ও রাত্রির নিদ্রা হরণ করে নিলো।  
 প্রেমভাব তার সমস্ত চেতনাকে করলো অধিকার,  
 ফলে, তার প্রকৃতিতে দেখা দিলো পরিবর্তন।  
 বুদ্ধিমান ব্যক্তি কী সুন্দর বলেছেন,  
 মেয়েদের সামনে কোনদিন পুরুষের আলোচনা করো না।  
 কারণ, নারীর অস্তরে তখন হয় দৈত্যের আবির্ভাব,  
 তারা খুঁজে ফিরে অসন্তব্ধের পথ।

ରୁଦାବାର ପାଂଚଜନ ତୁମ୍ହି ବାନୀ ଛିଲ,  
ସକଳ କାଜେ ତାରା ଛିଲ ଶାହଜାଦୀର ସହାୟକ ।  
ରୁଦାବା ଏକଦିନ ତାର ବାନୀଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲଲେନ

• রাজন্তুর সদশ ফলবিশেষ।

শোন, আজি আমি আমার মনের গোপন কথা তোমাদের বলবো।  
 তোমরা সবাই আমার গোপনতার সঙ্গী,  
 তোমরা আমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুখী।  
 আমার মনের সকল কথাই তোমরা পাঁচজনে জান,  
 বর্ষানুক্রমে তোমরা আমার সঙ্গিনী।  
 প্রেমোন্নাদনায় আজি আমি উদ্বৃলিত সেই সমুদ্রের মতো  
 চেউয়ের হাত বাড়িয়ে যে আকাশকে স্পর্শ করতে চায়।  
 জালের প্রতি অনুরাগে আমার অস্তর্দেশ অনুরঞ্জিত,  
 স্বপ্নের মধ্যেই আমি ভঙ্গন করি আমার সংশয়।  
 আমার হৃদয়-প্রাণ তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ,  
 তাঁরই দর্শনের কামনা দিনরাত আমার বুকে।  
 তোমরা ছাড়া আমার গোপনীয়তা কারো জানা নেই  
 তোমরা আমার প্রতি অনুরাগ, সততার তোমরা প্রতিমৃতি।  
 কোন একটা উপায় বের করে  
 আমার অস্তর থেকে উন্মুলিত করো দুঃখের শায়ক।  
 তোমরা আমাকে শোনাও এ-বেদনার প্রতিকার কী তোমরা  
 করতে পারো?  
 কী সাজ্জনা-বাণী শোনাতে পারবে, তা বলো?  
 দাসীগণ শাহজাদীর মুখে এই কথা শুনে  
 অত্যন্ত বিস্মিত হলো।  
 ঘৃণায় তারা উঠে দাঁড়ালো স্বস্থান থেকে,  
 তারপর ঝুঁদাবাকে লক্ষ্য করে বললো,  
 হে দুনিয়ার মহিলাকুলের শিরোমণি,  
 আপনি সামন্ত শ্রেষ্ঠের মহিয়সী কন্যা।  
 হিন্দুস্তান থেকে চীন পর্যন্ত আপনি প্রশংসিত,  
 শয়নকক্ষে আপনি অত্যুজ্জ্বল হীরক- অঙ্গুরীয়।  
 কাননে কোন দেবদারই আপনার মতো সমুন্ত নয়,  
 কোন পারবীনই<sup>\*</sup> নয় আপনার মুখের মতো সমুজ্জ্বল।  
 আপনার সুন্দর মুখের পরিবর্তে  
 প্রাচ্যের পুরু কনৌজের রাজ্যপাট বিলিয়ে দিতে পারেন।<sup>\*\*</sup>

\* নক্ষত্রবিশেষের নাম।

তুলনীয়ঃ তোমার গালের কালো তিলটির বদলে আমি সমরকৃদ্ধ ও বৃুদ্ধারা বিলিয়ে দিতে পারি।

— হাফেজ

আপনার নিজের মনে কি এ কথার জন্য লজ্জা বোধ হয় না ?  
কোন্ লজ্জায় আপনি মুখ দেখাবেন আপনার পিতাকে ?  
যে-ব্যক্তিকে তার পিতা নিজের বুক থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছিল,  
সেই ব্যক্তিকে আপনি কি করে ধারণ করবেন বুকে ?  
যে-লোক পাহাড়ের উপর পক্ষীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে,  
এবং জনসমাজে হয়ে আছে সেই বর্বর জীবনের স্মারক,  
কিভাবে আপনি তাকে বরণ করবেন ?  
একটু ভেবে বলুন ওগো মহিয়সী সামন্ত-কন্যা !  
কোন্ মার গর্তে জন্ম নিয়েছে হেন বৃক্ষ সন্তান ?  
এমন যার জন্ম তাকে অভিজ্ঞত বলবো কোন্ কারণে ?  
এমন সুন্দর মুখ ও ভ্রমরক্ষণ চুল যার,  
সেকি ভজনা করতে পারে এক বৃক্ষকে ?  
সারা জগৎ আপনার প্রেমে পাগল,  
রাজপ্রাসাদগুলি মুখর আপনার ঝাপের বর্ণনায়।  
আপনার এই সুন্দর মুখ, এই সমুন্নিত ও ক্ষণ কেশপাশ,  
চতুর্থ আকাশ থেকেও আকর্ষণ করে আনতে পারে  
আপনার জন্য স্বামী !

দাসীদের মুখে এসব কথা শনে  
কুন্দাবার অন্তরে জুলে উঠলো ক্রোধের আগুন।  
তিনি রাগে চিংকার করে উঠলেন,  
মুখ তাঁর রক্তবর্ণ হলো, চক্ষুব্রহ্ম হলো মুদিত।  
রাগে দৃঢ়ে কুন্দাবার ললাটে দেখা দিলো কুঞ্চনের রেখা।  
তিনি দাসীদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের উদ্দেশ্য মন্দ,  
তাই তোমাদের বক্তব্য আমার মনোমত নয়।  
আমার ভাগ্যাবাশ থেকে যদি খসে পড়ে নক্ষত্রদল  
তবুও দুঃখ করবো না ; অবস্থান করবো চাঁদের সাহচর্যে।  
গোলাপ যদি মাটি থেকে আহরণ না করে তার খাদ্য  
তবে তার অনুপম বিকাশ কি সম্ভব হবে ?  
যার মন ও মস্তিষ্ক সুরায় সিঞ্চ হবে ,  
পুষ্পরস হবে তার পক্ষে বেদনাদায়ক।  
তাই রোমের কায়সরকে আমি চাই না ; চীনের ফগফুরও আমার কাম্য নয়,  
এফন কি, ইয়ানের মুকুটধৰী বাদশাগণকেও আমি কামনা করি না।  
সামপুত্র জালই হবেন আমার স্বামী,

তিনি সিংহবাহু, তিনিই কেশরধারী।  
তোমরা তাকে বৃদ্ধই বল কিংবা তরুণ,  
তিনি ছাড়া আমার অস্তরে আর কারও স্থান নেই,  
আমার হৃদয়ের উপর একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব।  
তাঁকে না দেখেই আমার হৃদয় তাঁকে নির্বাচিত করে নিয়েছে,  
শুনে শুনেই আমি তাঁর প্রতি হয়েছি আসক্ত।  
তাঁকেই আমি ভালবেসেছি, তাঁর কেশরাজির কথা উঠে না,  
আমার প্রেম ধাবিত হয়েছে তার গুণাবলীর দিকে।  
দাসীগণ যখন এইভাবে জ্ঞানতে পারলো শাহজাদীর মনের কথা,  
এবং শুনতে পেলো তার প্রাণের হৃদয়বিদারক কান্না,  
তখন তারা রাজকন্যার মনের দিকে চেয়ে  
তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বললো, আমরা আপনারই দাসী,  
আপনাকেই আমরা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি ও ভক্তি করি।  
আদেশ করুন, কি আমাদের করতে হবে,  
আপনার আদেশের মধ্যে কল্যাণকেই আমরা দেখতে পাই।  
দাসীদের মধ্যে একজন বললো, হে মহিয়সী রাজকন্যা,  
গোপন এই রহস্য যেন আর কারো কাছে প্রকাশ না পায়।  
আপনার কালো নয়নযুগলের লজ্জা চির অব্যাহত থাক,  
অব্যর্থ হোক আপনার সুন্দর মুখের শরম।  
যদি আপনার অভিলাষ হয়,  
তবে আপনার মায়া দ্বারা আমাদের মুগ্ধ করুন।  
মন্ত্রপূর্ণ পাথির মতো আমরা উড়তীন হই,  
আপনার দুঃখ লাঘবের জন্য ধাবিত হই মৃগীর মতো;  
এবং আপনার অভিপ্রেত রাজাকে  
নিয়ে আসি আপনার সমীপে।  
দাসীর কথা শুনে ঝুঁটু করার সুরঞ্জিত অধরে হাসি ফুটলো,  
লাজারুণ মুখে তাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন,  
আমার প্রিয় দাসীগণ যখন উদ্যত হয় কোন কাজে  
তখন সুমঙ্গল তরুতে ফল ধরে।  
নিত্য তাতে দেখা দেয় মণিমুক্তা,  
এবং তার শাখা-প্রশাখা অবনত হয় ফলভারে।

## জালের সমীপে রূদ্ধাবার দাসীদের যাত্রা

দাসীগণ রাজকন্যার সমীপ থেকে উঠে এসে  
তার মনোকষ্টের প্রতিকারে ব্রতী হলো।  
রোমদেশের কিংখাবে তারা সঞ্জিত করলো নিজেদের,  
এবং কুস্তলে জড়িয়ে নিলো ফুলের মালা।  
তারপর পাঁচ সঞ্চিতে মিলে সেই প্রোত্তিনীর তীরে এসে উপস্থিত হলো—  
সেখানে ছিল সমেন্য জালের ঘোন শিবির।  
সময়টা ছিল বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিন,  
তাদের রাপের সমারোহে ও দেহের সৌরভে সার্থক হলো  
বসন্তের আগমন।

তটিনীর তীরে দাসীগণকে দেখে  
সৈন্যরা জালের কাছে গিয়ে সেই সংবাদ দিলো।  
তারা বললো, গোলাপ—বদনী পুষ্পবক্ষা রমণীগণ  
প্রোত্তিনীর উচ্চ-সংলগ্ন বাগিচায় ফুল তুলছে।  
তারা সেখানে যত্রত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে ও নিশ্চিতমনে চয়ন করছে ফুল,  
ওই দেখুন, তারা রাজ-শিবিরের ঠিক মুখোমুখী এসে  
হাজির হয়েছে।

উচু রাজাসন থেকে জাল তাদের চেয়ে দেখলেন,  
বললেন, জিজ্ঞাসা করো গোলাপবনের এই উপসিকারা কারা ?  
কেন তারা আমার ফুলবনে ফুল চয়ন করছে ?  
আমার অনুমতি উপেক্ষাকারীদের মনে কি ভয় নেই ?  
রাজা এই কথা শুনে গুপ্তচর বললো,  
মেহুবাবের রাজপুরী থেকে এসেছে এই সুন্দরীগণ।  
কাবুল রাজকন্যার দাসী এরা,  
তিনিই তাদেরকে এখানে ফুল তুলতে পাঠিয়েছেন।  
এই কথা শোনামাত্র উদ্বৃত্ত হলো জালের কল্পনা,  
তিনি আপনার মনের সঙ্গে গুঞ্জরণে রত হলেন।  
তারপর, কালবিলম্ব না করে এক দাস—বালককে সঙ্গে নিয়ে  
ধাবিত হলেন প্রোত্তিনীর দিকে।

সেখানে পৌছে তিনি দাসীদের দেখতে পেলেন,  
দাস—বালককে বললেন, সে ধেন তীরধনুক প্রস্তুত করে রাখে।

পায়ে হেঠেই জাল উদ্যত হলেন মৃগয়ায়,  
দেখা গেলো, নদীর জলে ভেসে বেড়াচ্ছে কতিপয় পাথি !  
দাস-বালক হাসিমুখে বীরপ্রবরের দিকে বাড়িয়ে দিলো তৌরধনুক,  
তিনি তার হাত থেকে সেগুলি তুলে নিলেন।

জাল সহসা চিৎকার করে পাখিগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে  
ক্ষিপ্ত হল্প্তে তাদের লক্ষ্য করে তীর নিশ্চেপ করতে লাগলেন।  
উভয়নরত পাখিগুলি তীরবিন্ধ হয়ে পড়তে লাগলো নদীতে,  
দেখতে দেখতে নদীর জল রক্তে লাল হয়ে উঠলো।

জাল এইবার দাস-বালককে পাখিগুলি  
ধরে আনবার আদেশ দিলেন।

দাস-বালক দ্রুত নৌকায় চড়ে  
দাসীদের সমীপে এসে হাজির হলো।

দাসীগণ তখন সুন্দর্ণ দাস-বালককে  
জিজ্ঞাসা করলো মৃগয়াসক্ত রাজার কথা।

তারা বললো, এই সিংহ-বাহু হস্তীবপু বীর কে ?  
তিনি কোন্ দেশের রাজা, কোথায় তাঁর আসর ?  
এমন ক্ষিপ্তহল্প্তে যিনি তীর চালাতে পারেন  
তিনি তো সাধারণ লোক নন।

এই সৈনিকের চেয়ে মহত্তর আমরা আর কাউকে দেখিনি,  
তীর-ধনুকের এমন কুশলী আমাদের চোখে পড়েনি।

এইকথা শুনে দাস-বালক ওষ্ঠ দংশন করে বললো,  
রাজা সম্পর্কে এমন সাধারণভাবে কথা বলো না,  
ইনি নীমরোজের<sup>০</sup> অধিপতি সাম-পুত্র,  
পৃথিবীর রাজন্যবর্গ তাঁকে কাহিনী বলে সম্বোধন করেন।  
আকাশ কখনও এমন বীরের উপর আবর্তিত হয়নি,  
কাল কখনও দেখেনি এমন যশষী পুরুষ।

দাসী তখন দাস-বালকের দিকে চেয়ে  
মুচকি হেসে বললো, এমন কথা বলো না।  
মেহুবাবের অস্তঃপুরে রয়েছে এক পূর্ণচন্দ্র,  
যিনি তোমার রাজার চেয়ে মহত্তর।

দেহ-সৌর্ঘ্য তার সেগুন তরমু মতো, গায়ের রং যেন হস্তীদণ্ড,  
কালো কেশরাজিতে তিনি যেন মন্ত্রকে মুকুট ধারণ করে আছেন।

---

•      শীতান

নার্গিস ফুলের মতো তার দুই চোখ, ভূরাদুয় সুবক্ষি,  
 পক্ষরাজি যেন উড়স্ত চকোর।  
 মনের দৃঢ়খে তার অধরোষ্ঠ নীরব হয়ে আছে,  
 তার ঐন্দ্রজালিক চক্ষুদুয় যেন স্বপ্ন দেখছে,  
 তার রঞ্জবর্ণ মুখের উপর এসে পড়ছে ভ্রমরক্ষণ এলোচুল।  
 এই মহিয়সী রমণী এখন বিরহে অর্ধমৃতা  
 তার নিঃশ্঵াস পথ পাছে না অধরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত।  
 সেজন্যই আমরা কাবুলস্তান থেকে আগমন করেছি  
 জাবুলস্তানের অধিপতির সমীপে।  
 উপায় চিন্তা করছি, যাতে সেই রঞ্জাধরার অধরোষ্ঠের সঙ্গে  
 মিলনে সম্পৃক্ত করতে পারি সাম-নন্দনের অধরোষ্ঠ।  
 তাঁদের সেই মিলনকে আমরা সন্তুষ্ট করে তুলতে চাই,  
 জালের সঙ্গে পরিণয়ে আবক্ষ করতে চাই কুদাবাকে।  
 এইভাবে দাসীগণ বরাননা কুদাবার  
 সকল শুণ একটি একটি করে বর্ণনা করলো।  
 দাসীদের মুখে এই বাণী শুনে  
 দাস-বালকের মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠলো।  
 সে তখন দাসীদের লক্ষ্য করে বললো,  
 চাঁদের সঙ্গে তবে উজ্জ্বলিত সূর্যকেই মানাবে।

এই মিলনকে যদি সমর্থন করেন জগৎপিতা  
 তবে সবারই মন হবে আনন্দ পরিপূর্ণ।  
 তিনি যখন মিলনকে বিরহ দ্বারা ঢেকে রাখেন  
 তখন মনে হয় বুঝি কর্তিত হলো সকল সভাবনার সূত্র।  
 কিন্তু বিছেদ প্রকটিত হলেও অন্তরে গোপন থাকে মিলনের আকাঙ্ক্ষা,  
 এই-ই জগতের রীতি।  
 তাই বীর যখন সংযমের সঙ্গে সন্ধান করেন দম্পতির,  
 তখন তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা সহজে চরিতার্থ হয়।  
 ডিমের উপরে বসে তা দেয় স্ত্রী পাখি,  
 কিন্তু বাচ্চা ফুটে বেরুলে দেখা যায়, পিতার লক্ষণ তাতে পরিস্ফুট।  
 দাস-বালক হাসতে হাসতে ফিরে আসছে দেখে  
 যশস্বী সামপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,  
 ওরা তোকে কি বলেছে যে এমন হাসিমুখে ফিরে আসছিস,—

তোর ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হচ্ছে, দস্তরাজি বিকশিত ?  
দাস-বালক যা শুনে এসেছে, সব বীরবরের কাছে নিবেদন করলো,  
তার বার্তা শুনে বীরবরের হাদয়ে বইলো বসন্তের হাওয়া।  
তিনি দাস-বালককে গিয়ে বললেন, তুই এখনই ফিরে যা,  
এবং দাসীগণকে গিয়ে বল,  
ফুলবনে তোমরা আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করো,  
গোলাপের ডাল থেকে চয়ন করো গোলাপরূপী মুক্তা।  
যতক্ষণ আমি তোমাদের জন্য বাণী নিয়ে না আসি,  
ততক্ষণ তোমরা প্রাসাদে ফিরে যেয়ো না।  
এই বলে বীরবর রাজকোষ থেকে স্বর্ণমুদ্রা ও কতিপয় মুক্তা  
এবং পাঁচ জোড়া স্বর্ণখচিত মূল্যবান পারিষ্ঠে আনিয়ে নিলেন।  
তারপর স্বীয় শয়নকক্ষের নিভৃত কোণ থেকে  
বের করে আনলেন এক মণি-মঞ্জুষা ;  
এবং তার থেকে বাদশাহ মনুচেহেরের দেওয়া  
দুটি অঙ্গুরীয় তিনি রুদাবার জন্য মনোনীত করলেন।  
এইবার দাস-বালককে সম্বোধন করে জাল বললেন,  
এইগুলি নিয়ে যাও আর আমার মনের কথা তাদের বলো।  
দাস-বালক যথাসত্ত্ব স্বর্ণমুদ্রা ও উপটোকণাদিসহ  
সুন্দরী পঞ্চদাসীর নিকটে এসে উপস্থিত হলো।  
এবং সেই স্বর্ণ ও মুক্তা বীরবর জালের নাম করে  
তুলে দিলো তাদের হাতে।  
একজন দাসী তখন দাস-বালককে বললো,  
কথা কখনো গোপন থাকে না।  
যতক্ষণ তা দুজনের মধ্যে থাকে তখনই তা গোপন,  
তিনজনের কাছে গেলেই তা প্রকাশ পায়, চারজনের কাছে  
পরিণত হয় আসরের বস্ত্রে।  
ওগো বুদ্ধিমান রাজানুচর,  
যদি রাজ সমীপ থেকে কোন বাণী এনে থাক, তবে বলো।  
দাসীগণ তখন জালের মনোভাব তার মুখ থেকে জানতে পেলো,  
জানলো রুদাবার বিছেদ বেদনায় তিনিও কাতর।  
সংবাদ শুনে দাসীগণ পরস্পরের মধ্যে মিথ্যে কথা বলাবলি শুরু করলো,  
বললো, প্রমত্ত সিংহ অবশ্যই জালে ধরা পড়েছে।  
রুদাবা ও জালের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার

শুভ সক্ষেত নয়নগোচর হচ্ছে।  
যথা সময়ে রাজাৰ সন্দেশবাহী গোলাঘ ফিৰে এসে  
সকল কথা তাঁকে নিবেদন কৱলো।  
আনন্দোদ্দেশিত চিষ্টে রাজা ফুলবনেৰ পথ ধৱলেন,  
ও কাবুলস্তানেৰ দাসীদেৱ কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

সুগঠিত-প্ৰতিমা সুন্দৱী দাসীগণ  
রাজাকে দেখে সাষ্টাঙ্গে প্ৰণত হলো।  
রাজা তখন তাদেৱ কাছে জিজ্ঞাসা কৱলেন,  
অদেখা প্ৰিয়তমাৰ রূপ-সৌন্দৰ্য ও স্বভাৱ-সৌন্দৰ্যেৰ কথা।  
বললেন, তাৰ রূপ ও বৃক্ষিমতা কিৱৰপ ?  
তোমৰা সব একে একে খুলে বলো।

সাবধান, মিথ্যা ত্বোকবাকেয় আমাকে ভুলাতে চেয়ো না,  
সত্য বললে বৃক্ষি পাৰে তোমাদেৱ সম্মান।

কিন্তু যদি মিথ্যা বলো, তবে জেনে রাখ,  
হাতীৰ পায়েৰ তলায় আমি তোমাদেৱ নিষ্পিষ্ট কৱবো।

এই কথা শুনে ভয়ে পিঙ্গলবৰ্ণ হলো দাসীদেৱ মুখ,  
তাৰা সভয়ে রাজ-সমীপে মৃত্তিকা চুম্বন কৱলো।

দাসীদেৱ মধ্যে বয়সে যে সৰ্বকনিষ্ঠ  
সে জালকে সম্বোধন কৱে বললো,  
মাতৃগৰ্ভ থেকে যারা দুনিয়ায় জন্মগ্ৰহণ কৱেছে  
রাজাদেৱ মধ্যে তেমন জন হলেন মহামতি সাম ;

তাৰ দেহসৌষ্ঠব ও বৃক্ষিমতা অনুপম।

ওগো বীৱাৰ্গণ্য, দ্বিতীয় জন আপনি স্বয়ং —  
সিংহ-বাহু উন্নতশিৱ।

ত্বীয় জন হলেন সেই চন্দ্ৰাননা ঝুঁদাৰা,  
রঞ্জতশুভ্ৰ দেবদারুতুল্য যীৱ দেহ, যিনি গৌৱশালিনী।

আপাদমন্তক তিনি গোলাপ ও চামেলীৰ মতো,  
তিনি উন্নতদেহা ও সৌভাগ্যশালী।

তাৰ মুখ থেকে ঘৰে সুৱার উন্মাদনা,  
তাৰ কেশৱজি থেকে উথিত হয় আবীৱেৰ সুগন্ধ।

মুশক ও অস্পৰ দ্বাৱা বুনানো তাৰ কুস্তল,  
সূৰ্যকান্ত মণি ও মুকুতায় উজ্জ্বল তাৰ বক্ষদেশ।

তাৰ কোঁকড়ানো চুলেৰ বাঁধুনীতে

রহস্যের পর রহস্য নিবিড় হয়ে আছে।  
 তুলিতে আঁকা ছবির মতো তিনি, চীন দেশে\* যাঁর উপমা বিরল,  
 তাঁর প্রশংসনা উচ্চারণ করে স্বয়ং পূর্ণচন্দ্র ও পারবীন তারা।  
 এই রূপবর্ণনা শুনে আকুল রাজা  
 দাসীকে অত্যন্ত মিষ্টস্বরে বললেন,  
 এখন বলো, কি উপায় করা যায় ?  
 কোন্ পথে তার সান্নিধ্যে গিয়ে পৌছান সম্ভব ?  
 আমার হৃদয়-মন উত্তলা হয়েছে তার প্রেমে,  
 তার মুখ দর্শনের জন্য উদ্বেলিত হয়েছে আমার সকল বাসনা।  
 দাসী বললো, যদি অনুমতি দেন  
 তবে এক্ষুনি আমরা ধাবিত হই প্রাসাদের দিকে।  
 বীরবরের সৌভাগ্যযুক্ত পরামর্শ থেকে —  
 তার বাণী, ব্যক্তিত্ব ও জাগ্রত চিত্ত থেকে —  
 এক সদেশ আমরা বহন করে নিয়ে যাবো,  
 এবং রচনা করবো এক কৌশল।  
 সেই বরনারীর সুরভিত মন্তক অবশ্যই ফাঁদে আবদ্ধ করবো,  
 তার সুরঞ্জিত ওষ্ঠাধর এনে ধরবো সাম—নন্দনের ওষ্ঠাধরের উপর।  
 বীরবরকে রজ্জু সোপান\*\* সহ  
 সিংহকে মিটাতে হবে তার সাধ !  
 তখন দেখবেন, কেমন অনুপম হয় সেই মধুর লগ্ন,  
 রাজকন্যার কর্তসুধায় কেমন আপুত হয় আপনার হৃদয় দেশ।

---

• চৈনিক চিত্রকলার অনবদ্যতার প্রশংসনা ফারসী সাহিত্যে প্রচুর আছে।  
 ফারসী প্রতিশব্দ “কমন্দ” কমন্দ এক প্রকার অস্ত্রণ ; মহাভারতীয় পাশ তার অনুরূপ।

## କୁଦାବା-ସମୀପେ ଦାସୀଦେର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଦାସୀର ଏହି ପରାମର୍ଶ ବୀରବରେର ମନଃପୂତ ହଲୋ,  
ତା'ର ଅନ୍ତର ଥେକେ ଦୂରୀଭୂତ ହଲୋ ବିଛେଦେର ସକଳ ଶୋକ ।  
ସୁନ୍ଦରୀରା ଚଲେ ଗେଲେ ଜାଲଓ ଫିରେ ଏଲେନ ଶିବିରେ,  
ବର୍ଷ-ସୂଚନାର ରାତ୍ରି କ୍ରମେ ଗଭୀର ହୟେ ଏଲୋ ।

ଏହିକେ ସୁନ୍ଦରୀରା ପ୍ରତ୍ୟାବ୍ରତ ହଲୋ କାବୁଳ ରାଜପ୍ରାସାଦେର ସିଂହଦ୍ଵାରେ,  
ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ହାତେ ଦୁଟି କରେ ଡାଲଶୁଦ୍ଧ ଗୋଲାପ ।  
ଦ୍ୱାରା-ରକ୍ଷକ ତାଦେରକେ ଦେଖେ ଏଗିଯେ ଏସେ ପଥ ଆଟକାଲୋ  
ଏବଂ ତାଦେରକେ ଭର୍ତ୍ସନା କରେ ବଲଲୋ,  
ଏହି ଅସମୟେ ତୋମରା କି କରେ ବାହିରେ ଏଲେ ?  
ତୋମାଦେର ଏଭାବେ ଦେଖେ ଆମି ବିଶ୍ଵିତ ହଲାମ ।  
ସୁନ୍ଦରୀଗଣ ଜବାବ ପ୍ରତ୍ୟେକର କରେ ଦାରୋଯାନକେ ବଲଲୋ,  
ଆଜକେର ରାତ ଅନ୍ୟ ରାତରେ ମତୋ ନୟ,  
ବାଗାନେ ଆଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଂବା ଦୈତ୍ୟର ଆନାଗୋନା ନେଇ ।  
ବସନ୍ତକାଳ ଏସେଛେ, ତାଇ ବାଗାନେ ଫୁଲ ତୁଳାଛି,  
ଧରଣୀ ଥେକେ ଚଯନ କରଛି ସୁଚିକନ ସୁମ୍ବୁଲ-ଲତା ।\*

ରାଜକନ୍ୟା କୁଦାବାର ଆଦେଶେ ତା'ର ମନୋରଞ୍ଜନେର ଜନ୍ୟ  
ପୁଷ୍ଟଚଯନେ ଆମରା ବହିର୍ଗତ ହୟେଛି ।  
ତୁମି କେନ ଆମାଦେରକେ ଏମନଭାବେ ଭର୍ତ୍ସନା କରଛୋ ?  
ଆମରା ଯେ କାଁଟାର ଭିତର ଥେକେ ଚଯନ କରେ ଏନେହି କୋମଲ ଗୋଲାପ ।  
ଦାରୋଯାନ ବଲଲୋ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନଶୁଲିକେ  
ଅନ୍ୟଦିନେର ମତୋ ମନେ କରା ଉଚିତ ନୟ ।  
କାରଣ, ବୀରପ୍ରଭର ଜାଲ ଏଥିନ କାବୁଲେ ସମାଗତ,  
ତା'ର ଶିବିର ଓ ସୈନ୍ୟଦଳେ ଆଛନ୍ତି ହୟେଛେ ଧରିତ୍ରୀ ।  
ତୋମରା କି ଦେଖତେ ପାଓ ନା, କାବୁଲାଧିପତି  
ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଶିଶେଷେ ପ୍ରାସାଦ ଥେକେ ବିନିର୍ଗତ ହୟେ  
ତା'ର ସମୀପେ ଗମନ କରେନ; ଜାନୋ ନା,  
ତା'ଙ୍କରେ ମଧ୍ୟେ ବସ୍ତୁତ କତ ନିବିଡ଼ ହୟେ ଉଠେଛେ ।  
ଯଦି ତିନି ତୋମାଦେରକେ ଏଭାବେ ଫୁଲ ହାତେ ଦେଖତେ ପାନ

\* ଚୁଲେର ମତୋ ସୁଗଙ୍କୀ ଲତା ବିଶେଷ ।

তবে তোমাদের অবস্থা কি হবে একবার কল্পনা করতে পারো ?  
যাও, আর কখনও অস্তঃপুর থেকে বেরিয়ো না,  
চলে যাও, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

সুন্দরীগণ রূদ্বাবার সমক্ষে উপস্থিত হয়ে  
পরিবেশন করলো সকল গোপন সংবাদ।  
তারা বললো, এমন সূর্যসদৃশ পুরুষ কোথাও দেখিনি,  
তাঁর মুখমণ্ডল গোলাপ পাপড়ির বর্ণযুক্ত এবং কেশরাজি সাদা।  
সংবাদ শুনে রূদ্বাবার অন্তর প্রেমে পূর্ণ হলো,  
প্রিয়তমের দর্শনাকাঞ্চকায় প্রবল হলো তাঁর হৃদয়।  
দাসীগণ স্বর্গমুদ্রা ও মুক্তাঙ্গলি তাঁর সামনে রাখলে  
রূদ্বাবা তাদেরকে প্রশঁসন করলেন জাল সম্পর্কে।  
বললেন, তোমরা বলো সাম পুত্রের সঙ্গে  
তোমাদের সময় কেমন কাটলো ? তাঁর মাহাত্ম্য কিরূপ ?  
সুন্দরীগণ তখন একে একে  
ব্যক্ত করলো জাল সম্পর্কে তাদের অভিমত।  
তাঁরা বললো, জালের মতো বীর দুনিয়ায় নেই,  
তাঁর মতো মহিমাব্যঞ্জক চেহারা কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।  
তাঁর শৌরুষদৃষ্টি দেহ উন্নত দেবদারুর মতো,  
সকল বিবেচনায়ই তিনি রাজপদের যোগ্য।  
যেমন তাঁর বর্ণ তেমনই দেহ-সৌরভ,  
তিনি ক্ষীণমধ্য ও প্রশস্ত-বৃক্ষ।  
তাঁর দুই চোখ যেন শিশিরসিঙ্গ নার্গিস,  
অধরোষ রঙিম ও মুখমণ্ডল গোলাপী আভাযুক্ত।  
তাঁর দুই বাহু ও স্বক্ষণ সিংহের তুল্য,  
তিনি সচেতন, জ্ঞানী, মহিমাময়।  
তাঁর মন্ত্রকের কেশরাজি সাদা  
অর্থ এই ক্রটিই যেন তাঁকে দান করেছে মাহাত্ম্য।  
তাঁর কোকড়ানো চুল মুখের উপর নেমে এসেছে জুলফির আকারে,  
যেন রঙগোলাপের উপর নেমেছে সাদা কিশলয়ের আবরক।  
আপনাকে বলতেই হবে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু দেখিনি,  
এমন না হলেই বরং সৌন্দর্যের হানি হতো।  
তিনি ব্যক্ত করেছেন আপনার সঙ্গে মিলনের আকাঞ্চকা,

আশান্বিত অস্তরের মধুরলঘু বিফল না হয়।  
রাজকন্যা, এখন অভ্যাগতজনের অভ্যর্থনার আয়োজন করুন,  
আমাদেরকে কি করতে হবে আদেশ করুন।

তাদের এই কথা শুনে ঝন্দাবা বললেন,  
পরামর্শ ও বাণীতে তোমরা লাভ করো নব নব কুশলতা।

পাখির প্রতিপালিত ছিলেন যে জাল  
যিনি ছিলেন বিষণ্ণ ও শুভকেশ—  
তাঁরই মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হয়েছে গোলাপ,  
সুগঠিত দেহ, সুন্দর মুখ ও বীরত্বব্যঙ্গক হয়েছে তাঁর চেহারা।

সাজিয়ে দাও তোমরা আমাকে তাঁর সামনে,  
এবং মূল্য আদায় করো মহামূল্য সম্পদের।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্দাবার গণে দেখা দিলো লাজারুণ,  
তাঁর মুখমণ্ডল শরমে ডালিমফুলের মতো রঙিন হয়ে উঠলো।

এক দাসীকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন,  
ত্বরিত তোমাকে যেতে হবে তাঁর কাছে।

সুসংবাদ বহন করে তুমি যাবে এই আসন্ন সন্ধ্যায়,  
এ-পক্ষের কথা তাঁকে বলবে, পরিবর্তে শুনবে তাঁর বাণী,  
যাতে তোমার প্রত্যাবর্তন হয় সফল,  
এবং তুমি ফিরে এসে দেখতে পারো পূর্ণচন্দ্রের নীরব হাসি।

দাসী যথাসময়ে যাত্রা করে  
শুভসন্দেশ নিয়ে আবার ফিরেও এলো ঝন্দাবার কাছে।

চন্দ্রবদনা প্রভুকন্যাকে সম্বোধন করে দাসী বললো,  
এখন উপায় চিন্তা করুন আগতপ্রায় মিলনের।

বিশ্ব-প্রভু আপনার বাসনা পূর্ণ করার পথে এনেছেন,  
শুভ হোক আমাদের সকলের পরিণাম।

ঝন্দাবা অবিলম্বে তাঁর ধনিষ্ঠতম সাথীদের নিয়ে  
গোপন মিলনের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন।

তাঁর এক প্রাসাদ ছিল আনন্দ সমুজ্জ্বল মধুমাসের মতো।

গুরুজনদের নির্দেশে সেটি নির্মিত হয়েছিল রাজকন্যার নিভৃত  
নিকেতন রূপে।

দাসীগণ সেই প্রাসাদকে চীনদেশীয় কিংখাব দ্বারা সজ্জিত করলো  
জরিদার যবনিকা প্রলম্বিত করলো তাঁর কক্ষে কক্ষে।

সুবা, কস্তুরী অম্বর ছিটিয়ে দিলো সর্বত্র,

মেঝেতে ছড়িয়ে দিলো মণিমুক্তার সন্তার।  
নীলোৎপল, শোলাপ ও রক্তজবা চায়িত হলো,  
সয়ত্বে বিন্যস্ত হলো চামেলীর শাখা ও সুম্বুলতা।  
স্বর্ণ ও নীলার পান-পাত্র  
গোলাপী পানীয় দ্বারা পূর্ণ করে রাখা হলো।  
এইভাবে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হলে সূর্যবদনী রাজকন্যা  
সূর্যের আশায় উন্মুখ হয়ে রইলেন।



## ରୁଦାବା ସମୀପେ ଜାଲ

ପଶ୍ଚିମାକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ ଗୋଲେ ଦାସୀଗଣ ରାଜକନ୍ୟାର କକ୍ଷ  
କୁଳୁପ ସଂବଦ୍ଧ କରେ କୁଞ୍ଜିକା ଗୋପନ କରଲୋ ।

ସାମ-ପୁତ୍ରକେ ପଥ ଦେଖିଯେ ଆନାର ଜନ୍ୟ

ରାଓୟାନା ହେଁ ଗୋଲେ ଏକ ଦାସୀ ।

ଯଥାସମୟେ ବୀରପ୍ରବର ମୁଖ କରଲେନ ରାଜପ୍ରାସାଦେର ଦିକେ,  
ତା'ର ଅନ୍ତର ପ୍ରିୟତମାର ମିଳନାକାଙ୍କ୍ଷାୟ ଗୁଣ୍ଠରିତ ହଲୋ ।

କଞ୍ଚନନ୍ଦୀ ଗୋଲାପତନୁ ରୁଦାବା

ଅଲିନ୍ଦ୍ୟୁକ୍ତ ଛାଦେର ଉପର ଗିଯେ ଉଠଲେନ ;

ସୁଉନ୍ନତ ଦେବଦାର ମାଥାର ଉପର ଯେନ

ଶୋଭା ପେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ।

ଏମନ ସମୟ ଦୂରେ ଦେଖା ଦିଲେନ ଅଶ୍ଵାରୋହୀ ସାମ-ପୁତ୍ର ।

ରାଜକନ୍ୟା ରାତ୍ରିର ନୀରବତାକେ ସଚକିତ କରେ ବଲଲେନ,

ଆପନାର ଆଗମନ ଶୁଭ ହୋକ, ଓଗୋ ଆମାର ଆକାଙ୍କ୍ଷିତ

ଯୌବନଶାଲୀ ।

ବିଶ୍ୱ-ମୁଢ଼ାର ଆଶୀର୍ବଦ୍ଦ ବର୍ଷିତ ହୋକ ଆପନାର ଉପରେ,

ଏବଂ ତା'ର ଉପରେ ଯିନି ଜନ୍ମ ଦିଯେଛେ ଆପନାର ମତୋ ପୁତ୍ର ।

ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଆପନାର ମୁଖେର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତାୟ ଦିନେର ମତୋ

ପ୍ରଭାମୟ ହେଁଛେ,

ଆପନାର ଦେହେର ସୌଗନ୍ଧେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁଛେ ଧରିତୀର ପ୍ରାଣ ।

ବୀରପ୍ରବର ଜାଲ ଅଶ୍ଵପୃଷ୍ଠ ଥେକେ ଏହି ଆବାହନ ଶୁନତେ ପେଯେ

ଛାଦେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ଦେଖଲେନ ସୂର୍ଯ୍ୟ-କନ୍ୟାର ବଦନମ ଶୁଳ ।

ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ତା'ର ରାପେର ଆଲୋଯ ଆଲୋମୟ ହେଁଛେ ଚାରଦିକ,

ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣର କାହେ ତୁଳ୍ଚ ହେଁ ଗେଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତମଣିର ବର୍ଣ୍ଣମାରୋହ ।

ଜ୍ବାବେ ବୀରପ୍ରବର ବଲଲେନ, ଓଗୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି,

ତୋମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆକାଶେର ଆଶୀର୍ବଦ୍ଦ ହେଁ ଝରହେ ଆମାର ଶିରେ ।

ଆହା ! ଏହି ତାରକିତ ରାତ୍ରିର ଐଶ୍ୱର ଅନ୍ତହୀନ,

ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୁର ପ୍ରଶଂସାୟ ଆମି ଉଚ୍ଚକଟ୍ଟ ହଲାମ ।

ଆମାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗଂପତି ଯେନ ବାସରେର ଗୋପନେ,

ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଟିତ କରେନ ତୋମାର ମୁଖ ।

ତୋମାର କଠିନରେ ଲାଭ କରାଇ ପରମ ସୁଖ,

ତୋମାର ମଧୁର କଥାୟ ହେଁଛି ଆମି ଆପ୍ୟାଯିତ ।

এখন বলো তোমার সমীপে আসার উপায় কি ?

আমাকে কি করতে হবে তাও বলো ।

সুন্দরী রূদাবা তখন উন্মুক্ত করলো

তাঁর সুদীর্ঘ কেশপাশ ।

এবং সেই দীর্ঘ কেশে তৈরি করলেন

এক রঞ্জুসোপান—অপূর্ব অনিন্দ্য ।

তাতে কুঞ্চনের পর কুঞ্চন,

যেন সর্পশ্রেণীর দেহে ছন্দের তরঙ্গ উঠেছে ।

সেই কেশরাজি ছাদের উপরের অলিন্দ থেকে

প্রলম্বিত হলো নীচে মাটি পর্যন্ত ।

রূদাবা গৃহশীর্ষ থেকে ডেকে বললেন,

ওগো বীরপুত্র পুরুষ প্রবর,

এখন সচেষ্ট হোন —

সিংহের বুক ও কেয়ানী পাঞ্জার সহায়তায় ।

ধারণ করুন এই কালো কেশদাম,

আপনার জন্য আমি কেশরাপে প্রলম্বিত হলাম ।

দীঘিন ধরে সংযতে পরিচর্যা করেছি এই চুলের,

সময়ে তা দিয়ে যেন বন্ধুর সহায়তা করতে পারি ।

জাল চোখ তুলে দেখলেন রাজকন্যার চন্দ্রমুখ,

আর তাঁর কালো চুলের সমারোহ ।

প্রশংসা করলেন তিনি তাঁর চুলের এবং তা চুম্বন করলেন,

রাজকন্যা উপর থেকে শুনতে পেলেন সেই চুম্বনের আওয়াজ ।

জাল বললেন, আহা ! সুখের ভারা এখনও আমার পূর্ণ হয়নি,

সূর্য আজকের দিনে তুমি আর উদিত হয়ো না ।

আমার চক্ষেল বুকের উপর রেখেছি আমার হাত,

তাতে বিন্দ করেছি তীক্ষ্ণতম শায়ক ।

এই বলে তিনি রঞ্জুসোপান ধারণ করে

উপরে উঠার জন্য উদ্যত হলেন,

সোপান-বৃত্তে নিজেকে সংলগ্ন করে ।

মুহূর্ত মধ্যে উঠে এলেন গৃহশীর্ষে ।

বীরবর সেই আনন্দযুক্ত ছাদে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রূদাবা তাঁর সামনে এসে আভূমি প্রণত হলেন ।

জাল ধারণ করলেন রূদাবার হাত,

একে অন্যের স্পর্শ লাভ করে হলেন ভাবে বিভোর।  
এইবার সুতনু রুদাবা জালের হাত ধরে  
প্রাসাদের ছাদ থেকে নীচে নেমে  
এগিয়ে গেলেন স্বর্ণ-খচিত স্বীয় কক্ষের দিকে,  
দাসীগণ স্বর্গীয় হৃরীদের মতো সেখানে অপেক্ষমান রয়েছে।  
রাজকন্যার মুখ, চূল ও কক্ষের সজ্জা-সমারোহ দেখে  
বিস্ময়ে হতবাক হলেন জাল।  
দেখলেন, রুদাবা কুশল ও কঠহারে  
এবং স্বর্ণখচিত কৌমিক বস্ত্রে নব বসন্তের মতো শোভনীয় ;  
তাঁর দুই গালে প্রশঁস্তি হয়েছে দুটি লালা ফুল,  
তাঁর কুঞ্জিত কেশে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠেছে।  
জাল সম্মাটের সমারোহে  
উপবিষ্ট হলেন রাজকন্যার সামনে।  
তাঁর বক্ষবাসের নীচে লুকানো রয়েছে এক তীক্ষ্ণধার খঞ্জর,  
সূর্যকান্তমণি-শোভিত শিরস্ত্রাণ তাঁর মাথায়।  
তাঁকে দেখে রুদাবার হরিণ-আঁখি চঞ্চল হলো,  
তিনি গোপন কটাক্ষে বার বার চেয়ে দেখলেন জালকে।  
জালের প্রশংস্ত কাঁধ ও ঐশ্বর্য-বিমণিত দেহ —  
যেন শক্ত পাথরে খোদিত এক অপূর্ব মানব মূর্তি।  
তাঁর মুখমণ্ডলের দীপ্তি কেড়ে নেয় হৃদয়-মন,  
তাঁর দৃষ্টি প্রাণের সলিতায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়।  
বীরগ্রবর জাল চন্দননাকে সম্বোধন করে বললেন,  
হে সুবাসিত সরল দেবদার !  
মনুচেহের যদি আমাদের এই কাহিনী শোনেন  
তবে তা তিনি মেনে নিতে পারবেন না।  
নূরীমান পুত্র সামের জন্যও এ ঘটনা হবে উচ্চার কারণ,  
তিনি ক্রোধে পাঞ্জা বিস্তার করে এগিয়ে আসবেন আমার দিকে।  
কিন্তু দেহ-প্রাণের অমূল্য সম্পদকে  
আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি, আমি ভয় করি না মত্যুকে।  
ন্যায়বান বিশ্ব-প্রভুর নির্দেশে আমি গ্রহণ করলাম তোমার নিবেদন,  
এই প্রেম-শপথ থেকে আমি কখনো প্রত্যাবর্তন করবো না।  
আমি বিশ্ব-প্রভুর দরবারে প্রণত হয়ে উচ্চারণ করবো তাঁর প্রশংসা,  
কারণ, প্রশংসার যোগ্য তিনিই, তিনিই উপাসনার লক্ষ্য।

তিনি নিশ্চিতই সাম ও সম্বাটের অস্তর থেকে  
 ধূয়ে মুছে সাফ করে দিবেন ক্রোধ ও ভৎসনার মালিন্য।  
 জগতের প্রস্তা শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা,  
 তিনিই প্রকট করবেন আমাদের পরিণয় !  
 জালের কথা শুনে ঝদাবা বললেন,  
 ধর্ম ও নীতির প্রভুর নাম নিয়ে আমিও গ্রহণ করলাম আপনাকে।  
 প্রাণের বাদশাখালি আমি আর কাউকে স্থীকার করি না,  
 আমার এই কথার সাক্ষী হলো স্বয়ং জগৎ-পিতা।  
 বিশ্ববরেণ্য জাল ব্যতীত আমার পতি কেউ নয়,  
 কারণ, তিনি মুকুট, সম্পদ, যশ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী।  
 তাঁর প্রেমই সর্বদা জাগরক থাকুক এই অস্তরে,  
 বুদ্ধি দূর হোক — সামনে অবস্থান করুক অমর কামনা।  
 কথোপকথনে রাত শেষ হয়ে এলে পূর্ব আকাশে দেখা দিলো

**শুভ্রতা,**

রাজতোরণে দিবসের সূচনাকারী দুন্দুভি নিনাদিত হলো।  
 এইবার চন্দ্রমুখীকে বিদায়-সন্তান্ত জানালেন জাল,  
 একে অপরের বক্ষলগ্ন হয়ে পরিণত হলেন টানাপোড়েন।  
 বিদায়লগ্নে উভয়ের পক্ষ্মাঞ্জি বাঞ্চাচ্ছন্ন হলো,  
 উদীয়মান সূর্যের উদ্দেশে তাঁরা বললেন,  
 হে পৃথিবীর উজ্জ্বল্যের হেতু, আরো কিছুক্ষণ কি অপেক্ষা করা  
 চলতো না ?

তোমার এই সহসা আগমন কি অত্যন্ত নির্মম নয় ?\*  
 অবশ্যে জাল রঞ্জুসোপান ধারণ করে  
 সৌভাগ্যদায়ক সেই রাজপ্রাসাদ থেকে নীচে নেমে এলেন।

\* রোমিও জুলিয়েটের উক্তি ও তাঁদের মিলন-রাত্রি সুরণীয়।

## ରୁଦାବା ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନୀଦେର ସଙ୍ଗେ ଜାଲେର ପରାମର୍ଶ

ତାପିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଥନ ଉଦିତ ହଲୋ ପୂର୍ବାଚଳେ  
ତଥନ ବୀରବୃନ୍ଦ ସକଳେ ଏକସଙ୍ଗେ  
ସେନାପତି ଜାଲେର ଦର୍ଶନାକାଷ୍ଟକାୟ  
ତା'ର ଶିବିରେର ପଥ ଧରଲେନ ।  
ଏଦିକେ ବୀରବରଓ ଦୂତ ପାଠିଯେ  
ମହତ୍ଵଗଣକେ ଡାକଲେନ ତା'ର କାଛେ ।  
ମତ୍ତୀରା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୋହିତଗଣସହ  
ସମ୍ମୁନ୍ତରଶିର ବୀର ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗକେ ନିଯେ  
ସାନଳେ ସେନାପତି-ଶିବିରେ ଏସେ ହାଜିବ ହଲେନ,  
ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସମୁଦ୍ରାସିତ ତାଁଦେର ଅନ୍ତର ।  
ସାମ-ପୁତ୍ର ତାଁଦେର ଦେଖେ ଉଚ୍ଚମୁକ୍ତ କରଲେନ ତା'ର ରସନା,  
ଶିଷ୍ଟତହାସ୍ୟ ଦେଖା ଦିଲୋ ତା'ର ଠୋଟେ ଓ ହଦୟେ ଗୁଞ୍ଜିରିତ ହଲୋ  
ବାସନାର ବୀଣା ।

ତିନି ବଲଲେନ, ବଦାନ୍ୟତାର ଉଣ୍ସ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୁର ମାହାତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରେ  
ଅନ୍ତର ଆମାର ଆଶା-ଆଶକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଲିତ ହଛେ ।

ଆଶା ତା'ର କରଶାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଭୟ ଆମାରଇ ପାପେର ଚିନ୍ତାୟ,  
ତାରଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଦୃଷ୍ଟି ଆମାର ପ୍ରସାରିତ ହେଁଯେଛେ

ଅନ୍ତିତ୍ରେର ତଳଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ତିନିଇ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରେନ ଚନ୍ଦ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ତାଦେର କକ୍ଷପଥେ,

ଗତି ତାଁରଇ ଦୟାୟ ଧାବିତ ହୟ ସଠିକ ମଞ୍ଜିଲେର ଦିକେ ।

ଦିବାରାତ୍ର ତାଁରଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସାମନେ ପ୍ରଣତ ଥାକତେ ହେବେ ।

ସବାଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରଛେ ତା'ର ସୃଷ୍ଟ ଜଗନ୍ତ ଥେକେ,

ଇହ ପରଲୋକେର ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ପଦ ତାଁରଇ ଦାନ ।

ତିନିଇ ଆନେନ ଧରଣୀ-ବକ୍ଷେ ବସନ୍ତର ପ୍ରାଚୁର୍ୟ, ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଓ  
ପାତା-ଘରାର ମୌସୁମ,

ତାଁରଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଫଳଭାରେ ଅବନତ ହୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଞ୍ଜ ।

କଥନେ ତିନି ଯୌବନେର ରୂପରାଗେ ସଜ୍ଜିତ କରେନ ଜୀବନକେ,

କଥନେ ବାର୍ଧକ୍ୟେର ଜରାୟ ମୁହୂରମାନ କରେନ ଚରାଚର ।

ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏମନ ସାଧ୍ୟ କାରୋ ନେଇ,

ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟତିରେକେ ପିପିଲିକାଓ ଧରଣୀତେ ଏକଟି ପଦପାତ

କରତେ ସକ୍ଷମ ହୟ ନା ।

যখন তিনি লওহ ও কলম<sup>\*</sup> সৃষ্টি করেন,  
 তখনই তিনি নির্ধারিত করেছেন সকল বস্তুর নিয়তি  
 তখনই তিনি নির্ধারিত করেছেন সকল বস্তুর নিয়তি  
 যুগল থেকে ধরিত্বীতে বেড়ে চলে প্রাণের সংখ্যা,  
 এক থেকে বৃক্ষি সন্তুষ্ট নয়।  
 বিশ্ব-প্রভু ব্যতীত এক কেউই নয়,  
 তাঁর সমকক্ষ, দম্পতি কিংবা বস্তু কেউ নেই।  
 যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন, যুগল থেকে সৃষ্টি করেছেন,  
 গৃহ রহস্য থেকে প্রকটিত করেছেন সৃষ্টিকে।  
 উর্ধ্ব আকাশ থেকে বাণী লাভ করেই  
 পত্রে পুন্সে সজ্জিত হয়েছে এই ধরিত্বী।  
 কাল উৎফুল্ল হয়েছে মানুষের জন্য,  
 তারই জন্য কল্পিত বস্তু লাভ করেছে মূল্য ও মর্যাদা।  
 জগতে যদি যুগলের অস্তিত্ব না থাকতো,  
 তবে পৌরুষ ও বীর্য থাকতো লোকচক্ষুর আড়ালে।  
 যুগল ব্যতিরেকে জীবন-ধর্মের রূপ আন্দৰা প্রত্যক্ষ করতাম না,  
 প্রতিষ্ঠিত হতো না জীবন ও যৌবনের সমারোহ।  
 সেই বীরের চেয়ে ভাগ্যবান কে? —  
 হৃদয় যাঁর আলোকিত রয়েছে সন্তানের বাংসল্যে।  
 যখন পিতার উর্ধ্বলোকে প্রস্থানের সময় হয়,  
 তখন সন্তানের কারণেই তিনি নবতর দিককে তাঁর সামনে  
 দেখতে পান।  
 সন্তানের জন্য দুনিয়ায় নাম থেকে যায়, —  
 তখন বলা হয়, এ হলো জালের পুত্র, ও হলো সামের ছেলে।  
 সন্তানের দ্বারাই অলঙ্কৃত হয় সিংহাসন,  
 তার দ্বারা নাম রাখিত হয়, বর্ধিত হয় সৌভাগ্য।

জাল অতঃপর বললেন, এই হলো আমার কাহিনী,  
 আমার হৃদয়-কাননের গোলাপ ও নার্গিস এই — যা আমি বললাম।

\* ফলক ও লিখন। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি ফলকে তাঁর সড়্জনী কলম দ্বারা যা লিপিবক্তৃ করেন সৃষ্টির আদিতে, সৃষ্টিস্তর নিয়তি তা-ই। মনে হয় ফেরদৌসীও এই প্রচলিত বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন।

আমার অস্তর থেকে প্রয়াণ করেছে বুদ্ধি ও বিবেচনা,  
আপনারা এখন বলুন, এই রোগের প্রতিকার কী ?  
যতক্ষণ শোকে সমাচ্ছন্ন না হয়েছি,  
ততক্ষণ কাউকে বলিনি আমার মনোদৃঢ়খের কথা ।  
মেহরাবের গোটা প্রাসাদ আমার আনন্দের সামগ্ৰী,  
সেই প্রাসাদের মৃত্তিকাও আমার কাছে মেহরাব-কন্যাকে,  
তাঁর প্রেমে আমি দুঃখে থেকে কত-না বারি বৰ্ষণ করেছি !  
আমার মন সৌন্দৰ্য্য কন্যার মায়ায় বশীভূত হয়েছে,  
আপনারা বলুন, সামের মনকে এখন কিভাবে বশীভূত করা যায় ?  
বাদশা মনুচেহের যদি এই কথা শোনেন,  
তাহলে তিনি কি একে যোবনের অবিমৃষ্যকারিতা কিংবা  
পাপ বলে গণ্য করবেন ?  
অভিজাত কিংবা সাধারণ যে কেউ দম্পতির রৌজ করে,  
প্রচলিত আইন ও নীতিধর্মের পথেই সে তা করে ।  
জ্ঞানিগণ এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হন না,  
কারণ, এ ধর্মের পথ, এতে পাপ ও কলঙ্কের কিছু নেই ।  
এখন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা জ্ঞানীর বক্তব্য কি, নিবেদন করুন,  
বলুন, বুদ্ধিমানগণ এর মধ্যে কি প্রত্যক্ষ করছেন ?  
রাজপুত্রের এই ভাষণ শুনে উপস্থিত জ্ঞানিগণ চূপ করে শোলেন,  
বুদ্ধিমানগণের কথা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে সেখানেই  
আটকে রইলো ।  
কারণ, জোহাক ছিলো মেহরাবের মাতামহ,  
এবং সেই গৰ্বে পূৰ্ণ তার হৃদয় ।  
এ-কথা ভেবে কেউ মুখ খুলতে সাহস করছিল না,  
কারণ, সকল দম্পতি থেকেই জন্ম নেয় না মহৎ সন্তান ।  
সেনাপতি (জাল) যখন দেখলেন যে, কেউ কথা বলছে না,  
তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ব্যক্ত করলেন স্বীয় মনোভাব ।  
বললেন, আমি বুঝতে পারছি, কেন আপনারা ইতস্তত করছেন,  
কেন উপেক্ষা করছেন আমার অভিমতকে ?  
কিন্তু মনে রাখবেন, যে আমাকে নির্বাচিত করবেন  
তাঁকে সহিতেই হবে নানাকৃপ অপমানের আঘাত ।  
তবু যাঁরা আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন  
এবং তদ্বারা দূর করবেন আমার পথের প্রতিবন্ধকতা,

তাঁদের জন্য আমি হবো সারা দুনিয়ার তুল্য,  
কোন রাজা তাঁর প্রজার জন্য যা করেন, আমি তাঁদের জন্য  
তা করবো ।

একথা শুনে সবাই প্রত্যুষের দানে উদ্যত হলেন,  
সবাই ব্যক্তি করলেন তাঁর মনোরঞ্জনের আকাঙ্ক্ষা ।  
তাঁরা বললেন, আমরা আপনার দাসানুদাস,  
নীরব থেকে আমরা শুধু বিশ্ময়ের সঙ্গে নিবেদন করেছি

আমাদের অপারগতা

যদিও মেহরাব পদমর্যাদায় যথেষ্ট উচু নয়, --  
তেমন সম্মত নয় বীরত্বে, মাঝেত্যে ও ঐশ্বর্যে,  
তবুও সে আরবদের নরপতি,  
আজদাহার (জোহাকের) সে বংশধর ।  
হে রাজা, এজন্য যদি আপনার মনে সংশয়ের উদয় না হয়,  
তাঁর বংশের এই ক্ষটি যদি আপনি সয়ে নিতে পারেন,  
তবে প্রেরণ করুন বীরপ্রবর সামের কাছে এক লিপিকা,  
এবং তাতে উক্ত করুন আপনার উজ্জ্বল হৃদয়ের জ্ঞানগর্ভ বাণী ।  
আপনার জ্ঞান ও কল্পনা আমাদের চাইতে অধিক,  
আপনার প্রজ্ঞা ও কল্পনা আমাদের অনুমানের উর্ধ্বে ।  
সাম যদি বাদশার কাছে স্বীয় মত ব্যক্ত করে  
লিপিকা লিখে পাঠান,  
তবে মনুচেহের বীরবর সামের কথার প্রতিবাদ করবেন না,  
যদি সে—কথা কোন দূরাহ কাজ কিংবা তুচ্ছ প্রস্তাবের দিকেও  
ইঙ্গিত করে ।

## সামের নিকট জালের লিপি লিখন ও অবস্থা পরিষ্কাপন

সেনাপতি জাল অবিলম্বে লিপিকারকে ডেকে পাঠালেন,  
এবং তাঁর সামনে অবারিত করলেন বিহুল চিত্তের ব্যাকুল বাসনা।  
তিনি তাকে সামের কাছে এক লিপি লিখতে বললেন,  
তাতে থাকবে, ভঙ্গি-সন্তানণ, শুভসন্দেশ ও বাণীর প্রণতি।  
লিপিকার ভূমিকা প্রস্তুত করতে হবে তাঁরই প্রশংসা দিয়ে  
যিনি তাঁর অসীম বদান্যতায় সৃষ্টি করেছেন এই ধরণী।  
তাঁরই থেকে আনন্দ তাঁরই থেকে শক্তি,  
তিনিই সৃষ্টি ও প্রণয়ের অধিকর্তা,  
আমরা সবাই তাঁর দাস, তিনিই একমাত্র প্রভু।  
তারপর লিপিতে থাকতে সামের প্রতি ভঙ্গি-বাণী,  
যিনি প্রহরণ, তরবারি ও লোহ শিরম্বাণধারী।  
তিনি তলোয়ার দ্বারা ধোত করেন ধরিত্বীর কলঙ্ক,  
তিনি তারাদল সদৃশ জ্ঞানিগণের আসর করেন আলোকিত।  
বর্মপরিহিত হয়ে নির্ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করেন,  
তিনি ঘোর সংগ্রামে বিতাড়িত করে ফিরেন কিরণিজদের।  
তিনি মাহাত্ম্যবর্ধনকারী যুদ্ধের,  
তিনি অঙ্ককার মেঘদল থেকে ক্ষারিত করেন রঞ্জের ধারা।  
তিনি উৎপাটিত করেন রাজমুকুট এবং হীনবল করেন বীরবৃন্দকে,  
তিনি বসিয়ে দেন বাদশাকে সোনার সিংহাসনে।  
তিনি পৌরুষের সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করেছেন,  
জ্ঞানের দ্বারা উন্মুক্ত হয়েছে তাঁর শির।  
কোন যুদ্ধে যদি সাম নুরীমান  
তাঁর পৌরুষসহ উপস্থিতি থাকতে না পারেন,  
তবে আমি তাঁর দাসের মতো  
তাঁর আদেশের অনুবন্তী হয়ে গতিমান হই।  
মাত্গর্ভ থেকে জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই  
আকাশ আবর্তিত করেছে আমার উপর বিপদের চক্র।  
পিতা যখন আনন্দে দিন যাপন করছিলেন,  
সীমোরগ আমাকে তখন নিয়ে যাচ্ছে সুদূর হিন্দুস্তানের এক পাহাড়ে।  
দুধের পরিবর্তে রক্ত ছিল আমরা খাদ্য,  
অবস্থান করেছি আমি পাখির নীড়ে।

আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পৃক্ত ছিলো সীমোরগের সঙ্গে,  
হৃদয় আমার বিরস ছিল, মুখমণ্ডল ছিল পাণুবর্ণ।  
সে মৃগয়া করে আনতো, তারই প্রসাদ আমি পেতাম,  
তার শাবকদের মধ্যে একজন বলেই গণ্য হতাম আমি।  
মানুষের মুখে সেই অপবাদ এখন আমার অন্তর স্পর্শ করে,  
যুগযুগে সে দুর্ভাগের ধূলি স্পর্শ করবে আমার চক্ষুদুয়।  
সকলে আমাকে সম্মোধন করেন সামের পুত্র বলে  
অর্থচ সাম যখন সিংহাসনে আমি তখন কাল যাপন করেছি  
পাখির নীড়ে।

সাম যখন তাঁর অন্তরে শুনলেন বিশ্ব-প্রভুর ডাক,  
তখনই কেবল তিনি ডাকলেন আমকে তাঁর কাছে।  
বিশ্ব-প্রভুর নিয়তি থেকে কেউ পালাতে পারে না,  
মেঘলোকের উর্ধ্বে উজ্জীয়মান হলেও তা থেকে রেহাই নেই।  
বর্ণা তার তীক্ষ্ণ দস্ত দ্বারা বীরের বক্ষ বিদীর্ণ করে,  
বিস্ত নিয়তির ইঙ্গিতে আপনিই ছিন্নভিন্ন হয় বাঘের চর্মাচ্ছাদন।  
নেহাই সদৃশ কঠিন ও অমোঘ দস্তরাজি ও  
নিয়তি নির্দেশের অনুবর্তী হয়।

হৃদয়-বিদারক এক ঘটনা ঘটে গেছে আমার উপর,  
আমি সর্বজন সমক্ষে তা প্রকাশ করতে পারছি না।  
আমার পিতা যদি সত্যিকারের বীর হয়ে থাকেন,  
তবে ছেটের কাছ থেকে তা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।  
আমি মেহুবাবের কন্যার প্রতি প্রেমাসন্ত হয়েছি,  
আমি অবিরত বিদ্যুৎ হচ্ছি তপ্ত অগ্নিতে !  
রাত্রির তারা আমার দোসর হয়েছে,  
আমার বুকে ধারণ করছি এক তরঙ্গেচ্ছল নদী।  
যে-বেদনা আমি লাভ করছি আমার অন্তর থেকে,  
তা আসরের লোকদের চোখে জল ঝরাচ্ছে।  
যদিও আমি অন্তরে ঐ দুঃখ পাচ্ছি,  
তবুও আপনার আদেশ ব্যতিরেকে কোন দিকে আমি  
পা বাঢ়াবো না !

এখন বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতির কি আদেশ আমার প্রতি ?  
কিভাবে আমি পরিত্রাণ পাবো এই দুঃখ থেকে ?

আমি মেহুরাব-কন্যাকে বিবাহ করতে চাই,  
দেশ-ধর্মের রীতি ও নীতি অনুযায়ী।  
পিতার নিশ্চয় মনে আছে সেদিনের কথা,  
যেদিন পিতা সকলের সামনে শপথ করে বলেছিলেন,—  
সেইদিন যেদিন আমি প্রত্যাবর্তন করেছিলাম আলবুর্জ পাহাড় থেকে।  
বলেছিলেন, তোমার হৃদয়ের কোন বাসনাকে আমি দলিত  
করবো না,

এখন দেখুন, আমার অস্ত্রে বন্দী হয়ে আছে এক দূরাত্ম কামনা।  
পিতার নিকট লিখিত এই লিপি নিয়ে দুজন অনুচর সহ এক দুত  
বিদুৎ গতিতে কাবুল থেকে সামের অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলো।  
দুতকে বলে দেওয়া হলো, পথচলায় ফ্লাণ্টি এলে  
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিবে।  
পরক্ষণেই দ্রুত অশু প্রধাবনে অগ্রসর হবে  
যাতে শীঘ্র সেখানে গিয়ে তুমি পৌছতে পার।

পর্বত প্রদেশে একটি ধুলিঝড়ের অনুরূপ তারা দৃষ্টিগোচর হলো,—  
যেন দূরাত্ম চিতাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে ব্যাধ।

এবং উচ্চারণ করলো সামের প্রশংসা।  
সাম দৃতের কুশল জিঞ্জাসা করলেন এবং জিঞ্জাসা  
করলেন লিপির কথা  
দৃত তখন জালের সংবাদ তাঁকে প্রদান করলো।  
সেনাপতি দ্রুত লিপিকার বঙ্গন উন্মোচিত করলেন,  
এবং পর্বতশীর্ষ থেকে নেমে এলেন নীচে।  
দৃত একটি একটি করে জালের কথা সেনাপতিকে বললো,  
শুনতে শুনতে সাম বিশ্ময়াবিষ্ট হলেন ও পরিম্মান  
হলো তাঁর মুখমণ্ডল।  
জালের বাসনা তাঁর মনঃপূত হলো না,  
তার কাছে অন্যপ্রকার তিনি আশা করেছিলেন।  
অবশ্যে উন্তরে তিনি দৃঢ় করে বললেন,  
তার স্বভাবের অনুযায়ী কথাই সে উচ্চারণ করেছে।  
ঘণ্টিত পাখি যার শিক্ষাদাতা,  
কালের কাছে তো সে তেমন বস্তুই আকাঙ্ক্ষা করবে।  
ক্রীড়া-প্রাণৰ থেকে গৃহে গিয়ে সাম  
দীর্ঘক্ষণ আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন।  
ভাবলেন, যদি বলি, এ-বিয়েতে আমার মত নেই  
তোমার আকাঙ্ক্ষা সুপথে পরিচালিত নয়,  
তবে বিশ্ব-প্রভু ও মানুষের কাছে  
আমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের দোষে দোষী হবো।  
যদি বলি সত্যই তোমার আকাঙ্ক্ষা গ্রহণযোগ্য,  
তবুও তুমি সে আকাঙ্ক্ষা থেকে মনকে ফিরিয়ে নাও  
তাহলে, পাখির প্রতিপালিত ও দৈত্যবৎশোষ্ণুত বলে  
সে সর্বত্র পরিচিত হবে।  
দুচিন্তার ভারী হয়ে এলো সেনাপতির মস্তিষ্ক,  
তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে অবশ্যে ঢেলে দিলেন নিজেকে  
নিদ্রার কোলে।  
কথা যদি মনে আবদ্ধ হয়ে থাকে  
তবে তাতে দেহ ক্লিষ্ট হয়, মন হয় ক্লিষ্টতর;  
সেজন্যই অস্তনিহিত বাক্যকে প্রকাশ করা উচিত,  
বিশ্ব-প্রভুর আদেশও তাই।

## জাল সম্পর্কে পরামর্শদাতাদের কাছে সামের মত প্রকাশ

নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে সাম তাঁর পরামর্শদাতাদের  
এক সভা ডাকলেন।  
তিনি সেখানে নক্ষত্রবিদদের কাছে প্রকাশ বরলেন ঘটনা,  
এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এর পরিণাম কি হবে?  
দুটি মূলবস্ত পানি ও আগুন, এদের মিলনে  
নিরাকৃশ অনর্থ দেখা দিতে পারে।  
অবশ্যই বিচারের দিনে  
ফারেদুনের ও জোহাকের পরম্পর প্রতিদুর্দুরী হয়ে দাঁড়াবেন।  
আপনারা নক্ষত্র গণনায় মনোনিবেশ করুন এবং বলুন  
নিয়তির লিখনী সৌভাগ্যের দিকে মুখ করেছে কি না?  
নক্ষত্রবিদগণ দীর্ঘদিন ধরে আকাশের রহস্য জানতে সচেষ্ট রইলেন।  
তারপর হাস্যমুখে ও আনন্দিত চিঠে  
ভাগ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁরা  
সাম-নুরীমানের সীমাপে আগমন করে বললেন,—  
হে স্বর্ণকটিবক্ষধারী বীর,  
আপনাকে জাল ও মেহরাব-কন্যা সম্পর্কে শুভসন্দেশ দিতে এসেছি,—  
এই যুগলের পরিণয় সৌভাগ্য-নির্দেশিত।  
ঠিকের প্রতিভা থেকে জন্ম নিবে এমন এক দুরস্ত হস্তী  
যিনি পৌরষে বন্ধন করবেন স্বীয় কঠিদেশ।  
তিনি স্বীয় তরবারির বিক্রয়ে বিশাল জগৎকে পদানত করবেন,  
এবং ইরান-শাহের সিংহাসনকে স্থাপন করবেন মেঘলোকের উর্ধ্বে।  
সত্যাটের অমঙ্গলকামীদের তিনি সমূলে উৎপাটিত করবেন,  
সমতলভূমিতে থাকবে না আর অঙ্ককার কোন গুহা।  
না সাকসারগণ থাকবে, না থাকবে মাজিন্দিরানী সম্প্রদায়,  
তিনি ধরিত্রীকে স্বীয় প্রহরণ দ্বারা ঘোত করবেন।  
তাঁরই হাত থেকে তুরানীগণ লাভ করবে অমঙ্গল,  
এবং ইয়ানীয়দের লভ্য হবে সুকল্যাণ।  
বেদনার্ত ফস্তিক তাঁর সহায়তায় সুখ-নিদ্রা লাভ করবে,

\* ফলক ও লিখনি। প্রচলিত বিশ্বাস মতে, সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি ফলকে তাঁর সূজনী কলম দ্বারা যা  
লিপিবদ্ধ করেন সৃষ্টির আদিতে, সৃষ্টিবস্তুর নিয়মিতি তা-ই। মনে হয় ফেরদৌসীও এই প্রচলিত  
বিশ্বাসে বিশ্বাসী হিলেন।

তিনি বিগ্রহ ও দুঃখ-কষ্টের দ্বার রূপ্ত করে দিবেন।  
 তিনিই হবেন ইরানীয়গণের আশার কেন্দ্রবিন্দু,  
 সুসংবাদ ও সুকল্যাণ বিনির্গত হবে সেই সীর থেকে !  
 তাঁর অশ্বের পদচতুষ্টয় যুদ্ধক্ষেত্রে চমক দিয়ে ফিরবে,  
 সেই অশ্বের মুখ স্পর্শ করবে সিংহের বদনমণ্ডল।  
 তাঁর যুগের সম্মাটের বহু ভাগ্য,  
 কাল তাঁর নাম থেকেই লাভ করবে আনন্দ।  
 রোম, হিন্দুস্তান ও ইরান যেই হোক না কেন,  
 সবাই স্থীয় অঙ্গুরীয়ে অঙ্গিত করবে তাঁর নাম।  
 নক্ষত্রবিদগণের কথা শুনে সাম মদুহাস্য করে  
 জাল-প্রেরিত দৃতদের গ্রহণ করলেন।  
 এবৎ তাদেরকে দান করলেন স্বর্ণরোপ্য ;  
 যেন ভয়ের মধ্যে তিনি লাভ করেছেন আশুস্তি।  
 জালের দৃতকে কাছে ডেকে মহামতি সাম  
 অনেক কথা বললেন।  
 তাকে বললেন, জালকে কুশল জিজ্ঞাসার পরে বলো যে,  
 তার এই বাসনায় আপত্তির কিছু নেই।  
 তবে এখন ধৈর্য ধারণ করো ও কথাটা গোপন রাখ,  
 যাতে কেউ এ-সম্পর্কে—কিছু না জানতে পারে।  
 আমি আজ রাত্রিশেষেই এ-যুদ্ধক্ষেত্র থেকে  
 ইরান-অভিমুখে পরিচালিত করবো সৈন্যদল।  
 সেখানে গিয়ে জানবো, সম্মাট এ-ব্যাপারে কি বলেন ?  
 দেখবো, এ-ব্যাপারে বিশু-প্রভুর অভিপ্রায় কি ?  
 এই বলে তিনি দৃতকে বহু মুদ্রা দান করলেন,  
 ও বললেন, যাত্রারস্ত করো, পথে দেরী করো না।

এইবার সেনাপতি স্থীয় সৈন্যদলকে প্রস্তুত করে  
 যাত্রারস্তের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন।  
 হাজারো কিরণজিকে কন্দী হিসাবে সংগে লওয়া হলো,  
 তাদেরকে পায়ে হেঁটে পথাতিক্রম করতে হবে।  
 অতঃপর যখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলো,  
 তখন প্রান্তরে শৃত হলো অশুরোহীদের অশুপদ্ধতি।  
 সেই সঙ্গে বাজলো বিষাণ ও দুন্দুভিতে আঘাত হনা হলো,

এবং সেনাপতির শিবির থেকে উদ্ধিত হলো কোলাহল।  
সেনাপতির যাত্রা শুরু হলে ইরানের পথে,  
সৈন্যদল সম্মুখস্থ নগরীর দিকে অগ্রসর হয়ে চললো।

এদিকে দূত এসে উপস্থিত হলো জালের কাছে  
সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সৌভাগ্যের বার্তা।  
সে এসে জালকে শোনালো মহামতি সামের বাণী,  
তা শুনে জাল অতিশয় আনন্দিত হলেন।  
জাল তৎক্ষণাতে উচ্চারণ করলেন বিশু-প্রভুর প্রশংসা,  
তাঁর বদান্যতায় কাল আজ আনন্দে অনুরণিত।  
দরিদ্রকে তিনি দিরহম দীনার দান করলেন,  
এবং আপনজনের মনে সঞ্চারিত করলেন আনন্দ।  
তারপর উচ্চারণ করলেন সেনাপতি সামের প্রশংসা  
কারণ, তিনিই তো দৃতমুখে পাঠিয়েছেন শুভসন্দেশ !  
উক্তেজনায় রাত্রিতে জালের ঘূম হলো না, দিনেও তিনি  
নিলেন না বিশ্রাম,  
এমন কি সুরাপান ও সঙ্গীত থেকেও তিনি বিরত রইলেন।  
হায় যেন প্রয়াণ করেছে আকাঙ্ক্ষিত সেই প্রেয়সীর সমীপে,  
কুদাবা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাই শুধু গুঞ্জরিত হচ্ছে  
জালের প্রাণের তারে।

## রুদাবার কার্যকলাপ সম্পর্কে সৌন্দুখ্যের অবগতি

সৈন্যাধিপতি জাল ও সেই দেবদারু—তনুর মধ্যে  
সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ছিল এক মিষ্টভাষিণী নারী,  
সে রুদাবার সন্নিকট থেকে সংবাদ নিয়ে যেতো সেই

দেবদারু—তনুর কাছে।

জাল সেই নারীকে ডেকে পাঠালেন,  
এবং তার কাছে দৃতমুখে শোনা সব কথা বললেন !  
তাকে বললেন, তুমি এইক্ষণে রুদাবার সমীপে গমন করো,  
এবং তাকে বলো হে সাধ্বী নবচন্দ্র !

বাণী যদিও সংকীর্ণ ও কঠিন এসে পৌছেছে,  
তনুও শীঘ্ৰই তার বিস্তৃতি—পথের কুঞ্জিকা পাওয়া যাবে।  
দৃত সামের সমীপ থেকে ফিরে এসেছে,  
আনন্দের সঙ্গে সে নিয়ে এসেছে সৌভাগ্যের বাণী।  
দৃত আরও অনেক বলেছে এবং বহু কাহিনীও শুনে এসেছে,  
পরিণাম সম্পর্কে পিতা আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন।  
এই বলে তিনি নারীর হাতে তুলে দিলেন লিপিকা,  
নারীও তখন লিপিকা হাতে রওয়ানা হয়ে গেলো  
সেখান থেকে।

বাযুগতিতে সে রুদাবার সমীপে এসে উপস্থিত হলো,  
এবং আনন্দের সঙ্গে তাঁকে দান করলো সুসংবাদ।  
অনিন্দ্যসুন্দরী রুদাবা তখন নারীকে দান করলেন রৌপ্যমুদ্রা,  
এবং তাকে বসালেন এক স্বর্ণ—আসনে।  
অতঃপর সেই দৃতীর হাতে তুলে দিলেন,  
এক প্রস্তু জামা।  
একটি শুভ শিরস্ত্রাণ বের করে আনলেন রাজকন্যা,  
তাতে স্বর্ণসূত্রের টানাপোড়েন আত্মগোপন করে আছে।  
সে—জামার সবটাই সূর্যকাস্তমণি ও স্বর্ণে বিখচিত,  
মুক্তার আধিক্যে রবং স্বর্ণ অদৃশ্য হয়ে আছে।  
একটি বহুমূল্য সুদৃশ্য অঙ্গুরীয়াও তিনি বের করলেন ;  
এসব উপহার সাম—পুত্র জালের হাতে দেবার পরামর্শ দিয়ে —  
রাজকন্যা নারীকে শোনালেন তাঁর বাণী ও সন্দেশ।  
নারী সেসব নিয়ে রাজকন্যার কক্ষ থেকে নির্গত হয়ে —

অন্তঃপুর চতুরে পা রাখতেই সীদুখ্তের নজরে পড়ে গেলো।  
সীদুখ্ত তখন উচ্ছেস্বরে ডেকে তাকে বললেন,  
কোথা থেকে তুমি আসছো ?  
যা জিজ্ঞাসা করবো, সরল অকপটে তা ব্যক্ত করো।  
সময় সময় তোমাকে আমার সামনে দিয়ে  
রাজকন্যার কক্ষের দিকে যেতে দেখি, কিন্তু আমার সঙ্গে  
একটি কথাও তুমি বলো না।  
আমার মনে তোমার উপর সন্দেহের উদয় হয়েছে,  
কারণ, তুমি আমাকে এই যাতায়াতের পথে ভালোমন্দ কোন  
সন্তানশই করো না।  
নারী রাজমহিষীর কথা শুনে ভয়ে হরিদ্রাভ হলো,  
এবং কম্পিত দেহে চুম্বন করলো মৃতিকা।  
তারপর বললো, আমি এক পসারিনী নানা দ্রব্য বিক্রী করি,  
এবং এইভাবে অর্জন করি আমার গ্রাসাঞ্চাদন।  
আমি রাজকর্মচারীদের ঘরে ঘরে যাতায়াত করি,  
তাঁরা আমার কাছ থেকে জামা ও মণিমুক্তা দ্রব্য করে থাকেন।  
ঐ কক্ষে রুদাবা আমার থেকে অলঙ্কার দ্রব্য করতে চেয়েছিলেন।  
আর সেই সঙ্গে মূল্যবান মুক্তারাজি।  
আমি তাঁরই জন্য মণিখচিত মূল্যবান অঙ্গুরীয় আনন্দন করেছিলাম,  
আর সেই সঙ্গে এমেছিলাম মুক্তাপূর্ণ এই মঞ্জুষা।  
এ-সব শুনে মহিষী বললেন, আমার সামনে ওগুলি রাখ,  
এবং তদ্ধুরা আমার ক্ষেত্রের প্রতিবিধান করো।  
আমি এই দুটি বস্ত্র রুদাবাকে দিবো,  
সে যদি আরও চায় তবে তা-ও তোমাকে এনে দিতে হবে।  
এগুলির মূল্য কি হবে তা আমরা স্থির করবো,  
কিন্তু তৎপূর্বে দূরীভূত করতে হবে সন্দেহ !  
আমি চন্দ্রমুখীকে আগামীকাল মুদ্রা দিয়ে দিবো,  
তুমি তার কাছ থেকেই মূল্য নিয়ো, আমার কাছে চাইতে হবে না।  
যানীর কথায় সরলতার অভাব বুঝতে পেরে  
দৃষ্টি মনে মনে বিপদের জন্য গ্রহণ করলো প্রস্তুতি।  
মহিষী এইবার নারীর পসরা খুলেই বুঝতে পারলেন,  
তার কথায় রয়েছে কুটিলতা ও মিথ্যা।  
তিনি যখন সেখানে দেখলেন, মূল্যবান পরিচ্ছদ,

এবং দেখলেন, রুদ্বার দেওয়া জামা,  
তখন তিনি ক্ষেত্রান্বিত হয়ে আকর্ষণ করলেন তার কেশ,  
এবং এক টানে তাকে নিশ্চেপ করলেন মাটিতে।

তারপর তাকে সেখান থেকে যেরে  
বেঁধে নিয়ে চললেন অন্তঃপুরের এক দিকে ;

তারপর সেখানে তাকে বেঁধে রেখে  
সীদুখ্ত ডেকে পাঠালেন তাঁর কন্যাকে।

কন্যা মায়ের সামনে এসেই

স্বীয় গুণদেশে আঘাত করলো ;

দুই আরক্তিম ফুলে ঝরে পড়লো অশ্রুধারা,

বাদলের পরে যেমন ফুলের সৌন্দর্য খোলে তেমনই খুলে

গেলো রাজকন্যার গুণদেশের শোভা।

সীদুখ্ত রুদ্বারকে বললেন, হে অনিন্দ্যসুন্দর চন্দ্ৰ,

তুমি কি জন্যে এই অপহৃত বস্তুতে নিজে সামিল হয়েছ ?

তোমার পুণ্যশীল জীবনের কি হয়েছে ?

কেন তুমি আমার কাছে খুলে বলছ না তোমার মনের কথা ?

হে চন্দ্ৰমুৰ্মী, কেন তুমি নিজের উপর টেনে আনছ দুঃখ ?

মায়ের কাছে খুলে বলো সকল রহস্য।

এই যে নারীকে আমি এখানে টেনে এনেছি,

সে কেন তোমার কাছে আগমন করে ?

কথা কি বলো, আর বলো সেই পুরুষ কে

যে তোমার দেওয়া শিরস্ত্রাণ ও অঙ্গুলীয়ের যোগ্য হতে পারে ?

আরবদের কাছে তাদের শিরস্ত্রাণের মূল্য অনেক,

আর আমরা নারীজাতি তাকে আমাদের লাভ-ক্ষতির প্রতীক  
বলে মনে করি।

সেই সুনাম ও যশকে তুমি নষ্ট বরতে যাচ্ছ ?

তুমি কি আমারই মতো কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ কর নি ?

রুদ্বার দৃষ্টি তখন স্বীয় পায়ের দিকে মাটিতে নিবন্ধ হলো,  
মায়ের সামনে সে লজ্জায় হলো অধোবদন।

তার চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা,

দুই চোখ তার দেখতে দেখতে রক্তবর্ণ হলো।

মাকে সম্বোধন করে রুদ্বার বললেন, হে বুদ্ধিমত্তা মা,

হৃদয়ের প্রেম আমাকে এমন করেছে।

আমার জননী যদি আমাকে জন্ম না দিতেন  
তবে ভালো ও মন্দ কিছুই আমার থেকে উদগত হতো না।  
জাবুলস্তানের সেনাপতি কাবুলে এসেছেন,  
তার প্রেমেই আমার আসন হয়েছে অগ্নির উপর।  
আমার হৃদয় দুনিয়ার প্রতি এতই বিমুখ হয়েছে যে,  
আমার অস্তর-বাহির সতত রোদন করছে।  
তাঁকে না দেখে আমি জীবিত থাকেত পারবো না,  
সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে একটি চূলের তুল্য মূল্য নয়।  
তিনি আমাকে দেখেছেন ও বসেছেন আমার পাশে  
তারপর হাতে হাত রেখে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।  
কাজেই, তাকে না দেখে আর চলে না,  
তাঁর ও আমার মধ্যখানে বিরাজ করছে শুধু আশুণ।  
মহামতি সামের কাছে পাঠান হয়েছিল দৃত,  
সামের জবাব আমি শুনেছি।  
এই যে নারী, যার কেশ আকর্ষণ করছেন,  
এবং তাকে মেরে পাতিত করছেন মাটিতে;  
দৃতের নামা নিয়ে সে-ই এসেছিল আমার কাছে,  
সেই নামার জবাবরাপেই যাচ্ছে এই রাজকীয় পরিচ্ছেদ।  
এ কথা শুনে সীদুখ্ত সবিস্ময়ে নীরব হলেন,  
তিনি জামাতা রূপে জালকে পছন্দ করলেন মনে মনে।  
জবাবে বললেন, কিন্তু এ তো বুদ্ধিমানের কাজ হলো না।  
জালের অনুরূপ পুরুষ সত্যিই বহুগান্তি;  
তিনি মহৎ, তিনি এক মহান সেনাপতির পুত্র,  
যশ ও প্রাণের ঐশ্বর্যের তিনি ঐশ্বর্যবান।  
তাঁর সবই গুণ, একটি মাত্র দোষ,  
সেই ক্রটির জন্য অবশ্য কেউ তাঁর সমক্ষক হতে পারে না।  
কিন্তু তবু ইরানের বাদশাহ এতে ক্রোধান্তিত হবেন,  
এবং ফলে, কাবুল থেকে তিনি সুর্যালোক পর্যন্ত উথিত করবেন  
ধূলিরাশি।  
তিনি চাইবেন না যে, আমাদের কোন সন্তান-সন্ততি  
তাঁর দ্বারা লাভ করে সম্মানের আসন।  
তারপর সেই নারীকে লক্ষ্য করে সীদুখ্ত বললেন,  
হে চতুর নারী, সর্বদা তুমি তোমার ওষ্ঠাধরকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

କଥନୋ ଯେନ ବାକ୍ୟ ତା ସ୍ଫୁରିତ ନା ହୟ,  
କଥାକେ ଏଖାନେଇ ମୃତ୍ତିକାୟ ପ୍ରୋଥିତ କରେ ଦାଓ ।  
ଏହିଭାବେ ଗୋପନେ କୋନ ଅନୁଗ୍ରାହି କନ୍ୟାର ସଦେ ଦେଖା କରାର ରୀତି  
ଦୁନିଆୟ କୋଥାଓ ପ୍ରଚାଲିତ ନେଇ ।  
ମନୋଦୂଷଖେ କାନ୍ଦତେ କାନ୍ଦତେ ତିନି ମେ ଶ୍ଵାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଏସେ  
ଶୟାମ ପ୍ରହଳଦ କରିଲେନ,  
ତାର ଗାତ୍ର-ତ୍ରକ ଯେନ କେଉଁ ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ କରେ କଟଛେ ।

## କନ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ସମ୍ପର୍କେ ମେହରାବ ଜାନତେ ପେଲେନ

ମେହରାବ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ସୀଯ ରାଜସଭା ଥେକେ ନିର୍ଗତ ହଲେନ,  
ତା'ର ଚିନ୍ତାଯ ଗୁଡ଼ିରିତ ହତେ ଥାକଲୋ ଜାଲେର କଥା !  
ଅନ୍ତଃପୁରେ ଏସେ ତିନି ମହାମାନ୍ୟ ସୀଦୁଖତକେ ଘୁମେ ଦେଖତେ ପେଲେନ  
ଦେଖଲେନ, ମନୋଦୂର୍ଘେ ଯେନ ମଲିନ ହୟେ ଆହେ ତା'ର ମୁଖ ।  
ନିଦୋଧିତା ସୀଦୁଖତକେ ରାଜା ବଲଲେନ, ତୋମାର କି ହୟେଛେ, ବଲୋ,  
ତୋମାର ଦୁଇ ଗୋଲାପ-ଗଣ ଏମନ ପରିଯୁନ କେନ, ବଲୋ !  
ମେହରାବେର କଥାର ଜବାବେ ରାନୀ ବଲଲେନ,  
ସୁଦୀର୍ଘ ଚିନ୍ତା ଆମାର ମନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ ଆହେ ।  
ଏହି ଜନ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଏହି ଐଶ୍ୱର  
ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀନ-ପରାନୋ ଏହି ଆରବୀୟ ଅଶ୍ଵକୁଳ ;  
ଏହି ଅନ୍ତଃପୁର ଓ ତୃତୀୟ ସୁମଜିତ କାନନ,  
ଏବଂ ବନ୍ଧୁଦେର ମନେର ସଫଳତାର ସ୍ଵପ୍ନ ;  
ରାଜାର ପୁଜାରୀ ଏହିସବ ଦାସ-ବାଲକ,  
ଏହି ରାଜମୁକୁଟ ଓ ରାଜସିଂହାସନ ;  
ଆର ଆମାଦେର ସମୁନ୍ତ ଦେବଦାରୁ ଓ ତାର ରୂପ,  
ଆମାଦେର ଯଶ, ସଂକଳପ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ;  
ଏହି ମାହାତ୍ୟ ଓ ଏହି ସରଲତା —  
ସମୟେ ସବ କିଛିତେଇ ବୁଝି ଆସେ ଘାଟିତି ।  
ଶକ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳତାୟ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋକ,  
ଆମାଦେର ଦୁଃଖ କି ତା ଏଥନ ଗଣନା କରା ଉଚିତ ।  
ଭାଗ୍ୟର କାହିଁ ଥେକେ ଆମରା ଲାଭ କରେଛି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସିନ୍ଧୁକ,  
ଆର ପେଯେଛି ଏକଟି ବକ୍ଷ ଯାର ଫଳଗୁଲି ଅମୃତ ନା ହୟେ ହୟେଛେ ବିଷ ।  
ମେହରାବ ବୃକ୍ଷେର ବୀଜ ଆମରାଇ ରୋପନ କରେଛିଲାମ ଏବଂ ବହୁ କଟେ ତାତେ  
ସିଞ୍ଚନ କରେଛିଲାମ ଜଳ,  
ଏବଂ ତାକେ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପଦ ବଲେ ଟେନେ ଧରେଛିଲାମ ବୁକେ ;  
ତାରପର ଯଥନ ସେବି ବଡ଼ ହୟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକେ ମେଲେ ଧରଲୋ ତାର ସମ୍ପଦ,  
ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାଯ ପ୍ରସାରିତ ହୟେ ପଡ଼ଲୋ ତାର ଛାଯା ;  
ତଥନ ତାର ପରିଣାମ ଆମାଦେର ଭୋଗ କରତେ ହଲୋ,  
ଦେଖଲାମ ଯେ, ସେ ହରଣ କରେ ନିଯେ ଢାହେ ଆମାଦେର ପ୍ରାଣେର ଆରାମ ।  
ସୀଦୁଖତେର ଏହି କଥାର ଜବାବେ ମେହରାବ ବଲଲେନ,  
ତୋମାର ଏହି କାହିଁନୀ ନବୋଚାରିତ କିନ୍ତୁ ତାତ୍ପର୍ୟ ପୂରାତନ ।

সরাইখানার জীবন এমনই হয়ে থাকে,  
সেখানে একদিন সুখ একদিন দুঃখ।  
একটি যথন ঘরে আসে তখন অপরটি বিদায় নেয়,  
দেখ না, আবর্তমান আকাশ সব কিছুকেই করছে পদদলিত !  
মনের দুঃখ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না,  
কারণ, করম্মাময় প্রভূর রীতি এ নয়।  
সীদুখ্ত বললেন, আপনার এই বিবৃতি,  
একদিক দিয়ে অবশ্যই সত্য,  
কিন্তু কি করে আপনি গোপন রাখতে পারবেন,  
সেই রহস্য যার পরিণাম দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে পারে ?  
শিষ্টাচারী বিষ্ণ মন্ত্রী বৃক্ষের এই কাহিনী  
শুনিয়েছিলেন তার সন্তানকে ;  
আমি সুশিক্ষার প্রয়োজনে আমার সন্তানকে তা শুনিয়েছি,  
এখন রাজা স্বয়ং আমার কথা অবধান করুন।  
সমুদ্রত দেবদার অবনত হয়েছে,  
নার্গিস রটনা করছে গোলপের অপবাদ।  
শুনুন, রূদ্বাকে সাধ-প্রত্ব জাল  
গোপনে আবক্ষ করেছেন প্রণয়-ফাঁদে।  
সমুজ্জ্বল-হৃদয় কন্যাকে আমার,  
সত্যপথ থেকে বিচলিত করেছে।  
কন্যাকে বহু উপদেশ দিলাম, বুঝালাম, কিন্তু সব বৃথা,  
দেখলাম, তার গণ্ডবুঝ হরিদ্বাত ও তার হৃদয় অন্ধকার।  
মেহরাব এই কথা শুনেই উঠে দাঁড়ালো,  
এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত রাখলেন তরবারি কোষে।  
তাঁর দেহ কম্পিত হলো ও মুখ হলো রক্তবর্ণ,  
হৃদয়ে শোণিত টগ্বগ করে ফুটতে লাগলো ও বেরিয়ে এলো  
হিম নিঃশ্বাস।  
তিনি বললেন, অবিলম্বে রূদ্বার রক্ত  
আমি মৃত্তিকায় প্রবাহিত করবো।  
এই কথা শুনেই সীদুখ্ত উঠে দাঁড়ালেন,  
ও স্বামীর কচিদেশ দুর্হতে জড়িয়ে ধরলেন।  
বললেন দাসীর মুখ থেকে একটা কথা শুনুন,  
আর যা বলি তা দেখুন বিবেচনা করে।

তারপর আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী  
যা ভাল বিবেচনা করেন করবেন।  
মহিযীর কথা শুনে রাগান্বিত হলেন মেহরাব  
ও তাকে ঠেলে দিয়ে মস্ত হস্তীর মতো গর্জন করে উঠলেন।  
বললেন, এমন পাপিষ্ঠ কন্যাই যদি আমার জন্ম নিয়েছে  
তবে তার শির কর্তন করাই সমুচিত হবে।  
আমি যদি তাকে হত্যা না করি, তবে পিতামহকে অপমান  
করা হবে,  
কারণ তিনিই আমার মধ্যে এ-অবস্থায় এমন ভাবের সৃষ্টি  
করেছেন।

যে-পুত্র পিতার পথ পরিত্যাগ করে  
বীরগণ তাকে পিতার সন্তান বলে গণ্য করেন না।  
সে-ই ব্যাপ্তি নামের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে,  
রণে যার পাঞ্জা তীক্ষ্ণ বলে প্রমাণিত হয়।  
আমার রণশ্চেত্র আমার আকাঙ্ক্ষা,  
পিতার আমার পিতামহ থেকে এই সুভাবই পেয়েছিলেন।  
পিতার চিহ্ন পুত্রের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়,  
নীচ ব্যক্তি থেকে সমন্বিত স্বভাব সম্ভব নয়।  
প্রাণের ভয় এবং অপমানের কলঙ্ক,  
কি করে আমার শিরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখবে ?  
যদি বীরপ্রবর সাম বাদশাহ মনুচেহেরকে সঙ্গে নিয়ে  
আমার উপর লাভ করেন বিজয়,  
তবে কাবুল থেকে সূর্যলোকে উঠিত হবে ধূম্রাজি,  
এবং তার জনপথ ও আবাদভূমি ধ্বংস হয়ে যাবে।  
এ কথা শুনে সীদুখ্ত বললেন, হে বীরবুন,  
অনর্থক এদিকে আপনার রসনাকে পরিচালিত করবেন না।  
সেনাপতি সামের সমীপ থেকে সংবাদ এসেছে,  
প্রতিকার ও ভীতিকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন না।  
তিনি কিরগিজদের দেশ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন,  
এ-রহস্য তাঁর কাছে গোপন থাকেন।  
এ কথা শুনে মেহরাব বললেন, হে চন্দ্রমুখী,  
আমার কাছে মিথ্যা ও বক্রকথা বলো না ;  
কে কেমন করে নিজের প্রজ্ঞার মুখোযুক্ষ হয়েছে ?

কে মুক মৃত্তিকাকে আদেশ করে নীরব হতে চায় ?  
 আমি জানি, মহামতি, জালের চেয়ে উন্নত জামাতা  
 অভিজ্ঞাত অনভিজ্ঞাত কারো মধ্যে নেই।  
 বীরপ্রবর সামের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক  
 আহওয়াজ ও কান্দাহারের মধ্যে কে কামনা না করে ?  
 সীদুখ্ত এইবার বললেন, হে সমুন্তশির রাজা,  
 মিথ্যা ও বক্র কথায় আমার কোন আনন্দ নেই।  
 আপনার দৃঢ় থেকে জন্ম নিয়ে আমার দৃঢ়,  
 আপনার বেদনাহত অস্তর আমার বন্দীদশার অনুরূপ।  
 এইকপ দৃঢ়ই আমাকে ব্যথিত করেছে,  
 এমন চিন্তাই অধিকার করেছে আমার মস্তিষ্ককে।  
 আপনি নিজেই তো আমাকে ব্যথাহত দেখেছেন,  
 দেখেছেন, হৃদয় থেকে আনন্দ বিদায় করে আমি  
 ব্যথিত নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম  
 যদি এ-ব্যাপারে আমি বিশ্বিত ব্যথ্যাহত না হতাম,  
 তাহলে কি এমন দুর্চিন্তা আমাকে অভিভূত করতো ?  
 বাদশাহ ফারেদুন যমনের বাদশা সরওকে নিয়ে সুখী হয়েছিলেন,  
 বিশু-সন্ধানী জাল নিশ্চয় সে-কাহিনী স্মরণ করেছেন।  
 কারণ এই দুনিয়া অগ্নি ও জল, মাটি ও বাতাস  
 প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী বস্তু নিয়েই এমন সমুজ্জ্বল হয়েছে।  
 এই বলে রাজমহিষী সামের প্রত্যুত্তরপত্র বের করলেন,  
 এবং রাজাকে বললেন, ভাগ্যের এই নির্দেশকে শিরোধার্য করুন।  
 যে একদা পর ছিল, সে আপনার আপন জন হবে,  
 আপনার প্রতিকূল চিন্তা পরিণত হবে অনুকূল মনোভাবে।  
 মেহরাব সীদুখ্তের এই সব কথা নীরবে শুনলেন,  
 তাঁর অস্তর থেকে বৈরীভাব ও মস্তিষ্ক থেকে ক্রোধ দূর হয়ে গেলো।  
 এইবার স্বামধন্য রাজা সীদুখ্তকে সম্বোধন করে বললেন,—  
 যান, এবার রুদাবাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।  
 পুরুষ-সিংহের এই আদেশ শুনে ভীত হলেন সীদুখ্ত,  
 ভাবলেন, এ সময় কি করে রুদাবাকে এখানে আনয়ন করি।  
 বললেন, প্রথমে আপনার আদেশ তো তাকে জানাই,  
 যাতে সে আমার কথায় আশ্বস্ত বোধ করে।

---

• যুমন আরবদেশে অবস্থিত

এ কথা শুনে মেহরাব সাধ্যাতিক শপথ করলেন,  
জানালেন, তাঁর হৃদয় থেকে উন্মুক্ত হয়েছে ক্রোধ।  
সীদুখ্ত তখন যশস্কানী রাজাৰ থেকে কথা নিলেন যে,  
তিনি রুদাবাৰ প্ৰতি কোনৱৰ্ষ রোষ প্ৰকটিত কৰবেন না।  
জবাবে রাজা বললেন, দেখুন পৃথিবীৰ অধীশ্বৰ  
তেমন কিছু কৰলে আমাদেৱ প্ৰতি অসন্তুষ্টই হবেন।  
তখন না থাকবে প্ৰান্তৰ জনপদ, না পিতামাতা,  
না রুদাবা, না চলমান প্রোতোষিনী।

এ কথা শুনেই শিৱ অবনত কৰলেন সীদুখ্ত,  
এবং নীচু হয়ে চুম্বন কৰলেন ঘৃতিকা।  
অধরোষ্টে হাসি নিয়ে সীদুখ্ত এবাৰ কন্যাৰ কাছে এলেন,  
মুৱাত্ৰিৰ পৰ্দান্তৱাল থেকে যেমন কৰে খতোলন কৰে  
প্ৰকটিত দিন।

কন্যাকে সুসংবাদ দান কৰে তিনি বললেন, রণোন্তৰ সিংহ,  
বন্য গৰ্দভেৰ উপৰ বিস্তাৱ কৰবে না তাৰ পাঞ্জা।  
সুতোং অবিলম্বে সজ্জা পৰিগ্ৰহ কৰে  
পিতৃস্মীপে রোদনুমুখ হয়ে আগমন কৰো।  
জবাবে রুদাবা বললেন, সজ্জা কেন,  
মূল্যবান সম্পদ যেখানে রয়েছে, সেখানে দারিদ্ৰ্যেৰ  
প্ৰকাশ কেন?

আমাৰ প্ৰাণ সাম-নন্দনেৰ সঙ্গে পৰিণীত হয়েছে,  
কেন এই প্ৰকটিত সত্য গোপন কৰবো ?  
এই বলে রুদাবা পিতৃস্মীপে প্ৰাচীমূলে সমুদিত সূৰ্যেৰ মতো  
আবিৰ্ভূত হলেন

তাৰ সৌন্দৰ্যেৰ ছটায় নিমগ্ন হলো স্বৰ্ণ ও সূৰ্যকান্ত মণি !  
পিতা তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলেন,  
ও মনে মনে স্মৰণ কৰলেন বিশুদ্ধষ্টাকে।  
আনন্দিত বসন্তকালে সমুজ্জ্বল সূৰ্যেৰ মতো  
সুন্দৱী স্বৰ্গেৰ সৌন্দৰ্য নিয়ে উপস্থিত হলেন।  
পিতা এবাৰ তাকে প্ৰশ্ন কৰলেন, সকল প্ৰজ্ঞা কি ধুয়ে  
মুছে ফেলেছো ?

মুক্তাৰ আঘাতে কে কবে আহত হয়েছে ?  
যদি কাহ্তান প্ৰান্তৰ থেকে কোন প্ৰতাৱকেৱ আগমন হয়

তবে তাকে অগ্নিপূজারী তীর নিক্ষেপে হত্যা করে থাকে।  
কোথায় শুনেছ যে পরী শয়তানের সঙ্গে পরিণীতা হয়েছে?  
তোমার জন্য কি তাজ ও অঙ্গুরীর কোন প্রয়োজন নেই?  
রুদাবা পিতার কথা শুনে অত্যন্ত আহত হলেন,  
তাঁর মুখবর্ণ রক্তশূন্য হরিদ্রাভ হলো।  
পরিম্লান নার্গিস আবির কৃষ্ণপক্ষ  
যেন নির্দায় আচ্ছন্ন হয়ে নিম্নমুখী হলো।  
দেখা গোলো, পিতা ক্রোধে রংগোলুৰ হয়ে উঠেছেন,  
তিনি শুরু ব্যাঞ্চের মতো গর্জন করে চলেছেন!  
ভাঙ্গা মন নিয়ে রাজকন্যা প্রত্যাগত হলেন স্বগৃহে  
তাঁর হরিদ্রাভ বদনে যেন রক্ত উখলে উঠেছে।  
মতো ও কন্যা এইবার সাহায্যের জন্য  
বিশ্ব-প্রভুর দিকে হাত বাঢ়ালেন।

## জাল ও রুদ্বাবার কার্যকলাপ সম্পর্কে মনুচেহেরের অবগতি

অতঃপর মহামান্য সম্ভাটের কাছেও  
মেহরাব ও তেজস্বী জাল সম্পর্কে সংবাদ এসে পৌছলো।  
মেহরাবের সঙ্গে আত্মীয়তা ও জালের প্রতি মরতা —  
একটি অন্যটির প্রতিক্রিপ হয়ে দেখা দিয়েছে।  
ধরিত্রীর অধিপতি ইরান সম্ভাটের সামনেই  
মন্ত্রিগণ এ-সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন।  
সম্ভাট জ্ঞানীদের সম্বোধন করে বললেন,—  
দিবসের আলো যেন আমার উপর ঝান হয়ে আসছে।  
কেননা, ইরানকে আমি ব্যাখ্য ও সিংহের পাঞ্চা থেকে  
যুদ্ধ ও সঙ্কল্পের সাহায্যে মুক্ত করে এনেছি।  
মহামতি ফারেদুন ধরিত্রীকে পবিত্র করেছেন জোহাক থেকে  
অথচ কাবুলের এই মেহরাব সেই জোহাকেরই বংশোদ্ধৃত।  
জালের এই নির্লজ্জ প্রেম থেকে এমন না হোক,  
যেন অবনত তরু আবার শির সমুন্নত করে সমকক্ষতা দাবি করে।  
যদি মেহরাব-কন্যা ও সাম-পুত্রের থেকে জন্ম নেয়  
কোন কোষেৰ্মুক্ত তরবারি,  
তবে আমার বংশধরও  
সেই বিষের উপযুক্ত প্রতিষেধক বলে গণ্য হবে না।  
সেই বীরের পক্ষপাতিত্ব যদি তার মায়ের দিকে থাকে,  
এবং তার মন্দ কথার প্রভাবে যদি সে প্রভাবিত হয়,  
তবে ইরানের উপর নেমে আসবে দুঃখ ও বিপদ,  
এবং সম্পদ ও শিরস্ত্রাণ তার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে  
যেতে পারে।  
এখন আমার এ-কথার প্রত্যুষেরে আপনাদের বলার কি আছে,  
সুষ্ঠু পরামর্শের আকারে তা নিবেদন করুন।  
সম্ভাটের কথা শুনে সকল পরামর্শদাতাই উচ্চারণ করলেন  
তাঁর প্রশংসা,  
এবং তাঁকে সম্বোধন করলেন পবিত্র ধর্মের অনুগত সম্ভাট বলে।  
তাঁরা বললেন, আপনি আমাদের চেয়ে অধিক প্রজ্ঞার অধিকারী,  
উচিত-অনুচিতের ধারণা আপনার প্রজ্ঞার বাইরে নয়।  
এমন করুন যাতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে শুভ সংকল্প,

এবং আজদাহাও আপনার বদান্যতা স্বীকার করে নেয়।  
সমুন্ত সম্মাট যখন পরামর্শদাতাদের কথা শুনলেন,  
তখন তিনি অনুসন্ধানী হলেন শুভ পরিণামসূচক কর্মের।  
সম্মাটের আদেশে শাহজাদা নওজর  
বজনগণসহ সম্মাট সমীপে এসে উপস্থিত হলেন।  
নওজরকে সম্মেধন করে সম্মাট বললেন, বীরপ্রবর সামের কাছে যাও,  
তাঁকে গিয়ে জিঞ্জাসা করো যুদ্ধের ফলাফল কি?  
দেখা হলে তাকে বলো, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে  
আমার সমীপ হয়ে যেন তিনি দেশে ফিরেন।  
নওজর সম্মাটের আদেশে পিতৃসমীপ থেকে  
মুখ করলেন সেনাপতির দিকে।  
বীরপ্রধান সাম যখন জানতে পেলেন যে, নওজর আসছেন  
তখন তিনি অবিলম্বে সম্মাটপুত্রের প্রত্যুদ্গমনে এগিয়ে এলেন।  
সকল যশস্বী বীরই শরীর হলেন সেই প্রত্যুদ্গমনে,  
স্বাগত জানাবার জন্য তাদের পক্ষে বেজে গেলো তুরীভূরী।  
অতঃপর স্বনামধন্য নওজরসহ বীরবন্দ  
সেনাপতি সামের সামনে এসে দাঁড়ালেন।  
উপস্থিত বীরগণ এইবার পরম প্রীতিভরে  
পরম্পরের কুশল জিঞ্জাসা করলেন।  
নওজর এইবার সামকে পিতার বাণী প্রদান করলেন,  
ও তার সন্দর্ভনে লাভ করলেন পরম প্রীতি।  
প্রত্যুত্তরে সাম বললেন, সম্মাটের আদেশ মাথা পেতে নিলাম,  
তাঁর সন্দর্ভনে যথাশীঘ্ৰ নয়ন—মন নন্দিত করবো।  
সামের মেহমান হয়ে শাহজাদার সময় কাটতে লাগলো,  
আর সেই সঙ্গে তার সুখদায়ক সাহচর্য।  
যথাসময়ে সামনে রক্ষিত হতো ভোজ্যদ্রব্য ও পানপাত্র,  
তারা মনুচেহেরের নাম নিয়ে পাত্র উঠাতেন।  
যথাসময়ে শাহজাদা নওজর ও সেনাপতি সামের পেছনে  
সানন্দে এসে সমবেত হলেন গোটা রাজ্য।  
আতিথ্যের আনন্দিত দীর্ঘ রাত্রি শেষ হয়ে এলো  
যখন আলা—আঁধারের রহস্য ভেদ করে উদয় হলো সূর্যের।  
রাজপ্রাসাদের তোরণ থেকে নিনাদিত হলো দুন্দুভি,  
সতেজ অশুদ্ধ ও উদ্ধৃত সমুন্ত করলো তাদের শির।

সম্রাট মনুচেহেরের ফরমানে সকল সহ  
সাম ও নওজর রাজধানীর অভিমুখী হলেন।  
এদিকে মনুচেহের যখন সংবাদ পেলেন যে ওরা আসছেন,  
তখন শাহীমহল সাজাবার আদেশ দিলেন।  
সারী থেকে আমল প্রদেশ পর্যন্ত গোটা এলাকায় কোলাহল উঠলো,  
মনে হচ্ছিল যেন উচ্ছ্বসিত দরিয়ায় উথিত হয়েছে ঝাঙ্কা।  
বর্ণাধারী টেনে নিলো তাদের বর্ণা, সেই সঙ্গে  
বর্মপরিহিত হয়ে বেরিয়ে এলো প্রত্যুদ্গমনে।  
সৈন্যদের সমাহারে এক পর্বতের পাদদেশ থেকে  
অন্য পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত লাল ও হলুদ বর্ণের ঢাল যেন  
পরম্পর সীবিত হয়ে গেলো।

দামামা, বিষাণ ও কাংস্যঘন্টা সহযোগে  
আরবী ঘোড়া, হস্তীদল ও বিচির অশ্বসহ  
বিপুল সেনাদল এগিয়ে গেলো দুন্দুভি বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে  
শাহজাদা ও সেনাপতির প্রত্যুদ্গমনের জন্য।

## মনুচেহের সমীপে সামের আগমন

সম্বাট শিবিরের সন্নিকটবর্তী হয়েই সাম  
অশু থেকে অবতরণ করে পদব্রজে অগ্রসর হলেন।  
জগজ্জয়ী সম্বাটের চেহারা নয়নপথে উদিত হতেই  
সাম মৃতিকা চুম্বন করে তাঁর সমীপবর্তী হলেন।  
সামকে আসতে দেখে সমুজ্জ্বল সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন  
মনুচেহের,  
রশ্মি বিকিরণকারী সূর্যকান্ত মণি শোভিত তাজ শোভা পাছে  
তাঁর শিরে।

সম্বাট যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সামকে সংবর্ধনা করে  
তাঁর সিংহাসনের পাশে দান করলেন আসন।  
অতঃপর কথা উঠলো কিরগিজ ও তাদের যুদ্ধার্থিগণ সম্পর্কে,  
এবং মাজিন্দিরানের দৈত্যদের প্রসঙ্গও বাদ গেলো না।  
বহু জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে সম্বাট উচ্চারণ করলেন সহানুভূতি  
সেনাপতি ও সম্বাটের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করার মানসে  
সব একে একে বর্ণনা করলেন।

সেনাপতি বললেন, হে সম্বাট ! চিরকাল আপনাকে ধিরে  
বিরাজ করুক আনন্দ,  
প্রতিহিংসাকারীর চক্রান্ত বিধ্বস্ত হোক আপনার প্রাণের মহিমায় !  
আমি যখন নর-দৈত্যদের নগরীতে প্রবেশ করলাম,  
দৈত্য বললে কম বলা হয়, ওরা যেন সবাই দুর্দাঙ্গ ব্যাপ্ত ;  
তখন দেখলাম, তাদের অশুদ্ধল ইরানীয় অশুদ্ধল থেকে  
অধিক ভারী ও পুষ্টাঙ্গ।  
সাক্ষার নামধারী সেই সৈন্যদলকে দেখলে  
মনে হয়, ওরা যেন সারিবদ্ধ সিংহযুথ।  
এই প্রতিপক্ষ যখন নগরী থেকে আমার আগমন সংবাদ

শুনতে পেলো,  
তখন তাদের ক্রুদ্ধ চিৎকারে বধির হয়ে এলো আমার কর্ণ।  
তারা নগরীতে অবস্থান করেই উচ্চারণ করলো জয়ধ্বনি,  
এবং ধ্বনি দিতে দিতেই নির্গত হলো শহর থেকে।  
বিপুল সৈন্য সারি বেঁধে দাঁড়ালো,  
তদের পদতাড়িত ধুলায় অদ্ভুকার হয়ে এলো দিনের অলো !

তাদের বড় বড় যুদ্ধার্থী আমার সামনে এসে দাঁড়ালো,  
এবং যুদ্ধার্থ ক্রমে এগিয়ে থাকলো আমার দিকে।  
এই দৃশ্য দেখে আমার সৈন্যদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হলো,  
এবং প্রতিকার কি হবে সহসা তারা ভেবে উঠতে পারলো না।  
আমার এই সক্ষট মুহূর্তে কর্তব্য কি নির্ধারণ করার পূর্বেই  
প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ করে উথিত করলাম হঞ্চার।  
তারপর টেনে নিলাম তিনশত মণ ভারী এই প্রহরণ,  
এবং উচ্চজিত করলাম অম্বর লৌহসদৃশ ঘোড়া।  
আমি অগ্রসর হয়ে তাদের উপর প্রহরণাঘাত করতে লাগলাম,  
ফলে, তাদের সাহস ও বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো।  
এমন সময় তেজস্বী সুলমের পৌত্র  
ক্ষিপ্রগতি ব্যাপ্ত্রের মতো আমার সামনে এগিয়ে এলেন।  
এই জগদ্বিদ্যাত বীরের নাম ছিল কারকোয়  
প্রসন্ন—মুখ এই বীরের সকল্প ছিল অবিচল।  
মায়ের দিক থেকে তিনি জোহাকের বংশোদ্ধৃত,  
বড় বড় উদ্ধৃত ব্যক্তির শিরও তাঁর সামনে ধূলায় লুটাতো।  
তাঁর অনুগত সৈন্যদল পিপীলিকা ও পঙ্গপালের অনুরূপ,  
বন—পর্বত ঢেকে অবস্থান নিয়েছিল তারা।  
এই সৈন্যদল যখন যুদ্ধার্থ আমাদের দিকে মুখ করলো,  
তখন আমাদের যশস্বীদের চেহারা এলো বিবর্ণ হয়ে।  
এই সময় আমি প্রহরণের এক আঘাত হানলাম,  
এবং প্রতিপক্ষের সৈন্যদলকে হাটিয়ে দিলাম কিঞ্চিৎ দূরে।  
অশুপষ্ঠ থেকে এমন এক চিংকার দিলাম,  
যার ফলে ধরিত্বী তাদের চোখে যাঁতাকল সদৃশ প্রতিভাত হলো।  
ফলে, আমাদের সৈন্যদের মধ্যে এলো সাহস ও উদ্বীপনা,  
তারা নির্দিষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রে।  
কারকোয় যখন আমার হঞ্চার শুনতে পেলেন,  
এবং প্রত্যক্ষ করলেন আমার প্রহরণের গতি,  
তখন রণসাজে পূর্ণভাবে সজ্জিত হয়ে আমার সামনে এলেন,  
সুদীর্ঘ পাশ হাতে নিয়ে মত হস্তীর মতো ধাবিত হলেন আমার দিকে।  
পাশ—চক্রে আমাকে ধৃত করার জন্য তিনি তা সজোরে  
নিক্ষেপ করলেন,  
আমি সাবধানে মাথা নীচু করে সে আঘাত এড়িয়ে গেলাম।

এইবার আমি টেনে নিলাম কেয়ানী ধনুর্বাণ,  
 এবং তাতে সংযোজিত করলাম ইস্পাত-কঠিন শর।  
 সাহসী শ্যেন পক্ষীর মতো উড়ে গেলো সে-তীর  
 আমার ধনুর্বাণ থেকে শুরু হলো অগ্নিবর্ষণ।  
 মনে হতে লাগলো, প্রতিপক্ষের মস্তক নেহাই সদৃশ,  
 যাতে শরবর্ষণ লৌহ শিরঝাণকে মস্তকের সঙ্গে গঁথে দিচ্ছে।  
 দেখলাম, কারকোয় এবার ধূলিরাশির ভিতর থেকে এগিয়ে  
 আসছেন মস্ত হস্তীর মতো,

তাঁর হাতে ধরা রয়েছে ভয়ঙ্কর হিন্দুস্তানী তলোয়ার।  
সুলম-পৌত্র যখন এইভাবে আমার দিকে এগিয়ে এলেন,  
তখন মনে হলো, স্বয়ং পর্বত যেন কাঠো আশ্রয় ভিক্ষা করছে।  
তিনি ক্ষিপ্রগতি আর আমি ধীরে সুস্থে যুদ্ধ করতে লাগলাম,  
উভয়ে উভয়কে পরাজিত করার সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত।  
এমন সময় তিনি আমার খুব নিকটবর্তী হলেন,  
আমি সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে পাঞ্চ প্রসারিত করে দিলাম।  
এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষ পুঁজবের কঢ়িবক্ষ আকর্ষণ করে  
তাঁকে বিযুক্ত করে নিলাম তাঁর অশ্বাসন থেকে।  
তারপর তাকে বিপুল-বপু হস্তীর মতো আছড়ে ফেললাম মাটিতে,  
এবং তাঁর বক্ষঃদেশে আমূল বিন্দু করে দিলাম তরবারি।  
বাদশাকে এইভাবে অপমানিত অবশ্য মাটিতে পতিত হতে দেখে  
তাঁর সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নপর হলো।  
তারা উচুনীচু বন-পর্বত যে কোন পথ ধরে পারে  
দলবদ্ধ হয়ে পালাতে লাগলো।

অশুরোহী ও পদাতিক দ্বাদশ সহস্র হতাহত হয়ে —  
যুদ্ধ ভূমে পড়ে রইলো ।  
আরও দ্বাদশ সহস্র শনামধন্য বীর ইরানীদের হাতে বন্দী হলো ।  
অশুরোহী, পদাতিক ও নাগরিক মিলে  
প্রতিপক্ষে অবশ্যই তিনি লক্ষ লোক ছিল ।  
দুর্ভাগ্য করে আপনার সৌভাগ্যের সমান হতে পারে ?  
সৌভাগ্য আপনার সিংহসনের সামনে সর্বদা অবনত হয়ে অপেক্ষা করে ।  
সামের মুখে এই বর্ণনা শুনে ইরান-সম্বাটের গোরব  
তাঁর শিরস্ত্রাণকে চতুর্লোক পর্যন্ত উঠিত করলো ।  
সানন্দে তখন সঙ্গীত করা হলো সরা-শোভিত আসর,

মনে হলো, সকল অমঙ্গল থেকে দুনিয়া আজ মুক্ত।  
আসরের সবাই সুরাপানে হুস্ব করে আনলেন রাত্রি,  
এবং সেনাপতির আলোচনাসভা মুখর করে রাখলেন।  
এইভাবে রাত্রি প্রভাত হলে  
সম্মাটের প্রাসাদ পর্যন্ত খুলে গেলো পথ।  
বীরপ্রবর সাম এইবার মহামান্য সম্মাট  
মনুচেহেরের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।  
অনুপম প্রতিপত্তি সম্মাটের শুণকীর্তন করে  
সাম এখন মেহরাব ও জাল সম্পর্কে বলবেন ভাবছেন;  
এমন সময় সম্মাট আগেই তাঁকে  
অন্য কথা বলে বসলেন।  
এখান থেকে আপনি মনোনীত সামন্তগণকে নিয়ে —  
অবিলম্বে হিস্তুঙ্গানের দিকে যাত্রা করুন,  
এবং কাবুল ও মেহরাবের প্রাসাদ জুলিয়ে ভূমিভূত করে দিন।  
সে যেন আপনার হাত থেকে রেহাই না পায়,  
কারণ সে আজাদাহার [ জোহাকের ] বংশধর।  
সময় সময় সে দুনিয়ায় অশান্তি উৎপাদন করে,  
শান্তি বিঘ্নিত করা তার স্বভাবের অন্তর্গত।  
তার যত আত্মীয় আছে  
যত মাহাত্ম্য তাকে ঘিরে আছে,—  
তার মতো স্বজন  
ও জোহাকের বংশোদ্ধৃত যতজন আছে।  
তাদের প্রত্যেকের দেহ দ্বিখণ্ডিত করে পৃথিবীকে ধৌত করবেন।  
যেন মেহরাব ও জোহাকের এক ফৌটা রক্তও অবশিষ্ট না থাকে।  
সেনাপতির চোখে সম্মাটের ক্রোধ ও তেজস্বিতা এমনভাবে  
প্রতিষ্ঠিত হলো যে,  
তিনি আর একটি কথা বলবারও সাহস পেলেন না।  
তিনি তৎক্ষণাত সম্মাটের সিংহাসন চুম্বন করলেন,  
ও মুখ মর্দন করলেন যশষ্বী সম্মাটের অঙ্গুরীয়ে।  
মুখে বললেন, সম্মাটের আদেশ প্রতিপালিত হবে,  
তাঁর ক্রোধ অবশ্যই প্রশ্মিত করতে চেষ্টা করবো।  
সাম তৎক্ষণাত সম্মাট সমীপ থেকে বিদায় নিয়ে  
স্থীর গৃহ পানে অশু প্রধাবিত করলেন।

## মেহরাবের সঙ্গে যুদ্ধার্থ সামের যাত্রা

মেহরাব ও জালের কাছে সংবাদ পৌছলো যে,  
সেনাপতি সাম এখন কাবুলের পথে অগ্রসর হচ্ছেন !  
সংবাদ পেয়েই গোটা কাবুল আবেগে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো,  
এবং কোলাহল নির্গত হলো মেহরাবের প্রাসাদ থেকে ।  
সীদুর্খ্যত, মেহরাব ও রুদ্দাবা  
স্থীয় ধন-প্রাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়লেন ।  
জাল তখন মনোদৃঢ়ক্ষে নির্গত হলেন কাবুল থেকে,  
তাঁর ওষ্ঠাধর কম্পিত হচ্ছে কিন্তু সঙ্কল্পে অবিচল ।  
তিনি মনে মনে বলছেন, যদি ভয়ঙ্কর আজদাহাও  
এগিয়ে আসে,  
যার নিঃশ্বাসে জুলে খাক হয়ে যায় ধরিবী,  
আর সে যদি কাবুলকে ধ্বংস করতে চায়  
তবে প্রথমে চূর্ণ করতে হবে আমার শির ।  
এই ভেবে তিনি আহত মন নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন,—  
মনে তাঁর কত কথা উঠছে ও মন্ত্রিক্ষে শুরু হয়েছে চিন্তার সংবর্ষ !  
এদিকে মহাবীর সামের কাছে সংবাদ পৌছলো যে,  
পথে এগিয়ে আসছেন সিংহ-শিশু ।  
খবর পেয়েই তিনি গোটা সৈন্যদলকে সামনে থেকে সরিয়ে  
উড়িয়ে দিলেন ফারেদুনের পতাকা ।  
এবং প্রত্যুদ্গমনের উপযোগী দুন্দুভি বাজিয়ে  
জালকে আগু বাড়িয়ে আনার জন্য সৈন্যদের প্রস্তুত করলেন ।  
সকল হাতীর পিঠেই ঝুলিয়ে দেওয়া হলো রঙীন পর্দা —  
লাল, হলুদ ও বেগুনি রঙে ঝলমল করে উঠলো  
গোটা বাহিনী ।  
সাম-পুত্রের দৃষ্টি যখন পিতার মুখের উপর পড়লো,  
তখন অশু-বল্কা অপরের হাতে দিয়ে তিনি অশু-পৃষ্ঠ থেকে  
অবতরণ করলেন ।  
এই সময় দুই পক্ষ থেকেই এগিয়ে এলেন মান্যবর ব্যক্তিগণ —  
সিংহাসনারোহী ও সিংহাসন-প্রত্যাশী ।  
বীরপ্রবর জাল পিতার উদ্দেশে চুম্বন করলেন ম্যাতিকা,  
পিতা তখন পুত্রের সঙ্গে কথোপকথনে রত হলেন ।

সাম এক আরবীয় ঘোড়ায় সওয়ার —

দেখে মনে হচ্ছে, স্বণবিখণ্ডিত সুউচ্চ গিরিচূড়া সামনে দণ্ডায়মান।  
উভয় পক্ষ থেকেই সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন,  
পিতা-পুত্রের সন্ধিকামনায় তাঁরা উন্মুক্ত করলেন তাঁদের রসনা।  
তাঁরা জালকে বললেন, হে বীরপুত্র বীর, আপনি

পিতা থেকে ক্লিষ্ট হয়েছিলেন ;  
আমরা সন্ধির প্রস্তাব করছি, আপনি তা থেকে মুখ  
ফিরাবেন না।

উত্তরে জাল বললেন, আমি কোন কিছুকেই ভয় করি না,

কারণ, মানুষের পরিণাম মৃত্তিকা ব্যতীত কিছু নয়।

পিতা যদি স্থিরচিত্তে বিবেচনার দিকে অগ্রসর হয়ে থাকেন,  
তবে নিশ্চিতই কথার পিঠে কোন কথা নেই।

দেখুন, আমি ভক্তিভরে উন্মুক্ত করছি রসনা,

অতঃপর দুই গঙ্গ ভিজিয়ে দিচ্ছি লজ্জাশুরতে।

এই বলেই জাল পিত্তস্মীপে এগিয়ে এলেন,  
আনন্দিত ও প্রশস্তচিত্তে তাঁর পদক্ষেপ হলো ত্বরিত।

এমন সময় অশুরোহী সাম অবতরণ করলেন অশু থেকে  
এবং এইভাবে জালের প্রতি প্রদর্শন করলেন যথাযথ সম্মান।

জাল পিত্তস্মীপে উপস্থিত হয়েই

যথারীতি মৃত্তিকা চুম্বন করলেন।

তিনি উচ্চারণ করলেন সামের প্রতি প্রশংস্তি

এবং স্বীয় চক্ষু থেকে অশু ঝরাতে লাগলেন।

বললেন, জাগ্রত-চিত্ত সেনাপতির মন ফুল্ল হোক !

দাসের প্রতি তিনি হোন ক্ষমা-সুন্দর।

হে বীরপ্রধান, আপনার তরবারির আঘাতে দ্রবীভূত হয় হীরকখণ্ড,  
যুদ্ধের দিনে পৃথিবী আপনার ভয়ে হৃদ্দন করতে থাকে।

রণক্ষেত্রে আপনার ক্ষিপ্র অশু যখন চমকাতে শুরু করে,

তখন মহুরগতি সৈন্যদলেও জেগে উঠে গতির বেগ।

যখন অস্তরীক্ষ প্রত্যক্ষ করে আপনার ভৌমতম প্রহরণ,

তখন আকাশপথে সঞ্চরমান তারকাদল স্তব্ধ হয়ে থেমে দাঁড়ায়।

পৃথিবী আপনার দানে হরিদুর্ণ হয়েছে,

আপনার প্রাণের ভিত্তি হয়েছে সুবিবেচনা।

সকল মানুষই আপনার বদন্যতায় আনন্দিত

আপনার বদান্যতা থেকে অংশ লাভ করে কাল ও ধরিত্বী।  
কিন্তু একমাত্র আমিই আপনার দয়া থেকে বঞ্চিত,  
যদিও আপনারই সন্তান বলে আমি জগতে পরিচিত।  
এই তুচ্ছ পরিত্যক্ত আমি পক্ষিনীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছি,  
এই দুনিয়ায় আমার মতো হতভাগ্য আর কেউ নয়।  
আমি নিজের মধ্যে কোন অপরাধ দেখতে পাই না,  
অথচ অমঙ্গল পথ করে আসে আমার জীবনে।  
বীরপ্রবর সাম অবশ্যই আমার পিতা,  
যদিও তাঁর সঙ্গে এই সম্পর্কে আমার ইচ্ছার কোন ভূমিকা নেই।  
আমি মাত্রগত থেকে জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছি,  
জনহীন পর্বতাঞ্চলকে আপনি নির্বাচিত করেছেন আমার বাসস্থান বলে।  
ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আপনি নবজাতককে দূরে  
নিষ্কেপ করেছেন,  
বর্ধমান এক শিশুকে আপনি স্থাপন করেছেন অগ্নিতে।  
আমি না দেখেছি কোন দোলনা, না প্রত্যক্ষ করেছি স্তন ও দুর্ঘ,  
না আমার ক্রন্দনকে কেউ পরিবর্তিত করেছে হাসিতে।  
আমাকে আপনি পর্বতাঞ্চলে এনে পরিত্যাগ করেছেন।  
বঞ্চিত করেছেন আমাকে সকল প্রকার স্নেহ ও পরিচর্যা থেকে।  
বিশু-স্বষ্টার সঙ্গে আপনি প্রদর্শন করেছেন প্রতিকূলতা,  
কারণ, আমি যে বিশু-স্বষ্টার দ্বারা প্রতিপালিত  
সেই স্বষ্টাই আমাকে পরম শক্তিসহ নিরীক্ষণ করছেন।  
কৃতিত্ব, বীরত্ব ও জয়ী তরবারি আমার আছে  
কাবুলরাজ মেহরাবের মতো মিত্রও আমার রয়েছে।  
তাজ-তখ্ত ও ভারী প্রহরণ  
সঙ্কল্প, সামন্ত ও সেনাপতিগণসহ  
আমি আপনারই ফরমান অনুযায়ী কাবুলের  
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছি,  
এবং আপনার ইচ্ছা ও বাণীর অনুগমন করছি।  
আপনিই বলেছিলেন, আমার কোন অনিষ্ট আপনি করবেন না,  
এবং আমার কর্মকে সুপথে পরিচালিত করবেন।  
কিন্তু মাজিন্দিরান থেকে কি এই উপটোকনই আপনি পেয়েছেন,  
যে কিরণজিজ্ঞান থেকে অশু প্রধাবিত করেছেন আমার দিকে?

আপনি কি চান যে আমার প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদকে আপনি ধ্বংস করবেন ?  
কি আপনি চান, কি প্রত্যাশা করেন, আমাকে খুলে বলুন।  
আমি এখন আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি,  
আমার জীবন্ত তনু অর্পণ করেছি আপনার হাতেই।  
ইচ্ছা হয়, করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করুন আমার দেহ,  
কিন্তু কাবুলে প্রবেশ করবেন না বিজয়ী বেশে।  
কারণ, মেহরাব ও কাবুল আপনারই আদেশের অনুগত,  
আপনার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাদের অন্য ইচ্ছা নেই।  
মেহরাব কি অপরাধ করেছেন, আপনি কি দেখেছেন তাঁর মধ্যে ?  
যে জন্যে আপনাকে শক্রবেশে এখানে উপস্থিত হতে হয়েছে ?  
আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন, এখানে তো আপনারই অধিকার,  
কাবুলের দৃঢ়খকে আমার দৃঢ়খ বলে গণ্য করবেন।  
জালের কথা শুনে সেনাপতি সাম  
সেদিকে মনোযোগী হলেন, প্রশংসিত হলো তাঁর ক্রোধ।  
জালকে সম্বোধন করে সেনাপতি বললেন, তুমি সত্য বলেছ,  
তোমার রসনা সত্য সাক্ষ্যই দিচ্ছে।  
আমার সকল কাজই তোমার প্রতি হয়েছে জুলুমের অনুরূপ,  
এখন সকল দুশ্মনের অন্তরই তোমার আনন্দের অনুকূল হোক !  
আমার কাছে কি চাও, খুলে বলো,  
হৃদয় থেকে বের করে দাও সকল সংকীর্ণতাকে।  
ধৈর্য ধারণ করো, যাতে তোমার বাসনা চরিতার্থ করে।  
তোমাকে সার্থকভাবে সুখী করতে পারি।  
আমি এখন ইরান-সম্ভাটের কাছে এক লিপি লিখবো,  
এবং হে ভাগ্যবান, তোমার হাতেই সেই লিপি তাঁকে পাঠাবো।  
তিনি যখন তোমার প্রতিভা ও মুখ সন্দর্শন করবেন,  
তখন কিছুতেই সম্ভাট তোমার কোন ক্ষতি করবেন না।  
আমি লিপিতে সকল কথাই সুন্দরকৃপে বর্ণনা করবো,  
এবং তদ্বারা সম্ভাটের মনপ্রাণকে করে তুলবো তোমার অনুকূল।  
বাহুবলে চিরকাল তুমি হও সিংহের মতো,  
যে কোন ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপক্ষ হোক তোমার মগয়া।  
এই কথা শুনে স্বচ্ছদ-চিন্ত জাল চুম্বন করলেন মৃত্তিকা,  
এবং পিতার উদ্দেশে উচ্চারণ করলেন বহুবিধ প্রশংসা।

## মনুচেহের-সমীপে জালের ঘাতা

সাম এবার লিপিলিখককে কাছে বসালেন  
এবং বহু বিষয়ে বহু বাণী উচ্চারণ করে চললেন।  
লিপির শুরুতেই লেখা হলো বিশু-প্রভুর প্রশংসা,  
তিনি সর্বত্র ও সর্বকালে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত।  
তাঁর থেকেই উৎসারিত ভালো-মন্দ ও অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব,  
আমরা সবাই তাঁর দাস এবং তিনি এক !  
তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই রূপ ধারণ করে অস্তিত্বে,  
আবর্তমান আকাশ তাঁর থেকেই লাভ করে গতি।  
তিনি শনি গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্রের প্রভু,  
তাঁর সমীপ থেকে সম্ভাট মনুচেহেরের উপর বর্ষিত হোক  
আশীর্বাদ।

যুদ্ধক্ষেত্রে সম্ভাট প্রতিষেধক বিনষ্টকারী হলাহল,  
আসরে তিনি ধরিত্রী-উজ্জ্বলকারী পূর্ণচন্দ্ৰ।  
তিনি প্রহরণাঘাতে নগৰীৰ দ্বাৰোম্বোচনকারী,  
আনন্দরূপে তিনি প্রত্যেকেৰ কাছে বিলসিত।  
তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে ফাৰেদূনেৰ পতাকা সমূলীত করেন,  
তিনিই যুক্তোন্মাদ সিংহেৰ শিৰ করেন বিচূৰ্ণ।  
হে সম্ভাট, আপনাৰ পদাঘাতে উন্নতশিৰ পৰ্বত,  
আপনাৰ সমূলত অশ্বেৰ পদতলে ধূলিৱাশিৰ রূপ লাভ করে।  
আপনাৰ পবিত্র হৃদয় ও পৃত নীতিমালাৰ পরিণামে  
মেষ ও নেকড়ে একই ঘাটে পান করে জল।  
আপনাৰ দাসুৱাপে আমি নিৰ্দিষ্ট স্থানে এসে পৌছেছি,  
আমাৰ অশ্বও রয়েছে স্বহানে প্রতিষ্ঠিত।  
কৰ্ণুৱেৰ মতো শুভ কেশ আমি ধাৱণ কৱছি আমাৰ শিৱে,  
চন্দ্ৰ-সূর্য এইৱৰ শিৱস্ত্রাণই আমাকে দান কৱেছেন।  
আপনাৰ দাস রূপেই আমি বন্ধন কৱেছি আমাৰ কঢ়িদেশ  
আপনাৰ নিৰ্দেশে চিৱদিন আমি ব্যুহ রচনা কৱবো।  
অশ্ব-বল্গা বাগিয়ে ধৰে প্রতিপক্ষেৰ সঙ্গে প্রহৱ রণে নিৱত, —  
আমাৰ মতো এমন বীৰ আপনি আৱ ধৱিত্রীতে দ্বিতীয়টি  
দেখবেন না।

মাঙ্গ-ন্দিৱানেৰ বীৱ পুনৰ্বগণ পানি হয়ে গিয়েছিল,

যখন আমি হাতে তুলে নিয়েছিলাম ভীম প্রহরণ।  
আমার বংশের যদি কেউ দুনিয়ায় না থাকে,  
তবে বিদ্রোহীরা সম্মুক্ত করবে তাদের শির।

যেমন কশফ নদী থেকে উঠে এসেছিল এক আজদাহা,  
এবং তার মুখ নিঃস্ত লালায় মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছিল।  
নগর থেকে নগর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল তার দেহবিস্তার ;  
ধরিত্বী ভয়ে কম্পিত হয়েছিল তাকে দেখে  
সবার দিনরাত্রি সঙ্কট-সন্তাবনায় কাটছিল।

সেই আজদাহার ভয়ে বায়ুমণ্ডল হয়েছিল বিহঙ্গশূন্য,  
এবং হিংস্র পশুকুল ধরিত্বীবক্ষে বিচরণে শক্তি ছিলো।  
তার অবয়ব দৃষ্টেই ঈগলের পাখা পুড়ে ছাই হয়ে যেতো ;  
এবং পৃথিবী আপনিই কুকড়ে যেতো তার বিশোদগারে।  
ভয়ঙ্কর নক্রকেও সে টেনে আনতো জলমধ্য থেকে,  
এবং বিদ্যুৎ-গতি শ্যেন পক্ষীকে উড়য়ন থেকে

আকর্ষণ করে নিতো।

পৃথিবীর মানুষ ও চতুর্সদ তার হাতে প্রাণ দিয়েছিল,  
তারা ছেড়ে দিয়েছিল দুনিয়া সেই আজদাহারই হাতে।  
যখন আমি দেখলাম যে ধরিত্বী মনুষ্যশূন্য হয়ে যাচ্ছে,  
এবং তার বিরুক্তে কেউ-ই কিছু করে উঠতে পারছে না ;  
তখন পরিত্র বিশ্ব-প্রভুর শক্তিতে বিশুস্মী হয়ে —

আমি অস্তর থেকে দূর করে দিলাম সকল ভয়।

সেই সম্মুক্ত প্রভুর নামে বক্তন করলাম কঠিদেশ,  
এবং হস্তীবপু এক অশ্বের পিঠে চড়ে বসলাম।  
অশুসনের নীচে রাখলাম গোমুখাক্ষিত প্রহরণ,  
বাহ্যতে ঝুললাম ধনুক এবং পষ্ঠদেশে ঢালচর্ম।

এইভাবে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে ভয়ঙ্কর নক্রের অনুরূপ ধাবিত হলাম,  
আমার শক্ত পাঞ্জা ওর মারাত্মক নিঃশ্বাসের মুখোমুখি হতে চললো।  
যে আমাকে দেখলো সেই জানালো স্বাগত সন্তাযণ,  
তারা আশা প্রকাশ করলো, আমি আজদাহার গায়ে হানবো

প্রহরণের আঘাত।

আমি যথাস্থানে পৌছে আজদাহাকে পর্বতের মতো সম্মুক্ত দেখলাম,  
তার মস্তকের কেশরাশি ফাঁসরজ্জুর অনুরূপ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।  
তার লকলকে জিহ্বা প্রকাও কালো বৃক্ষের মতো

শুধুমাত্র অস্তিত্বের প্রতাপেই সে আকাশ থেকে  
টেনে পতিত করেছে বাজপাখি।

দুটি জলাশয়ের মতো রঞ্জপূর্ণ তার চক্ষু,  
আমাকে দেখামাত্র সে গর্জন করে অগ্রসর হলো।  
হে সন্ত্রাট, তখন আমার মনে হলো  
অগ্নিদাহ আমি অনুভব করছি আমার বুকে।  
দুনিয়া আমার চোখে প্রতিভাত হলো দুষ্টুর সমুদ্র বলে,  
তার থেকে বহিগতি কালো ধূয়া মেঘলোক স্পর্শ করলো,  
তার চিংকারে প্রকম্পিত হলো ধরণীবক্ষ,  
তার মুখনিঃস্ত হলাহলে পথিবীতে প্রবাহিত হলো স্ন্যোতধারা।  
আমিও তার দিকে ছুড়ে দিলাম আমার সিংহ-গর্জন,  
সাহসী পুরুষের যোগ্য প্রত্যুত্তর !  
হীরক-কঠিন ফলাযুক্ত এক তীর শরাসন থেকে তুলে নিয়ে —  
ত্বরিত গতিতে আকাশে নিক্ষেপ করলাম।  
সেই হিংস্র দৈত্য ছিল তীরের লক্ষ্য —  
যাতে তার জিহ্বা তার তালুর সঙ্গে বিন্দু করে দিতে পারি।  
এইভাবে আজদাহার একাংশ বিন্দু করার ফলে  
আশৰ্য হয়ে দেখলাম তার জিহ্বা ঝুলে পড়েছে তার মুখের বাইরে  
সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষেপ করলাম দ্বিতীয় তীর,  
এবার সেটি সরাসরি তার চোয়াল বিন্দু করে দিলো।  
তৃতীয় শর তার বুকের নীচের দিক লক্ষ্য করে ছুড়লাম,  
সেটি তার কলাজে ছিদ্র করে রক্তের ধারা বইয়ে দিলো মাটিতে !  
অগ্রসরমান আজদাহা যখন আমার নিকটবর্তী হলো।  
তখন এই গোমুখাঙ্কিত প্রহরণ দুরার তাকে আঘাত করলাম।  
বিশ্ব-প্রভুর শক্তিতে এইবার  
হস্তীবপু সেই দৈত্যকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করতে সমর্থ হলাম।  
তার মন্তকে হনলাম গোমুখাঙ্কিত প্রহরণের আঘাত  
মনে হলো, পর্বতশীর্ষকে আঘাত করলো স্বয়ং আকাশ।  
মন্ত হস্তীর মন্তকের মতো তার শির যখন চূর্ণ হয়ে গেলো,  
তখন তার ভিতরের বিষ নীলনদের ধারার মতো প্রবাহিত হলো।  
এই আঘাতটি এমন চূড়ান্ত হলো যে দ্বিতীয়টির প্রয়োজন হলো না,  
পর্বত ও মৃত্তিকার ব্যবধান চিরতরে দূর হয়ে গেলো।  
কশফ নদী আজদাহার রক্তে লাল হলো,

ফলে, দুনিয়া শাস্তিতে ঢলে পড়লো নিম্নার কোলে ।  
এই দৃশ্য দেখবার জন্য গোটা পর্বতাঞ্চল নরনারীতে ভরে গেলো,  
এবং সবাই উচ্চারণ করতে লাগলো আমার প্রশংসা ।

গোটা জগৎ যেন এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে লাগলো,  
কেননা, এই আজদাহা ছিল সর্বকালের জন্য মুর্তিঘান অঘঙ্গল ।

সেই হতে লোকে আমাকে মোক্ষম আঘাতকারী বলে

অভিহিত করতে লাগলো,

এবং গোটা জগৎ আমার শিরে বর্ণ করলো মুক্তারাজি ।

আজদাহার হত্যা সম্পূর্ণ করে আমার গাত্র থেকে খুলে

ফেললাম তনুত্রাণ,

আমার গাত্র তখন হয়ে উঠলো বিবসনা ।

অশু-পৃষ্ঠ থেকেও অশুসন খুলে ফেলে দিলাম,

আজদাহার বিষ-স্পর্শ তখনও তাতে লেগে রয়েছিল ।

সেই অঞ্চলে দীর্ঘদিন পর্যস্ত গাছে কোনো ফলফুল ধরলো না,

শুক্ষ কন্টক ব্যতীত আর কিছুই সেখানে গজায়নি ।

দৈত্যদের সঙ্গে আমার যুদ্ধের কাহিনী যদি বর্ণনা করি,

তবে এ লিপিকা হয়ে পড়বে দীর্ঘ ।

অস্তত এটুকু বলবো যে, এইভাবে যখন যে প্রচেষ্টা চালিয়েছি,  
তখনই উদ্বিত জনের শির করেছি পদানত ।

যেখানেই প্রধাবিত করেছি আমার অশু,

সেখানেই প্রাগ্হরক সিংহকে করেছি নির্জিত ।

গত কয়েক বছর ধরে অশুপৃষ্ঠ হয়েছে আমার আসন,

অশুই হয়েছে আমার সিংহসন ও বাসভূমি ।

গোটা কিরিগিজভূমি ও মাজিন্দিরানকে

এই প্রহরণ দ্বারা আপনার বশীভূত করে এনেছি ।

একটি মুহূর্তের জন্যও দেশের কথা আমি ডাবিনি,

শুধু আপনারই সন্তোষ ও বিজয় কামনা করেছি ।

এখন আমার অশ্বের এই সমুন্নত গ্রীবা

এবং আমার প্রহরণের প্রহার —

যেমন পূর্বে ছিল, তেমন আর থাকছে না,

আমার দেহযষ্টি ও হয়ে এসেছে বাঁকা ।

ধনুর্বণ আমার ক্লান্ত হাত থেকে খসে পড়েছে

কাল আমার থেকে বন্ধ করে দিয়েছে রাজস্ব গ্রহণ ।

সেইজন্য রাজকীয় দুন্দুভি আমি সমর্পণ করতে চাই জালের হাতে,  
যাতে সে কটিদেশ বহন করে হাতে তুলে নেয়  
কেয়ানী-প্রহরণ।

এ করলে শক্রদল বিনাশে সে তৎপর হবে,  
এবং তার কৃতিত্ব সম্মাটকে দান করবে আনন্দ।  
জাল তার অন্তরে পোষণ করছে এক বাসনা,  
সম্মাট সমীপে তা নিবেদন করতে সে যাচ্ছে।  
সেই বাসনা বিশ্ব-প্রভুর সমীপে অকল্যাণকর নয়,  
তাঁর নির্দেশের অধীনে অবস্থান করে সকল কল্যাণ।  
কিন্তু জালের সেই বাসনার প্রতি আমি কোন সমর্থন জানাইনি,  
কারণ মহামান্য সম্মাটের আমি দাস মাত্র — তাঁর অনুমতি ছাড়া  
কিছুই হওয়ার নয়।

তবে আমি অবশ্যই আমার সম্মাটের কাছে জানাবো,  
কি শপথ আমি জালের কাছে করেছিলাম।  
বহু লোকের সামনে আমি তাকে বলেছিলাম,  
যখন তাকে ফিরিয়ে এনোছিলাম আলবুর্জ পাহাড় থেকে  
বলেছিলাম, জালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ আমি করবো না,  
তার বাসনা আমি পূর্ণ করবো।  
এখন শোণিতাঙ্গ হৃদয়ে ভাঙ্গ মন নিয়ে  
সে আমার কাছে এসেছে;  
এসে আমাকে বলছে, আপনি আমল\* থেকে বেরিয়ে  
কাবুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করুন।  
যখন আমি পঞ্জীয়ন দ্বারা পালিত হচ্ছিলাম,  
যখন আপনি আমাকে দূরে পরিত্যাগ করেছিলেন;  
তখন আমি কাবুলে এক চন্দ্রমুখীকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম,  
যার সৌন্দর্য ফুলবনে সরল দেবদারুর অনুরূপ।  
সেই সৌন্দর্যবর্তীর দ্বারা সে যদি সত্যই পাগল হয়ে থাকে,  
তবে আশ্চর্যের কিছু নেই,  
আমার আশা, সম্মাটও তার দোষ ধরবেন না।  
এখন সেই প্রেম প্রসঙ্গ এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে,  
তাকে ধে-কেড়ে দেখে, সে-ই তার উপর অশ্রুবর্ষণ করে।

---

মাঝিন্দিরানের অস্তর্গত একটি শহরের নাম।

সেই নিষ্পাপ যুবক এখন বিশাদ-সিদ্ধুতে মগ্ন,  
সম্ভাট সমীপে সে বাণী-বাহক রূপে যাচ্ছে, স্বয়ং সম্ভাটই  
এখন সম্যক্ত প্রত্যক্ষ করুন।

তার এই বিষয় আমাকে পীড়া দিচ্ছে;  
যখন সে সম্ভাটের সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হবে,  
তখন এমন করবেন যে কোন সামন্ত যেন তার সঙ্গে কথা বলে;  
আপনি স্বয়ং কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না  
দুনিয়ায় আমার পক্ষে চাওয়ার মতো বস্তু আর কিছু নেই,  
সম্ভাট যদি মহেশ্বর দ্বারা দাসের এই মনোবাসনা পূর্ণ  
করেন তবেই যথেষ্ট।

সবশেষে নূরীমান পুত্র সামের পক্ষ থেকে মহান বাদশার প্রতি  
সহস্র অভিনন্দন; সামন্তবর্গকেও কুশল জিজ্ঞাসা।  
এইভাবে লিপি লিখন সম্পূর্ণ হলে তা তুলে দেওয়া  
হলো জালের হাতে

তিনি তখন বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে,  
রাত্রি তার শিরে তুলে নিলো অঙ্ককারের তাজ।  
সাম সারারত ঘুমালেন না ভোর পর্যন্ত জেগে রইলেন,  
নানা দুশ্চিন্তা হরণ করে নিয়েছিলো তাঁর নিদ্রা।  
অবশেষে রাত্রি খুলে ফেললো তারাখচিত বসন,  
এবং উষার ঠোটে দেখা দিলো শুভ হাসির রেখা।  
এইবার জাল তার অশুসনে উঠে বসলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে নিনাদিত হলো যাত্রারঙ্গসূচক বিষাণ।  
কতিপয় ধীরও জালের সঙ্গী হলেন,  
দ্রুত গতিতে তাঁরা এগিয়ে চললেন কাবুল-রাজ্যের সিংহাসন  
অভিযুক্তে।

মহামতি জাল কাবুল থেকে বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
মহাবল সাম প্রত্যাবর্তন করলেন এক উদ্যানে।

## সীদুখ্তের উপর মেহরাবের ক্রোধ

কাবুল এ-কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে  
কাবুল-রাজের অন্তর ক্রোধে পরিপূর্ণ হলো।  
তিনি সরোবে সীদুখ্তকে কাছে ডাকলেন,  
এবং রুদাবার প্রতি যে ক্রোধ উচ্ছিত হচ্ছিলো তাঁর মনে  
তা সীদুখ্তের উপর ঢাললেন।  
তিনি বললেন, এ-কথা এখন ভালো করে বোঝ যে  
ইরান-সম্ভাটের সঙ্গে আমি শক্তিতে কখনই পেরে উঠবো না।  
নিয়ে এসো তোমার সেই পাপাসন্ত কন্যাকে  
তাকে আমি টেনে নিয়ে যাবো লোক-সমক্ষে;  
একরূপ ক্রোধের প্রকাশ ইরান-সম্ভাটকে শান্ত করবে,  
এবং সেই সঙ্গে আমার দেশের লোকও হবে তয় থেকে মুক্ত।  
তা না হলে কাবুল সাম যে ঘূঁঢ়ের সূচনা করবেন,  
কে তার প্রহরণের সম্মুখীন হতে সাহস করবে ?  
সীদুখ্ত এই কথা শুনে কাবুল-রাজের সামনে উপবিষ্ট হলেন,  
এবং প্রতিকার চিন্তায় নিজেকে করলেন নিমজ্জিত।  
একটি উপায় মহিয়ীর মাথায় এলো,  
সেটি যেমন সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রসূত, তেমনি দূরদর্শী।  
তিনি তখন রাজাকে বললেন, আমার কথা শুনুন,  
অতঃপর আপনার যা অভিপ্রায় তা করবেন।  
যদি জীবন আপনার প্রিয় হয়,  
তবে ক্ষমা করুন, আর জেনে রাখুন, রাত্রি গর্তবতী।  
রাত্রি যতই না দীর্ঘ হোক  
তার অন্ধকার বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না ;  
দিবস যখন আলোকিত নদীতে পরিণত হবে,  
তখন ধরিত্রী হেসে উঠবে বদ্ধশানের মুক্তার মতো।  
এই কথা শুনে মেহরাব সীদুখ্তকে বললেন,  
অতীত দিনের মানুষের মতো উপমার উপস্থাপন করো না।  
যা জান পরিষ্কার করে বলো, এবং আরও জানতে সচেষ্ট হও,  
অথবা অঙ্গে ধারণ করো রক্ত-বসন।  
জবাবে সীদুখ্ত বললেন, হে সম্মুক্ত-শির রাজা,  
আপনি তো আমার রক্তে আশৃষ্ট হবেন না।

আমার উচিত হবে সামের সামনে যাওয়া,  
এবং সেখানে গিয়ে উচ্চৃত করা আমার তরবারি —  
যা বলা উচিত তাই আমি তাঁকে বলবো,  
প্রজ্ঞা বাজে কথাকেও দান করে পরিপূর্ণ।

আমার থেকে বিশাদ আর আপনার থেকে উপহাত সম্পদ,  
এ দুটোই আমি তাঁকে দান করবো।

এই কথা শুনে মেহরাব বললেন, এই নাও কুঞ্জিকা,  
সম্পদ যত ইচ্ছা দান করো, কিন্তু দুঃখ নয়।

দাসদাসী, অশু, আসন ও শিরস্ত্রাণ,  
সব কিছু দুরা নিজেকে সংজ্ঞিত করে ওদিকে মুখ করো।

কিন্তু কাবুল-নগরী যেন আমাদের কারণে আহত না হয়,  
যদি প্রয়োজন হয়, আমাদের সন্ততি আমাদের জন্য হোক পরিম্মান।

উত্তরে সীদুখ্যত ফশমী নরপতিকে বললেন,  
বিষাদিত অঙ্গকরণের জায়গায় বিনয়কে আনয়ন করুন।

এমন যেন না হয় যে, আমি যখন প্রতিকারকল্প গমন করবো  
তখন আপনি রুদাবার প্রতি করবেন কঠিন আচরণ।

দুনিয়ায় রুদাবাই আমার প্রাণের একমাত্র অবলম্বন,  
আপনাকে এখন আমি প্রতিজ্ঞায় আবক্ষ করছি;

আমার নিজের জীবনের জন্য কোন শক্তি আমার নেই,  
কিন্তু তার জন্য আমার দুরকমের সকল্প।

প্রথম, তার জন্য আমি করছি দৃঢ় শপথ  
দ্বিতীয়, পুরুষের সাহস নিয়ে প্রতিকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

অতঃপর সীদুখ্যত অঙ্গে ধারণ করলেন স্বর্ণখচিত কৈশিক বস্ত্র,  
এবং সীথিতে মুক্তা ও সূর্যকান্ত মণির অলঙ্কার পরলেন।

তারপর মেহরাবের রাজকোষ থেকে উপহারের জন্য  
তিনশত সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা বের করে নিলেন।

রৌপ্য নির্মিত অশুসন গ্রহণ করলেন ত্রিশটি,  
এবং আরব ও ইবানের বাছাই করা অশুও সঙ্গে নিলেন।

ষাটজন কঠহার পরিহিতা দাসী রইলো তার সঙ্গে,  
তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে স্বর্ণের পানপাত্র।

পাত্রগুলিতে রয়েছে কস্তুরী, কর্পূর, মণি ও স্বর্ণখণ্ড,  
রয়েছে নীলকান্ত মণি ও সুগঠিত মুক্তা।

একশো উদ্ধী যাদের গায়ের পশম লাল,

এবং একশো উষ্ট নানা উপকরণে বোঝাই করে নেওয়া হলো।  
আরো নেওয়া হলো রাজ্যোগ্য একটি মুকুট,  
সেই সঙ্গে কুণ্ডল, কঠহার ও কর্ণভরণ।  
আকাশের মতো সমুন্ত একটি স্বর্ণ সিংহাসনও লওয়া হলো,  
তাতে খচিত ছিল বহু মূল্যবান মুদ্রা।  
রাজকীয় বিশটি পরিষদ নিয়ে অগ্রসর হলো  
বিশজন অশুরোহী পুরুষ।  
সেই সঙ্গে হিন্দুস্তানী চারটি মতৃহস্তীও ছিল,  
সেগুলিতে বোঝাই করা ছিল পরিষদ ও আচ্ছাদনী।

## সাম কর্তৃক সীদুখ্তকে সন্তুষ্ট করা

উপহার সামগ্ৰীৰ কাজ শেষ কৱে অশ্ৰেৰ দিকে  
মনোনিবেশ কৱলেন রানী,  
এবং বিদুৎগতি—সম্পন্ন এক অশৃ আনয়ন কৱলেন।  
রোম দেশীয় শিৱস্ত্রাণ তিনি তলে নিলেন শিৱে।  
এবং বাযুগতি এক অশ্ৰেৰ পিঠৈ চড়ে বসলেন।  
দ্রুতগতিতে তিনি সামেৰ শিবিৱে এসে উপনীত হলেন  
না তিনি কাৰো নাম ধৰে ডাকলেন, না নিজেৰ নাম বললেন।  
প্ৰহৱীকে সহসা সম্বোধন কৱে বললেন যে,  
বিশুবিখ্যাত বীৱকে গিয়ে বলো,  
কাৰুল থেকে এক দৃতেৰ আগমন হয়েছে,  
সে জাৰুল রাজেৰ সঙ্গে দেখা কৱতে চায়।  
বলো, দৃত মেহৰাবেৰ সমীপ থেকে বাণী নিয়ে এসেছে,  
এবং সেই বাণী বিশু—বিজয়ী সামেৰ জন্যই নিৰ্দিষ্ট।  
সামেৰ কাছে যবনিকাঞ্চনালবৰ্তী বীৱেৰ আগমন হয়েছে,—  
এ কথা তাঁকে বলো, এবং তাতে কৱো গুৰুত্বারোপ।  
এই বলে সীদুখ্ত অশৃ থেকে অবতৱণ কৱলেন,  
এবং দ্রুত চলে গৈলেন সেনাপতিৰ সামনে।  
ভূমি চুম্বন কৱে রানী উচ্চারণ কৱলেন  
ইৱান—সম্ভাট ও বীৱেৰ প্ৰশংসা।  
সামেৰ জন্য আনীত উপহার — হস্তী ও দাসী —  
সারি বেঁধে দুমাইল পৰ্যন্ত দণ্ডায়মান।  
রানী সমস্ত উপহার বীৱকে উৎসৃষ্ট কৱলেন,  
সাম তা প্ৰত্যক্ষ কৱে হলেন বিশ্বিত।  
রানী এইবাৰ চিন্তান্বিত মন নিয়ে উন্মাদিনীৰ মতো  
উপবেশন কৱলেন,—  
তাঁৰ মন্তক অবনত ও হস্তদুয় সংযুক্ত।  
কোন কথা না বলে তিনি চুপ কৱে রইলেন,  
মনে হলো, তাঁৰ নিশ্চাস পৰ্যন্ত পড়ছে না।  
সাম ভাবতে লাগলেন কোথা থেকে এসেছে এত উপহার,  
এবং নারীবেশী দৃতই বা কোন বীতি অবলম্বনে এখানে  
আগমন কৱেছে?

আমি যদি এখন এইসব উপহার গ্রহণ করি,  
তবে আমার বাদশাহ তাতে অসম্পূর্ণ হতে পারেন।  
আর যদি মুখ ফিরাই জালের দিক থেকে  
তবে সে সীমোরগের বিক্রমে এগিয়ে আসবে।  
এবং তার প্রাণ আমা থেকে পাবে দৃঢ়থ,  
আর লোকের কাছেইবা আমি কি বলবো ?  
এইসব বিষয়ে সাম গভীরভাবে চিন্তামণি হলেন,  
অবশেষে তিনি হিঁব করলেন যে, উপহার গ্রহণ করবেন।  
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি উপহার বস্তুসমূহ জালের কোষাধ্যক্ষকে দিলেন,  
এবং কাবুল-চন্দ্রাননার নাম করে তা রাখতে বললেন।  
এমন সময় সুরাননা সীদুখ্ত সামনে এসে  
হাঁটিস্টে উন্মুক্ত করলেন স্বীয় রসনা।  
যখন দেখলেন যে উপহারসমূহ গৃহীত হয়েছে,  
সেগুলির সব কিছুই সেনাপতির নিকট পৌছেছে;  
তখন একই সঙ্গে তিনজন সুন্দরী দাসীকে রানী পেশ করলেন,—  
তারা সবাই রজত-বক্ষা ও দেবদারু সদৃশ।  
তাদের প্রত্যেকের হাতে ধরা রয়েছে একটি করে পানপাত্র,  
সেগুলি সূর্যকান্তমণি ও সুডেল মুক্তারাজিতে পরিপূর্ণ।  
মণিমুক্তাগুলি সেনাপতির পায়ের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হলো,  
ফলে, সেগুলি পরম্পরের সঙ্গে মিশে গেলো।  
এইভাবে অভিষ্ঠ কাজ সিদ্ধ হলে  
সেখান থেকে অন্য লোক চলে গেলো।  
এইবার সীদুখ্ত সেনাপতিকে সম্বোধন করে বললেন,  
আপনার সিদ্ধান্ত বৃক্ষকে দান করে নব ঘোবন।  
মহত্ত্বমণি জ্ঞান শিক্ষা করে আপনার থেকে,  
এবং অঙ্ককার ধরিত্রী আপনার জন্য হয়ে উঠে আলোকিত।  
আপনার অঙ্গুরীয় অমঙ্গলের হস্ত বক্ষন করে,  
এবং আপনার প্রত্যরুণ করে বিশ্ব-প্রভুর পথ উন্মুক্ত।  
দোষ যদি কিছু করে থাকেন তবে মেহ্রাব তা করেছেন,  
তাই তাঁর হন্দয় বস্ত অঙ্গ হয়ে ঝরছে তাঁর চোখে।  
কাবুলের মহত্ত্বমণি কি পাপ করেছেন ?  
তাঁরা কেন আজ ধূলায় লুটাচ্ছেন ?  
কাবুলবাসীরা এখনও আপনার কারণেই জীবিত আছেন,

তারা আপনারই দাস ও পায়ের ধূলার সমান।  
তাদের ভয় ও সংজ্ঞাহীনতাকে আপনি জীবনীশক্তিতে  
রূপান্তরিত করুন,  
তাদের মধ্যে সৃষ্টি করুন সূর্য ও শনিগ্রহের আলো।  
আপনার জন্য কাবুল জনতার রক্তপাতে  
কটিবন্ধন করা শোভা পায় না !  
এইবার বীরপ্রবর সাম বললেন, উত্তর দিন,  
আমি যা যা জিজ্ঞাসা করবো তার সরল জবাব চাই।  
প্রথম প্রশ্ন, আপনি মর্যাদায় মেহরাবের চেয়ে ক্ষুদ্র না সমান ?  
মেহরাবের মেয়ের সঙ্গে জালের কোথায় দেখা হয়েছিল ?  
তার চেহারা, চুল, স্বভাব ও বুদ্ধি কিরূপ ?  
বলুন, কে তাকে সামনাসামনি দেখেছে ?  
তার সমুন্নতি ; সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা  
কে প্রত্যক্ষ করেছে, আমার কাছে বলুন।  
সীদুখত তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে সেনাপতি,  
আপনি সৈন্যাধ্যক্ষগণের প্রধান ও বীরদের পৃষ্ঠপোষক।  
প্রথমেই আমি এক কঠিন শপথ করছি,  
যার ফলে আকাশ ও ধরিরত্রী হবে কম্পিত।  
আপনার হাতে আমার প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই,  
না আমার কাছে আপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আর কেউ আছে।  
আমার প্রাসাদ ও অস্তঃপুর জনবহুল,  
আমার ধনসম্পদ আমার মর্যাদার ভিত্তি।  
আমার কথা আপনার মান-সম্ভবের উপযুক্ত হবে।  
কাবুলের গোপন ধনভাণ্ডার আমি উন্মুক্ত করছি  
জাবুলস্তানের দৃষ্টির সামনে, অবলোকন করুন।  
এইবার সাম কাবুল রাজমহলীর হস্তধারণ করলেন  
এবং সর্বরকমের শপথ ও প্রতিজ্ঞায় নিজেকে করলেন আবদ্ধ।  
সীদুখত বীরপ্রবরের শপথবাক্য শ্রবণের পর  
সব কথা সত্য-সরলভাবে বলতে মনস্থ করলেন।  
তিনি মৃত্তিকা চুম্বন করে সোজা হয়ে দণ্ডযামান হলেন,  
এবং যা কিছু গোপন ছিল সব করলেন অবারিত।  
বললেন, হে সেনাপতি, আমি জোহাকের বৎসধর,  
অ্যালোকিত-চিত্ত বীর মেহরাবের পত্নী,

চন্দ्रমুখী রূদ্বিবার মা আমি,  
যে রূদ্বিবার উপর জাল তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।  
আমার গোটা পরিবার বিশ্ব-প্রভুর সমীক্ষে যেন  
অঙ্ককার রাত্রির বুকচেরা আলো।

আমি এখনই আপনার কাছে জালের সব কথা বলবো,  
যা জগজ্জয়ী ইরান সম্বাটেরও অগোচরে থাকবে না।  
আমি আপনার সামনে দণ্ডায়মান, বলুন আপনার বাসনা কি ?  
এই কাবুলে কে আপনার শক্র, কেইবা বকু ?  
যদি আমরা অসৎ লোক ও অপরাধী হয়ে থাকি,  
তবে এ-রাজ্য আর প্রত্যাশা করি না।

আমি দৃঢ়খিতচিত্তে এই আপনার সামনে দাঁড়িয়েছি,  
আপনার অভিপ্রায় হয়, আমাকে হত্যা করুন বা বন্দী করুন।  
কাবুলের নিরপরাধ অধিবাসীদের অনিষ্ট করবেন না,  
কারণ, তারা অঙ্ককার থেকে আলোয় সমাগত।

সেনাপতি যখন তার কথা শুনলেন  
ও দেখলেন যে, মহিলা সাধুসঙ্কল্প ও আলোকিত-চিত্ত,  
দেখলেন যে, তাঁর রূপ বসন্তের মতো ও দেবদারু সদৃশ দীর্ঘকায়,—  
তাঁর কঠিদেশ ক্ষীণ ও গমন রাজহংসীর অনুক্রম  
তখন তিনি বললেন, আমার শপথ সত্য,  
যদি প্রাণ যায়, তবু তার বিপরীত কিছু হবে না।  
আপনি এবং কাবুলে আপনার যত আত্মীয় আছে,  
সবাই স্বাস্থ্য ও শাস্তিতে বসবাস করুন।

তদুপরি আমি আপনার সঙ্গে একমত যে,  
জাল শীয় পত্নীরপে রূদ্বিবাকে মনোনীত করেছে।  
যদিও আপনারা অন্য বংশের  
তবুও রাজমুকুট, রাজাসন ও অঙ্গুরীয়ের আপনারা অবিকারী।  
এই-ই হলো দুনিয়ার রূপ, এতে কলকের কিছু নেই,  
কারণ, বিশ্ব-স্বষ্টির ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব নয়।  
তিনি তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ীই সব কিছু সৃষ্টি করেন,  
আমরা চাই, বা না-চাই তার জন্য কিছু যায় আসে না।  
তিনি কাউকে উপরে, কাউকে নীচে স্থান দেন,  
কাউকে ন্যূনতা দ্বারা করেন বিমর্শ।  
কিন্তু উভয়ের পরিণাম মৃত্তিকা-গর্ভে,

কারণ, সকল সন্তা মৃত্যু-সন্তা দ্বারা বিচূর্ণ হয়।  
কঙ্গেই এখন আমি আপনার জন্যই কাজ করে যাবো,  
আপনার করণ মিনতি ও অভিপ্রায়ই হবে কাজের লক্ষ্য।  
সমব্যথা ও মিনতির প্রকাশ দ্বারা  
এক লিপিকা আমি সমুন্নত সন্ধাটের কাছে লিখবো।  
সেই লিপিকা নিয়ে ঘনুচেহেরের কাছে যাবে জাল,  
এত দ্রুত এই সিদ্ধান্ত পালিত হবে যেন যাত্রাপথে  
গজাবে তার পাখা।

সে অশ্বাসনে চড়ে বসবে, তারপর ধাবিত হবে বাযুগতি,  
তার ঘোড়ার ক্ষুর বিদীর্ঘ করবে পথের মুক্তিকাকে।  
এর ফলে সন্ধাটি আমাকে দান করবেন প্রত্যুষ্তর,  
তাঁর অনুমতি আমাদেরকে আনন্দিত সৌভাগ্য দান করবে।  
তিনি বললেন, পাখির প্রতিপালিত জালের হৃদয়

হাতছাড়া হয়েছে,

তার চোখের জলে ভিজে উঠেছে পদতল।  
দম্পতি যদি এমন সুদর্শন হয়,  
তবে অপশংশ থেকে যত সত্ত্বর সন্তুষ্ট তাদের বের করে আনা উচিত।  
একজন পৌরুষে আজদাহার অনুরূপ,  
অন্যজন ফুলবনের ঘতো।

কন্যা দেখলে অবশ্যই আমার পছন্দ হবে,  
এবং তার বাক্যালাপও হবে আমাদের মনোমত।  
সীদুখ্ত বললেন, যদি সেনাপতি  
দাসীর প্রাণকে এমন আলোকিত আনন্দিত করলেন,  
তবে দয়া করে আপনার অশুকে আমার প্রাসাদে প্রধাবিত করুন;  
ফলে, গর্বে গৌরবে আমার শির সমুন্নত হবে আকাশে।

আপনাকে আমরা সন্ধাটি বলে বরণ করে নিবো,  
আপনার সামনে আমরা উপস্থিত হবো উৎসর্গীকৃত প্রাণ নিয়ে।  
সাম চেয়ে দেখলেন যে সীদুখ্তের ওষ্ঠাধর স্মিত হয়ে উঠেছে,  
শক্তার সকল মূল তাঁর থেকে হয়েছে উৎপাটিত।

হাসিমুখে এইবার বীরপ্রবর সাম বললেন,  
চিন্তা থেকে মনকে অত শীঘ্র মুক্ত করবেন না।

সত্ত্বর আপনি আপনার লক্ষ্য সফলকাম হয়েছেন,  
সীদুখ্তও হেসে তার প্রত্যুষ্তি দিলেন।

তারপর তিনি, স্বীয় কাজে সফলকাম হয়ে  
আনন্দে সূর্যকাস্ত মণিসদৃশ মুখ নিয়ে  
বাযুগতি অশু প্রধাবিত করে ফিরে এলেন,  
এবৎ মেহরাবের কাছে ব্যক্ত করলেন সুসংবাদ।  
বললেন, চিঞ্চা থেকে মুক্ত করুন মনকে,  
এবৎ প্রত্যুদ্গমনের আয়োজন সম্পূর্ণ করুন।  
পরের দিন যখন সূর্যের উৎসে একটু ঢেউ লাগলো  
তখন সীদুখ্ত নিদ্রা থেকে জাগলেন।  
মহামান্যা রানী অবিলম্বে রাজানুষী  
সেনাপতি সামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।  
চলতে চলতে তিনি এসে পৌছলেন সামের শিবিরে  
এবৎ সামের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন  
যথাসময়ে তিনি সামের নিকটবর্তী হয়ে মাথা নত করলেন  
ও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে গেলেন কথোপথন।  
তারপর যথারীতি স্বস্থানে এসে উপবেশন করলেন  
এবৎ আনন্দিত বোধ করলেন তাঁর সান্নিধ্যে।  
সাম এইবার নব আত্মীয়ের জন্য গ্রহণ করলেন ব্যবস্থা,  
এবৎ মেহরাবের জন্য নতুন বাণী দান করলেন।  
বললেন, আপনি এদিকে-ওদিকে ভ্রম করে সব দেখুন,  
যা দেখে গেলেন তা গিয়ে মেহরাবকে বলবেন।  
অতঃপর সাম তাঁর জন্য উপহার প্রস্তুতে মনোনিবেশ করলেন,  
যত মূল্যবান বস্তু আছে, সব এনে জড়ো করতে আদেশ দিলেন।  
সীদুখ্তের সঙ্গে মেহরাবের জন্যও মনোনীত করলেন উপহার  
স্বেহময়ী রুদ্রাবার জন্যও উপটোকন সামগ্ৰী দিতে ভুলেন না।  
তদুপরি, কাবুলে সামের যা ছিল —  
প্রাসাদ, উপবন, শস্যক্ষেত্র ও আশীর্বাদ ;  
এবৎ দুঃখবৰ্তী চতুর্পদ ; প্রচুর বস্ত্র ও আচ্ছাদনী ;  
সব সীদুখ্তকে দান করা হলো  
তারপর তাঁর হাতে হাত রেখে সাম বললেন,—  
আনন্দিত-চিত্তে আপনারা কাবুলে বসবাস করুন,  
ভয় ও সল্লেহ থেকে মনকে করুন মুক্ত।  
এই কথা শুনে মলিন চন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠলো,  
তারপর শুভ নক্ষত্রে তাঁর যাত্রা হলো ঘরের দিকে।

## মনুচেহের সমীপে সামের লিপিকাসহ জালের আগমন

এখন কর্ণগত করো জালের বিবরণ,  
সম্মাট মনুচেহের সমীপে যে সৌভাগ্য তিনি  
লাভ করেছিলেন তার কথা ।

যখন সম্মাটের কাছে খবর এলো যে,  
সাম-পুত্র জালের আগমন হয়েছে,  
তখন বীরবন্দের দ্বারা এক প্রত্যুদ্গমনের ব্যবস্থা করা হলো,  
যে বীরগণ সম্মাট-সমীপে লাভ করতেন মর্যাদার আসন ।

সমুন্নত রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্তী হতেই  
জালের জন্য সম্মাট-দরবারের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেলো ।  
সিংহাসন-সমীপে উপস্থিত হয়েই জাল চুম্বন করলেন মৃত্তিকা,  
দীর্ঘকাল জাল মাটিতে মুখ নীচু করে রাইলেন,  
যা মাহাত্ম্যাবৃষ্টি সম্মাটকে দান করলো তৎপুরি ।

আদেশ পাওয়ার পর জাল  
মাটি থেকে শিরোত্তোলন করে ধূলা ঝাড়লেন ।

এইবার জাল সমুন্নত সিংহাসনের নিকটবর্তী হলেন,  
সম্মাট-সমীপ থেকে প্রশু হলো —

হে সেনাপতি-পুত্র, এই দূর দুরাহ পথ অতিক্রম করে  
কিভাবে সম্মাট-সমীপে তোমার আগমন ?

জবাবে জাল বললেন, হে সম্মাট, আপনার ঐশ্বর্যে পথ ছিল নির্বিঘ্ন  
এবং পথের সকল দুঃখ আনন্দ হয়ে বেজেছে ।

জালের কাছ থেকে এইবার বাদশাহ সেনাপতির পত্র পেলেন,  
এবং তা হাতে নিয়ে আনন্দিতভিত্তে স্মিত হাস্য করলেন ।

পত্র পাঠ করে সম্মাট বললেন,  
মনে আমার দুঃখ দীর্ঘতর হলো ।

কিন্তু এই মনোহর লিপিকা  
যা বয়োবৃন্দ সাম হৃদয়াবেগ দিয়ে রচনা করেছেন,

যদিও আমার প্রাণকে ব্যথিত করেছে  
তবুও এর আস্তরিকতাকে আমি স্বল্পমূল্য জ্ঞান করতে পারি না ।  
আমি তোমার বাসনাপূর্তির ব্যবস্থা করবো,  
এবং তোমার পরিণামের সফলতা যেন এ-পথে হয় তা দেখবো ।  
তোমাকে কিছুদিন আমার কাছে বাস করতে হবে,

যাতে আমি তোমার কাজ-কর্ম পরীক্ষা করে দেখতে পারি।  
ততক্ষণে পাচকগণ জালের জন্য স্বর্ণপাত্রে নিয়ে এলো খাদ্যদ্রব্য,  
সন্ধাটের আদেশে সকল যশস্বী আমীর  
শরীক হলেন সেই ভোজপর্বে।  
সন্ধাট এইভাবে ভোজপর্ব সমাধা করে  
অপর এক সিংহাসনযুক্ত প্রকোষ্ঠে সুরাপানে নিরত হলেন।  
সুরাপান শেষ করে সাম-পুত্র রাত্রির জন্য বিদায় নিলেন,  
এবং স্বর্ণসন-সজ্জিত এক ঘোড়ায় চড়ে বসলেন।  
পরদিন সকালে যথারীতি সাজ-সজ্জা করে  
এসে উপস্থিত হলেন ঐশ্বর্যবিমণিত মনুচেহরের দরবারে।  
জগৎপতি মনুচেহরের জালকে স্বাগত জানালেন  
জবাবে সাম-পুত্র উচ্চারণ করলেন সন্ধাটের প্রশংসা।  
এইবার সন্ধাটের আদেশে পুরোহিত ও জ্ঞানীগণ  
নক্ষত্রবিদ ও সমৃজ্ঞাসিতচিন্ত ব্যক্তিবর্গ  
সমন্বিত সিংহাসনকে ঘিরে এসে বসলেন,  
এবং শুরু করলেন অসীম আকাশ-রূপ ভাগ্যের অনুসন্ধান।  
তাঁরা চিন্তা ও গণনায় নিমগ্ন হয়ে  
দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত নক্ষত্রের অনুসন্ধানে ব্যস্ত রইলেন।  
তিনদিন ধরে গণনা অব্যাহত রাখার পর  
নক্ষত্রবিদগণ হিন্দুসন্নানী জ্যোতিষগ্রহ হাতে নিয়ে,  
সন্ধাটকে সম্বোধন করে বললেন,  
আকাশের নক্ষত্রাঙ্গি গণনা করে দেখলাম,  
নক্ষত্রের গণনায় প্রকাশ পেলো যে,  
জালের সৌভাগ্য দ্রুত সঞ্চরমান বিদ্যুতের অনুরূপ।  
দেখা গেলো যে, মেহরাব-কন্যা ও সাম-পুত্রের থেকে  
এমন এক প্রতিভাবান পুত্রের জন্ম হবে যিনি হবেন অতীব যশস্বী।  
তিনি দীর্ঘজীবী হবেন ও তাঁর জীবন হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ,  
শক্তি, ঐশ্বর্য ও সুনামের তিনি অধিকারী হবেন।  
তাঁর সাহস ও বুদ্ধিমত্তা এত সমন্বিত হবে যে,  
যুদ্ধক্ষেত্রে ও আসরে কেউ তাঁর সমকক্ষ থাকবে না।  
গতিমান হলে তাঁর অশ্ব কেশরাজির চেয়েও শীর্ণ হবে,  
তাঁর প্রতিপক্ষের কলিজা তাঁর ভয়ে শুক্ষ হয়ে আসবে।  
তুর্কী শ্যেন পক্ষীও তাঁর উপর দিয়ে উড়েয়নে হবে অক্ষম,

মহস্তম দলপতি ও অভিজ্ঞাত প্রতিপক্ষকেও তিনি  
মানুষ বলে গণ্য করবেন না  
তার দেহ-তরু সমুন্নত ও তিনি প্রচুর শক্তির —  
অধিকারী হবেন,  
তিনি তাঁর পাশ-রঙ্গুতে অবলীলায় আবজ্ঞ করবেন সিংহ।  
তিনি অগ্নিতে দগ্ধ করবেন বন্য গর্ভড়,  
তাঁর অসি-চালনায় ক্রম্মনরত হবে বায়ুরাশি।  
তিনি সম্মাটদের পক্ষে বক্ষন করবেন স্থীয় কটিদেশ,  
ইরানের অশুরোহীদের তিনি সহায়ক হবেন।  
তাঁর হৃদয়ের সকল প্রেম ইরানের জন্য রাখিত থাকবে,  
সারাজীবন তিনি ব্যাপ্ত থাকবেন তুরানের সঙ্গে যুদ্ধে।  
ইরান-সম্মাটের মনস্তুষ্টির জন্য  
তিনি দিবারাত্রি রোম ও চীনের সঙ্গে ব্যাপ্ত থাকবেন সগ্রামে।  
নক্ষত্রবিদদের এই ভবিষ্যদ্বৃণী শুনে মনুচেহের  
অত্যন্ত আনন্দিত হলেন,  
অতীতের ক্ষোভ ও দুঃচিন্তা মুছে গেলো তাঁর অস্তর থেকে।

## জালের কাছে পুরোহিতদের কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

এই সময় সন্মাট জালকে সম্বোধন করে বললেন,  
তোমাকে এখন কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।  
জাগ্রত্ত-চিত্ত জ্ঞানিগণ সেখানে বসেছিলেন,  
এবং জালের কাছেই ছিলেন যশোর্ষী পুরোহিতগণ।  
ঠিক তাঁকে সম্বোধন করে এমন কতকগুলি প্রশ্ন করলেন,  
যাদের তাৎপর্য যবনিকান্তরালে গোপন ছিলো।  
জনৈক পুরোহিত জালকে জিজ্ঞাসা করলেন,—  
সেই পুরোহিত ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণবৃদ্ধি।  
তিনি বললেন, আমি বারোটি সূন্দর সূর্যন্ত বৃক্ষ দেখতে পাইছি,  
প্রত্যেকটি সুবৃজ সমারোহে শিরোত্তোলন করছে আকাশের দিকে।  
সেই বৃক্ষের প্রত্যেকটি থেকে উদ্গত হয়েছে ত্রিশটি শাখা,  
তার মধ্যে একটি বেশী কিংবা কম নয়।  
দ্বিতীয় পুরোহিত প্রশ্নেছিলেন বললেন, হে সম্মুত শির,  
আমি দেখছি, দুটি তেজোদণ্ড আরবী ঘোড়া ;  
তাদের মধ্যে একটি আলকাত্তার মোতের মতো কালো,  
অন্যটি, স্ফটিকের মতো সাদা ও স্বচ্ছ।  
দুটিই স্বস্থান থেকে বিচলিত ও দ্রুত ধাবমান,  
একটি অন্যটিকে কিছুতেই ধরতে পারছে না।  
ত্তীয়জন বললেন, ত্রিজন অশ্বারোহী  
যারা সন্মাটের সমীপ থেকে দ্রুত অপস্থিতান,  
সোজাসুজি গণনা করলে দেখবে, একজন কম হয়েছে,  
পুনরায় হিসাব করলে দেখা যাবে ত্রিশ ঠিকই আছে।  
চতুর্থজন বললেন, সেই উপবন —  
যার দিকে চাইলে দেখা যায় সবুজে ও স্মোতফিনীতে পূর্ণ,  
একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি সে উপবনের দিকে  
দ্রুত আগমন করে,  
উপবনের সতেজ ও শুক্ষ উভয়ই তাঁর চোখে সমান  
যতই মিনতি করো — প্রশ্ন করো — সে কোন জবাবই দিবে না।  
অপর জন প্রশ্ন করলেন, সূর্যন্ত দুইটি দেবদার  
নদী ও উমি স্পর্শ করে বাঁশির মতো দণ্ডয়মান ;  
সেখানে রয়েছে এক পাখির নীড়,

সন্ধ্যাকালে পাখিটি আসে নীড়ের বাইরে ;  
এই দেবদারু থেকে যখন একটি শুক্ষ পত্র ঝরে পড়ে,  
তখন সেই পত্রবরা কস্তুরী-সুবাস ছাড়িয়ে দেয় চারদিকে ;  
দেবদারু দুইটির একটি শ্যামল সবুজ,  
অন্যটি শুক্ষ ও পরিম্মান ।

অপর জন প্রশ্ন করলেন, কোন পাহাড়ে  
একটি নগরী দেখতে পেলাম,  
মানুষ সেই নগরী থেকে বেরিয়ে  
কন্টকপূর্ণ এক আন্তরের দিকে মুখ করেছে ।

সে—নগরীর অট্টালিকাসমূহ শিরোন্তোলন করেছে চন্দ্রালোকে,  
সেখানে সুউন্নত সিংহাসনের সামনে অপেক্ষমান রয়েছে দাসীগণ ।

তারা এই নগর ছেড়ে কোথাও বের হয় না,  
কেউ তাদের অতীতের কথা ও চিন্তা করে না ।

হঠাতে সেখানে উঠিত হলো এক ভূমিকম্প,  
এবং সে—ভূমি পবিত্র করে দিলো তার অন্তর ;  
ওরা তখন সেই নগরী থেকে সংগ্রহ করলো

তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী

এবং ভীত সন্তুষ্টগণকে ফিরিয়ে আনলো ।

এখন সত্যকে বের করে আনুন যবনিকান্তরাল থেকে,  
এবং প্রত্যেকটি কাহিনীর তৎপর্য প্রকট করুন  
মহত্ত্বমগ্নের সামনে ।

যদি এইসব রহস্য উদ্ঘাটিত করতে আপনি সমর্থ হন,  
তবে কালো মৃত্তিকা হয়ে উঠবে আপনার হাতে সুগন্ধী কস্তুরী ।

## জাল কর্তৃক পুরোহিতদের কথার উত্তর প্রদান

মহামতি দীর্ঘকণ পর্যন্ত চিন্তাবিত থেকে  
শিরোত্তোলন করলেন, ফ্লু হলো তাঁর আনন।  
তারপর প্রত্যুষে স্বীয় রসনা উন্মুক্ত করে  
পুরোহিতগণ যা কিছু বলেছিলেন সব স্মরণ করলেন।  
প্রথমে বললেন, বারোটি সম্মুখ বৃক্ষের কথা,  
যাদের প্রত্যেকটি থেকে উদ্গত হয়েছে ত্রিশটি শাখা।  
প্রত্যেক বছরের মধ্যে রয়েছে বারোটি নতুন মাস,  
যেমন নতুন বাদশাহ তাঁর সিংহসন থেকে জারি  
করেন নব বিধান।

প্রত্যেক মাসের মধ্যে রয়েছে ত্রিশটি দিন,  
কাল এইভাবেই নিজেকে নিয়ত পরিবর্তিত করে।  
এখন শুনুন অশ্বের কাহিনী,  
যারা বিদ্যুতের মতো দ্রুত পরিদশ্যমান।  
এরা হলো কালের দুই রূপ — দিন ও রাত্রি,  
একটি অপরাটির পেছনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।  
দিন রাত্রির এই চলন থেকেই  
আকাশের আবর্তনকে গণনা করা হয়।  
কিন্তু একে অন্যকে কিছুতেই ধরতে পারছে না,  
যেমন কুকুরের সামনে অপস্যমান থাকে দ্রুতগতি মৃগ।  
তৃতীয়ত, আপনি বলেছেন সেই ত্রিশজন অশ্বারোহীর কথা,  
যারা সপ্তাটকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায়।  
ত্রিশজন অশ্বারোহীর মধ্যে কখনও একজন কম হয়,  
কিন্তু পুনরায় গণনায় তারা ত্রিশের সংখ্যা পূর্ণ করে।  
নতুন মাসের হিসাবে এমনই হয়ে থাকে,  
জগৎপিতা এমনভাবেই তা সৃষ্টি করেছেন।  
আপনি তাই একদিন কম হলেও তাকে মাসের  
গণনায় স্ফূর্তিকর বলেন না,  
কারণ মাসের মধ্যে কখনও একদিন কমই হয়।  
এখন আমি কোষোম্বুজ্ব করছি সেই কাহিনী  
যা দুটি দেবদারু ও তদুপরি রচিত নীড়ের সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে।  
বৃষ রাশি থেকে তুলা রাশি পর্যন্ত

জগতাভ্যন্তরে বিরাজ করছে যে লুকায়িত অঙ্ককার,—  
তার বেটেন থেকে মুক্তি লাভ করে  
পৃথিবী প্রকাশ্য অঙ্ককারের মধ্যে প্রবেশ করে।  
দুটি দেবদারু প্রকৃতপক্ষে আবর্তমান আকাশের দুই বাহু,  
একটি থেকে আনন্দ ও অপরটি থেকে দুঃখ।  
সেই বৃক্ষে উড়স্ত পক্ষী হলো সূর্য  
দুনিয়ায় তার থেকেই আশা ও হতাশা।  
অপর প্রশ়ি হলো, পর্বতোপরি এক নগর  
সেটি হলো অবসর যাপনের শহুল ও হিসাবের জায়গা।  
সেই কন্টকাকীর্ণ প্রাস্তর হলো পৃথিবী — দুদিনের সরাইখানা  
যেখানে রয়েছে সুখ ও দুঃখ।  
সেখানে পরীক্ষার জন্য বিস্তৃত হয়ে আছে জীবন,—  
কেউ যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট, কেউ অধিক কামনা করছে।  
সেখানে ভূমিকম্পের সঙ্গে উঠিত হচ্ছে প্রবল বাতাস,  
এবং পৃথিবী থেকে জেগে উঠছে কোলাহল।  
আমাদের সকল দুঃখ ছেয়ে আছে সেই কন্টকবন,  
আমরা তা পার হয়ে নগরীতে পৌছতে সচেষ্ট।  
অপর কোন লোক যখন আমাদের দুঃখের মুখোমুখী হয়,  
তখন সে তাতে প্রভাবান্বিত না হয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে।  
এমনই করে প্রথম থেকে চলছে কথার প্রবাহ,  
এমনই তা থাকবে — কখনও পুরানো হবে না।  
যদি ধনসম্পদ যশের অনুবর্তী হয়,  
তবে প্রাণ পাবে মর্যাদার আসন।  
যেহেতু লোভ জটিলতাকে অনুসরণ করে  
সেহেতু প্রাণশূন্য নিষ্প্রভা নির্গত হয় তার থেকে।  
যদি আমাদের প্রাসাদের চূড়া স্পর্শ করে গ্রহলোক  
তবে আমাদের জীবনের জন্য তাও এক তাঁবু বিশেষ।  
যদি পৃথিবীর মাটি ও পাথর আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে,  
তবুও এখানকার প্রতিতি স্থান আমাদের জন্য ভয় ও দুঃখের ক্ষেত্র।  
বনভূমি ও তাতে কাস্তে হাতে সেই পুরুষ  
জল-শুল যার ভয়ে প্রকম্পিত —  
সে জল-শুল মথিত করে চলছে,  
২. ত অন্যই করো না কেন, কিছুই সে কানে নেয় না।

সেই পুরুষ হলো কাল ও আমরা ঘাসকাপী গুল্ম,  
অথবা সে পিতামহ ও আমরা প্রপৌত্র।  
তরুণ ও বৰ্ষীয়ান কাল কিছুই গণনা করে না  
সে যেন প্রধাবিত শিকারী, সামনে সব মৃগয়া।  
জগতের সম্পদ ও রীতিই হলো এমন,  
মৃত্যু না নিয়ে কেউ মাত্রগৰ্ভ থেকে জাত হয় না।  
এর এক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, বেরিয়ে যেতে হয়  
অন্য দ্বার দিয়ে,  
কাল দ্বারা নিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে তার শিরা।

## মনুচেহেরের সামনে জালের কৃতিত্ব প্রদর্শন

জাল যখন এইভাবে প্রকটিত করলেন প্রশ়ঙ্গলির তাৎপর্য,  
তখন মনুচেহের তাঁর প্রতি অত্যন্ত সম্মত হলেন।

আনন্দে ফুল হলো মণ্ডলীর আনন  
তাঁরা সহর্ষে উচ্চারণ করলেন সম্মাটের প্রশংসা।  
সম্মাট এবার এক আসর সম্ভিত করলেন,  
আবর্তমান আকাশের তলে যেন তা চৌদ্দ রাতের  
চাঁদের মতো শোভা পেলো

সবাই সুরাপানে নিরত হলেন, জগৎ তাঁদের চাঁথে হয়ে এলো অঙ্ককার,  
এবং সুরাপায়ীদের মষ্টিক্ষ সুরার উন্মাদনায় মাতাল হলো।

মর্যাদার আকাঙ্ক্ষী মানুষ কোলাহল করে  
নির্গত হলো সম্মাটের দরবার থেকে।  
বীরবন্দ আনন্দ ও উন্মাদনা নিয়ে নির্গত হলেন,  
এবং একে অপরের হাতে হাত রাখলেন।

অতঃপর যখন অগ্নিগোলক সূর্য উদয়াচল থেকে মুখ তুললো,  
তখন সামন্তগণের প্রভু বাদশার ভঙ্গ হলো নিদ্রা।  
এমন সময় বীরপ্রবর জাল কঠিদেশ বন্ধন করে  
পুরুষ-সিংহের মতো আগমন করলেন সম্মাটের দরবারে।  
সম্মাটের দরবার থেকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের পর  
তিনি সৌভাগ্যবান সেনাপতি সামের অভিমুখী হওয়ার ইচ্ছা করলেন।

মহামান্য সম্মাটকে সম্মোধন করে বললেন, হে মহামতি,  
সামের চেহারা আমার নয়নপথে উদিত হয়েছে।  
আমি এখন সমুজ্জ্বল সিংহাসনের পদ চতুর্ষয় চুম্বন করছি,  
আপনার মুকুটের ঐশ্বর্যে আলোকিত হয়ে উঠেছে আমার অঙ্গ।  
এইবার সম্মাট সাম্পূত্র জালকে সম্মোধন করে বললেন, হে তরুণ,  
আরও একটি দিন তুমি আমাদের সঙ্গে থেকে যাও।  
তুমি মেহরাব কন্যার পাণি প্রার্থনা করছো,  
হৃদয়ে তোমার নূরীমান-পুত্র সামের দর্শনাকাঙ্ক্ষা কোথায় ?  
অতঃপর সম্মাটের আদেশে বেজে উঠলো কাংস্য ঘন্টা ও হিন্দুস্তানী দামামা,  
এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে নিনাদিত হলো বিষাণ  
বর্ণ, প্রহরণ ও তীর-ধনুকসহ আনন্দিতচিত্তে  
বীরবন্দ প্রান্তরে এসে জমায়েত হলেন।

তাঁরা ধনুকে জ্যাযুক্ত করে টেনে নিলেন তীর,  
 এবং শুক্রের দিনের মতোই লক্ষ্যভেদে উন্মুখ হয়ে উঠলেন।  
 বীরবৃন্দের প্রত্যেকেই স্বীয় অশুবক্ষণা বাগিয়ে ধরলেন  
 এবং প্রহরণ, তরবারি, তীর ও বর্ণসহ অগ্রসর হলেন।  
 আসাদ অলিঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখছেন সম্রাট —  
 বীরগণ কিভাবে তাঁদের রণনেপুণ্য প্রকটিত করছেন।  
 এমন সময় তাঁর দৃষ্টিসীমায় এলেন সামপুত্র জাল,  
 এমন সুন্দর সমুদ্রাতি ইতিপূর্বে কারও নজরে পড়েনি।  
 সম্রাটের প্রাসাদ সম্মুখস্থ প্রাঞ্চে ছিলো একটি প্রাচীন বৃক্ষ  
 বশ বৎসর ও মাস অতিক্রান্ত হয়েছে তাঁর উপর দিয়ে।  
 জালকে দেখা গোলো, তিনি ধনুকে জ্যাযুক্ত করছেন  
 এবং রণহস্তার উপরিত করে উন্তেজিত করছেন অশুকে ;  
 তাঁরপর তিনি বৃক্ষটিকে লক্ষ্য করে সোজা তীর নিক্ষেপ করলেন,  
 তীর বৃক্ষ ছেদ করে বেরিয়ে গোলো।  
 এই দৃশ্য দেখে বর্ণাধারীগণ উত্তোলন করলেন তাঁদের ঢাল,  
 এবং স্বীয় বর্ণা ধরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।  
 এমন সময় জাল স্বীয় তুর্কী দাসবালকের হাত থেকে  
     ঢাল চেয়ে নিলেন,  
 এবং অশু উন্তেজিত করে উত্তোলন করলেন শির।  
 ধনুক পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে তিনি বর্ণা করলেন মুষ্টিবৰ্দ্ধ,  
 এবং তদ্বারা নতুনতর ভাবে মৃগয়ারীতি অবলম্বন করলেন।  
 তিনজন ঢালচর্মধারী বীর তাঁর বর্ণার লক্ষ্য হলো,  
 তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অপমানিত অবস্থায় নীচে পড়ে গোলো।  
 এইবার বীরপ্রবর সামন্তদের সম্বোধন করে সম্রাট বললেন,  
 মহত্তমদের মধ্যে কোন বীর এর সম্মুখীন হতে চান, এগিয়ে আসুন।  
 সম্রাটের আহ্বান অনুসারে বেরিয়ে এলেন এক বীর,  
 বর্ণা ও তীরের বর্ষণে তাঁর চারদিকে উপরিত হলো ধূলি।  
 অন্যান্য বীরও উন্মুক্ত করলেন তাঁদের অস্ত্র,  
 ক্রোধে তাঁরা উন্মুক্ত করলেন তাঁদের রসনাও,  
 অশু—বক্ষণা বাগিয়ে ধরে তাঁরা রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন,  
 তাঁদের বর্ণা থেকে ঠিক্রে বেরতে লাগলো ঔজ্জ্বল্য !  
 এমন সময় দেখা গোলো, জাল ধূলা উড়িয়ে  
     উন্তেজিত করেছেন তাঁর অশু,

মনে হলো তিনি যাঁপিয়ে পড়তে চাইছেন প্রতিপক্ষের দলে ।  
তিনি একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে নিলেন,  
প্রতিপক্ষের মধ্যে কে সব চাইতে অধিক শক্তির ও যশস্বী ।  
জাল বিদ্যুৎগতিতে আপত্তি হলেন তাঁর উপরে  
আক্রমণের বেগ সহ্য করতে না পেরে সে-বীর পলায়নপর হলেন ।  
এমন সময় দেখা গোলো, জাল ধূলিরাশির মধ্যে থেকে নির্গত হয়ে —  
প্রতিপক্ষের কটিবন্ধ ধরে সবলে আকর্ষণ করছেন !  
অশ্বাসনের উপর থেকে এমন অপমানিতভাবে  
তাঁকে মাটিতে পতিত করলেন যে,  
তা দেখে সম্ভাট ও সৈন্যদল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গোলেন ।  
বীরবন্দ তখন উচ্চেস্থে বলতে লাগলেন, এমন পূরুষ  
কেউ কখনও ঢোকে দেখিনি ।  
মনুচেহের বললেন, এই অসমসাহসী তরুণ  
চিরকাল সৌভাগ্যসহ অবস্থান করুক ।  
যে কেউ এর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে  
সেই তার মাত্-দন্ত পোশাককে করবে রক্তরঞ্জিত ।  
সিংহ-সদৃশ বীরগণও এমন সন্তান জন্ম দেননি,  
নক্রসম বীরবন্দও এর সমকক্ষ বলে গণ্য নন ।  
প্রশংসিত সেই সাম যাঁর উত্তরপূরুষ এমন বীর,  
দুনিয়ায় এই বীর অশ্বারোহী সর্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকুন ।  
মহত্তম সম্ভাট এরপর সরাসরি জালের প্রশংসা উচ্চারণ করলেন,  
সেই সঙ্গে সভাসদ ও সামন্তগণ ও কীর্তন করলেন তাঁর প্রশংসা ।  
এইবার মহত্তমগণ মুকুট ও কটিবন্ধনে সংজ্ঞিত হয়ে  
দলে দলে সম্ভাটের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন ।  
দুনিয়াপতি সম্ভাট সামপুত্রের জন্য প্রস্তুত করলেন এক খেলাত,  
যা দেখে সভাসদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন ।  
তাতে রয়েছে মূল্যবান মুকুট ও সোনার সিংহাসন,  
রয়েছে অশ্ব, কষ্ঠহার ও স্বর্ণ-কটিবন্ধ ।  
সেই খেলাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মহামূল্য পোশাক,  
দাস-দাসী ও সর্ববিধ সামগ্রী ;  
এইসব সম্পদ সম্ভাট দান করলেন জালকে —  
জাল সসম্ভবে সম্ভাটের উদ্দেশে চুম্বন করলেন মৃত্যিকা ।

## ମନୁଚେହେରେ ପକ୍ଷ ଥେକେ ସାମେର ଚିଠିର ଜ୍ବାବ

ଅତଃପର ସାମେର ଚିଠିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଲେଖା ହଲୋ  
ଏବଂ ତାତେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରା ହଲୋ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ।  
ବଲା ହଲୋ, ହେ ଶକ୍ତିତ ନିର୍ଭୀକ ସେନାପତି,  
ସର୍ବତ୍ର ଆପନି ସିଂହେର ମତୋ ବିଜୟୀ ।

ଆବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଆପନାର ଅନୁରୂପ ବୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେନି,  
ଆସର-ଶୋଭନତା ଓ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାରେ  
ଆପନାର ସଙ୍କଳପ ଓ ସୌମ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଅସାଧାରଣ ।

ଆପନାର ଭାଗ୍ୟବାନ ପୁତ୍ର ଜାଲେ ଆପନାରଇ ମତୋ,  
ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ସିଂହା ତାଁର ସାମନେ ହୟ ସନ୍ତ୍ରଷ୍ଟ ।

ତିନି ସାହସୀ, ନିପୁଣ, ବୀର ଓ ଦକ୍ଷ ଅଶ୍ଵାରୋହୀ,  
ଦୁନ୍ତିଯାଯ ତିନି ବୀରଦେର ସ୍ମୃତି ହୟେ ଅବସ୍ଥାନ କରବେନ ।

ଆପନାର ଚିଠି ନିଯେ ସେ ଏସେଛେ, ତାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆମି ଜାନତେ ପେରେଛି,  
ଜାନତେ ପେରେଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୁଖେର ଲକ୍ଷ୍ୟ  
ତାର ସକଳ ଅଭିପ୍ରାୟ ତାକେ ଫିରିଯେ ଦିଲାମ,  
ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେ ତାକେ ଦେଖତେ ପେଲାମ ଭାଗ୍ୟବାନ ।

ଯେ ସିଂହେର ମୃଗ୍ୟା ହଲୋ ବାଘ  
ତାର ଥେକେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ଅସମ ସାହସିକତା ବ୍ୟତୀତ ଆର  
କି ଆଶା କରା ଯେତେ ପାରେ ?

ତାର ହଦୟକେ ଆମି ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରେଛି,  
ତାର ମନ ଥେକେ ଦୂର କରେ ଦିଯେଛି ଦୁଃଖିତାର ଭାର ।

ଚିଠି ନିଯେ ଜାଲ ସୌଭାଗ୍ୟସହ ସମ୍ବାଟ ସମୀପ ଥେକେ ନିର୍ଗତ ହଲେନ,  
ବୀରବ୍ଲେଦେର ମାଥାର ଉପର ଦିଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୋଚର ହଚ୍ଛେ ତାର ଶିର ।

ତିନି ଏବାର ସାମେର ଅଭିମୂଳେ ଏକ ଦୂରକେ ରାତ୍ୟାନା କରେ ଦିଯେ ବଲଲେନ —  
ସମ୍ବାଟେର ନିକଟ ଥେକେ ଆମି ଲାଭ କରେଛି ହଦୟାନନ୍ଦ ।

ସେଖାନେ ଥେକେ ପ୍ରାଣ୍ୟ ଖୋଲାତ ଓ ମୁକୁଟ  
କର୍ଣ୍ଣ-କୁଣ୍ଡଳ, କର୍ତ୍ତହାର ଓ ସମୁଜ୍ଜ୍ଵଳ ସିଂହାସନ ନିଯେ  
ସତ୍ତର ଆପନାର ସମୀପେ ଉପାସିତ ହବୋ,  
ସମ୍ବାଟ-ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଯଶ ଆମାର ସଙ୍ଗୀ ହବେ ।

ଏଇ ସଂବାଦ ଓ ସମ୍ବାଟେର ଚିଠି ପେଯେ ସାମ ଏତ ଖୁଶି ହଲେନ ଯେ,  
ତାତେ ତାଁର ଶୁଭକେଶ ଯେନ ପେଲୋ ନବ୍ୟୋବନେର ବର୍ଣ୍ଣ-ସମାରୋହ ।

তিনি এক অশুরোহীকে অবিলম্বে প্রেরণ করলেন কাবুল  
এবং সন্ত্রাট থেকে প্রাপ্ত সংবাদ জানালেন মেহরাবকে।

জানালেন সন্ত্রাটের প্রশংসা ও আনন্দের কথা,  
জানালেন সেখানকার সকল সভাসদ ও সামন্তজনের খুশীর কথা।  
দৃত এসব সংবাদ নিয়ে যথাসময়ে কাবুল পৌছলো,  
কাবুল-রাজ তার থেকে জানতে পেলেন সকল কথা

কাবুল-রাজ তখন জাবুলস্তানের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা ভেবে  
এত আনন্দিত হলেন যে,

সর্বত্র তিনি গীতবাদ্যের আয়োজন করার শুরু দিলেন,  
মনে হলো, তাঁর গোটা সন্তা এই সংবাদে হয়েছে অনুরঞ্জিত।

বিকশিতচিত্ত মেহরাবের হাদয়ানন্দ তখন,

তাঁর ওষ্ঠাধরে স্মিতহাস্য হয়ে দেখা দিলো

তিনি এইবার মহিলাশ্রেষ্ঠ সীদুখ্তকে কাছে ডাকলেন,

ও পল্লবিত করে তাঁকে শোনালেন সে-কাহিনী।

বললেন, আপনার সিদ্ধান্ত ছিলো সৌভাগ্যের সূচক,

তাই সে সিদ্ধান্ত অঙ্ককারকে আলোকিত করেছে।

যে বৃক্ষ আপনি মাটিতে রোপণ করেছিলেন,

তা লাভ করেছে সন্ত্রাটের আশীর্বাদ।

সূচনায় আপনার কৃতকর্ম

শুভ পরিণাম হয়ে দেখা দিয়েছে।

সুতরাং কাবুলের সকল সম্পদ আপনার সামনে পেশ করছি,

যদি তাজ, তখ্ত বা অন্য কোন বস্তু আপনার

অভিপ্রেত হয়, বলুন।

শুভ সন্দেশ শুবণ করে সেই গুণ্ডিত রহস্য নিয়ে

সীদুখ্ত ছুটে এলেন কন্যার সমীপে।

তিনি কন্যাকে জালের আগমনের শুভ সংবাদ প্রদান করে বললেন,  
তুমি এখন তাঁকে স্বামীরাপে লাভ করবে।

নারী-পুরুষকে আজ দর্শন করে সমন্বয় থেকে।

দেখো, প্রতিকূলতা থেকে প্রার্থিত বস্তু বেরিয়ে আসছে

হে ভাগ্যবত্তী, দ্রুত সেই কাঞ্চিক্ষত বস্তুর সমীপবত্তী হও,

তুমি যা প্রার্থনা করেছ তাই পেয়েছ।

এই কথা শুনে ঝুদাবা বললেন, হে রাজমহিয়ী,

প্রত্যেক যোগ্য ঘণ্টুলীর প্রশংসা !

আমি আপনার পদধূলিকে আমার উপাধান করছি,  
আপনার নির্দেশই হবে আমার জন্য ধর্মের বিধান ।  
আপনার উপর থেকে বিদুরিত হোক দুর্ভাগ্যের কুণ্ঠি,  
আপনার তনুমন হোক আনন্দের নিকেতন ।

সীদুখ্ত কন্যার কথা শুনে  
অস্তঃপুরপ্রাসাদ সজ্জিত করার দিকে মনোনিবেশ করলেন ।  
আনন্দিত স্বর্গের মতো করে সজ্জিত করলেন প্রাসাদ  
সুমধুর সুরা, অস্বর ও কস্ত্রীতে মোহিত হলো প্রতিটি কক্ষ ।  
স্বর্ণ-বিগচিত চিত্র সম্বলিত যবনিকা ঝুলানো হলো  
প্রতিটি দ্বার বাতায়নে  
ও সর্বত্র ছিটিয়ে দেওয়া হলো মুক্তা ও জমরুদ পাথর ।  
অস্তঃপুর প্রাসাদে রক্ষিত হলো এক স্বর্ণ-সিংহাসন,  
চৈনিক রীতি অনুযায়ী তা সজ্জিত ও বিচিত্রিত হলো ।  
সে আমলের সকল চিত্রই ছিলো মুক্তাবিখচিত,  
মুক্তা দ্বারাই বিরচিত হয়েছিলো তার প্রতিটি চিত্র ।  
সেই সিংহাসনের পদচতুষ্টয় সূর্যকান্ত মণিতে নির্মিত,  
সেটি ছিলো মহামূল্য, ছিলো কেয়ানী তখ্তের অনুরূপ ।  
রুদাবাকেও সাজানো হলো অতীব মনোরম করে,  
তাঁর সারা অঙ্গে যেন সৃষ্টি করা হলো ইন্দ্ৰজাল ।  
রুদাবা উপবিষ্ট হলেন মণিমুক্তা বিনিমিত সেই স্বর্ণ-সিংহাসনে,  
ধরায় তাঁর সৌন্দর্য ধেন অতুলন ।  
গোটা কাবুল রাজ্যও উৎসব-সাজে সজ্জিত হলো,  
সর্ববিধ সুন্দর উপকরণ ও বর্ধ-সমারোহে হলো তা অপরাপ ।  
হস্তীসকলকে রোমক দেশীয় কিংখাব সজ্জায়  
সজ্জিত করা হলো ;  
এবং তাদের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হলো গায়ক ও বাদ্যকরণ,  
কতিপয় হস্তীতে আরোহণ করলেন সম্মানিত সব সভাসদ ।  
এইভাবে প্রত্যুদ্গমনের প্রস্তুতি নেওয়া হলো,  
দাসীগণ সুন্দর সাজ পরে সারি বেঁধে দাঁড়ালো ।  
সর্বত্র ছিটানো হলো আবীর ও কস্ত্রী,  
পথে পথে বিছিয়ে দেওয়া হলো সুচিত্রিত কৌশিক বস্ত্র ।  
স্বর্ণসূত্র ও কস্ত্রী-সুবাসে পথঘাট অপরাপ হয়ে উঠলো,  
সুরে ও গোলাপজলে ভিজে উঠলো মণিকা ।

## সাম সমীপে জালের উপস্থিতি

জাল এবার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলেন,  
তাঁর গতি উজ্জীয়মান পাখি বা জলের উপর স্বচ্ছদগতি নোকার  
অনুরূপ।

তাঁর আগমন সংবাদ পাওয়ার পর  
যথারীতি প্রত্যুদ্গমনের প্রস্তুতি নেওয়া হলো।  
সামের পুরীতে কোলাহল উথিত হলো — সবাই বলতে লাগলো,  
ভাগ্যবান জাল আগমন করছেন।  
আনন্দিতচিত্তে সাম স্বয়ং অগ্রসর হলেন পুত্রের প্রত্যুদ্গমনে,  
কাছে পেয়ে তিনি জালকে দীর্ঘ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখলেন।  
পিতৃ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে জাল চুম্বন করলেন মণিকা,  
এবং যা কিছু দেখে ও শুনে এসেছেন সব শুন্ধাভরে  
পিতৃ সমীপে নিবেদন করলেন।

সাম এবার পুত্রসহ আনন্দিত মনে  
মহামূল্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন।  
সাম তখন সীদুখতের কথা তুললেন,  
জাল এইবার শোপন করলেন তাঁর শ্মিত হাসি।  
সাম বললেন কাবুল থেকে প্রস্তাব এসেছিলো,  
প্রস্তাবদাত্রী স্বয়ং কাবুল—মহিষী সীদুখত।  
আমার কাছে তিনি কথা চাইলে আমি কথা দিলাম,  
বললাম, কথার খেলাপ আমি কখনও করি না।  
সোজাসুজি বলুন, আমার কাছে আপনার প্রাথনীয় কি ?  
আপনার প্রার্থনা পরিপূরিত হবে।  
প্রথম প্রস্তাব ছিলো, জাবুল রাজপুত  
কাবুল রাজাস্তংপুরের পৃষ্ঠান্তের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হোক !  
দ্বিতীয়, আমরা যদি মেহমান রাপে তাঁদের দেশে যাই,  
তবে, তাঁদের মনোদুঃখের হবে অবসান।  
সেই কাবুল—রাজমহিষীর দৃত এখানে উপস্থিত,  
সে রূপগঞ্জময় সে প্রস্তাব নিয়ে এখনও অপেক্ষা করছে।  
এখন সেই দৃতের কাছে কি বলবো,  
স্বাধীনচিত্ত মেহরাবের কাছে পাঠাবো কি বাণী ?  
সামের এই কথা শুনে জাল এত আনন্দিত হলেন যে,

শরমে তাঁর আপাদমস্তক লাল হয়ে উঠলো ।  
জাল জ্বাবে বললেন, হে সেনাপতি,  
আপনার সব কথা শুনলাম ;  
এখন কি সৈন্যসহ কাবুলের উপর বাঁপিয়ে পড়বো,  
আপনার কথা শুনে তা থেকে বিরত হবো, ভাবছি ।  
সাম এইবার জালের দকে চেয়ে মৃদুহাস্য করলেন  
তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর কর্তব্য কি ?  
এখন মেহুরাব-কন্যার প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোন কথা নয়,  
রাত্রির অঙ্ককারে এ ব্যক্তি জালের আর কোন স্পন্দন নেই ।  
সামের আদেশে নিনাদিত হলো দুন্দুভি  
এবৎ অস্তঃপুরের ফটক উন্মুক্ত করা হলো ।  
এক দৃত অশু চালনা করে  
বীরপ্রবর মেহুরাব সমীপে এসে উপস্থিত হলো ।  
মেহুরাবের সমীপে পৌছেই দৃত  
সরাসরি সব কথা তাঁকে খুলে বললো ।  
মেহুরাব সংবাদ শুনে আনন্দিত হলেন,  
তাঁর মুখমণ্ডল রক্তগোলাপের মতো ফুল হলো ।  
সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো কাঁস্য ঘটা  
ও সৈন্যদল সজ্জিত হলো বিচ্ছি পোশাকে ।  
মদমস্ত হস্তী ও বাদ্যকরণ কর্তৃক নির্গত হলো শোভাযাত্রা,  
গোটা নগরী একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত  
পরিগ্রহ করলো আনন্দসজ্জা ।  
রং বেরঙের কৌশিক যবনিকা প্রলম্বিত হলো প্রাসাদে,  
লাল, সবুজ, হলুদ ও বেগুনীর বাহার খুলে গোলো ।  
বিষাণের উচ্চ নিনাদ, সপ্ততার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের উচ্চ স্বর,  
ঢাকের বিকট ধ্বনি ও কাঁস্যঘটার আওয়াজ  
সব মিলে যেন প্রলয় কোলাহল উথিত হলো,  
মনে হলো চারিদিকে বেজে উঠেছে প্রলয় বিধান !  
সামের যাত্রীদলেও সেই একই কাণ ;  
সামকে দেখতে পেয়ে কাবুল-রাজ অশু থেকে অবতরণ করলেন ।  
এবৎ বিশু-বিশৃঙ্খল সেনাপতিকে আবদ্ধ করলেন কঠিন আলিঙ্গনে,  
তারপর তাঁর কুশল জিঞ্জাসা করলেন ।  
কাবুল-রাজ এবার উচ্চারণ করলেন প্রশংসা —

প্রশংসা সামের জন্য এবং জালের জন্য।

জালকে বসানো হলো এক দ্রুতগতি ঘোড়ার পিঠে  
যেন পর্বতশীর্ষে শোভা পেলো পূর্ণচন্দ্ৰ।

মুক্তা বিখচিত এক স্বর্ণমুকুট জালের  
মাথায় তুলে দেওয়া হলো।

এইভাবে তাঁরা আনন্দিত পরিবেশে প্রবেশ করলেন ধূমবুল নগরীতে,  
বহু পুরানো কথা প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হলো।

গোটা শহর দুর্মুক্তি-ধ্বনিতে

ও বেণু-বীণা ও বিশালে এমনভাবে গুঞ্জিত হলো যে,  
মনে হলো, প্রত্যেকটি গৃহের অলিন্দ গীত বাদ্যে মশগুল  
হয়ে উঠেছে,

এবৎ কাল হয়েছে সুমধুর আরাবে পরিপূর্ণ।

নগরীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আনন্দিত

লোকজন ও সঙ্গিত অশু পুরিদ্যমান হচ্ছে,

এবৎ সর্বএ ভূরভূর করছে জাফ্রান ও কস্তরীর সুবাস।'

এমন সময় দাসীগণকে নিয়ে অস্তঃপুর থেকে নিগত হলেন সীদুখ্ত,  
তাঁকে ঘিরে রচিত রয়েছে তিনশত দাসীর এক বৃত্ত।

এদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে পানপাত্র

তাতে ভরা রয়েছে মুক্তা ও কস্তরী।

সবাই মিলে উচ্চারণ করলেন সামের প্রশংসা,

এবৎ পানপাত্র মুক্তা ও কস্তরী ছিটিয়ে দিলো তার পথে।

এমন সময় মন্দুহাস্য করে সাম সীদুখ্তকে সম্বোধন করে বললেন,  
কতদিন আর রূদ্বাবাকে অস্তঃপুরে লুকিয়ে রাখবেন।

উত্তরে সীদুখ্তের বললেন, যদি সূর্য দেখার ইচ্ছাই আপনার হয়ে থাকে,  
তবে পণ কোথায় ?

সীদুখ্তের কথার পিঠে সাম বললেন,

যা আপনাদের অভিপ্রায় আমার থেকে আকাঙ্ক্ষা করুন।

সম্পদ, সিংহসন, মুকুট ও নগর-বন্দর

আমার যা কিছু আছে সব তাতে রয়েছে আপনার অংশ !

এইবার তাঁর মুখ করলেন স্বর্ণ-খচিত এক মহলের দিকে  
যেখানে রয়েছেন রূপধারিনী মধুমাস।

সাম চন্দ্রমুখীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন,

আনন্দ উত্সাসিত হয়ে উঠলো তার আনন !

তিনি জালকে সম্বোধন করে বললেন,  
বিশ্ব-প্রভু তোমার সহায়ক হয়েছেন।  
জানি না, কিভাবে উচ্চারিত হবে তার প্রশংসা,  
দৃষ্টি তার মুখে লাভ করেছে নববিকাশ।  
সামের অনুরোধে ইইবার এগিয়ে এলেন মেহ্রাব  
এবং যথাযথ আইন অনুসারে উচ্চারণ করলেন বিবাহের  
শপথ-বাণী।

তারপর দুজনকে বসানো হলো একই সিংহাসনে,  
ও তাঁদের উপর মূল্যবান আকীক জমরুদ পাথরের  
পুল্পবৃষ্টি করা হলো।

চন্দ্রাননা কন্যার মাথায় শোভা পোলো স্বর্ণখচিত মুকুট,  
সামপুত্রের মাথায় রাখা হলো মুক্তাখচিত তাজ।  
তারপর উপটোকনের তালিকা আনা হলো সকলের সামনে,  
সেই সঙ্গে ছিলো পিত্ত্বদত্ত যৌতুক।  
যখন উপটোকন ও যৌতুকের তালিকা পাঠ করা হলো,  
তখন ঘনে হলো এমন সম্পদের কথা কাহিনীতেও  
কেউ শ্রবণ করেনি।

সাম সব দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন  
তিনি সে-সবের উপর পাঠ করলেন বিশ্ব-প্রভুর নাম।  
বর-কন্যার মহল থেকে সাম তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরে এলেন  
এবং এক সপ্তাহ ধরে সুরার আনন্দে রাইলেন মত হয়ে  
গোটা নগরী থেকেই উথিত হলো সুরাপানের আওয়াজ,  
সেনাপতির মহলে বিরাজ করতে লাগলো  
উপভোগের আনন্দোচ্ছাস।

জাল ও বিস্বাধরা রাজকন্যা কেউই  
সেই প্রথম সপ্তাহের দিবারাত্রে নিদ্রামণ্ড হলেন না।  
অতঃপর তাঁরা গমন করলেন দ্বিতলের কক্ষে  
এবং সেখানে পরিপূর্ণ আনন্দে কাটিয়ে দিলেন তিনটি সপ্তাহ।  
রাজ্যের মহত্তমগণ হাতে হাত রেখে সায়িবন্ধ হয়ে  
সেই সম্মুখ্যত দ্বিতল কক্ষের বহির্দুর্গে অপেক্ষা করে রাইলেন।  
মাসের শুরুতে সেনাপতি সাম  
স্বীয় রাজ্য সীষ্টানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।  
তাঁর চলে যাওয়ার পর জালও

সপ্তাহখানেক ধরে গ্রহণ করলেন তাঁর যাত্রার প্রস্তুতি।

শিবিকা, অশৃ ও হস্তীপৃষ্ঠের সঙ্গা হ্যওদার প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত হলো,  
একটি সুর্দশন শিবিকা নির্দিষ্ট হলো চন্দ্রাননা রাজকন্যার জন্য।

সীদুখ্ত, মেহরাব এবং তদীয় আত্মীয়-স্বজন

অগ্রেই নীমরোজেরও পথ ধরেছিলেন।

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অতিক্রান্ত হতে লাগলো তাঁদের পথ  
মনের সুখে তাঁদের মুখ থেকে নির্গত হলো আশীর্বাদ।

এইভাবে সোল্লাসে তাঁরা এসে পৌছলেন নীমরোজ,  
সবাই তাঁদের আগমনে উৎফুল্ল হলো।

সাম তখনই এক আসর সংজ্ঞিত করলেন,  
তিনদিন ধরে চললো সে আসরে আনন্দিত সুরাপান।

অতঃপর সীদুখ্ত স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনসহ  
কাবুলের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এই সময় সাম স্থীয় রাজ্য তুলে দিলেন জালের হাতে  
এবং তাঁর সৌভাগ্যের অনুকূলে বিনির্গত করলেন সৈন্যদল।

পশ্চিমের কিরণিজদের অভিমুখে অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন সাম,  
তাঁর সৌভাগ্যসূচক পতাকা যথারীতি উজ্জীব হলো।

তিনি জালকে সম্বোধন করে বললেন, আমার এই রাজ্যকে  
আমি আমার নয়ন ও ছদ্মপিণ্ডের মতো রক্ষা করেছি।

বিজয়ী সন্তান মনুচেহের এই দেশ ও রাজ্য  
আমাকে দান করে বলেছিলেন, ভোগ করো রক্ষা করো।

আমি দুষ্ট লোকের ক্ষতি সাধন থেকে ভয় করছি  
বিশেষ করে মাজিন্দিরানের দৈত্যদেরকে আমার ভয়।

হে জাল, এই রাজ্য ও সিংহাসন আমি তোমাকে দিলাম,  
এই রাজ্য তোমার, সেই সঙ্গে সৌভাগ্যশালী রাজমুকুট।

এই বলে বীরপ্রবর সাম তাঁর যাত্রা শুরু করলেন, সিংহাসনে  
বসলেন জাল,

সে-খুশীতে যথারীতি আসর সংজ্ঞিত হলো ও চললো সুরাপান।  
রুদাবা এসে জালের সঙ্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন,  
তাঁর শিরে শোভা পেতে লাগলো এক স্বর্ণ-মুকুট।

---

সামের রাজ্য ও রাজধানীকে জ্বালন্তান, শীতান ও নীমরোজ এই নামেই অভিহিত  
হয়েছে।

## ରୁଷମେର ଜନ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍ଗ

ଦୀଘଦିନ ଅତିବାହିତ ହତେ ନା ହତେଇ  
ସମ୍ମୂଳତ ଦେବଦାରୁ ଫଳଭାରେ ଅବନତ ହଲୋ ।  
ହଦୟଗ୍ରାହୀ ବସନ୍ତକାଳ ବିଦ୍ୟାୟ ନିଲୋ,  
ତନୁମନ ସମପିତ ହଲୋ ବିଶାଦ ଓ ବେଦନାର ହାତେ ।  
ଦେହଭ୍ୟନ୍ତରେ ବାହିତ ବୋକାର ଚାପେ  
ରୁଦାବାର ଚୋଖେ ପ୍ରବାହିତ ହଲୋ ଅଞ୍ଚ ।  
ଉଦର ତାର ଶକ୍ତ ହଲୋ ଓ ଶୁଲ, ଦେହ ଶୁରଭାର,  
ରଙ୍ଗାଭ ଆନନ୍ଦ ତାର ଜାଫ୍ରାନେର ମତୋ ହରିଦ୍ରାଭ ହୟେ ଏଲୋ ।  
ମା ମେଘେକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲଲେନ, ମାଗୋ,  
ତୋର କି ହୟେଛେ ଯେ, ଏମନ ପୀତାଭ ହୟେ ଗେଛେ ତୋର ସାରା ଦେହ ?  
ଜବାବେ କନ୍ୟା ବଲଲେନ, ଦିନରାତ୍ରି ଆମାର  
ଫରିଯାଦେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେଛେ ତାଦେର ଓଷ୍ଠାଧର ।  
ଆମାର ସୂମ ହୟ ନା ; ପରିମ୍ଲାନ ହଚ୍ଛେ ଆମାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ  
ମାଗୋ, ମନେ ହୟ, ଆମି ଯେନ ଜୀବନମୃତ ହୟେ ଆଛି ।  
ଆମାର ବୋଧହୟ ସମୟ ହୟେ ଏସେଛେ,  
ଆର ଆମି ଏହି ବୋକା ବିହିତେ ପାରଛି ନା ।  
ଏହିଭାବେ ନବଜାତକେର ଜନ୍ମ-ସଂଭାବନା ନିକଟତର ହଲୋ,  
ଦୂରୀଭୂତ ହଲୋ ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ଵାମ ।  
ଏକଦିନ ସହସା ରୁଦାବା ସଂଜ୍ଞା-ହାରା ହଲେନ,  
ସାରା ଅନ୍ତଃପୂର ଥେକେ ଉଠିଲୋ ବିଲାପେର ରୋଲ ।  
କ୍ରମନରତା ସୀଦୁଖୃତ କନ୍ୟାର ଅବଶ୍ଵା ଦେଖେ  
ଶ୍ଵୀଯ କଷ୍ଟ କେଶକଳାପ ଟେନେ ଛିଡ଼ିତେ ଲାଗଲେନ ।  
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଲେର କାଛେ ଥବର ଗେଲୋ ଯେ,  
ସମ୍ମୂଳତ ଦେବଦାରୁ ବେଦନାୟ ପରିମ୍ଲାନ ହୟେଛେନ ।  
ଅବିଲମ୍ବେ ଜାଲ ରୁଦାବାର ଶିଯରେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଲେନ,  
ବିଚର୍ଚ-ହଦୟ ବୀରେର ଚୋଖ ଥେକେ ଝରେ ପଡ଼ିଛେ ଅଞ୍ଚ ।  
ରୁଦାବାର କକ୍ଷେ ଦାସୀଗଣ ନିଜେଦେର ଚୁଲ ଛିଡ଼େ  
ବିହିୟେ ଦିଲୋ ଚୋଖେର ଜଲେର ଧାରା ।  
ଏହି ସମୟ ଜାଲ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରତେ ଲାଗଲେନ,  
ମାନସିକ କ୍ରିୟା ତାର ଦୁଃଖେ ଲାୟ କରେ ଆନଲୋ,  
ସହସା ଜାଲେର ମନେ ପଡ଼ିଲୋ ସୀମୋରଗେର କଥା,

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সহায়ে সীদুখ্তকে সেই সুসংবাদ দিলেন।  
 একটি পাত্র আনিয়ে অবিলম্বে তিনি তাতে আগুন জুলালেন,  
 এবং তাতে ধরলেন সীমোরগের একটি পাখা।  
 দেখা গেলো, সাড়াজ্ঞাপক পাখি নেমে আসছে নীচের দিকে।  
 মেঘখণ্ড যেমন বর্ষণ করে মূল্যবান বারি,  
 এবং তার ফলে দেহে মনে নেমে আসে স্বষ্টি;  
 তেমনি করে পূর্ণ মঙ্গল—সন্তানায় দীর্ঘপ্রশংস্তি  
 উচ্চারণ করলেন জাল,  
 এবং সঙ্গে পরম শৃঙ্খার সঙ্গে পাখির সামনে তিনি আনত হলেন।  
 সীমোরগ জিজ্ঞাসা করলো, বলো তোমার দৃঢ় কি ?  
 তোমার চোখ অশ্রুপূর্ণ কেন ?  
 রজতবরণী দেবদারুর গর্ভে এমন এক শিশুর জন্ম হবে,  
 যে হবে সিংহের মতো বীর্যবান ও যশস্বী।  
 তার পদধূলি চুম্বন করবে ব্যাঘ,  
 মেঘখণ্ডও তার শিরোপারে ছায়া বিস্তারে ভয় পারে।  
 তার চিংকারে দীর্ঘ হবে হিংস্র নেকড়ের গাত্রচর্ম,  
 সে তার ভয়ে দংশন করবে স্থীয় থাবা।  
 যে কোন বীর তার ধনুকের টক্কার শুনে ভীত হবে,  
 এবং তার বাহু ও গ্রীবাদেশের সম্মুতি দেখে কম্পিত হবে,  
 প্রাণ ভয়ে।

প্রত্ন্য ও সঞ্চলেপ সে হবে সামের অনুরূপ,  
 কুকু হলে সে সিংহের মতো দুরস্ত হবে।  
 সম্মুতিতে সে হবে দেবদারু ও শক্তিতে হাতী,  
 অদ্বুলির টোকায় সে প্রস্তর খণ্ডকে দুমাইল দূরে নিষ্কিপ্ত করবে।  
 সেই শিশু মঙ্গলময় বিশু-প্রভূর ইচ্ছায়  
 স্বাভাবিক পথে এই ধরায় জাত হবে না ;  
 সুতরাং তীক্ষ্ণধার এক ছুরিকা আনয়ন করো,  
 আর সেই সঙ্গে আনো উষ্ট্রাসিত-চিন্ত এক শল্যবিদ।  
 প্রথমে সে চন্দ্রাননকে সুরা প্রয়োগে বেহংশ করবে,  
 এবং তদ্বারা তার মন থেকে দূর করে দিবে ভয় ও দৃক্ষিণ্ঠা।  
 তুমি দেখবে, সেই উষ্ট্রাসিত-চিন্ত শল্যবিদ  
 কি করে উদর-গর্ভ থেকে বের করে আনে সিংহকে।

দেবদারু-সদৃশ কন্যার গর্ভ থেকে সে উত্তোলন করবে শিশুকে  
কিন্তু তার জন্য কন্যার ব্যথার কোন অনুভূতি হবে না।  
উদর থেকে সে যেমন শিশুকে বের করে আনবে  
তেমনই করে চন্দ্রাননার রক্তও সে করে নিবে নিষ্কায়ণ।  
তারপর সে উদরের যে-স্থান দীর্ঘ করেছে তা সেলাই করবে,  
সুতরাং মন থেকে দুশ্চিন্তা ও ডয় বিদূরিত করো।  
তোমাকে বনজ ঘাসের কথা বলে যাচ্ছি  
সেটিকে বেটে দুধ ও কস্তুরীর সঙ্গে মিশিয়ে শুকিয়ে নিবে।  
তারপর তা জখমে মালিশ করবে,  
তাতেই ব্যথা ও ক্ষত অনেকটা ঠিক হয়ে আসবে।  
এরপর আমার একটি পাখা বুলিয়ে দিবে ক্ষতস্থানে,  
ফলে সে আমার সৌভাগ্যসূচক ছায়ার নীচে অবস্থান করবে।  
আমার এই উপদেশ তোমার জন্য কল্যাণকর হোক,  
বিশ্ব-প্রভু এ-ব্যবস্থা তাঁর করুণার দ্বারা অভিসিঞ্চ করুন।  
কারণ, এই রাজকীয় তরু তিনিই দান করেছেন,  
যাতে প্রত্যহ তাতে সৌভাগ্যপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।  
কাজেই মন থেকে দূর করে দাও সকল মালিন্য,  
এ-তরুর শাখায় বিশ্ব-প্রভুই দান করবেন ফল।  
এই বলে সীমোরগ স্থীয় বাহু থেকে একটি পাখা খসিয়ে দিলো,  
তারপর দেখতে দেখতে উড়োয়ামান হলো উর্ধ্বাকাশে।  
পাখি চলে গেলে জাল হাতে নিলেন তার পাখা  
এবং সে যে উপদেশ দিয়ে গেছে সেই বিস্ময়কর  
কর্মের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।  
এ দৃশ্যের দিকে যেন সবিস্ময়ে চেয়ে রইলো সারা দুনিয়া  
সবার চক্ষু থেকেই ঝরতে লাগলো অশ্রু।  
সীদুখতের চোখ থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হলো,  
তিনি ভাবতে লাগলেন, শিশু কিভাবে বিযুক্ত হবে  
তার মায়ের উদর থেকে।  
যথাশীঘ্ৰ এসে উপস্থিত হলেন দক্ষ এক শল্য-চিকিৎসক,  
তিনি এসে চন্দ্রাননাকে সুরা দ্বারা সংজ্ঞাহারা করলেন।  
শল্য-চিকিৎসক বিনাকংক্ষে চন্দ্রাননার উদর কাটলেন  
ও অবলীলায় বের করে আনলেন গর্ভস্থ শিশুকে।\*

আধুনিক সিজারিয়ান অপারেশনের অনুরূপ।

এমন অনায়াসে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়ে চিকিৎসক  
শিশুকে মা থেকে বিযুক্ত করলেন যে,  
হেন বিস্ময়কর ঘটনার কথা দুনিয়ায় কেউ কোন দিন শুনেনি।  
নবজাত শিশু যেন সিংহসদৃশ এক বীর —  
যেমন সে দীর্ঘতনু তেজন প্রশংসন—বক্ষ।  
বিস্ময় ও বিস্ফারিত নেত্রে সবাই চেয়ে রইলো,  
এমন বিশালবপু নবজাতক কেউ কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি।  
একদিন একরাত্রি জননী সুরার নেশায় সুপু হয়ে রইলেন,  
তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এলো তাঁর সংজ্ঞা।  
ইতিমধ্যে ক্ষতশ্বান সেলাই করা হয়েছিল,  
এবং তা বিষহর ঔষধে করে রাখা হয়েছিল সিঙ্গ।  
যখন দেবদারুতনু রাজকন্যার সংজ্ঞা ফিরে এলো,  
তখন প্রথমেই তিনি কথা বললেন মাতা সীদুখ্তের সঙ্গে।  
সঙ্গে সঙ্গে শির ছুইয়ে স্বর্ণকূচি ও মুক্তার বর্ষণ করা হলো,  
এবং উচ্চারণ করা হলো সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা।  
জননী এইবার অগ্রসর হলেন স্বীয় শিশুপুত্রের দিকে,  
এবং সঙ্গে তাকে তুলে নিলেন কোলে।  
একদিনের শিশুকে এক বছরের বলে প্রতীয়মান হচ্ছে,  
মনে হচ্ছে যেন একরাশ লালা ও কুসুম ফুল  
এনে করা হয়েছে জড়ো।

শিশুকে দেখে দেবদারুতনুর ওষ্ঠাধরে দেখা দিলো স্মিত হাস্য,  
তিনি তার মধ্যে রাজকীয় ঐশ্বর্যের চিহ্ন দেখতে পেলেন।  
রাজকন্যা বললেন, আমি দৃঢ় থেকে শিরোঘোলন করলাম,\*  
এবং পুত্রের নাম রাখলেন রুক্ষম।  
এবার কৌশিক বস্ত্রের উপর সূত্র দ্বারা সীবিত হলো এক শিশু,  
সমুন্নতিতে সে—শিশু যেন দুগ্ধপানে নিরত এক সিংহশাবক।  
প্রতিক্রিয়াতে ভরে দেওয়া হলো সমুরের কঢ়—কলাপ,  
এবং মুখমণ্ডলে সূর্য ও মঙ্গল গ্রহের শোভন রূপ করা হলো অঙ্গিত।  
বাহ্যিকে এমনভাবে সূচীকর্মে তুলে ধরা হলো যেন  
দুটি জীবন্ত অজগর,  
এবং শিশুর মুষ্টিবক্ষ হাত যেন সিংহের থাবা।  
সে হাতের একটিতে ধরা রয়েছে বর্ণা ও প্রহরণ

---

ক্রন্তব অর্থ শিরোঘোলন করলাম।

অন্যটি সঙ্গের অশু-বশ্বা ধারণ করে আছে।  
প্রতিকৃতিতে দেখান হয়েছে শিশু এক সাদা ঘোড়ায় সওয়ার,  
তার পাশে কতিপয় পরিচারক অপেক্ষা করছে।  
কুশলী শিল্পীর হাতে প্রতিকৃতি তৈরি হলে পর  
সে সম্মানে বিদায় নিলো।

এইবার সংবাদবাহিগণ দ্রুতগতি অশু আরোহণ করলো,  
তাদের উপর করা হলো স্বর্ণ-মুদ্রার পুঁজুটি।  
অঙ্গপর প্রহরণধারী রুক্ষমের সেই প্রতিকৃতি নিয়ে  
তারা এসে উপস্থিত হলো মহামতি সামের কাছে।

সাম সুসংবাদ শুনে ফুলবনে এক আসরের আয়োজন করলেন,  
এবং কাবুলস্তান থেকে জাবুলস্তান পর্যন্ত —  
গোটা প্রান্তের জুড়ে চললো সুরাপাত্র ও বেণু বীণা বেজে উঠলো,  
দেশের কোণে কোণে জমে উঠলো শত শত আসর।

কাবুলে মেহরাবের অন্তরে আনন্দ আর ধরে না,  
সুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দরিদ্রের মধ্যে  
বিতরণ করলেন সুর্ণমুদ্রা।

জাবুলস্তানের প্রতিটি প্রাণে বসে গেলো গায়ক-বাদকের দল।  
বড় ছেটি থেকে পৃথক হয়ে রইলো না  
সকলে মিলে টানাপোড়েনের মতো একস্থানে বসে গেলেন।

দুষ্পানরত রুক্ষমের সেই প্রতিকৃতি  
বীরপ্রবর সামের নিকট নিয়ে আসার পর  
দৃত তা তাঁর সামনে মেলে ধরলো,  
তিনি দেখে যুগপৎ আনন্দিত ও উৎফুল্ল হলেন।

তারপর উন্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,  
এই কৌশিক ব্যত্র যদি আসল শিশুর অর্ধেকও হয়,  
তবে তার শির মেঘমালা স্পর্শ করবে ও তার বস্ত্রাঙ্কল  
হবে গোটা ধরিত্ব।

অঙ্গপর সাম আগস্তক দৃতকে কাছে ডাকলেন,  
এবং তাকে মন্তক পর্যন্ত করলেন স্বর্ণমুদ্রায় প্রোথিত।  
এইবার সেনাপতির প্রাসাদ থেকে উপর্যুক্ত হলো আনন্দ  
পরিজ্ঞাপক দুন্দুভি,  
এবং উন্মুক্ত প্রান্তের স্বতন্ত্র-শোভিত উপবনের মতো হেসে উঠলো।

গোটা সাক্ষার ও মাঞ্জিন্দিরান  
সেনাপতির আদেশে পূর্ণরূপে সংজ্ঞিত হলো।  
সর্বত্র সুরা পরিবেশিত হলো এবং ডাকা হলো গায়কদের,  
পরিবেশনকারী ও আহ্বানকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হলো  
রজত মুদ্রা।

এইভাবে যখন আনন্দোৎসবে কেটে গোলো একটি সপ্তাহ,  
তখন এক লিপিকরকে সেনাপতির সামনে বসানো হলো।  
প্রত্যুষের জালের কাছে লেখা হলো এমন এক লিপি,  
তাতে যেন সাজানো হয়েছে এক আনন্দিত উপবন।  
প্রথমে উচ্চারিত হলো, সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা,  
কারণ, কালের আবর্তন তাঁর থেকেই লাভ করে আনন্দ।  
এর পর তাতে জালের শুণকীর্তন করা হলো —  
যিনি তরবারি ও প্রহরণের দক্ষ চালক।

তারপর কৌশিক বস্ত্রের সেই প্রতিকৃতির কথা বলা হলো,  
যাতে ফুটেছে বীরাগ্রগণ্ডের শৌর্য ও সম্রাটদের ঐশ্বর্য।  
লিপিতে বলা হলো, এ—প্রতিকৃতি এত সুন্দর শোভন যে,  
এর দর্শনে মন থেকে সকল গ্রানি দূর হয়ে যায়।  
আমি মনে—প্রাণে নবজাতকের মঙ্গলের জন্য  
সৃষ্টিকর্তার সমীপে দিবারাত্রি প্রার্থনা করছি।  
তোমার পুত্রকে কখন জীবিতাবস্থায় দেখবো,  
তারই প্রহর শুণছি।

এখন থেকে আমার ও তোমার সহায়ক জন্য নিয়েছে।  
দৃত এই লিপি নিয়ে বায়ু গতিতে

আনন্দিত ও সমুজ্জ্বল—চিত্ত জালের কাছে এসে পৌছলো,  
সে একটি—একটি করে বর্ণনা করলো সামের আনন্দের কথা,  
বললো, তিনি কি করে স্বয়ং সমুন্নত করেছেন শিশুর যশ।

দৃতের কথা শুনে জালের অন্তরাত্মা  
গর্ব—গৌরবে নন্দিত হলো।

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হলো নতুন আনন্দ,  
গৌরবে তাঁর শির সমুন্নত হলো নীল আকাশে।

কুস্তমের জন্য শুন্যদায়ী ধাত্রী রাখা হলো দশজন,  
যাতে যথেষ্ট দুগ্ধপানে সে ত্পু হতে পারে।

যখন তার খাওয়ার বয়স হলো  
যখন তাকে দেওয়া হলো উপযুক্ত পরিমাণে মাস ও কুটি।  
তার খাদ্যের জন্য প্রত্যহ পাঁচটি পশু মারা হতো,  
এবং উপযুক্ত সংখ্যক পুরুষ নিয়ত রাইলো তার প্রতিপালনে।  
যখন সে বাল্য বয়সে উপনীতি হলো  
তখন তার সমুন্নতি হলো সরল দেবদারুর মতো।  
নক্ষত্রের মতো দীপ্তিমান হলো তার মুখমণ্ডল,  
ধরিত্বা যেন তারাভরা আকাশের মতো তার দিকে  
করলো দৃষ্টিপাত।  
মনে হলো সে যেন বীরপ্রবর সামের মতো হয়ে উঠেছে,  
পেয়েছে তাঁরই সমুন্নতি, প্রজ্ঞা, সৌন্দর্য ও সঙ্কল্প।

## ରୁଷ୍ମକେ ଦେଖାର ଜନ୍ୟ ସାମେର ଆଗମନ

ମହାବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ସାମେର କାଛେ ଯଥନ ସଂବାଦ ପୌଛିଲୋ ଯେ,  
ତୀର ପୌତ୍ର ଏଥିନ ସିଂହେର ମତୋ ବଲବାନ ହୟେ ଉଠେଛେ;  
ଏହି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟକ୍ତ ବାଲକେର ଅନୁରାପ ଆର କୋଥାଓ  
ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୟ ନା,  
କେଉ ଏମନ ବୀରତ୍ର ଓ ସିଂହ-ପୌରୁଷ କୋଥାଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେନି —  
ତଥନ ପୌତ୍ରକେ ଦେଖିବାର ଜନ୍ୟ ବିଚିଲିତ ହଲୋ ସାମେର ଅନ୍ତର,  
ତିନି ସଙ୍କଳପ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ ଯେ, ଏବାର ଅବଶ୍ୟାଇ  
ରୁଷ୍ମକେ ଦେଖିତେ ଯାବେନ।  
ଗୋଟା ସୈନ୍ୟବାହିନୀକେ ସେନାପତିଦେର ହାତେ ସମର୍ପଣ କରେନେ  
କତିପଯ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ନିଯେ ରାଗ୍ୟାନା ହୟେ ଗେଲେନ ।  
ଜାଲ-ପୁତ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କେ ଟାନଛେ,  
ତାଇ ତିନି ସୈନ୍ୟରେ ଧାବିତ ହଲେନ ଜାବୁଲାଷାନେର ଦିକେ ।  
ଜାଲ ଏହି ସଂବାଦ ପାଓଯା ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଗମନେର  
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଲେନ,  
ସୈନ୍ୟଦଲେର ପଦତାଡ଼ିତ ଧୂଲାୟ ଆଚନ୍ତୁ ହଲୋ ଧରିବାଟା ।  
ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଗମେର ଜନ୍ୟ ତିନି ନିଜେ ଓ କାବୁଲ-ରାଜ ମେହରାବ  
ଉଭୟେ ଗ୍ରହଣ କରଲେନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।  
ଘଟାଯ ଆଘାତ କରାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଥିତ ହଲୋ କୋଲାହଳ,  
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଓ ନିବାସ ଥେକେ ନିର୍ଗତ ହଲୋ ମାନୁଷେର ମୋତ ।  
ଫଳେ ଏକ ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶ ଥେକେ ଅନ୍ୟ ପାହାଡ଼େର  
ପାଦଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
ସୁବିନ୍ଦ୍ରିୟ ହଲୋ ସୈନ୍ୟଦଲ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଲୋ ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ଢାଲଚର୍ମ ।  
ଆବରୀଯ ଘୋଡ଼ା, ଅଶ୍ଵ ଓ ଅଶ୍ଵତର ଏବଂ ହଣ୍ଟିର ହେଷା-ବ୍ୟହଣେ  
ପାଁଚ ମାଇଲ ଦୂରବତୀ ସ୍ଥାନ ଓ ଆରାବେ ଗୁଡ଼ିତ ହତେ ଲାଗଲୋ ।  
ଏକଟି ମଦମତ ହଣ୍ଟିକେ ସାଜାନୋ ହଲୋ,  
ତାତେ ରାଖା ହଲୋ ଏକ ସୁଶୋଭନ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ-ସିଂହାସନ !  
ସେଇ ସିଂହାସନେ ଏସେ ବସଲେନ ଜାଲ-ପୁତ୍ର ରୁଷ୍ମ,  
ତୀର ସମ୍ମନ୍ତି ଦେବଦାର-ସଦୃଶ, ଦେହ ଓ ସକଳ-ଗ୍ରୀବା  
ଆକର୍ଷଣ କରଛେ ସବାର ଦୃଷ୍ଟି ।

---

ସାମ ଦୀବଦିନ ଯାବେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଯୋଜିତ ହିଲେନ ; ତାଇ ରୁଷ୍ମକେ ଦେଖିତେ ଯାଓଯାଇ ସମୟ  
ପାରେନ ନି ।

তাঁর শিরে পরানো হয়েছে মুকুট ও কোমরে কটিবদ্ধ,  
তাঁর সম্মুখে রয়েছে ঢালচর্ম ও হাতে তীর-ধনুক।  
যখন মহাবীর সাম দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেলেন  
তখন স্বীয় সৈন্যদলকে দুভাগে বিভক্ত করে সারিবদ্ধ করলেন।  
এদিকে জাল ও মেহরাব উভয়ে অবতরণ করলেন অশু থেকে,  
প্রবীণ মহস্তমগণও তাঁদের অনুসরণ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রগত হলেন মাটিতে মাথা রেখে,  
এবং উচ্চারণ করলেন মহাবীর সামের প্রশংসা।  
এদিকে সাম যখন হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট সিংহ-শিশুকে  
দেখতে পেলেন

তখন তাঁর ওষ্ঠাধরে স্মিতহাস্য রেখা ফুটলো ও আনন্দে  
নেচে উঠলো তাঁর হাদয়।

যখন হস্তীসহ বালককে তাঁর নিকটবর্তী করা হলো,  
তখন পৌত্রের মুখ-সৌন্দর্য দেখে তিনি বিস্মিত হলেন।  
উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, হে নরপতি জালের পুত্র,  
তোমার প্রশংসা এই যে, তোমার অনুরূপ

আর কেউ জাত হয়নি।

এইবার রুক্ষম সামের সিংহাসন চূম্বন করে  
উচ্চারণ করলেন পিতামহের প্রশংসা।  
বললেন, হে বিশ্বজয়ী বীর, আনন্দিত হোন,  
আমি আপনার থেকে উদগত শাখা, আপনি মূল।  
আমি সেনাপতি সামের এক দাস বৈ নয়,  
তিনিই আমার পানাহার ও হৃদয়ানন্দ।

আমি আপনার থেকেই অশু, তনুগ্রাম শিরস্ত্রাণ প্রার্থনা করি,  
আপনার কাছে আমি চাই তীর-ধনুক।

শক্রদের শির আমি আপনার পদতলে উৎসর্গ করছি,—

বিশু-প্রভূর করুণায় উচ্চারণ করছি এই শপথ।

লোকে বলে, দেখতে আমি আপনার মতো,

আমার শক্তি সাহসও বস্তুত আপনার মতো হোক।

এই বলে রুক্ষম নেমে এলেন মদমস্ত হস্তী-পৃষ্ঠ থেকে  
সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে ধরলেন পৌত্রের হাত।

তারপর তাঁর শির ও চক্ষু চুম্বন করলেন,  
সমস্ত হাতী-ও বাদ্যযন্ত্র নত-নীরব হয়ে প্রত্যক্ষ করলো সেই দৃশ্য।

এইবার তাঁরা মুখ করলেন পারিবারিক সমাধি-সৌধের দিকে,  
সারাপথ সানন্দিত বাক্যালাপে কেটে গেলো ।  
অতঃপর গোটা প্রাসাদ সাজান হলো ও প্রত্যেক কক্ষে  
রাখা হলো স্বর্ণ-সিংহাসন,  
চললো আনন্দ, ভোজ ও সুরাপান ।  
এইভাবে অতিবাহিত হয়ে গেলো একটি মাস,  
এর মধ্যে দুঃখ কাকে বলে কেউ দেখলো না ।  
প্রত্যেকে রাজপ্রাসাদে বাদ্য-বাজনার মধ্যে  
পানাহারে নিরত রইলো,  
কথোপকথনে ও দৈত সঙ্গীতে কেটে গেলো তাদের সময় ।  
প্রাসাদ কক্ষের এক কোণে সিংহাসনোপরি বসেছিলেন জাল,  
অপর এক কোণে প্রহরণ হাতে রুক্ষম ।  
মধ্যস্থলে বসেছেন বিশ্ব-উম্মোচনকারী বীর সাম,  
তাঁর মুকুটে স্ফূরিত হচ্ছে হৃষা-পাখির পালক ।  
তিনি রুক্ষমের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন,  
এবৎ উচ্চারণ করলেন বিশ্ব-প্রভুর নাম,  
এমন বালু, গ্রীবা ও সমুদ্রাতি  
এমন ক্ষীণকাটি ও প্রশস্ত বক্ষ অদ্বৈতপূর্ব ।  
তার দুই উরু ফেন অশ্বের স্তুল উরুর ঘতো  
মনে হয় তার হৃদয় সিংহের ও সাহস শাদুর্লের ।  
এমন সুন্দর মুখমণ্ডল এবৎ এমন শৌর্য ও ঐশ্বর্য —  
দুনিয়ায় অবশ্যই তার সমকক্ষ কেউ নেই ।  
এইবার তিনি জালকে সম্বোধন করে বললেন,  
তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখো, শত পুরুষ পরম্পরায়ও এমন  
ছিল বলে কেউ বলবে না !  
মনে করো, শিশুকে কিভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল  
মাত্-উদ্দর থেকে,  
এ-কৌশল অবশ্যই কল্যাণের সূচক ছিল ।  
সীমোরগকে সহস্র ধন্যবাদ !  
কারণ বিশ্ব-প্রভু তাকেই নিয়োজিত করেছিলেন  
পথ-প্রদর্শকরাপে ।  
আজ সত্যই আমি আনন্দিত,  
মনের সকল গ্লানি আমি বিদূরিত করছি সুরাপানে ।

এই দুনিয়া সরাইখানা — আসা যাওয়া নিয়েই এর কারবার,  
এখানে একজন যদি নতুন হয়, অপরে হয় পুরানো।  
এই বলে সেনাপতি হাত বাড়ালেন পানপাত্রের দিকে,  
ও সুরাপানে মন্ত হলেন।

মেহরাবও এসে সুরা পান করলেন,  
তিনি নিজেকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।  
তারপর বললেন, আমি জালের কথা ভাবি না,  
ভাবি না সাম কিংবা তাজ ও তখ্তের মালিক স্বয়ং বাদশার কথা।  
আমি ভাবছি, যদি রুস্তম, আমি, কংকায় অশু ও তরবারি  
একত্র হয়

তবে উড়ন্ত মেঘখণ্ডও আমাদের উপর ছায়া ফেলতে ভয় পাবে।  
আমি আবার জোহাকের দিনের সমারোহের প্রবর্তন করবো,  
পদতলের মাটিকে রূপান্তরিত করবো খাঁটি কস্তুরীতে।  
আমি অবিলম্বে রুস্তমের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের  
কাজ শুরু করবো।

মেহরাবের কথা শুনে জাল ও সাম উভয়ের  
অধরোঞ্চে হাসির রেখা দেখা দিলো।  
নতুন চাঁদে সৌরমাসের প্রথম দিনে এলো,  
সাম সিংহাসন ছেড়ে স্বীয় গন্তব্যের পথে যাত্রা করলেন।

জালও পিতার সঙ্গে সঙ্গে  
এক মঞ্চিল পথ এগিয়ে গোলেন।

হস্তীপৃষ্ঠে ম্লানমুখে রুস্তমও  
পিতামহকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপনার্থ সঙ্গী হলেন।  
বিদায়-লগ্নে সামের চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠলো,  
হায়, তাঁর জীবন—সূর্য সন্ধ্যার রক্তিমাভা অঙ্গে ধারণ করে আছে।

তিনি জালকে লক্ষ্য করে বললেন, হে পুত্র,  
সর্বদা বিশ্ব-প্রভুর সান্নিধ্যে অবস্থান করো।

বাদশাদের ফরমানকে জ্ঞান করো নিজের ভূষণ বলে  
প্রজ্ঞাকে কাঞ্চিত বস্তুর উর্ধ্বে স্থান দিয়ো সর্বত্র।

সারা বছর মন্দ থেকে বেঁধে রাখবে স্বীয় হাত,  
প্রতিদিন অন্বেষণ করবে বিশ্ব-প্রভুর পথ।

জেনে রেখো, দুনিয়া চিরকাল কারো সঙ্গে থাকে না,  
অস্তিত্ব ও অনাস্তিত্বের পালাত্রম নিয়তই চলছে।

আমার এই উপদেশগুলি স্মরণ রেখো  
ধরণীপৃষ্ঠে সরল পথ ব্যতিরেকে অনুষ্ঠণ করো না।  
আমি বুঝতে পারছি,  
কাল আমার জন্য হৃষ্টতর হয়ে এসেছে।  
স্বীয় দুই উত্তরাধিকারীকে এইভাবে কতিপয় উপদেশ দিয়ে  
সাম জ্ঞাপন করলেন বিদ্যায়-সন্তাষণ।  
জাবুলস্তানের রাজপুরী থেকে উত্থিত হলো দুন্দুভির আওয়াজ,  
করীদল যাত্রারঙ্গসূচক বৃহৎ উচ্চারণ করলো।  
এইভাবে সকলকে সুভাষণে সিঙ্ক করে ও স্বীয় হৃদয়কে  
বিদ্যায় দৃঢ়ৰ্থে মলিন করে  
সেনাপতি সাম পশ্চিমের দিকে মুখ করলেন।  
তাঁর সন্তানদুয় অশুস্ক্রিত চোখে ও তাঁর উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করে  
তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন।  
তিন মঞ্জিল পথ যেমে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন,  
এদিকে সেনাপতি সাম অতিক্রম করে চললেন বহুদূরের পথ।  
জাল স্বীয় পুত্র রুশ্মসহ  
সৈন্যসামন্ত সমভিব্যহারে সীস্তানে ফিরে এলেন।  
এবৎ আনন্দিতচিত্তে কিছুদিন ধরে  
পানাহারে নিমগ্ন হয়ে রইলেন।

## ରୁକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତକ ଶ୍ଵେତହଞ୍ଚୀ ନିଧନ

ଜାଳ ଏକଦିନ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କ ବାଗିଚାଯ  
ସୁରା ପାନେ ନିରାତ ଆଛେ ।  
ଆଲାପ ଆଲୋଚନାଯ ଓ ହାସି-କୋଲାହଲେ  
ସବାର ମନ ଲୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ।  
ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତମଣି ସଦଶ ରଙ୍ଗିନ ସୁରା  
ଆଲୋକିତ କରେ ଆଛେ ସ୍ଫଟିକ ପାତ୍ରଗୁଲୋ ।  
ଜାଳ ପୁତ୍ର ରୁକ୍ଷମକେ ସମ୍ବାଧନ କରେ ବଲଲେନ,  
ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସମାରୋହ ଯଶସ୍ଵୀ ପୁତ୍ର ।  
ଉପାହିତ ଜନମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟେ ବୀରଗଣକେ ତୁମି  
ବସନ-ଭୂଷଣ ରାପ ସମ୍ମାନ ଦାନ କରୋ ।  
ରୁକ୍ଷମ ପିତାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ  
ଉପାହିତ ସାମନ୍ତଗଣକେ  
ବହୁ ଧନରତ୍ନ, ଅଶ୍ଵ ଓ ଗଜାଦି ଦିଯେ  
ଭୂଷିତ କରଲେନ ।  
ଏରପର ଆସର ଭାଙ୍ଗଳୋ,  
ସବାଇ ଧନରତ୍ନ ପେଯେ ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ହୟେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରଲୋ ।  
ପ୍ରଚଲିତ ରୀତି ଅନୁୟାୟୀ ସେନାପତି ଜାଳ  
ଶ୍ରୀଯ ଶଯନ କଙ୍କେ ଫିରେ ଏଲେନ ।  
ରୁକ୍ଷମଙ୍କ ତା'ର ତାରଣ୍ୟେର ଉଦ୍ଦୀପନା ନିଯେ  
ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ହଲେନ ନିଜ ଶଯନ କଙ୍କେର ଦିକେ ।  
ଘୁମେର ମଧ୍ୟେ ତିନି ଶୁନନ୍ତେ ପେଲେନ,  
ଦ୍ୱାରେର ବାଇରେ କିସେର ଯେନ ଏକ କୋଲାହଲ ।  
ସବାଇ ଯେନ ବଲାବଳି କରଛେ, ସେନାପତିର ଶ୍ଵେତହଞ୍ଚୀ ବାଁଧନ ଟୁଟେ  
ବୈରିଯେ ପଡ଼େଛେ,  
ଏବଂ ମାନୁଷ ଭୀତ ହୟେ ଚାରଦିକେ ଛୁଟୋଛୁଟି କରାଛେ ।  
ଏହି କଥା କାନେ ଆସାମାତ୍ର ତାରଣ୍ୟ ଓ ବୀରତ୍ବେର ଉତ୍ୟେଜନାଯ  
ରୁକ୍ଷମେର ମନ୍ତ୍ରିକ ଥିକେ ଘୁମେର ନେଶା ଛୁଟେ ଗେଲ ।  
ତିନି ଦୌଡ଼େ ଏସେ ପିତାମହେର ପ୍ରହରଣ ତୁଲେ ନିଯେ  
ପଥେ ବୈରିଯେ ଏଲେନ ।  
ଦେଖା ଗେଲୋ ଯେ, ଉପାହିତ ଜନତା ନିଜେଦେର ରକ୍ଷଣେର ଜନ୍ୟ  
ପ୍ରାସାଦ-ଦ୍ୱାର ରୁକ୍ଷ କରେ ଦିଯେଛେ ।

রুস্তম বললেন, অন্ধকার রাত্রিতে মণ্ড হাতী যখন জিঞ্জির ভেঙে  
নগরে বেরিয়ে গেছে,  
তখন বুঝি তোমরা দ্বার রুক্ষ করে নিজেদের রক্ষণের  
ব্যবস্থা করছো ?

এই বলে তিনি দ্রুত দ্বার-পথে ধাবিত হলেন,  
ও গদার আঘাতে উম্মোচিত করে দিলেন দ্বারের বন্ধন।  
বাতাসের বেগে তিনি দ্বারের বাইরে এসে দাঁড়ালেন,—  
তাঁর গ্রীবাদেশে শোভা পাছে সেই ভীম প্রহরণ।  
এইবার তিনি দ্রুত ধাবিত হলেন মণ্ড হাতীর দিকে,  
হাতীটি বন্যাক্রান্ত নীলনদের মতো সগর্জনে রুস্তমের দিকে  
মুখ করলো।

রুস্তম দেখলেন, শেষ পর্বত চূড়া তাঁর দিকে  
সগর্জনে এগিয়ে আসছে,  
তাঁর পদতলে মৃতিকা উচ্ছ্বসিত রঞ্জন পাত্রের মতো  
টগবগ করে ফুটছে।  
পেছনে তাকিয়ে দেখলেন তার নিজের যশস্বী সেনানীরা  
এই দৃশ্য দেখে ভয়ে মেষদল যেমন ব্যাঘু থেকে পলায়নপর হয়  
তেমনি করে পালিয়ে যাচ্ছে।

রুস্তম তখন সিংহের মতো গর্জন করে হাতীকে ধমক দিলেন  
কিন্তু হাতী তাতে ভয় না পেয়ে দ্বিগুণ বেগে এগিয়ে  
আসতে লাগলো।

রুস্তমকে দেখা মাত্র তার মতুতা যেন বৃদ্ধি পেয়ে গেছে,  
চলস্ত পর্বত চূড়া যেন সবেগে ধাবমান হচ্ছে সামনের দিকে।  
কাছাকাছি এসেই ভীষণ মণ্ডতায় হাতী তার শুণ  
প্রসারিত করলো রুস্তমের দিকে।

রুস্তমও তাঁর হস্তস্থিত প্রহরণ দ্বারা হাতীর মন্তকে  
ভীষণ আঘাত হানলেন,  
সেই আঘাতে পর্বত-বপু হাতীর দেহ অবনমিত হলো।  
কাঁপতে কাঁপতে স্তন্তহীন পর্বত ঢলে পড়লো  
এবং প্রহরণাঘাতে জজরিত হলো তার বিশাল বপু।  
গর্জনরত হস্তীর দফারফা করে  
রুস্তম শাস্ত চিত্তে শয়নকক্ষে প্রত্যাগমন করে নিদ্রামগ্ন হলেন।  
যথাসময়ে পুব দিকে তরুশ তপন

প্রেমিকার মুখচ্ছবি নিয়ে আবির্ভূত হলো ।  
জালের কাছে সংবাদ পৌছলো,  
কুস্তম কি করে মন্ত হাতীকে পরাজিত করেছেন ।  
জাল এই অপূর্ব সংবাদ শোনা মাত্র  
হাতীর পূর্ব-কীর্তির কথা স্মরণ করে বললেন,  
আফসোস ! হে মদমত হাতী,  
কি কুক্ষণেই না তুই রুস্তমের দিকে নীলনদের মতো গর্জন করে  
এগিয়ে গিয়েছিলি !

কত-না সংগ্রামে এই মন্ত হাতী  
শক্রসন্যের বৃহকে তচনছ করে দিয়েছে !  
শতযুক্তে জয়ী হাতী, তুই অবশেষে নিজ কর্মদোষে  
জাল-পুত্র রুস্তমের হাতে প্রাণ হারালি ।  
এই বলে রুস্তমকে কাছে ডেকে এনে  
তার গ্রীবাদেশ, শির ও হস্তদুয় চুম্বন করে বললেন,  
হে সমুদ্যত সিংহ-শাবক,  
তুমি পূর্ণ বিক্রমে তোমার থাবা প্রসারিত করো ।  
হে বালক বীর, বীরত্বে বিক্রমে ও সমুন্নতিতে  
তুমি তুলনাহীন ।  
এখন তুমি অগ্রসর হও সামনের দিকে,  
এবং তোমার গর্জনে বিগলিত করে দাও বিপক্ষের হাতিয়ার ।  
প্রিয়পুত্র, এখন তুমি তোমার প্রপিতামহ নুরীমানের রক্তের প্রতিশোধে  
তৎপর হয়ে কটিদেশ বন্ধন করো এবং সৈন্যদলসহ এগিয়ে যাও ।  
তোমার লক্ষ্যস্থলে তুমি এক পর্বত দেখতে পাবে যার চূড়া  
স্পর্শ করেছে মেঘমালা,  
যার উপর দিয়ে দুরস্ত দৈগলও পক্ষ বিস্তারে সমর্থ হয় না  
চার ফরসৎগ\* উচু তার চূড়া,  
তার প্রশস্ততা ও চার ফরসৎগ !  
পর্বতের চতুর্দিক প্রস্তর-প্রাচীরে সূরক্ষিত,—  
তার উপত্যকা সবুজ, বহু দ্রোতপিনী নির্গত হয়েছে তার থেকে ।  
এই পর্বত সবুজ বনভূমি, জলপূর্ণ হৃদ ও মণিকাঞ্চনে সম্পদশালী,  
বহু মানব ও জীবজন্তু এই পর্বতাঞ্চলে বাস করে ।  
বহু ফলবান বৃক্ষ ও চাষাবাদে সমৃদ্ধ সেই এলাকা,—

---

তিন মাইলে এক ফরসৎ হয় ।

সমৃদ্ধি ও সম্পদে তা তুলনাহীন।  
বিশ্ব-প্রভু সেখানে সর্ববিধ ফল  
সৃষ্টি করে রেখেছেন।  
সেই পর্বতে প্রবেশ করার একটিমাত্র পথ  
সমুন্নতিতে সেই পথ আকাশতুল্য।  
নূরীমান নির্বাচিত বীরগণসহ  
বাদশা ফারেন্দুনের আদেশে সেখানে গমন করেছিলেন।  
যথাসময়ে তিনি প্রাচীরের পাদদেশে গিয়ে পৌছেছিলেন,  
সেস্থান পর্যন্ত তাঁর পথ ছিল মুক্ত।  
তারপর যুদ্ধ করে তিনি আরো দূর এগিয়ে গেলেন,  
সেই স্থানটি ছিল মন্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন।  
দীর্ঘ এক বছর ধরে তিনি সেখানে যুদ্ধরত রইলেন,  
ও কুম্ভ স্বীয় সৈন্যদল থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়লেন।  
অবশ্যে নূরীমান যে-স্থানে অবস্থান করছিলেন  
সেখানে পশ্চাদ্বিক থেকে এক বিরাট প্রস্তরখণ্ড পড়ে তাঁকে  
বহির্বিশ্ব থেকে বিছিন্ন করে দিয়েছিলো।  
সৈন্যগণ তাঁর অপেক্ষায় থেকে অবশ্যে  
সেনাপতিহীন অবস্থায় বাদশার সমীপে ফিরে এসেছিল।  
এই সংবাদ যখন বীরবর সামের কাছে পৌছালো এবং  
তিনি জানতে পারলেন যে,  
যুদ্ধকামী সিংহের যুদ্ধসাধ চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয়ে গেছে,  
তখন তিনি দৃঢ় ও ক্ষোভে ফেটে পড়লেন  
এবং দীর্ঘ বিলাপ-ধ্বনি উঠিত করলেন পিতার জন্য।  
এইভাবে এক সপ্তাহ শোক-সাগরে নিমগ্ন থেকে  
অষ্টম দিনে তিনি সমবেত করলেন সৈন্যদল।  
এবং বন উপত্যকা পূর্ণ করে  
সৈন্যদল চালনা করলেন সেই দুর্গ প্রাচীরের দিকে।  
কিন্তু সেখানে মাস-বর্ষ অপেক্ষা করেও  
দুর্গে প্রবেশের দ্বার-পথ আবিষ্কারে তিনি সমর্থ হলেন না।  
সেই দীর্ঘ দিনের মধ্যে দুর্গ থেকে যেমন কেউ বেরুল না  
তেমনি কাউকে তিনি সেখানে প্রবেশ করতেও দেখতে পেলেন না।  
এইভাবে তাঁর অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো,  
পিতৃশোণিতের প্রতিশোধ নিতে তিনি বিফলকাম হলেন।

হে পুত্র, এখন তোমার কাল সমাগত,  
তুমি এখন এই দৃঢ়খের প্রতিকারের ব্যবস্থা করো।  
আমার আশা, তুমি তোমার সৌভাগ্যসহ এক কাফেলা সঙ্গে করে  
এমনভাবে যাত্রা করবে যাতে কোন শুণ্ঠচর তোমাকে  
চিনতে না পারে।

দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে তুমি অগ্রসর হবে সিপান্দ<sup>১</sup> পাহাড়ের দিকে,  
পথের সমস্ত বাধা ও কটক উন্মুক্ত করে।  
এখনও তুমি পরিচিত নও,  
এই অপরিচয় তোমার সাফল্যের সূচনা করবে।  
পিতার কথা শুনে ক্রস্তম বললেন, পিতঃঃ আদেশ করুন,  
শীত্র আমি এই দৃঢ়খের প্রতিকার করছি।  
জ্বাব শুনে জাল বললেন, বৎস্য, তোমাকে খুব সাবধান  
থাকতে হবে,  
সৃতরাঙ্গ যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোন।  
নিজেকে তুমি উদ্ভিদালকের সাজে সংজ্ঞিত করে নাও,  
এবং উটের এক কাফেলা নিয়ে যাত্রা করো।  
উদ্ভিদগীর পৃষ্ঠে বোঝাই করে নিতে হবে লবণ,  
যাতে কেউ তোমার প্রকৃত পরিচয় না জানতে পারে।  
কারণ সে অঞ্চলে লবণের চাহিদা বিস্তর,  
বহু মূল্য দিয়েও সেখানে কেউ লবণ কিন্তে পায় না।  
তুমি যখন সেই প্রাচীরের সমীপবর্তী হবে  
তখন দেখতে পাবে, সেখানকার ভোজ্যবস্তুতে লবণ নেই।  
হঠাতে যখন লোকে দেখবে যে, লবণ নিয়ে তুমি  
সেখানে উপস্থিত হয়েছ,  
তখন বড় ছেট সবাই তোমাকে আগু বাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

---

যে পর্বতের কথা একটু আগে বলা হয়েছে সেই পর্বতের নাম।

## সিপন্দ পাহাড়ের দিকে রুক্ষমের যাত্রা

পিতার উপদেশানুযায়ী রুক্ষম সকল ব্যবস্থা করে  
অভিযানের জন্য প্রস্তুত হলেন।  
লবণের সূপের মধ্যে প্রহরণ লুকিয়ে রেখে  
সমুন্নত মস্তকে তিনি যাত্রারভ করলেন  
সঙ্গে নিলেন কতিপয় সতর্ক ও বাহাদুর সিপাহী।  
যশঘূর্ণী বীর উষ্ট্রদলের পৃষ্ঠে বোঝাই করা মালের মধ্যে  
আরো অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে সঙ্গে নিলেন।  
তারপর স্বীয় কৌশল চিন্তা করে  
অতি সতর্কতার সঙ্গে সিপন্দ পাহাড়ের দিকে পথাতিক্রম  
করতে লাগলেন  
পাহাড়ের সন্নিকটে পৌছে রুক্ষম লক্ষ্য করলেন যে,  
প্রহরারত গুপ্তচর তাঁদেরকে দেখে স্বীয় দলপতির দিকে  
ডোড়ে গেলো।  
গুপ্তচর গিয়ে স্বীয় রাজাকে বললো, এক উষ্ট্রচালকের নেতৃত্বে  
এক কাফেলা দুর্গের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছে।  
মনে হয় এরা লবণের ব্যবসায়ী,  
আদেশ করলে তাদের দলপতির কাছে জিজ্ঞাসা করে  
দেখতে পারি।  
এই কথা শুনে দুর্গাধিপতি এক ব্যক্তিকে  
সবিশেষ জানবার জন্য কাফেলার সর্দারের কাছে পাঠাবার  
আয়োজন করে বললো,  
তাকে জিজ্ঞাসা করবে এবং নিজেও লক্ষ্য করে দেখবে তাদের  
সঙ্গে কি বস্তু আছে?  
তারপর আমার কাছে ফিরে এসে সঠিক সংবাদ দিবে।  
দৃত দুর্গ থেকে নীচে নেমে  
সরাসরি রুক্ষমের কাছে এসে দাঁড়ালো।  
এবং রুক্ষমকে লক্ষ্য করে বললো, ওগো কাফেলার সর্দার,  
তোমার বোঝাইকরা মালের অভ্যন্তরে কি আছে আমাকে তা  
অবগত করাও।  
যাতে আমি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক জেনে  
আমাদের অধিপতিকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করতে পারি

জবাবে রুস্তম বললেন, ওগো দৃত,  
তুমি তোমার মহান অধিপতির কাছে গিয়ে বলো যে,  
আমাদের সঙ্গে আছে লবণের বোঝাই  
এবং লবণ ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নেই।  
দৃত এই কথা শুনে দলপতির কাছে  
ফিরে এসে বললো, ওগো মহাত্মন,  
এক কাফেলা দেখে এলাম,  
তারা বললো, তাদের সঙ্গে রয়েছে শুধুমাত্র লবণ।  
সংবাদ শোনামাত্র দলপতির মুখে হাসি দেখা দিলো,  
তিনি উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন।  
বললেন, সত্ত্বর দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করে  
কাফেলাকে ভিতরে নিয়ে এসো।  
রুস্তমের কাছে খবর পৌছা মাত্র  
তিনি নিতল থেকে উপরের দিকে মুখ করলেন।  
সংকীর্ণ দুর্গ-দ্বারের সন্নিকটবর্তী হতেই তিনি দেখলেন,  
বহু লোক তাঁকে স্বাগত সন্তানের জানাতে এগিয়ে এসেছে।  
রুস্তম দুর্গাধিপতির সমীপবর্তী হয়েই  
মৃত্তিকা চুম্বন করে তাঁর প্রশংসি উচ্চারণ করলেন।  
তারপর সভাস্থ সকলকে যথারীতি সম্বোধন জানিয়ে  
লবণের অনেকগুলি বোঝা তাঁদের সমীপে পেশ করলেন।  
দলপতি তখন আশীর্বাদ করে বললেন, চিরজীবী হও,  
চন্দ্র সূর্যের মতো দীপ্তিমান হও।  
হে শুভসংকল্প যুবক, আমি তোমাকে এখানে  
সাদর সন্তানের জানাচ্ছি।  
এইবার রুস্তম স্বীয় পণ্যবাহী কাফেলাসহ  
হাটকেন্দ্রে এসে উপস্থিত হলেন।  
তাঁকে দেখে বালক-বৃন্দ নরনারী  
চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো,  
কেউ সোনা দিয়ে কেউ রাপো দিয়ে  
কেউ বসন দিয়ে লবণ কিনতে লাগলো।  
রাত্রি অন্ধকার হলে রুস্তম তাঁর থাবা বিস্তারিত করলেন,  
দুর্গ-মধ্যস্থ সেনানীদের দিকে।  
রণপিপাসু সৈন্যদল তখন

দুর্গাধিপতির শরণাপন্ন হলো ।  
এই সময় দুর্গ-রক্ষক কোত্তাল সর্বশক্তি নিয়ে  
রুস্তমের দিকে ধাবিত হলো ।  
রুস্তম তখন তাঁর ভয়ঙ্কর প্রহরণ দ্বারা  
তার মস্তকে আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করে দিলেন ।  
এরই মধ্যে সারা দুর্গে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো  
চারদিক থেকে সকলে বিশ্বাসঘাতক শক্তির দিকে অগ্রসর হলো ।  
অঙ্ককার রাত্রি তলোয়ারের দীপ্তিতে ঝলকাতে লাগলো,  
ধরণী বাদখণ্ডনের সূর্যকাণ্ঠ মণিতে লাল হয়ে চললো,  
যুদ্ধ আর রক্তের তরঙ্গে মনে হলো  
যেন পূর্বকাশে ভোরের লালিমা ফুটে উঠেছে ।  
রুস্তম কৃমান্বয়ে প্রহরণ, তরবারি ও শরজালে  
বিপক্ষকে দলিত করে চললেন ।  
এমন সময় দেখা গেলো, পূর্বকাশের যবনিকা ধরে এসে  
দাঁড়িয়েছেন সূর্য,  
ধরণী পাতাল থেকে সপ্তর্ষি পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে ।  
দুর্গে আর একটি লোকও অবশিষ্ট রইলো না,—  
সারা এলাকা মৃতদেহ ও যুদ্ধক্রান্তিতে অবসন্ন বিবশ ।  
বীরবৃন্দ যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেছে  
যারা ধরা পড়েছে তাদেরকে দিতে হয়েছে প্রাণ ।  
এমন সময় দুর্গের এক সংকীর্ণ কোণে রুস্তম দেখতে পেলেন  
শক্ত পাথরে তৈরি এক গহ ।  
সেই গহের একটি মাত্র লোহ দ্বার ।  
দ্বারের উপর অঙ্কিত রয়েছে এক গণিত-চক্র ।  
তিনি প্রহরণের আঘাতে দ্বার চূর্ণ করে  
তার ভিতরে প্রবেশ করলেন ।  
দেখলেন, তার মধ্যে এক সুউচ্চ গম্বুজ —  
সেই গম্বুজ আগাগোড়া স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ ।  
এই বিপুল ধনরাশি দেখে  
রুস্তম বিস্ময়ে অভিভূত হলেন ।  
কিন্তু নিজের সেই বিস্ময় লুকিয়ে রেখে  
তিনি পরাজিত বন্দীদেরকে এমন আরো সম্পদাগার আছে কি না  
জিজ্ঞাসা করলেন ।

জ্বাবে এমনই এক স্বর্ণময় আকর তারা তাঁকে দেখিয়ে দিলো,  
সেটি নদীতীরে অবস্থিত মুক্তা পরিপূর্ণ এক গাজকোষ।  
এইভাবে সেই অভেদ্য দুর্গ জয় করে  
রুম্ভ বসন্তের শোভাময় এক আসর সজ্জিত করার  
আদেশ দিলেন।

## ରୁଷମ କର୍ତ୍ତକ ଜାଲେର ନିକଟ ବିଜୟ ସଂବଦ୍ଧାବୀ ଲିପିକା ଲିଖନ

ରୁଷମ ସ୍ବୀୟ କିର୍ତ୍ତିକଳାପ ସବିଷ୍ଟାରେ ବିବୃତ କରେ  
ପିତାର ନିକଟ ଏକ ଲିପିକା ଲିଖଲେନ ।

ତାତେ ପ୍ରଥମେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭୁ  
ସର୍ପ ଓ ପିପିଲିକାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଶଂସା କିର୍ତ୍ତିତ ହଲୋ ।

ତିନି ପ୍ରଭୁ ଜୋହରା ତାରା, ଶନି ଗ୍ରହ ଓ ଚାଁଦେର  
ତିନି ପ୍ରଭୁ ସୁବିଷ୍ଟ୍ରତ ଆକାଶ-ଚନ୍ଦ୍ରାତପେର ।

ତାରପର ବୀରବର ଜାଲେର ଗୁଣଗ୍ରାମ କିର୍ତ୍ତିତ ହଲୋ,  
ଯିନି ଜାବୁଲତାନେର ପ୍ରଭୁ ଓ ଅନୁପମ ଯୋଦ୍ଧା ।

ତିନି ବାଦଶାର ଯୋଗ୍ୟ-ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଯୁଗ-ଯୁଗ-ନନ୍ଦିତ,  
ଚାଁଦ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପରଓ ତା'ର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକର ।

ତିନି ଇରାନୀୟଗଣେର ଆଶ୍ୟାନ୍ତିଲ,  
ତିନି ଉନ୍ନତଶିର ଓ ବଲବାନ,

ତିନି ସକଳ ଆସର ଓ ସକଳ ନଗରୀର ଯୋଗ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ।

ତିନି ବୀରତ୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନେର ଧାରକ,  
ତିନି ସ୍ବୀୟ ବାହୁବଳେ ଧରିଆତୀର ରକ୍ଷଣେ ତୃପର ।

ଏଇ ବୀରପର ଚିରଜୀବୀ ହେନ,  
ତା'ର ତାଜ, ତଥ୍ତ ଓ ରାଜମୁକୁଟ ଚିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେକ ।

ଲିପିତେ ରୁଷମ ଲିଖଲେନ, ଆପନାରଇ ଆଦେଶେ ଆମି  
ସିପନ୍ଦ ପାହାଡ଼େ ଏସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ,

ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶର ମତୋ ଉଚ୍ଚ ।

ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶେ ଏସେ ପୌଛାଲେ ପର

ସେଖାନକାର ଦଲପତିର କାହୁ ଥେକେ ଆମାର ପ୍ରତି

ସ୍ଵାଗତ ସନ୍ତାଷଣ ଜାନାନୋ ହଲୋ ।

ସେଇ ଦଲପତିର ଆଦେଶେ ଆନନ୍ଦିତ ହୟେ

ଆମି ଆମାର ବାହୁବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲାମ ।

ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାର ହଲେ ଆମି ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଲାମ,

ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଭ୍ୟାସରେ କାଉକେଇ ରେହାଇ ଦିଲାମ ନା ।

ବହୁ ଲୋକ ହତ ହଲୋ, କେଉ ଆହତ ହଲୋ, କେଉବା ପାଲିଯେ ଗେଲୋ,

ମୃତଦେହ ଛଡ଼ିଯେ ରହିଲୋ ସର୍ବତ୍ର ।

ଯେ-ସ୍ଵର୍ଗରୋପ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଁବେ ତାର ଓଜନ

কম করে হলো পাঁচশত হাজার মণ।  
যুদ্ধে আরো যে-সব বস্তু জয়ীপক্ষের করতলগত হয়েছে  
সেই সব বসন-ভূষণও অনেক।  
এইসব কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ সহজ নয়,  
দিন গড়িয়ে মাস যাবে তবু গণনা শেষ হবে না।  
এখন আপনি আপনার অতুলন সৌভাগ্য ও জ্ঞানসহ  
আমাকে কি করতে হবে তা আদেশ করুন।  
লিপিকা নিয়ে দৃত শীত্রগতি জালের সমীপে এসে উপস্থিত হয়ে  
তাঁর হাতে তা সমর্পণ করলো।  
লিপিকা পাঠ করে বীরবর এতো প্রীত হলেন যে  
মনে হলো তিনি আবার নবযৌবন লাভ করেছেন।  
তৎক্ষণাত তিনি তার জবাব লিখবার মনস্ত করলেন,  
ও পুত্রের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলেন আশীর্বাণী।  
আনন্দিত লিপিকার মধ্যে যেন  
সর্বত্র বিছুরিত হলো অস্বর ও কস্তুরীর সুগন্ধ।  
লিপিকার সুচনায় লিখিত হলো বিশ্ব-প্রভূর গুণগ্রাম,  
তারপর বলা হলো আনন্দিত আত্মার কথা।  
জাল লিখলেন, গ্রহণ করো আমার আশীর্বাদ তোমার বিজয়ে,  
আনন্দিতচিত্তে তোমার আগমন-পথে বিছিয়ে দিছি আমার প্রাণ।  
তোমারই শৌর্যে এমন যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে,  
বালকের কীর্তি ম্লান করেছে যে-কোন পুরুষের পৌরুষকে।  
তোমার বিজয়ে নুরীমানের অমর আত্মা গর্ববোধ করেছে,  
তাঁর দুশ্মনদের মাথা হয়েছে হেঁট।  
যে-সম্পদ তুমি লাভ করেছো তা বোঝাই করার জন্য  
এক লক্ষ উট আমি এই সঙ্গে পাঠালাম।  
এই লিপিকা পাওয়া মাত্র তুমি অশ্঵ারূপ হয়ো,  
কারণ তোমার বিছেদে আমি কাতর।  
বিজিত সম্পদের মধ্যে যা ভাল তা উটের পিঠে বোঝাই করে  
দুর্গে আগুন ধরিয়ে দিবে  
ক্রস্তম পিতার লিপিকা পেয়ে  
অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হলেন এবং  
সম্পদরাশির মধ্যে ভালো সেই সব  
স্বর্ণ ও রাজোপযোগী মণিমালা,

সুন্দর কারুখচিত চীনা কিংখাব প্রভৃতি  
 নির্বাচিত করে উটের উপর বোঝাই করে  
 পিতার সমীপে রওয়ানা করে দিলেন।  
 তারপর সিপন্দ পাহাড়ে ধরিয়ে দিলেন আগুন,  
 সেই আগুনের ধূয়া আছন্ন করলো উন্নত আকাশ।  
 অতঃপর হষ্টচিতে রুস্তম  
 বায়ুগতি স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হলেন।  
 নীমরোজের অধিপতি রুস্তমের আগমন-সংবাদ  
 পেয়ে তাঁর প্রত্যুদ্গমনের জন্য  
 দুন্দুভি আদি বাদ্যযন্ত্র  
 সঙ্গিত করার আদেশ দিলেন।  
 দেখতে দেখতে তাত্ত্বিক্তা, দামামা ও শক্তাদির নিনাদে  
 চারদিকে আমোদিত হয়ে উঠলো।  
 এই আয়োজনের মধ্যে জালও স্বয়ং  
 পুত্রের মুখসন্দর্শনের আশায় শীত্রিগতি অগ্রসর হলেন।  
 রুস্তম পিতাকে দেখা মাত্র  
 নীচে নেমে এসে প্রশংসা উচ্চারণ করলেন।  
 সেনাপতি পুত্রকে বুকে টেনে নিয়ে  
 করলেন আশীর্বাদ।  
 সেখান থেকে সাম-পুত্র স্বীয় ফরজন্দ রুস্তমকে নিয়ে  
 প্রাসাদে এসে প্রবেশ করলেন।  
 এইবার রুস্তম স্বীয় জননী রুদাবার সমীপে এসে  
 সমস্তমে ঘৃতিকা চুম্বন করলেন।  
 মা পুত্রের দুই স্কন্দ ও বক্ষদেশ চুম্বন করে  
 তাকে সিঙ্গ করলেন আশীর্বাদে।

---

• নীমরোজের অধিপতি জাল স্বয়ং।

## সামের কাছে জালের লিপিকা

বীরবর জাল সুসংবাদসহ এক লিপিকা  
মহামতি সামের কাছে লিখলেন।  
তাতে সিপদ্দ পাহাড়ের যুদ্ধের সকল খুঁটিনাটি  
সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হলো।  
দৃত এই লিপি নিয়ে বিবিধ উপটোকনসহ  
যথাসময়ে সামের সমীপে গিয়ে উপস্থিত হলো।  
লিপিকা পোয়ে সামের মুখ  
গোলাপ ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠলো।  
অবিলম্বে তিনি বসন্তের শোভাময়  
এক আসর সজ্জিত করার আদেশ দিলেন।  
সংবাদবাহী দৃতকে দান করলেন বসন-ভূষণ  
ও পরিকীর্তিত করলেন রুস্তমের গুণাবলী  
তারপর উন্নতশির বীরপুত্রের লিপির  
জ্বাবে লিখলেন,  
সিংহ-শাবকের বল-বীর্যের কাহিনী  
যতই বিশ্বয়কর হোক, তা অস্বাভাবিক নয়।  
এই সিংহ-শিশু তেমন এক পিতার সন্তান  
যে-শোণিত ছাড়া মাত্তদুগ্ধ পান করেনি কখনো।  
মানব-সমাজে প্রত্যাগত হয়েই  
সে দাঁতের ব্যবহারে সংযত হয়েছে সর্বপ্রথম।  
সেই পিতার সন্তান যদি মাত্তন্ত্রে প্রতিপালিত হয়েও থাকে  
তবুও পিতার শৌর্য তাতে অবশ্যই প্রকাশ পাবে।  
কাজেই রুস্তমের জন্য এ আশ্চর্য নয় যে,  
সে তার পিতা জালের মতো বীরত্ব প্রকাশ করবে।  
সে-বীরত্ব এমন যে যুদ্ধের ময়দানে  
সিংহও কামনা করে তার সাহায্য।  
এইভাবে লিপিকা সমাপ্ত করে  
সাম দৃতকে ডেকে তার হাতে তা দিলেন।  
দৃত খেলাত ও লিপি  
জালের নিকট নিয়ে এলো।  
লিপি পোয়ে জাল অত্যন্ত আনন্দিত হলেন,

তরুণ পুত্রের কীর্তি শ্রবণে গর্বে তাঁর বুক ভরে উঠলো।  
সারা বিশ্ব যেন জালের জন্য হলো উচ্চাশাম্ভ সম্ভাবনাময় —  
ধরণীতল থেকে রাশিচক্রের সমূলতি পর্যন্ত।  
এখন আমরা বর্ণনা করবো মনুচেহেরের কথা,  
সেই করুণাময় বাদশার সম্পর্কে বলবো।  
বিদায়ের বেলায় মহান বাদশা পুত্রকে কি উপদেশ দিয়ে গেলেন  
এখন তা শ্রবণ করুন।

## পুত্রের প্রতি মনুচেহেরের উপদেশ

মনুচেহেরের বয়ঃক্রম একশো বিশ বছর পূর্ণ হলে,  
দুনিয়া থেকে তাঁর যাত্রার সময় এলো।  
জ্যোতির্বিদগণ সমবেত হয়ে  
আকাশ থেকে তাঁর জীবন-রহস্য অবগত হওয়ার চেষ্টায়  
রত হলো।

তারা কিছুতেই তাঁর জীবনের দিনগুলোকে দীর্ঘতর  
দেখতে পেলো না।

সকল গণনা বার বার পূর্বশানেই ফিরে আসছে।  
অবশেষে তারা সেই দুর্দিনের সঙ্কান পেলো,  
ও জানতে পারলো যে, বাদশার জীবন-পুঞ্চ বিশীর্ণ হওয়ার  
দিন এসে গেছে।

বাদশাকে এখন অন্যতর পাঞ্চালার দিকে যাত্রা করতে হবে,  
সেখানে বিশ্ব-প্রভু তাঁর জন্য উত্তম স্থান  
নির্দেশ করে রেখেছেন।

বাদশা জ্ঞানীদের কথা শুনে  
রাজসভা ডাকার আদেশ দিলেন।  
সেখানে রাজ্যের জ্ঞানীগুলীদের ডেকে  
স্থীয় অস্তরের কথা ব্যক্ত করলেন।

পুত্র নওজরকেও ডাকা হলো দরবারে,  
বাদশা তাঁকে কতিপয় উপদেশ দান করলেন।  
বললেন, এই শাহী তথ্ত নশুর,  
চিরঞ্জীব আত্মার জন্য এটি তৈরি করা হয়নি।  
আমার জীবনের একশো বিশ বছর  
দুঃখ কষ্টে আমি অবিচল রয়েছি।

অনেক আনন্দ ও মনোবাঞ্ছাও আমার পূর্ণ হয়েছে এই সময়ে,  
বহু যুদ্ধে পরাজিত করেছি আমি দুশ্মনকে।

কিন্তু সর্বদা আমার মনে রয়েছে মহামতি ফারেদুনের উপদেশ,  
তাঁর মহস্তকে আমি ভূষণকৃপে অঙ্গে ধারণ করেছি।  
বীরপ্রবর সুল্ম ও তূর থেকে

আমার মাতামহ এরজের রক্তের প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।  
তাদের নগরীর পতন করেছি, স্থাপন করেছি অনেক দুর্গ।

তবু বলব যে, জীবনের কিছুই জানতে পারিনি,  
 অতীতের কত কাহিনীই আমার অজ্ঞানা রয়ে গেলো।  
 যে-বৃক্ষ দান করে তিক্ত ফল ও উদগত করে তিক্ত কিশলয়,  
 তার জীবনও মৃত্যুর উপযুক্ত বলে গণ্য হয় না।  
 আমি দৃঢ় ও বেদনা বহন করে নিয়ে গেলাম,  
 দিয়ে গেলাম তোমাকে রাজ্য, ধন ও সিংহাসন।  
 ফারেদুন যেমন আমাকে দিয়েছিলেন  
 তেমনি আমিও তোমাকে এই পরীক্ষিত শাহী তাজ দিয়ে গেলাম।  
 জেনে রেখো কাল ছোট বড় সকল ঘটনাকেই অতীত করে  
 বার বার প্রত্যাবৃত্ত হয় নিরক্ষুশ শাস্তির বাণী নিয়ে।  
 যে-পতাকা তোমার হাত থেকে খসে পড়বে  
 দীর্ঘদিন পরে সে তোমাকে তা ফিরিয়েও দিতে পারে।  
 কাজেই জীবনের প্রতি কখনো অপ্রসন্ন হয়ো না,  
 মহৎ পূর্বপুরুষের সন্তানের কাছ থেকে মহস্তই বাঞ্ছনীয় হয়।  
 অবহিত হও, বিশ্ব-প্রভুর ধর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত হয়ো না,  
 সেই ধর্মই তোমাকে দান করবে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।  
 সেই ধর্ম দুনিয়ায় নতুন যুগের পক্ষন করবে,  
 জ্ঞানীদের মধ্যে থেকে আসবে তার বাণীবাহক।  
 কাজেই মনে রেখো, প্রাচ্য দেশ থেকে যখন সেই বাণীবাহকের\*  
 আবির্ভাব হবে,

তখন যেন তাকে অস্বীকার কিংবা শক্রজ্ঞান করে বসো না।  
 তাঁকে গ্রহণ করো, তাঁর ধর্মকে সত্যধর্ম বলে জেনো,  
 তাঁর বাণীকে পূরোপুরি বিবেচনা করে দেখো।  
 কখনো বিশ্ব-প্রভুর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না,  
 কারণ, তাঁরই থেকে আগত হয় সকল কল্যাণ।  
 অবহিত হও কিছুদিন পরে তুরুন্নীদের মধ্যে থেকে এক সৈনিক এসে  
 ইরানভূমি অধিকার করে বসতে চাইবে।  
 চৰাচৰ পরিপূর্তি হবে বেদনার্ত চিৎকারে।  
 তোমার সামনে রয়েছে বহুবিস্তৃত কর্তব্য  
 শাস্তিপ্রিয় জনতাকে রক্ষা করতে হবে হিংস্র নেকড়ের হাত থেকে।  
 তোমার অকল্যাণ পিশঙ্গের সন্তানদের থেকে আসবে।  
 তুরানীরাই তোমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে।

\* এই বাণীবাহক কি জরোয়েস্ট্র না ভারতীয় কোন মহাপুরুষ?

হে পুত্র, তখন তোমার সংগ্রামে  
সাম ও জালকে অবশ্যই সহযোগী করবে নিবে।  
ইতিমধ্যে জালের ওরসজাত নববৃক্ষ  
মাথা উচু করে দাঁড়াবে।  
তার শৌর্যে তুরান দেশ অসহায় বোধ করবে,  
তোমার প্রতি শক্রতাকে সে নিজের প্রতি শক্রতা বলে গ্রহণ করবে।  
এতটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে বাদশার মুখমণ্ডল অশ্রপ্লাবিত হলো,  
নওজরও পিতার সঙ্গে বোদন করলেন।  
কিছুক্ষণ পরেই বাদশা অসুস্থ হয়ে পড়লেন,  
রোগ সারবার কোন লক্ষণই দেখা গেলো না।  
অবশ্যে কেয়ানী চক্রবৃদ্ধ চিরদিনের জন্য মুদিত হয়ে গেলো।  
এই জ্ঞানী ও যশস্বী নরপতির কাহিনী  
দুনিয়ায় এক মহৱী স্মৃতির সঞ্চয় রেখে গেলো।  
বন্ধুবা, আজ এক উপদেশ তোমাদের দিব,  
দুনিয়ার ভালবাসা থেকে তোমাদের মনকে মুক্ত করো।  
এই দুনিয়া রঙ ও গহ্নের এমন এক বাগিচা  
যেখানে জীবন ও মৃত্যু বীজরূপে উপ্ত হয়ে চলছে।  
জীবন ও মৃত্যু দুটি সাদা ও কালো ঘোড়া  
সর্বদা সামনের দিকে ধাবমান।  
এরা এক নগরী থেকে অন্য নগরীর পথে  
যাত্রা চিরকাল অব্যাহত রেখেছে।  
এক ঘঞ্জিলে পৌছে এরা একে অপরের হাতে  
সঁপে দিয়েছে যাগ্রা-ঘণ্টা।  
কাজেই দুঃখ করো না —  
দুদিনের এই পাঞ্চশালায় কারো অবস্থান চিরস্থায়ী নয়।  
এখন বলো বাদশা নওজবের কাহিনী —  
কাল কেমন আচরণ করেছে তাঁর সঙ্গে সেই কথা।

# ନ୍ତର୍ଜର

[ତିନି ସାତ ବହୁ ରାଜତ୍ସ କରେଛିଲେନ]

## ନ୍ତର୍ଜରେର ସିଂହାସନାରୋହଣ

ପିତୃଶୋକ ଅପନୋଦିତ ହେଁଯାର ପର ବାଦଶା ନ୍ତର୍ଜର  
କେଯାନୀ ତାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାଶହିତ ଜୋହ୍ଲ ସେତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
ଉନ୍ନିତ କରଲେନ ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଜୋତିବିଦଗଣ ଦେଖେ ଶୁଣେ ଏକ ଶୁଭଦିନ ନିର୍ଧାରିତ କରଲୋ ।

ନ୍ତର୍ଜର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନୁଚେହେରେ ସିଂହାସନେ ସମାସୀନ ହଲେନ,  
ସାମନ୍ତ ଓ ସୈନ୍ୟଦଳ ଯଥା ନିଯମେ ଦୀନାର ଓ ଦିରହମ ଉପଟୋକନ ଦିଲୋ ।

ଇରାନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠଗଣ ଏକେ ଏକେ ସବାଇ

ତାଁର ସିଂହାସନେର ପଦତଳେ ଲଲାଟ ରକ୍ଷା କରଲେନ ।

ତାଁର ବଲଲେନ, ଆପନି ରାଜାଧିରାଜ ଆମରା ଆପନାର ବାନ୍ଦା,

ମନ ଓ ଚକ୍ର ଆମରା ଆପନାରଇ ଭାଲବାସାୟ ତୃପ୍ତ କରାଛି ।

କିନ୍ତୁ ବେଶୀଦିନ ଗତ ହତେ ନା ହତେଇ

ବାଦଶା ଅନ୍ୟାଯ ଓ ଉତ୍ସୀତନେର ଦିକେ ପା ବାଡ଼ାଲେନ ।

ଦେଶେ ଚାରଦିକ ଥିକେ ବିଲାପ-ଧ୍ଵନି ଶୁତ ହତେ ଲାଗଲୋ,

ନତୁନ ବାଦଶାର ରାଜତ୍ସେର ସୂଚନାଯାଇ ଧରଣୀ ବୃଦ୍ଧ ହୟେ ଏଲୋ ।

ତିନି ଅବିଲମ୍ବେ ପିତାର ମୀତି-ନିୟମ ଥିକେ ହଞ୍ଚ ପ୍ରକାଳନ କରଲେନ

ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଦେର ଉପର ବିରକ୍ତ ହୟେ ଉଠିଲେନ ।

ପୌର୍ଣ୍ଣ ତାଁର ହାତେ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଅପମାନିତ ହଲୋ,

ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପେଲୋ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂପଦେର ରାଶି ।

କୃଷକକୁଳ ହତାଶାୟ ତାଁର ଶାସନ ଥିକେ

ଅନ୍ୟଦିକେ ମୁଖ ଫିରାଲୋ ।

ଯେ-ସୈନ୍ୟଦଳ ଛିଲ ବାଦଶାର ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର ସ୍ଵରପ

ବୀରଦଳ ଯାରା ଛିଲ ସମ୍ମାଟେରଇ କର୍ତ୍ତସ୍ଵରେର ପ୍ରତିଧିବନି,

ଦେଶେର ବୈଦନା-ଚିତ୍କାରେ

ତାଦେର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୟେ ଉଠିଲୋ ।

ଏ ଦେଖେ ଜାଲେମ ବାଦଶା ଭୟ ପେଯେ

ସାମେର କାହେ ଏକ ଲିପିକା ଲିଖିଲେନ ।

ସାମ ଏଇ ସମୟ ମାଜିନ୍ଦିରାନେ ସାକସାରଦେର ସଙ୍ଗେ

ଯୁଦ୍ଧ ରତ ଛିଲେନ,

লিপিতে সর্বপ্রথম বিশু-প্রভূর গুণগ্রাম লিখিত হলো।  
তিনি চন্দ্ৰ, সূৰ্য ও তাৰাদলেৱ প্ৰভূ,  
তিনি সৃষ্টি কৱেছেন যুগপৎ হস্তী ও পিপীলিকা।  
তাঁৰ অসাধ্য কিছু নেই,  
তিনি সৰ্বকৰ্মে অনায়াস।  
তাঁৰ ক্ষমতায় বহুতম ও ক্ষুদ্রতম  
একই মূল্য বহন কৱে  
সেই চন্দ্ৰ সূৰ্যেৱ প্ৰভূৰ নাম নিয়ে  
শুভেচ্ছা নিবেদন কৱি মনুচেহেৱেৱ আত্মাৰ উদ্দেশে।  
তাঁৰ থেকেই সমুজ্জ্বল রাজমুকুট ও সিংহাসন  
আমি লাভ কৱেছি।  
বীৱিপ্ৰবৰ সামৰে শুভ হোক,  
তাঁৰ মস্তকে বৰ্ষিত হোক কল্যাণেৱ বারিধাৰা।  
এই অভিজ্ঞ সেনাপতি চিৱকাল নিৰ্বাচিত সামস্তদেৱ  
সেনাপতিত্বে উন্নত-শিৰ থাকুন !  
চিৱকাল তাঁৰ অস্তৱ ও মণিক্ষ প্ৰফুল্ল থাকুক  
মন তাঁৰ সকল দৃঢ় থেকে মুক্ত থাকুক চিৱদিন।  
গোপন ও প্ৰকাশ সমভাবে  
তাঁৰ বিজ্ঞতাৰ আয়ত্তাধীন।  
তিনি বীৱি ও বাদশাৰ আপনজন,  
আমাৰ রাজকীয় ক্ষমতাৰ ধাৰক ও বাহক।  
বাদশাৰ রাজ্যেৱ তিনি পৰিচালক,  
তাজ ও তখ্ত তাঁৰই কাৱণে রয়েছে সমুজ্জ্বল।  
এই মুহূৰ্তে সাম্রাজ্য অতি সঙ্কটেৱ মধ্যে পতিত হয়েছে,  
সীমা অতিক্ৰম কৱেছে বিপদৱাজি।  
যদি এখন তিনি ধাৰণ না কৱেন তাঁৰ প্ৰহৱণ  
তবে অচিৱেই সাম্রাজ্যেৱ চিহ্ন ধৱণী থেকে মুছে যাবে।  
সাম বাদশাৰ এই লিপিকা পাঠ কৱে  
এক দীৰ্ঘশূস মোচন কৱলেন।  
এবং বাত্ৰিকালে তাঁৰ প্ৰাসাদ থেকে নিৰ্গত হলো  
যাত্ৰাৰন্তসূচক দুন্দুভি নিনাদ।  
এক বিৱাট সৈন্যদলসহ তিনি কিৱিগিজ অঞ্চল থেকে বহিৰ্গত  
হলেন —

যেন কৃষ্ণসাগর উজ্জুসিত হয়ে উঠলো ।  
ইরানের সন্নিকটবর্তী হতেই  
সামন্তগণ তাঁর প্রত্যুদ্দগমনের জন্য এগিয়ে এলেন ।  
তাঁরা পদব্রজে সামের সমীপবর্তী হয়ে  
রাঙ্গের সকল হাল হকিকত বর্ণনা করলেন ।  
সামন্তগণ বাদশা নওজরের কীর্তি-কলাপ  
গোচরীভূত করলেন সামের ।  
তাঁরা বললেন, কি করে বাদশা তাঁর জ্বুল ও অত্যাচারে  
পিতার রীতি পদ্ধতিকে নস্যাং করে দিয়েছেন ।  
তাঁর কার্যকলাপে ধরণী বিরান হয়েছে,  
তাঁর জাগ্রত ভাগ্য হয়েছে তমসাচ্ছন্ন ।  
জ্ঞানের পথে তিনি বিচরণ করেন না,  
ধর্মের ছায়া তাঁর উপর থেকে সরে গেছে দুরে ।  
ধীরবর সাম যদি এখন এই সিংহাসনে  
আরোহণ করেন তবে সকল দিক রক্ষা পাবে সুন্দরভাবে ।  
আবার ধরণী শোভিত হবে ফলেফুলে ;  
আবার ইরান তাঁর সৌভাগ্যে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে ।  
আমরা সবাই আপনার আজ্ঞাবহ, আদেশ করুন,  
আমাদের ধনপ্রাপ্ত আপনার পায়ে আমরা উৎসর্গ করলাম ।  
সামন্তদের কথা শুনে সাম বললেন,  
আমার জন্য এমন করা কি শোভন হবে ?  
নওজর কেয়াণী বংশোদ্ধৃত, তিনি তখ্তে সমাপ্তীন ।  
আমার রাজ-মুকুট এই বংশেরই দান,  
কাজেই এমন কথা আমার কানে শোনাও পাগ ।  
যদি বাদশা মনুচেহেরের কোন কন্যাও  
এই সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতেন,  
তবে তাঁরও পদধূলি আমার উপাধান হতো,  
আমার বৃক্ষ আত্মার শান্তি নেমে আসতো তাঁর নামে ।  
বাদশার মন যদি পিতার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েও থাকে  
তবে সামান্য কয়দিনের জন্যই ।  
ইস্পাতে যে জৎ ধরেছে  
তা সারিয়ে নেওয়া কি খুবই কঠিন হবে ?  
আমি বিশ্ব-প্রভুর ইচ্ছায় অবশ্যই সম্মাটিকে সুপথে নিয়ে আসবো,

আবার ধরিত্বাকে করে তুলবো তাঁর প্রতি অনুরক্ত।  
মনুচেহেরের পায়ের ধূলি আমার সিংহাসন,  
নওজরের অশ্বের পদলেখা আমার রাজমুকুট।  
আমি তাঁকে বহু কথা বলবো, বহু উপদেশ দিব,  
সুগরামশ্রে আবার উদিত করবো তাঁর ভাগ্য-তারকা।  
আপনারা তখন অতীতের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন,  
আপনারা তখন আবার নতুন করে তাঁর কল্যাণের জন্য  
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন।

সামন্তগণ সামের কথা শুনে সত্যিই লজ্জিত হলেন,  
তাঁরা নওজরের আনুগত্যে নতুন করে কোমর বাঁধলেন।  
বীরপ্রবরের সৌভাগ্যের ছাঁয়ায়  
ধরণী যেন নব-যৌবন লাভ করলো।

সাম সঘাট সমীপে পৌছে  
যথারীতি সিংহাসন লক্ষ্য করে মৃত্তিকা চুম্বন করলেন।  
নওজর শৈত্রগতি সিংহাসন থেকে নেমে  
বীরবরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।  
তারপর নিজের সামনে তাঁকে বসিয়ে  
অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর কুশলাদি।  
সেনাপতি সাম বাদশাকে বললেন,  
আপনিই ফারেন্দুনের একমাত্র চিহ্ন।

আপনাকে এমনই বদান্যতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতে হবে যে,  
লোকে চিরকাল ক্রতৃজ্ঞতার সঙ্গে আপনার নাম স্মরণ করে।  
আপনি লক্ষ্য করুন এই দুনিয়াকে যারা সম্যক চিনতে পেরেছে  
তারা কখনও দুনিয়ার দৈহিক আরাম-আয়েশ কামনা করে না  
যারা দুনিয়ার কাছে নিজের অন্তর বাঁধা রাখে,  
জ্ঞানিগণ তাদেরকে নির্বোধ বলে অভিহিত করে থাকেন।  
স্বর্ণ-সম্পদ মানুষকে উন্নত করে না,  
তার চূড়ান্ত লক্ষ্যও তারা নয়।

অবধান করুন, মৃত্যু শিয়রের পাশেই নির্মাণ করেছে তার গুপ্ত ঘাঁটি,  
আর আপনার চারিদিকে রয়েছে অমাবস্যার অঙ্ককার।  
সে এক টানে রাজাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে  
মৃত্তিকার তিমিরে,  
সে মন্ত্রক ও রাজমুকুটকে নিষ্কেপ করে গহ্বরের অতলে।

এই নশুর সরাইখানায় নিজেকে আবক্ষ রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়,  
 এর মোহময়ী ছলনা মরীচিকার মতো অচিরেই মিলিয়ে যায়।  
 এখানে আত্মা নিশ্চিপ্ত হয় অঙ্ককারের মধ্যে,  
 এখানে সর্বত্র অঙ্ককারেই লীলাখেলা।  
 বুদ্ধিমান এর বিছেদে দ্রুত্ব করে না,  
 বিছেদ ও বিরহই এখানকার নিত্যকার রীতি।  
 এখানে রাজছত্রের অধিকারী ও দরিদ্রের একই পরিণতি,  
 এই যাত্রাপথে উভয়ের পরিণাম এক।  
 এই সরাইখানায় এমনভাবে অবস্থান করুন  
 যেন বিশ্ব-প্রভূর কাছে আপনি নির্দোষ বলে প্রতীয়মান  
 হতে পারেন।  
 এখানে ফারেদুন বিচরণ করে গেছেন ধর্মের পথে,  
 আর দুর্ভাগ্য জোহাকের উপর বর্ষিত হয়েছে অভিশাপ।

সামের কথা শুনে নওজর বললেন,  
 হে যশস্বী, আপনার উপদেশ অনুসারেই আমি চলবো।  
 আমার কৃতকর্মের জন্য আমি লজ্জিত,  
 এখন থেকে আমি করশার দৃষ্টিতে চাইব নিজের দিকে।  
 অতঃপর বাদশা এক আসর সজ্জিত করার আদেশ দিলেন,  
 এবং সানন্দে সামের জন্য সপ্তাহকাল ধরে  
     আনন্দ ও সুরার আয়োজন করলেন।  
 সামন্তগণ সকলে নওজরের সমীক্ষে এসে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন,  
 রাজানুগত্যে মন্তক অবনত করলেন সকলে।  
 রাজের সকল অঞ্চল থেকে যথারীতি রাজস্ব ও  
     শুল্কাদি আসতে লাগলো —  
 যশস্বী সেনাপতির ভয়ে শাস্ত হলো সারা দেশ।  
 নওজর নিশ্চিপ্তে উপবিষ্ট রাইলেন সিংহাসনে,  
 তাঁর মাহাত্ম্য দিকে দিকে জ্যোতিঃ বিকীরণ করতে লাগলো।  
 সাম নওজরের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিলেন উপদেশের সিংহদ্বার,  
 তিনি তাঁকে স্মরণ করালেন অতীতের অনেক উত্তম কথা।  
 তিনি তাঁকে বললেন ফারেদুনের প্রতাপ ও হোশঙ্গের  
     মাহাত্ম্যের কাহিনী,  
 তাঁকে শোনালেন ধরিত্রীর শোভা মহান মনুচেহেরের কথা।

বললেন, তাঁরা দুনিয়ার দিকে ন্যায় ও বদান্যতার দৃষ্টিতে চাইতেন,  
অত্যাচার ও জুলুম ছিল তাঁদের যুগে আঞ্চাত।  
এইভাবে ধীরে ধীরে বাদশা নওজরের প্রক্রিকে  
তিনি সুস্থিতা ও মানবিকতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।  
সামন্তদের মনোভাবকে নওজরের সপক্ষে অনয়ন করে  
তাদেরকে আনুগত্যে মজবুত ও ক্রটকর্মে লজ্জিত করলেন।  
এইভাবে সাম উদ্ধত সামন্তগণ ও বাদশার প্রতি  
তাঁর ভাষণ সম্পূর্ণ করলেন।  
তারপর নওজরের দেয় খেলাত  
তাজ, তখ্ত, অঙ্গুরীয়;  
এবৎ দাসবৃন্দ, সোনালী সাজসহ অশুদ্ধল,  
ও মুক্তা-ক্ষোদিত সুবর্ণ ভঙ্গারসহ  
সাম মাজিন্দিরানের পথে যাত্রা করলেন,  
দিক-দিগন্ত ছেঁয়ে গেলো তাঁর সৈন্যদলে।  
এরপর কিছুদিন গত হয়ে গেলো,  
নওজর দেখতে পেলেন তাঁর সুখ নেই স্বাচ্ছন্দ্যও  
তাঁর জীবনে ফিরে আসেনি।  
এইভাবে তাঁর রাজত্বের সাত বছর পূর্ণ হলে  
এক বিরাট সঙ্কটের তিনি মুখোমুখী হয়ে পড়লেন।

## পিশঙ্গ মনুচেহেরের মতুর কথা জানতে পারলেন

কালক্রমে তুরানী সৈন্যদল  
মনুচেহেরের মতুসংবাদ জানতে পেলো ।  
এই সঙ্গে নওজরের কীর্তিকলাপের কথা ও তারা  
শক্রদের মুখ থেকে অবগত হলো ।  
এই খবর যখন তুরানী সমাট পিশঙ্গের কানে গেলো  
তখন তিনি ইরান আক্রমণের মনস্ত করলেন ।  
তাঁর মনে পড়লো পিতা তুরের কথা,  
ও সেই স্মৃতি তাঁকে উত্তলা করলো ।  
মনে পড়লো মনুচেহের ও তাঁর সৈন্যদের কথা  
তাঁর সেনাপতি, অনুচরবৃন্দ ও রাজ্যের কথা ।  
পিশঙ্গ অবিলম্বে শীঘ্র রাজ্যের যশস্বী সামন্ত  
ও সেনাপতিগণকে ডাকলেন ।  
ডাকলেন আরজাস্প্ গ্রসিউজ ও বারমানকে,  
ডাকলেন ক্রুক্ষ ব্যাঘ্রসদৃশ বীর গুল্বাদকে ।  
অজয় বীর ওয়েসাকেও ডাকলেন  
যিনি ছিলেন পিশঙ্গের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি ।  
পুত্র আফ্রাসিয়াব ছিলেন বিশু-জয়ী বীর  
তাঁকেও পিশঙ্গ কাছে ডাকলেন ।  
সকল এলে পিশঙ্গ সুল্ম ও তুরের সম্বন্ধে বললেন,  
বললেন, শক্রতা আর বসনাঞ্চলে ঢেকে রাখা উচিত হবে না ।  
যুদ্ধের জন্য সবাই উন্মুখ,  
একথা কারো আজানা নয় ।  
সবাই জানে ইরানীয়গণ আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছে,  
সেই স্মৃতি সবাইকে রেখেছে উত্তেজিত করে ।  
কাজেই আমি চাই আর বিলম্ব না করে মহামতি তুরের  
ও ক্ষিপ্রগতি সুল্মের  
রক্তের প্রতিশোধে কোমর বাঁধতে ;  
আমাদের মুখমণ্ডল রক্তাপ্ত করার দিন এসেছে ।  
এ সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি,  
শীঘ্র করে আমাকে জানাও ।  
পিতার কথা শুনে আফ্রাসিয়াবের মন্তিক্ষে

উষ্ণ রক্তপ্রবাহ চক্ষল হয়ে উঠলো ।  
রসনা উন্মুক্ত করে সে পিতার সমীপবর্তী হলো —  
অন্তর তার শক্রতায় পরিপূর্ণ, কটিদেশ দৃঢ়বন্ধ ।  
সে বললো, আমি সিংহদলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রস্তুত,  
আমি ইরানীয় বীরদের সমকক্ষ ।  
যদি আমি তরবারি উন্মুক্ত করি,  
তবে দুনিয়াকে নেস্তনাবুদ না করে ছাড়বো না ।  
কটিদেশ দৃঢ়বন্ধ করে যদি আমি যুদ্ধে উদ্যত হই  
তবে ইরান দেশে কাউকে বাদশাহী করতে দিব না ।  
আফ্রাসিয়াবের বীরত্বব্যঞ্জক দীর্ঘ দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করে  
পিশঙ্গের সর্বদেহে উত্তেজনার বিদ্যুৎ খেলে গেলো ।  
তিনি দেখলেন তার সিংহ বাহু ও হস্তী-সামর্থ্য,  
দেখলেন, তার দীর্ঘ দেহের ছায়া পড়েছে যোজনব্যাপী পথ ধরে ।  
তার রসনা যেন ক্ষিপ্তম অসি চমক দিছে,  
হৃদয় তার বন্যাক্রান্ত নদী ও হস্ত বর্ষণোন্মুখ মেঘ ।  
রাজাদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসি কোষোন্মুক্ত করে  
পিশঙ্গের সৈন্যদলসহ সে ইরানের পথে যুদ্ধযাত্রা করবে ।  
পিতা যখন পুত্রকে এমনই যোগ্য দেখলেন  
তখন গর্বে তার শির উন্নীত হলো সৌরলোক পর্যন্ত ।  
মনে মনে বললেন, আমার এই পুত্রই মৃত্যুর পর  
আমার নাম রাখবে ।  
এই ভাবে বাদশা তাঁর সৈন্যদল জমায়েত করলেন,  
এবং তাদেরকে শ্ৰেণীবন্ধ করলেন সেনাপতিদের অধীনে ।  
আফ্রাসিয়াব স্থীয় অন্তর শক্রতায় পূর্ণ করে  
উত্তেজিত ভঙ্গিমায় পিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন ।  
পিশঙ্গ রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করে  
সৈন্যদের সকল সন্তান দুর্বা সজ্জিত করলেন ।  
এইভাবে যখন অভিযান প্রস্তুত হলো আগীসের ।  
তখন সহসা আবির্ভাব হলো আগীসের ।  
আগ্রীস চিঞ্চান্বিত চিষ্টে পিতার সমীপবর্তী হলেন,  
তিনি ছিলেন সুবিবেচক ও বুদ্ধিমান ।  
বললেন, হে অভিজ্ঞ পিতা,  
আপনি কেন তুরানী সৈন্যদলকে এমনভাবে জমায়েত করেছেন

যদিও আজ ইরানে মনুচেহের নেই  
তবুও সেখানে নূরীমান-পুত্র সামের মতো বীর রয়েছেন।  
গারশাস্প ও কারেনের মতো বীরবন্দে  
আজও ইরানের আসর সরগরম।  
আপনি জানেন, এইসব অভিজ্ঞ বীরবন্দের হাতে  
শিতামহ তুরের কি গতি হয়েছিল।  
যুদ্ধের কোলাহল উথিত করা এখন উচিত হবে না,  
এতে দেশের সমৃহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।  
পুত্রের উক্তির জবাবে পিশঙ্গ বললেন,  
চেয়ে দেখো আফ্রাসিয়াবের দিকে,  
এক পুরুষ-সিংহ দেখো, মৃগয়ায় উদ্যত হয়েছে,  
এক মন্ত হন্তী দেখো, সংগ্রাম-ক্ষেত্র আলোড়িত করে ফিরছে।  
যে-পৌত্র পিতামহের রক্তের প্রতিশোধে কোমর বাঁধে না  
তার কৌলীন্য সন্দেহাত্তীত নয়।  
তোমারও উচিত তার সঙ্গ দান করা  
এবং সকল অবস্থায় তাকে উপদেশ দিয়ে যাওয়া।  
আকাশে মেঘদল ভারী হলৈই  
প্রান্তর বর্ণ-প্রাচুর্যে সিঞ্চ হয়।  
যাও আজ পর্বত ও উপত্যকা হোক তোমাদের অশ্বের বিচরণ ভূমি,  
নিরঞ্জ হোক সকলের যাত্রাপথ।  
ধরিত্বী সবুজ শস্যে হেসে উঠেছে,  
সর্বত্র আজ ছাউনি পড়ুক তোমাদের সৈন্যদলের।  
গ্রাম-গ্রামান্তর অশ্ব-খুরের আঘাতে রোদন করে উঠুক,  
প্রতিহিংসার রক্তে লাল হোক দিকদিগন্তের।  
সৈন্যরা ভুলে যাক শ্যামলতা ও গোলাপের স্মৃতি,  
অনির্বাণ চিত্তে তারা গিয়ে উপস্থিত হোক আমল নামক স্থানে।  
এই স্থান থেকেই একদিন মনুচেহের  
পরিচালনা করেছিলেন তুরের প্রতি তাঁর অভিযান।  
এখান থেকেই তাঁর সৈন্যদল, ঘনঘটার মতো  
আমাদের উপর সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়েছিল।  
তোমরাও আবার সেই দৃশ্যেরই অবতারণা করবে,  
তোমরাও ঘনঘটার মতো ছেয়ে পড়বে তাদের উপর।  
তোমাদের তাড়ায় শক্র-সৈন্য পালিয়ে যাবে ইরানে,

সেখানে গিয়ে তারা আশ্রয় নিবে সিংহাসনের চতুর্পার্শ্বে।  
কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত, ইরান থেকে তারা  
নববলে বলীয়ান হয়ে ফিরে অস্তে পারবে না।  
কারণ, নওজর এক অনভিজ্ঞ তরুণ মাত্র,  
যুদ্ধবিদ্যায় সে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী নয়।  
তোমরা রণমত কারেনকে বধ করতে চেষ্টা করবে,  
ওদের সেনাপতিদের মধ্যে গারাম্বাস্পকেও নিধন করা চাই।  
ইরানের এই দুই বীরকে হত্যা করতে  
অবশ্যই তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।  
এইভাবেই তোমরা পিতামহের মৃত আত্মাকে শান্ত ও  
শক্তিদের হৃদয়ে আগুন দিতে সক্ষম হবে।  
রক্তপাগল নরপতি এইভাবে স্বীয় মনোভাব  
ব্যক্ত করে বলবেন,  
জেনে রেখো, প্রতিশোধের কামনায় নিয়ত আমার রক্ত  
টগ্বগ করে ফুটছে।

## আফ্রাসিয়াবের ইরান আক্রমণ

তৎ-প্রান্তৰ যখন (সৈন্যদলের উপস্থিতিতে) জামদানি  
শাড়ির মতো বুটাদার হয়ে উঠলো,  
তখন তুরানী সেনাধ্যক্ষ সঙ্কল্পে কোমর বাঁধলেন।  
তুর্কীস্থান ও চীন থেকে আসলো সিপাহী সান্ত্বী,  
সারা পশ্চিম দেশ রণসাজে সজ্জিত হলো।  
সেন্যদলের মধ্যভাগ ও প্রান্তসীমা দৃষ্টিগোচর হয় না,  
নওজরের ভাগ্য-শাখা বুঝি আর মুঞ্জরিত হলো না।  
পরদিন সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে  
প্রতিহিংসার অভিযানে তারা যাত্রা শুরু করলো।  
হন্তীপৃষ্ঠে বেজে উঠলো রণ-দামামা,  
ধরণী সৈন্যদলের পদধূলিতে কঢ়বর্ণ হলো।  
অভিযান যখন জেছ্বতে এসে পৌছলো  
তখন ফারেন্দুনের পৌত্র তার সংবাদ পেলেন।  
নওজর দীর্ঘকামীদের কথা শুনতে পেয়েই  
সকল বাদশাহী সৈন্য তলব করলেন।  
অবিলম্বে নিনাদিত হলো দুন্দুভি  
এবং সৈন্যদল শীঘ্ৰগতি জেছ্বুৰ পথে অভিযান করলো।  
যাত্রা শুরু হলো বাদশাহী সৈন্যদলের —  
প্রান্তৰের পর প্রান্তৰ তারা অতিক্রম করে চললো।  
গ্রাম থেকে গ্রামান্তর মহাবীর কারেনের পরিচালনায়  
সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চললো।  
সম্রাট স্বয়ং রাজ-প্রাসাদ ছেড়ে  
নগর প্রাচীরের বহির্দেশে প্রান্তৰের পথ ধরলেন।  
সম্রাট নওজরের আগে—পিছে  
সারাদেশ যুক্তের আলোচনায় মুখের হয়ে উঠলো।  
নগর-প্রান্ত অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো,  
সৈন্যদলের পদধূলিতে সূর্য ঢেকে গেছে !  
যথাস্থানে এসে নওজর যুক্তের জন্য  
সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করতে লাগলেন।  
এদিকে আফ্রাসিয়াব তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে থেকে  
দুজনকে নির্ধারিত করলেন।

শ্বাসাস ও খজরওয়ান নামক সেই দুই  
বীরের হাতে সমর্পণ করলেন একদল অশ্বারোহীকে।  
তাদের পরিচালনায় শিখ হাজার দক্ষ সিপাহী  
জালকে বাধা দিয়ে রাখার জন্য জাবুলস্তানের দিকে  
রওয়ানা হয়ে গেলো।

এমন সময় সৎবাদ এলো মহাবীর সাম  
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন,  
স্বয়ং জাল তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করছেন।  
এই সৎবাদে আফ্রাসিয়াব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন,  
তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তাঁর সৌভাগ্য সুপ্রাপ্তির মতো  
মস্তক উত্তোলন করেছে।

শীঘ্ৰগতি তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন  
ও শিবিরের যবনিকা উত্তোলন করে বাইরে এলেন।  
গণনা করে দেখা গেলো তাঁর সৈন্যদলে রয়েছে  
সৰ্বমোট চার লক্ষ সিপাহী।

তাদের কোলাহলে পৰ্বত উপত্যকা উচ্ছ্বসিত হয়েছে,  
যেন প্রাণৰ আকীর্ণ হয়েছে অসংখ্য পিপালিকা ও পঙ্গপালে।  
বাদশা নওজরের সঙ্গে রয়েছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সিপাহী,  
তারা সবাই সংগ্রাম-কুশলী বীর।

আফ্রাসিয়াব দৃষ্টিপাত করলেন স্বীয় সৈন্যবাহিনীর দিকে  
এবং রাত্রিকালে তাদের পরিদর্শনের নিমিত্ত অশ্বারোহণে  
বহিগত হলেন।

সেই রাত্রেই আফ্রাসিয়াব পিতার কাছে লিপিকা লিখে  
সবিস্তারে সকল অবস্থা অবগত করালেন।  
লিখলেন, নওজরের সৈন্য সংখ্যা গণনা করলে  
তাদেরকে আমাদের মগ্যারই উপযুক্ত বলে মনে হয়।  
দ্বিতীয়ত, সাম তাঁর বাদশার সঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন  
চিরাদিনের জন্য  
কখনো তিনি আর যুক্তে অবর্তীর্ণ হতে পারবেন না।

ইরানভূমিতে তাঁরই ভয় আমার ছিলো,  
তিনিই যদি বিগত হয়ে গেলেন, তবে আর কার ভয় ?  
জাল এখন সামের সমাধি-মন্দির নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছেন,  
এ সময় যুক্ত করার মতো মনোবল তিনি কি করে পেতে পারেন ?

আমার পূর্ণ বিশ্বাস এতক্ষণে শামাসাস  
নীমরোজের তাজ ও তথ্য অধিকার করে নিয়েছে।  
সকল কাজেই সুযোগের অন্বেষণ করতে হয়,  
সময় বুঝে বন্ধুকে দিতে হয় সদৃপদেশ।  
সময় কালে যদি মানুষ উদাসীন হয়  
তবে সুদিন তার জন্য হয় সুদূরপরাহত।  
লিপিসহ দৃত অশ্বে কষাঘাত করলো  
ও বাযুগতি পিশঙ্গ সমীপে এসে পৌছে গেলো।

## বারমান ও কোবাদের যুদ্ধঃ কোবাদের নিধন

পাহাড়ের চূড়ায় উষার আলো দেখা দেওয়া মাত্র  
একদল সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলো।  
দুই সৈন্যশিবিরের মধ্যে ছিল দুই ফরসংগ ব্যবধান,  
উভয় দলই ছিল সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধসাজে সজ্জিত।  
বারমান নামক এক তুরী বীর এই সময়  
সমস্ত ঘূমন্ত সৈন্যদের ডাক দিয়ে বললো, জাগো !  
চেয়ে দেখ বাদশা নওজরের রাজকীয় শিবির থেকে  
একদল সৈন্য এগিয়ে আসছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।  
এই বলে তুরানীয়দের অধিপতি আফ্রাসিয়াবের সমীপবর্তী হয়ে,  
সে যুদ্ধের পতাকা কামনা করলো।  
বললো, বাদশার অনুমতি নিয়ে  
আমি প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করবো।  
বারমানের কথা শুনে সাবধানী আগ্রীস বললেন,  
যদি প্রথম মোকাবেলায়ই বারমান বিনষ্ট হয়  
তবে আমাদের সামন্তদের মন ভেঙে যাবে  
ও সকল সৈন্যদের উপর তার প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ।  
কাজেই কোন একজন নামহীন সৈনিককে প্রেরণ করা হোক,  
যাতে কারো আঙ্গুলের ইশারা তার উপর পতিত না হয়।  
আগ্রীসের এই লজ্জাকর প্রস্তাব শুনে  
আফ্রাসিয়াবের ভা কুঞ্জিত হলো।  
তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বারমানকে বললেন,  
যাও, তুমি সাঁজোয়া পরে ধনুর্ধর হয়ে এসো,  
এবং শীঘ্ৰগতি প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হও ;  
আঙ্গুলের ইশারায় কিংবা মুখের কথায় কিছুই আসে যায় না।  
যথারীতি বারমান যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে  
প্রতিপক্ষের সেনাপতি কারেনকে যুদ্ধার্থ আহবান জানালো।  
বললো, নওজরের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থেকে  
কে আমার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চাও, আস !  
কারেন তখন স্বীয় সৈন্যদের দিকে চেয়ে দেখলেন  
বললেন, কে যুদ্ধার্থ এগিয়ে আসতে চাও, আস।  
যশস্বীদের মধ্যে অসম সাহসী কোবাদ ছাড়া

আর কেউ কোন প্রত্যুত্তর করলো না।  
সেনাপতি কারেন তখন ক্রোধে রক্তবর্ষ হলেন,  
আপন ভাতার যুদ্ধোৎসাহ তাঁকে উত্তেজিত করে তুললো।  
উত্তেজনায় তাঁর চোখে জল এলো,  
তিনি ক্রোধান্বিত স্বরে বললেন,  
এতজন যুবক সংগ্রামীর মধ্যে কি  
একজন বৃক্ষই যুদ্ধভূমির দিকে মুখ করলো ?  
কোবাদের জন্য কারেনের হাদয় দুঃখে ভরে উঠলো,  
তিনি ভারাক্রান্ত হাদয়ে বীরগণের উদ্দেশে রসনা উন্মুক্ত করলেন।  
ভাতাকে বললেন, অপনার বয়স বার্ধক্যের সীমাও  
অতিক্রম করেছে,

এমন সময় আপনি যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়েছেন কেন ?  
আপনার প্রতিপক্ষ বারমান একজন সুগঠিত পুরুষ  
সে যৌবনশালী ও শক্তিদণ্ড।  
সে সিংহ-সদৃশ এক বীর  
সে সগর্বে মন্ত্রক উত্তোলন করেছে সূর্যের দিকে।  
আপনি বৃক্ষ ও অশক্ত এক সম্মানিত সেনাপতি,  
সেই আপনিই কি বাদশার সম্মান রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন ?  
আপনার শুভ কেশ যদি রক্তে রঞ্জিত হয়  
তবে হতাশায় ভেঙে পড়বে আমাদের বীরগণ ;  
এই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হবে,  
এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের হাদয় পূর্ণ হবে দুঃখে।  
শুনুন, এই কথা শুনে বৃক্ষ ভাতা  
বীরবর কারেনকে জবাব দিলেন  
তিনি বললেন, এই আবর্তনশীল আকাশ  
আমাকে মহৎ প্রতিদানে ভূষিত করেছে।  
ভাতৎ, জেনে রেখো মৃত্যু অসত্য নয়,  
সে অনেক সময় সম্মানিতের শির উন্নীত করে রাখে।  
তাছাড়া যেদিন মহান মনুচেহের পরলোকগত হয়েছেন  
সেদিন থেকে আমার অন্তর বিগলিত হচ্ছে।  
এই আবর্তনশীল আকাশ কাউকে চিরজীবী পরিত্যাগ করে না,  
এই ব্যাধি সকল মৃগয়াকেই বধ করে।  
মৃত্যু কাউকে সমুন্নতি দান করে তরবারির সাহায্যে

যখন যুদ্ধরত দুই প্রতিপক্ষ একে অন্যের সম্মুখীন হয়।

তার মস্তক রাখিত হয় বর্ণালিকে,

তার দেহ তীরের ফলায় আবদ্ধ থাকে।

আবার কারো মৃত্যু হয় স্বীয় গৃহের ক্ষুদ্র শয়ায়

নীরবে, সবার চোখের অগোচরে!

ভাতৎ, এই দুনিয়া থেকে যদি প্রস্থানের সময় আমার হয়েই থাকে  
তবে আমাকে সম্মানের সঙ্গে যেতে দাও।

আমি চলে গেলে আমার প্রতি করশা করো,

আমাকে সমাহিত করো রাজকীয় সমাধির মধ্যে।

আমার মস্তক কর্পূর কস্তুরী ও গোলাপজলে সিঞ্চ করে  
সেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত করে দিয়ো।

আমাকে এইভাবে সমাহিত করে তোমার শোক পরিত্যাগ করো,  
পরম করুণাময় বিশু-প্রভুর কাছে কামনা করো

আমার আত্মার শাস্তি।

এই বলে তিনি হাতে বর্ণা তুলে নিয়ে

মস্ত হস্তীর মতো সংগ্রামে এগিয়ে গেলেন।

এবং বারমানকে সম্বোধন করে বললেন,

কে আমার সঙ্গে যুক্তে এগিয়ে আসতে চাও, আস।

স্বয়ং কাল আমাকে তোমার সঙ্গে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

বারমানকে লক্ষ্য করে কোবাদ বললেন,

মুহূর্তের জন্য আকাশ আমার প্রতি আবার করশা বদ্ধ হয়েছেন।

শক্তির বিনিময়ে মৃত্যুর কাল সমাগত,

সময় অসময় রূপান্তরিত হওয়ার মুহূর্ত এসে গেছে।

এই বলে আর কালবিলম্ব না করে

তিনি তাঁর কালো অশু সামনের দিকে প্রধাবিত করলেন।

এই সময় রাত্রির অঙ্ককার অপসারিত করে

সূর্য পতিত করলো তার শুভ দীপ্তি।

বারমান তার বিজয় পরিগতির দিকে

সবেগে ধাবিত হলো।

প্রচণ্ড বীর্যে এক বর্ণা নিক্ষেপ করে

সে কোবাদের কাটিদেশ সম্পূর্ণরূপে বিন্দ করে দিলো।

সিংহ-হৃদয় বৃক্ষ সেনাপতি সেই আঘাতে

মুখ থুবড়ে ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

বারমান বিজয়গর্বে উৎকুল্পন হয়ে  
আফ্রাসিয়াবের সমীপে ফিরে এসে গ্রহণ করলো  
তাঁর হাত থেকে এক মহামূল্য রত্ন উপহার —  
যে রত্ন পাওয়ার কল্পনাও কেউ কখনো করেনি।  
রাজকীয় ইই উপহার দেখে সকল সৈন্য বিস্ময়ে হতবাক হলো,  
আফ্রাসিয়াব তাকে আরো দিলেন কুণ্ডল, কঠহার  
ও স্বর্ণময় কটিবন্ধ।

এমন ভূষণ ও শিরস্ত্রাণ কোন সৈনিক  
কোন রাজার হাত থেকে লাভ করেনি কখনো।  
কোবাদ নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই  
সেনাপতি কারেন সৈন্যদলসহ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।  
দুই প্রতিপক্ষ দুটি সাগরের মতো পরম্পরের মুখোমুখী হলো,  
তাদের পদপাতে ধরণী যেন প্রকস্পিত হয়ে উঠলো।

কারেন প্রতিহিংসায় মন্ত হয়ে  
বিরাটবপু গরসিউজের দিকে সবেগে ধাবিত হলেন।  
গরসিউজও সৈন্যদল সহ সগর্বে  
কারেনের সম্মুখীন হলো।  
অশুর হ্রেষায় ও সাত্রীদলের পদধূলিতে সূর্য ঢেকে গেলো।  
তরবারি সকল হীরকের মতো চমক দিতে লাগলো,  
বর্ণাফলকে ছুটলো রক্তের ধারা।  
মেঘপুঞ্জে উজ্জীয়মান চিলের মতো  
আকাশে চললো অবিরাম শরবর্যণ।  
রণ-দামামার বজ্রধনিতে মেঘদল গলিত হয়ে ঝরতে লাগলো,  
তরবারি সমূহে সঞ্চার হলো প্রমত প্রাণের।

কারেন যেদিকেই ধাবিত করেন তাঁর অশু  
সে দিকেই ইস্পাতের ফলায় বিদ্যুৎ খেলতে লাগলো।  
মনে হলো যেন চতুর্দিকে ঝরছে অসংখ্য হীরা ও সূর্যকান্ত মণি,

সূর্যকান্ত মণি নয়, অযুত ধরায় ঝরছে স্বয়ং

প্রতিহিংসামত প্রাণের প্রবাহ।

আফ্রাসিয়াব কারেনের শৌর্য প্রত্যক্ষ করে  
সৈন্যদলসহ নিজেই তাঁর দিকে অশু প্রধাবিত করলেন।  
পার্শ্ব পর্বতশ্রেণী রাত্রির ছায়া প্রসারিত করা পর্যন্ত  
চললো সেই ভীষণ জীবন-মরণ সংগ্রাম।

যথা সময়ে সূর্য তার নীল-বাস পরিধান করলে  
কৃষ্ণকায় রাত্রি এসে তাকে গোপন করে ফেললো  
লোকচক্ষুর অন্তরালে ।

সারা দুনিয়া যেন শয়তানের মুখের মতো কালো হয়ে এলো,  
আকাশে লিকলিকিয়ে উঠলো কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্ত সাপ ।  
এইভাবে ধরণী রাত্রির অঙ্ককারে সম্পূর্ণ ছেয়ে গেলে  
বীরপ্রবর কারেন তুরানী-সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে ছাড়া পেলেন ।  
উভয়পক্ষের সৈন্যদল শ্রান্তকুস্ত ও ভগ্ন হাদয়ে  
নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাগত হলো ।

তুরানী পক্ষে হত হলো অসংখ্য সিপাহী,  
ইরানীদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলো ।  
কারেন স্বীয় সৈন্যদলসহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে  
ফিরে এলেন নিজ শিবিরে ।

তাঁকে দেখতে পেয়ে নওজরের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা ঝরলো,  
সেই ধারার যেন বিরাম নেই ।  
তিনি বললেন, মহামতি সামের মৃত্যুতেও  
হাদয় আমার এত শোকাভিভূত হয়নি ;  
কোবাদের জীবন-সূর্য অন্তগত হওয়ায়  
মনে যে দৃঢ় পেলাম তার তুলনা নেই ।

জগতের রীতিই যেন এই :  
একদিন যদি সুখের, তবে অন্যদিন হয় দুঃখের হাহাকারে পরিপূর্ণ ।  
তাই প্রতিপালন ও প্রতিপোষণ ছাড়া গত্যন্তর নেই,  
কারণ, এই দুনিয়ার একদিকে যেমন গোরের নির্জনতা  
অন্যদিকে তেমনি দোলনার কোলাহল ।

কারেন সম্মাটকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,  
যে মুহূর্তে জন্ম নিয়েছি সেই মুহূর্তেই প্রাণকে সঁপে দিয়েছি  
মৃত্যুর হাতে ।

মহামতি ফারেদুন আমার শিরে স্থাপন করেছিলেন এই শিরস্ত্রাণ,  
সেদিন থেকেই এরজের প্রতিহিস্মায় উদ্যত হয়েছিলাম ।  
এখনও আমার কঠিবন্ধ আমি শিথিল করিনি,  
এখনও পরিত্যাগ করিনি ইস্পাত-কঠিন আমার তরবারি ।  
হে বাদশা, শাস্ত হোন, আজকের যুদ্ধে আমি  
পিশঙ্গ-পুত্রকে কোণঠাসা করে দিয়েছিলাম !

যখন তার সৈন্যবাহিনীর একটি দলকে প্রায় নির্মূল করার  
মতো করে এনেছি,  
তখন তারা সাহায্য কামনা করেছে অন্য একদলের।  
আমাকে গোমুখাঙ্কিত প্রহরণ-হাতে দেখতে পেয়ে  
পিশঙ্গ-পুত্র সবেগে ধাবিত হয়েছিলেন আমার দিকে।  
আমি তৎক্ষণাত এগিয়ে গিয়েছিলাম তার দিকে  
তারপর দুজনে একেবারে মুখোমুখী এসে উপস্থিত হয়েছিলাম।  
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেলো অশ্বের ঝঝনা,  
যেন কোন এক জাদুবলে চোখের সামনে রঞ্জের ঢেউ জেগে  
উঠলো।  
ক্রমে নেমে এলো রাত্রির অঙ্ককার,  
আঘাতে আঘাতে আমার বাহু প্রায় শিথিল হয়ে এলো।  
মনে হলো যেন কালের প্রান্তসীমায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি,  
মেঘদলের নীচে দিয়ে বাতাস বইতে শুরু করেছে।  
এই সময় অগত্যা ক্ষান্ত হতে হলো যুদ্ধ থেকে,  
কারণ রাত্রির অঙ্ককার তখন ঘন হয়ে নেমে এসেছে ধরণীর উপর।

## নওজরের সঙ্গে আফ্রাসিয়াবের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ

রাত্রি তার কালো রেশমী পরিধেয় উল্লেচিত করার সঙ্গে সঙ্গে  
সূর্য আলোর প্রতিবিম্বনে উল্টাসিত করে দিল ধরিত্রীর বক্ষ।  
নক্ষত্রপতি আকাশের ঘবনিকা ভেদ করে  
একটি সোনালী কিরণ নিক্ষেপ করলেন তাঁর জ্যোতির সঞ্চয় থেকে।  
ইরানীয়গণ কেয়ানী যুদ্ধ-রীতি অনুযায়ী  
রচনা করলো সৈন্যবৃহ।  
বেজে উঠলো দুন্দুভি, নিনাদিত হলো তৃৰ্য  
ধরণী প্রকল্পিত হলো তাদের আওয়াজে।  
আফ্রাসিয়াব ইরানীদের যুদ্ধসংজ্ঞা দেখে  
শক্রদের মুখোমুখী স্বীয় ব্যুহ রচনা করলেন।  
অশুরোহীদের পদধূলিতে  
অসময়ে সূর্য তাঁর মুখ ঢাকলেন।  
দেখতে দেখতে উভয় পক্ষের সৈন্যদলে  
পর্বত-প্রান্তর ছেয়ে গেল।  
একে—অন্যকে চেপে ধরলো সংগ্রামের মন্ততায়  
খুনের নদী বয়ে চললো দুর্বার গতিতে।  
কারেনের চারদিকে সৈন্যদলের মধ্যে  
ঝরতে লাগলো শোণিতের ধারা।  
যেখানেই আফ্রাসিয়াব রচনা করছেন ব্যুহ  
সেখানেই তাঁর চারদিকে বয়ে যাচ্ছে লহর দরিয়া।  
সর্বশেষে নওজরের নিয়তি তাঁকে সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থল থেকে  
প্রতিহিংসা—পরায়ণ আফ্রাসিয়াবের মুখোমুখী নিয়ে এলো।  
প্রহত হলো বর্ণার মুখে বর্ণা,  
তীরের ফলার সঙ্গে তীরের ফলার সংঘর্ষে উৎক্ষিপ্ত হলো অগ্নি।  
এইভাবে উভয়ের মধ্যে চললো এক ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা—  
দুনিয়ার শ্মৃতির সঞ্চয়ে যার তুলনা নেই।  
ক্রমে রাত্রির অঙ্ককার পরিব্যাপ্ত করে চললো দিগ্ধিদিক,  
পিশঙ্গ—পুত্র বাদশার উপর শক্তির প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হলো।  
ইরানীয়দের পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হলো ও যুদ্ধের গতি  
চলে গেল নওজরের প্রতিকূলে।

পরাঞ্জুখ বাদশা নতমন্তকে  
স্থীয় শিবিরের দিকে প্রত্যাবত হলেন।  
নওজরের মন দৃঢ়খে ও হতাশায় ভেঙে খান খয়ে গেল,  
মনে হলো তার রাজমুকুট যেন দুর্ভাগ্যসূচক এক নক্ষত্রের ইঙ্গিতে  
ধূলায় বিলুষ্ঠিত হচ্ছে।

যুদ্ধবিরতির ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর

তূসকে সম্মানীপে ডাকা হলো।

তুস ও গুণ্ঠাহাম\* এসে উপস্থিত হলে দেখা শেল  
তাঁদের হৃদয় শোকাভিভূত ও মুখে বেদনাসূচক ধ্বনি।

সম্মাট বললেন, আমার মনে আজ অপরিসীম দৃঢ়খ,  
আমার ভাষণ ও রোদন আজ একাকার হয়ে গেছে।

নিবিড় মনোবেদনায় বাদশার মনে পড়লো

সৌভাগ্যশালী পিতার অস্তিম উপদেশগুলি।

তিনি বলেছিলেন, চীন ও তুর্কীস্তানের দিক থেকে

এক সৈন্যবাহিনী ইরানভূমি অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করবে।

তাদের থেকে তোমার জীবনে দুর্ঘটনার উৎপত্তি হবে,  
সেই সৈন্যবাহিনী তোমার অস্তরে হানবে শোকের আঘাত।

পরলোকগত বাদশার সেই কথা আজ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে,  
পরম দুর্দিন আজ দ্বারে সমাগত।

তুরানীয়গণ যখন আজ যুদ্ধে আহ্বান জানায়

তখন এ পক্ষ থেকে যশস্বীদের নাম আর সরবে ঘোষিত হয়নি।

কাজেই তোমাদেরকে এখন পারস্যের পথে রওয়ানা

হয়ে যেতে হবে,

সেখান থেকে চলে যেতে হবে আলবুর্জ পাহাড়ের দিকে।

সৈন্যদের চলাচলের পথ থেকে সরে যেতে হবে তোমাদেরকে,

এমন কি নিজেদের সৈন্যসামন্ত থেকেও আত্মগোপন করতে হবে।  
তোমাদের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হচ্ছে,

তোমাদের অসহায় অবস্থার জন্য নিজেকে আরো অসহায়  
বোধ হচ্ছে।

তোমরা ফারেদুনের বংশোদ্ধৃত দুই আত্মা,

অসংখ্য আসর থেকে এখন তোমরা বিদায় গ্রহণ করো।

\* সম্মাট নওজরের দুই পুত্রের নাম।

জানি না, তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হয় কি না,  
আজকের এই দেখাই শেষ দেখা কি না জানি না।  
সর্বদা সংবাদ অবহিত থাকতে চেষ্টা করো,  
অতন্ত্রভাবে দুনিয়ার ঘটনাদি সম্পর্কে খবর রেখো।  
যদি দুঃসংবাদ পাও যে,  
সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তগত হয়েছে,  
তবে তার জন্য দৃঃখ্যে আত্মহারা হয়ো না,  
কারণ, উন্নত আকাশের আবর্তন এমনি করেই হয়।  
কাল একজনকে মাটিতে পতিত করে,  
অন্যজনের শিরে পরায় রাজকীয় তাজ।  
পরাজিত ও মৃত দুয়ের অবস্থায়ই এক —  
পরাজিত যে সেও তো কিছুক্ষণ ছটফট করে অবশেষে শান্তই  
হয়ে যায়।

সাবধানতার সঙ্গে আমার এই উপদেশগুলি স্মরণে রেখো,  
সুসময় যখন আসবে তখনই কেবল প্রসারিত করো রাজকীয় বাহু।  
এই বলে সত্যটি দুই পুত্রকে বাহুবেষ্টনে বুকে ধারণ করলেন,  
তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা নির্গত হতে লাগলো।  
তৎপর তৃস ও গুস্তাহাম এবং নওজর পরম্পর বিছিন্ন হলেন,  
তাঁদের চোখে অশুর বন্যা, অন্তরে দৃঃখ্যের জ্বালা।

## আফ্রাসিয়াবের সঙ্গে নওজরের ত্তীয়বার যুদ্ধ

সৈন্যগণ দুইদিন বিশ্বাম নেওয়ার পর  
ত্তীয় দিনের উষা যখন পূর্বে মস্তক উত্তোলন করলো,  
বাদশা তখন আর বিলম্ব না করে  
অগত্যা যুদ্ধের আয়োজন করলেন !  
আফ্রাসিয়াব নব উদ্বীপনায় নওজরের দিকে  
সৈন্য পরিচালনা করলেন।  
বাদশার শিবিরেও রণহস্তারসহ  
নিনাদিত হলো রণবাদ্য ও দুন্দুভি।  
অভিযান নির্গত হলো বাদশার,—  
তিনি স্থীয় মস্তকে তুলে নিলেন লৌহ-শিরস্ত্রাণ।  
ওদিকে আফ্রাসিয়াবের পক্ষে সৈন্যগণ  
তরবারি ও যাবতীয় যুদ্ধান্তে সজ্জিত হয়ে বহিগত হলো।  
ধরণী এক পর্বতের পাদদেশ থেকে অন্য পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত  
সুরক্ষিত হলো তনুগ্রাণে,  
সৈন্যদল আগুয়ান হলো গুরুভার প্রহরণ নিয়ে।  
পর্বত উপত্যকা ডুবিয়ে দিয়ে সৈন্যের ঢল নামলো,  
যেন এক নদীতীর থেকে অন্য নদীতীর পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া  
হয়েছে একই আস্তরণ।  
এদিকে কারেন রচনা করলেন তাঁর ব্যুহ,  
সম্মাটকে কেন্দ্র করে রচিত হলো কেয়ানী-সৈন্যসজ্জা।  
সম্মাটের বাম পার্শ্বে রাইলেন বীর তলীমান,  
সেনাপতি শাপুর সম্মাটের দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করে রাইলেন।  
এইভাবে মহাবীর আফ্রাসিয়াবের অভিযুক্তে  
শাহী সৈন্যদল সিংহের মতো অগ্রসর হলো।  
আফ্রাসিয়াবের বাম পার্শ্বে স্থাপন করা হলো বারমানকে,  
মধ্যভাগ যেন লৌহ প্রাচীরে দুর্ভেদ্য হয়ে রাইলো।  
দক্ষিণ পার্শ্বে বিপুল-কায় গার্সিউজ  
পর্বতের সামনে পর্বত-দীর্ঘকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।  
এইভাবে দুই প্রতিপক্ষ পরম্পরের মুখোমুখী হতেই  
বেজে উঠলো রণবাদ্য ও কাড়া-নাকাড়া।

এই সময় সূর্য রাত্রির যবনিকা ছিন্ন করে দিনের  
 গুম্বুজের উপর আসীন হয়েছেন,  
 পর্বত-উপত্যকা উচ্ছ্঵সিত হয়ে উঠেছে আলোর বন্যায়।  
 সৈন্যদল উত্তোলিত করেছে তরবারি — যেন প্রাণের এক  
 আঙ্গুত আত্মপ্রকাশ,  
 ধরণী অশুদ্ধলের পদাঘাতে আহত হয়ে যেন  
 রোদন করে চলেছে।  
 তারপর আফ্রাসিয়াবের সৈন্যদলের বর্ণ-ছায়ায়  
 যখন ছায়াছন্ন হয়েছে ধরণীতল,  
 তখন পরাজয় দ্রুত সম্ভাটের দিকে ধাবিত হলো।  
 শাহী পক্ষের দুর্ভাগ্যের অঙ্ককার  
 তুরানীদের বিজয়-চিৎকারে নিবিড়তর হয়ে এলো।  
 দেখা গেল, শাপুরের দিকে যে সৈন্যদল ছিল  
 তারা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।  
 অবশেষে শাপুর নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
 ইরানীয়দের ভাগ্যও অস্তগত হওয়ার উপক্রম করলো।  
 ইরানী সৈন্যদলের নাম করা পালোয়ানগণ  
 কেউ হত কেউ বা আহত হয়ে পড়লেন।  
 কাবৈন ও বাদশা স্বয়ং এই দৃশ্য দেখে বুকলেন  
 এই যুক্তে তাঁদের ভাগ্যতারা বিমুখ,  
 তাঁরা তখন বিজয়-উৎফুল্ল তুরানী সৈন্যদের পেছনে ফেলে  
 দহিস্তানহঁ\* সীম শিবিরের দিকে মুখ করলেন।  
 দহিস্তানের দুর্গ ছিল শক্ত প্রাচীরে সুরক্ষিত ;  
 সামান্য কিছু সৈন্যসহ তাঁরা সেই দুর্গে আশ্রয় নিলেন।  
 বাদশাহী সৈন্য ততক্ষণে অধিকাঙ্গই নানাপথে পলায়নপর হয়েছে  
 মাত্র কতিপয় সিপাহী এসে মিলিত হলো বাদশার সঙ্গে।  
 এদিকে আফ্রাসিয়াব সময় নষ্ট না করে রাত্রিকালেই  
 এই অশুরোহীদল সঞ্জিত করলেন,  
 এবং সেনাপতিদের মধ্যে থেকে  
 ওয়েসা-পুত্র কারুখানকে বাছাই করে নিলেন।

\* প্রাচীন ইরানের এক নগরীর নাম

ଆଦେଶ ହଲୋ, ସୈନ୍ୟଦଲସହ ଅରଣ୍ୟ-ପଥେ  
ପାରିଶ୍ୱେର ଦିକେ ଯାତ୍ରା କରତେ ହବେ ।  
କାରେନ ଆଫ୍ରାସିଯାବେର ଏହି ନୈଶ ଅଭିଧାନେର କଥା ଜାନତେ ପୈଯେ  
ଦୁଚିଷ୍ଟାୟ ଅଧୀର ହୟେ ଅବିଲମ୍ବେ ନେଇରେ ସମୀକ୍ଷା  
ଏମେ ଉପଶ୍ରିତ ହଲେନ ।

ବଲଲେନ, ତୁରାନୀୟଗଣ ପ୍ରତିହିଂସାୟ ମତ ହୟେ  
ଇରାନେର ଦିକେ ମୁଁ କରେଛେ ।  
ତୁରାନ-ରାଜ ପଲାଯନପର ସୈନ୍ୟଦେର ପୈଛନେ  
ଏକ ସୈନ୍ୟଦଲ ପାଠିଯେ ଦିଯେଛେ ।  
ଆମାଦେର ଗୃହ ସାହି ତାରା ଅଧିକାର କରେ ବସେ  
ତବେ ବଲ୍ଲ ସିପାହୀ ହତ ହୟେ ପଡ଼ବେ ।  
ଆମାଦେର ପରିବାର-ପରିଜନେର ଉପର ତାରା  
କରବେ ବୀଭତ୍ସ ଅତ୍ୟାଚାର,

ସୁତରାଂ ଆମାକେ ଏଖନଇ ଯାତ୍ରା କରତେ ହୟ ।  
ମହାମାନ୍ୟ ବାଦଶାର ଆଦେଶ ପେଲେ  
ଆମି ଏହି ଅମଙ୍ଗଳକାମୀ ତୁର୍କିଦେର ପିଛୁ ଧାଓୟା କରତେ ପାରି ।  
ଆପନି ଏହି ଦୁଗେହି ଅବଶ୍ଵନ କରନ୍,  
ଏଥାନେ ଆପନାର ପାନାହାରେ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଓ ଆପନାର  
ଆଦେଶେର ଅପେକ୍ଷାୟ ଏକଦଲ ସୈନ୍ୟଓ ରହିଲେ ।

ମନେ କୋନ ଦୁଃଖ କିଂବା ଦୁଚିଷ୍ଟା ଶ୍ଵାନ ଦିବେନ ନା,  
ପରିଶାମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆପନାର ଜୟ ହବେ ।  
ଆପନି ସିଂହର ମତୋଇ ଏଥାନେ ଅବଶ୍ଵନ କରନ୍,  
ସ୍ୟାଟଦେର ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ଯେ ସିଂହ-ହଦୟ ତାଇ ଆପନାର ଜନ୍ୟ କାମ୍ଯ ହୋଇ ।  
ଆମି ସୈନ୍ୟଦଲସହ କାରୁଧାନେର ପୈଛନେ  
ଜ୍ୟାମୁକ୍ତ ତୀରେର ମତୋ ଧାବମାନ ହବୋ ।  
କାରେନେର କଥା ଶୁଣେ ନେଇର ବଲଲେନ,  
ଆପନାର ଅଭିମତ ଯୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ନୟ ।  
ଯେ-ସୈନ୍ୟ ଏଥାନେ ରଯେଛେ  
ତା ଦିଯେ ଆପନି କୋନ ବାହିନୀ ସଞ୍ଜିତ କରତେ ପାରବେନ ନା ।  
ଶୁଭତାମ୍ଭ ଓ ତୁମ ରଣସଜ୍ଜାର ଆୟୋଜନ କରତେ ଗେଛେ  
ତାରା ଫିରେ ଏଲେ ଯଥାରୀତି ଯୁଦ୍ଧ ହବେ ।  
ଏହି ବଲେ ସତ୍ରାଟ୍ ସେନାପତିଦେର ନିଯେ ପାନାହାରେ ରତ ହଲେନ,  
କିଛୁକ୍ଷଣେର ଜନ୍ୟ ଶୋକ ଭୁଲେ ଥାକାର ଏହି ବ୍ୟବଶ୍ଵାଇ କରତେ ହଲୋ ।

সুরার মাদকতায় সম্মাটের মস্তিষ্ক উত্তেজিত হলে  
তিনি শিবিরের যবনিকা উত্তোলিত করার আদেশ দিলেন।  
ইয়ানের অশুরোহী সিপাহীগণ তখন  
শিবির ছেড়ে দলে দলে বাইরে এসে ঢাঁড়ালো।  
কারেন কানুখানের পেছনে ধাবমান হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হলেন,  
তাঁর দুই চোখে যেন বসন্তের বারিধারা বইলো।  
তাঁর মুখে ছুটলো কথার তুবড়ি  
বাণিজ্যায় তিনি অনুপম।  
বললেন, আমাকে পারস্যে যেতেই হবে  
এ ছাড়া অন্য কোন সুষ্ঠু অভিমত চিন্তার বাইরে।  
যদি ইরানী সৈনিকদের পরিবারস্থ মহিলাগণ  
শক্রদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েন  
যদি আমাদের স্ত্রী-পুত্র তুরানীদের করতলগত হয়  
তবে আন্তরে অহঃহ বিন্দ হবে তীরের ফলা।  
এ-সময়ে বর্ণা হাতে ময়দানের পথ ধরাই যুক্তিযুক্তি,  
নিশ্চিন্তে বসে থাকার সময় এ হতেই পারে না।  
কারেনের এই অভিমতের প্রতি সমর্থন জানালেন  
শেদ্ওশ ও কৃশ্যাদা নামক দুই সামন্ত।  
রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতিবাহিত হলে  
বীরগণ যুক্তসাজে সজ্জিত হলেন।  
কারেন নিজের জন্য নিলেন  
একদল বাছা বাছা সৈন্য।  
মনে অসহ্য বেদনার ভার নিয়ে কারেন  
রাত্রি থাকতে থাকতেই সুপেদ নামক দুর্গের সন্নিকটবর্তী হলেন।  
এই দুর্গে গাজ্দহাম নামক এক ইরানীয় দুর্গাধিপতি  
সদাজ্ঞাগ্রত বীরগণের সঙ্গে অবস্থন করতেন।  
কারেন সহসা দেখলেন, এই দুর্গের পথ আগলে বসে আছে  
দুষ্ট বারমান তার হস্তীযুথ ও সৈন্যদল নিয়ে।  
প্রথমত, কারেন এই দৃশ্য দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন,  
কিন্তু পরক্ষণেই তাঁকে স্বীয় আতার শোমিত-প্রতিশোধের  
সঙ্কল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হলো।  
কালবিলম্ব না করে তিনি যুদ্ধের সাজ পরে  
স্বীয় সৈন্যদের প্রস্তুত করে নিলেন।

তারপর বারমানকে বামে রেখে  
সোজা পারস্যের পথ ধরলেন।  
বারমান কারেনের উপস্থিতি জানতে পেয়ে  
ভৱিত গতিতে এসে তাঁর সম্মুখীন হলো।  
তার এই ক্ষিপ্রগতিতে  
কারেনের চোখে শোণিত ধারা উচ্ছাসিত হওয়ার  
দৃশ্য জেগে উঠলো।  
বারমান সিংহের মতো কারেনের দিকে ধাবিত হলেন,  
তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন পথই নেই।  
কারেনও ভৱিত গতিতে তার দিকে ফিরে  
বিশ্ব-প্রভুকে স্মরণ করলেন।  
এবং বারমানের দিকে এমন এক অব্যর্থ বর্ণ নিষ্কেপ করলেন যে,  
একই আঘাতে তার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেলো।  
অশৃপ্ত থেকে বারমান নতমন্তকে গাড়িয়ে পড়লেন মাটিতে,  
উদিত সূর্যের আলো তাঁর চোখে অঙ্ককার হয়ে এলো।  
তাঁর সৈন্যদলের মধ্যেও নেমে এলো হতাশা,  
একে একে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে ইতঃন্তত ছাড়িয়ে পড়লো  
সেনাপতি করেন তখন স্বীয় সৈন্যদলসহ  
দ্রুত পারস্যের অভিমুখে ধাবিত হয়ে চললেন।

## আফ্রাসিয়াবের হাতে নওজুর বন্দী হলেন

নওজুর কারেনের সফলতার সংবাদ পেয়ে  
দ্রুত তাঁর পশ্চাতে পারস্যের দিকে রওয়ানা হলেন।  
দেখতে দেখতে দিনাবসান হয়ে এলো,  
কিন্তু আকাশ আবর্তিত হলো তাঁর দুর্ভাগ্যের লগ্ন অভিমুখে।  
আফ্রাসিয়াব নওজুরের চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে  
দ্রুত বনপথে এগিয়ে চললেন।

এক দুর্বার সৈন্যবাহিনী নিয়ে  
সিংহের মতো নওজুরের পেছনে তিনি ধাবিত হলেন।

বাদশার পশ্চাতে খুব নিকটবর্তী এসে  
তিনি তাঁকে যুদ্ধার্থ আহ্বান জানালেন।

এই সময় রাত্রির অঙ্ককার অপসারিত করে সূর্য উঠেছে,  
আফ্রাসিয়াব নওজুরের মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন।

দেখতে দেখতে অশুরোহীদের পদধূলিতে আকাশ  
আবার অঙ্ককার হলো,

যুক্তের পরিণাম হলো নওজুরের বন্দীত্ব।

বাদশা স্বয়ং ও তাঁর সঙ্গী দুই হাজার সিপাহী

নিজেদেরকে শক্রের হাতে অসহায় বোধ করলেন।

সৈন্যদের অনেকেই তখন চারদিকে পালাতে চেষ্টা করছে  
কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপদ্ভালে তাদেরকেও আটকা পড়তে হলো।

এইভাবে সকল সৈন্য বন্দী হয়ে

আনীত হলো বাদশা আফ্রাসিয়াবের সম্মুখে।

আফ্রাসিয়াব বললেন, ভাগ্য আজ আপনার অনুকূল নয়,  
তাই সে আর আপনাকে পালাবার অনুমতি দিবে না!

এই ভাগ্যই আপনাকে দিয়েছিল তাজ, তখ্ত ও সম্মতি,  
আজ সে দিছে আপনাকে অঙ্ককার ও অবনতি।

এখন আপনি অবস্থান করুন শক্রদের মধ্যে,  
কখনো ভালো কখনো মন্দ ব্যবহার আপনি লাভ করবেন  
এদের হ্যাত থেকে।

এই দুনিয়া এক সুন্দর বাজিকর,  
প্রতি মুহূর্তে সে নতুন নতুন খেলা দেখিয়ে যাচ্ছে।

হৃদয়কে আবক্ষ করো না তুমি এর সঙ্গে,

এর উপর স্থাপন করো না কোন আস্থা ।  
তোমার শির যদি চিরদিন সুষণ ও কীর্তির উপাধানে  
শয়ন করেও থাকে,  
তবু জেনে রেখো পরিণাম তার মৃত্তিকা ।  
একজনকে সে অতল থেকে উথিত করে চন্দ্রলোকে,  
অন্যজনকে চন্দ্রলোক থেকে নামিয়ে আনে নিম্নভূমিতে ।

অতঃপর আফ্রাসিয়াব তাঁর সৈন্যদের আহ্বান করে বললেন,  
পর্বত, বন্দর, বন-জঙ্গল ও জলপথ  
সর্বত্র খুঁজে কারেনকে ধরে আনো  
সে যেন কিছুতেই রেছাই না পায় ।  
সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ সংগ্রামকামীকে  
যেখান থেকেই পার জীবিত কি মৃত আমার সামনে নিয়ে এসো ।  
কিন্তু যখন আফ্রাসিয়াব শুনলেন যে, সে আগেই  
পারস্যের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে,  
তখন বললেন, বারমানকে খবর দাও ।  
সে যেন সত্ত্বর তার পেছনে ধাওয়া করে  
তাকে বন্দী করে এখানে নিয়ে আসে ।  
সৈন্যগণ তখন জানালো, কারেন কিভাবে  
বারমানকে ইতিপূর্বেই হত্যা করেছে ।  
এই সংবাদ শুনে আফ্রাসিয়াব অত্যন্ত শোকাভিভূত হলেন,  
আহার, নিদ্রা ও শ্রান্তি সব তাঁর কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠলো ।  
তিনি যশস্বী ওয়েসাকে সম্মোধন করে বললেন,  
আপনি পুত্রের মৃত্যুতে ভেঙে না পড়ে মনকে দৃঢ় করুন ।  
এক নির্ধারিত সৈন্যদলসহ এখনই পুত্রের শোশিত প্রতিশোধার্থে,  
সতর্কতার সঙ্গে অভিযান করুন ।

## ওয়েসা স্বীয় পুত্রকে হত দেখতে পেলেন

যশস্বী সেনাপতি ওয়েসা  
তুরানী সৈন্যদলসহ সম্মুখ্যাতা করলেন।  
তিনি কারেনের সমীপে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই  
পথে প্রিয় পুত্রের কর্তৃত শির দেখতে পেলেন।  
দেখলেন, তুরানীয় ঝাণা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে,  
রণদামামা নীরব ও সেনাপতি রক্তশয্যায় শায়িত।  
তুরানী বীরগণের দেহও অগমিত সংখ্যায়  
তার সঙ্গে ইতৎস্ত ছড়িয়ে আছে।  
এই দৃশ্য দেখে ওয়েসা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন,  
তাঁর হৃদয় শোকে বিদীর্ঘ হয়ে গেল।  
তাঁর চক্ষু থেকে নির্গত হলো উষ্ণ অশ্রুর ধারা,  
ভগ্নহৃদয়ে তিনি কারেনের পশ্চাদ্বাবনের মনস্থ করলেন।  
কালবিলম্ব না করে তুরানীয় বীর সিপাহীগণ  
কারেনের পশ্চাদ্বাওয়া করে যাত্রা শুরু করলো।  
কারেন ওয়েসার আগমনের সংবাদ পেয়ে  
বিজয়োৎসাহে তার দিকে ফিরে দাঢ়ালেন  
ও দ্রুতগতিতে অশ্বারোহী সৈন্যদলসহ  
নীমরোজের দিকে মুখ করলেন।  
পুত্রের শোকে অধীর ওয়েসা  
অবিরত এগিয়ে চলেছেন পারস্যের পথে।  
কারেন উপত্যকা-পথে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে  
বাম দিকে দেখতে পেলেন অশ্বারোহী সৈন্যের পদতাঢ়িত  
ধূলি-মেষ ;  
শীঘ্রই ধূলিরাশি অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুরানীয় ঝাণা  
দৃষ্টিগোচর হলো,  
সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে দেখা গেলো তুরানীয় সেনাপতিকে।  
দুই পক্ষই বুহ রচনা করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো,  
দুই পক্ষের বীরগণই উত্থিত করলো রণধৰনি।  
কারেন চেয়ে দেখলেন, তুরানী সৈন্যগণের সঙ্গে রয়েছে  
ইরানীয় বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম।

ইরানীয়দের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে এ দেখেই কারেন  
বুঝতে পারলেন, ইরানের সুদিনের অবসান নিকটতর।

ইরানের সিংহাসন আজ  
পিশক্ষ-পুত্রের করতলগত হতে চলেছে।

সহসা সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে ওয়েসা চিংকার করে বললেন,  
তোমাদের তাজ, তথ্ত ও মাহাত্ম্য বিনষ্ট হয়েছে।

কনৌজ থেকে কাবুলস্তান এবং  
সেখান থেকে জাবুলস্তানের সিংহদ্বার পর্যন্ত

সর্বত্র আমাদের অধিকার —

সকল রাজপ্রাসাদে অক্ষিত হয়ে গেছে আমাদের সিংহাসনের চিত্র।

কোথায় তুমি শান্তি পাবে বলে মনে করো,

তোমাদের বাদশা বন্দী হওয়ার পর আর কোথায় আশ্রয়  
পাবে বলে আশা করো ?

ওয়েসার এই কথা শুনে কারেন বললেন, চুপ করো, সকলে যায়নি।  
ভাগ্য যদি সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকে, কর্ম নিরুদ্ধ নয়,

দৃঢ়, শোক কিংবা দুর্ক্ষিতা নিষ্কল।

আকাশের আবর্তন তোমার সুদিনকে  
অবশ্যই কর্তৃত করে দিবে।

বাদশাহ নওজর যদি বন্দী হয়ে থাকেন,  
তবে মনে রেখো, আবর্তনশীল আকাশ আজ বৃথা  
আবর্তিত হবে না।

তোমার জন্য আজ দুর্দিন —

মহসুম দুর্দিন আজ তোমার ভাগ্যে লিখিত আছে।

এই কথা শুনে প্রতিহিংসাপরায়ণ ওয়েসা বললেন,

তোমাদের হাত থেকে চলে গেছে রাজ্য, ধন ও সিংহাসন।

ধরিত্ব ও কাল উভয়েই তোমার বাদশার দুশ্মন,

তোমাদের জাগ্রত ভাগ্য চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

জবাবে কারেন বললেন, আমার নাম কারেন,

আমি প্রবাহিত জলমোতে নিক্ষেপ করি উত্তরীয়।\*

\* উত্তরীয় জলমোতে নিক্ষেপ করা অর্থাৎ মরণপণ করা। এখানে কারেন অলোর্বিক ক্ষমতার দাবি স্বত্বাবকে জয় করার কথাও বলছেন।

আমি ভয়ে প্রস্থানপর হই না, ভাষণেও আমি প্রভাবিত নই,  
আমি সংগ্রামেরই আকাঙ্ক্ষায় তোমার পুত্রের সম্মুখীন হয়েছিলাম।  
সেই প্রতিহিস্সা থেকে হৃদয়-মন পবিত্র করতে না করতেই  
তোমার সঙ্গে আমাকে আবার যুক্তে প্রবৃত্ত হতে হলো।  
প্রাণ লুষ্ঠনকারী এক দস্তুর হাত  
আমি আজ তোমাকে প্রদর্শন করাবো।  
এই বলে তিনি অশুদ্ধল সম্মুখের দিকে ধাবিত করলেন,  
ও রণদামামায় আঘাত করার আদেশ দিলেন।  
দক্ষিণ ও বাম চারদিক থেকে উঠিত হলো ধূলিরাশি,  
তাতে ঢেকে গেলো চন্দ্রসূর্য।  
এক পক্ষ অন্য পক্ষকে সংজোরে চেপে ধরলো,  
চারদিকে প্রবাহিত হতে লাগলো রক্তের নদী।  
কারেন ওয়েসাকে লক্ষ্য করে নিষ্কেপ করলেন বর্ণ  
ওয়েসা ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।  
সংগ্রামী তুরানীগণকে দলে দলে হত হতে দেখে  
ওয়েসা ভয় ও দুর্চিন্তায় বিমৃঢ় হয়ে পড়লেন।  
রণে ভঙ্গ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন তিনি,  
ভাগ্যহৃত ওয়েসার পক্ষান্বাবনের ইচ্ছা কারেন মন থেকে  
দূর করে দিলেন।  
ওয়েসা পুত্রশোকে অধীর হয়ে অশুসজল চোখে  
আফ্রাসিয়াবের সমীপে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।

## শমাসাস ও খজরওয়ানের জাবুলস্তান অভিমুখে যাত্রা

এক সৈন্যদল আর্মান\* শহর থেকে  
প্রতিহিংসায় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে জাবুলস্তানের পথে যাত্রা করলো।  
শমাসাস সৈই সৈন্যদল নিয়ে জেঁছ অতিক্রম করে  
সীস্তানের অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন।  
খজরওয়ান তলোয়ারধারী ত্রিশ হাজার  
তুর্কী বীরবন্দসহ চলেছেন অন্য পথে।  
তাঁরা যাত্রা অব্যাহত রেখে অতি সতর্কতার সঙ্গে  
সফলভাবে হীরমন্দে\*\* এসে উপনীত হলেন।  
এই সময় জাল শোকাভিভূত অন্তর নিয়ে  
গোরাবায়\*\*\* সামের সমাধি নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছেন।  
রাজধানীতে আছেন বীরবর মেহরাব —  
জ্ঞানী, অতন্ত্র ও বুদ্ধিমান।  
যথাসময়ে এক দৃত মেহরাবের সমীপ থেকে  
এগিয়ে গেলো শমাসাসের শিবির অভিমুখে।  
দৃত শমাসাসের দরবারে উপনীত হয়ে  
মেহরাবের অসংখ্য শুভকামনা নিবেদন করে বললো,  
মেহরাব বলেছেন, তুরানী সিপাহীদের অধিপতি  
রাজমুকুট শিরে টিরজীবী হোন।  
আমি স্বনামধন্য জোহাকের বৎশোস্তুত,  
এই রাজ্য—সিংহাসনে আমি মোটেই সুখী নই।  
কেবল প্রাণের দায়ে এই সম্বন্ধে আমি কেয়ানীদের সঙ্গে  
আবদ্ধ রয়েছি,  
কারণ, এ ছাড়া আর কোন উপায় আমার ছিল না।  
এখন এই রাজ্য ও সারা জাবুলস্তান  
আমার জন্য সরাইখানার তুল্য।  
বর্তমানে জাল শোকাভিভূত অন্তর নিয়ে  
সামের সমাধি নির্মাণে নিরত।  
তাঁর এই শোক আমার আনন্দের হেতু হয়েছে,

\* আর্মেনিয়া।  
\*\* নীমরোজ রাজ্যের অন্তর্গত এক নদীবন্দর।  
\*\*\* সাম. জাল ও কন্দমের পারিবারিক গোরস্তান।

প্রার্থনা করি, তাঁর মুখ যেন আমাকে দেখতে না হয়।  
আমি সেনাপতির কাছে কিছুদিনের সময় চাই,  
যাতে আমি মহাবীর আফ্রাসিয়াবের সমীপে  
একজন বুদ্ধিমান দৃতকে  
বায়ুগতি অশুসহ প্রেরণ করতে পারি।  
তিনি আমার অস্তরাস্তি আকাশক্ষার কথা জানতে পারলে  
দূতের আর বেশী কিছু বলার থাকবে না।  
বর্তমানে আমার কাছে তাঁর উপযুক্ত উপটোকন  
যা আছে তা পাঠিয়ে দিছি।  
পরে সমস্ত রাজ্যই তাঁর পায়ে উৎসর্গ করে  
আমার অস্তরের কামনা পূর্ণ করবো।  
বীরবরের মনোরঞ্জনের জন্য  
আমি সর্বরকম উপটোকনই প্রেরণ করছি।  
আনুগত্যসূচক এই উপহার পেয়ে  
আশা করি তিনি তাঁর সহায়তার হস্ত আমার দিকে  
প্রসারিত করবেন।  
এদিকে এক অশ্বারোহী দৃতকে জাল-সমীপে  
পাঠাবার ব্যবস্থা করে  
মেহরাব তাকে বললেন, তুমি অশু প্রধাবিত করে উড়ীয়মান হও।  
এবং স্বচক্ষে যা দেখে গেলে তা জালের কাছে বর্ণনা করে  
জানাও যে, শক্র গৃহের দ্বারে সমাগত।  
ভীমদশন তুর্কী সৈন্যদলসহ দুই সেনাপতি  
যুদ্ধার্থ এখানে আগমন করেছে।  
হীরমন্দ পর্যন্ত তারা পৌছে গেছে,  
উৎকোচ দিয়ে তাদেরকে আমি সেখানেই নিরস্ত করে রেখেছি।  
দৃত মেহরাবের এই বার্তা নিয়ে  
অগ্নি গোলকের মতো গিয়ে জালের সমীপে উপস্থিত হলো।

## মেহরাবের সহায়তায় জালের উপস্থিতি

জাল সংবাদ পাওয়া মাত্র  
ঘোড়ায় জিন পরাবার আদেশ দিলেন।  
এবং যুদ্ধক্ষুর এক সেনাদলসহ তৎক্ষণাত্  
মেহরাবের অভিমুখে যাত্রা করলেন।  
দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত চলে  
অবশ্যে তিনি এসে মিলিত হলেন মেহরাবের সঙ্গে।  
মেহরাব তাঁরই প্রতীক্ষায় কাল যাপন করছেন —  
তিনি যেন প্রতিভা ও সুবিচেচনার জ্ঞলস্ত প্রতিমুর্তি।  
মনে মনে জাল বললেন, প্রতিপক্ষের এই সৈন্যদল  
এবং খজর্ওয়ানের মতো বীর আমার সামনে কিছু নয়।  
তবে এখন তিনি নগরাভিমুখে  
যাওয়ারই মনস্ত করলেন।

নগরীতে পৌছে তিনি মেহরাবকে জানালেন যে,  
তিনি যা করেছেন সবই অত্যন্ত বৃদ্ধিমত্তার পরিচালক।  
তারপর বললেন, আমি এখন রাত্রির অঙ্ককারে আত্মগোপন করে  
যথাসময়ে সেখান থেকে আমার শোণিতপিপাসু হস্ত  
প্রসারিত করবো।

শক্রদল কেবল তখনই আমার অবস্থান জানতে পারবে  
যখন আমি প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবো।  
এই বলে তিনি বাহুতে তুলে নিলেন এক বিশাল কার্যুক  
এবং তাতে সংযোজিত করলেন বৃক্ষকাণ্ড সদৃশ এক তীর।  
শক্র সৈন্য কোথায় আছে তা অবহিত হওয়ার জন্য  
জাল সেই তীর নিষ্কিপ্ত করলেন আকাশে।  
তিনি দিকে তিনটি তীর নিষ্কিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
চারদিক থেকে উথিত হলো বিপুল কোলাহল।  
তারপর রাত্রি গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সমবেত করে  
তিনি শরবর্ষণে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেন।  
শক্রদল বলাবলি শুরু করলো,  
এই শরবর্ষণ জালের সমীপ থেকেই হচ্ছে।  
শমাসাস তখন খজর্ওয়ানকে সম্বোধন করে বললেন,

বন্ধু, বৃথা এই যুক্ত।  
এই যুক্তে মেহরাব, ধন-সম্পদ ও সৈন্যদল  
সব আমরা হারাব।  
খজরওয়ান জ্বাবে বললেন, ভয় করো না,  
জাল মানুষ বৈ নয়।  
সে লোহ নির্মিত নয়,  
সে দেব কিংবা দৈত্যজাতও নয়।  
তুমি ভয় পেয়ো না,  
দেখো, এখনি আমি তাকে পরাজিত করছি।  
তাকে আমি কখনো অশ্বের উপর জীবিত বসে থাকতে দিব না,  
সকল ইরানীয় সৈন্যকেও আমি বধ করবো।

সূর্য আকাশ-অলিঙ্গে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
ময়দানে রণভেরী বেজে উঠলো।  
নগর-অভ্যন্তরেও নিনাদিত হলো কাংস্য ঘণ্টা  
ও হিন্দুস্তানী রংগদামামা।  
জাল যুক্তসাজে সজ্জিত হয়ে  
বাড়ের বেগে যুক্তক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন।  
তাঁর সৈন্যরাও অশুশ্রাপ্তে আরোহণ করে  
প্রতিহিংসার মন্ততায় ঝু কুঞ্জিত করে এগিয়ে এলো।  
এগিয়ে চললো অভিযান ময়দানের দিকে,  
বহিগর্ত হলো হস্তীবাহিনী শিবির-সীমা অতিক্রান্ত করে।  
দুই প্রতিদুন্দু সৈন্যদল পরম্পরের মুখোমুখী সারি বেঁধে  
দাঁড়িয়ে গেলো,  
বৈরনির্যাতন বাসনায় স্ফুরিত হলো তাদের ওষ্ঠাধর।  
খজরওয়ান এক বিরাট মুষল ও ঢাল চর্ম হাতে  
জালকে আক্রমণ করলেন।  
সেই মুষল দুরা তিনি জালের বর্ষে আঘাত করলেন,  
যশস্বীর বর্ষ সেই আঘাতে দীর্ঘ হয়ে গেলো।  
এইবার জাবুলস্তানের অধিপতিকে ক্রোধোন্মত দেখে  
কাবুল সৈন্যদল সবেগে ধাবিত হলো।  
জাল বাহু প্রসারিত করে  
সিংহের মতো খজরওয়ানের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হাতে তাঁর পিতার সেই নামকরা প্রহরণ,  
ক্রোধ ও উদ্বীপনায় তিনি টগবগ করে ফুটছেন।  
খজরওয়ানও অনুরাপ উদ্বীপনায়  
গর্জনরত ব্যাষ্টের মতো অগ্রসর হলেন।

জাল তাঁর অশ্ব উত্তেজিত করার সঙ্গে সঙ্গে উড়লো যুদ্ধের ধূলি,  
খজরওয়ানও সঙ্গে সঙ্গে তুললেন তার চারদিকে ধূলির ঝড়।  
খজরওয়ান তার মুষল উদ্যত করে  
জালের মুখের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এই সময় জাল ক্ষিপ্তহস্তে তার মস্তকে হানলেন  
গোমুখ-চিহ্নিত প্রহরণের আঘাত,  
সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছসিত রক্তের ধারায় মৃত্তিকা  
ব্যাষ্টচর্মের মতো অনুরঞ্জিত হয়ে উঠলো।

খজরওয়ানকে নিহত করে জাল  
যুদ্ধক্ষেত্রের উন্মুক্ত স্থানে এসে দাঁড়ালেন।  
শমাসাসকে ডাক দিকে বললেন, বেরিয়ে এসো,  
কিন্তু শমাসাস ভয়ে অগ্রসর হলেন না।

এই সময় জাল অপর এক তুরানী সেনাপতি গুলবাদকে  
হাতের কাছে পেয়ে তাকে আঘাত করলেন।  
প্রহরণধারী জালকে এই বেশে দেখে  
তলোয়ারধারী শক্রসৈন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে লাগলো।  
শমাসাস স্বয়ং পলায়নপর হলেন ও তাঁর সঙ্গে  
অন্যান্য বীরগণও ইতৎস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন।

এইবার জাল হাতে তুলে নিলেন ধনুক  
ও শরজালে চারদিক আচ্ছন্ন করে দিলেন।  
একটি তীর গিয়ে বিন্দ হলো সেনাপতি গুলবাদের বক্ষে  
এই দৃশ্যে সৈন্যদের উৎসাহ একেবারেই ভেঙে গেলো।  
দুই সেনাপতির এই নিধন প্রত্যক্ষ করে  
ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো শমাসাসের মুখমণ্ডল।  
তিনি আর কালবিলম্ব না করে  
সৈন্যদলসহ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।  
যুদ্ধ জয়ের পর ইরানী সৈন্যদল  
জাবুলস্তান ও কাবুলস্তানের অধিপতির সমীক্ষে  
এসে জড়ে হতে লাগলো।

হত শক্রসৈন্যের দেহে যুদ্ধক্ষেত্র এমন আকীর্ণ হয়ে উঠেছিল যে,  
সৈন্যদলের চলাফেরায় বিস্তৃ উপস্থিত হলো ।  
এদিকে ভগ্নোদ্যম তুরানী সৈন্যদলকে নিয়ে  
শমাসাস দীর্ঘ হাদয়ে ফিরে চললেন তুরান-অধিপতির সমীপে ।  
যাত্রাপথে শমাসাস বনভূমিতে পা রাখতেই দেখা গেলো  
তারা কারেনের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে ।  
ইতিপূর্বে ওয়েসার সৈন্যবাহিনীকে অপমানিত  
ও তার বীরবৃন্দকে বধ করে  
সহসা কারেনও দেখলেন  
তিনি শমাসাসের সৈন্যদলের মুখোমুখী হয়ে পড়েছেন ।  
কারেন তাদেরকে দেখেই চিনতে পারলেন  
এবং বুঝতে পারলেন কি জন্য তারা জাবুলস্তান থেকে  
এমনভাবে ফিরে আসছে !  
সঙ্গে সঙ্গে রণবাদ্য বেজে উঠলো  
ও দুই প্রতিপক্ষ পরম্পরের মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো ।  
কারেন তাঁর বীর সিপাহীদের ডেকে বললেন,  
হে শুন্ধচিত্ত বীর সেনানীগণ,  
তোমরা বর্ণা উদ্যত করে  
সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়ো ।  
সৈন্যগণ সেনাপতির ডাকে বর্ণা হাতে নিয়ে  
মন্ত হস্তীর মতো শক্রসৈন্যের দিকে অগ্রসর হলো ।  
বর্ণাফলকে আকাশ বেগুনের মতো কণ্টকিত হয়ে উঠলো,  
তাদের ছায়ায় ঢেকে গোলো চন্দ্ৰ সূর্য ।  
ভৌষণ যুদ্ধে তুরীয়া সৈন্য বিনষ্ট হতে লাগলো,  
বহু হতাহত হলো ও অবশিষ্ট রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নপুর হলো ।  
এইভাবে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ অপমানিত ও পরাজিত করে  
সেনাপতি কারেন উষ্ট্রাসিত সূর্যালোকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন ।  
এদিকে শমাসাস কতিপয় হতাবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে  
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রাণ বাঁচালেন ।

## আফ্রাসিয়াবের হাতে নওজরের নিধন

তুর্কদের অধিপতির কাছে সংবাদ পৌছলো যে,  
নামকরা বীরগণ নিহত হয়ে গেছেন।  
আফ্রাসিয়াব এই সংবাদে অত্যন্ত ব্যথা পেলেন,  
তাঁর দুই গণ বেয়ে হাদয়-রক্ত যেন ঝরে পড়তে লাগলো।  
তিনি বললেন, এদিকে নওজর জিন্দানখানায় দিব্যি বসে আছে,  
আর ওদিকে আমার বন্ধুগণ যুদ্ধে নিহত হচ্ছেন।  
কোথায় নওজর? — তাকে নিয়ে এসো,  
ওয়েসার শোণিতের প্রতিশোধ আমি তার উপর নেব।  
জল্লাদের উপর আদেশ হলো, তাকে নিয়ে এসো,  
যুদ্ধের স্বাদ আমি তাকে আস্বাদন করাবো।  
নওজর এই খবর শুনে বুঝলেন,  
তাঁর জীবনের দিন শেষ হয়ে এসেছে।  
সৈন্যগণ আফ্রাসিয়াবের এই আদেশ শুনে  
কলরব কোলাহলে পথ মুখরিত করে নওজরের অভিমুখে  
রওয়ানা হলো।

যথাসময়ে সিপাহীগণ নওজরের দুই হাত শক্ত করে বৈধে  
তাঁকে টেনে নক্রসদৃশ আফ্রাসিয়াবের কাছে নিয়ে এলো।  
নিয়ে এলো তাঁকে তাঁর শিবির থেকে উন্মুক্ত এক প্রান্তরে  
নগু-শির নগু-পদ ও অপমানিত অবস্থায়।  
আফ্রাসিয়াব বাদশা নওজরের উপর  
নিক্ষেপ করলেন এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।  
দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই  
আফ্রাসিয়াব স্বীয় পিতামহদের স্মৃতি নিজের মধ্যে উদ্দীপিত  
করে বললেন,  
সমস্ত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার লগু এসেছে,  
এই বলে ক্রোধান্বিত মৃত্তিতে তিনি টেনে নিলেন তরবারি।  
এবং বাদশাহ নওজরের গ্রীবাদেশে তার দ্বারা আঘাত করলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে বাদশার শির দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে  
মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।  
এইভাবে মহামতি বাদশা মনুচেহরের উত্তরপুরুষ  
বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

ইরান বঞ্চিত হয়ে পড়লো রাজমুকুট ও সিংহাসন থেকে।  
ওগো বুদ্ধিমান জনগণ,  
লোভ ও স্বার্থপ্রতার জামা কখনো পরিধান করো না !  
তোমরা দেখেছ অনেক সিংহাসন ও রাজমুকুট,  
কিন্তু সেসব কি কাউকে শাস্তি ও স্বষ্টি দিতে পেরেছে কখনো ?  
এই নিম্নমুখী ধরিত্বীর কাছ থেকে কি তোমরা আশা করো ?  
সে বার বার তোমার কাছে প্রত্যাবৃত্ত হবে দৃঢ় ও হতাশার  
উপটোকণ নিয়ে।

অন্যান্য ইরানী কয়েদীকেও অপমানিত অবস্থায় বৈধে আনা হলো  
তারা প্রাণভিক্ষা চাইল তুরান-অধিপতির কাছে।  
এই দৃশ্য দেখে বুদ্ধিমান আগ্রীস  
করুণায় অভিসিঞ্চ হয়ে বললেন,  
তোমরা কি এতগুলি নিরপরাধ ব্যক্তির শির  
বাদশার আদেশে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাও ?  
এই বীর সিপাহীগণে বর্মপরিহিত অবস্থায়  
তুর্কীসৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবর্তীণ নয়।  
এরা যে বন্দী, — বন্দীকে হত্যা করা মহস্ত নয়,  
তোমরা কি মহস্তকে নীচতার মধ্যে বিসর্জন দিতে চাও ?  
এদেরকে বন্দীদশায় নিরাপদে  
রেখে দেওয়াই তোমাদের কর্তব্য।  
আমি এদের জন্য নির্দিষ্ট করলাম জিন্দানখানা,  
ও সতর্ক পাহারাদারগণকে এদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করলাম।  
এইভাবে বন্দীদের রোদনের প্রত্যুষের  
আগ্রীস তাদের দান করলেন প্রাণ।  
অতঃপর চীন ও তুর্কীস্তানের অধিপতি  
স্বীয় সৈন্যদের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে  
তুরান থেকে ইরানে এসে উপস্থিত হলেন  
ও স্বীয় রাজাঙ্গুরীয়ের প্রভাবাধীন করে নিলেন সারা দেশ।  
তুলে নিলেন তিনি কেয়ানী তাজ মাথার উপরে,  
এবং রাজানুগ্রহ বর্ষণের ছলে খুলে দিলেন রাজভাণ্ডার।  
এইভাবে হাদয়মন ঈর্ষ্যা ও প্রতিহিংসায় পূর্ণ করে  
তিনি অধিষ্ঠিত হলেন ইরানের সিংহাসনে।

## নওজরের মৃত্যু সম্পর্কে জালের অভিহিতি

গুস্তাহাম ও তুসের কাছে খবর পৌছলো যে,  
বাদশাহীর গৌরব-সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।  
তরবারির আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে সম্মাটকে,  
এবং এইভাবে ভাগ্য বিমুখ হয়েছে ইরানের প্রতি।  
শোকে তাঁরা স্থীয় কেশ আকর্ষণ করতে লাগলেন ও মণিত  
করলেন শুঙ্গরাজি,  
গোটা ইরানদেশ থেকে উত্থিত হলো হায় হায় ধ্বনি।  
পরাক্রান্ত সামন্তগণ শোকে তাঁদের শির ধূলিলিপ্ত করলেন,  
চোখ থেকে প্রবাহিত করলেন শোণিত ও বক্ষবাস  
বিদীর্ণ করলেন।

এইভাবে শোকে অধীর হয়ে তাঁরা জাবুলস্তানের দিকে  
রওয়ানা হলেন —  
মুখে তাঁদের বাদশার গুণগান ও অন্তর তাঁদের বিবহে ছিন্নভিন্ন।  
তাঁরা বলতে লাগলেন, আহা বদান্য বাদশা মহাবীর নওজর  
রাজন্যবর্গের প্রধান ও পৃথিবীর অধিপতি,  
তোমার উন্নত শির আজ ধূলায় লুটাচ্ছে,  
তোমার রাজকীয় শোণিত উপ্ত হয়েছে ধরণীতলে।  
শুষ্ক কাশবনও আজ রোদন করছে তোমার জন্য,  
লাজে অপমানে সূর্য তার মুখ নীচু করে দিয়েছে।  
আমরা এই শোণিতের প্রতিশোধ চাই, তাই রোদন করছি,  
আমরা আমাদের পিতার মৃত্যুতে হয়েছি শোকাভিভূত।  
ফারেদুনের বৎশ তাঁরই দুরা জীবিত ছিল,  
তাঁরই অশ্বারোহীদের অধীনস্থ ছিল ধরণী।  
হায়, কি নির্মমভাবে অপমানিত অবস্থায় তাঁর শির বিছিন্ন করা  
হয়েছে দেহ থেকে,

এবং সেই সঙ্গে তাঁর সহযোগীদেরকেও।  
আমাদের সমস্ত তরবারি আজ প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষায় বিষ-সিক্ত করেছি,  
দুশমনদের শিরশেছেনের বাসনা নিয়ে আমরা নির্গত হয়েছি গৃহ থেকে।  
তোমরাও প্রতিহিংসার সকল্প নিয়ে পরিধান করো বর্ম,  
তোমরাও উদ্দীপিত হও পুরাতন শক্রতার স্মৃতি বক্ষে নিয়ে।

অবশ্যই আকাশ আমাদের সঙ্গে শোকরত,  
 তার চক্ষু থেকে বরে পড়ছে সহানুভূতির শোণিতাঙ্গ।  
 তোমরাও তোমাদের চক্ষু সিঞ্জ করো শোণিতের ধারায়,  
 বিশ্বাস্তির পরিধেয় ছিন্ন করে দূর করো দেহ থেকে।  
 এইভাবে সকলই শোকাবেগে রোদন করতে লাগলো,  
 যেন উত্তপ্ত আগনে সবাই জুলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।  
 জাল টেনে ছিড়ে ফেললেন তাঁর বক্ষবাস,  
 এবং মাটিতে বসে রোদন করতে লাগলেন।  
 পরে বললেন, উন্মুক্ত করলাম আমার এই সুতীক্ষ্ণ তরবারি,  
 প্রলয় দিবস পর্যন্ত তা কোষবদ্ধ হবে না।  
 আমার যে বর্ম আমার সিংহাসন তলে রাখিত আছে  
 তার এবং বর্ণার ছায়ায় আমি নেব বিশ্বাস।  
 ঘোড়ার রেকাব হবে আমার পায়ের অবস্থানভূমি,  
 কৃষ্ণবর্ণ লোহ-শিরস্ত্রাণ হবে রাজমুকুট।  
 প্রতিহিংসার সঙ্কল্পে অটল থেকে দূর করবো আমি  
     বিশ্বাস্তি ও নিদ্রা,  
 বাদশার জন্য আমার চোখ থেকে অবিরত ঝরবে অক্ষুধারা।  
 পরলোকগত সম্মাটের অমর আত্মা,  
 সকল সামন্ত ও সেনাপতির চোখে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করবে।  
 তোমরা বিশ্বস্তার দানে  
 হৃদয়মন উজ্জীবিত করো।  
 মাত্রগৰ্ভ থেকেই আমরা মৃত্যু সঙ্গে করে এনেছি,  
 আমরা গ্রীবা অবনত করে রেখেছি বিশ্ব-স্পষ্টার  
     আদেশের কাছে।  
 এইভাবে বীরগণ উত্তেজিত চিত্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন,  
 এই সংবাদ যথাসময়ে সারীতে\* গিয়ে পৌছলো।  
 তারা শুনলো যে, ইরানীয়গণ মুদ্রার্থ এগিয়ে আসছে,  
 চারদিক থেকে তারা হাঁকিয়ে দিয়েছে তাদের অশু।  
 তারা অসংখ্য সৈন্য জমায়েত করেছে  
 এবং শাস্তি ও বিশ্বাস বিস্মৃত হয়েছে।  
 জাল এই সৈন্যবাহিনীর মনে উন্দীপনার সৃষ্টি করেছেন,  
 এবং বীরগণের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন আশার আবেগ।

\* প্রাচীন ইরানের প্রদেশ বিশেষ।

ইরানের সকল অঞ্চল থেকেই বেরিয়ে আসছে সৈন্য ও যুদ্ধ-সামগ্ৰী,  
প্রত্যেক নগৰীতে উজ্জীৱ হয়েছে কেয়ানী ঝাণ্ডা।  
তারা সবাইকে দান করছে ধন ও তাদের গায়ে  
তুলে দিচ্ছে যুদ্ধের সাজ,  
বীরগণের কোলাহলে মুখিৰিত হয়ে উঠেছে ধৰিত্ৰী।  
এই সংবাদ শুনে বন্দী ইরানী সেনাপতিগণের আহার নিৰ্দা  
বন্ধ হয়ে গেলো,  
তারা আফ্রাসিয়াবের সমীপ থেকে একমাত্ৰ ভীতি ছাড়া  
আৱ কিছুই প্ৰত্যক্ষ কৰে না  
তাই তারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান আগ্ৰীসেৱ শৱণাপন্ন হয়ে বললো,  
হে জ্ঞান ও শুভ-সঙ্কল্প রাজা,  
আমৰা সবাই আপনার আজ্ঞানুবৰ্তী,  
আপনারই আজ্ঞায় আমৰা আজো জীবিত রয়েছি।  
আপনি জানেন জাল জাবুলস্তানের অধিপতি,  
এবং তার সঙ্গে রয়েছেন কাবুলেৱ রাজা ;  
তাঁদেৱ সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছেন  
কাৰেন, খাৰ্দা ও কুশওয়াদেৱ মতো বীৱাগ্ৰগণ্যগণ।  
তাছাড়া আৰো অসংখ্য বীৱ আজ উদ্যত,  
এমন পৱিপূৰ্ণ উখান ইৱান আৱ দেখেনি।  
এৱা সকলে নওজৱেৱ হত্যার প্ৰতিশোধে  
সংগ্ৰামে ঝাঁপিয়ে পড়বে।  
এই সংবাদে আফ্রাসিয়াৰ উত্তেজিত হয়ে  
আমাদেৱ উপৱ প্ৰতিশোধ গ্ৰহণে তৎপৱ হবেন।  
এক এক কৱে আমাদেৱ নিৰপৱাধ শিৱ  
কৰ্ত্তিত কৱে তিনি তাৰ রাজকীয় সাধ মেটাবেন।  
যদি সুবিবেচক আগ্ৰীসেৱ মন সিঙ্ক হয় সমবেদনায়  
তবে মুক্ত কৱন আমাদেৱকে বন্দীহৰে দশা থেকে।  
আমৰা দেশেৱ সৰ্বত্র ছড়িয়ে পড়ে  
সামন্তগণকে বুঝিয়ে বলবো।  
দলপতিগণেৱ কাছে আপনার প্ৰশংসা কৱবো,  
বিশু-স্বষ্টাৰ সমীপে নিবেদন কৱবো মিনতি।  
বন্দীদেৱ কথা শুনে সুবিবেচক আগ্ৰীস বললেন,  
এমন কৱা বুদ্ধিমানেৱ কাজ হবে না।

কারণ তাহলে অনর্থক আমার দিক থেকে শক্রতা প্রকাশ পাবে  
 ও তার ফলে আফ্রাসিয়াবের দেমাগ হবে উত্তোজিত।  
 বরং আমি অন্য উপায় করছি  
 যার ফলে ভাই আমার উপর রাগ করতে পারবেন না।  
 যদি জাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই হয়ে থাকেন  
 তবে তিনি এক বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবেন।  
 সেই বাহিনী যখন সারীর সমীপবর্তী হবে  
 তখন তোমাদের সবাইকে আমরা মুক্ত করে দিব।  
 এবং সেই সঙ্গে আমল\* শূন্য করে দিয়ে  
 যুদ্ধ থেকে নিরত হবো।  
 বন্দী ইরানীয় যৌদ্ধাগণ আগ্রাসের কথা শুনে  
 শুক্রায় শির অবনত করলেন।  
 এবং তাঁদের মধ্যে একজন  
 সারী অভিযুক্ত প্রধারিত করলেন অশু  
 যথাসময়ে সেই অশুরোহী জালের সমীপে এসে  
 বন্দী ইরানীয়গণের পক্ষ থেকে প্রদান করলেন বাণী।  
 বললেন, ওহে আমাদের দলপতি,  
 আগ্রাস আমাদের প্রাণ দান করে আমাদের বন্ধু হয়েছেন।  
 এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় আমরা আবন্ধ হয়েছি  
 ও তাঁর প্রতি জানিয়েছি আনুগত্য।  
 জাল যদি ইরান থেকে যুদ্ধ যাত্রা করে  
 তুরানীয় সৈন্যদের সম্মুখীন হন,  
 তবে মহামতি আগ্রাস সম্প্রানে  
 আমল অঞ্চল শূন্য করে চলে যাবেন।  
 এই শর্তে আমরা সবাই  
 আজদাহারণী আফ্রাসিয়াবের হাত থেকে মুক্তির আশা করছি।  
 জাল তখন স্বপক্ষের বীরগণকে  
 ডেকে বন্দী ইরানীয় বীরগণের শর্ত তাদের অবগত করালেন।  
 তারপর তাদের সম্বোধন করে বললেন, হে বন্ধুগণ,  
 আপনারা সবাই বীর ও মহারথী।  
 আপনাদের মধ্যে কে  
 সূর্যালোকিত প্রান্তরে শির উচু করে দাঁড়াবেন?

---

\* ইরানের অঞ্চল বিশেষের নাম।

বীরগণের মধ্যে থেকে উঠে দৌড়ালেন কুশওয়াদ,  
বললেন, বঙ্গগ, অনুমতি দিলে আমি যুক্তে যাবো।  
জাল তাঁকে সাধুবাদ দিয়ে বললেন,  
আপনি সুখী হোন, শূভ হোক এই বর্ষ মাস।  
কুশওয়াদের অধীনে এক বাহিনী যথাসময়ে  
জাবুলস্তান থেকে আমল অভিমুখে যাত্রা করলো।  
দুই মঞ্জিল পথ অতিক্রম করার পরই  
শুভ-সঙ্কল্প আগ্রীস সংবাদ পেলেন।  
সঙ্গে সঙ্গে তিনি দামামা নিনাদিত করে  
সৈন্যদল ও বন্দী বীরগণসহ সারী অভিমুখে

রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কুশওয়াদ কৃতিত্বের সঙ্গে সারী উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
বন্দী বীরগণ শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে দূরে দেখা দিলেন।

তাঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে একটি করে অশু,  
শর্ত মতো বিজয়ী বেশে কুশওয়াদ আমল থেকে

জাবুলস্তানের দিকে যাত্রা করলেন।

জাল যখন সংবাদ পেলেন যে,  
কৃতকার্য হয়ে কুশওয়াদ ফিরে এসেছেন ;  
তখন তিনি এক নিষ্কলুষ ধনভাণ্ডার দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করলেন  
ও সংবাদদাতাকে দান করলেন স্বীয় মূল্যবান পরিধেয়।

কুশওয়াদ জাবুলস্তানের নিকটবর্তী হতেই

জাল স্বয়ং তাঁর প্রত্যুদ্গমনের জন্য এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে দেখেই বন্দীগণ দীর্ঘক্ষণ ধরে রোদন করলো,  
বললো, কিভাবে তারা বাঘের পাঞ্চায় এতকাল বন্দী রয়েছে।

তারপর মহামতি নওজরের কথা বলে

তারা স্বীয় মন্তকে ধূলি নিষ্কেপ করে বহুক্ষণ রোদন করলো।

অতঃপর নগরীতে প্রবেশ করে বীরগণ

সজ্জিত করলো উন্নত প্রাসাদগুলিকে।

মনে হলো যেন সম্মাট নওজরের কাল ফিরে এসেছে,

ইরান আবার স্ব-সত্ত্বায় পেয়েছে তাজ তখ্ত ও সামন্তবৃন্দ।

জাল এমন সম্পদ ও সামগ্রী আহরণ করলেন যে,

সৈন্যদল তাতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্পু হয়ে উঠলো।

## ভাত্তহস্তে আগ্রীসের নিধন

আগ্রীস আমল থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে  
আফ্রাসিয়াব তাঁর কার্যকলাপের খবর পেলেন।  
তিনি ভাইকে ডেকে বললেন, তুমি একি করেছ ?  
অম্বতের সঙ্গে তুমি কি তগুল মিশিয়েছ ?  
আমি কি আদেশ করিনি, এদেরকে হত্যা করো,  
এদের একজন যেন জীবিত না থাকে তার তদারক তুমি করো ?  
যুদ্ধকামী ব্যক্তি কখনো সহানুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করে না,  
সংগ্রামক্ষেত্রে সৌজন্যের কোন দাম নেই।  
যুদ্ধরত সৈনিক নিজেকে বিবেচনার হাতে সমর্পণ করে না,  
প্রতিহিংসাকে কারুণ্যের সঙ্গে একত্র করে দেখে না কেউ !  
আফ্রাসিয়াবের কথার জবাবে আগ্রীস বললেন,  
আপনার শিরস্ত্রাণ লজ্জায় অবনত হওয়া উচিত।  
সিংহাসনকে যদি আপনি মনে করে থাকেন আপনার পুঁজি,  
তবে বিশু-প্রভুকে ভয় করুন ও মানুষের উপর অত্যাচার থেকে  
নিরত হোন।  
কারণ, তাজ এবং তখ্ত অনেক আপনি দেখেছেন,  
কিন্তু বলুন তো, এগুলোকে কেউ বশ্যতা স্থীকার  
করাতে পেরেছে কখনো ?  
যদি আপনি সুবিচারের পথ অবলম্বন করেন  
তবে, হে যশপ্রার্থী, সকলে আপনার সফলতা কামনা করবে।  
অন্যায়কারী দৈত্যের হাত থেকে যদি মৃক্ষি পেতে চান,  
তবে কল্যাণকর কর্ম প্রকটিত করুন দুনিয়ায়।  
ছোট বড় কারো পক্ষে অত্যাচারের পথ প্রশংস্ত নয়।  
আকাশের হাত অন্যায়ের উপর অত্যন্ত নির্মম,  
যদি জ্ঞানী হয়ে থাকুন তবে অনুসরণ করুন মঙ্গলের পথ।  
ভালো করলে ভালোই আপনি ফিরে পাবেন,  
মন্দ মন্দ হয়েই প্রত্যাগত হবে আপনার কাছে।  
আফ্রাসিয়াব এই কথার কোন জবাবই দিলেন না।  
বরং তিনি উষ্ণ হয়ে উঠলেন ভাইয়ের উপদেশে,  
শয়তানের উত্পন্ন মস্তিষ্ক জ্ঞানের মুখ্যামূর্খী এসে দাঁঢ়ালো।

আফ্রাসিয়াব মন্ত হস্তীর মতো ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে  
 প্রত্যুষেরের জন্য হাত বাড়ালেন তলোয়ারের দিকে ।  
 এবং কালবিলম্ব না করে অকৃতজ্ঞ নর-পিশাচ  
 সেই তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দিলো ভাইয়ের দেহ ।  
 আগ্রীসের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ  
 যথাসময়ে জালের কাছে গিয়ে পৌছলো ।  
 জাল এই সংবাদ শুনে বললেন, এইবার আফ্রাসিয়াবের ভাগ্য-তারা  
 অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে, তার সিংহাসন হবে বিরান ।  
 কিছুদিন তিনি সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম  
 সমবেত করার কাজে ব্যয় করে  
 যথাসময়ে কাংস্য-ঘন্টা নিনাদিত করে ও রণদায়ামা বাজিয়ে  
 দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের মতো এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলেন ।  
 এবং বৈরনির্যাতনের সকলেপ অধীর হয়ে  
 পারস্যের দিকে মুখ করলেন ।  
 এদিকে আফ্রাসিয়াব সংবাদ পেলেন যে,  
 জাল এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ এগিয়ে আসছেন ।  
 তিনিও কালবিলম্ব না করে স্থীয় সৈন্যদলসত  
 সরীর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন ।  
 দুই পক্ষেরই অগ্রবর্তী বাহিনীর মধ্যে  
 ঢললো দিবারাত্রি সংগ্রাম ।  
 দুই পক্ষেরই নাম করা সেনানীগণ  
 যুদ্ধ নিহত হতে লাগলেন ।  
 এইভাবে দুই সপ্তাহ যুদ্ধ করার পর  
 দুই পক্ষেরই পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয় প্রকার বাহিনী  
 দ্বাস্ত হয়ে পড়লো ।

---

\* ইরাকের অস্তর্গত এক প্রাচীন নগরী ।

## জওতহ্মাস্প তিনি পাঁচ বছর রাজস্ত করেছিলেন

রাত্রি বেলায় জাল একদিন আফ্রাসিয়াব সম্পর্কে  
অনেক কথা বললেন।  
সেখানে ইরানী বীরগণের অনেকে উপস্থিত ছিলেন,  
জালের বন্ধুস্থানীয় সামন্তগণও হাজির।  
জাল বললেন, দেখুন, আমাদের বীরেন্দ্রবৃন্দের  
ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন।  
এ সময় কেয়ানী বৎশোষ্টুত কোন সন্দ্রাট আমাদের  
সামনে থাকা প্রয়োজন,  
যেন পূর্বশ্মতি সর্বদা আমাদের মনে জাগরুক থাকে।  
সৈন্যগণ যদি নৌকার মতো হয়  
তবে বাদশা অনুকূল বায় ও বাদ্বান।  
যদি স্বনামধন্য সামন্তগণ ও সৈন্যগণ  
তুস ও গুণাহামকে তাজ ও তখ্তের  
উপযুক্ত বলে মনে না করেন  
তবে কোন ভাগ্যবান নরপতিকে বাদশা করতে হবে,  
বিশ্ব-প্রভুর মাহাত্ম্যের জ্যোতি যাঁর উপর প্রতিফলিত হয়,  
এবং যাঁর কথায় দীপ্তি পায় জ্ঞানের দীপিকা।

জালের প্রস্তাব শুনে চারদিক থেকে  
জ্ঞানীগণ কথা কয়ে উঠলেন।  
তাঁরা বললেন, ফারেন্দুনের পুরুষপরম্পরা থেকে  
কোন নরপতিকে এই উন্নত সিংহাসনের জন্য নির্বাচিত  
· করতে হবে।  
এবং সামন্তগণ এ-জন্য তহ্মাস্প-পুত্র জওকে ছাড়া  
আর কাউকে দেখতে পেলেন না,  
কারণ, কেয়ানী সামর্থ্য ও জ্ঞান তাঁরই মধ্যে পূর্ণরূপে  
দেবীপ্যমান রয়েছে।  
যথাসময়ে কারেন, জ্ঞানীগণ ও ধর্মবেত্তাগণ  
সৈন্য ও বীরবৃন্দ সমভিব্যাহারে  
সেই সুসংবাদসহ জও সমীক্ষে উপনীত হয়ে বললেন,

ফারেদুনের তাজ আপনার শিরে নতুন করে শোভা পাবে।  
সেনাপতি জাল ও সকল সৈন্য  
আপনাকে সম্মাট বলে কামনা করছেন।

নওজরের কাল সমাপ্ত হয়েছে,  
এখন শ্রবণ করো বাদশা জও-এর কীর্তিকাহিনী।

এক শুভ মুহূর্তে ভাগ্য-নির্ধারিত শুভ-সঙ্কল্প জও  
ইরানের উন্নত সিংহাসনে সমাচীন হলেন।

সৈন্য ও সামন্তগণ সহর্ষে তাঁকে বরণ করে নিলেন,  
রাজকীয় উপহারমালা উৎসৃষ্ট হলো তাঁর পদতলে।  
তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে ধরণীকে দান করলেন  
নবজীবনের সজীবতা।

সৈন্যদলকে তিনি প্রত্যাবৃত্ত করালেন অন্যায়ের পথ থেকে,  
তাদের হাদয়ে দান করলেন পরম-পবিত্র বিশ্ব-প্রভুর মঙ্গল-পরশ।  
এখন থেকে রাজ্যে আর কেউ কারো উপর

অন্যায়-আচরণ করতে পারলো না,  
এখন থেকে দূর হয়ে গেলো সবার দুঃখ।

যারা দুনিয়ায় দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করছিলো,  
অভাবের তাড়নায় যাদের মুখ ছিল মলিন,  
যারা আকাশ থেকে লাভ করতো না করুণার জলধারা,  
তারা এখন পরিত্পু ও সুখী হলো।

দুই পক্ষের সৈন্যদল যারা দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে  
একে অন্যের সম্মুখীন হয়ে লড়ছিলো,

যারা প্রত্যহ ভীষণ যুদ্ধের মন্ততার মধ্যে  
পরম্পর বলাবলি করছিলো,

আকাশ আমাদের উপর বিরুপ হয়েছে,  
সেই সৈন্যবাহিনীর দুপক্ষ থেকেই

দৃতেরা এসে জও-এর সমীপে অভিযোগ করে বললো,  
সম্মাট, দুদিনের ইই দুনিয়ার সরাইখানায়  
আমরা দুঃখ ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।  
নামকরা ধীরগণ আজ যুদ্ধে নির্মূলপ্রায় হয়েছেন,  
জীবন আমাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

তারা এক বাক্যে বললো,  
হে সন্তাট, অতীতের শক্তি আমরা বিস্মিত হচ্ছি।  
শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য আমরা উন্মুখ,  
অতীতের কাহিনী আমরা সুরণ করতে চাই না।  
সন্তাটের নির্দেশে তখন ইরান ও তুরানের  
বীরগণ একত্রিত হয়ে এক জায়গায় বসলেন।  
তাঁরা সঙ্গের মধ্যস্থতায়  
পরম্পরের শক্তি বিস্মিত হতে চাইলেন।  
তাঁরা জেহ্ন থেকে শুরু করে তুরানের সীমান্ত পর্যন্ত  
বিস্তৃত সকল এলাকা  
এবং চীন সীমান্ত থেকে খুটান পর্যন্ত অংশ  
সন্তাটকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন।  
তৎপরিবর্তে তুরানীদের যে-এলাকা  
জাল অধিকার করেছিলেন,  
সন্তাট তা থেকে জালকে নিবৃত্ত করে  
সেই এলাকা ফিরিয়ে দিলেন তুরানীগণকে।  
এইভাবে সঙ্গী-শর্ত নিরূপণ করে  
বাদশা জও সৈন্যদলসহ পারস্যের পথ ধরলেন।  
পূরাতন ও হতগৌরব দুনিয়া  
আবার নবজীবন লাভে ধন্য হলো।  
মহাবীর জাল ও তাঁর সিপাহী-সান্ত্বীসহ  
প্রত্যাবর্তিত হলেন জাবুলস্তানের পথে।  
তুর্কী সৈন্যগণও প্রতিহিংসা বিস্মিত হয়ে  
ফীয় রংগসন্তারসহ দেশে ফিরে চললো।  
এইভাবে যখন বিশ্ব-প্রভূর ইচ্ছায়  
প্রতিদৃষ্টী সৈন্যদল পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলো  
তখনই পর্বতশীর্ষে গর্জন করে উঠলো নব মেঘদল,  
ধরণী রঙের সমারোহে পরিধান করলো নবসাজ।  
পৃথিবী যেন নবপরিণীতার মতো ঘোবনশালিনী হলো,  
কানন কুসুমিত হলো, নদী ও জলাশয় সকল পূর্ণ হলো জল ভারে  
মানব ভূলে গেলো তার হিংস্র-স্বভাব,  
কাল তার আবর্তন থেকে দূর করে দিলো অঙ্ককারকে।  
জও তাঁর চারপাশে মহাত্মগণকে জ্ঞায়েত করলেন,

সৃষ্টি ও বদান্যতায় ধরণী ভরে উঠলো ।  
সংকীর্ণতার গর্ভ থেকে জন্ম হলো উদারতার,  
বিস্ম-মুষ্টার নামে মানুষ মুক্ত করলো সকল বন্ধ ।  
ঈর্ষা ও ঘণা বিশ্বত হয়ে জনগণ সর্বত্র  
মিলিত হলো আবার ।  
এইভাবে অতিক্রান্ত হয়ে গেলো পাঁচটি বছর, —  
এই সময়ের মধ্যে না রইলো মানুষের দুঃখ না রইলো অমঙ্গল ।  
পাঁচটি বছর যেন একটি আনন্দময় দিনের মতো  
বেরিয়ে আসলো ভয় ও দুঃখের কাল-কালান্তর থেকে ।  
সম্মাটের বয়স ছিয়াশি বছর পূর্ণ হলো  
সহসা পরিম্মান হলো তার সূর্যসদৃশ জীবন-প্রসূন ।  
বদান্য সম্মাট জও-এর মতুর সঙ্গে সঙ্গে  
ইয়ানীয়গণের ভাগ্যও আবার তার সজীবতা হারিয়ে ফেললো ।

## গারশাস্প

তিনি নয় বছর রাজস্ব করেছিলেন

জও-এর এক পুত্র-সন্তান ছিল,  
 পিতা তার নাম রেখেছিলেন গারশাস্প।  
 গারশাস্প যথাসময়ে সিংহাসনে উপবেশন করে,  
 মাথায় তুলে নিলেন কেয়ানী তাজ।  
 পিতার তথ্যে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে  
 ধরণী আবার তার থেকে লাভ করলো দীপ্তি ও সমারোহ।  
 তুরানীয়রা খবর পেলো, জও গত হয়েছেন,  
 তার সিংহাসন এখন শূন্য।  
 সঙ্গে সঙ্গে তারা রণহস্তান উদ্ধিত করে সমুদ্রে রণতরী ভাসালো,  
 আফ্রাসিয়াব দ্রুতগতিতে রীতে এসে উপনীত হলেন।  
 তুরানী সৈন্যদল বাদশা পিশঙ্গের আশীর্বাদ নিয়ে আসেনি,  
 তারা সঙ্গে এনেছে শুধু ঝোঁটা ও প্রতিহিংসার সম্ভার।  
 পিশঙ্গের হাদয় এই সময় রাজ্য ও সিংহাসনের দিকে ছিলো না,  
 তিনি পুত্র আগ্রাসের বিয়োগ-ব্যথায় বিধুর ছিলেন।  
 দীর্ঘদিন তিনি কাউকে মুখ পর্যন্ত দেখাননি,  
 তাঁর উজ্জ্বল তরবারিতে মরিচা ধরে গিয়েছিলো।  
 যুদ্ধের অনুমতি নেয়ার জন্য আফ্রাসিয়াবের নিকট থেকে  
 এক দৃত পিশঙ্গের সমীপে এসে উপস্থিত হলো।  
 কিন্তু মাস গড়িয়ে বছর চলে যায়,  
 পিশঙ্গ দৃতকে তাঁর সামনে আসার অনুমতি দেন না।  
 অবশ্যে তিনি বললেন, হে আফ্রাসিয়াব, তুই আত্মকে  
 স্থীয় হস্ত প্রক্ষালন করেছিস,  
 তুই পাখির প্রতিপালিত জালের সামনে থেকে পলায়ন  
 করেছিস প্রাণভয়ে।  
 শক্র সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমি তোকে পাঠিয়েছিলাম,  
 সেক্ষেত্রে তুই দুর্বিষহ করে তুলেছিলি স্থীয় ভায়ের জীবন।  
 জীবনে আর কোনদিন তোর দ্বারা আমি কোন কাজ নিব না।  
 আমার চোখের সামনে তুই কখনো আসতে পারবি না।  
 পিশঙ্গের এই বিমুখতার মধ্যে দিয়ে

কয়েকটি বছর কেটে গোলো ।  
ইতিমধ্যে জও-পুত্র গারশাস্পও পরলোকগত হলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সর্বত্র দেখা দিল অমঙ্গল ।  
মানুষের কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো —  
শাহী তথ্য আবার শূন্য হয়ে পড়েছে ।  
এই সময় সহসা বীরপ্রবর পিশকের নিকট থেকে  
আফ্রাসিয়াবের কাছে আদেশ এলো ; —  
জেই থেকে নির্গত হও, প্রস্তুত করো সৈন্যদল ;  
এ সময় কেউ যেন অলসভাবে বসে না থাকে ।  
শাহী ফরমান পেয়ে আফ্রাসিয়াব  
সাপেজ্বাব উপত্যকা থেকে ঝুঁটাব-এর দিকে সৈন্য চালনা করলেন ।  
দিগন্তপ্রসারী সৈন্যদলে ধরণী আকাশের মতো সীমাহীন হলো,  
হিন্দুস্তানী তলোয়ারের বাদলধারা ঘরে পড়তে লাগলো  
সেই আকাশ থেকে ।  
এমনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আফ্রাসিয়াব  
দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চললেন ।  
ইরানে খবর হলো,  
মহান সিংহাসনের ক্রেতারা এগিয়ে আসছে ।  
সঙ্গে সঙ্গে নিনাদিত হলো রণবাদ্য ও দুর্দুতি, —  
ইরান থেকে উত্থিত হলো এক উচ্ছ্঵সিত কলরোল ।  
সৈন্যগণ স্ব-গৃহ থেকে নির্গত হয়ে জাবুলস্তানের দিকে মুখ করলো ।  
দেশের সর্বিক মুখ্যরিত হয়ে উঠলো যুদ্ধের আলোচনায় ।  
দলপতিগণ জালকে গিয়ে বললো,  
শক্ত মুঠিতে আপনি দেশকে ধারণ করুন ।  
মহামতি সামের পরে আপনিই সেই বীর  
যাঁর উপর আমরা নির্ভর করতে পারি ।  
বাদশা জও-এর পরে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন যুবরাজ,  
তিনিই এতদিন নিবারিত রেখেছিলেন অকল্যাণকে ।  
আজ সেই সন্ত্রাট-পুত্র গারশাস্পও বিগত হয়েছেন,  
ধরণী আবার হয়ে পড়েছে মুকুটহীন ।  
তাই সৈন্যগণ জেই থেকে আপনারই দিকে আকর্ষিত হয়েছে,  
চেয়ে দেখুন তাদের পদধূলিতে আচ্ছন্ন হয়েছে মধ্যাহ্ন-ভাস্কর ।  
এখন আপনার জ্ঞানবুদ্ধিমতো প্রতিকার অবলম্বন করুন,

শক্রসন্য ইরানের দ্বারদেশে এসে সমুপস্থিত হয়েছে।  
দলপতিগণের এই কথা শুনে জাল বললেন,  
নিচিন্ত হোন, আমি এখুনি যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধছি।  
আমার মতো কোন অশ্বারোহী যখন তার পদদ্বয়  
রেকাবের উপর রাখে,  
এবং হাতে তুলে নেয় তরবারি ও প্রহরণ তখন কে তার  
মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে সাহস পায় ?  
আজো এই বৃক্ষ বয়সে রঞ্জক্তে আমি  
দিবারাত্রি সমান উৎসাহে সংগ্রাম করে যাই।  
যৌবনকালে আমার পদদ্বয়  
ঘূর্ণি হাওয়ার ছন্দে সর্বত্র নেচে বেড়াতো।  
বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা ! তিনি এই বীজ থেকে  
উদ্ভাত করেছেন এক বৃক্ষ-শিশু।  
সে আজ মন্ত্রক উন্নীত করেছে আকাশের দিকে,  
তার বীরত্ব আপনাদের চোখের সামনে আজ উপস্থিত।  
রুষ্টম আজ সুউন্নত দেবদারুর মতো শির উন্নেলন করেছে  
সে-শিরে শোভা পেতে পারে একমাত্র মহামূল্য রাজমুকুট।  
এখন আমি তার বাহনের উপযুক্ত এক অশ্বের  
সঙ্ঘান করছি,  
যে-অশ্ব তার শৌর্য ও ভার বহনে সক্ষম হয়ে  
স্বচন্দে বিচরণ করতে পারবে।  
আমি রুষ্টমকে আমাদের রাজকীয় কাহিনীর আদ্যস্ত শুনিয়েছি,  
বলেছি তাকে আমাদের শক্রতার জাতিগত কারণ।  
এবং প্রত্যক্ষ করেছি, প্রতিক্রিয়ায় তার মধ্যে জেগেছে সহানুভূতি,  
তাকে বলেছি, হে পুত্র, সাহস ও বীরত্বে বঞ্চন করো তোমার  
কঠিদেশ।

বীরবর জালের এই ভাষণ শুনে  
ইরানের সকল নগরী আনন্দিত হলো, সকল জনের মুখমণ্ডল  
ফুল হলো প্রাণের সজীবতায়।  
চারদিক থেকে নির্গত হতে লাগলো অশুদ্ধল,  
বীরবন্দ যুদ্ধসাজ পরে উঠিত হলেন সর্বস্থল থেকে।  
জাল রুষ্টমকে লক্ষ্য করে বললেন,  
পুত্র, চেয়ে দেখো তোমার শির উন্নত রয়েছে সকল মানুষের উর্ধ্বে

তোমার সামনে রয়েছে বিপুল ও বিপদসঙ্কূল এক কর্মক্ষেত্র,  
যা তোমার নিদ্রা ও বিশ্বাস্তি হরণ করে নিবে।  
পুত্র, তোমার জন্য যে—দিন আমি নির্দিষ্ট করছি  
সে—দিন আসব কিংবা আরামের নয়,— সেদিন যুদ্ধের।  
এখনও তোমার ওষ্ঠাধরে মাত্তদুগ্ধের গন্ধ লেগে আছে,  
এখনও তোমার প্রয়োজন সন্তোষ ও মমতার।  
হা পুত্র, কি করে সেই তোমাকেই আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবো  
কি করে তোমাকে ছেড়ে দেবো ব্যাঘাতল ও বীরবৃন্দের মাঝখানে?  
এর জবাবে কি তুমি বলবে এ কথায় কি প্রতিক্রিয়া হবে

তাই ভাবছি,

আশীর্বাদ করি মাহাত্ম্য ও সুমঙ্গল তোমার সঙ্গী হোক।  
পিতার কথা শুনে রুক্ষম বললেন,  
হে যশস্বী পিতা,  
আমার কথা বিস্মিত হয়ে আপনি এখন  
সর্বত্র প্রকটিত করুন আপনার বীরত্ব।  
আশা করি আপনার মনে আছে  
সিপান্দ পাহাড় ও মদমন্ত্র হস্তীর কথা।  
যদি আমরা পিশঙ্গ—পুত্রের ভয়ে বিদ্রাসিত হই  
তবে ধরণী অচিরেই হারাবে তার রঙ ও গন্ধের বিচিত্র সন্তার।  
এখন যুদ্ধের কাল বণকৌশল প্রদর্শন করার মুহূর্ত,—  
সঙ্কোচ ও পৃষ্ঠপ্রদর্শনের সময় এ নয়।  
ভয়নাক সিংহকে ধরাশায়ী করাই পুরুষের পরিচয়।  
নারীর সুযশ এ সকলের মধ্যে নয়,  
গৃহের পরিবেশে আহার ও নিদ্রার মধ্যেই তার কর্ম সীমিত !  
রুক্ষমের এই কথা শুনে জাল বললেন, হে সাহসী যুবক,  
তুমি যশস্বীগণের শিরোভূষণ এবং বীরবৃন্দের পৃষ্ঠপোষক।  
সিপান্দ পাহাড় ও সাদা হাতীর ঘটনা।  
আমার সম্যক মনে আছে।  
অবশ্য সে—যুদ্ধ তোমার জন্য সহজ ছিলো,  
কারণ, তা শুনে আমি ভীত কিংবা বিস্মিত হইনি।  
কিন্তু আফ্রাসিয়াবের কীর্তি  
আমার আঁধার রাত্রির নিদ্রা হরণ করে।  
আমি কি করে তোমাকে তার সামনে পাঠাই,

সে অপরিমিত বলশালী ও অসীম সাহসী এক রাজ্ঞা ।  
এদিকে তোমার এখন বঙ্গবর্গের সহবাসে নন্দিত হওয়ার কাল,  
সুরা-সঙ্গীতে কাল কাটাবার বয়স তোমার ।  
সংগ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদ বরণের সময়  
এখনও তোমার হয়নি ।  
পিতার কথা শুনে কৃষ্ণম বললেন,  
আমি ভোগ ও সুরা পানে মন্ত্র থাকার মতো পুরুষ নই ।  
আমার উন্নত গ্রীবা ও দৃঢ় মুষ্টি  
স্বেহ-পুষ্ট আদুরে বালকের পরিচয় বহন করে না ।  
যদি যুদ্ধ ও প্রতিহিস্তার ক্ষেত্রেই আমার জন্য নির্দিষ্ট করে থাকেন,  
স্বয়ং বিশ্ব-প্রভু ও ভাগ্য,—  
তবে আমার ধনুকের টক্কারে  
বিছুরিত হবে নক্ষত্রের অগ্নিকণা ।  
আপনি দেখবেন, আমি সংগ্রামে অবর্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
প্রতিপক্ষের বৃহৎ মধ্যে বয়ে যাবে রক্তের নদী ।  
আমার হাতে ধরা থাকবে স্বচ্ছ জল-বর্ণের মেঘদল,  
যার থেকে বর্ষিত হবে তপ্ত শোণিতের বারিধারা ।  
নিরামণ বজ্জ্বল নিক্ষিপ্ত হবে তার থেকে  
হস্তীযুথের মস্তক তার দ্বারা বিগলিত হবে ।  
যখন আমি আমার বক্ষে ধারণ করব কবচ,  
তখন আমার তুণীর থেকে কাল প্রবাহিত হবে ।  
আমার প্রহরণের আঘাতে  
বিচূর্ণিত হবে দুর্গ-প্রাচীর ।  
আমার বর্ণাফলক যখন প্রতিপক্ষের দিকে মুখ করবে,  
তখন তার পাষাণ-হাদয় পরিত্পু হবে শুধুমাত্র শোণিতের ধারায় ।  
আমি এখন চাই এমন এক অশু  
যা উচ্চ পর্বত চূড়ার অনুরূপ ।  
চাই এমন এক প্রহরণ  
যা আমার হাতে ধরা থাকলে  
তুরানী সৈন্যদলের মস্তক আমি  
অবলীলায় চূর্ণ করতে পারি ।  
এই প্রহরণের আঘাতে আমি হস্তীপৃষ্ঠ বিচূর্ণিত করবো,  
প্রবাহিত করবো নীলনদের ধারার মতো শোণিত-প্রবাহ ।

আমি এমন এক তনুত্রাণ কামনা করি,  
অগ্নি কিংবা জলে ধার কোন ক্ষতি হয় না।  
তীর ও বর্ণার তীক্ষ্ণতম আঘাতেও যা বিদীর্ণ নয় —  
এমনই অঙ্গাবরণ আমার কাম্য।  
তারপর আমি সৈন্যদলসহ এমনই সংগ্রামমত হবো যে,  
ক্রতান্ত ব্যাপ্তের রীতি আমি অবলম্বন করবো,  
বিদ্রোহীদের উজ্জ্বল শির দলিল করবো পদতলে।  
এইভাবে সারা রাজ্য আমি শক্রহীন করবো,  
আমার তীরের ফলা পথ করে নেবে নির্জন চাঁদের দেশে।

কৃষ্ণমের এই জবাবে বীরবর এত প্রীত হলেন যে,  
তাঁর অস্তরাত্মা যেন উর্ধ্বগামী চাতকের মতো নন্দিত হলো।  
মহামতি সামের পুত্র জাল বললেন,  
হে আলস্য ও সুরা বর্জনকারী যুবক,  
তোমাকে আমি বীরপ্রবর সামের প্রহরণ দান করবো,  
যা দুনিয়ায় বহন করছে তাঁর পুণ্যস্মৃতি।  
এই প্রহরণ তোমাকে দুনিয়ায় চিরঞ্জীব করবে।  
এই প্রহরণ দ্বারাই হে পুত্র,  
মহামতি সাম মাজিন্দিরানের বীরগণের সঙ্গে লড়েছিলেন।  
জালের আদেশে সেই বিখ্যাত প্রহরণ  
কৃষ্ণমের সামনে আনা হলো।  
কৃষ্ণম পিতামহের প্রহরণ দেখে  
আনন্দে মদু হাস্য করলেন।  
এবং জালের গুণাবলী উচ্চারণ করে বললেন,  
হে বীরাগ্রগণ্য, আমি এখন  
এমন এক অশ্ব কামনা করি  
যা আমার শৌর্য ও ভার বহনে সক্ষম।  
জাল এই কথা শুনে চিন্তান্তিত হলেন  
এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উচ্চারণ করলেন বিশ্ব-প্রভুর নাম।

## রুস্তম কর্তৃক রাখশাকে গ্রহণ

জাবুলস্তানের অশুশালে যত ঘোড়া ছিলো  
কাবুলস্তানের তুরঙ্গরাজির সঙ্গে সেগুলি আনা হলো।  
সব ঘোড়া রুস্তমের সামনে এলে  
তিনি সেগুলির গায়ে রাজকীয় মোহরের চিহ্ন অঙ্কিত দেখলেন।  
যে-ঘোড়াই তাঁর পছন্দ হলো,  
তারই পিঠে তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলেন।  
তাঁর শক্তিতে প্রত্যেক ঘোড়ার পিঠই বেঁকে যেতে লাগলো,  
ও তাদের বুক গিয়ে স্পর্শ করলো মাটি।  
অবশ্যে কাবুল থেকে আনিত অশুদ্ধলের মধ্যে  
একটি তেজীয়ান ঘোড়া নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো।  
সেটি সাদা রঙের এক ঘোটকী;  
বুক তার সিংহের মতো সুগঠিত ও পুচ্ছ হুস্ত।  
তার দুটি কান উদ্যত খঞ্জেরের মতো,  
গ্রীবা-কেশের প্রচুর ও কঢিদেশ ক্ষীণ।  
এই ঘোটকীর পেছনে দাঁড়িয়েছিলো তারই মতো উচু এক অশু-শাবক  
তেমনি সুগঠিত তার উরুদেশ ও বক্ষ প্রশস্ত।  
তার চক্ষুদুয় ঘন কঢ়িবর্ণ ও চঞ্চল,  
তার অগুকোষ কালো ও সুপুষ্ট এবং ইস্পাতের মতো কঠিন।  
তার দেহের বর্ণ আগাগোড়াই সুদৰ্শন  
যেন জাফ্রানের উপর ছড়িয়ে আছে গোলাপের পাপড়ি।  
সে জলস্তল সর্বত্র কিংবরণ করে সমান পারদর্শিতায়,  
সে দিনের বেলায় সূর্য ও রাত্রিতে চন্দ্রের মহিমা প্রকটিত করে।  
পরিখায় আত্মগোপনকারী সৈন্যদলকে সে প্রত্যক্ষ করতে পারে,  
অঙ্ককার রাত্রিতেও সে দেখতে পায় দুই ফরসৎ পথ।  
শক্তিতে সে হাতীর মতো, উচ্চতায় উদ্ধৃ সদৃশ,  
সাহসে সে সিংহের মতো, ধৈর্যে পর্বতের অনুরূপ।  
রুস্তম এই ঘোটকী ও তার পেছনে অশু-শাবককে  
দেখতে পেয়ে যখন  
তাঁর রাজকীয় ফাঁসে অশুশাবককে আবদ্ধ করার জন্য  
পাশ প্রস্তুত করলেন,  
তখন অশু-পাল তাঁকে ডেকে বললো,

হে সামন্ত, সাবধান, অশুটিকে এভাবে ধরতে যাবেন না।  
কৃষ্ণম অশু-পালকে প্রশ্ন করলেন, কেন?  
এই অশুরের পরিচয় কি? ওর মুখে ঐ চিহ্ন কিসের?  
অশু-পাল জবাবে বললো, চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন না,  
কারণ, ওই থেকেই তার সমন্ত গুণের উপ্তব।  
আমরা এই উদ্ভিদ ঘোড়াটিকে রাখ্শ নামে ডাকি,  
দেখতে সে যেমন সুন্দর, গতিতেও তেমনি বিদ্যুতের মতো।  
এই ঘোড়ার মালিক কে, আমরা জানি না,  
আমরা একে কৃষ্ণমের ঘোড়া বলে অভিহিত করি।  
তিন বছর হলো এটি এখানে এসেছে,  
সামন্তগণ এর সুলক্ষণ দ্বাটে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।  
কিন্তু এর মা যদি লক্ষ্য করে যে, আপনি তাকে ধরবার জন্য  
পাশ হাতে নিয়েছেন,  
তবে সে যুদ্ধার্থ সিংহের মতো এগিয়ে আসবে।  
হে বীরবর, বুঝতে পারি না, কি রহস্য  
এই ঘোড়ার মধ্যে আত্মাগোপন করে আছে?  
কাজেই ওগো সচেতন পুরুষপ্রবর আমার সন্নির্বন্ধ অনুরোধ,  
আপনি এর কাছে যাবেন না।  
এই ঘোটকী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে  
সিংহের বক্ষ ও ব্যাঘ্রের গাত্রচর্ম অবলীলায় দীর্ঘ করে।  
কৃষ্ণ প্রবীণ অশু-পালের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।  
তারপর সহস্রা কেয়ানী পাশ নিষ্কিপ্ত করে  
সুদৰ্শন ঘোড়ার গ্রীবাদেশ তাতে আবদ্ধ করে নিলেন।  
এই দেখে তার মা মদমত হাতীর মতো দৌড়ে এসে  
ফাঁসের বক্ষনে দস্ত বিদ্ধ করলো।  
কৃষ্ণ তখন সিংহের গর্জনে এগিয়ে গেলেন তার দিকে,  
সেই আওয়াজে ঘোটকীর সর্বদেহ কম্পিত হলো।  
কৃষ্ণ কালবিলম্ব না করে ঘোটকীর পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত করলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে সে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গেলো;  
এবং উঠে উর্ধবশৃঙ্খলে  
অশুদলের দিকে পলায়ন করলো।  
কৃষ্ণ তখন সর্বশক্তিতে পাশরজ্জু আকর্ষণ করে,  
রাখ্শকে কাছে টেনে আনলেন।

এবং তার পৃষ্ঠদেশে করাঘাত করে  
সেই উজ্জ্বল ঘোড়াকে স্থীয় বশে আনলেন।  
তিনি মনে মনে বললেন,  
এই অশু সত্যিই আমার বাহনের উপযোগী।  
অতঃপর রুস্তম রাখ্শের উপর চড়ে  
তাকে কিয়দ্দুর প্রধাবিত করে  
অশু-পালককে জিজ্ঞাসা করলেন,  
বলো, এই উজ্জ্বল ঘোড়ার দাম কত?  
অশুপাল জবাবে বললো, রুস্তমই যখন  
একে বশে আনতে পারলেন  
তখন এর দাম সারা ইরান দেশ;  
কারণ, এর পিঠে চড়ে তিনি জলস্তুল সমন্বিত  
গোটা দুনিয়া তাঁর অধিকারে আনতে পারবেন  
ও জয় করতে পারবেন যে-কোন যুদ্ধের ভয়াবহতা।  
অশুপালের কথা শুনে রুস্তমের ওষ্ঠাধর সূর্যকান্ত  
মণির মতো বিকশিত হলো  
তিনি মনে মনে উচ্চারণ করলেন, বিশ্ব-প্রভুর গুণগ্রাম।  
তারপর তিনি সুদর্শন রাখ্শকে  
জিন ও গদীতে সুসজ্জিত করলেন,  
এবং তাকে মুক্ত করে দিয়ে  
তার বক্ষের বল ও স্নায়বিক শক্তি পরীক্ষা করে নিলেন।  
এইবার তিনি সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে  
লৌহ শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে হাতে তুলে নিলেন প্রহরণ;  
এবং অশুবক্ষণা হস্তে ধারণ করে  
মন থেকে বাহনের সকল অভাব-বোধ বিদূরিত করলেন।  
রুস্তমকে পিঠে নিয়ে রাখ্শ আস্কান্দিতে  
বৃত্তাকার অয়ন-পথ অতিক্রম করে চললো।  
তার পদক্ষেপে প্রকটিত হতে লাগলো মন্ত্রের সুষমা,  
তার চলায় দুরস্ত রূপ বিছুরিত হলো।  
রাখ্শের মোহন গতিভঙ্গি ও ভাগ্যবান আরোহীকে দেখে  
জালের অঙ্গৰে নব বসন্তের আবির্ভাব হলো।  
তিনি রাজকোষ খুলে দিয়ে, দান করলেন প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা —

তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি যেন আজ ও কালের প্রভেদ রেখা  
বিস্মৃত হয়েছেন।  
অতঃপর সেনাপতির আদেশে হস্তীপৃষ্ঠে পণব নিনাদিত হলে  
তার মোহন ধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিগন্তেরে।

## আফ্রাসিয়াবের অভিমুখে জালের সৈন্য চালনা

সৈন্যদলের কোলাহল, দুন্দুভন্নাদ ও বঁশাণ—ধ্বনিতে  
দিক-দিগন্ত উচ্চকিত করে মদমত হস্তীদলসহ  
জাবুলস্তানে কেয়ামতের ঘটা উথিত করলেন জাল ;  
মৃত দেশকে তিনি সরবে আদেশ করলেন, উঠো, জাগো !  
সৈন্যদল জাবুলস্তানের সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে চললো,  
যেন ক্তাঙ্গ ব্যাত্রদল তাদের থাবা রক্তে রঞ্জিত করে নিয়েছে।  
সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে রয়েছেন বীরশ্রেষ্ঠ রুস্তম  
তার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করে চলেছেন প্রবীণ শূরবৃন্দ।  
বনভূমি, জনপদ ও প্রান্তর সৈন্যদলে ছেয়ে গেছে,  
তাদের উপর দিয়ে এখন কাকও উড়ে যেতে ভয় পায়।  
সেই সঙ্গে সারাক্ষণ নিনাদিত হচ্ছে রণবাদ্য,  
সৈন্যদলের শীর্ষ ও পশ্চাদেশ দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে।  
যথাসময়ে জালের আগমন-বার্তা আফ্রাসিয়াবের কর্ণগোচর হলে  
তাঁর আলস্য ও সুখনিদ্রা ভঙ্গ হলো।  
তিনি ক্ষিপ্তার সঙ্গে স্বীয় সৈন্যদলকে  
জলভূমি ও বাঁশবন পরিপূর্ণ রী—অভিমুখে চালিত করলেন।  
ইরানী সৈন্যদলও ক্রমে বনজঙ্গল অতিক্রম করে  
যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলো।  
এইভাবে যখন প্রতিদুন্দুই দুই সৈন্যদলের মাঝখানে  
দুই ফরসৎ দূরত্ব অবশিষ্ট রইলো,  
তখন সেনাপতি জাল প্রবীণ সেনানীবৃন্দকে  
সম্বোধন করে বললেন,—  
হে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সিপাহসালারগণ,  
আপনারা অবধান করুন,  
আমি এখানে বহু সৈন্য জমায়েত করেছি,  
বহু বীর ও দলপতিগণকে আনয়ন করেছি এখানে।  
কিন্তু সন্মাটের সিংহাসন এখনো শূন্য,  
সৈন্যবাহিনী এখনো অনাথ।  
মহামান্য জও যতদিন জীবিত ছিলেন  
ততদিন ধরিত্বী লাভ করতো তাঁর থেকে নতুন নতুন ফরমান।  
এখনও কেয়ানী বংশোন্তৃত কোন নরপতিকে

সিংহাসনে উপবিষ্ট থেকে প্রেরণার উৎস হতে হবে।  
দেশেরকার জন্য সিংহাসনারোই হতে হবে কোন বাদশাকেই;  
কারণ, মানুষ নেতৃত্বে হয়ে জীবন-যাপন করতে পারে না।  
কোন এক জ্ঞানী আমাকে কেয়ানী বৎশোষ্ণুত  
এক রাজার নিশানা বাঁলে দিয়েছিলেন;  
সেই রাজার নাম কোবাদ, তিনি মহামতি ফারেদুনের কুলজ্ঞাত,  
তাঁর মাহাত্ম্য, সততা ও গৌরব সেই বৎশেরই অনুরূপ।

## ରୁଷ୍ଟମ କର୍ତ୍ତକ କାଯକୋବାଦକେ ଆଲବୁର୍ଜ ପାହାଡ଼ ଥେକେ ଆନନ୍ଦନ

ଜାଲ ରୁଷ୍ଟମକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲଲେନ,  
ହେ ପୁତ୍ର, ଅମ୍ବ୍ରଧାରୀ ହୟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋ ।  
ଆରବୀ ସୈନ୍ୟଦେର ଥେକେ ଏକଟି ଦଲକେ ବାହାଇ କରେ ନିଯେ  
ଯାତ୍ରା କରୋ ଆଲବୁର୍ଜ ପାହାଡ଼ର ଦିକେ ।  
ସେଖାନେ ଗିଯେ ସମ୍ବ୍ର ନରପତି କୋବାଦକେ ସ୍ଵାଗତ ଜାନାଓ,  
ମନେ ରେଖୋ, ଏତେ ବିଲମ୍ବ କରା ଚଲବେ ନା ।  
ସପ୍ତାହକାଳ ମଧ୍ୟେଇ ତାଁକେ ନିଯେ ଫିରେ ଆସବେ,  
ସେଜନ୍ୟ ଦିନରାତ ଥରେ ତୋମାଦେର ଅଶ୍ଚ ଚାଲନା କରାତେ ହେବେ ।  
ତାଁକେ ବଲବେ, ସୈନ୍ୟଦଲ ତାଁକେଇ କାମନା କରଛେ,  
ତାଁର ଜନ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ହୟେ ଆଛେ କେଯାନୀ ସିଂହାସନ ।  
ବଲବେ, ହେ ରାଜ୍ଞୀ, କେଯାନୀ ତାଙ୍କ ଆପନି ଛାଡ଼ା କାରୋ ଶିରେ  
ମାନାବେ ନା,  
ଆପନାର ସମୀପ ଛାଡ଼ା ଜନଗଣେର ନାଲିଶ ଜାନାବାର ହୁଲ ଆର ନେଇ ।  
ଜାଲେର ଏଇ ଆଦେଶ ଶୁଣେ  
ରୁଷ୍ଟମ ସମସ୍ମାନେ ମୃତିକା ଚୁମ୍ବନ କରଲେନ ।  
ଏବେ ଅବିଲମ୍ବେ ଆନନ୍ଦିତଚିତ୍ତେ ରାଖିଶେ ପିଠେ ଚଢେ  
କାଯକୋବାଦେର ଉଦ୍ଦେଶେ ଯାତ୍ରା କରଲେନ ।  
ପଥେ ସର୍ବତ୍ର ତୁର୍କୀଦେର ଗୁପ୍ତର-ସୈନିକେର ଦଲ ଛଢିଯେଛିଲ,  
ତାରା ରୁଷ୍ଟମେର ଗତିରୋଧ କରେ ଏସେ ଦୌଡ଼ାଲୋ ।  
ରୁଷ୍ଟମ ଗୋମୁଖାକ୍ଷିତ ପ୍ରହରଣ ନିଯେ  
ତାଦେର ଆକ୍ରମଣ କରଲେନ । —  
ପରତେର ମତୋ ଟୋଟି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ  
ଏକାକୀଇ ଶକ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଲୋ ।  
ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣେଇ ଶକ୍ତିସୈନ୍ୟ  
ପରାଜିତ ହୟେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୟେ ପଡ଼ଲୋ ଚାରଦିକେ ।  
ପରକ୍ଷଣେଇ ତାରା ନିଜେଦେର ଏକତ୍ରିତ କରେ  
ସମ୍ମିଲିତଭାବେ ରୁଷ୍ଟମକେ ଆକ୍ରମଣ କରଲୋ ।  
ଦେଖତେ ଦେଖତେ ବୟେ ଗେଲୋ ରଙ୍ଗେର ନଦୀ,  
ବହୁ ତୁରାନୀ ସୈନ୍ୟ ହତ ହୟେ ଶୋଣିତଶୟ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରଲୋ ।  
ତୁବୁ ଚଲତେ ଲାଗଲୋ ଯୁଦ୍ଧ — ତୁରାନୀଗଣ ବୀରବିକ୍ରମେ ଲାଭେ ଚଲଲୋ ବନ୍ଧୁକଣ,

কিন্তু পরিণামে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপদ্ধন করতে বাধ্য হলো ।

তারা হৃদয়ে পরাজয়ের গ্লানি ও চোখে অঙ্গ নিয়ে

প্রত্যাবৃত্ত হলো আফ্রাসিয়াবের অভিমুখে ।

গিয়ে বললো রুস্তম ও তাঁর অপূর্ব বিক্রমের কাহিনী ;

আফ্রাসিয়াব সব শুনে মনে মনে বড় চিন্তিত হলেন ।

তুর্কী সৈন্যদের মধ্যে বীরত্বে অগ্রগণ্য ও ঐন্দ্রজালিক

ব্যক্তিত্বের অধিকারী

কলুনকে কাছে ডেকে আফ্রাসিয়াব বললেন,

আপনি নির্বাচিত বীর সিপাহীগণসহ

ইরানের পথে ধাবিত হোন ;

সর্বদা সাবধান ও সচকিত হয়ে অবস্থান করবেন,

শক্র—সৈন্যের নিকটে হয়ে আপনাকে অতম্ভু থাকতে হবে ।

ইরানীয়গণ অত্যন্ত ক্ষিপ্র,

তারা সহসা গুপ্তচর বাহিনীর উপর ঢাও করে বসে ।

নরপতির উপদেশ শিরোধাৰ্য করে কলুন বেরিয়ে এলেন,

তাঁকে পথ দেখিয়ে চললো অগ্রগামী এক সৈন্যদল ।

সেই পথের দুর্ব্বাস্তে খ্যাতনামা বীরগণ

ও মদমস্ত হস্তীদলসহ তরুণ বীর রুস্তম

ইরানের ভাবী বাদশার অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন ।

আলবুর্জ পাহাড়ে গিয়ে পৌছতে মাত্র এক মাইল পথ বাকী আছে,

এমন সময় পথ—সম্মুখে রুস্তম সমারোহপূর্ণ একস্থান দেখতে পেলেন ।

প্রচুর ছায়াময় বৃক্ষ ও বহুতা নদীর পাশে

এক ঘোবনধারী পুরুষ আসৱ করে বসেছেন ।

জলের কাছাকাছি স্থাপিত রয়েছে এক সিংহাসন,

মূল্যবান কস্তুরী ও সুগন্ধী গোলাপজলে স্বেচ্ছান আমোদিত ।

যৌবনশালী সেই পুরুষ পূর্ণচন্দ্ৰের মতো

আসৱ উজ্জ্বলিত করে সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন ।

বল্ল বীর আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে

তাঁর সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ।

বৰ্ণ—গঞ্জের সমারাহে সেই আসৱের সঙ্গা

রাজকীয় সমারোহেৱে উপযুক্ত ।

উপস্থিত বীরগণ রুস্তমকে দেখতে পেয়েই

তাঁকে আগু বাড়িয়ে নিতে এলেন,  
এবং তাঁর সম্মুখবর্তী হয়ে  
নত মন্তকে বিনতি প্রকাশ করে  
বললেন, হে প্রখ্যাত শূর,  
যদি এ পথে আপনার আগমন হয়েছে,  
তবে অবতরণ করুন,  
আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি ।

আপনার হস্তে ধারণ করুন আমাদের আতিথ্যের সুরা পাত্র;  
আপনার প্রখ্যাত বদনমণ্ডলের উদ্দেশে আমরা সুরাপান করি ।

রুম্ভ তাঁদের কথা শুনে বললেন,—  
হে উন্নতশির বীরেন্দ্রবন্দ, আমি বিশেষ জরুরী কাজে  
আলবুর্জ পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেছি ।  
পথে যাত্রাভঙ্গ করা আমার জন্য অনুচিত হবে,  
কারণ, আমার সামনে রয়েছে সমৃহ বিপদ ।  
সমস্ত ইরান-দেশ আজ শক্ত পরিবেষ্টিত,  
সকল গোত্রে আজ বিলাপের ধ্বনি উথিত হচ্ছে ।

ইরানের সিংহাসন আজ নরপতিশূন্য,  
এ—অবস্থায় সুরাপানে মন্ত হওয়া আমাকে শোভা পায় না ।  
দৃঢ় ও বেদনার কারণ ভুলে গিয়ে  
নিষিদ্ধ আরামে বসে থাকা সম্পূর্ণ অনুচিত ।

রুম্ভের কথার জ্বাবে বীরবন্দ বললেন,  
হে শূরশ্রেষ্ঠ, আলবুর্জ পাহাড়  
আপনি কার খৌজে যাত্রা করেছেন,  
আমাদেরকে দয়া করে বলুন ।

কারণ, আমরা এই রাজ্যেরই অধিবাসী,  
এখানে এক আসরে আমরা মিলিত হয়েছি ।  
আপনাকে আমরা পথের খৌজ দিতে পারবো,  
যথাসম্ভব সহায়তাও আপনাকে আমরা দান করতে পারবো ।

উত্তরে রুম্ভ বললেন, সেখানে  
এক পৃত-চরিত নরপতি বাস করেন,  
সেই মহামতির নাম কায়কোবাদ,  
তিনি পুণ্যস্মৃতি ফারেন্দনের উপর্যুক্ত বংশধর ।

আপনারা যদি তাঁকে জানেন তবে

আমাকে দান করুন তাঁর সঙ্কান।  
ক্রস্তম যখন এই কথা বলছিলেন,  
তখন সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন তাঁকে।  
এইবার আসর-প্রধান তাঁর রসনা উন্মুক্ত করে  
বললেন, আমি কায়কোবাদের সঙ্কান বলতে পারি।  
যদি আপনি আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন,  
এবং আপনার সান্নিধ্য দ্বারা আমাদের দান করেন প্রচুর আনন্দ,  
তবে আমি বলতে পারি কায়কোবাদের কথা,—  
তিনি কেমন আর তাঁর রীতিনীতিই বা কিরাপ।  
ক্রস্তম কায়কোবাদের সঙ্কান পাওয়া যাবে শুনে  
রাখ্য থেকে অবতরণ করলেন।  
এবং নদী-তীরবর্তী সেই ছায়াময় আসরে এসে  
উপবেশন করলেন।  
সিংহাসনাক্ত ঘোবনশালী মহাপুরুষ তখন  
ক্রস্তমের হাতে হাত রেখে তাঁকে স্বাগত জানালেন।  
তারপর স্থীয় হস্তে তুলে নিলেন সুরাপাত্র  
ও অতীতের বীরগণকে স্মরণ করলেন।  
তারপর অপর এক পাত্র ক্রস্তমের হাতে এগিয়ে দিয়ে  
প্রশ্ন করলেন, হে প্রখ্যাত বীর,  
আপনি কায়কোবাদ সম্পর্কে জানতে চান,  
বলুন তো, এ নাম আপনি কোথায় শুনলেন ?  
জবাবে ক্রস্তম বললেন, সেনাপতির মুখে ;  
আমি তাঁরই কাছ থেকে মহামতি কোবাদের প্রতি বাণী নিয়ে এসেছি।  
ইরানের সিংহাসন তাঁর জন্য প্রস্তুত,  
সেনাপতি ও বীরবৃন্দ তাঁকে আনন্দের সঙ্গে আহ্বান জানিয়েছেন  
আমার পিতাই সেই সেনাপতি — ইরানী বীরবৃন্দের প্রধান,  
লোকে তাঁকে স্বনামধন্য জাল বলে সম্বোধন করেন।  
তিনিই আমাকে আদেশ করেছেন, তুমি আলবুর্জ পাহাড়ে যাও,  
সেখানে নরপতি কোবাদকে সঙ্গীদল পরিবৃত্ত অবস্থায় দেখতে পাবে।  
তাঁকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে  
অবিলম্বে নিয়ে এসো।  
তাঁকে বলো যে, বীরগণ তাঁকে কামনা করছেন,  
শাহী তথ্য তাঁর জন্য সংজ্ঞিত করে রাখা হয়েছে।

কাজেই হে মহদাশয়, আপনি যদি কায়কোবাদের সন্ধান জানেন  
তবে বলুন ও আমাকে সেখানে পৌছিয়ে দিন।  
রুস্তমের কথায় সিংহাসনারাত্ তরুণ মৃদুহাস্য করে  
বললেন, হে বীর,  
ফারেদুনের বৎজাত কায়কোবাদ আমিই  
পিত্ত্পরম্পরাক্রমে আমি সকলের নাম স্মরণ করছি।  
এই কথা শোনামাত্র রুস্তম সম্ভবে আসন ছেড়ে  
উঠে এলেন ও তাঁর সামনে মস্তক অবনত করলেন।  
তারপর বললেন, হে রাজরাজেশ্বর,  
হে বীরগণের আশ্রয় ও সামন্তগণের সহায়ক,  
ইরানের সিংহাসন আপনার জন্য শুভ হটক,  
মদমত হস্তীদল আবক্ষ হোক আপনার নিষ্কেপিত জালে।  
আপনার সিংহাসনারোহণ ইরানের জন্য  
সমারোহ ও উন্মত্তির কারণ হোক।  
দেশাধিপতির সমীপে আমি বীরাগ্রগণ্য জালের  
আশীর্বাদবাণী উচ্চারণ করি।  
দাসের প্রতি যদি অনুমতি হয়  
তবে যে-গোপন বাণী নিয়ে আমার আগমন তা প্রকাশ করি  
যুদ্ধাদ্যোগী বীরবৃন্দের সন্দেশ  
নিবেদন করি রাজসমীপে।  
এই কথা শুনে কায়কোবাদ সিংহাসন থেকে নেমে এসে  
রুস্তমকে তাঁর অনুমতি জ্ঞাপন করলেন।  
রুস্তম এইবার তাঁর রসনা উন্মুক্ত করে  
ইরান-সেনাপতির বাণী তাঁকে দান করলেন।  
জালের বাণী কর্ণগোচর করা মাত্র  
উৎসাহে কায়কোবাদের বক্ষ নেচে উঠলো।  
তিনি উৎকৃষ্ট সুরা পরিবেশনের আদেশ দিলেন  
ও রুস্তমের নামোচারণ করে পানপাত্র ওষ্ঠ স্পর্শ করালেন।  
রুস্তমও বাদশার দীর্ঘায়ু কামনা করে  
পানপাত্র হাতে নিয়ে তা নিঃশেষে পান করলেন।  
এবং বললেন, হে বাদশা, আপনিই মহামতি ফারেদুনের  
পরিচয় বহন করছেন,  
আপনার সন্দর্শনে রুস্তমের প্রাণমন আজ নন্দিত।

আপনার বিহনে দীর্ঘদিন ধরে  
পৃথিবী শাহী-সিংহাসন ও কেয়ানী মুকুট থেকে বক্ষিত ছিল।  
আজ আমার হাদয়ের কোলাহল সঙ্গীতের মাধুর্য নিয়ে নির্গত হচ্ছে,  
আনন্দ উচ্ছলিত হচ্ছে ও বিশাদ হচ্ছে দূরীভূত।

মনের নেশা অপগত হলে  
তরুণ বাদশার মুখমণ্ডলে হাসি দেখা দিল।  
তিনি রুষ্টমকে লক্ষ্য করে বললেন,  
হে বিজ্ঞ তরুণ, আমি কাল রাত্রে এক স্বপ্ন দেখেছি।

দেখেছি, দৃঢ় শ্রেত-পক্ষ শ্যেন পাখি  
ইরানের দিগন্ত থেকে একটি সূর্যসদৃশ মুকুট নিয়ে  
আমার কাছে উড়ে এসেছে,  
ও সেই মুকুট পরিয়ে দিয়েছে আমার শিরে।

ঘূম থেকে জেগে উঠার সঙ্গে সঙ্গে  
আমার হাদয় এক মহৃষী আশায় পূর্ণ হয়ে উঠলো।  
আমি সজ্জিত করলাম নদীতীরের এই আসর  
যা আপনি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন।

আপনি সেই শ্রেত শ্যেনপক্ষীর মতো আমার কাছে  
বীরেন্দ্রবন্দের প্রতিশ্রুত সেই রাজমুকুট নিয়ে এসেছেন।

রুষ্টম শ্যেনপক্ষী ও উজ্জ্বল রাজমুকুটের স্বপ্নবৃত্তান্ত  
শ্রবণ করে বললেন,  
হে সম্রাট, আমার দৌত্য  
অবশ্যই আপনার স্বপ্নের সফল পরিণতি।

এখন গাত্রোধান করুন, চলুন আমরা ইরানের দিকে যাত্রা করি,  
এবং যথাশীত্র বীরগণ-সমূপে গিয়ে উপস্থিত হই।

রুষ্টমের আহ্বানে বাদশা কোবাদ  
লালবর্ণের এক যুদ্ধাশ্বে আরোহণ করে উষ্ণার মতো নির্গত হলেন।  
দিবারাত্র যাত্রা অব্যাহত রেখে  
অবশ্যে তাঁরা তুরানীদের গুপ্তচর বাহিনীর নিকটবর্তী হলেন।

বীরপ্রবর কলুন তখন  
সংগ্রামার্থে তাঁদের গতিপথ রক্ষ করে দাঁড়ালেন।  
নব ইরানরাজ এই দৃশ্য দেখে  
যুদ্ধার্থ বৃহৎ রচনা করার আদেশ দিলেন।

রুষ্টম বললেন, হে সম্রাট,

আপনাকে যুক্ত করতে হবে না ।  
আমি, রাখ্শ, প্রহরণ এবং বর্ষই  
এখানে যথেষ্ট হবে ।

আমার বক্ষদেশ, আমার প্রহরণ ও আমার বাহ্যিক আমার সহায়,  
বিশ্ব-প্রভু ব্যতিরেকে আর কোন রক্ষকের আমার প্রয়োজন নেই ।  
এই বলে রুস্তম রাখ্শকে উত্তেজিত করে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন  
ও নিমেষের মধ্যে শক্রব্যুহ তচ্ছন্ধ করে দিলেন ।

একজন প্রতিপক্ষের পর মুহূর্ত মধ্যে অন্যকে ধরাশায়ী করলেন,  
প্রহরণাঘাতে তার মস্তক বিচুরিত হয়ে দূরে ছিটকে পড়লো ।  
এইবার তিনি বিদুৎগতিতে অগ্রসর হয়ে অশ্বারোহী বীরগণের কয়েকজনকে  
অশৃপ্তি থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে আছড়ে মারলেন ।

এই আঘাতের প্রচণ্ডতায় তাদের  
মস্তক, গ্রীবাদেশ ও মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো ।

কলুন চেয়ে দেখলেন, এক দৈত্য যেন বক্ষনমুক্ত হয়ে  
হাতে প্রহরণ ও পাশ নিয়ে অশ্বারোহণে তার দিকে এগিয়ে আসছে ।  
কলুন বাযুগতি রুস্তমের দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করলেন  
ও বর্ণ নিক্ষেপে মুহূর্ত মধ্যে তাঁর বর্ষ-বক্ষন উন্মুক্ত করে দিলেন ।  
রুস্তম অগ্রসর হয়ে হস্ত দ্বারা তাঁকে আঘাত করে স্বীয় বর্ণ টেনে নিলেন,  
তাঁর ক্ষিপ্ততা ও বীরত্ব দেখে কলুন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন ।  
রুস্তম অন্য হাতে প্রখ্যাত বীর কলুনের বর্ণ ছিনিয়ে নিয়ে  
পর্বতের শীর্ষ-সংলগ্ন মেঘের মতো গর্জন করে উঠলেন,  
এবং মুহূর্ত মধ্যে কলুনকে বর্ণবিদ্ধ করে অশৃপ্তি থেকে উঠিয়ে নিয়ে  
মাটিতে নিক্ষেপ করলেন ।

কলুন শরবিদ্ধ পক্ষীর মতো মাটিতে পড়ে ছট্টফট করতে লাগলো,  
সকল তুরানী সৈন্য এই দৃশ্য চেয়ে দেখলো ।  
রাখ্শ যেন যুদ্ধের উন্মাদনায় মন্ত হয়ে উঠেছে,  
তার ক্ষুরের তাড়নায় উথিই হচ্ছে ধূলিরাশি ।  
এইবার শক্রসৈন্য কলুনকে পরিত্যাগ করে  
পলায়নপর হলো ।

এইভাবে শক্রদের গুপ্তচর বাহিনীকে পরাজিত বিত্রাসিত করে  
রুস্তম পর্বতের পাদদেশে ফিরে এলেন ।  
সুনির্মল জলাশয় ও সবুজের সমারোহে পূর্ণ সেই উপত্যকায় এসে  
তিনি অশৃপ্তি থেকে অবতরণ করলেন ।

ରାତ୍ରି ସମାଗତ ହଲେ  
ଯାଆର ଆଯୋଜନ କରା ହଲୋ ।  
ରାଜ୍କୀୟ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ମୁକୁଟ ସଙ୍ଗେ କରେ  
କୁଣ୍ଡମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଲେନ ।  
ତାରପର ଗଭୀର ରାତ୍ରିତେ  
ସାବଧାନୀ ବୀର ସମ୍ବାଦିତର ଆବାର ଯାଆ ଶୁରୁ କରଲେନ ।  
ଯଥାସମୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନେ ତାରା ଜାଲେର ସମୀପେ ଏସେ  
ଉପାସ୍ଥିତ ହଲେନ ।  
ଏକ ସପ୍ତାହ ଥରେ ସଂଗୋପନେ ଚଲତେ ଲାଗଲୋ  
ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନସହ ପରାମର୍ଶ ସଭା ।  
କାରଣ, କାହିଁକୋବାଦ ଯଥନ ଏକବାର ସିଂହାସନେ ଉପାବିଷ୍ଟ ହବେନ  
ତଥନ ସେଇ ସଂବାଦ ଆର କାରୋ କାହେ ଗୋପନ ଥାକବେ ନା ।  
ସୁତରାଙ୍ଗ ଏହି ଏକଟି ସପ୍ତାହଇ  
ତାରା ଆନନ୍ଦେ ଓ ସୁରାପାନେ କାଳ୍ୟାପନ କରାର ସୁଯୋଗ ପାବେନ ।  
ଅଷ୍ଟମ ଦିନେ ଶୁଭ କେଯାନୀ ସିଂହାସନ ଯଥାବିଧି ସାଂଜ୍ଜିତ କରା ହଲୋ,  
ଏବଂ ତାର ଶୀର୍ଷଦେଶେ ଶ୍ଵାସିତ କରା ହଲୋ ସମୁଜ୍ଜ୍ବଳ ରାଜ୍ମୁକୁଟ ।

## কায়কোবাদ

তিনি একশে বছর রাজত্ব করেছিলেন

কায়কোবাদ আনন্দিতচিত্তে সিংহাসনে উপবেশন করলেন,  
ও শিরে তুল নিলেন মুক্তাখচিত কেয়ানী তাজ।  
জাল ও কারেনের মতো জগজ্জয়ী বীরগণ  
তাঁর চতুর্পার্শ্ব আলোকিত করে রইলেন।  
কুশওয়াদ ও খর্বাদের মতো সামন্তগণ  
নতুন রাজমুকুটের উপর করলেন মুক্তার বারিবর্ষণ  
বীরেন্দ্রবৃন্দ ও সামন্তগণ বললেন, হে সন্তাট,  
তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করুন।  
কায়কোবাদ তাঁদের মুখে আফ্রাসিয়াবের কীর্তিকলাপ  
শ্রবণ করে ইরানীয় সৈন্যদলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।  
বাদশার আদেশে সেনাপতিগণ  
ইস্পাত-নির্মিত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হলেন।  
বাদশার দরবার থেকে ঘোষণা প্রচারিত হলো,  
হে ইরানী সৈন্যদলের বীর সিপাহসালারগণ,  
এখন যুদ্ধের কাল, জিঘাসায় উদ্বোধিত হোন,  
উদ্ভিত তুর্কীগণের বিরুদ্ধে গুপ্ত ঘাঁটি সকল রচনা করুন।  
যে কেহ এই যুদ্ধে তার পৌরুষ প্রদর্শন করবে,  
আমার সমীপ থেকে তাকে দান করা হবে প্রভূত পুরস্কার  
পরদিন যথাসময়ে সৈন্যদল প্রস্তুত হলো যুদ্ধ্যাত্মার জন্য,  
সন্তাটের মহলে নিনাদিত হলো রংগদামামা।  
রুস্তম যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে  
মদমত হস্তীর মতো উথিত করলেন ধূলিরাশি।  
ইরানীয় বাহিনী শোণিতপাতের প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে  
সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হলো।  
সৈন্যদলের একপাশে রইলেন কাবুলরাজ মেহরাব,  
অন্যপাশে রংগকুশলী গুষ্ঠাহাম।  
মধ্যভাগ রক্ষা করে চললেন বীরপ্রবর কারেন,  
তাঁর সঙ্গে রইলেন শক্রনিধনকারী কুশওয়াদ।  
সম্মুখভাগ রক্ষার ভার পড়লো,  
অগ্রগণ্য বীরবন্দসহ শূরশ্রেষ্ঠ রুস্তমের উপরে।

ঠিক তাঁদেরই পেছনে মহামতি জাল কায়কোবাদসহ  
প্রতিষ্ঠিত রইলেন,  
তাঁদের এক হাতে অগ্নি অন্য হাতে বাতাস।  
সম্মুখে উড়ীয়মান হলো কাওয়ানী বাণী,  
তার বর্ণ-সমারোহে ধরণী যুগপৎ হলুদ, লাল ও নীল বর্ণে  
চিত্রিত হলো  
সুসজ্জিত ময়ূরপত্ত্বীর মতো ধরণী ভাসমান হলো,  
চীন সাগরে যেন জাগলো উর্মিদোলা।  
চালচর্মে বনপ্রাণীর একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেলো,  
অসিফলক প্রদীপের মতো উঠলো দীপ্ত হয়ে।  
ধরণী কঢ়িবর্ণ নদীজলের মতো প্লাবিত করলো তার দুই তীর,  
সেই জলে প্রতিবিস্থিত হলো লক্ষ লক্ষ তারার প্রদীপ।  
কাড়ানাকাড়ার নিনাদে সৈন্যদলের কোলাহলে  
সূর্য যেন তার নিত্যকার গন্তব্যপথ হারিয়ে ফেললো।  
অন্যদিকে আফ্রাসিয়াবও সজ্জিত হলেন যুদ্ধসাজে,  
তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বিখ্যাত বীরগণও যুদ্ধার্থ কোমর বাঁধলো।  
আফ্রাসিয়াবের সৈন্যদলের ডান পাশে রইলেন  
বিখ্যাত সামন্তগণসহ ওয়েসার মতো বীর।  
বাম পাশ রক্ষা করে রইলেন উজ্জ্বল বর্ণাধারী সেনানীবন্দসহ  
বীরপ্রবর শামাসাস ও গর্সিউজ।  
মধ্যভাগে স্বয়ং তুরানাধিপতি (আফ্রাসিয়াব)  
জিঘাংসাপ্রায়ণ বীরবন্দসহ চারদিক আলোকিত করে রইলেন।  
তাদের চলায় আকাশে কঢ়িবর্ণ মেঘদল ঘনীভূত হলো,  
তাতে ঢাকা পড়লো শনি গ্রহ ও অন্যান্য তারাদল !  
দুই সৈন্যদলই একপথে পরম্পরের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে,  
তারা যেন দুদিকেই সীমাহীন অন্ত !  
দুই বাহিনী থেকেই উপরিত হচ্ছে নাকাড়া ও দুন্দুভির নিনাদ,  
ধরণী যেন আকাশের হস্ত চুম্বন করে চলেছে।  
ইস্পাত পরানো অশু-খুরের তাড়নায়  
পৃথিবী আকাশের মতো চলমান হতে চাইছে।  
বর্ণাফলকের শীর্ষদেশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তারকারাজি  
শালিত অসিধারে উৎকীর্ণ হচ্ছে অগ্নি।  
রক্তধারায় রণভূমির পিপাসিত অস্তর তৃপ্ত হতে চাইছে,

বীরবন্দের তলোয়ার থেকে মস্তক উন্মীত করতে পারছে না  
বীরগণ।

গুপ্ত ঘাঁটি থেকে পাশরজ্জুতে আবদ্ধ হচ্ছে কত না প্রাণ,  
বৃহমধ্যস্থ তাপ থেকে সঞ্চারিত হচ্ছে সৈন্যদলের চলৎশক্তি।

সংগ্রাম-কুশলী কারেন এই দৃশ্য দেখে  
সিংহের মতো রণহুক্ষার উথিত করলেন  
ও সৈন্যদলের সামনে এসে

প্রতিপক্ষকে জানালেন সদর্প আহ্বান।

যুদ্ধক্ষেত্রে কাল তখন বিদ্যুচমক প্রদর্শন করলো,

বাহু প্রদর্শন করলো পৌরুষের নৈপুণ্য।

কারেন বললেন, আমি বীরগণের রক্ষক,

আমি ইরানী বীরবন্দের একজন।

আমি এমন একজন প্রতিপক্ষ কামনা করছি,

যে আমার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে পারে।

কারেনের প্রত্যুত্তরে শক্রদল থেকে কেউই তাঁর সম্মুখীন হতে

সাহস করলো না,

বীরত্ব যেন তাদের মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে স্তব্ধ রইলো।

এমন সময় আফাসিযাব জিঘাংসায মত হয়ে

তাঁর সৈন্যগণকে উত্তেজিত করলেন।

এদিকে শাহী সৈন্যদলও অগ্রসর হলো তুরানীদের দিকে,

তাদের পদধূলিতে চন্দ্র সূর্য ঢাকা পড়লো।

এমন সময় সংগ্রামী কারেনের এক আক্রমণে

একই সঙ্গে দশজন প্রতিপক্ষ নির্মূল হয়ে গেলো।

তিনি কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে

রণমত প্রতিপক্ষকে দলন করে চললেন।

জগজ্জয়ী সৈন্যদলের মধ্যেও

মহাবীর কারেন আজ দুর্বল সিংহ।

কখনো প্রহরণ, কখনো অসি, কখনো দীর্ঘ বর্ণাফলকে

তিনি উন্নতশির প্রতিপক্ষকে নিধন করে চললেন।

হত শক্রতে যুদ্ধক্ষেত্রে পর্বতাকার হলো

শক্রবুহে নেমে এলো হতাশা।

এমন সময় বীরবর তাঁর সামনে শমাসাসকে দেখতে পেয়ে

সিংহনাদ উথিত করলেন,

ও তার দিকে সবেগে ধাবিত হয়ে  
কটিদেশ থেকে অসি নিষ্কোশিত করলেন।  
বিষমিশ্রিত সেই অসির আঘাত হানলেন তিনি শামাসাসের মন্তকে  
আর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমিই স্বনামধন্য কারেন।  
শামাসাস অধোমুখে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন  
তখনই বহিগত হয়ে গেলো! তাঁর প্রাণ-বায়ু।  
প্রবীণ আকাশের এই-ই রীতি —  
কখনো সে ধনুকের মতো বাঁকা কখনো তীরের মতো ঝাজু।

## ଆତ୍ମପରିଚୟାବେର ସଙ୍ଗେ କୁନ୍ତମେର ଯୁଦ୍ଧ

କୁନ୍ତମ କାରେନେର ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ଓ ବୀରତ୍ତ  
ପ୍ରାଣଭରେ ଉପଭୋଗ କରଲେନ ।  
ତାରପର ପିତାର ସମୀପେ ଏସେ  
ଜିଞ୍ଜାସା କରଲେନ, ହେ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା,  
ଆପନି ଆମାକେ ବଲୁନ, ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପିଶଙ୍କ-ପୁତ୍ର ଏଥିନ  
ରଣକ୍ଷେତ୍ରେର କୋନ ଦିକେ ଅବଶ୍ଥାନ କରଛେ ?  
କୋଥାଯ ତିନି ତୁରାନୀ ଝାଣ୍ଡା ଉଚୁ କରେ  
ସଦର୍ପେ ବିରାଜ କରଛେ ?  
ତୀର ସନ୍ଧାନ ଆମାକେ ବଲୁନ, ତୀର ସଙ୍ଗେ ଆମି ଯୁଦ୍ଧ କରବୋ,  
ବୀରବୃନ୍ଦେର ମଧ୍ୟେ ଆମି ସମ୍ମନୁତ କରବୋ ଆମାର ଶିର ।  
ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମାର ସହାୟ ହୁନ,  
ତବେ ଅବଶ୍ୟାଇ ଆମି ତାଁକେ ବାଦଶାର ସମୀପେ ଟେନେ ନିଯେ ଆସବୋ ।  
ଆଜ ତିନି ଛାଡ଼ା ଆର କାରୋ ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଯୁଦ୍ଧ ନଯ,  
ଆଜ ଶୁଦ୍ଧ ଆମି ଥାକବୋ, ଥାକବେ ଆମାର ପ୍ରହରଣ,  
ଥାକବେ ଯୁଦ୍ଧର ମୟଦାନ ଓ ପିଶଙ୍କ-ପୁତ୍ର ।  
ଆଜ ଆମି ତାର କୋମରବନ୍ଧ ଧରେ ଆକର୍ଷଣ କରବୋ  
ଓ ଅବଲୀଲାଯ ତାକେ ନିଯେ ଆସବୋ ଏଥାନେ ।  
ପ୍ରାଣେର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମ ପ୍ରଭୂର କୃପାୟ  
ସେ ଯଦି ପାହାଡ଼େର ମତୋଓ ଟାଟିଲ ହୟ, ତବୁ ତାକେ ସ୍ଵଶ୍ରାନ୍ତ ଥେକେ  
ବିଚଲିତ କରବୋ,  
ସେଇ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି, ବିଧରୀ ଓ ପ୍ରାଣହୀନ ନରାଧମକେ  
ବନ୍ଧନ କରେ ନିଯେ ଆସବ କାଯକୋବାଦେର ସମୀପେ ।  
କୁନ୍ତମେର କଥା ଶୁଣେ ଜାଲ ବଲଲେନ, ହେ ପୁତ୍ର, ଅବଧାନ କରୋ,  
ଆରୋ ଏକଦିନ ନିଜେକେ ସଂଘତ କରେ ରାଖ ।  
କାରଣ ଏଇ ତୁକୀ ବୀର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଆଜଦାହାର ମତୋଇ ଭୟକର,  
ସଙ୍କଳପ ଓ ପ୍ରତିହିସାୟ ସେ ଅମଗଲେର ଘନଘଟା ।  
ତାର ଝାଣ୍ଡା କାଳୋ ରଙ୍ଗେ, ତାର ପୋଶାକ ଓ ଘୋର କଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ,  
ତାର ବାହୁଦୟ ଲୋହ-ବର୍ମେ ଓ ଶିରୋଦେଶ ଲୋହ-ଶିରମ୍ପାଣେ ଆଛାଦିତ ।  
ତାର ଲୋହ-କଟିନ ମୁଖମ୍ବଳ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ-ନିର୍ମିତ ଆଛାଦନୀତେ ଢାକା,  
ତାର କାଳୋ ପତାକା ତାର ଶିରମ୍ପାଣେର ଉପରେ ଧରା ରଯେଛେ ।  
ଯୁଦ୍ଧେ ସେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ —

পিশঙ্গ-পুত্রের রণকোশলের এ এক অপরিহার্য অঙ্গ।  
চক্ষের নিম্নে সে নদী থেকে আনে ভীষণতম নক্রকে,  
তার কনুই থেকে পাঞ্জা পর্যন্ত দীর্ঘ অঙ্গিতম অঙ্গুলি।  
তার রোষ থেকে বাঁচবার জন্য নিজের উপর নজর রাখতে হয় সর্বক্ষণ,  
কারণ সে যেমন বীর তেমনি ভাগ্যবান।

এই আফ্রাসিয়াবের নাম শুনলে  
লৌহগিরি ও বিগলিত হয়ে ধারণ করে স্নোতবিনীর আকার।  
রুস্তম পিতার কথা শুনে বললেন, হে পিতঃঃ,  
আপনি আমার অস্তরে ভীতি সঞ্চারের প্রয়াস করবেন না।  
বিশ্ব-স্বষ্টা আমার সহায়,  
সাহস, তরবারি ও বাহুবল আমার দুর্গ-প্রাচীর।  
যদি সে আজদাহার মতো ভয়ঙ্কর ও দৈত্যের মতো বলশালীও হয়  
তবু তাকে কোমরে বেঁধে আমি টেনে নিয়ে আসবো।  
আপনি এখনি দেখতে পাবেন কি করে আমি  
সংগ্রামকামী তুর্কী নরপতিকে আকর্ষণ করে আনছি সৈন্য  
শ্রেণীর সামনে।

এমন যুদ্ধ আমি তার সঙ্গে করবো যে,  
পিশঙ্গ-এর সৈন্যগণ তা দেখে ভয়ে পলায়নপর হবে।  
এই বলে রুস্তম রাখ্শকে উত্তেজিত করলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে নাদিত হলো বিষণ।  
অশু প্রধারিত করে রুস্তম তুরানী সৈন্যদলের সামনে এসে দাঁড়ালেন,  
ও উথিত করলেন সিংহনাদ।  
আফ্রাসিয়াব দূর থেকে এক বালকের  
এমন সাহস দেখে বিস্মিত হলেন।  
তিনি তাঁর পাশুস্থিত বীরগণকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন,  
এই আজদাহাটি কে ? মনে হচ্ছে এই মাত্র যেন সে বক্ষন-মুস্ত  
হয়ে এসেছে।

কে সে ? কি তার নাম ?  
উত্তরে একজন জানালো, সে সাম-বন্দন জালের পুত্র।  
তার নাম রুস্তম — উত্তেজ্যের প্রতিমূর্তি সে,  
আগুন পানি সর্বত্র সে সমানে ঝাপিয়ে পড়ে।  
আপনি কি দেখছেন না তাঁর হাতে ধরা রয়েছে সামের প্রহরণ,—  
সে তরুণ ও যশঃকামী।

এই কথা শুনে আফ্রাসিয়ার সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে এসে  
দাঁড়ালেন,

তরী যেন উর্মিদলের আঘাতে উৎখায়িত হয়েছে।

রুম্নম তাঁকে দেখেই স্বীয় জঙ্ঘাদেশে করাধাত করে  
কাঁধে তুলে নিলেন গুরুভার প্রহরণ।

তারপর উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব যখন কম হয়ে এলো,  
তখন রুম্নম অশৃপ্ত থেকে উদ্যত করলেন তাঁর গুরুভার প্রহরণ।  
আফ্রাসিয়ার তা দেখেই তাঁর কটিদেশে রাক্ষিত  
তরবারি আকর্ষণ করে নিলেন।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি তা নিয়ে লড়াই করে চললেন  
জাল-পুত্রের সঙ্গে,

রুম্নম এইবার তাঁর পাঞ্চা প্রসারিত করে  
বজ্রমুক্তিতে আফ্রাসিয়াবের কোমরবন্ধ ধরে টান দিলেন,  
ও তাঁকে মহাবিক্রমে অশৃপ্ত থেকে বিমুক্ত করে ফেললেন।  
রুম্নম ভাবলেন, এইভাবে তাঁকে টেনে নিয়ে যাবেন  
কায়কোবাদের কাছে,

যাতে প্রথমদিনের যুদ্ধেই তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে থকে।  
কিন্তু তুরান-রাজ ও রুম্নমের মধ্যে অঠিরেই শুরু হয়ে গেলো টানাটানি,  
কোমরবন্ধের রজ্জু সেই আকর্ষণ সহ্য করতে না পেরে ছিড়ে গেলো।  
সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে পড়লেন তুরান-রাজ,  
ও তাঁকে আগলে দাঁড়ালো তাঁর সৈন্যদল।

রুম্নম তখন নিমেষের মধ্যে তাঁর হস্ত প্রসারিত করে  
আফ্রাসিয়াবের মস্তক থেকে ছিনিয়ে নিলেন তাঁর রাজ-মুকুট।  
তুরান-রাজ রুম্নমের হাত থেকে এইভাবে ফসকে যাওয়ায়  
রুম্নম রাগে ও ক্ষেত্রে নিজের হাত কামড়াতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে ইরানের বীরগণ মহাবীরের পাশে  
এসে জমায়েত হলো।

কারেন, কুশ্বয়াদ প্রমুখ মহারথিগণ  
উচ্চকর্ত্তে রুম্নমের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন।  
এমন সময় রুম্নম জনৈক সিপাহীকে কাছে ডেকে  
এইমাত্র যা ঘটে গেলো তার বর্ণনা দিয়ে বললেন,  
তুরানরাজের কোমরবন্ধ ধরে আকর্ষণ করেছিলাম,  
অভিপ্রায় ছিল, সেইভাবেই তাঁকে টেনে নিয়ে যাবো বাদশার কাছে।

কিন্তু সহসা কোমরবন্ধ ছিড়ে গেলো,  
 মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তিনি আমার হাত থেকে রেহাই  
 পেয়ে গেলেন।  
 মাটি থেকে উঠে যখন তিনি দাঁড়ালেন,  
 তখনও তাঁর শিরে শোভা পাছিল সমুজ্জ্বল তাজ।  
 আমি ছিনিয়ে নিলাম সেই তাজ,  
 অগত্যা সেই তাজই আমি বাদশার সমীপে প্রেরণ করছি।  
 এই বলে রুশ্ম কোষ থেকে টেনে নিলেন খরশান তরবারি,  
 ও তা নিয়ে প্রলয় উদ্ধিত করলেন তুরানীয় সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে।  
 এমন সময় হস্তিপৃষ্ঠে বেজে উঠলো বিজয়ড়কা,  
 তার নিনাদ ছড়িয়ে পড়লো ক্রোশ থেকে ক্রোশাস্তরে।  
 কতিপয় সৈন্য তখন সুসংবাদ নিয়ে ছুটলো বাদশার কাছে,  
 তাঁকে গিয়ে বললো, রুশ্ম প্রতিপক্ষের সৈন্যবাহিনীর  
 বক্ষ বিদীর্ণ করে দিয়েছেন।  
 তিনি তুরান-রাজের সমীপবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
 তুরানী পতাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।  
 তিনি তাঁর কোমরবন্ধ ধরে আকর্ষণ করে তাঁকে নিক্ষেপ করেছেন  
 অপমানিত অবস্থায় মাটিতে,  
 সঙ্গে সঙ্গে তুরানীয় সৈন্যদলেও পড়ে গেছে হাহাকার।  
 তারা কোন রকমে তাদের রাজাকে তুলে নিয়ে  
 অন্তর্ধান করেছে।  
 এইভাবে তুরান-রাজ রুশ্মের হাতে পরাজিত হয়ে  
 এক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে  
 অবিলম্বে স্বীয় সৈন্যদলকে ছেড়ে  
 বন-পথ ধরে পালিয়ে গেছেন।  
 এই সুসংবাদ শুনে সম্রাট কোবাদ  
 সৈন্যদের মধ্যে বাযুগতি আদেশ প্রচার করে দিলন,—  
 তোমরা সমবেতভাবে তুরানী সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো,  
 ও শাখা-প্রশাখাসহ তাদেরকে উশুলিত করে দাও।  
 আদেশ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট নিজেও  
 অগ্নিগোলকের মতো ধাবমান হলেন সামনের দিকে,  
 সৈন্যবাহিনীও যেন বাযুতাড়নে উর্মি-মুখের নদীতে পরিণত হলো।  
 বীরপ্রবর জাল ও মেহরাব

সিংহের মতো গজ্জন করে অগ্রসর হলেন।  
চারদিকে উঠিত হলো সমর কোলাহল,  
খঙ্গের ও তীরের ফলা বিদ্যুতের মতো চম্কাতে লাগলো।  
স্বর্ণময় তাজ ও স্বর্ণ-খচিত ঢাল-চর্ম  
কুঠারাধাতে বিদীর্ঘ মস্তকান্দথে বিষণ্ঠ হয়ে উঠলো।  
যেন ঝৈশান কোণ থেকে উঠিত হলো প্রলয়ের মেঘ,  
নিম্নুক বনে সে ছড়িয়ে দিলো শোশিতাঙ্গ বারিধারা।  
দুই দিক থেকে দুই প্রতিপক্ষ পরম্পরের প্রতি  
ধাবিত হলো চরম জিঘাংসায়,  
তাদের নৈকট্যে মনে হলো, দুই দল মিলে পরম্পর  
একাকার হয়ে গোছে।

হতাহতের বেদনা-চিংকার ও দুন্দুভির নিনাদ  
যেন মেঘগর্জনকে উপহাস করতে লাগলো।  
সিংহের ইস্পাত-নখরের টানে  
দীর্ঘ হতে লাগলো ব্যাঞ্চের বুক ও নেকড়ের গাত্রচর্ম।  
রুস্তমের হাতে ধরা রয়েছে গোমুখাঙ্কিত প্রহরণ,  
তা দিয়ে তিনি অনুরঙ্গিত করে চলেছেন ধরণীবক্ষ।  
যেদিকেই তিনি ধাবিত করছেন তাঁর অশু  
সেদিকে ঝরে পড়ছে প্রতিপক্ষের শির হেমন্তের শুকনো  
পাতার মতো।

যখনই তিনি কোন বীরের মস্তকে তরবারির আঘাত হানছেন,  
তখনই পর্বতশীর্ষ-সমান উন্নতমস্তক অবনত হয়ে পড়ছে।  
বীরগণের রক্তে মাটির ময়দানে  
বয়ে যাচ্ছে শোশিতের ঢেউ।  
প্রাস্তরের সর্বদেহ আপাদমস্তক,  
অশুখুরের তাড়নায় ক্রম্লন করে উঠছে।  
যুদ্ধের এই দিন, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে  
মীনরাশিতে নিয়ে গোলো রক্তের আর্দ্রতা  
ও চন্দ্রলোকে ধূলিরাশি।  
এইভাবে যুদ্ধের দিনের অস্ত হলো,

মীনরাশিতে নীত হলো রক্তের আর্দ্রতা ও চন্দ্রলোকে উথিত  
হলো ধূলিরাশি ।

বিরাট প্রাস্তরে এখন অশু-খুরের অযুত চিহ্ন দেখে  
ধরণী হতবাক ও আকাশ প্রকস্পিত হতে লাগলো ।  
আজকার এই যুক্তে মহাবীর রুক্ষম  
তরবারি, খণ্ডর, প্রহরণ ও পাশের দুরা যুগপৎ  
বীরগণের শির, বক্ষ ও হস্তপদ  
কর্তন, বিদারণ ও বক্তন করে চলেছিলেন অবলীলায় ।  
এক একটি আক্রমণে তিনি নিধন করেছেন  
এক হাজার একশো ষাট জন প্রতিপক্ষকে ।

জাল স্থীয় সন্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন,  
তাঁর শক্তি, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সফলতায়  
গর্বে ও আনন্দে নেচে উঠেছে তাঁর বুক  
নিজের মনে তিনি বলে চলেছেন, আহা রুক্ষম অনুপম মহীয়ান !  
তুর্কী সৈন্যদল ততক্ষণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নপর হয়েছে ।  
তারা প্রথমে কোহিস্তানের অস্তর্গত দামগা নগরীর দিকে  
মুখ করলো ।

পরে সেখান থেকে ভগু হৃদয়ে হা-হৃতাশ নিয়ে  
অগ্রসর হলো জেহ্ব পথে ।  
তাদের অস্ত্রশস্ত্র টুটে খান খান হয়ে গেছে,  
তাদের কোমর ভেড়ে গেছে,  
তাদের রণবাদ্য মীরব ও অশু নির্খোজ হয়েছে, সৈন্যবাহিনীর  
অগ্রপচার হয়েছে ছিন্নভিন্ন ।

তিন দিন অনবরত পথ চলে তারা নদী-তটে এসে পৌছলো,  
চতুর্থ দিনে আবার সেখন থেকে শুরু করলো পশ্চাদাপসরণ ।  
এদিকে ইরানীয় সৈন্যদল  
ফিরে এলো তাদের বাদশার সমীপে ।  
অধিকৃত সম্পদের ভারে তারা এখন ক্লান্ত,  
বন্দী তুর্কীদের বোঝা বয়ে আনতে হয়েছে বলে তাদের  
চলন হয়েছে শুরু ।  
নিরাপদে ও হষ্টচিত্তে বাদশার সমীপে ফিরে এসে  
তারা উচ্চারণ করলো তাঁর জয়ধ্বনি ।

সৈন্যদলের পশ্চাতেই এলেন রুস্তম,  
বাদশার শির আজ সমুন্ত সপ্তর্ষীদলে।  
বাদশা রুস্তমকে দেখতে পেয়েই ভুরিতে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন  
ও রুস্তমের হাতে রাখলেন নিজের হাত।  
তারপর স্বীয় সিংহাসনের এক পাশে রুস্তমকে বসিয়ে  
অপর পাশে উপবিষ্ট করালেন মহামান্য জালকে।

## স্বীয় পিতার সমীপে আফ্রাসিয়াবের আগমন

আফ্রাসিয়াব সেখান থেকে পালিয়ে  
সৈন্যদলসহ জেছুর তীরে এসে উপস্থিত হলেন।  
সাতদিন সেখানে বিশ্বাম নিয়ে  
অষ্টম দিনে আত্মগ্নানি ও দীর্ঘশ্বাসসহ আবার যাত্রা করলেন।  
যথাসময়ে পিশঙ্গ-পুত্র পিতার সমীপে উপস্থিত হয়ে  
ভগ্ন হৃদয়ে তাঁকে নিবেদন করলেন যুদ্ধের কথা।  
বললেন, হে যশোরী নরপতি,  
এই যুদ্ধ সংঘটিত করা আপনার অনুচিত হয়েছে।  
প্রথমত, ইরান-শাহের সঙ্গে যে সন্ধি হয়েছিল  
তা সম্পূর্ণ অবিবেচনার সঙ্গে ভঙ্গ করা হয়েছে।  
আমাদের বীরগণ বুবতে পারেন নি, সন্ধি ভঙ্গকারিগণ  
লোকসমাজে সম্মানিত আসনের অধিকারী হন না।  
ফলে, ধরিত্বী এরজের বৎস থেকে পরিত্বাণ পেলো না,  
ত্বলাহল রূপান্তরিত হলো না অমৃতে।  
একজন গেলো, অন্যজন এলো,  
ধরিত্বী অনাথ হলো না।  
কোবাদ এসে আপন শিরে তুলে নিলেন শাহীতাজ,  
এবং নতুন প্রতিহিংসায় কোমর বাঁধলেন।  
সামের পশ্চাতে উদয় হলো অন্য এক অশ্বারোহীর,  
জাল তার নাম রেখেছেন রুস্তম।  
এমন এক ভয়ঙ্কর নক্তের মতো সে এগিয়ে এলো,  
ধরিত্বী যার নিঃশ্বাসে জ্বলে পুড়ে থাক হয়ে যায়।  
সানুশীর্ষ সর্বত্র সে বিচরণ করে ফিরে অবলীলায়,  
সে সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করে তরবারি, পাশ ও প্রহরণ।  
সে তার মুদ্দার দ্বারা দীর্ঘ-বিদীর্ঘ করে বায়ুমণ্ডল,  
সে আমার প্রাণকে একমুষ্টি মৃত্যুকার তুল্য জ্ঞান করে।  
অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে সে বিদীর্ঘ করে দিয়েছে  
আমার সৈন্যবাহিনীর বুহ।  
সে অপাঙ্গে লক্ষ্য করেছে আমার পতাকা,  
আর মুহূর্ত মধ্যে অশৃপ্ত থেকে আমার উপর উদ্যত করেছে  
তার প্রহরণ।

সে আমার কোমরবক্ষ ধরে টান দিয়েছে,  
আর আমার মনে হয়েছে, সেই আকর্ষণে বিযুক্ত হবে আমার  
স্নাযুতত্ত্বী।

কিন্তু আকর্ষণের দুর্বার শক্তিতে ছিন্ন হয়ে গেলো আমার কোমরবক্ষ  
তাল সামলাতে না পেরে আমি গড়িয়ে পড়লাম মৃত্তিকায়।  
সম্বট, এমন শক্তি কোন সিংহেরও পরিদৃষ্ট হয় না,  
মনে হয়, সে যেন মৃত্তিকায় প্রতিষ্ঠিত থেকে মস্তক উন্নীত  
করেছে মেঘমালার উর্ধ্বে।

আমার যুদ্ধরত সৈন্যগণ সমবেতভাবে  
আমাকে আকর্ষণ করে নিয়েছে তার বজ্জমুষ্টি থেকে।  
আপনি সম্যক অবগত আছেন আমার সাহস ও বীরত্বের কথা,  
জানেন আমার বজ্জমুষ্টি, নৈপুণ্য ও সঙ্কল্পের শক্তি কত !  
তবু, তার হাতে আমি কিশলয়ের মতো ক্ষীণতনু প্রমাণিত হয়েছি,  
তার সামনে আমার আগই যেন হয়ে উঠেছিল এক সংশয়ের বস্তু।  
হস্তীর মতো বিপুলকায় ও সিংহের পাঞ্চাযুক্ত এই বীরকে দেখে,  
লোপ পেয়েছিল আমার সংজ্ঞা, বুদ্ধি, আমার বিবেচনা ও সঙ্কল্প।  
পর্বত, কল্দর ও বিপথ সর্বত্র

সে তার অশুবল্ক্ষ্য করে ছুটে বেড়ায়।  
বহু বীর ও সিংহ-পুরুষ আমি স্বচক্ষে দেখেছি,  
অনেক অশ্঵ারোহীর অপূর্ব কৌশলের কাহিনীও শ্রবণ করেছি ;  
কিন্তু তার পথে সাগর কিংবা পাহাড় যাই পড়ুক,  
সিংহ কিংবা হাতী যাই আসুক,  
সে সমান ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে যায় সংগ্রামের দিকে —  
মৃগয়ার মস্ততায় ও ক্রীড়ার আনন্দে।  
সুতরাং এখন সঙ্গি ছাড়া অন্য উপায় আমি দেখি না,  
আপনার সৈন্যবাহিনী কিছুতেই তার সমকক্ষ নয়।  
আমি জগজ্জয়ী বীর, আপনার সেনাদলের আমি রক্ষক,  
বিপদে তারা গ্রহণ করে আমারই শরণ।  
সেই আমিই বলছি, তার সঙ্গে কিছুতেই আমরা এটে উঠতে পারব না,  
বলছি, সঙ্কিই এখন আমাদের একমাত্র পথ।  
বীরপ্রবর ফারেদুন শুরশ্রেষ্ঠ তূরকে  
দান করেছিলেন ধরিত্বীর একাংশ।  
সেটুকু নিয়েই সস্তু থাকুন,

পুরানো কলহের কথা আর স্মরণ করবেন না।  
যদি আমরা তা থেকে প্রত্যাবর্তন করি যুদ্ধের পথে,  
তবে ধরণী আমাদের জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে।

আপনি জানেন, সংবাদের চেয়ে প্রত্যক্ষতা অধিকতর নির্ভরযোগ্য।  
শোনা কথায় কেউ সহজে কান দেয় না।

আপনার এই ইরান অভিযান যে—ক্রীড়া প্রদর্শন করেছে  
সেই ক্রীড়ায় সৈন্যরা প্রত্যক্ষ করেছে পলায়নের এক দীর্ঘ পথ।  
সম্প্রাট, আজকের কাজ আগামী দিনের জন্যে ফেলে রাখবেন না,  
কারণ আগামী দিনে কালের কি পরিবর্তন হবে তা কেউ জানে না।  
বলে আজ বসন্তের যে—উৎসব,  
কাল হয়তো সেই ফুল গোলাপ কোন কাজেই লাগবে না।

লক্ষ্য করুন, এই স্বর্ণময় অশুসজ্জার দাম কি,  
কি মূল্য এই স্বর্ণ-নির্মিত মুকুট ও সোনালী ঢাল চর্মের ?  
এই আরবী অশুরাজি আর তাদের দামী বল্কা —  
এই হিন্দুস্তানী তলোয়ার ও তার স্বর্ণধচিত কোষ —  
এরা কোন্ কাজে লাগলো ? কি হলো সেই যশস্বী বীরবৃন্দের —  
যাঁদেরকে পরিণামে অপমানিত হতে হলো ?

সেই গুলবাদ সেই বারমান,—  
সিংহ ছিল যাঁদের মৃগয়ার লক্ষ্য, তাঁরা আজ কোথায় ?  
কোথায় খজ্রওয়ান,  
জাল যাঁকে গুরুভার প্রহরণের আঘাতে নিধন করেছেন ?  
জিঘাংসাপরায়ণ ও সৈন্যদলের সহায় সেই শয়াসাস আজ কোথায়,  
কারেন যাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত করেছেন নির্মভাবে ?  
এইসব বিখ্যাত সেনাপতি ছাড়াও আরো  
দশ হাজার বীর সৈনিক নিহত হয়েছেন এই যুদ্ধে।  
অসম সাহসী কলুন রুশের হাতে  
শোচনীয়ভাবে হয়েছেন পরাজিত ও নিহত।  
সেই যশস্বী বীরবৃন্দের পরাজয়ের কলক্ষের চাইতেও  
অধিক হলো অন্যায় যুদ্ধ।  
আমারই কারণে যদি এই বীরগণ গত হয়ে থাকেন,  
বিখ্যাত আগ্রীস যদি হত হয়ে থাকেন আমারই হাতে,  
তবে অবশ্যই সে পাপের ফল  
ভোগ করতে হবে আমাকে আজ কিংবা কাল।

এই কারণেই হয়তো আমার চারদিক ঘিরে এসেছিল  
শক্রসৈন্য পতাকা উচু করে।  
তারা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল বিগত দিনের পাপ,  
তারা আমার দিকে তেড়ে এসেছিল আর আমি  
পালিয়েছিলাম অপমানিত অবস্থায়  
অপমান ও অনুশোচনা আজ আমার অনুষঙ্গী হয়েছে,  
স্বীয় কৃতকর্মে আমার অস্তর হয়েছে আজ বিষাদে পরিপূর্ণ।  
কালের ব্যবহারে আজ আমি ক্ষত-বিক্ষত,  
হে সম্ভাট, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।  
এখন অতীতের কথা আর স্মরণ করবেন না,  
কায়ফোবাদের সঙ্গে এখন সঞ্চির ব্যবস্থা করুন।  
অন্য আকাঙ্ক্ষার যদি এখন আপনার মনে উদয় হয়  
তবে চারদিক থেকে শক্রসৈন্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে  
একদিকে থাকবে খরতাপ সুর্যের যতো রুক্ষম,—  
যার সঙ্গে সংগ্রামে সবাই অশক্ত।  
অন্যদিকে থাকবে সংগ্রাম-কুশলী কারেন,  
যার চক্ষুদুয় কখনো ক্লান্তিতে নিমালিত হয় না।  
ত্তীয় দিক থেকে আসবে স্বর্ণ-মুকুট পরিহিত কুশওয়াদ —  
সঙ্গে করে নিয়ে আসবে আমল থেকে দুর্দান্ত সেনানীবৃন্দ।  
চতুর্থ দিক থেকে আসবেন কাবুল-রাজ মেহরাব,  
যিনি সম্রাটের সেনাপতি ও বিচক্ষণতার প্রতীক।

## କାୟକୋବାଦ ସମୀପେ ପିଶଙ୍ଗେର ସନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ

ତୁରାନ-ରାଜ ଅଞ୍ଚଲିକ୍ତ ଚାଷେ  
ଆହ୍ରାସିଯାବେର କାହିନୀ ମନ ଦିଯେ ଶୁନଲେନ ।  
ତାର କିଛୁ କିଛୁ କଥା ତୀର ମନେ ନିଦାରଣ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଵାର କରଲୋ,  
ଫଳେ, ତୀର ମନ୍ତ୍ରକେ ଅଚିରେଇ ଉଦୟ ହଲୋ ସୁବୁଦ୍ଧିର ।  
ସମ୍ବାଟ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଇରାନ ପାଠାବାର ଜନ୍ୟ  
ନିର୍ବାଚିତ କରଲେନ ।

ଦେଇ ଯଶସ୍ଵୀର ନାମ ଓଯେମା  
ତିନି ବାଦଶା ପିଶଙ୍ଗେରଇ ସହୋଦର ଭାଇ ।  
ବାଦଶା ଏକ ଲିପିକାରକେ ଡେକେ ବଲଲେନ,  
ଶୀଘ୍ର କରେ କାଗଜ ଓ ମୂରିବର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟରୀ ନିଯେ ଏସୋ ।  
ଏବଂ ଆରତାଙ୍ଗେର\* ମତୋ ସୁନ୍ଦର କରେ ରଚନା କରୋ ଏକ ଲିପିକା,  
ତାତେ ଥାକବେ ରଂ ଓ ଦୃଶ୍ୟର ଅପରାପ ସମାହାର ।  
ଲିପିକା ଶୁରୁ କରୋ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭୂର ନାମ ଦିଯେ  
ଯିନି ତୀର ସୃଷ୍ଟିକେ ଦାନ କରେଛେ ଜୀବନଧାରଣେର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ।  
ଲିଖୋ, ତିନି ସହାୟ, ସନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦମ୍ପତ୍ତି-ହୀନ,  
ତୀର କାହେ କିଛୁଇ ଶୁଣୁ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୟ ।  
ତିନି ବିଶ୍ୱେର ସ୍ମଷ୍ଟ ଓ ସମସ୍ତ ଅଭାବେର ଉଦ୍ଧର୍ମ,  
ତୀରଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ସାନୁଶୀର୍ଷେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଚିତ ହେଁଛେ ।  
ତୀରଇ ଆଦେଶେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁରୁ କରେଛେ ତାଦେର ଭମଣ,  
ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଯେଛେ ଶାନ୍ତଭାବେ ।  
ତିନିଇ ଉତ୍ତ୍ରୀତ କରେଛେ ନୀଳାଭ ଗଗନ-ଗମ୍ବୁଜ,  
ତିନିଇ ଆନୟନ କରେନ ସାଯଂକାଳେର ପ୍ରାସାଦ ଥେକେ  
ପ୍ରଭାତେର ସମାରୋହ ।

ସୋନାଲୀ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳୀ ଅଲିନ୍ଦେ ଦାଁଡ଼ିଯେ  
ଗୋଧୁଲିର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପାତ୍ରେ ସୁରୀ ପାନ କରେ ତୀରଇ କରଣ୍ୟ ।  
ତୀରଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାନ୍ଦେର ରାପସୀଦେର ମତୋ ଚାର ଦାସୀର  
କାଁଧେ ଭର କରେ ମଙ୍ଗଳ ପଥେ ଉଦିତ ହନ ।  
ଦ୍ଵିତୀୟାର କ୍ଷୀଣତନ୍ତ୍ର ଚାଁଦ ତୀରଇ ଆନୁଗତ୍ୟେର ନିର୍ଦର୍ଶନ ସ୍ଵରାପ

---

ବିଶ୍ୟାତ ଚିତ୍ରକର ମାନୀର ରଚିତ ଏକଟି ଗ୍ରହେର ନାମ । ପାଶଚାତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟାସିକଗଣ ମାନୀକେ ଏକ ନତୁନ  
ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବଲେ ଗଣ୍ୟ କରେଛେ ।

বুকে ধারণ করে আসে বলয়িত দাস্য।  
তারপর ফারেদুনের আত্মার প্রতি কামনা করি তাঁর আশীর্বাদ  
আমাদের বৎশের সকল সম্পদ ও বীর্য এই ফারেদুন থেকেই।  
হে যশস্বী কায়কোবাদ, এখন আমি আপনার কাছে  
যুক্তিসম্মত ও রাজযোগ্য দুএকটি কথা নিবেদন করবো,  
আপনি শ্রবণ করুন।

যদি পুণ্যাত্মা এরজের প্রতি তূর  
তাজ ও তখ্তের জন্য অন্যায় করে থাকেন  
তবে আমাদের উচিত হবে না তার জ্ঞের টেনে  
পরম্পরারের প্রতি শক্রতোভাব পোষণ করা।  
এরজের রাজ্যের প্রতিশোধ মনুচেহের নিয়েছেন।  
মহামতি ফারেদুন তাঁকে দান করেছিলেন রাজ্য,  
সত্য ও ন্যায়পরতার উপর ভিত্তি করে।  
আমাদের উচিত হবে ফারেদুনের সেই বিধান  
সর্বতোভাবে মান্য করে চলা।  
নদীর অপর পারের দেশ ও ইরানের মধ্যে  
প্রবাহিত রয়েছে প্রখ্যাত জেঙ্গ\* নদী।  
পুণ্যাত্মা এরজ কখনো নদী-পরবর্তী  
আমাদের রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি।  
এরজের অধিকারভূক্ত এলাকা ছিল ইরান ভূমি,  
মহামতি ফারেদুন এমনিভাবেই বিভক্ত করেছিলেন তাঁর সাম্রাজ্য।  
এখন আমরা যদি ফারেদুনের সেই নির্দেশ অমান্য করি  
তবে নিজেরাই জগৎকে নিজেদের জন্য সঙ্কীর্ণ করবো।  
ইহ-পরকাল উভয় লোকেই আমরা আমাদের ভাগ্যের উপর  
টেনে আনবো তলোয়ারের আঘাত ও মৃষ্টার ক্ষেত্র।  
অন্যপক্ষে মহাবীর ফারেদুন যেমন করে  
সুল্ম, তূর ও এরজকে রাজ্য দান করে গেছেন,  
তা যদি আমরা সর্বান্তকরণে মেনে নেই ও শক্রতা না করি,  
তবে দুনিয়াকে আমরা বহু দুর্ভোগ থেকে বঁচাতে পারবো।  
এতক্ষণে মহাবীর জালের ক্ষেত্র শীতল হয়ে এসেছে,

---

ইরান ও তূরানের সীমা-নির্ধারক নদী।

বীরগণের রক্তও মৃত্যিকাবক্ষে জমাট বেঁধেছে।

মহা সংগ্রামের যে প্রতিফল তা আমাদেরকেই ভোগ করতে হবে,  
আর কেউ তার অশ্বভাগী হবে না।

চলুন তবে এই পঞ্চভূতের দেহকে —

— যে একদিন কার্পাস-বন্দে আচ্ছাদিত হয়ে মৃত্যিকাগর্ডে  
বিলীন হবে —

অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ কিংবা বিপদ দ্বারা

দুদিনের এই সরাইখানায় আর বিব্রত না করার

প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করি

অন্যথায় যদি আবার আমরা যুদ্ধে পরম্পরের সম্মুখীন হই,

তবে কেবল দুঃখ-রূপ নক্তের জালেই আমরা

নিজেদের শির আবদ্ধ করবো

হে সম্মাট, নিঃসন্দেহেই সৎকর্ম মন্দকর্মের চেয়ে উত্তম,

কাজেই চলুন, আমরা একে অন্যের প্রতি শক্রতাভাব বিসর্জন দিই।

আমরা যেন স্বপ্নেও আর জেহ নদীকে না দেখি,

ইরানের দিক থেকেও কেহ যেন সেদিকে মুখ না করে।

দুই রাজ্য যেন চিরকাল পরম্পরের প্রতি শুভেচ্ছা, শান্তি,

ও বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে সুখে কালাতিপাত করে।

অতঃপর লিপিকা মোহরাঙ্কিত করে বাদশা পিশঙ্ক

তা দূতের হাতে দিয়ে ইরান অভিমুখে যাত্রা করার আদেশ দিলেন।

বাদশা দূতের সঙ্গে বহু মুক্তা, স্বর্ণময় তাজ ও তখ্ত

এবং বহু সুদর্শন গোলাম ও বাঁদী দিলেন।

সেই সঙ্গে দিলেন মূল্যবান আরো দ্রব্যাদি —

উপটোকনের উপযুক্ত অশুরাজি,

তাদের স্বর্ণ-নির্মিত সাজ-সরঞ্জাম,

হিন্দুস্তানী তরবারি ও তাদের রজত-নির্মিত আধার।

দৃত লিপিকা ও উপটোকনসহ

যথাসময়ে কায়কেবাদের দরবারে এসে উপস্থিত হলেন।

বাদশা লিপিকা পাঠ করে।

তার জবাব লিখালেন।

তাতে বললেন, যুদ্ধের সূচনা আমাদের দিক থেকে হয়নি,

আফ্রাসিয়াবই প্রতিহিংসায় মন্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

তুর থেকেই উৎপীড়নের শুরু,

তিনিই এরজের মতো বাদশাকে সিংহাসন থেকে  
বর্ষিত করেছিলেন।

তারপর আফ্রাসিয়াবই জলরাশি অভিক্রম করে  
পা রেখেছিলেন ইরান ভূমিতে।

আপনি অবগত আছেন, তিনি বাদশা নওজরের সঙ্গে  
কি ব্যবহার করেছিলেন?  
যার জন্য হরিণাদি চতুর্পদের অস্তরেও আঁকা রয়েছে  
বিশাদের গভীর চিহ্ন।

প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে বুদ্ধিমান আগ্রীসের সঙ্গে  
ফ্যে-ব্যবহার তিনি করেছিলেন, কোন মানুষ তা করতে পারে না।  
যদি অন্যায় আচরণ থেকে সত্যিই আপনারা লজ্জিত হয়ে থাকেন,  
তবে নতুন করে আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন।

উৎপীড়ন কিংবা জিঘাংসা —

দুনিয়ার সরাইখানায় আমারও কাম্য নয়।  
আপনাদেরকে জলরাশির পরপার আমি প্রত্যর্পণ করলাম,  
কিন্তু আফ্রাসিয়াবকে শাস্ত থাকতে বলুন।

নতুন করে রচনা করুন সন্ধিপত্র  
এবং মহস্তের কাননে রোপণ করুন নতুন বৃক্ষশিশু।  
কায়কোবাদের দৃত চিঠাবাধের মতো দ্রুতগতিতে এসে  
পুঁশঙ্গের হাতে লিপিকা অর্পণ করলো।

পিশঙ্গ তৎক্ষণাত্ সৈন্যদের ডেকে সীমান্তের পথে প্রেরণ করলেন,  
সৈন্যদের পদধূলিতে আকাশ অঙ্ককার হলো।

তুরানী সৈন্য যথশীঘ্র জেছ ছেড়ে এলো,  
কায়কোবাদের কর্ণে পৌছলো সেই সংবাদ।  
সংবাদ শুনে বাদশা সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন,  
কারণ বিনা যুদ্ধেই শত্রুসৈন্য, ইরান ভূমি ত্যাগ করে গেছে।

মহাবীর রুশ্ম বাদশার মনোভাব লক্ষ্য করে বললেন,

হে সম্রাট, যুদ্ধের দিনে সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করুন।

আজ সন্ধির দিন নয়,

আজ আমার প্রহরণের নৈপুণ্য প্রকাশের দিন।

রুশ্মের প্রস্তাব শুনে সম্রাট বললেন,

শুরশ্রেষ্ঠ, ক্ষমার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই।

মহান ফারেদুনের পৌত্র এই সম্মানিত পিশঙ্গ,

তিনি আজ সংগ্রাম থেকে মুখ ফিরাচ্ছেন।  
জনীদের জন্য উচিত হবে,  
এ-অবস্থায় তাঁর দিকে প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টিতে না তাকানো।  
জাবুলস্তান থেকে সিঙ্ক্লন্দের তীর পর্যন্ত সমস্ত এলাকা  
আপনার ভরণ-পোষণের জন্য আমি লিখে দিচ্ছি।  
নীমরোজের অধিপতির সঙ্গে আপনি এই রাজ্য  
সিংহাসনারাঢ় হয়ে সুখে ভোগ করুন।  
কাবুল রাজ্য রাইলো বীরপ্রবর মেহরাবের অংশে,  
আপনার বর্ষা-ফলকের আভায় সেই রাজ্য উজ্জ্বল থাকুক চিরদিন।  
তারপর বহু উপটোকন ও খেলাত দিয়ে  
বাদশা শূরশ্রেষ্ঠ রুস্তম ও জালকে নন্দিত করলেন।  
কায়কোবাদ স্বীয় রাজকীয় ব্যক্তিত্বের উপযোগী  
বসন-ভূষণ ও অশুদ্ধিও রুস্তমকে উপহার দিলেন।  
বাদশা নিজের হাতে তাঁর মাথায়  
সোনার তাজ পরিয়ে দিয়ে বললেন,—  
মহাবীর জাল ব্যক্তিরেকে মাহাত্ম্যের সিংহাসন থাকে শূন্য।  
জালের একটি কেশের অনুরূপ নয় একটি রাজ্যের মূল্য,  
তিনিই আমাদের মধ্যে প্রাচীন দিনের বীরগণের স্মারক।  
বাদশার আদেশে পাঁচটি হাতীর পিঠে বসানো হলো  
নীল নদের স্বচ্ছ জলরাশির মতো উজ্জ্বল নীলকাণ্ঠ মণিময় হওদ্বা।  
তার উপর বিছানো হলো অতিশয় মূল্যবান  
স্বর্ণ খচিত কিংখাবের আস্তরণ।  
তারপর জালকে এমন মহামূল্য রাজকীয় বসন-ভূষণে সজ্জিত করা হলো  
যা দুনিয়ার যে-কোন নরপতির চিরদিনের কাম্য।  
এইবার জালের সমীপে এসে সম্রাট বললেন,  
এর চাইতেও উত্তম খেলাত আপনার উপযুক্ত।  
মহস্তর অশুরাজ আপনাকে উপহার দিচ্ছি  
আরও সম্পদ উন্মুক্ত করছি আপনার সামনে।  
যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকি,  
তবে, অবশ্যই আপনাকে আমি সকল অভাব থেকে মুক্ত করবো।  
তারপর সম্রাট বীরবর কারেন, কুশওয়াদ ও খরাদ  
প্রমুখ বীরগণকে  
যথাযোগ্য খেলাত ও উপটোকনসহ

যথাবিধি সম্ভিত করলেন।  
সৈন্যদের কাউকে দিলেন স্বর্ণমুদ্রা  
কাউকে দিলেন তরবারি ও ঢালচর্ম,  
কারো ভাগে পড়লো শিরস্ত্রাণ  
কেউবা পেলো স্বর্ণময় কটিবন্ধ।

## পারস্যের অন্তর্গত ইস্তিখার নগরীতে কায়কোবাদের আগমন

কায়কোবাদ সেখান থেকে পারস্যের ইস্তিখার নগরীতে এলেন  
এই নগরী ছিল পারস্যের সম্পদাগারের দ্বারদেশ।  
এই নগরই কেয়ানী বৎশের নরপতিগণের রাজধানী ছিল।  
কায়কোবাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে  
সারাদেশ যেন সে নগরীর দিকে মুখ করলো।  
কায়কোবাদ কেয়ানী সিংহসনে উপবিষ্ট হলেন,  
আর মাহাত্ম্য, সৌভাগ্য ও দানের সিংহদ্বার যেন মুক্ত হয়ে গেলো।  
তিনি উপস্থিত সামন্ত ও অভিজাতগণকে সম্বোধন করে বললেন,—  
দুনিয়া আজ এক প্রাণ থেকে অন্য প্রাণ পর্যন্ত আমার পদানত হয়েছে।  
কোন হস্তীর উপরও যদি কোন মক্ষিকার অভিযোগ থাকে  
তবে তার বিচার হবে ধর্মসম্মত উপায়ে।  
আমি এই দুনিয়াতে সত্য ব্যতীত অন্য পথে বিচরণ করবো না  
অন্যথায় বিশু-প্রভূর ক্ষেত্র আমার উপর আপত্তি হবে।  
রাজ্যের স্বাস্থ্য ও শাস্তি হবে আমার উপস্থত্ব এবং সম্পদ,  
সর্বত্র জল মৃত্তিকা হবে আমার ধনভাণ্ডার।  
সমন্ত নরপতি হবেন আমার সামন্ত,  
সৈন্য ও নাগরিক উভয়কেই আমি রক্ষা করবো সমভাবে।  
সকলই অবস্থান করবেন আমার বাহ্যবলের ছায়ায়—  
নিরাপত্তা ও সুবিবেচনার সঙ্গে।  
মানুষ সর্বত্র বিচরণ করবে নিরাপদে,  
মনে হবে তারা বাদশার চোখের সামনেই অবস্থান করছে।

দেখতে দেখতে কায়কোবাদের রাজত্বের দশ বছর অতীত  
হয়ে গেলো,  
গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর দান প্রবাহিত হয়ে চললো।  
বাদশা পদ্ধতি করলেন অনেক সুদর্শন নগরীর,  
রী-র আশেপাশে বসালেন শত শত গ্রাম।  
এইবার তিনি মুখ ফিরালেন পারস্যের দিকে,  
সঙ্গে সঙ্গে কালের বীণা অনুবণ্ণিত হয়ে উঠলো।  
জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণকে নিয়ে  
সম্রাট এবার সিংহাসন আলো করে বসলেন।

সমস্ত বীর সেনাপতিকে ডেকে আনালেন নিজের কাছে  
ও সন্তোষভরা দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলেন।  
তাঁদের কাছে তিনি নতুন করে আবৃত্তি করলেন প্রাচীনদের কাহিনী,  
শোনালেন তারা কি করে বদান্যতা ও উদারতার দ্বারা শোভাময়  
করেছেন এই ধরণীকে।

অবশ্যে পৃথিবীকে মহৎ জীবনে উজ্জীবিত করে রেখে  
কায়কোবাদের শতবর্ষের রাজত্বের অস্তিম দিন ঘনিয়ে এলো।  
দুনিয়াতে তাঁর নাম রাখতে পারে এমন চার পুত্র তাঁর ছিল।  
প্রথম পুত্রের নাম ছিল কায়কাউস  
দ্বিতীয় পুত্র কায়আরশ; তৃতীয় পুত্রের নাম কায়পিশীন।  
চতুর্থ পুত্রের নাম ছিল কায় আর্মীন, —  
ঠঁঠাই সবাই ছিলেন অভিজ্ঞ ও বহুদেশদর্শী  
রাজত্বের একশো বছর পূর্ণ হলে  
কায়কোবাদের জীবন—সূর্য অস্তগমনোন্মুখী হলো।  
তিনি যখন বুবতে পারলেন মণ্ড নিকটবর্তী হয়েছে,  
ও জীবন-বৃক্ষের সবুজ পাতা শুকিয়ে এসেছে,  
তখন মহামতি কায়কাউসকে কাছে ডেকে  
কতিপয় উপদেশ দান করলেন।  
বললেন, আমি এখন পরলোকের পথে যাত্রী,  
আমাকে সমাহিত করে তুমি সিংহাসনে বসো।  
আমি সেই লোক যে একদিন আলবুর্জ পাহাড় থেকে  
অনুগামিগণসহ এখানে আনন্দের সঙ্গে আগমন করেছিলাম।  
আমার সৌভাগ্য কখনো আমাকে পরিত্যাগ করেনি,  
যদিও আমি ভাগ্যের পূজারী কোনদিনই ছিলাম না।  
তুমি যদি বদান্যতা ও সুযুক্তির অনুসারী হও,  
তবে তোমার জীবনকেও তুমি সফলতার সঙ্গেই পরলোকের পথে  
নিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু যদি বিচরণ করো লোভের পথে,  
তবে তোমার শিরকে তুমি দুঃখ ও বিপদের জালে  
ঝড়িত করে ফেলবে।  
এবং দুঃখ ও বিষাদ তোমার জীবনের অনুষঙ্গী হবে,  
ফলে শক্তদের হাতে সমর্পণ করতে হবে নিজেকে।  
তখন এই স্থান তোমার জন্য হবে অগ্রিমৰ,

দুনিয়া হবে দুঃখ ও দুর্দশায় পূর্ণ।  
কাজেই হে সুবোধ পুত্র,  
সুবিচার ও বদান্যতার পথে হেক তোমার যাত্রা।  
তোমার হাতে সমর্পন করছি এই শাহী তাজ ও তখ্ত,  
দীর্ঘ পথ তুমি তা' নিয়ে অতিক্রম করো বদান্যতার সঙ্গে।  
এই বলে তিনি দুনিয়া ছেড়ে সুবিষ্টীর্ণ পরলোকের পথ ধরলেন,  
সিংহাসন ছেড়ে নির্বাচিত করলেন কাফনের শয়া।  
এইভাবে দুনিয়ার বুক থেকে বিগত হয়  
সুখ ও আনন্দের দিন।  
যে—বক্ষের অগণিত শাখা  
একদিন সবুজ পাতা ও রঞ্জিন ফলে—ফুলে আচ্ছন্ন থাকে,  
সেই বৃক্ষই প্রকৃতির নিয়মে ঝরিয়ে দেয় তার ম্ভারোহু,  
তারপর নিজেই অবনমিত হয় অস্তিম শয়নে।  
কত উচ্চ—শির সত্রাট  
এই দুনিয়ায় গর্বভরে বিচরণ করেছেন,  
কিন্তু আজ শুধু তাঁদের নামটিই অবশিষ্ট রয়ে গেছে;  
কারণ, এখানে কেউ চিরঙ্গীব নয়।  
দুনিয়ার এই-ই রীতি — মানুষ এখানে মৃত হয়,  
কিন্তু দুনিয়ার মৃত্যিকা সুনাম ও যশকে নষ্ট করতে পারে না।  
বঙ্গুগণ, কায়কোবাদের কাহিনী এখানেই শেষ,  
চলুন আমরা এখন স্মরণ করি কায়কাউসের ইতিবৃত্ত।

## କାୟକାଉସ

ତିନି ଏକଶତ ପଞ୍ଚାଶ ବରୁଣ ରାଜସ୍ତ କରେଛିଲେନ  
ସିଂହାସନାରୋହଣ ଓ ମାଜିନିରାନ ଅଭିମୁଖେ ଅଭିଯାନେର ବାସନା ପ୍ରକାଶ

ଫଳସ୍ତ ବ୍ରକ୍ଷ ଯଥନ ତାର ମାଥା ଉଠୁ କରେ ଆକାଶେ  
ତଥନେଇ ଯଦି ଆକାଶ ଥେକେ ଆପତିତ ହୟ ବିପଦ,  
ତବେ ତାର ପତ୍ରରାଜି ବିଶୁକ୍ଷ ଓ କାଣ ଦୂର୍ବଳ ହୟ,  
ଶୀର୍ଷଦେଶ ଅବନମିତ ହେୟାର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରକାଶ ପାଯୁ ତାର  
ନିର୍ଜୀବତାର ଲକ୍ଷଣ ।

ଏହିଭାବେ ବୃକ୍ଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେୟାର ଆଗେ  
ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ସେ ଉକ୍ତାତ କରେ ଏକ ନବଶାଖା ।  
ଏହି ନବୋଦ୍ଧାତ ଶାଖାର ସୂଚନା ଯଦି ମହେ ଥେକେ ହୟ,  
ତବେ ଅଟିରେଇ ସେ ପ୍ରକଟିତ କରେ

ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀର ମହେ ।

ଠିକ ତେମନି ପୁତ୍ର ତାର ପିତାର ସଭାବନାଗୁଲିକେ  
ବିକଶିତ କରେ ତୋଲେ ନିଜେର ମଧ୍ୟେ ।  
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପିତାର ଗୌରବ ଓ ମାହାତ୍ୟ ଥେକେ ଆପନାକେ  
ବିଯୁକ୍ତ କରେ,

ତବେ ସେ ନିଜେଇ ନିଜେକେ କରେ ଫେଲେ ଅଞ୍ଜାତକୁଳଶିଲ ।

ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିମ୍ବତ ହୟ ଗୁରୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ,  
ଦୁଃଖେ ହୟ ଦୁନିଆୟ ତାର ଭାଗ୍ୟ-ଲିଖନ !  
ପୂରାନୋ ସରାଇଥାନାର ଏହି-ଇ ରୀତି,  
ମୂଲକେ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରେ ଶୀର୍ଷ କଥନୋ

ତାର ମନ୍ତ୍ରକ ଉନ୍ନୀତ ରାଖତେ ପାରେ ନା ।

ଜ୍ଞାନ-ବୃଦ୍ଧେର ଏହି କଥା ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ଶୋନ  
ଏବଂ ସ୍ଵରଗ କରେ ରାଖୋ ତାଁର ଉପଦେଶ ।

କାୟକାଉସ ସଥନ ପିତାର ଆସନେ ଏସେ ବସଲେନ  
ତଥନ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରେ ନିଲୋ ତାଁର ଆନୁଗତ୍ୟ ।  
ତିନି ଦେଖଲେନ, ତାଁର ରାଜକୋଷ ସର୍ବବିଧ ସମ୍ପଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ,  
ଜଗଂ ତାଁର ସାମନେ ଦାସେର ମତୋ କରଜୋଡ଼େ ଦଶ୍ୟମାନ ।  
କୁଣ୍ଡଳ କଟ୍ଟହାର ଆଦି ସକଳ ରାଜକୀୟ ଆଭରଣ ତାଁର ଅଙ୍ଗଶୋଭା,  
ମଣିମୁକ୍ତା-ଖଚିତ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ-ସିଂହାସନ ତାଁର ପାଦପୀଠ ।

ଆର୍ଯୀ ଅଶ୍ଵରାଜିତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଁର ଅଶ୍ଵଶାଲା ;  
ଦୁନିଆୟ ତାଁର ସମକଳ କେଉଁ ନେଇ ।  
ସ୍ଵର୍ଗମୟ ସିଂହାସନେର ଉଚ୍ଚତାୟ ଅଧିକାର୍ତ୍ତ ହୟେ  
ତିନି ଆରୋ ଦେଖଲେନ —  
ଇରାନେର ସକଳ ବୀର କରଜୋଡ଼େ  
ତାଁର କଥାର ସମର୍ଥନେ କଥା ବଲେ ଯାଛେ ।  
ଏହିବାର କାଉସ ବଲଲେନ, ଦୁନିଆୟ  
ଆମାର ମତୋ ଆର କେ ଆଛେ ?  
ସାରା ଜଗତେ ଆମାରଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ,  
ଆମାର ଚାଇତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତି ଆଜ କୋଥାୟ ?  
ଏକଦିନ ବାଦଶା ସୁରାପାନେ ବିଭୋର ଆଛେ,  
ତାଁର ପାଶ୍ଚରଗଣେ ମଦମତ ।  
ଏମନ ସମୟ ଦ୍ୱାରରକ୍କ ଏସେ ଜାନାଲୋ,  
ଏକ ଗାୟକ ରାଜଦର୍ଶନ-ପ୍ରାର୍ଥୀ ।  
ଗାୟକ ବଲଲୋ, ହେ ସମ୍ବାଟ୍,  
ଆମି ମାଜିନ୍ଦିରାନ ଥେକେ ଆଗତ ଏକ ସଙ୍ଗୀତତ୍ୱ ।  
ସେଥାନେ ବହୁ ସୁକଳ ଗାୟକେର ବାସ,  
ଆମି ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ନଗଣ୍ୟ ।  
ବାଦଶା ଯଦି ଆମାକେ ତାଁର ଦାସଦେର ମଧ୍ୟେ ଗଣ୍ୟ କରେ ନେନ  
ତବେ ମାଜିନ୍ଦିରାନେର ପଥ ଆମି ଦେଖାତେ ପାରି ।  
ଏହି ବଲେ ବାଦଶାର ଆଦେଶ ନିଯେ  
ସେ ତାର ବୀଣାୟ ମାଜିନ୍ଦିରାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ଥିତ କରଲୋ ।  
ଗାନେର ସୁରେ ସେ ବଲଲୋ, ଆମାଦେର ମାଜିନ୍ଦିରାନ ନଗରୀ  
ଚିରକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଥାକୁକ ।  
ତାର ଫୁଲବନେ ଚିରଦିନ ଫୁଟେ ଆଛେ ଗୋଲାପ,  
ତାର ପର୍ବତପ୍ରାଣେ ଲାଲା ଓ ସୁମ୍ବୁଲେର ସମାରୋହ ।  
ତାର ବାତାସ ଆରାମଦାୟକ, ତାର ମାଟି ସୁଦୃଶ୍ୟ  
ସେଥାନେ ଶୀତ ନେଇ ଶ୍ରୀମ ନେଇ, ସେଥାନେ ଚିରବସନ୍ତ ବିରାଜମାନ ।  
ତାର କାନନେ ବୁଲବୁଲ ଗାନ ଗାୟ,  
ତାର ବନେ-କାନ୍ତାରେ ହରିଗଦଳ ବିଚରଣ କରେ ଫିରେ ।  
ଅମଗେ ସେଥାନେ ଦେହ କ୍ଲାନ୍ସ ହୟ ନା ।  
ସାରା ବହୁ ସେଥାନେ ସର୍ବତ୍ର ରଂ ଓ ଗନ୍ଧର ସନ୍ତାର ଛଢିଯେ ଆଛେ ।  
ସେଥାନେ ଗୋଲାପେର ବନେ ଯେନ ଯୌବନେର ହାଓୟା,

তার সুবাসে নলিত হচ্ছে মানুষের অস্তরতম আত্মা।  
 বছরের সকল দিনে — পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও বৈশাখ —  
 সেখানের উদ্যানগুলিকে আপনি কুসুমিত দেখতে পাবেন।  
 সারা বছর ধরে স্নোতিশ্বিনীর অধরোষ্ট সেখানে হস্তি,  
 পক্ষী সমাকূল বনকাস্তার কলনাদিতি।  
 সে-রাজ্য এক প্রাণ থেকে অন্য প্রাণ পর্যন্ত সম্পদে পরিপূর্ণ,—  
 স্বর্ণ-মুদ্রা, মূল্যবান কোশিক ও বহু ধনরত্ন সেখানে ছড়িয়ে আছে।  
 দাসিকন্যারা স্বর্ণকীর্ণিট পরিধান করে সর্বত্র বিচরণ করছে,  
 দাস বালকগণ সোনালী কাটিবক্ষ কোমরে জড়িয়ে প্রস্তুত রয়েছে সর্বক্ষণ।  
 কিন্তু সেখানে কোন মানুষ নেই, \*
 সেই সৌন্দর্য ও স্বর্ণসম্পদে হাদয় নলিত করে এমন কেউ নেই।

কায়কাউস গায়কের মুখে এই বর্ণনা শুনে  
 অন্তরে এক নতুন কামনার আবির্ভাব লক্ষ্য করলেন।  
 তাঁর মন ভিতরে ভিতরে মাজিন্দিরানের পথে সৈন্যদলসহ  
 অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলো।  
 বাদশা সেনাপতিদের ডেকে বললেন,  
 আমরা সবাই আসরের বড় অনুরাগী হয়ে উঠেছি।  
 বীরের মন যদি আলস্যের প্রতি অনুরোধ হয়ে পড়ে,  
 তবে জড়তার মধ্যেই সে অনুসন্ধান করে তঃপুরি।

আমি জামশেদ, জোহাক ও কায়কোবাদের স্থলাভিষিক্ত,  
 আমি মাহাত্ম্যে ও বৎশ-গৌরবে তাঁদের চেয়েও বড়।  
 জ্ঞান-নৈপুণ্যে আমি তাঁদের চাইতে মহসুর —  
 আমি মুকুটধারীদের প্রধান, আমি জগৎ অনুসন্ধানকারী।  
 মাজিন্দিরান অভিমুখে এক অভিযান আমি পরিচালনা করবো,  
 আমার বীরবৃন্দ এই অভিযানে বহন করবেন গুরুভার প্রহরণ  
 দলপতি ও সামন্তগণ সন্তানের এই অভিপ্রায় শুনে  
 প্রমাদ গণলেন।  
 তাঁরা ভয়ে বিবর্ণ হলেন ও বিরক্তিতে তাঁদের ভূক্ত কুক্ষিত হলো,

ତୀରା ବଲଲେନ, ଦୈତ୍ୟଦେର ସଙ୍ଗେ କେଉ ସ୍ଥେଚ୍ଛାୟ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଯାଯ ନା ।  
କିନ୍ତୁ ବୀରଗଣ ପ୍ରକାଶ୍ୟେ ବାଦଶାର କଥାୟ କୋନ ଜ୍ବାବ ନା ଦିଲେଓ  
ତାଁଦେର ଅସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଲୋ ଡମ୍ବ ଓ ଉଷ୍ଠାଧର ହିମ ନିଃଶ୍ଵାସେ କଞ୍ଚିତ ହଲୋ ।  
ତୁସ, ଗୋଦରଙ୍ଜ, କୃଷ୍ଣଓଯାଦ, ଗୋପ,  
ଏବଂ ଖର୍ବାଦ, ଶୁର୍ଗୀନ, ବାହ୍ୟାମ ଓ ନେଓ ପ୍ରମୁଖ ବୀରଗଣ  
ପ୍ରକାଶ୍ୟେ ଘୋଷଣା କରଲେନ, — ସମ୍ବାଟ, ଆମରା ଆପନାର ଆଜ୍ଞାବହ,  
ଆପନାର ଆଦେଶ ସ୍ୟତିରେକେ ଆମରା କୁଆପି ପଦକ୍ଷେପ କରି ନା ।  
ଅତ୍ୟପର ତୀରା ସବାଇ ଏକ ସଭାୟ ମିଲିତ ହେଁ,  
ପରମ୍ପରେର ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରଲେନ ।  
ତୀରା ବଲଲେନ, ଆମାଦେର ଭାଗ୍ୟ ବିମୁଖ ହେଁଯେଛେ,  
ଜାନି ନା, ଭବିତବ୍ୟ କି ଲୁକିଯେ ରେଖେହେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ।  
ବାଦଶା ଆମାଦେର କାହେ ଯା ବ୍ୟକ୍ତ କରଲେନ,  
ତା ଯଦି ସତିଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ କରେନ,  
ତବେ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇରାନେର ଜନ୍ୟଓ ନେମେ ଆସବେ ଦୂର୍ଦିନ,  
ଏହି ଦେଶେର ଅଳ୍ଲାହି ହେଁବେ ଆଲୋଡ଼ିତ ।  
ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଜାମଶେଦ ଛିଲେନ ସିଂହାସନ ଓ ଅଞ୍ଚୁରୀଯେର ଅଧିକାରୀ,  
ତୀର ଆଜ୍ଞାବହ ଛିଲ ଯୁଗପ୍ରତି ଦୈତ୍ୟ, ବିହୟ ଓ ପରୀଦିଲ ।  
ତିନିଓ କୋନ ଦିନ ମାଜିଦିରାନ ଅଭିଧାନେର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରେନନି,  
ତିନିଓ ଦୈତ୍ୟ-ବୀରଗଣେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିତେ ଚାନନି ।  
ଯନ୍ତ୍ର-ପୂତ କ୍ଷମତା ଓ ଅସାଧାରଣ ଥୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଫାରେଦୁନ —  
ତିନିଓ କୋନଦିନ ଏମନ ଆକାଶକ୍ଷା ମନେ ସ୍ଥାନ ଦେନନି ।  
ଯଦି ଏହି ପଥେ ପୌର୍ବ, ଯଶୋରାଶି ଓ ଧନ ସମ୍ପଦେର ସଞ୍ଚାବନା ଥାକତୋ,  
ତବେ ସ୍ଵୟାଂ ମନୁଚେହେଇ-ଏ-ପଥେର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ହତେନ,  
କିନ୍ତୁ ତିନି ତା କରେନନି ।  
କାଜେଇ ଏଖନେ ସମୟ ଆଛେ,  
ସକଳେ ମିଲେ କୋନ ଏକଟା ଉପାୟ ଥୁଜେ ବେର କରନ ।  
ଏମନ ଉପାୟ ବାର କରତେ ହେଁ  
ଯାତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଇରାନ ଭୂମି ଏହି ସମ୍ଭୂ ବିପଦ ଥେକେ ରଙ୍କା ପାଯ ।  
ମହାବୀର ତୁସ ତଥନ ସକଳ ସେନାପତିକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲଲେନ,  
ହେ ବୀରାଘଗଣ୍ୟ ସେନାପତି ଓ ସାମନ୍ତଗଣ,  
ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକଟି ମାତ୍ର ସମାଧାନ ଆଛେ,  
ଏବଂ ସେଟିଓ ଖୁବ ଦୂତର ନୟ ।  
ଦୂତଗାମୀ ଘୋଡ଼ାଯ କରେ ଏକ ଦୂତକେ

মহামতি জালের সমীপে প্রেরণ করুন।  
দৃত গিয়ে তাঁকে বলবে, ফুলের মালা ছিড়ে ফেলে  
দ্রুত ইরান অভিমুখে যাও করুন।  
বাদশা কায়কাউসের উপর দুর্দিনের অঙ্ককার নেমে এসেছে।  
যদি আপনি বিলস্ব করোন  
তবে পরিণামে তাঁর জন্য অনুশোচনা করতে হবে।  
তুম বললেন, কোন সুপ্রাম্পণাতা যদি  
বাদশার সমক্ষে প্রকটিত করেন উপদেশ  
এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে,  
দৈত্যদের নগর—দ্বার উদ্ঘাটন করা কারো জন্যে উচিত না,  
তবেই সকল দিক রক্ষা পাবে এবং একমাত্র জালই তা পারেন;  
অন্যথায় অবশ্যই উচ্চ—নীচ সব সমান হয়ে যাবে।  
তুমের কথা সকল বীরই সমর্থন করলেন,  
তাঁরা বললেন, এ—কাজ জালকেই মানাবে।  
অতঃপর সকলে একমত হয়ে  
দ্রুতগামী অশু সজ্জিত করার আদেশ দিলেন।  
এক দৃত সেই অশু চড়ে বাযুগতি নীমরোজে এসে  
মহামতি জালের সমীপে উপস্থিত হলো।  
সে বীরগণের বাণী তাঁকে জানিয়ে বললো,  
হে যশস্বী সাম—পুত্র,  
ইরানে এমন এক অস্তুত সমস্যার উদয় হয়েছে,  
বুদ্ধির দ্বারা যার কোন কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না।  
আপনি যদি সেই সমস্যা সমাধানে অগ্রসর না হন  
তবে না থাকবে রাজ্য না তার মানুষ।  
বাদশা এমন এক দুর্ভৰ পথে পা বাড়তে চাইছেন,  
স্বয়ং শয়তান যে—পথে অগ্রসর হতে ভয় পায়।  
তিনি অতীতের বাদশাগণের বিপদ—কাহিনী থেকে  
কোন শিক্ষা লাভ করতে চান না।  
তিনি সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে  
মাজিন্দিরানের পথে অগ্রসর হতে চান।  
আপনি গিয়ে তাঁকে সেই সঙ্কট—সঙ্কুল কাহিনীর কথা স্মরণ করান,  
যে—সঙ্কট আপনি স্বয়ং বাদশা কোবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন।  
কাজেই হে বীরবর, আপনি অত্পু—সিংহ রুপ্তমকে সঙ্গে নিয়ে

খৎপরাক্রমে কঠিদেশ বঙ্গন করুন।  
 এবং রাজ সমীপে গিয়ে তাঁকে  
 এই অমঙ্গল-সূচক অভিযান থেকে নিবৃত্ত করুন।  
 দূতের মুখে সকল শুনে জাল অত্যন্ত ব্যথিত হলেন,  
 ভাবলেন, এই বুঝি কেয়ানী তরু বিশুষ্ক হওয়ার দিন এলো।  
 তিনি বললেন, কায়কাউস এখনো অপরিপক্ষ,  
 তিনি দুনিয়ার তাপ ও শৈত্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।  
 অভিজ্ঞ বীরবৃন্দের কথায় তিনি কর্ণপাত করেন না,  
 অঙ্গকার রাত্রিকে তিনি নিজের সুরেই ভরে তুলতে চান।  
 দুনিয়ায় যে বিজ্ঞদের পরামর্শ মতে চলে,  
 কাল তার মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় সচ্ছদে।  
 তখন তার তরবারির নীচে  
 অভিজ্ঞাত ও অনভিজ্ঞাত যৃগপৎ ভয়ে ও ভক্তিতে প্রস্তুত হয়।  
 তাই আশ্র্য নয়, যদি বাদশা আমার দিকে  
 দৃষ্টিপাত না করেন,  
 এবং আমার কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে ব্যথিত করেন।  
 সেই আশঙ্কার কথা মনে করে বাদশার জন্ম  
 আমার হাদয় বিগলিত হচ্ছে।  
 তবু আমি যাবো এবং  
 বাদশাকে সুপরামর্শ দিব।  
 তবু যদি তিনি তাঁর ইচ্ছাকে প্রাবল্য দান করেন,  
 তবে রুম্নম সৈন্যদলসহ  
 দীর্ঘ-রাত্রি অশেক্ষা করে থাকবে,  
 কখন আবার প্রভাত বেলায় রাজমুকুট  
 বল্মল করে উঠবে সূর্যালোকে।  
 এই বলে জাল ইরান যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন,  
 ও তাঁর সঙ্গে লইলেন জ্ঞানী ও প্রবীণ ও বীরগণকে।  
 যথাসময়ে তুস, গোদরং, গেও,  
 গুরুগীন ও বীরেন্দ্রবৃন্দের কাছে সংবাদ পৌছলো,  
 মহামতি জাল ইরানের সমীপবর্তী হয়েছেন,  
 দূরে তাঁর পতাকা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।  
 সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতিগণ  
 বীরবরের প্রত্যুদ্গমনে অগ্রসর হলেন।

জাল নিকটবর্তী হতেই তারা বাহন পরিত্যাগ করে  
পদব্রজে অগ্রসর হলেন।  
এবং তাঁকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানিয়ে  
তাঁর সঙ্গে সন্ত্রাট সমীপে যাত্রা করলেন।  
তুস বললেন, হে বীরগণের প্রধান,  
দীর্ঘ-পথের ক্লেশ আপনাকে সহ্য করতে হয়েছে।  
ইরান ভূমির মহাত্মগণের জন্যই  
আপনি বরণ করেছেন এই ক্লেশ।  
সে জন্য আমরা ধন্য,  
আমরা আপনার রাজমুকুটের প্রশংসা উচ্চারণ করছি।  
জাল উপস্থিতি যশস্বীগণকে সম্বোধন করে বললেন,  
যে-ব্যক্তির উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে দীর্ঘ-কাল,  
সে স্মরণ করে প্রবীণদের উপদেশ,  
এবং সেই অনুযায়ী সে সকল কর্ম উৎসর্গ করে মহাকাশকে।  
আমি উপদেশ দান করতে পারবো এমন গর্ব করি না,  
কারণ, আমি নিজেই উপদেশের প্রত্যাশী।  
সদুপদেশ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়,  
দুঃখ ও অপমান নেয়ে আসে তারই মন্তকে।  
জালের কথা শুনে সবাই উচৈষ্ঠের বলে উঠলেন,  
আমরা আপনার সঙ্গে রয়েছি,  
আপনার উপদেশ অমান্য করেছে এমন কারো কথা  
আমরা শুনিনি।  
তারপর সবাই একসঙ্গে বাদশার সমীপে  
সেই বিখ্যাত তাজ ও তথ্তের ছায়ায় এসে উপস্থিত হলেন।

## କାଯକାଉସକେ ଜାଲେର ଉପଦେଶ ଦାନ

ଜାଲ ସେନାପତିଗଣେର ପୁରୋବର୍ତ୍ତୀ ହୟେ ରାଜସଭାଯ ପ୍ରବେଶ କରଲେନ,  
ତୀର ପେଛନେ ରଇଲେନ ସ୍ଵର୍ଗମୟ କଟିବଙ୍କପରା ବୀରେନ୍ଦ୍ରବୃନ୍ଦ ।

ବାଦଶା କାଉସକେ ସିଂହାସନେ ସଗୌରବେ  
ଓ ହାଟ୍ଚିଷ୍ଟେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦେଖେ ଜାଲେର ମନେ ପଡ଼ଲୋ

ସ୍ଵାଟ ମନୁଚେହରେର କଥା,  
ବିଗତ ସେଇ ମହାନ ବାଦଶାଇ ଯେନ ଏଥାନେ ଉପବିଷ୍ଟ ରଯେଛେ ।

ଜାଲ ହାତ ଜୋଡ଼ କରେ ମନ୍ତ୍ରକ ଅବନତ କରଲେନ  
ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ ରାଜାସନେର ଦିକେ ।

ତାରପର ଚିରାଚରିତ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ

ତିନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରଲେନ ବାଦଶାର ଗୁଣଗାନ ।

ବଲଲେନ, ହେ ଜଗତାଧିପତି, ଆପନି ରାଜାଗଣେର ରାଜ୍ଞୀ ।

ଆପନାର ସିଂହାସନେର ଅନୁରାପ ରାଜାସନ କେଉ ଦେଖେନି,  
ଆପନାର ସମାନ ସୌଭାଗ୍ୟେର କଥା ଶୁନେନି ଏଇ ମହାକାଶ ।

ସାରା ଜୀବନ ଆପନି ସୁଧୀ ଓ ବିଜୟୀ ଥାକୁଳୁଁ

ଆପନାର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନେ ଓ ହଦ୍ୟ ବଦାନ୍ୟତାଯ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକ ।

ସ୍ଵାଟ୍ ଓ ଜ୍ବାବେ ଜାଲେର ଶୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରଲେନ

ଓ ତାଁକେ ସିଂହାସନେର ପାଶେଇ ଏନେ ବସାଲେନ ।

ତାରପର ବାଦଶା ଦୀର୍ଘ ପଥେର କ୍ଲେଶ

ଏବଂ ରୁତ୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀରଗଣେର କଥା ଜାଲକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ ।

ଜାଲ ବାଦଶାକେ ବଲଲେନ,

ହେ ସ୍ଵାଟ, ଆପନାର ଜୟ ହୋକ ।

ଆପନାର ଶିର ଚିର ସବୁଜ ଓ ଦେହ ସୁନ୍ଦ୍ର ଥାକ,

କେଯାନୀ କଟିଦେଶ ଜଡ଼ତା କିଂବା ଆଲସ୍ୟେ ନିର୍ଜୀବ ନା ହୋକ ।

ଆମରା ସବାଇ ଆପନାର ସୌଭାଗ୍ୟେ ସୁଧୀ ଓ ସମୁଜ୍ଜ୍ଵଳ,

ଆପନାର ସିଂହାସନେର ବଦୌଲତେ ଆମରା ସବାଇ ଉଚ୍ଚଶିର ।

ଏହିଭାବେ ବାଦଶାର ଶୁଣଗ୍ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଜାଲୁଁ

ଏକ କାହିଁର ଅବତାରଣା କରଲେନ ।

ବଲଲେନ, ହେ ଦୁନିଆର ବାଦଶା,

ଆପନି ସିଂହାସନ ଓ ରାଜମୁକୁଟେର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ।

ଆପନି ମହାମତି ବାଦଶା ଫାରେନ୍ଦ୍ରନେର ସ୍ମୃତିର ଧାରକ,

ଆପନି ଜଗତକେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପ ଥେକେ ଛାଯାଦାନକାରୀ ।

আমি অবাক হয়ে এক নতুন কথা শুনলাম —

আপনি নাকি মাজিন্দিরান অভিযানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ?

হে শ্বেতী সন্ত্বাট, আপনি আমার দিকে কর্ণপাত করুন,  
একটি উপদেশ আমি আপনার সামনে উচ্চারণ করছি।

আপনি সামন্তদের প্রধান ও বীর —

যে কোন বীরের চেয়ে আপনি মহত্তর ও উত্তম।

আপনি যৌবনশালী ও জ্ঞানী;

দুনিয়ায় কেউ আপনার অপর্যশ শ্রবণ করেনি।

শ্বীয় কীর্তিতে আপনি সর্বক্ষণ আনন্দিত,

জ্ঞানিগণের মনঃপূত শাসক আপনি।

এই দুনিয়ায় পাবিত্র বিশু-প্রভুর সমক্ষে

আপনি কোন মন্দ কাজের জন্য লজ্জিত কিংবা বিত্রাসিত নন।

সৎয়মশীলের জন্য উচিত,

অসংযমীর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ;

জ্ঞানী ও ভাগ্যবান বিলম্বে হলেও

ভালমন্দ চিনে নিতে পারেন।

আপনি বিচক্ষণতা, জ্ঞান ও সঙ্কল্পে

ধরিত্বী ও কাল উভয়কে আপনার পদানত করতে পেরেছেন।

তবু আপনাকে একটা উপদেশ আমি দিব

ও তার দুরা আপনার অন্তর থেকে দূর করবো অঙ্ককার।

আপনি স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও সফলতার সঙ্গে জীবনযাপন করুন,  
ধরাতল থেকে উঠিত হোক আপনার সুষণ।

আপনি জানেন যে, আপনার প্রপিতামহ ছিলেন জামশেদ,

তাঁর মুকুট সুর্যের মতো জ্যোতিশ্চান ছিল।

সমস্ত দৈত্য ও চতুর্সু তাঁর আদেশের অনুবর্তী ছিল,

সমস্ত দুনিয়া ছিল তাঁর শাসনাধীন।

তথাপি তিনি এই দুরাহ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি,

তিনি কদাপি মাজিন্দিরান জয়ের সঙ্কল্প নেননি।

ফারেন্দুণও করেননি এমন কাজের অভিলাষ,

যদিও তিনি শ্বেত পরাক্রমে ধৰ্ম করেছিলেন জোহাকের সিংহাসন।

আপনার পূর্বে অনেক সন্ত্বাট বিগত হয়েছেন,

তাঁরা কেউই এ-পথে পা বাঢ়াতে চাননি।

আমারও মাথার উপর দিয়ে কালের কিছুটা অংশ বিগত হয়েছে,

এই খুলিমুষ্টির উপরে বহুবার আবর্তিত হয়েছে আকাশ।  
আমি মনুচেহেরকে দেখেছি,  
এ-দেশের বহু সম্পদ, গৌরব ও রাজপ্রাসাদ তাঁরই দান।  
জও, নওজর ও কায়কোবাদ প্রমুখ  
বহু বাদশার শাসনকাল আমার মনে আছে;  
তাঁরাও তাঁদের সকল সম্পদ, সৈন্যদল ও অস্ত্রাদিসহ  
কোন দিন মাজিন্দিরান অভিযানের অভিপ্রায় প্রকাশ করেননি।  
কারণ, সেই দেশ জাদুবিদ্যায় পারদশী দৈত্যের দেশ,  
তাঁদের নগরীর দ্বার তারা জাদুমন্ত্র দ্বারা বন্ধ করে রেখেছে।  
আমরা অস্ত্র, সম্পদ কিংবা শৈর্য দ্বারা  
সেই রুদ্ধদ্বার খুলতে অক্ষম হবো।  
তরবারি দ্বারা আমরা দৈত্যদের নির্মূল করতে পারবো না,  
জ্ঞান, বৃক্ষ কিংবা সম্পদেও তারা হয় না করায়ত্ব।  
সেই দেশে যাওয়া শুভগ্রহের অনুমোদিত নয়,  
কাজেই আপনার সৎকল্প পরিত্যাগ করা উচ্চম।  
সেই পথে সৈন্যচালনা ভাগ্যের মনঃপূত নয়,  
কোন বাদশাই তাতে ঘঙ্গল দেখতে পাননি।  
এই যশস্বী সেনাপতিগণ আপনারই আজ্ঞাবহ,  
আপনার দাসের মতোই তাঁরা আপনার ইঙ্গিতে পরিচালিত  
হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

আরও অধিক সম্পদের অধিকারী হওয়ার বাসনায়  
ঠিদের রক্তে আপনি কোন বৃক্ষ রোপণ করতে যাবেন না।  
কারণ, এমন বৃক্ষের উচ্চতা ও ফলভাব বহন করে অভিশাপ,  
অতীতের সন্ত্রাটগণ এমন কাজ থেকে বিরত থাকতেন।

জালের কথা শুনে কায়কাউস বললেন,  
আমি নিজেকে আপনার উপদেশের উধৰ্ব জ্ঞান করি না।  
কিন্তু, জামশেদ কিংবা ফারেদুনের চাইতে  
আমার জনবল, ধনবল ও প্রতিপত্তি অধিক।  
মনুচেহের ও কায়কোবাদ থেকেও আমি অধিক ক্ষমতার অধিকারী,  
সেই জন্যই তাঁরা মাজিন্দিরানের আকাঙ্ক্ষা করেন নি।  
আমার সৈন্যদল, আমার সাহস ও সম্পদ তাঁদের চেয়ে বেশী,  
সারা দুনিয়া আমার সুতীক্ষ্ণ শরবারির ছায়াতলে বিরাজমান।

আমি মাথা তুলে দাঁড়ালে পৃথিবীর সর্বত্র আমার পথ উন্মুক্ত,  
আমার অস্ত্রের মুখে দুনিয়ার কোন কিছুই লুকায়িত নয়।  
আমি অগ্রসর হলে যাকে ইচ্ছা তাকেই  
আমার জালে আবদ্ধ করতে পারি।  
গুরুভার কর তুলে দিয়ে,  
যে-কোন লোক দ্বারা আমি মাঝি দিয়ানে শাসন চালিয়ে  
যেতে পারবো।

তারা আমার চোখে খড়কুটার মতো ভেসে যাবে,  
জাদুবিদ্যা ও দৈত্যদল কিছুই আমার সামনে টিকে থাকতে  
পারবে না।

তাছাড়া, আপনার কানেও হয়তো খবর এসেছে যে,  
দৈত্যদল দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দিচ্ছে।  
কাজেই সকল রকম কষ্ট স্বীকার করে হলেও  
সেখানে গিয়ে পৌছতে হবে।  
আপনি আপাতত রূপসহ স্বসিংহাসনে উপবিষ্ট থেকে  
ইরানের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত থাকুন।  
বিশ্ব-প্রভু আমার সহায় হবেন,  
দৈত্যদের শির হবে আমার মৃগয়ার লক্ষ্য।  
যদিও এই সংগ্রামে এখন আমি বন্ধুহীন,  
তবু আপনি আমাকে তার থেকে বিরত হওয়ার অনুরোধ  
করবেন না।

জাল সম্মাটের মুখে এই কথা শুনে  
কিংকর্তব্যবিমৃত হলেন।  
তিনি বললেন, আপনি সম্মাট, আমি আপনার দাস মাত্র,  
তবু মনের দুঃখে এত কথা বললাম।  
দুর্ভিবনায় ভারাক্রান্ত অস্তর লঘু করার জন্যে  
যা জ্ঞানতাম তা নিবেদন করলাম।  
কেউ নিজের দেহ থেকে ম্তুকে উৎপাটিত করতে পারে না,  
যুগের চক্ষুকে কেউ সীবনী দ্বারা সেলাই করে দিতে পারে না।  
মানুষ যার অনুসন্ধানে ব্যস্ত তার থেকে নিবৃত্ত হওয়া  
তার জন্য সম্ভব নয়,  
পিপাসিত যে সে পানির ধৈঁজ অব্যাহত রাখবেই।  
আমি কামনা করি, ভাগ্য আপনার প্রসন্ন হোক,

বিশ্ব-প্রভু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেন আমার উপদেশ।  
প্রার্থনা করি, কোন কর্ম যেন আপনার মর্যাদা হানির কারণ না হয়,  
আশীর্বাদ করি, আপনার হৃদয় ধৰ্ম ও নীতিবোধ দ্বারা  
উজ্জ্বল থাকুক।  
বড়ই সুখের কারণ হবে, যদি বাদশা আমার কথায় মনে কোন  
দুঃখ না নেন,  
শুধু কল্যাণ কামনায়ই আমি তা উচ্চারণ করোই।

বাদশা যথাশীত্র জালকে বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন,  
এবং তাঁর প্রস্থানে শোকাভিভূত হলেন।  
এনিকে বাদশার সমীপ থেকে বেরিয়ে আসতেই  
জালের ঢাঁকে অঙ্ককার হয়ে এলো চন্দ্ৰসূর্য।  
তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তুস, গোদরঞ্জ, বাহুরাম ও গোও  
প্রমুখ বীরগণও রাজসভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।  
গোও বললেন, আমি শপথ করে বলছি,  
আমরা আপনার নির্দেশ সর্বদা মান্য করে চলবো।  
কায়কাউসের সকল ক্ষমতা সত্ত্বেও  
আমি তাঁকে পরোয়া করি না।  
প্রলোভন, মৃত্যু-ভয় ও বাদশার প্রতি আনুগত্য থেকে আপনি  
মুক্ত হোন,  
আপনার উপর থেকে দুশ্মনের দীর্ঘ হাত অবশ্যই  
নিবৃত্ত থাকবে।

আমরা চারদিক থেকে এসে আপনার পাশে জড়ো হবো,  
বিশ্বাস করুন, অভিনন্দন ছাড়া আর কিছুই আপনার কর্ণগোচর হবে না।  
বীরগণের জন্য আপনি দুংখ বরণে প্রস্তুত হোন,  
কঠিন পথ অতিক্রমের জন্য হোন সংকল্পবদ্ধ।  
আমাদের জন্য এই অভীষ্ট লাভের পথ,  
সেনাপতি জাল ছাড়া আমাদের আর কোন বাদশা নেই।  
গোওয়ের প্রস্তাব শুনে জাল বললেন, মন্ত্রণার  
একটি মাত্র পথ আছে,  
সেটি এই যে, কাউসের ভাগ্যের সঙ্গেই আপনারা  
জড়িত করুন নিজেদেরকে।  
আপনারা সর্বান্তকরণে পালন করুন বাদশার নির্দেশ,

এবং এই অভিযানের প্রতিকূলতা থেকে নিবৃত্ত হোন।  
বিশ্ব-প্রভুর দরবারে আমার এই প্রার্থনা,  
আপনাদেরকে যেন সানন্দে প্রত্যাবৃত্ত দেখতে পাই।  
এই কথা বলে জাল সেনাপতিগণকে আলিঙ্গন করে  
যথাসময়ে সীস্তানের দিকে মুখ করলেন।

## কায়কাউসের মাজিন্দিরান যাত্রা

জাল রাজসভা ত্যাগ করে যাওয়ার পরেই  
সৈন্যদের মধ্যে সাজ সাজ বর পড়ে গেলো।  
তুস ও গোদরঞ্জকে সন্তুষ্ট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে  
যাত্রারঙ্গের আদেশ দিলেন।  
রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদশা বীরগণ সমভিব্যাহারে  
মাজিন্দিরানের দিকে মুখ করলেন।  
মীলাদ নামক সেনাপতির হাতে ইরান দেশ  
রাজকোষের কুঞ্জিকা, তাজ ও অঙ্গুরীয় রক্ষার ভার পড়লো।  
তাঁকে বলা হলো, যদি রাজ্য শক্তির আবির্ভাব হয়,  
তবে তাদের মোকাবেলায় তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে না।  
যে-কোন অঙ্গলের সূচনা দেখলেই জাল ও রুস্তমের  
শরণ নিতে হবে,  
কারণ, তাঁরাই সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠপোষক ও রাজ্যের শোভা।  
পরদিন যথারীতি যাত্রার সূচক দুন্দুভি নিনাদিত হলো,  
গোদরঞ্জ ও তুসের পরিচালনায় এগিয়ে চললো সৈন্যবাহিনী।  
চলতে চলতে ইরানাধিপতি কায়কাউস  
ইস্পারোজ পর্বতের পাদদেশে ছাউনি ফেলার আদেশ দিলেন।  
এই সময় সূর্য পশ্চিমাকাশে অন্ত গেলো,  
সন্তুষ্ট ও সৈন্যবাহিনীর জন্য রচিত হলো নিম্না  
ও বিশ্রান্তির শয্যা।  
এই স্থানে নরখাদক দৈত্যদের বাস ছিল,  
স্বয়ং দৈত্যরাও এখানে সভয়ে চলাফেরা করতো।  
বাদশার আদেশে পর্বতের সানুদেশ  
বহুমূল্য শয্যায় আচ্ছাদিত হলো,  
পার্বত্য-অনিল আমোদিত হলো সুগন্ধী সুরায়।  
সকল ভাগ্যবান সেনাপতি  
সন্তুষ্ট কায়কাউসের সিংহাসন ঘিরে বসলেন।  
সারা রাত আমোদ-উৎসবে মন্ত থেকে  
উষা সমাগমে সৈন্যগণ আসর ছেড়ে উঠলো  
এবং যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে  
করঞ্জোড়ে এসে দাঁড়ালো বাদশার সামনে।

বাদশা গেওকে সম্মোধন করে বললেন,  
সৈন্যদের মধ্য থেকে দুবার করে হাজার বীর ঘনোনীত করুন।  
এরা শুরুভার প্রহরণের আঘাতে  
মাজিন্দিরানের নগর-দ্বার উন্মুক্ত করবে।  
কাউস গেওকে আরো বললেন,  
হে বীর, আপনি আপনার পাঞ্জা প্রসারিত করে অগ্রসর হোন।  
এবং মাজিন্দিরানের নগর-দ্বার লক্ষ্য করে  
তরবারি ও প্রহরণের সাহায্যে অনিবার্ভাবে স্বীয় পথ তৈরি করে নিন।  
যুবক কিংবা বৃন্দ যেই আপনার চোখ পড়বে  
তাকেই প্রাণহীন শবে পরিগত করবেন।  
গৃহ কিংবা জনপদ যা কিছু আপনার নজরে পড়বে  
তাকেই জ্বালিয়ে ভক্ষীভূত করবেন,  
এবং দিনকে করবেন রাত্রিতে পর্যবসিত।  
এইভাবেই দৈত্যরা জানতে পারবে,  
তাদের জাদুর শক্তি দুনিয়ায় নস্যাই করে দেওয়া হয়েছে।  
বাদশার আদেশ শুনে গেও রাজসভা ত্যাগ করলেন,  
ও সৈন্যদের মধ্য থেকে বেছে নিলেন বীর সিপাহীগণকে।  
যথাসময়ে তিনি মাজিন্দিরানের নগর-দ্বার অভিমুখে যাত্রা শুরু করে,  
পথিমধ্যে তলোয়ার ও প্রহরণের বারি বর্ষণ করে চললেন।  
নারী, শিশু ও পুরুষ কেউ তাঁর তলোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পেলো না।  
এইভাবে তিনি জনপদ ও নগরী ধ্বংস করে চললেন,  
মনে হলো, তিনি যেন স্থলে ধরিত্বাকে মুক্ত করে চলছেন  
তীব্র হলাহল, থেকে।

সহসা এক সুন্দর পুরী তাঁর নজরে পড়লো,  
তার সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে আনন্দের উপকরণ।  
বহু প্রিয়-দর্শন নারী ও সোনালী কটিবঙ্ক জড়ানো দাস  
সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।  
দাসিগণের শিরে প্রস্ফুরিত হচ্ছে শিরস্ত্রাণ,  
তাদের মুখ উজ্জ্বলিত রয়েছে চতুর্দশী চাঁদের মতো।  
সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অনেক সম্পদ,  
বহু মণিমুক্তা ও অগণিত দীনার।  
সেখানে চরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য গবাদি পশু,  
তাদের হাম্বারবে দিগদিগন্ত আমোদিত হচ্ছে।

এই সুন্দর ও আনন্দিত সংবাদ  
বাদশা কায়কাউসের সমীপে পাঠানো হলো।  
বলা হলো, এই শহর যেন একটি প্রতিমা-সজ্জিত মন্দির,  
চীন দেশীয় গালিচার মতো এখানে ফুলের শয়া বিছানো রয়েছে।  
এখানকার দাসিগণ প্রিয়দর্শন,  
দাস বালকদের মুখ যেন গোলাপ পাপড়িতে ধৌত করা হয়েছে।  
পূর্ণ এক সপ্তাহ ইরানীয়গণ সেই নগরীতে অবস্থান করে  
আবার ধৰ্মস-নৃত্যে মেতে উঠলো।  
মাজিন্দিরানের অধিপতির কাছে যখন এই সংবাদ পৌছলো,  
তখন তিনি ক্ষোভে দুঃখে মন্তক অবনত করলেন।  
দৈত্যদের সেনাপতি সাঞ্জা এই দুঃসংবাদে  
অত্যন্ত ব্যথিত হলো।  
রাজা তাকে বললেন, তুমি শীঘ্ৰগতি সপেদ দৈত্যের সমীপে গমন করো,  
সূর্য যেমন সমারোহ ও গতিতে আকাশ-পথ অতিক্রম করে  
ঠিক তেমনিভাবে।

তাকে বলবে, ইরান থেকে এক বিৱাট সৈন্যদল  
ধৰ্মস-কামনায় মাজিন্দিরানে আগমন করেছে,  
পথে সর্বত্র প্রজ্ঞালিত করেছে যুদ্ধের আগুন।  
জগজ্জয়ী কায়কাউস তাদের পরিচালক,  
অসংখ্য তাদের সিপাহী ও প্রভূত তাদের অশ্বশস্ত্র।  
তুমি যদি অবিলম্বে আমাদের সহায়তা না করো,  
তবে মাজিন্দিরানে আর কাউকে জীবিত দেখতে পাবে না।  
রাজার বাণী শুনে নিয়ে  
অবিলম্বে সাঞ্জা যাত্রা ক লো।  
যথাসময়ে সে সপেদ দৈত্যের সমীপে এসে  
রাজার সন্দেশ ও যুদ্ধের যে ভয়াবহ দৃশ্য সে দেখে এসেছে  
তা বর্ণনা করলো।

সব শুনে সপেদ দৈত্য বললো,  
বৰ্তমানের এই পরিণতি দেখে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।  
ইরানের বাদশা যদি বিৱাট সৈন্যদলসহ যুক্তার্থ এসেই থাকেন;  
তাহলেও ভয়ের কিছু নেই।  
আমি অবিলম্বেই সৈন্যদল জমায়েত কৰছি,  
অবশ্যই তাঁকে আমি মাজিন্দিরান থেকে হটিয়ে দিব।

এই বলে দৈত্য পর্বতের মতো  
সীয় মন্তক উন্নীত করলো আকাশ মণ্ডলে।  
তারপর সৈন্যদলসহ কাউসের অভিমুখে যাত্রা করে  
মাজিন্দিরানে এসে উপস্থিত হলো।  
ওদিকে স্বার্ট কায়কাউসও মাজিন্দিরান সীমান্তে এসে পৌছলেন  
মনোরম উপত্যকায় সংগ্রামিত হলো তাঁর শিবির।  
সেই তাঁবুর চন্দ্রাতপ লাল ও হলুদ বর্ণের আচ্ছাদনীতে  
সজ্জিত হলো,

রঙের বিভায় ঝলসে গেলো সবার দৃষ্টি।  
রাজ-শিবিরের উপর সূর্যালোক প্রতিফলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
মনে হলো ধর্মীয়েন রূপান্তরিত হয়েছে বিপুল-প্রসার জলাশয়ে।  
সুসজ্জিত সৈন্যদল ও অশুরাজিতে  
দুনিয়া বেহেশ্তের রূপ পরিগ্ৰহ করলো।  
শিবিরাভ্যন্তরে রক্ষিত হলো এক স্ফটিক-সিংহাসন—  
সূর্যালোকিত আকাশের সমারোহ যেন তাতে প্রতিবিস্তি রয়েছে।  
এই সিংহাসনে কেয়ানী তাজ মাথায় পরে  
উপবিষ্ট হলেন প্রবল প্রতাপান্তি ইরান-রাজ কায়কাউস।  
বাদশার সৎ ও অসৎ পরামর্শদাতাগণ ও সামন্তগণ  
তাঁকে ঘিরে স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হলেন।  
বাদশা বীর সেনাপতি ও সামন্তগণকে সম্বোধন করে বললেন,  
হে বীরগণ, আপনারা সবাই আমার মঙ্গলকামী,  
আপনারা প্রত্যেকেই আমার আদেশের অনুবর্তী।  
আমি এখন মাজিন্দিরান অধিপতিকে জয় করবো,  
দৈত্যদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করবো সংগ্রামে।  
এই বিধৰ্মী রাজার সমীপে আমি কোন লিপি  
অথবা বাণী দ্বারা আমার রসনা উন্মুক্ত করতে চাই না।  
কাল সকালে যখন প্রাচীমূলে সূর্য উদিত হবেন  
তখন সরাসরি গিয়ে উপস্থিত হবো মাজিন্দিরানের দ্বারদেশে।  
না থাকবে রাজা না থাকবে তার সৈন্যদল,  
সারা রাজ্য আমার পদপ্রাপ্তে ত্রন্দন করে উঠবে।  
বিপক্ষ দলের শির আমি দলিত করবো আমার অশ্বের পদতলে,  
দৈত্যদলকে দেখিয়ে দিব তামাস।  
সমন্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো আমার অধিকার,

ও এইভাবে অন্তরের কামনাকে আমি সত্যে পরিণত করবো,  
বাদশার কথা শুনে উপস্থিত সামন্তগণ মণ্ডিকা চূম্বন করে  
বাদশার চিরজীবন কামনা করলেন।  
তাঁরা সরবে ঘোষণা করলেন, অঙ্গলের হস্ত বাদশার উপর থেকে  
বিদূরিত হোক,

ধরিত্রী ও কাল সমভাবে কামনা করুক সম্ভাটের কল্যাণ।  
আমার সবাই আপনার দাস ও আঞ্জানুবর্তী,  
হে প্রহরণ, তরবারি ও তৌর-খনুকের অধীশ্বর !  
হে সম্ভাট, আমরা আপনারই সম্পদ  
ও শক্তি দ্বারা প্রতিপালিত ও রক্ষিত।  
আমাদের প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিক্ত,  
নিয়োজিত করুন আমাদেরকে আপনার মর্যাদা অনুযায়ী সংগ্রামে।  
কিন্তু বড়ই দুঃখ যে, অত্যাচারী সপেদ দৈত্য  
এখনো এসে পৌছায়নি।  
সে যদি এই যুক্তে অংশ গ্রহণ না করে,  
তবে অবাধে দৈত্য সংহার করে আমরা তাকে আসতে  
প্ররোচিত করবো।

এইভাবে যুদ্ধকামী সৈনিকদের গর্বেজিত কথাবার্তার ভিতর দিয়ে  
দিনের আলো শেষ হয়ে এলো।  
কায়কাউসের অপ্রকৃতিস্থায় রঙ চড়তে চড়তে  
ক্রমে ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যার লালিমা।  
রাত্রি হল মনে হলো, একখণ্ড কালো মেঘ আকাশে উদিত হয়েছে,  
দেখতে দেখতে আবিসিনিয়ার কৃষ্ণকায় দাসের মুখের মতো

ধরিত্রী হয়ে উঠেছে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ  
সমস্ত পথিবী ভেসে যাচ্ছে সেই কালোর বন্যায়,  
মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে তার সকল আলো।  
মনে হলো, মেঘদলের উর্ধ্বে সংশ্লাপিত হয়েছে এক ধূম-শিবির,  
তা থেকে উদ্গত হচ্ছে কালো বাতাস।  
এমন সময় সহসা আকাশ থেকে শুরু হলো  
প্রস্তর ও উপলব্ধের বারিধারা,  
ও তাতে ছিন্নভিন্ন হতে লাগলো ইরানীয় সৈন্যদল।  
তাদের মধ্যে অনেকেই আলিঙ্গন করলো মৃত্যুকে,  
কোন বস্তুই এই অঙ্গল থেকে রক্ষা পেলো না।

বহু সৈন্য পালিয়ে গেল ইরানের পথে,  
তারা কায়কাউসের প্রয়াসের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলো।  
এইভাবে রাত্রি গত হয়ে প্রভাত নিকটবর্তী হলো  
বিজয়কাঞ্চনী সম্মাটের চোখে দুনিয়া অঙ্ককার হয়ে এলো।  
তিনি দেখলেন, তাঁর সৈন্যদল দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে,  
সেনাপতিগণ বিশুরু ও হতাশ হয়ে পড়েছেন।  
কাউসের অন্তরে নেমে এলো অমাবস্যার অঙ্ককার,  
তিনি শীঘ্র করে সৈন্যদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।  
দেখলেন সমস্ত সম্পদ তাঁর লুট হয়ে গেছে, সৈন্যরা হয়েছে বন্দী,  
তাঁর যৌবনশালী ভাগ্য মুহূর্তে ঢেলে পড়েছে বার্ধক্যের কোলে।  
সম্মাট আক্ষেপ করে বললেন, মহামতি জাল বলেছিলেন,

### ভাগ্য যখন প্রসন্ন

তখন সম্পদের লালসা দুঃখ ডেকে আনে।  
হায় ! তাঁর সুদুরদেশ গ্রাহ্য না করে  
আমি ধাবিত হয়েছিলাম অমঙ্গলের পথে।  
সপ্তাহকাল অতীত হতে না হতেই দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে  
ইরানীয় সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।  
অষ্টম দিনে সিংহনাদ করে সপেদ দৈত্য এসে উপস্থিত হলো

বাদশার সমীপে,

এবং বললো, হে নিঃসঙ্গ হতভাগ্য-সম্মাট !  
আপনিই কি অহঙ্কারে মন্ত হয়ে  
মাজিন্দিরানের চারণভূমি অধিকার করতে চেয়েছিলেন ?  
আপনিই কি মদমত হস্তির মতো শুধু নিজের শক্তিই দেখেছিলেন,  
অন্য কারো মধ্যে শক্তির আবির্ভাব কি আপনার

কল্পনার বাইরের বস্তু ছিল ?

সেই সপেদ দৈত্যের কথা কি আপনার জানা ছিল না  
যে আকাশ থেকে উপত্তে আনে নক্ষত্র ?  
এখন স্বীয় কর্মের পরিণতির মুখোমুখী হয়ে  
বাইরে আনুন আপনার অস্তরস্থিত কামনা।  
যদি জ্ঞানের পাঠ আমার মনে উদয় না হতো,  
তবে এখুনি আপনার প্রাণ আমি দেহ থেকে টেনে বের করতাম।  
কিন্তু বিজয়ী সম্মাট গারশাসপের সঙ্গে  
আমি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ রয়েছি যে,

ইরান ভূমিতে আমি আমার জাদুকরী ধ্বংস-শক্তি প্রকটিত করবো না ;  
যদি তা না হতো, তবে অবশ্যই এখন আমি প্রলয় উদ্ধিত করতাম  
কিন্তু সে থাক, আমি আপনার জন্য এমন দৃঢ়খের ব্যবস্থা করছি —  
যা এমনিতেই আপনার দিনের অস্তিম ডেকে আনবে ।

এই বলে সে অস্ত্রধারী দৈত্যদের মধ্যে থেকে  
দুদশ সহস্র দৈত্যকে মনোনীত করে  
বন্দী ইরানীয়গণকে তাদের হাতে সমর্পণ করলো ।  
তাদের গ্রীবাদেশে পরানো হলো বন্দীহের জিঞ্জির,  
বাদশাকে বিছিন্ন করা হলো তাঁর সৈন্যদের থেকে ।  
কোন রকমে প্রাণে বেঁচে থাকতে পারে  
এমন খাদ্যের বরাদ্দও তাদের জন্য করা হলো ।  
তারপর বাদশার ও সৈন্যদলের সকল সম্পদ,  
তাজ, তখ্ত ও মণিমুক্তা —  
যা কিছু ছিল সব মাজিন্দিরানের সেনাপতি  
আরঝঙ্কে সমর্পণ করে সে বললো,  
আমার যা করার ছিল তা করলাম,  
প্রতিপক্ষের গর্ব ও শক্তিকে বিলুপ্তি করলাম ধূলায় ।  
ইরানের বীরগণ ও ইরানের বাদশা  
আর কখনো চন্দ সূর্যের আলো দেখতে পাবে না ।  
তাদেরকে প্রাণে বধ করিনি ;  
ভয়াল দৃষ্টিতে উচ্চনীচ প্রত্যক্ষ করার অবসর তাদের দিলাম ।  
বিপদে ও বিলাপে অহঙ্কারের পরিণাম তারা হৃদয়ঙ্গম করবে,  
আর মানুষ লাভ করবে তার থেকে শিক্ষা ।  
আরঝঙ্ক সপেদ দৈত্যের কথা কর্ণগোচর করে  
আনন্দে প্রত্যাবৃত্ত হলো মাজিন্দিরানে ।  
তার সঙ্গে গেল তার সৈন্যদল ও সম্পদ,  
গেলো বন্দী ইরানীয় সিপাহী ও বিজিত অশুরাজি ।  
এইভাবে সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে সপেদ দৈত্য  
সূর্যের মতো সঙ্গীরবে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করলো ।  
মাজিন্দিরানে বন্দী অবস্থায় পরিত্যক্ত হলেন কায়কাউস ;  
তিনি মনে মনে বললেন, এ আমারই পাপের প্রতিফল ।

## জাল ও রুক্ষমের প্রতি কাউন্সের বাণী

নিদারণ দুর্যোগে বাদশার মন একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো,  
দুর্ভাগ্য তাঁকে অশক্ত করে ফেললো পক্ষহীন বিহঙ্গের মতো।  
স্থীয় সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বমুহূর্তে  
বাদশা একজন দৃতকে লিপিকা সহ রওয়ানা করে দিয়েছিলেন।  
সেই দৃত আগু থেকে বিনির্গত ধূম্রের মতো  
জাবুলস্তানের দিকে এগিয়ে চললো।  
বাদশা লিখেছিলেন, ভাগ্য আমার প্রতি বিমুখ হয়ে  
ধূলায় লুক্ষিত করেছে আমার তাজ, তথ্ত ও সমারোহ।  
আমার যে সম্পদ ও সৈন্যদল  
ধরিগ্রাতে বসন্তের মতো সুসজ্জিত ছিল,  
আবর্তনশীল আকাশ তা সব দৈত্যকে দান করেছে,  
যেন বাতাসের সঙ্গে এসে ঘিলিত হয়েছে বারিদ-বর্ষণ।  
আমার চোখে এখন দুনিয়া অঙ্ককার, আমার ভাগ্য বিমুখ,  
আমার তাজ, তথ্ত ও সমারোহ সব ভুলুষ্টিত হচ্ছে।  
দৈত্যের মুষ্টিতে আমি এতো কুষ্টিত যে,  
বোধ হচ্ছে, প্রাণ শীত্বাই আমার দেহের আশ্রয় ত্যাগ করবে।  
যখনই আপনার উপদেশ আমার মনে পড়ে,  
তখনই আমার হাদয় মথিত করে বহিগত হয় হিম নিঃশ্বাস।  
আপনার নির্দেশ আমি উপেক্ষা করেছিলাম,  
সেই নিরুক্তি আজ আমার জন্য এই দুঃখ বহন করে এনেছে।  
আপনি যদি এখন আমার সাহায্যে এগিয়ে না আসেন,  
তবে আমার সকল প্রাণ্প্রাণী হবে ক্ষয়ে ক্রপান্তরিত।  
দৃত মাজিন্দিরান থেকে পক্ষীর মতো উড়ে সীস্তানে এসে পৌছলো।  
মহামতি জালের সমীপে এসে  
যা কিছু সে দেখে ও শুনে এসেছে সব নিবেদন করলো।  
দৃতের কথা শুনে জাল গাত্রাবরণ বিদীর্ণ করে  
শত্রু-মিত্র সবার অলক্ষে চলে গেলেন।  
তাঁর উত্তসিত হাদয়ে বহুদূরের অমঙ্গল যেন প্রতিফলিত হলো,  
তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন কালের প্রয়োজন,  
রুক্ষমকে কাছে ডেকে জাল বললেন,  
তরবারি কোষবন্ধ রেখে

আনল্দে অবকাশ যাপনের সময় এ নয়,  
অপরের তাজ রক্ষায় আমাদের কোন্ লাভ ?  
দুনিয়ার বাদশা আজ হিংস্র দৈত্যের কবলিত,  
ইরানের গৌরব যে বীরগণ তাঁদের উপর আজ নিদারণ দুর্দিন ।  
অবিলম্বে তোমার রাখ্যকে সজ্জিত কর,  
বিশ্ব-প্রভুর দেওয়া তরবারি কর উন্মুক্ত ।  
এই দুষ্টর কর্ম তোমাকেই শোভা পায়,  
আমার বয়ঃক্রম এখন দ্বিশতাধিক ।  
নিদারণ বিপদ থেকে বাদশাকে দান কর মুক্তি,  
এই কর্ম তোমার যশকে আকাশচূম্বী করবে ।  
দৈত্যদের এই আশ্ফালনের সামনে  
বিশ্বাস্তি কিছুতেই শোভা পায় না ।  
শিরে তুলে নাও সিংহ-মুখাক্ষিত শিরস্ত্রাণ,  
ও অস্তর থেকে দূর কর ভয় ও সন্দেহ ।  
যুদ্ধে প্রবাহিত কর খনের দরিয়া,  
হঞ্চারে অবনমিত কর পর্বতলীর ।  
তোমার শৌর্যে আরঝঙ্গ ও সপেদ দৈত্যের  
সকল উদ্যম উন্মুক্তি করো ।  
মাজিন্দিরানের অধিপতির শিরসহ  
প্রতিপক্ষের সকল অস্ত্র তোমার গুরুভার প্রহরণের আঘাতে  
কর বিচৃণিত ।

এই সংগ্রাম থেকে জীবিত ফিরলে  
সারা বিশ্বে তোমার যশ ও সফলতার সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে ।  
হে পুত্র, আমি আশা করি তুমি সামের নাম উজ্জ্বলিত করবে,  
তাঁর মতো বীর দুনিয়ায় ছিল না ।  
নিশ্চয় জেনো অতঃপর সমস্ত বিশ্ব তোমার বশীভৃত হবে,  
দৈত্যগণ প্রকম্পিত হবে তোমার নামে ।  
পিতার কথা শুনে রুক্ষম বললেন,  
আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যাত্রা করছি, কিন্তু পথ যে দীর্ঘ ।  
ছয়মাস ধরে পথ চলে সম্রাট মাজিন্দিরান পৌছছিলেন ।  
এই দুরপথ অতিক্রম করতে যদি সংবাদ পাই যে,  
সম্রাট ক্ষেত্রে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করেছেন ;  
কারণ, কায়কোবাদের বংশোন্তু রাজাৰ প্রাণ

যেমন সুকুমার তেমনি মূল্যবান।  
উত্তরে জাল বললেন, বাদশা যে পথে গিয়েছিলেন  
সেই পথ ছাড়াও অন্য এক পথ আছে।  
কায়কটুসের যাত্রাপথ দীর্ঘ বটে কিন্তু  
অপর পথে মাজিন্দিরান পৌছতে দুস্পাহ মাত্র সময় লাগে।  
কিন্তু সেপথ বিপদসঙ্কুল — সেপথের সিংহ, দৈত্য ও ঘোর অক্রকার —  
তোমার চক্ষুকে বিশ্বায়ে বিস্ফারিত করবে।  
আমার অভিমত, তুমি এই হৃষি পথই অবলম্বন কর ও  
সম্মুখীন হও বিশ্বময়রাজির,  
বিশু-স্মৃষ্টা স্বয়ং তোমার রক্ষক হবেন।  
সে পথে যদিও তোমাকে সম্মুখীন হতে হবে বিপদরাশির,  
তবুও, আশীর্বাদ করি, রাখ্শের পদতলে তুমি সেসব  
দলিত করবে।  
আমি প্রতি রাত্রে ভোরের আলোর উম্মেষক্ষণ পর্যন্ত  
জগৎ-পিতার কাছে তোমার জন্য কল্যাণের প্রার্থনা করবো।  
আমি স্থির নিশ্চিত আবার তোমাকে আমি দেখতে পাবো,  
দেখতে পাবো তোমার উন্নত শির, তোমার বজ্রমুষ্ঠি ও তোমার প্রহরণ।  
কিন্তু দৈত্যদের দেশে পৌছে সর্বদা তুমি অতন্ত্র থাকবে,  
এবং মনে রাখবে বিশু-প্রভুকে।  
সাবধানী পুরুষ যেখানেই যাত্রা করুক  
কেউ তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না।  
এবং যে-লোক বিশু-প্রভুর সমন্বয় নাম নিয়ে অধিকার করে দুনিয়া —  
তার শক্ত মুষ্ঠি কেউ কখনো করতে পারে না শিথিল।  
মহান পিতার কথা শুনে রুক্ষম বললেন,  
আপনার আদেশ শিরোধার্য করে আমি কোমর বাঁধলাম।  
আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত;  
বিশু-প্রভুর সহ্যতা ভিন্ন আর কিছুই প্রাথনীয় নয়।  
আমার দেহ ও প্রাণ দুষ্ট-ই আমি আপনার পায়ে উৎসর্গ করলাম,  
সমস্ত মন্ত্রশক্তি আমি অবলীলায় পরাভূত করবো।  
ইরানীয়গণের মধ্যে এখনও যাঁরা জীবিত আছেন,  
তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা আমি করছি।  
আরবাঙ্গ কিংবা সপেদ দৈত্য কাকেও আমি রেহাই দেব না,  
সাঞ্জা, পুলাদ গন্দী প্রমুখ দৈত্যদের আমি সংহার করবো।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্ফুটা এক ও অদ্বিতীয় খোদার নাম যিয়ে  
 কুস্তম রাখশ্চকে উত্তেজিত করলে  
 অবশ্যই সে আরঝঙ্গকে বৈধে আনতে পারে।  
 অবশ্য সে দলিল করতে পারে দৈত্যবীরের শির  
 তার রাখশ্চের পদতলে।  
 পরদিন সূর্য উদয়াচলে মুখ খুলতেই  
 দুনিয়া নব বসন্তের সমারোহে হেসে উঠলো।  
 কুস্তম তাঁর সিংহ-মুখাক্ষিত শিরস্ত্রাণ মাথায় পরে প্রস্তুত হলেন,  
 জ্বাল তা দেখে উচ্চারণ করলেন প্রচুর আশীর্বাণী।  
 বললেন, দুনিয়ায় তোমার আকাঙ্ক্ষা সফলতায় সার্থক হোক,  
 তোমার শক্ররা নিপাত যাক।  
 সর্বদা সর্বত্র উচ্চারিত হোক তোমার সুনাম,  
 রাখশ তোমাকে বহন করলে স্বয়ং বিশ্ব-প্রভুঃ  
 তিনি তোমার শক্রদের শির অবনত করলন।  
 এমন সময় কুস্তম-জননী রূদ্বাবা  
 অশ্রু-সিঞ্চন বদনে সেখানে আগমন করলেন।  
 চন্দ্রমুখী রূদ্বাবা কুস্তমকে সম্বোধন করে বললেন, —  
 হে পুত্র, তুমি কোন পথে যাত্রা করছ?  
 তুমি কি আমাকে বিছেদের শোকের মধ্যে পরিত্যাগ করতে চাও?  
 বল, বিশ্ব-প্রভুর দরগায় কি বস্তু তোমার কাম্য?  
 জ্বাবে কুস্তম বললেন, ওগো স্নেহময়ী মাতা,  
 আমি স্বেচ্ছায় এই পথ নির্বাচিত করিনি।  
 স্বয়ং ভাগ্য আমার জন্য নির্ধারিত করেছেন এই পথ,  
 আপনি আমাকে সানন্দে সমর্পণ করুন বিশ্ব-প্রভুর হাতে।  
 এই বলে তিনি বিদায়-সূচক অভিবাদন জানাবার জন্য  
 মায়ের সমীপবর্তী হয়ে বললেন,  
 মা, আশীর্বাদ করল, শীঘ্রই ফিরে এসে  
 আবার আপনাকে দেখবো।

## সপ্ত সঙ্কটের পথে রুক্ষমের অভিযান

প্রথম সঙ্কট : সিংহের সঙ্গে রাখ্শের যুদ্ধ

মহাবীর রুক্ষম যথাসময়ে পিতার সমীপ থেকে  
বিদায় হয়ে নীমরোজ থেকে নিঞ্চান্ত হলেন।

দুদিনের পৃথ তিনি একদিনে অতিক্রম করে চললেন,  
অঙ্ককার রাত্রিকে তিনি গণ্য করলেন দিবসের মতো।

দিন-রাত্রি সমান গতিতে রাখ্শ  
পথাতিক্রম করে চললো।

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে রুক্ষম খাদ্যের অন্বেষণে  
এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি দেখলেন, এই প্রান্তরে বিচরণ করে ফিরছে  
বহু বন্য-গর্দভ।

পাশ হাতে নিয়ে তিনি রাখ্শকে  
একটি গর্দভের পেছনে দ্রুত ধাবিত করলেন।  
এবং চক্ষের নিমিষে কেয়ানী পাশে আবদ্ধ করে নিলেন  
সেই গর্দভকে।

তারপর তীরের ফলায় অগ্নি উদ্গত করে  
তাতে শুকনো ঘাস পাতা দিয়ে আগুন জ্বালালেন।  
এবং বন্য গর্দভটিকে হত্যা করে  
আগুনে পুড়িয়ে নিলেন।

গর্দভের পোড়া মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে  
রুক্ষম তার হাড়-গোড় দূরে নিষ্কেপ করলেন।  
এইবার রাখ্শের মুখ থেকে লাগাম খুলে নিয়ে  
তিনি তাকে নিকটস্থ তৃণ-প্রান্তরে চরে ফিরবার জন্য ছেড়ে দিলেন।  
এবং নিকটস্থ বেণুবনে স্বীয় শয়া রচনা করে  
বুদ্ধতে পারলেন, এই স্থান বিপদ-সঙ্কুল।  
তাই সিথানের নীচে তরবারী রক্ষা করে  
তিনি অচিরেই নিদ্রাভিভূত হলেন।  
এই বেণুবন ছিল এক সিংহের আশ্বানা,  
হস্তীও যার পরাক্রমের সামনে তুচ্ছ ছিল।  
রাত্রির এক প্রহর গত হলে  
সিংহ তার থানায় প্রত্যাগত হয়ে দেখলো,

তার আস্তানায় শুয়ে আছে এক বীর পুরুষ,  
আর নিকটেই এক অশু বিচরণ করে ফিরছে।  
সে ভাবলো, প্রথমে অশুকে নিধন করে  
পরে তার আরোহীকে আক্রমণ করা যাবে।

এই ভেবে সে রাখ্শের দিকে সবেগে ধাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
রাখ্শও প্রত্যন্তের আগুনের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো।  
সে তার সামনের দুই পা উথিত করে  
সিংহের মন্ত্রকে এমনভাবে আঘাত করলো যে,

সেই আঘাতে সিংহের মন্ত্রক বিচূর্ণিত হয়ে  
তার দন্তরাঙ্গি দেহে প্রবিষ্ট হয়ে গেলো।

হট্টগোলে রুক্ষমের ঘূম ভেঙে গেলে তিনি উঠে দেখলেন,  
এক বিকটাকার সিংহ মৃত পড়ে আছে।

রুক্ষম তখন রাখ্শকে উদ্দেশ্য করে বললেন,  
হে সচেতন অশু, তুই সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিস।

যদি তার হাতে তোর মৃত্যু হতো  
তবে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে —

পাশ, কামুক, তরবারি ও গুরুভার প্রহরণ নিয়ে  
কেমন করে আমি মাজিদিয়ানে গিয়ে পৌছতাম ?

আমি তোর মতো তেজিয়ান ঘোড়া আর কোথাও দেখি নি —  
এমন ক্ষিপ্ততা, এমন হঁশিয়ারী ও এমন বলবীর্য

আমার ধারণার অতীত ছিল।

তোর হট্টগোল যখন আমার গভীর নিদ্রাকে সচকিত করলো  
তখন সিংহের সঙ্গে তোর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

তবে তারপরেও কেন তুই চেঁচামেচি করে  
আমার সুখ-নিদ্রা এমন করে ভেঙে দিলি ?

এই বলে মহাবীর আবার নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন  
ও দীর্ঘক্ষণ আরামে নিদ্রা গেলেন।

যখন তাঁর ঘূম ভাঙ্গলো তখন সূর্য  
অঙ্ককার পর্বতমালার উপর থেকে মুচকি হাসছে।

রুক্ষম আবার রাখ্শকে জীন পরিয়ে সজ্জিত করলেন  
ও স্মরণ করলেন সর্বমঙ্গলদাতা বিশ্ব-প্রভুর নাম।

তারপর যথারীতি রাখ্শের পিঠে সওয়ার হয়ে  
দ্বিতীয় সঙ্কটস্থলের দিকে মুখ করলেন।

## দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত ৩ প্রস্তবণের সাক্ষাৎ লাভ

সামনে এলো এক বিপদ-সঙ্কুল পথ,  
রুস্তম উদ্বিগ্ন চিত্তে সেই পথ অতিক্রম করে চললেন।  
জলহীন বৃক্ষহীন এই প্রান্তরে সৌরতাপ অত্যন্ত প্রথর,  
উঠে যেতে পক্ষীকুলের বুক এখানে বিদীর্ণ হয়।  
মরুময় এই প্রান্তরে উষ্ণবায়ু প্রবাহ নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে,  
মনে হয় আগুনের হল্কা যেন ছুটে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।  
রাখ্ম ও তার আরোহীর রসনা তাপে ও তৃষ্ণায়  
অবশ হয়ে এলো।

রুস্তম অশৃপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে  
পাগলের মতো বর্ণা হাতে পদব্রজে এগিয়ে চললেন।  
কোথাও তিনি এক ফেঁটা পানির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন না,  
বার বার তিনি মেঘের আশায় আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন  
উর্ধ্ব-মুখ হয়ে রুস্তম বললেন, হে বিশ্ব-পালক প্রভু,  
এত দুঃখ ও নির্মতা তুমি আমার উপর অবতীর্ণ করেছ ;  
যদি আমার এই দুঃখ তোমার প্রসন্নতা লাভে সক্ষম হয়  
তবে আমার জীবন সফলতায় পূর্ণ করে দিয়ো প্রভু !  
আমার এই অভিযানের লক্ষ্য বাদশা কাউসকে মুক্তি দান করা।  
সকল ইরানীয় বীরগণকে দৈত্যের হাত থেকে  
রেহাই করাও আমার উদ্দেশ্য প্রভু !  
তুমি পাপী ও পতিতগণের সহায়  
তুমি তোমার পূজারী ও দাসগণের রক্ষক।  
হে পবিত্র প্রভু, ঐদেরকে তুমি আমার হাতে মুক্তি দান করো,  
তাঁদের মুক্তির জন্যে আমি আমার দেহপ্রাণ উৎসর্গ করেছি।  
তুমি বলেছ, তুমি দান-উন্মুখ প্রভু,  
বিপদগ্রস্তদের বিপদে তুমি তাদের সহায়।  
যদি আমার উদ্দেশ্য তোমার অনুমোদন লাভ করে থাকে  
তবে দেখো, আমার জীবন বিপজ্জালে অঙ্ককার হয়ে এসেছে।  
আমাকে দান করো তোমার সহায়তা  
এবং বৃক্ষ জালের হাদয়কে শোকের আঘাত থেকে রক্ষা করো।  
এই বিপদে আমার সহযোগী বীরগণের জীবন বিপন্ন করো না,

আমাকে, আমাদের সেনানীবৃন্দকে ও আমার দেশকে  
বিপন্নুক্ত করো।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রুস্তমের চোখে

কবর ও কাফনের ছবি ভেসে উঠলো।

তিনি আপন মনে বলে চললেন, আহা, আমি যদি ইরানীয়  
সেনানীবৃন্দের সন্নিকটে বীরের মতো গিয়ে পৌছতে পারতাম !

যদি দুরস্ত আক্রমণে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে

তাঁদের প্রাণে সঞ্চার করতে পারতাম আশার।

যদি আমার প্রহরণের ঘায়ে পর্বত বিদীর্ঘ করে

এগিয়ে যেতে পারতাম লক্ষ্যের অভিমুখে !

যদি তা না হয় তবে কিসের পৌরুষ ?

কিসের সে ভাগ্য, সৃষ্টিকর্তার কাছেই যদি তা অন্ধকার  
থেকে যায় ?

হায়, এই তৎক্ষণার আমি কি উপায় করি,

স্বীয় প্রাণের উপর আপত্তি এই ব্যাধির প্রতিকার কি ?

এই কথা বলার পরই মহাবীর

তৎক্ষণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।

তিনি উত্পন্ন মৃত্যিকার উপর ঢলে পড়লেন

পানির জন্য তাঁর ছাতি যেন ফেটে যেতে লাগলো।

এমন সময় সহসা সেখানে একটি সুর্দৰ্শন ভেড়ার আবির্ভাব হলো,  
ধীর মন্ত্র গতিতে সে রুস্তমের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

রুস্তম মনে মনে ভাবলেন,

হয়ত নিকটেই কোন জলাশয় আছে।

বিশ্ব-প্রভু করুণা পরবশ হয়ে

আমার উদ্ধারের জন্য এই চতুর্পদকে প্রেরণ করেছেন

রুস্তম স্বীয় তরবারির উপর ভর করে

স্বষ্টার দেওয়া শক্তিতে উঠে দাঁড়ালেন।

এক হাতে তরবারি ও অন্য হাতে লাগাম ধরে

ভেড়ার পেছনে পেছনে তিনি এগিয়ে চললেন,—

তাঁর মনে ভেসে উঠছে, শুভ মুহূর্তের আগমনের আশা।

সহসা পথ-সম্মুখে এক জলাশয়ের নিকটে এসে

ভেড়া থমকে দাঁড়ালো।

রুস্তম আকাশের দিকে মুখ করে বললেন,

হে সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রভু,

এই জলাশয় বস্তুত ভেড়ার জন্য ছিল না,  
প্রান্তরের এই দৃঢ়ত্ব আমার ভাগ্যলিপি নয়।

তোমার সমক্ষে আমার ভাষা সংকীর্ণ ও অক্ষম,  
তোমার আশ্রয় ব্যতীত অন্য আশ্রয় নেই।

যে ব্যক্তি করণাময় বিশ্ব-প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরায়  
তার স্থান কোথায় ?

করণাময় প্রভু শাস্তি যা সৃষ্টি করেছেন  
দানের সামনে তা কত অকিঞ্চিতকর !

হে প্রভু, প্রান্তরকে তুমিই সবুজের সাজ পরাও,  
অনুষ্ঠণকারীর হাদয়ে তুমিই দান করো তোমার স্মরণ !

তোমার বিরক্তে উদ্যত হয় যে অস্ত্র  
তুমি তা ভেঙে টুকরা টুকরা করো।

রুক্ষমকে তুমিই জীবিত রেখেছ,  
তা না হলে তার দেহ আজ কাফনে আবৃত হতো।

যে আজদাহার চর্ম অচ্ছেদ্য  
ব্যাস্ত্রের নখরেও যা বিদীর্ণ হয় না —

রুক্ষম স্বচক্ষে তাকে হরিপের ক্ষুরের ঘায়ে  
দীর্ঘ হতে দেখেছে।

এতো তোমারই কীর্তি প্রভু,  
তোমারই দান ও শাস্তির নির্দর্শন।

এইভাবে বিশ্ব-প্রভুর শুণগান করে  
রুক্ষম রাখ্শের উপর থেকে জীন নামিয়ে নিলেন।

এবং সেই পবিত্র জলাশয়ে সারা দেহ ধৌত করে  
সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

এইভাবে পানিতে ত্পু হয়ে তিনি মগয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন  
ও তৃণীর তীর দুরা পূর্ণ করে নিলেন।

এইবারও তিনি এক দূরস্ত বন্য-গর্দন শিকার করে  
তার চর্ম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলগা করে নিলেন।

এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাতে খাদ্য প্রস্তুত করলেন।

তারপর সেই জলাশয়ে গিয়ে  
পূর্ণ পরিত্বিত সঙ্গে জলপান করে  
তারই তীরে সবুজ শঙ্কদলে শয়নের আয়োজন করলেন।

ରାଖଶକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲଲେନ,  
ଦେଖିସ, କାରୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କିଂବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିସ ନେ ।  
ଯଦି ଶକ୍ତ ଆଗମନ ହୁଏ  
ତତ୍କୁ ସିଂହ କିଂବା ଦୈତ୍ୟର ସଙ୍ଗେ ଲଡ଼ିବାର ତୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ ।  
ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୁ ଆମାକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଜୀନ ଗଦିତେ ସୁଶୋଭିତ ହେୟାର ଜନ୍ୟ ।  
ଆର ତୋକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଜୀନ ଗଦିତେ ସୁଶୋଭିତ ହେୟାର ଜନ୍ୟ ।  
ଏହି ବଲେ ବୀରବର ନିଦ୍ରାର ଶାନ୍ତିମୟ କୋଳେ ଢଳେ ପଡ଼ଲେନ,  
ଓ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଖି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚରେ ବେଡ଼ାତେ ଲାଗଲୋ ।

### ତୃତୀୟ ସକଟଃ ଆଜଦାହାର ସଙ୍ଗେ ରୁକ୍ଷମେର ଯୁଦ୍ଧ

ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଆସନ୍ତ ହେୟାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ ଥେକେ  
ଏମନ ଏକ ଆଜଦାହା ବେରିଯେ ଏଲୋ,  
ବିରାଟକାଯ ହାତୀଓ ଯାର ଥେକେ ରେହାଇ ପାଯ ନା ।  
ସେଇ ଭୀମଦର୍ଶନ ଆଜଦାହା ମାଥା ଥେକେ  
ଲେଜେର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶି ଗଜ ଦୀର୍ଘ ।  
ଏହି ପ୍ରାନ୍ତର ସେଇ ଆଜଦାହାର ବିଚରଣ-ଭୂମି,  
ତାର ଭୟେ ଦୈତ୍ୟଗଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପଥେ ଚଲାତେ ଭୟ ପାଯ ।  
ଆଜଦାହା ବିଶ୍ଵମୟେ ହତବାକ ହୟେ ଭାବତେ ଲାଗଲୋ,  
ଏଥାନେ କୋନ୍ ସାହସୀ ପୁରୁଷ ଏମନ ନିରଦ୍ଵେଗେ ନିଦ୍ରା ଯାଚେ ?  
ଏ ପଥେ ଦୈତ୍ୟ, ମାତ୍ରଙ୍କ କିଂବା ସିଂହ  
କେଉଁ ଚଲାତେ ଭରସା ପାଯ ନା ।  
ଯେହି ହୋକ, ସେ ଆର ଆଜ  
ଆଜଦାହାର ହାତ ଥେକେ ରକ୍ଷା ପାବେ ନା ।  
ପ୍ରଥମେଇ ସେ ରାଖଶକେ ଆକ୍ରମଣ କରାର ଜନ୍ୟ ଏଗିଯେ ଗେଲୋ ।  
ରାଖି ତଥୁନି ଦୌଡ଼େ ଏଲୋ ବୀରବରେର ସମୀପେ ।  
ଏବେ ମୃତ୍ୟୁକାଯ ପଦାଘାତ କରେ, ଲେଜ ଆଲୋଲିତ କରେ  
ଓ ଚିଂକାର କରେ ଚାରଦିକ କାଁପିଯେ ତୁଳଲୋ ।  
ସେଇ କୋଳାହଲେ ରୁକ୍ଷମେର ସୁମ ଭେଣେ ଗେଲୋ,  
ତିନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧାରେ ନିଜେର ମନକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନିଲେନ ।  
ଏବେ ଚୋଥ ଫିରିଯେ ଚାରଦିକ ଦେଖାତେ ଲାଗଲେନ,  
ଏଦିକେ ଆଜଦାହା ନିଜେକେ ବନମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ କରେ ଫେଲଲୋ ।  
ରୁକ୍ଷମ ତାଁକେ ଅନର୍ଥକ ନିଦ୍ରା ଥେକେ ଜାଗାବାର ଜନ୍ୟ

ରାଖ୍ଷକେ ତିରକ୍ଷାର କରଲେନ ।  
କିନ୍ତୁ ରୁଷ୍ମ ନିଦିତ ହଲେ  
ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଆଜଦାହ ବେରିଯେ ଏଲୋ ।  
ଏଇବାରଓ ରାଖ୍ଷ ରୁଷ୍ମର ଶିଯରେର କାହେ ଏସେ  
ପଦାଘାତେ ମୃତିକା ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରତେ ଲାଗଲୋ ।  
ବୀରବର ଆବାର ନିଦ୍ରା ଡେଙ୍ଗେ ଉଠେ ବସଲେନ,  
କ୍ରୋଧେ ତାଁ ମୁଖ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ହେୟେ ଉଠିଲୋ ।  
ତିନି ବନେର ଚାରଦିକେ ଢାଖ ଫିରିଯେ ଦେଖତେ ଲାଗଲେନ,  
କିନ୍ତୁ ଜମାଟ ଅଞ୍ଚକାର ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁ ତାଁ ନଜରେ ପଡ଼ିଲୋ ନା ।  
କ୍ରୋଧାନ୍ତି ସ୍ଵରେ ତିନି ବିନିଦ୍ର ରାଖ୍ଷକେ ବଲଲେନ,  
ରାତ୍ରିର ଅଞ୍ଚକାରକେ ତୁଇ ଉତ୍ୟକ୍ତ ନା କରେ ଥାକବି ନା ।  
ଆବାର ତୁଇ ଆମାକେ ଘୂମ ଥେକେ ଜାଗିଯେ ଦିଲି !  
ଜେନେ ରାଖ୍ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ତୁଇ ଏମନ ହଟ୍ଟଗୋଲ କରବି  
ତବେ ଏଇ ତରବାରିର ଆଘାତେ ଆମି ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବିଛିନ୍ନ କରବୋ ।  
ତୋକେ ମେରେ ପାଯେ ହେଟେଇ ଆୟି ମାଜିନ୍ଦିରାନ ଗିଯେ ପୌଛବୋ  
ନିଜେଇ ତରବାରି ଓ ଗୁରୁଭାର ପ୍ରହରଣେର ଭାର ବହିବୋ ।  
ଯଦି ସିଂହଓ ତୋକେ ଆକ୍ରମଣ କରେ  
ତବେ ଆମିଇ ତାର ମୋକାବେଲା କରବୋ ।  
ବଲେ ରାଖଛି ,ଆଜ ରାତ୍ରେ ଆର ତୁଇ ଆମାକେ ବିରକ୍ତ କରବି ନେ,  
ସଙ୍କଟକାଳେ ଆମି ନିଜେଇ ଘୂମ ଥେକେ ଜେଣେ ଉଠିବୋ ।  
ଏଇ ବଲେ ବୀରବର ତୃତୀୟ ବାରେର ମତୋ ନିଦ୍ରାମୟ ହଲେନ,  
ତାଁ ବୁକେର କାହେ ପଡ଼େ ରଇଲୋ ତାଁ ସିଂହ-ମୁଖାକ୍ଷିତ ଶିରମ୍ଭାଣ ।  
ଏମନ ସମୟ ଆବାର ଭୟକ୍ଷର ଆଜଦାହ ଗର୍ଜନ କରେ ବେରଲୋ,  
ତାର ପୁଛାଗ୍ର ଥେକେ ନିର୍ଗତ ହଞ୍ଚେ ଆଗୁନେର ହଲ୍କା ।  
ଏଇ ସମୟ ରାଖ୍ଷ ବୀରବରେର କାହେ ଯେତେ ନା ପେରେ  
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ ।  
କିନ୍ତୁ ରୁଷ୍ମର ପ୍ରତି ଆଜଦାହର ବ୍ୟବହାରେର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ  
ତାର ଅନ୍ତର ଛିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ହତେ ଲାଗଲୋ ।  
ପ୍ରଭୁର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସା ତାକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରିର ଥାକତେ ଦିଲୋ ନା,  
ମେ ଦୌଡ଼େ ରୁଷ୍ମର କାହେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ ।  
ଚିନ୍କାରେ ଓ ହଟ୍ଟଗାଲେ ଚାରଦିକ ସଚକିତ କରେ ପଦାଘାତେ  
ମେ ମୃତିକା ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଘ କରତେ ଲାଗଲୋ ।  
ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗେ ରୁଷ୍ମ ଜେଣେ ଉଠେ

ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে অশ্বের দিকে তাকালেন।  
কিন্তু বিশু-প্রভু এইবার রুস্তমের চাখে রহস্য প্রকটিত করলেন,  
আজদাহা আর মৃতিকা গর্ভে অস্তর্হিত হওয়ার সময় পেলো না।  
অঙ্ককারের মধ্যেই রুস্তম তাকে দেখে ফেললেন,  
ও সঙ্গে সঙ্গে কঠিদেশ থেকে টেনে নিলেন ক্ষুরধার তরবারি।  
তারপর বসন্তকালীন মেঘের মতো গর্জন করে  
অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণের আগুন প্রজ্জ্বলিত করলেন।  
বীরবর আজদাহাকে লক্ষ্য করে বললেন,  
এর পর দুনিয়ায় তুই সফলতা প্রত্যক্ষ করবি নে।  
উত্তরে আজদাহা বললো,  
আমার হাত থেকে এ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি।  
এই প্রাস্তরের শত যোজন আমার করতলগত,  
উর্ধ্বর্কাশের বায়ুরাশিও আমার অধিকারে।  
শ্যেনপক্ষীও এই প্রাস্তরের উপর দিয়ে উড়তে অক্ষম,  
আকাশের তারারা পর্যন্ত রাত্রিতে ভয়ে এদিকে দৃষ্টিপাত করে না।  
কাজেই শীগংগির করে বল্ কি তোর নাম,  
কার পুত্র তুই, কোন সাহসে এ পথে পাড়ি জমিয়েছিস ?  
জবাবে বীরবর বললেন, আমার নাম রুস্তম,  
আমার পিতা জাল, পিতামহ সাম ও প্রপিতামহ নূরীমান।  
বৈরনির্যাতনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি একাই  
সাহসী রাখশের পিঠে চড়ে পথ অতিক্রম করছি।  
তুই এখনি আমার যুদ্ধের তেজ প্রত্যক্ষ করবি,  
অবিলম্বেই তোর মস্তক আমি ধূলায় লুটিয়ে দিব।  
এই বলেই তিনি আজদাহার সঙ্গে যুদ্ধে অবর্তীণ হলেন  
দীর্ঘক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলতে লাগলো।  
আজদাহা রুস্তমকে এভাবে ঠেসে ধরলো যে,  
মনে হলো রুস্তম হেরে যাবেন।  
রাখশ আজদাহার শক্তি ও বীরপ্রবরকে বিপদগ্রস্ত দেখে  
তীরবেগে এসে আজদাহার উপর পতিত হয়ে  
তার চর্মে দস্ত বিন্দু করলো।  
এবং সিংহের বিক্রমে তার চর্ম ছিন্ন করে দিলো,  
রুস্তম রাখশের এই পরাক্রম দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন।  
এইবার তিনি তাঁর তরবারির এক মোক্ষম আঘাতে

আজদাহার শির তার দেহ থেকে বিছিন্ন করে দিলেন।  
বিরাটকায় আজদাহা বিপুলায়তন স্থান নিয়ে গড়িয়ে পড়লো,  
সঙ্গে সঙ্গে রুষ্মের পদতলে প্রবাহিত হলো খুনের দরিয়া।  
রুশ্ম আশ্চর্য হয়ে আজদাহার বিরাটকায় দেহ,  
তার ভয়কর পৃষ্ঠ এবং তার বলদপিত পাঞ্জার দিকে চেয়ে রইলেন।  
রাত্রির অন্ধকার, বনের ভয়াবহতা ও রক্তের ধারার দিকে চেয়ে  
রুশ্ম পরম কৃতজ্ঞতায় বিশ্ব-প্রভুর নাম উচ্চারণ করলেন।  
তারপর জলাশয়ে নেমে হস্তপদ প্রক্ষালন করে ভাবলেন,  
জগৎ-পিতার শক্তি ব্যতিরেকে আর কোন শক্তিই দুনিয়ায় নেই।  
এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, হে করুণাময় প্রভু,  
আমার জ্ঞান, শৌর্য ও সমারোহ তোমারই দান।  
তাই সিংহ, দৈত্য, হস্তী,  
বনভূমি, কিংবা স্নোতোন্মত নদী  
সর্বত্রই তুমি আমাকে সফল ও বিজয়ী করেছ।

### চতুর্থ সংক্ষিপ্ত : কুহকিনী রমণীকে হত্যা

বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা কীর্তন করার পর  
রুশ্ম রাখ্শকে সংজ্ঞিত করলেন,  
ও তার পিঠে চড়ে পথাত্তিক্রম করতে লাগলেন  
ক্রমে তিনি ঐন্দ্ৰজালিকদের দেশে এসে উপস্থিত হলেন।  
দীর্ঘ পথ চলতে চলতে দেখা গেল,  
সূর্য অস্তগমনোন্মুখী হয়েছে।  
রুশ্ম চারদিকে চেয়ে দেখলেন, শ্যামল বৃক্ষরাজি ও স্বচ্ছ  
স্নোতোন্মতীতে

সেই স্থানে যেন যৌবনের বসন্ত এসেছে।  
হংস চক্ষুর মতো স্বচ্ছ জলাশয়ের তীরে  
এক সুবর্ণ-ভংগার সুগন্ধী সূরায় পূর্ণ রয়েছে।  
তারই সংলগ্ন কয়েকটি পাত্রে ভেড়ার সুপুর্ক মাংস,  
কুটি, লবণ ও রসনাত্প্রিকর আচার পরিবেশিত রয়েছে।  
রুশ্ম এই সব খাদ্যসামগ্ৰী ও সূরা দেখে  
বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা উচ্চারণ করলেন।  
এবং অশু-পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে

খাদ্যসামগ্ৰীৰ দিকে পা বাড়ালেন।

এসব কিছুই ইন্দ্ৰজালিক ; রুষ্টমের আগমন-শব্দ শুনেই  
সেখান থেকে অশৰীৱী দৈত্যগণ প্ৰস্থান কৱলো।

রুষ্টম জলাশয়েৰ কিনারায় এসে  
পানপাত্ৰ পূৰ্ণ কৰে হটচিপ্পে উপবেশন কৱলেন।  
ভংগাৰেৰ পাশেই তিনি এক তানপূৰাৰ দেখতে পেলেন  
তাঁৰ মনে হলো, জনহীন অৱণ্য যেন উৎসব-কক্ষে  
ৱাপাস্তৱিত হয়েছে।

রুষ্টম টেনে নিলেন তানপূৰা  
ও তাতে সংযোজিত কৱলেন সূৰ ও কথা।

তাঁৰ মনে হলো, জীবন আজ বড় মুক্ত,  
দুনিয়ায় আনন্দেৰ মাত্ৰা সত্যই কম।

এখানে সৰ্বত্র যুদ্ধেৰ ময়দান,  
এৱ অধিকাংশই গহন অৱণ্য ও মৱন্তুমি।

এখানে দৈত্য ও আজদাহার সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ,  
সংগ্ৰাম ও অৱণ্য থেকে এখানে মুক্তি নেই।

আমাৰ ভাগ্য আমাকে সুৱা, পাত্ৰ, ফুলবন ও সঙ্গীত থেকে  
বঞ্চিত কৰে রেখেছে।

সৰ্বদা আমাকে ভীষণ নক্ষেৰ সঙ্গে  
ও হিংস্র ব্যাঘাতিৰ সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়।

রুষ্টম এমনি ভাবছেন, সহসা এক নারী কঢ়েৰ সুমধুৰ গীত  
তাঁৰ কৰ্ণগোচৰ হলো।

সঙ্গে সঙ্গে অপৱেপ সুন্দৱী নারী  
তার অনবদ্য রূপ যৌবনসহ সেখানে এসে আবিৰ্ভূত হলো।

ৱৰণ ও সৌৱভেৰ হিল্লোল তুলে সে  
রুষ্টমেৰ পাশে এসে বসলো ও জিজাসা কৱলো তাঁৰ কুশল।

রুষ্টম এই দৃশ্য দেখে বিশ্ব-প্ৰভুৰ প্ৰশংসা উচ্চাৰণ কৱলেন  
ও স্মৰণ কৱলেন তাঁৰ গুণগ্ৰাম।

অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি ভাবলেন, আহা কে জানতো  
মাজিদিৱানেৰ পথে এমন খাদ্য সামগ্ৰী, সুৱা ও যৌবনশালিনী

নারী তাঁৰ প্ৰাপ্য হবে ?

কিন্তু হায়, তিনি জানতেন না যে, এ কলুষিত ইন্দ্ৰজালেৰ খেলা,  
এখানকাৰ রঙ-যৌবনেৰ অস্তৱালে লুকায়িত রয়েছে

শয়তানের কৃহক ।

রুস্তম একটি পানপাত্র হাতে নিয়ে

বিশ্ব-প্রভুর নাম স্মরণ করলেন ।

সঙ্গে সঙ্গে করশাময় প্রভুর দিক থেকে আকাশবাণী হলো

ও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে গেলো কুহকিনী নারীর মুখভাব ।

কারণ, তার অন্তরে পবিত্র-প্রভুর জন্য কোন স্থান ছিল না,

এবং তার কঠে ছিল না তাঁর গুণগ্রাম ।

তাই বিশ্ব-প্রভুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে বিবর্ণ হয়ে গেলো

রুস্তম তার দিকে চেয়ে লক্ষ্য করলেন সেই রূপান্তর ।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশ টেনে নিয়ে তা নিক্ষেপ করলেন

ও তাতে ফাঁসিয়ে নিলেন কুহকিনীর মন্ত্রক ।

তারপর জিঞ্জাসা করলেন, বল তুই কে,

তোর যা আসল রূপ এবার তা প্রকটিত কর ।

সহসা দেখা গেলো, পাশে আবক্ষ রয়েছে এক কুৎসিত বৃক্ষা,

তার সর্বদেহের চর্ম লোল ও অসংখ্য কুঞ্চনে কুঞ্চিত ।

রুস্তম তখনই তরবারি টেনে নিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন ;

এই দৃশ্য দেখে লুকায়িত জাদুকরণ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো ।

### পঞ্চম সংক্ষিপ্ত ৪ : রুস্তমের হাতে আওলাদের বন্দী হওয়া

সেখান থেকে রুস্তম আবার

সংগোরবে স্বীয় পথ ধরলেন ।

যেতে যেতে এমন এক স্থানে এসে তিনি উপস্থিত হলেন

যেখানে চারদিকে কেবলই অঙ্ককার ।

আবিসীনীয় দাসের মতো রাত্রির অঙ্ককারের মধ্যে

চাঁদ তারা কিছুই আকাশে দীপ্তি পাচ্ছে না ।

স্বয়ং সূর্য যেন সেখানে বন্দী হয়ে আছে,

নক্ষত্রবাজি আবক্ষ রয়েছে নিদারশ্ন পাশ রঞ্জুতে ।

রুস্তম শুখ করে দিলেন রাখ্শের লাগাম,

অঙ্ককারের মধ্যে সে যদৃছ চলতে লাগলো ।

অবশেষে তিনি এক আলোকিত প্রান্তরে এসে পৌছলেন,

যেখানে সারা মাঠ তরু যবের ফসলে ভরে আছে ।

দুনিয়া সহসা যেন বার্ধক্য থেকে লাভ করেছে নবযৌবন,

সর্বত্র সবুজ ও চলমান ম্রোতশ্বিনীর সমারোহ ছড়িয়ে রয়েছে।

তনুআণ ও সকল অঙ্গাবরণ

যা এতক্ষণ দেহরক্ষায় বীরবরের অঙ্গে শোভা পাচ্ছিল

সব তিনি খুলে ফেললেন,

উন্মোচিত করলেন তাঁর সিংহ-মুখাঙ্গিত শিরস্ত্রাণ।

এইসব তিনি সৃষ্টালোকে মেলে দিয়ে

বিশ্রান্তি ও নিদার আয়োজনে মনোনিবেশ করলেন।

এবং অশুবক্ষা খুলে নিয়ে রাখ্যাকে ছেড়ে দিলেন মাঠে,

যাতে সে ঘবের ক্ষেতে চরে বেড়াতে পারে।

জামা ও শিরস্ত্রাণ শুকিয়ে গেলে বীরবর আবার তা গায়ে চড়িয়ে

শুকনো ঘাসের এক শয্যা রচনা করলেন।

তারপর মাথার নীচে ঢালচর্ম রক্ষা করে

ও তরবারির হাতলের উপর হাত রেখে তিনি নিদ্রামগু হলেন।

এদিকে সবুজ শস্যক্ষেত্রে এক কোণে প্রান্তর-পালকে

‘দেখতে পেয়ে

রাখ্য চিংকার শুরু করে দিলো ;

তাঁর পায়ে এক কাঞ্চিতও দুর্যা আঘাত করলো

কুস্ত জেগে উঠতেই প্রান্তর-পাল বললো, রে দুরাচার,

বল কেন এই অশু এই ক্ষেতে বিচরণ করছে ?

কোন্ সাহসে তুই নিদরশ্ন শাস্তির দিকে এমন করে এগিয়ে

এসেছিস ?

প্রান্তর-পালের মুখে এই কথা শুনেই কুস্ত লাফিয়ে উঠে

তার দুই কান ধরে আকর্ষণ করলেন

এবং কোন কথা না শুনে টানতে টানতে

কান দুটো ছিড়েই ফেললেন।

প্রান্তর-পাল তখন স্বীয় কানে হাত রেখে

চিংকার করতে করতে কিরে গেলো।

কুস্ত নিরুদ্বেগে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন

আওলাদের রাজ্যে পরম সাহসী এই তরুণের আবির্ভাব

সত্যেই বিশ্বয়কর !

এদিকে প্রান্তর-পাল রক্তাক্ত হাতে

কানকাটা অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে আওলাদের কাছে এসে

উপস্থিত হলো।

সে বললো, কোথা থেকে জানি এক দৈত্য-বপু পুরুষ  
বাধালোর বর্ম ও ইংগ্রিজের টুপী পরে এখানে এসেছে,  
আপাদ-মন্তক সে নরকাপী শয়তান বিশেষ,  
সে যেন সীয় তনুগাণে সুপু এক দুরস্ত আজদাহা।  
আমি তার ঘোড়াকে যবের ক্ষেতে চরতে দেখে  
সে সম্পর্কে লোকটাকে অভিযুক্ত করতে গিয়েছিলাম।  
সে তখন কোন কথা না বলে লাফিয়ে উঠে  
আমার কান দুটো ছিড়ে দিয়েই আবার নিরন্দৃগে শয়ে পড়েছে।  
আওলাদ প্রান্তর-পালের বর্ণনা শুনেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো,  
ও কাল বিলস্ব না করে মনোবিক্ষেপে ধূম্রবাশির মতো  
স্বহান থেকে নির্গত হলো।

এবং অশ্রুধারী সৈন্যদের নিয়ে

প্রান্তরের দিকে মুখ করলো।

কিছুদূর এগিয়েই প্রান্তর-পালের বর্ণনা অনুযায়ী

ময়দানের এক কোণে সে দেখতে পেলো এক সিংহ-পুরুষকে।

সঙ্গী বীরগণসহ আওলাদ তখন অশুবল্কা বাগিয়ে ধরে

রুস্তমের দিকে মুখ করলো।

কিছুটা কাছে এগিয়ে আসতেই

রুস্তমও মুখ করলেন রাখশের দিকে।

এবং তরবারি উন্মুক্ত করে ঢড়ে বসলেন রাখশের পিঠে

ও যথারীতি অশুবল্কা বাগিয়ে ধরে মেঘগর্জনে

তাদের দিকে ধাবিত হলেন।

এইভাবে দুইপক্ষ পরম্পরের নিকটবর্তী হতেই

দুদিক থেকে যুগপৎ আক্রমণ শুরু হয়ে গেলো।

আওলাদ রুস্তমকে সম্বোধন করে বললো, বল তোমার নাম কি ?

তুমি কোন দেশের রাজা কিংবা তোমার রক্ষক কে ?

এ-পথে আসা তোমার মোটেই সমীচীন হয়নি,

কারণ, এ পথে বীরাগ্রগণ্য দৈত্যগণের অবস্থান।

তাছাড়া, এই প্রান্তর-পালের কর্ণদুয় কেন তুমি কর্তিত করেছ ?

কোন সাহসে তোমার অশুকে তুমি

ছেড়ে দিয়েছিলে এই শস্যক্ষেত্রে ?

একটু অপেক্ষা করো, শাস্তিরাপে এখনি আমি দুনিয়াকে তোমার

চোখে আঁধার করে দিচ্ছি,

এখুনি ধূলায় লুটাচ্ছি দেখো তোমার শিরস্ত্রাণ।  
রুষ্টম জবাবে বললেন, আমি তোমাদের জন্য এমন এক  
বিপদের ঘনঘটা

যাতে সুপু রয়েছে বক্ষ-বিদারক সিঙ্গু।  
সেই মেঘ থেকে বর্ষিত হবে তরবারি ও বর্ণা।  
তার বর্ষণে অচিরেই তোমাদের শির হবে নিমজ্জিত।  
আমার নাম যদি তোমার কর্ণে পৌছে থাকে তবে তা উচ্চারণ  
করার সঙ্গে সঙ্গে  
তোমার প্রাণ স্তুতি ও তোমার রক্তপ্রবাহ জমাট বেঁধে যাবে।  
মনে হচ্ছে, সেই মহাবীরের পাশ ও ধনুঃশরের কীর্তি  
আজও তুমি শুনতে পাওনি।  
যদি তা তোমার জানা থাকতো তবে তোমার জননী আজ  
তোমার কাফন সেলাইয়েরই ব্যবস্থা করতেন ও উথিত করতেন  
শোক-সন্তপ্ত বিলাপ-ধ্বনি।

তুমি সৈন্যদল নিয়ে সেই বীরের দিকেই প্রধাবিত হয়েছ,  
তুমি আখরোটকে গম্বুজের উপর স্থিত করার বাসনা করেছ।  
এই বলে তিনি নক্রসম মহাবিপদ কোঝোম্বুক্ত করলেন  
ও শক্র-সৈন্যের দিকে ধাবিত হলেন।  
তারপর সিংহ যেমন তার মৃগয়ার উপর আপত্তি হয়  
তেমনি করে তিনি শক্রসৈন্য বিনাশ করতে লাগলেন।  
তাঁর তলোয়ারের এক আঘাতে দুজন মহাবীরের মস্তক  
ধূলায় লুঁচিত হতে লাগলো।  
অবশ্যে গোটা সৈন্যদল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে  
পলায়নপর হলো পর্বতের দিকে।  
পার্শ্ববর্তী জনপদ ও প্রান্তর  
তাদের পদধূলিতে অঙ্ককার হয়ে গেলো।  
এইবার রুষ্টম মদমস্ত হস্তীর মতো  
পাশ উন্মুক্ত করে আওলাদের দিকে ধাবিত হলেন।  
রাখ্যকে এইভাবে অগ্রসর হতে দেখে  
আওলাদের চোখে দুনিয়া অঙ্ককার হয়ে এলো।

- 
- আখরোট শক্ত ও গোল বিধায় গোলাক্তি গম্বুজের উপর তা হির থাকতে পারে  
অসত্ত্বকে প্রকাশ করার ইডিয়ম'।

କୁନ୍ତମ ତା'ର ହଞ୍ଚିତ ଦୀର୍ଘ ପାଶ ଉଡ଼ିଯେ ମାରଲେ  
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫିସେ ଆବନ୍ଧ ହୟେ ପଡ଼ିଲୋ ଦୈତ୍ୟ-ସର୍ଦୀରେର ଶିର ।  
ଆଓଲାଦ ଘୋଡ଼ା ଥିକେ ଅବତରଣ କରେ କରଜୋଡ଼େ  
କୁନ୍ତମେର ସାମନେ ଏସେ ତା'ର ପଦତଳେ ରାଖିଲୋ ତାର ମୁକୁଟ ।  
କୁନ୍ତମ ଆଓଲାଦକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲିଲେନ,  
ତୁମି ଯଦି ବକ୍ରପଥ ଅବଲମ୍ବନ ନା କରୋ  
ଏବଂ ସପେଦ ଦୈତ୍ୟେର ବାସଭୂମି  
ଓ ପୂଲାଦ-ଗନ୍ଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଦୈତ୍ୟଦେର ହଥା ଆମାକେ ଦେଖିଯେ ଦାଓ,  
ଓ ସେଇ ସଙ୍ଗେ ବାଦଶା କାଯକାଉସ କୋଥାଯ ବନ୍ଦୀ ଆଛେନ  
ତାର ଝୌଜ ଦାଓ, ଏବଂ ବକ୍ର ପଥ ପରିତ୍ୟଗ କରେ  
ସରଳ ପଥେ ଆମାକେ ଅନୁସରଣ କରୋ  
ତବେ ଶୁରୁଭାବ ପ୍ରହରଣେର ଆଘାତେ  
ମାଞ୍ଜିନ୍ଦିରାନେର ଅଧିପତିକେ ବଧ କରେ  
ତୋମାକେ ଦାନ କରିବୋ ତା'ର ରାଜ୍ୟ  
ଓ ସେଇ ରାଜ୍ୟେର ଅଧିଶ୍ଵର କରିବୋ ତୋମାକେ ।  
କିନ୍ତୁ ଯଦି ବକ୍ରତା ଓ ଚତୁରତାର ଆଶ୍ୱର ନାଓ  
ତବେ ଜେନେ ରାଖ, ତୋମାର ଚକ୍ର ଥିକେ ପ୍ରବାହିତ କରିବୋ ରକ୍ତେର ଧାରା ।  
ଆଓଲାଦ ବଲିଲୋ, ହେ ମହାମତି, ଆପନାର ମଣ୍ଡିଷ୍କ ଥିକେ  
କ୍ରୋଧ ବିଦୂରିତ କରିଲ ।  
ଆମାର ଦେହକେ ପ୍ରାଣଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରେ ପରିଣିତ କରିବେନ ନା,  
ଆପନି ଯେ ସକଳ ସ୍ଥାନେର ନିଶାନା ଜାନତେ ଚେଯେଛେ ସବ  
ଜାନତେ ପାବେନ ।

କାଯକାଉସ ସେଖାନେ ବନ୍ଦୀ ଆଛେନ ଆପନାକେ ସେଖାନେ ନିଯେ ଯାବୋ,  
ସକଳ ନଗରୀର ପଥ ଆପନାକେ ବାଂଲେ ଦିବ ।  
ଆପନାକେ ବେଦ ନାମକ ଦୈତ୍ୟ ଓ ସପେଦ ଦୈତ୍ୟେର ପ୍ରାସାଦ  
ଏବଂ ଆପନି ଯା ଦେଖିତେ ଚାନ ସବ ଦେଖାବ ।  
ହେ ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ଦୈତ୍ୟ-ହଦୟ-ମହାବୀର,  
ଜ୍ଞଗ-ପିତା ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ମହାର୍ଦ୍ଦଶ ଗୁଣେରେ ଅବତାରଣା କରେଛେ !  
କାଯକାଉସ ସେଖାନେ ବନ୍ଦୀ ସେନାନ ଏଥାନ ଥିକେ  
ଶତ ଫର୍ମସଂଗ ଦୂରେ ।  
ସେଖାନ ଥିକେ ଦୈତ୍ୟଦେର ଆସ୍ତାନା ରଯେଛେ  
ନିଦାରଣ ଏକ କଠିନ ପଥେର ପ୍ରାଣେ ଆରୋ ଏକଶୋ ଫରସଂଗ ବ୍ୟବଧାନେ ।  
ଦୁଇ ପର୍ବତେର ମାଝ ଦିଯେ ଗିଯେଛେ ଭୟାବହ ପଥ,

সে পথের উপর দিয়ে আকাশে হুমা পক্ষীও উড়তে অক্ষম।  
সে পথে রয়েছে দুইশো গভীর কৃষ,  
তাদের গভীরতা কত কেউ তা কোনদিন পরিমাপ করতে পারেনি।  
বারো হাজার জঙ্গী দৈত্য  
রাত্রিবেলায় সেই পর্বত পাহারা দেয়।  
পূলাদ—গন্দী, বেদ ও সঞ্চার মতো দৈত্য ধীরগণ  
সেখানকার সেনাপতি ও নগর—পাল।  
দৈত্যরাজ সপ্তদ এই পাহাড় থেকেই  
তাকে বেতসের মতো কম্পিত করে আবির্ভূত হন।  
পর্বতশীর্ষের মতো উচু তাঁর শির,  
বাহ্যুগ তাঁর শিলাদৃঢ় ও দশ রশি পরিমাণ দীর্ঘ।  
কিন্তু আপনার শৌর্য ও অশু চালনা,  
আপনার তরবারি, বর্ণা ও প্রহরণ  
এবং আপনার যুদ্ধ—কৌশল অতি অস্তুত,  
দৈত্যগণ স্বপ্নেও এমন প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি।  
সেখান থেকে বেরুলেই আপনি কঙ্করময় এক বিরাট প্রান্তর পাবেন  
মৃগদলও সে প্রান্তরের উপর দিয়ে বিচরণ করতে অক্ষম।  
তারপরেই এক নদী আপনার সামনে পড়বে,  
সেই নদীর প্রশস্ততা দুই ফরসঙ্গেরও উপরে।  
কানারঙ্গ দৈত্য সেই অঞ্চলের অধিপতি,  
বহু জঙ্গী দৈত্য তার আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত রয়েছে।  
সেখান থেকে বুজগোশ পর্যন্ত একপথ  
ঠিকে থেকে তিনশো ফরসংগ চলে গেছে।  
তারপর বুজগোশ থেকে মাজিন্দিরানের মহানগরী পর্যন্ত  
আরো বহু ফরসংগ পথ যেতে হবে।  
সেই পথের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে শাহী সৈন্য —  
তাদের সংখ্যা নূনগক্ষেও এক লক্ষ।  
তারা সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত,  
তাদের মধ্যে একজনকেও আপনি দৃঢ়বিত  
কিংবা বিষণ্ণ দেখতে পাবেন না।  
আমার বিশ্বাস, আপনি একাই আপনার লৌহ—ক্ষণাগ  
এইসব দৈত্য সৈন্যের উপর শান দিতে পারবেন।  
কুস্তম আওলাদের কথা শুনে মৃদু হাস্য করে বললেন,

আমার সঙ্গে যদি তুমি পথ চল,  
 তবে দেখতে পাবে কি করে রুস্তম একাই  
 এত সব সৈন্যের মোকাবেলা করেন।  
 চিরজয়ী বিশ্ব-প্রভূর শক্তিতে  
 এবং এই তরবারি, ধনু, শর ও যুদ্ধ-কৌশলের সহযোগিতায়  
 তুমি আমার শৈর্যবীর্য প্রত্যক্ষ করতে পারবে,  
 দেখতে পাবে, সংগ্রামে আমার প্রহরণের মোক্ষম আঘাতের বিস্ময়।  
 দেখতে পাবে, কি করে তারা ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পলায়ন করছে,  
 দেখতে পাবে, অশু-বক্ষা সংয়ত করার অবকাশ তারা পাচ্ছে না।  
 এখন তুমি আমাকে বাদশা কাউস যেখানে আছেন  
 সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।  
 এই বলে রুস্তম আনন্দিত মনে রাখশের পিঠে চড়ে বসলেন,  
 আওলাদও তাঁর সঙ্গে বাযুগতি অশু প্রধাবিত করলো।  
 দিনরাত অবিশ্রান্ত চলে রুস্তম  
 ইস্পারোজ পর্বতের সমীপে এসে পৌছলেন।  
 এখানেই বাদশা কাউস রচনা করেছিলেন তাঁর বৃহ,  
 এখানেই দৈত্যদের আক্রমণ ও জাদুমন্ত্রের অমঙ্গল তাঁর উপর  
 আপত্তি হয়েছিল।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর গত হলে দূরবর্তী প্রাস্তর থেকে  
 আনন্দ-কোলাহল ও নারী কঢ়ের গীতধ্বনি ভোসে এলো।  
 শহরের দিকে দেখা গেলো মশাল ও প্রদীপ সকল জ্বলে উঠছে।  
 রুস্তম আওলাদকে প্রশু করলেন, দক্ষিণে বামে  
 যে-আনন্দ কোলাহল শুন্ত হচ্ছে ও মশাল দেখা যাচ্ছে সে কি ?  
 আওলাদ জবাবে জানালো, মাজিন্দিরানের এই শহরে  
 কেউ মধ্যরাত্রির আগে নিদ্রা যায় না।  
 ওখানে রয়েছে পুলান্দ আর্বক্ষ ও বেদের মতো  
 সপেদ দৈত্যের বিশিষ্ট সেনাপতিগণ।  
 ওখানেই মেঘমালাকে স্পর্শ করে তারকা-খচিত  
 চন্দ্রাত্প টানানো রয়েছে,  
 যেখানে সারাক্ষণ দৈত্যবীর আর্বক্ষ গর্জন করছে।  
 রুস্তম স্থীয় অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে  
 সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত নিদ্রামগু রাইলেন।

প্রভাতে যখন সূর্য অঙ্ককার পর্বতান্তরাল থেকে  
মন্তক উন্নীত করলো  
ও ধরিত্রীকে উজ্জীবিত করলো গৌরবে,  
তখন রাজমুকুটদানকারী মহাবীর নিদ্রা থেকে উঠে  
রাখশের দিকে এগিয়ে গেলেন।  
তারপর আওলাদকে এক বৃক্ষের সঙ্গে  
পাশ দুরা শক্ত করে বেঁধে  
পিতামহের প্রহরণ হাতে নিয়ে লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন।

### ষষ্ঠ সংকটঃ আরঝঙ্গ দৈত্যের সঙ্গে রুস্তমের যুদ্ধ

রুস্তম তাঁর অভ্যাস মতো  
ব্যাঘ্রমুখচিহ্নিত শিরস্ত্রাণ মাথায় পরে  
আরঝঙ্গ দৈত্য ও তার সৈন্যদের  
সম্মুখীন হলেন।  
এবং এমন ভীমগর্জনে তাদের যুদ্ধার্থ আহ্বান করলেন যে,  
মনে হলো, সেই আওয়াজে জল স্থল পর্বত দীর্ঘ হয়ে গেছে।  
রুস্তমের গর্জন শুনে আরঝঙ্গ  
উল্লম্ফনে স্থীয় শিবির থেকে নির্গত হলো।  
রুস্তম তাকে দেখতে পেয়েই রাখশকে উস্তেজিত করে  
বিদ্যুৎগতিতে এসে তার মুখোমুখী দাঁড়ালেন।  
এবং আশৰ্য শক্তিতে আরঝঙ্গ দৈত্যের কেশ ও কর্ণ ধরে  
আকর্ষণ করে  
অবলীলায় কর্তিত করলেন তার মন্তক।  
দৈত্যের শোণিতাঙ্গ দেহ ছিন্নশির হয়ে  
তার সৈন্যদের সামনে ধূলায় লুটিয়ে পড়লো।  
দৈত্য-সৈন্য স্থীয় সেনাপতির পরিগাম ও রুস্তমের প্রহরণ দেখে  
তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য  
পর্বত প্রাস্তর নদী সব উপেক্ষা করে  
পিতাপুত্র নির্বিশেষে উর্ধবশৃঙ্গসে পলায়নপর হলো।  
এইবার রুস্তম টেনে নিলেন তাঁর তরবারি  
ও দৈত্য-সৈন্যের অবশেষটুকুও যুক্তহান থেকে মুছে দিলেন।  
তারপর সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যাওয়ার আগেই  
তিনি ইসপারোজ পাহাড়ে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।

সেখানে এসে আওলাদের বক্ষন মোচন করে  
এক বৃক্ষ-তলে তিনি উপবেশন করলেন।  
বাদশা কায়কাউস শহরের কোন্ স্থানে অবস্থান করছেন  
কুস্তম তা আওলাদের কাছে জানতে চাইলে  
আওলাদ অবিলম্বে গাত্রোখান করে  
পদব্রজে তাঁকে পথ দেখিয়ে চললো।  
শহরের অভ্যন্তরে পদার্পণ করেই  
রাখ্শ বজ্জের মতো হৃষাধ্বনি করলো।  
কায়কাউস এই আওয়াজ শুনেই  
আদ্যোপাস্ত সব বুঝতে পারলেন,  
এবৎ ইরানীয়দের ডেকে বললেন,  
আমাদের দুঃখের দিন শেষ হয়ে এসেছে।  
রাখ্শের হৃষাধ্বনি আমার কর্ণগোচর হচ্ছে  
এবৎ সেই আওয়াজে নবজীবন লাভ করছে আমার প্রাণ।  
এইবার কোবাদের সমীপে এসে  
রাখ্শ তেমনি করে হৃষাধ্বনি করলো যেমনভাবে

তুরানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে সে করেছিল।

সৈন্যরা বলতে লাগলো, বাদশা কায়কাউসের প্রাণ  
বন্দীহৈর অসহ্য ব্যথায় আজ মুহ্যমান।  
তাঁর মস্তিষ্ক থেকে বুঝি, চেতনা ও গৌরববোধ  
এমনভাবে লোপ পেয়েছে  
যেন এসব শুধু স্পন্দে একদিন তাঁর প্রাপ্য হয়েছিল।  
নিরাকুণ বন্দীত্বে আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম,  
এইবার নিশ্চয়ই ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।  
সৈন্যগণ বলতে লাগলো, আহা,  
কোথায় সেই শুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর !  
এমন সময় অগ্নিদীপ্ত অমিততেজা  
মহাবীর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।  
তিনি বাদশা কাউসের সমীপে গমন করার সঙ্গে সঙ্গে  
সমস্ত ইরানীয় সৈন্য এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো।  
গোদরজ, তুঁ ও নির্ভীক গোও  
গুন্তাহাম, শেদওয়াশ ও সিংহ-হৃদয় বাহরাম  
চিংকার করে আনন্দ প্রকাশ করলেন

এবং মৃত্তিকা চুম্বন করে পথের ক্লেশের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।  
বাদশা কাউস রুস্তমকে বুকে জড়িয়ে ধরে  
জিজ্ঞাসা করলেন জালের কুশল ও পথের ক্লেশের কথা।  
তারপর বললেন, যখন সপ্তদ দৈত্যের কাছে গিয়ে সংস্কৃত  
পৌছবে যে,

আরুঝ হত হয়েছে  
এবং রুস্তম গিয়ে মিলিত হয়েছেন কাউসের সঙ্গে,  
তখন সকল দৈত্যবীর এসে সেখানে জমায়েত হবে।  
আপনার সকল ক্লেশ বৃথা হয়ে যাবে,  
দুনিয়া ছেয়ে যাবে দৈত্য-সৈন্যে।  
কাজেই এখন আপনি কালবিলস্ব না করে  
সেই দৈত্যের গৃহাভিমুখে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যাত্রা করুন।  
বিশ্ব-প্রভু সহায় হলে  
দৈত্যদের ইন্দ্রজালকে আপনি পরাভূত করবেন।  
আপনি সপ্তগিরি উজিয়ে যাত্রা করুন,  
সর্বত্র দলে দলে দৈত্যগণ প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে।  
শুনেছি, সেই পথে ত্রাস ও সঙ্কটে পরিপূর্ণ  
এক গভীর গহ্বর পড়ে।  
সেই গহ্বরের চারপাশে যুদ্ধকারী দৈত্যবীরগণ  
হিস্ম ব্যাস্ত্রের মতো থানা দিয়ে বসে আছে।  
এই গহ্বরেই বাস করে সপ্তদ দৈত্য,  
তার থেকেই দৈত্য-সেনাদের মনে  
যুগ্মৎ ডয় ও আশার আনাগোনা হয়।  
তাকে আপনিই একমাত্র বধ করতে পারবেন —  
সে-ই দৈত্যদের মধ্যে প্রধান।  
আমাদের সৈন্যগণের চোখ দুঃখে অক্ষ হয়ে গেছে,  
অঙ্ককারে আমারও দৃষ্টি হয়ে গেছে ঝাপসা।  
চিকিৎসকগণ বলেছেন যে,  
সপ্তদ দৈত্যের মগজ ও রক্তে আমরা নিরাময় হবো।  
জনৈক জ্ঞানী চিকিৎসক মন্তব্য করেছেন  
এই রক্ত যদি অশুর মতো  
তিন ফোঁটা করে আমাদের চোখে পড়ে  
তবে আমাদের অঙ্গস্তু বিদূরিত হয়ে চোখে আলো ফুটবে।

আমি আশা করি, বিশ্ব-প্রভুর সহায়তায়  
 আপনি সেই দৈত্যকে নিধন করে বিজয়-গৌরবে ফিরে আসবেন।  
 রুষ্টম এই কথা শুনে সেখান থেকেই  
 তাঁর অভিযানের সূচনা করলেন।  
 ইরানীয়গণকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন,  
 আমি সপ্তদ দৈত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।  
 সে বিরাট যোদ্ধা এবং অত্যন্ত কুশলী,  
 অগণিত সৈন্য তার চারপাশে বিচরণ করছে।  
 যদি তার সঙ্গে যুদ্ধে আমার মেরুদণ্ড বড় হয়  
 তবে দীর্ঘদিন আপনাদেরকে এই কষ্ট ও অপমান ভোগ করতে হবে।  
 আর যদি সূর্যের স্ফটা মহাপ্রভু  
 আমাকে সৌভাগ্য দান করেন,  
 তবে গোটা হাত রাজ্য ও সিংহাসন আমি উদ্ধার করবো,  
 রাজ্য-তরু আবার ফুলফলে হেসে উঠবে।  
 রুষ্টমের কথা শুনে সামন্ত ও প্রধানগণ জয়বন্ধনি করে উঠলেন,  
 তাঁরা বললেন, অশু, প্রহরণ ও সজ্জা থেকে আপনি কখনো  
 বঞ্চিত হবেন না।

### সপ্তম সংক্ষিপ্ত : রুষ্টমের সপ্তদ দৈত্য বধ

সেখান থেকে রুষ্টম জিঘাংসায় মন্তিষ্ঠ পূর্ণ হয়ে  
 যুদ্ধার্থ নির্গত হলেন।  
 এবং আওলাদকে সঙ্গে নিয়ে  
 রাখ্শকে বাযুগতি চালিত করলেন।  
 আওলাদ পথ দেখিয়ে চললো,  
 শ্বাস্তি ক্লান্তি তুচ্ছ করে রুষ্টম এগিয়ে চললেন লক্ষ্যের দিকে।  
 সপ্তগিরির নিকটে এসে রাখ্শ থামলো,  
 দলে দলে দৈত্য-বীরগণ সেখানে বিচরণ করছে।  
 নিকটেই অতল সেই গহুর,  
 তার অভ্যন্তরে রুষ্টম দেখতে পেলেন দৈত্যসৈন্য।  
 তিনি আওলাদকে এই স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করে  
 বললেন, বলো এখন কোন দিকে যেতে হবে?  
 এই স্থান অত্যন্ত সঞ্চারপূর্ণ

তুমি এর সঠিক পরিচয় উদ্ঘাটিত করো।  
লক্ষ্যের যখন কাছাকাছি এসে পৌছেছি  
তখন তোমার পথ-নির্দেশ যেন যথাযথ হয়।  
আওলাদ বললো, সূর্য যখন তাপিত হয়ে উঠবে,  
তখন দৈত্যগণ নিন্দা যাবে।

কাজেই সহজেই আপনি তাদের উপর জয়লাভ করতে পারবেন,  
এইক্ষণ একটু অপেক্ষা করুন।  
একটু পরেই জাদু-বিদ্যাবিশারদ কতিপয় দৈত্যকে পাহারায় রেখে  
সবাই ঘুমিয়ে পড়বে।

তারপর জয়দাতা আপনার সহায় হলে  
আপনি সহজেই বিজয়ী হতে পারবেন।  
আওলাদের কথা শুনে রুস্তম সেখানে  
সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন।

তারপর আওলাদকে ভালো করে হাতে পায়ে বেধে  
তিনি অশ্বের উপর চড়ে বসলেন।  
এবং তাঁর মৃত্যু-সম তরবারি কোষোম্বুজ করে  
বজ্রসদৃশ গর্জন উদ্ধিত করলেন।

ও সঙ্গে সঙ্গে অশু প্রধাবিত করে শক্রর উপর ঝাপিয়ে পড়ে  
তাদের শির কর্তিত করতে লাগলেন।

দৈত্যগণ মহাবীরের আক্রমণের তেজ সহ্য করতে না পেরে  
প্রাণভয়ে পালাতে লাগলো।

তাদের মধ্যে একজনও রুস্তমের সঙ্গে যুক্তে  
সামান্যক্ষণও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না।

এইবার রুস্তম উদ্বিদিত সূর্যের মতো  
সংগীরবে সপেদ দৈত্যের অভিমুখে ধাবিত হলেন।

সামনে দেখতে পেলেন নরকসদৃশ এক গহ্বর  
তার নিম্নভাগ ইন্দ্রজাল প্রভাবে গভীর অঙ্ককারে আবৃত।

রুস্তম সামনে এগোবার কোন পথ না পেয়ে  
অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

দুই হাতে চোখ মুছে দৃষ্টি স্বচ্ছ করে নিয়ে  
অঙ্ককারের মধ্যে তিনি চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে গহ্বরের অভ্যন্তরে এক গিরিশৃঙ্গ তার নজরে পড়লো,  
তার আড়ালে অন্য সব কিছু ঢাকা পড়ে গেছে।

সেখানে ব্যাঘলোমের মতো কালো ও হলুদ বর্ণযুক্ত  
বিরাটিকার দৈত্য তার দুনিয়াজোড়া দৈর্ঘ্য ও শুলভ নিয়ে  
গভীর ঘূমে আচ্ছন্ন রয়েছে;  
কিন্তু রুক্ষম এ অবস্থায় তাকে বধ করা সমীচীন মনে করলেন না।  
তিনি গহৰারে ঘূমে দাঁড়িয়েই তাঁর ব্যাঘলোকার উপরি করলেন,  
সেই আওয়াজে দৈত্যের নিদ্রাভঙ্গ হলো।

সে তখনই তার লোহবাহু প্রসারিত করে  
কৃষ্ণবর্ণ পর্বতের মতো রুক্ষমের দিকে ধাবিত হলো।  
হাতে কঠিন পাথরের এক বিরাট পেষণ চক্র নিয়ে  
সে ধূমাকারে উপরি হলো পর্বত কন্দর থেকে।  
তাকে ইত্তাবে নিকটবর্তী হতে দেখে  
রুক্ষমের অন্তরে কিঞ্চিৎ ভয়ের সংশ্লাপ হলো।  
কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ক্রোধোন্মত ব্যাঘের মতো  
উত্তেজিতচিত্তে কঠিদেশ থেকে আকর্ষণ করে নিলেন তরবারি।  
এবং আশ্চর্য বীরত্বে বিশালাকার দৈত্যের  
এক হাত ও এক পা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।  
ছিন্নহস্ত দৈত্য তখন সিংহের গতিতে ও হস্তীর শক্তিতে  
মহাবীরের উপরে এসে পতিত হলো।  
শুরু হয়ে গেলো এক অভূতপূর্ব মল্লমুদ্রা —  
তাঁদের হস্ত ও পদতাড়নে সারা কন্দর আলোড়িত হতে লাগলো।  
দৈত্য সর্বশক্তিতে রুক্ষমের গ্রীবাদেশ ও কেশ ধরে আকর্ষণ করে  
তাঁকে তার নীচে ফেলে দিলো।  
রুক্ষমও তার গ্রীবাদেশে তাঁর বজ্রমুষ্ঠি প্রোথিত করলেন।  
সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যের মাংসপেশী ছিন্ন হয়ে  
দরবিগলিত ধারে শোণিতধারা মাটিতে ঝরে পড়তে লাগলো।  
রুক্ষম মনে মনে বললেন, আজ যদি বৈঁচে যাই  
তবে আমি দুনিয়ায় চিরঞ্জীব হবো।  
ওদিকে সপেদ দৈত্য ভাবলো, হায় !  
প্রিয় জীবনের আশা বুঝি ত্যাগ করতে হলো চিরদিনের জন্য।  
যদি হস্তপদ কর্তিত অবস্থাও  
আমি এই নকৃসম শক্তির হাত থেকে রেহাই পেতাম,  
তবে বড় ছোট কেউ কোনদিন আমাকে  
এই মাঞ্জিলিবানে দেখতে পেতো না।

এইভাবে সপেদ দৈত্য নিজের মনকে আশ্বাস দিতে লাগলো ।  
এদিকে রুস্তম বিশ্ব-প্রভুর নাম স্মরণ করে,  
যুদ্ধ করে চললেন ।  
অবশ্যে এই দীর্ঘ মল্লযুক্তকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য  
তিনি সর্বশক্তিতে পাঞ্চা প্রসারিত করে  
দৈত্য-সিংহকে ঘাড়ের উপর তুলে নিয়ে মাটিতে ছুড়ে মারলেন ।  
এমন জোরে তিনি তাকে মাটিতে নিশ্চেপ করলেন যে,  
তাতেই তার প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হলো ।  
রুস্তম তখন কালবিলস্ব না করে কটিদেশ থেকে খণ্ডের টেনে নিয়ে  
দৈত্যের বক্ষ বিদীর্ঘ করে তার কলিজ্ঞা আকর্ষণ করে নিলেন ।  
দৈত্যের হত দেহে শোটা কন্দর যেন পূর্ণ হয়ে গেলো,  
দুনিয়া যেন ভেসে গেলো তার শোণিত স্নোতে ।  
দৈত্যগণ রুস্তমের বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে  
সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয়ে পলায়ন করলো ।  
একজনও আর সেখানে অবশিষ্ট রইলো না,  
এদিকে রুস্তম কোমর থেকে কটিবক্ষ  
ও অঙ্গ থেকে তনুগাণ উৎসোচিত করে  
প্রার্থনার জন্য হস্ত মুখ প্রক্ষালনাস্তর  
একটি শুচিশুক্ষ স্থান বেছে নিলেন ।  
এবং মৃত্যিকায় ললাট স্থাপন করে  
বিশ্ব-প্রভুকে ডেকে বললেন, হে করুণাময়,  
সমস্ত অকল্যাণ থেকে তুমি তোমার দাসগণকে রক্ষা করো,  
আমার শৌর্যের উৎস তুমিই, তুমিই আমার সহায় ;  
ক্ষমতা, পৌরুষ, শক্তি ও শৌর্য —  
চন্দ্ৰ-সূর্যের আবৰ্তন তলে আমার যা কিছু কীর্তি —  
সব তোমারই দান ।  
রোগ, শোক, দুঃখ ও বিপদ  
কল্যাণ অকল্যাণ যা কিছু মানুষের উপর আপত্তিত হয়, —  
অভাব, প্রাচুর্য ও সৌভাগ্য,  
উন্নতি, অবনতি ও শৌর্য —  
সব কিছুতেই আমি তোমার করুণা প্রত্যক্ষ করি,  
এর কোন কিছুতেই মানুষের হাত নেই ।  
তোমার দানেই ধূলিকণা সূর্যে কঁপাস্তরিত হয়,

তোমারই গ্রিশুর্যে তাম্রমুদ্রা লাভ করে নক্ষত্রের বৈভব।  
এইভাবে বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে  
বীরবর আবার সর্ববিধি অস্ত্র-সাজে নিজেকে সজ্জিত করলেন।  
তারপর আওলাদের কাছে এসে তার বন্ধন উন্মোচিত করে  
কেয়ানী পাশ রঞ্জু গুটিয়ে নিলেন।  
আওলাদ বীরবরকে সম্মোধন করে বললো, হে নর-সিংহ  
বিশুকে আপনি আপনার তরবারির অধীনস্থ করেছেন।  
মাজিন্দিরানে এখন এমন কেউ নেই  
যে আপনার সঙ্গে প্রতিদুন্তিতায় অবতীর্ণ হতে পারে।  
প্রার্থনা করি, প্রতি কর্মেই আপনি জয়যুক্ত হোন,  
আপনার ব্যক্তিত্ব অবশ্যই তাজ ও তখ্তের উপযোগী।  
বড়ই বাধিত হবো যদি আপনি আমার দিকে লক্ষ্য করেন  
ও কর্ণপাত করেন আমার কয়েকটি কথার দিকে।  
হে বীরপ্রবর, অবলোকন করুন, আমার সারা গায়ে আপনার  
বন্ধনের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে,  
আপনার বজ্জবকঠিন পাশের তলে আমার দেহ ভগ্নপ্রায়।  
আপনি আমার হৃদয়কে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দানে নন্দিত করুন,  
যার প্রভাবে ভবিষ্যতের দিকে আমি আশান্তি

দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে পারি।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা আমার স্বভাব নয়,  
সিংহের শৌর্য ও রাজার অস্তঃকরণই অবস্থান করছে  
আমার বক্ষপঞ্চরের তলে।  
আওলাদের কথার প্রত্যুত্তরে ঝুস্তম বললেন,  
মাজিন্দিরানের একপ্রাঙ্গ থেকে অন্যপ্রাঙ্গ পর্যন্ত সম্মুদ্ধ রাজ্য  
আমি তোমাকে দান করলাম।

কিন্তু সানু-শীর্ষে প্রলম্বিত এক দীর্ঘ কাজ  
এখনও আমাদের সামনে রয়েছে।  
মাজিন্দিরানের অধিপতিকে তার সিংহাসন থেকে টেনে এনে  
কূপে নিক্ষেপ করার কাজটি এখনো বাকী।  
হাজার হাজার ইন্দ্রজালজ্ঞ দৈত্যকে  
এখনও আমার তরবারি-তলে হত দেখতে হবে।  
তবেই তোমাকে দান করতে পারবো এই রাজ্য  
অন্যথায় আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা পাবে কি করে?

এর পরেই আমি তোমাকে অভাবমুক্ত করতে পারবো  
তোমাকে দান করতে পারবো মাজিন্দিরানের আধিপত্য।  
এই বলে রুস্তম ইরানের বীরগণ  
ও সন্ত্রাটের দিকে মুখ করলেন।  
তাঁরা পথের দিকে চেয়ে আছেন  
কখন বীরবর দৈত্য-সিংহকে হত পরাভূত করে ফিরে আসবেন।  
যথাসময়ে কায়কাউস খবর পেলেন যে,  
সৌভাগ্যশালী রুস্তম বিজয়ীর বেশে প্রত্যাগত হয়েছেন।  
সংবাদ শুনে বীরগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করলেন,  
তাঁরা বলতে লাগলেন, উচ্ছ্বল-হৃদয় সেনাপতি প্রত্যাগত হয়েছেন।  
রুস্তমের প্রশংসা কীর্তন করতে করতে তাঁরা দৌড়ে এলেন,  
এবং প্রচলিত রীতির অধিক তাঁরা উচ্চারণ করলেন তাঁর শুণ।  
রুস্তম বললেন, হে জ্ঞান-সমৃদ্ধ সন্ত্রাট,  
শক্রুর মৃত্যু সংবাদে হৃদয় আশৃষ্ট করুন।  
সন্ত্রাটের আদেশানুযায়ী আমি সেই শক্রুর বক্ষপঞ্চর থেকে  
আকর্ষণ করে এনেছি তার কলিজা।  
এই কথা শোনার সঙ্গে বাদসশ কাউস  
রুস্তমের জয়োচ্চারণ করে বললেন,  
হে বীর, সৈন্য ও রাজমুকুট আপনাকে কোনদিন  
পরিত্যাগ না করুক।  
যে জননী আপনার মতো পুত্র জন্ম দিয়েছেন  
তিনি ধন্যা, প্রশংসার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করতে হয়।  
অসংখ্য প্রশংসা মহামতি জালের,  
এবং সম্মানিত ভূমি জাবুলস্তানের —  
যেখান থেকে আপনার মতো এমন বীরের আবির্ভাব হয়েছে, —  
ইতিহাস যে বীরের সদৃশ প্রত্যক্ষ করেনি কোন কালে।  
আমার ভাগ্য আপনার জনক-জননীর কল্যাণেই আজ  
উদ্ধাসিত হয়েছে  
কৃতাঙ্গ ব্যাঘ ও মদমত হস্তী হয়েছে পরাভূত !  
এইভাবে বীরবরের প্রশংসা কীর্তনের পর  
সন্ত্রাট বললেন, হে নিয়তির বরপুত্র,  
এইবার দৈত্য-রাজের রক্ত আমার  
ও উপস্থিত বীরগণের চক্ষুতে সিঞ্চন করুন ;

যাতে আমরা আবার আপনাকে দেখতে পারি  
 প্রত্যক্ষ করতে পারি বিশ্ব-প্রভুর দানের মৃত্যুমান মহিমাকে।  
 কুস্তম প্রথমে সন্ত্রাটের চোখে দৈত্যের কলিজার রক্ত সিঞ্চন করলেন,  
 সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি সূর্যের মতো প্রখর হয়ে উঠলো।  
 তারপর সকল বীরের চোখে সিঞ্চিত করার জন্য  
 কুস্তম দৈত্যের কলিজা নিংড়ে রক্ত বের করে নিলেন।  
 সে-রক্ত স্পর্শ করাবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখে আলো  
 ফুটে উঠলো,

সারা দুনিয়া হেসে উঠলো বসন্তের ফুলবনের মতো।  
বিজিত দৈত্যগণ তখন সজ্জিত করলো এক শুভ সিংহসন  
ও তার উপর টেনে দিলো সমুজ্জ্বল তাজ।  
সম্রাট মাঞ্জিন্দিরানের সিংহসনে  
রুক্ষম ও যশস্বী বীরগণ সমাহারে অধিষ্ঠিত হলেন।  
পদমর্যাদা অনুসারে তৃস, গোদরঞ্জ, কুশওয়াদ  
গেও, রাহাম, শুরগীন ও বাহ্রাম প্রমুখ বীরগণ সভা  
আলোকিত করে বসলেন।  
এইভাবে সুরা, সংগীত ও আনন্দে  
তাঁরা সাত দিন কাটিয়ে দিলেন।  
অষ্টম দিনে সবাই যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত হয়ে  
হাতে তুলে নিলেন গুরুভার প্রহরণ  
এবং অশুপ্রস্তে চড়ে মাঞ্জিন্দিরানের এই নগরী  
পেছনে ফেলে এগিয়ে চললেন।  
সম্রাটের আদেশে সৈন্যদল যেন  
শুক্ষ বৎশদণ থেকে আগুনের মতো নির্গত হলো।  
তরবারি থেকে বজ্র প্রজ্জ্বলিত করে  
তাঁরা পথে সকল নগরী জুলিয়ে ধ্বংস করে চললো।  
অনেক জাদুকর দৈত্য নিধন করে  
তাঁরা রক্তের নদী বইয়ে দিলো।  
রাত্রি অঙ্কুরার হলে বীরগণ  
যুদ্ধ শুগিত রেখে বিশ্বাসির আয়োজন করতে লাগলো।

প্রচলিত অর্থে রাজমুকুট ছাড়া সিংহসনের উপর টানানো চন্দ্রাপক্ষে তাজ বলা হয়।  
বিশেষ করে অভিধেকের সময় ধ্যে-চৌদোয়া টানানো হয় তাই তাজের মর্যাদা লাভ করে।

এমন সময় কায়কাউস সৈন্যদের ডেকে বললেন,  
এখন প্রতিশোধ গ্রহণ পাপ বলে গণ্য হবে।  
প্রায়শিকভাবে যথেষ্ট শাস্তি তারা পেয়েছে,  
এখন হত্যা থেকে নিবৃত্ত হওয়াই হবে আমাদের সমুচিত কর্ম।  
তারপর রুক্ষমকে সম্বোধন করে সন্ধাট বললেন,  
হে জ্ঞানী ও উদার-হৃদয় বীর,  
একজন সচেতন ও শক্ত ব্যক্তিকে —  
যে আশু ও বিলম্বের পার্থক্য বুবাতে পারে —  
মাজিন্দিরানের অধিপতির কাছে প্রেরণ করা উচিত বলে  
আমি মনে করি,  
যাতে সে তার অহঙ্কার থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে স্বীয় অন্তরকে  
জাহ্নত করার সুযোগ লাভ করে।  
বাদশার এই প্রস্তাব শুনে জাল-পুত্র সন্তুষ্ট হলেন,  
অন্যান্য বীরও তাঁর মতের সঙ্গে একমত হলেন যে,  
মাজিন্দিরানের অধিপতির কাছে লিপিকা পৌছলে  
তিনি তার সাহায্যে তাঁর অন্ধকার হৃদয় আলোকিত করতে পারবেন।

## মাজিন্দিরানের অধিপতির সমীপে কায়কাউসের লিপিকা প্রেরণ

পরদিন যখন, এই আবর্তমান গম্বুজ  
আকাশে হলুদ বর্ণের পট্টবাস বিছিয়ে দিলো,  
তখন সাদা রেশমী কাপড়ের উপরে  
লিপিকায় সাজিয়ে চললো আশা ও ভীতি-উদ্দীপক  
কতিপয় শব্দের ফুল।

প্রথমে লিখিত হলো, বিশ্ব-স্মষ্টার গুণগ্রাম —  
যাঁর থেকে দুনিয়ায় উত্তৃত হয়েছে সকল শিক্ষণ ও কলা।  
তিনি সৃষ্টি করেছেন, জ্ঞান, করুণা ও নিয়তির আবর্তন,  
তিনি সৃষ্টি করেছেন, পরুষতা, বিজ্ঞম ও প্রেম।  
সদসৎ নির্বিশেষে সবাই লাভ করে তাঁর করুণা,  
তিনিই ঘূর্ণ্যমান চন্দ্র-সূর্যের প্রভু।

পরে লেখা হলো, এই লিপিকা  
ইয়ানের বাদশা কায়কাউসের সমীপ থেকে  
মাজিন্দিরানের অধিপতির প্রতি —  
যিনি দৈত্য ও ঐন্দ্রজালিকদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছেন।  
লিখা হলো, অহঙ্কারে প্রমত্ত হে রাজা, জেনে রাখুন,  
আনন্দের নিলয় এই দুনিয়ার রীতি —  
আপনি যদি এখানে দয়াদ্রুচিত্ব ও ধর্মপ্রাণ হন  
তবে সর্বলোক থেকে প্রাপ্ত হবেন প্রশংসা।  
আর যদি অত্যাচার ও অধর্ম হয় আপনার অবলম্বন  
তবে উন্নত আকাশ থেকে আপনার উপর দুর্ভাগ্যের  
অবতরণ হবে।

হে রাজা, যদি স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেন  
তবে সেই বিশ্বাধিপতির অনুজ্ঞা পালন করুন।  
চেয়ে দেখুন পাপের কি শাস্তি তিনি বিধান করেছেন,  
দৈত্য ও ইন্দ্রজালের মধ্যে থেকে বিপদের কি ধূলিরাশি  
তিনি উথিত করেছেন।  
যদি আপনি চলমান ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন,  
আপনার হাদয় ও মন্তিক্ষ যদি সে সব থেকে গ্রহণ করে থাকে পাঠ,  
তবে এখানে মাজিন্দিরানের এই সিংহাসন-পদতলে  
বিনীতভাবে এসে উপস্থিত হোন।

কারণ ক্রস্তমের সঙ্গে আপনি যুক্তে পেরে উঠবেন না,  
সুতরাং আপনার জন্য উচিত করদাতা সামন্তরাপে অবস্থান করা।  
মাজিন্দিরানের রাজ্য যদি আপনার কাম্য হয়  
তবে এই লিপিকা আপনাকে বাংলে দিচ্ছে পথের নিশানা।  
অন্যথায় আরবঙ্গ ও সপেদ দৈত্যের মতো  
হৃদয় থেকে প্রাণের মাঝা পরিত্যাগ করুন।  
আপনি ক্রস্তমের রংগকৌশল ও বীর্য অবগত নন,  
তাঁর তলোয়ারের তাপে নদীতে নক্র ভুলে পুড়ে থাক হয়।  
এইভাবে ভাগ্যবান লিপিকার কর্তৃক লিপি লেখা শেষ হলে  
তা আবীর ও কস্ত্রী দ্বারা মোহরাক্ষিত করা হলো।  
এইবার বাদশা প্রহরণ-ধারী  
ফরহাদকে ডেকে পাঠালেন।  
সে ছিল এই নগরীর মহত্বমগণের অন্যতম,  
কমহীন অবকাশের মধ্যে সে জীবন যাপন করছিল।  
সপ্তাঁট তাকে বললেন, এই উপদেশপূর্ণ লিপিকা নিয়ে  
তুমি উল্লম্ফনে বক্সনোম্বুক্ত দৈত্যরাজের কাছে যাবে।  
ফরহাদ বাদশার আদেশ শুনে মৃত্তিকা চুম্বন করলো,  
ও লিপিকা নিয়ে প্রস্থানপর হলো।  
যথাসময়ে সে মাজিন্দিরানের রাজধানীতে এসে উপস্থিত হলো,  
সেখানে সর্বত্র দাসগণ ও অশ্বারোহীগণ বিচরণ করছে।  
মাজিন্দিরানের অধিপতি বীরগণ সমভিব্যাহারে  
এখানেই অবস্থান করেন।  
ফরহাদ বিচরণশীল সৈনিকদের মধ্যে থেকে একজনকে  
স্থীয় অভিপ্রায় জানিয়ে রাজ্ঞার সমীপে প্রেরণ করলো।  
রাজা যখন শুনলেন যে, কায়কাউসের সমীপ থেকে  
একজন জ্ঞানী দৃতের আগমন হয়েছে,  
তখন তিনি তাকে আগু বাড়িয়ে আনার জন্য  
মাজিন্দিরানের বীরগণের একটি দলকে প্রেরণ করলেন।  
এই দলের প্রত্যেকেই সুনির্বাচিত জ্ঞানী ও সুকোশলী।  
রাজা তাদেরকে বললেন, আজ পৌরুষ প্রদর্শনের দিন,  
সকলে আজ মস্তিষ্ক থেকে প্রমত্ততা বিদূরিত করো।  
সকলে আজ প্রদর্শন করো ব্যাঘ্রের শাঙ্কি ও কৌশল,  
কৌশলী প্রতিপক্ষকে করো পরাজিত।

দৃত এই বীরদলের সম্মুখীন হয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো  
সে দেখলো, প্রত্যুদ্গমনকারীদের ললাট কৃষ্ণিত,  
তাদের মুখ থেকে কোন কথাই বেরুচ্ছে না।  
ফরহাদের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের মধ্যে থেকে  
একজন দস্যুর মতো এগিয়ে এসে তার হাত ধরলো।  
করমর্দনের ছলে সে ফরহাদের হাতে এমন চাপ প্রয়োগ করলো যে,  
মনে হলো, তার হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে।  
তারপর তারা সেই ভৌতসন্ত্রস্ত দৃতকে ধরে নিয়ে এলো রাজার কাছে;  
কায়কাউস সম্পর্কে ও পথের বিপদ-আপদ সম্পর্কে  
রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন।

তারপর লিপি-পাঠকের হাতে তিনি তুলে দিলেন লিপি,  
তাতে মিশে রয়েছে কস্তুরীর সুবাস।  
পাঠক যখন লিপি পাঠ করতে লাগলো,  
তখন রাজার মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হলো।  
তরপর যখন ক্ষমত ও দৈত্যদের কাহিনী শুনলেন  
তখন তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত ও মন্তিক্ষ ক্রোধে প্রকশ্পিত হলো।  
তিনি মনে মনে বললেন, হায়! সূর্য অস্তে চলে গেছে  
রাত্রি হয়ে এসেছে, শান্তি, স্বপ্নের দিন বুঝি গত হয়ে এলো।  
আরবঙ্গ ও সপেদ দৈত্যের নিধনে  
এবং পুলাদগন্দী ও বেদের হত হওয়ার সংবাদে তাঁর অস্তরে  
পড়লো বিষাদের ছায়া।

এইভাবে সম্পূর্ণ লিপিকা পঠিত হলে  
রাজার চক্ষু যেন তাঁর রক্তাক্ত হাদপিণ্ডের উপর নির্নিমেষ হলো।  
তিনি দিন তির রাত্রি পর্যন্ত তিনি স্থীয়  
বীর ও পার্শ্বচরণগুলের সঙ্গে যুক্তি করে কাটালেন।  
চতুর্থ দিনে তিনি দৃতকে ডেকে বললেন,  
নতুন বাদশার কাছে ফিরে যাও — তিনি অস্ত।  
কায়কাউসকে এই জবাব দিয়ো, যে-পাত্র বিনিময় হবে,  
তাতে মদ্য ও পানীয়ের পরিবর্তে রয়েছে তীর।  
আপনি অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়ে একথা বিশ্মিত হয়েছেন যে,  
আমি যে-কোন আসর থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি শির।  
আমি সেই ব্যক্তি যে বন, নগরী কিংবা গিরি-পর্বত  
সব জায়গা থেকেই যে-কাউকে আমার সমীপে ধরে আনতে পারি।

আমার প্রাসাদ আপনার পূরী থেকে অনেক বড়  
 এখানে লক্ষাধিক সৈনিক সর্বদা বিচরণ করে।  
 যে দিকেই এরা মুখ করে সর্ব বাধা বিদূরিত হয়,  
 যুদ্ধে তারা বিনষ্ট করে রঙ্গ ও গঙ্গের দুনিয়া।  
 সাঞ্জার যতো সেনাপতির অধীনে আমার দুইশো সৈন্যই  
 বাদশাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ধরে আনতে পারে।  
 আর আমি নিজে যদি অবতীর্ণ হই যুদ্ধে  
 তবে জ্বনে রাখুন, স্বয়ং চন্দ্রও বিচুত হন তাঁর বৃত্ত থেকে।  
 অবশ্যই এ কথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে,  
 আপনার জীবন—সূর্য ইরান ছেড়ে এই রাজ্যেই অস্ত যাবে।  
 আশা করি, আপনি কোন যুদ্ধের আয়োজন থেকে বিরত থাকবেন,  
 করেণ, আমি প্রকাশ করছি যুদ্ধের বাসনা।  
 আমি সিংহদল সদৃশ এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছি,  
 এরা আপনার মষ্টিষ্ঠ থেকে সুখ-স্বপ্নগুলিকে হরণ করবে।  
 এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে দুই সহস্র হস্তী,  
 অথচ আপনার কাছে একটিও জঙ্গী হাতী নেই।  
 ইরান ভূমিতে আমি ধূলির ঝঞ্চা উদ্ধিত করবো,  
 বিলুপ্ত করবো সেখানে সানু—শীর্ষের প্রভেদ ;  
 ফরহাদ তাঁর আধিপত্যের, উচ্চতার,  
 বীরত্বের ও শক্তির এই গর্বের কথা শুনে  
 ও তাঁর লিপিকা হস্তগত করে  
 ইরান—সন্দ্বাটের অভিমুখে অশু—বচ্চা শুখ করলো।  
 যথাসময়ে সে বাদশার সমীপে এসে নিবেদন করলো সকল কথা  
 ও উন্মোচিত করলো রহস্যের যবনিকা।  
 দৃত আরো নিবেদন করলো, রাজ্ঞার শির আকাশেরও উর্ধ্বে  
 তাঁর গর্ব কিছুতেই মাথা নত করবে না !  
 আমার বাণী শুনে তিনি এতই বিরূপ হচ্ছিলেন যে,  
 মনে হলো, দুনিয়া তাঁর চোখে তুচ্ছ বস্তু।  
 বাদশা দৃতের কথা শুনে ঝুঁতুমকে ডেকে পাঠালেন  
 ও ফরহাদ যা বলেছিলো সব তাঁকে খুলে বললেন।

• চন্দ্রের পরিক্রমণ পথ সূর্যের সঙ্গে প্রায় একই ব্যতে — জ্যোতিশের এই সূত্র ফেরদৌসীর ভান  
ছিল।

ରୁଷମେର କାନେ ରାଜାର ଏହି ଜ୍ଵାବ ଏତ କଟୁ ଲାଗଲୋ ଯେ,  
କ୍ରୋଧେ ବର୍ଣ୍ଣଫଳକେ ମତୋ ତାଁ ରୋମାଞ୍ଚ ହଲୋ ।  
ତିନି କାଯକାଉଟସକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ବଲଲେନ,  
ଆମାଦେର ଆସରକେ ଏହି ଅପମାନ ଥେକେ ମୁକ୍ତ କରବୋ ।  
ଆପନି ଆମାକେଇ ସେଥାନେ ଦୂତରାପେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତ,  
ଆମି ତୀଙ୍କୁଥାର ତରବାରି ସେଥାନେ କୋଷୋନ୍ମୁକ୍ତ କରବୋ ।  
ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ଖଣ୍ଡରେ ମତୋ ଏକ ଲିପିକା ଲିଖିତେ ହବେ,  
କଥାଗୁଲି ତାର ବର୍ଷଗୋମୁଖ ମେଘେର ମତୋ ଗର୍ଜନ କରବେ ।  
ସେଇ ଲିପି ନିଯେ ଆମି ଦୂତେର ବେଶେ ଯାବୋ,  
ଆମାର କଥାଯ ଆମି ପ୍ରକାଶ କରବୋ ରଙ୍ଗେର ଅନନ୍ୟତା ।  
ଜ୍ବାବେ କାଯକାଉଟସ ବଲଲେନ,  
ଆପନାର ପ୍ରଭାଯ ଅନୁରୀଯ ଓ ମୁକୁଟ ଦୀପି ପାଯ ।  
ଆପନିଇ ଦୃତ, ଆପନିଇ ବୀରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସେନାପତି,  
ସକଳ ଯୁଦ୍ଧେ ଆପନିଇ ସର୍ବୋପରି ସିଂହେର ମତୋ ବିରାଜ କରେନ ।  
ତାରପର ବାଦଶାର ଆଦେଶେ ଲିପିକାର ଏଲୋ,  
ଓ ତାଁ ଲିଖନୀକେ ପରିବିର୍ତ୍ତି କରଲୋ ତୀରେର ଫଳାୟ ।  
ତାରପର ବିଶ୍ୱାସଟାର ପ୍ରଶଂସା କୀର୍ତ୍ତନେର ପର  
ଲିଖା ହଲୋ, ହେ ଧର୍ମପଥ ଥେକେ ବିଚ୍ଛୁତ ରାଜା,  
ବାଜେ କଥା ବଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେର ଲକ୍ଷଣ ନୟ ।  
ଯଦି ଔନ୍ଦତ୍ୟ ଥେକେ ଆପନାର ମଣିଷକ ମୁକ୍ତି ପେଯେ ଥାକେ  
ତବେ ଦାସେର ମତୋ ସବିନ୍ୟେ ଆମାର ଅନୁଝାର ଅନୁଭାରୀ ହେନ ।  
ଆପନାର ରାଜ୍ୟକେ ଯଦି ଧ୍ୱରଂସ ଥେକେ ରଙ୍ଗା କରତେ ଚାନ,  
ତବେ ଈର୍ଷ-ଦ୍ୱେଷ ତ୍ୟାଗ କରେ ଆମାକେ କର ଦାନେ ଏଗିଯେ ଆସୁନ ।  
ଆମାର ଉପଦେଶ, ମାଜିନ୍ଦିରାନ ନିଯେ ସୁଖେ ବସବାସ କରନ୍ତ  
ଏବଂ ରୁଷମେର ହାତ ଥେକେ ରଙ୍ଗା କରନ୍ତ ସ୍ଥିଯ ପ୍ରାଣ ।  
ଯଦି ତା ନା ହୟ, ତବେ ଅଚିରେଇ ଆପନାର ଦିକେ ଆମି ଅଭିଯାନ କରବୋ  
ରାଜ୍ୟେର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଥେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମି ରଚନା  
କରବୋ ସୈନ୍ୟବୁଝ ।

ମାଜିନ୍ଦିରାନେ ଆମି ପ୍ରବାହିତ କରବୋ ରଙ୍ଗେର ନଦୀ,  
ମହତ୍ଵମଗଣେର ଶିର ଆମି ଧୂଲାୟ ଲୁଟାବୋ ।  
ତାହାଡ଼ା, ଏହି ଯୁଦ୍ଧେ ଆମାର ସୈନ୍ୟେରଇ ବା ପ୍ରଯୋଜନ କିସେର  
ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମେ ଏକ ରୁଷମ୍ଭାଇ ଯଥେଷ୍ଟ ।  
ତିନି ଯଥନ ଯୁଦ୍ଧେ ଅବତାରୀଙ୍କ ହନ,

তখন দৈত্যবীরদের শির ধূলায় লুটিয়ে পড়ে।  
তাঁর পৌরুষের সমকক্ষতা করতে পারে এমন পুরুষ দুনিয়ায় নেই,  
তাঁর সঙ্গে লড়তে পারে এমন যোদ্ধাও নেই পৃথিবীতে।  
এই বীর যখন রণে অবতীর্ণ হন  
তখন তাঁর সামনে সানু-শীরের প্রভেদ দূর হয়ে যায়।  
তিনি সেই বীর যিনি যুদ্ধে  
সিংহের বক্ষ ও ব্যাষ্ট্রের চর্ম বিদীর্ণ করেন।  
নির্বোধ সপেদ দৈত্য তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ  
হীয় দেহকে শকুনের খাদ্যে পরিণত করেছে।

## মাজিন্দিরান-অধিপতির সমীপে দৃতরূপে রুক্ষমের আগমন

বাদশার মোহরাক্ষিত লিপি নিয়ে  
বিশুন্বুষী রুক্ষমের যাত্রা শুরু হলো।  
মাজিন্দিরানের সন্নিকটবর্তী হয়েই  
তিনি তাঁর প্রহরণ জিনের নিচে লুকিয়ে ফেললেন।  
মাজিন্দিরান শাহের নিকট সংবাদ পৌছলো,  
কায়কাউস লিপিসহ তাঁর দৃতকে পাঠিয়েছেন।  
সেই দৃত দেখতে কৃতাঞ্জলি ব্যাঘ্রের মতো —  
তাঁর কোমরে মৃগয়ান্বুষী পাশ—রঙ্গু বৃত্তাকারে উদ্যত রয়েছে।  
এমন এক অশু যাকে মদমত হস্তী বললেও বেশী বলা হয় না  
সেই নরপুঁগ চলমান গিরিয়া মতো এগিয়ে আসছে,  
কিংবা তাকে মৃগয়ার পেছনে ধাবমান বাধের সঙ্গেও  
তুলনা করা চলে।

মাজিন্দিরান-অধিপতি সংবাদ শুনে  
তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে থেকে কতিপয় অশুরোহীকে  
বেছে নিয়ে বললেন,  
সাজগোজ করে তোমরা সেই দুরস্ত ব্যাঘ্রকে  
সংবর্ধনা করে নিয়ে এসো।  
সৈন্যগণ বসন্তের মতো সজ্জিত হয়ে  
রুক্ষমের সমীপে এসে উপস্থিত হলো।  
প্রত্যুদ্গমনকারী সৈনিকগুলি নিকটবর্তী হতেই  
রুক্ষমের চোখ পড়লো তাঁর সামনে দুইশাখা বিশিষ্ট  
এক বৃক্ষের উপরে।  
কালবিলম্ব না করেই রুক্ষম সেই বৃক্ষের কাণ চেপে ধরে  
তাকে মোচড় দিতে শুরু করলেন।  
দেখতে দেখতে বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে  
রুক্ষমের হাতে চলে এলো।  
তিনি সেটিকে দ্বিমুখী ভাল্লুর মতো তুলে ধরলেন,  
মাজিন্দিরানী সৈন্যগণ এই দশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো।  
তাঁরা রুক্ষমের নিকটবর্তী হতেই রুক্ষম ডালপত্র সমেত  
বৃক্ষটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন।  
ফলে অভিযাত্রীদের অনেকেই বৃক্ষ শাখার নীচে চাপা পড়ে গেলো।

এইবার মাজিন্দিরানী সৈন্যদের মধ্যে থেকে তাদের দলপতি  
রুস্তমের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে তাতে চাপ দিলো।  
এমনভাবে পীড়ন করেই সে যেন রুস্তমের শক্তি পরীক্ষা  
করে নিতে চায়।

রুস্তম তার ব্যবহার দেখে সররে হেসে উঠলেন,  
উপস্থিত সকলেই সেই হাসি দেখে চমকে উঠলো।  
এইবার রুস্তম দলপতির হাতে সামান্য একটু চাপ সৃষ্টি করলেন,  
দলপতির মনে হলো, রুস্তম তার হাতের শিরা ও মুখের রক্ত  
আকর্ষণ করে নিচ্ছেন।

দলপতি রুস্তমের পীড়নের শক্তি সহ্য করতে না পেরে  
নতমুখে অশ্বের উপর থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো।  
এই দৃশ্য দেখে সৈন্যদের মধ্যে থেকে জনৈক অশ্বারোহী  
তাদের বাদশার সমীপে দৌড়ে গিয়ে সকল বিষয়  
তাঁকে অবগত করালো।

কালাহোর নামে এক বীর ছিল,  
সে ছিল মাজিন্দিরানের গর্ব ও গৌরব।  
স্বভাবে সে উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মতো, —  
যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই তার কাম্য ছিল না।  
দৈত্যরাজ তাকেই রুস্তমের অভ্যর্থনার জন্য  
পাঠাবার বাসনা প্রকাশ করে বললেন,  
তুমি শীত্র করে দূতের সমীপে গমন করে  
তোমার বীরত্ব ও কৌশলের পরাকাঞ্চ প্রদর্শন করো।

এমন করো যেন তার মুখমণ্ডল লজ্জায় অধোমুখী হয়,  
এবং তার চক্ষ থেকে গাঢ়িয়ে পড়ে তপ্ত অশ্ব।  
কালাহোর রাজাদেশ পেয়ে কৃতান্ত ব্যাঘ্রের মতো  
বীরবরের সন্ধিখানে এসে উপস্থিত হলো।  
এবং গর্জমান বাঘের মতোই রুস্তমকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে  
তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।  
বীরবর প্রত্যুষেরে কালাহোরের হাত স্বীয় মুষ্টিতে গ্রহণ করলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে কালাহোর নীলনদের মতো বেদনার্ত হলো।  
রুস্তমের শক্তির পরিচয় পেয়ে সে হাত টেনে নিতে চাইলো,  
কিন্তু রুস্তম তখন তাতে তাঁর বজ্রমুষ্টির চাপ দিয়ে চলেছেন,  
এবং সেই চাপে কালাহোরের হাতের নখগুলি

শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়তে শুরু করেছে।

অবশ্যে কালাহোর তার নখচমহীন হাতটাকে

এক পাশে ঝুলিয়ে নিয়ে দৈত্যরাজের সমীপে এসে বললো,  
হে রাজা, নিজেকে দৃঢ়ের মধ্যে পতিত করবেন না।

যুদ্ধ না করে সঙ্গিই আপনার কাম্য হওয়া উচিত,  
হৃদয়কে সাহসে প্রসারিত না করে ভয়ে সঙ্কুচিত করাই

কর্তব্য বলে মনে করি।

এমন বীরের সঙ্গে আপনি এঁটে উঠতে পারবেন না,  
কর দিয়ে অধীনতা স্বীকার করা ছাড়া গত্যস্তর দেখি না।

চলুন, আমরা দূতকে সংবর্ধনা করে নিয়ে এসে  
তার হাতে নগরীর ছোট বড় সকলকে সমর্পণ করি।

এইভাবেই আসন্ন বিপদ থেকে

ও ভয়ের কবল থেকে প্রাণকে আমরা রক্ষা করতে পারবো।  
কালাহোরের বচন শুনে দৈত্যরাজ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন,

ক্রোধে তাঁর মস্তিষ্ক আলোড়িত হতে লাগলো।

এমন সময় রুষ্টম স্বয়ং গতিমান হস্তীর মতো

দৈত্য-রাজ সভায় এসে উপস্থিত হলেন।

রাজা তখন রুষ্টমকে তাঁর সামনে আসন দান করে

বাদশা কাউস ও তাঁর সৈন্যদলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

দীর্ঘ পথের সানু-শীর্ষ ও কষ্টের কথাও

রুষ্টমের কাছ থেকে তিনি জানতে চাইলেন !

অতঃপর রুষ্টমকে সম্বোধন করে রাজা বললেন, আপনিই কি রুষ্টম ? —

মহাবীরোচিত বক্ষ ও বাহুর অধিকারী কি আপনিই ?

উত্তরে রুষ্টম বললেন, আমি সম্বাটের ভূত্য,

দাসত্বের যোগ্য বলে আমি নিজেকে মনে করি।

কোথায় রুষ্টম আর কোথায় আমি,

তিনি মহাবীর ও অতুলনীয় যোদ্ধা !

বিশুম্ভষ্টা বিশু সৃষ্টির পর থেকে

রুষ্টমের মতো উচ্চশির বীর আর জন্ম দেন নি।

যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অটল গিরির মতো,

তাঁর বাহন রাখ্শ ও তাঁর প্রহরণের কি বর্ণনা আমি দিব ?

তিনি যখন রণে অবতীর্ণ হন তখন প্রতিপক্ষের সৈন্যদল

স্থির থাকতে পারে না,

কারণ, তিনি পর্বতকে অপস্থিমান নদীতে ও নদীকে পর্বতে  
রূপান্তরিত করেন।

যুক্তক্ষেত্রে সিংহ, হষ্টী ও দৈত্য যেই আসুক না কেন —  
তাঁর দুরা অবরুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উথিত করে মরণ-চিংকার।

তিনি একাই এক সৈন্যবাহিনী,  
বাণী-বাহককে দেখে তাঁর পরিচয় আপনি পাবেন না।  
আমি তাঁরই দৃত,

তাঁরই সমীপ থেকে বাণী বহন করে এনেছি।

যশস্বী রূপম আপনাকে বলেছেন,  
প্রজ্ঞা অবলম্বন করুন, অন্যায়ের বীজ বপন করবেন না।  
বহু মন্দের বীজ আপনি ছড়িয়েছেন,

মানুষকে অপমানিত করার পথে বহু দূর এগিয়েছেন।

ইরান ভূমির বাদশা ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে

শক্রতামূলক কি ব্যবহার আপনি না করেছেন ?

উন্নত আকাশ ঘর সামনে দাসের মতো দণ্ডবৎ

সেই রূপমের নাম কি আপনার কর্ণগোচর হয়নি ?

আপনি যদি বাদশার উদারতা কামনা করেন,

তবে মনে করুন, আমি তাই নিয়ে এই সভায় আগমন করেছি।

হে রাজা, আপনি কি আপনার সৈন্যবাহিনী নিয়ে

জীবিত থাকতে চান না ?

আপনি কি আপনার মস্তকোপরি বর্ণাফলককে উদ্যত দেখতে চান ?

এই বলে দৃতরূপী রূপম

বাণীবাহক লিপিকাটি দৈত্যরাজের হাতে তুলে দিলেন।

রূপমের বাণিতা শুনে ও লিপিকা পাঠ করে

দৈত্যরাজ অত্যন্ত ক্রোধান্তিত ও মনে মনে চিন্তান্তিত হলো।

রূপমকে লক্ষ্য করে রাজা বললো,

এই উল্লম্ফন ও বাক্যব্যয় নিরর্থক।

তাঁকে বলবেন আপনি যদি ইরানের প্রধান হন,

এবং সিংহের হৃদয় ও বাহুর অধিকারী হয়ে থাকেন,

তবে আমি ও সৈন্যদল পরিবৃত মাজিন্দিরানের অধিপতি, —

আমার শিরে রাজমুকুট ও আমি স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট।

নিরর্থক বাক্যব্যয় আমি রাজকীয় ভব্যতার

যোগ্য বলে জ্ঞান করি না।

মহস্তমগণের সিংহাসন জয় করার বাসনা করবেন না,  
কারণ, এই বাসনা আপনার অপমানের কারণ হবে।  
সুতরাং হে দৃত, আমার উপদেশ, ইরানের দিকে  
ঘূরিয়ে নিন আপনার অশু-বলগা,  
নতুন বর্ণ ধারায় কাল আপনার জন্য প্রতিকূল হবে।  
আমি যদি আমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্বস্থান থেকে নির্গত হই,  
তবে আপনার বাহিনীর অগ্রপক্ষাং অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।  
আপনি অনিশ্চিত অবশ্য থেকে নিশ্চিতে প্রত্যাবর্তন করুন,  
প্রজ্ঞার বশবর্তী হয়ে ত্যাগ করুন আপনার ধনুশ।  
আমি যদি রুষ হয়ে আপনার মুখোযুথী হই  
তবে মুহূর্তেই আপনার ঔজ্জ্বল্য ও বাণিজ্যার অবসান ঘটবে।  
রুশম তাঁর উজ্জ্বল হৃদয় নিয়ে  
রাজসভা, সৈন্যদল ও উপস্থিতি বীরবৃন্দের দিকে দৃষ্টি  
নিশ্চেপ করলেন।

রাজাৰ দর্পোক্তৃত বাক্যাবলী তাঁৰ অসহ্য হলো,  
বৈরনির্যাতন কামনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো তাঁৰ মন্তিক্ষ।  
এমন সময় লোকজন রুশমের জন্য  
রাজকীয় উপচোকনাদি নিয়ে তাঁৰ নিকটবর্তী হলো।  
রুশম সেই বসন-ভূষণ, অশু ও স্বর্ণ  
সবই ঘৃণাভৱে প্রত্যাখ্যান কৰে  
রাজসভা থেকে নির্গত হয়ে গেলেন,  
তাঁৰ চোখে চন্দ্ৰ ও নক্ষত্র সকল অঙ্ককার বলে প্রতীয়মান হলো।  
রাজাৰ কঠিন বাক্য শুনে উত্তপ্ত মন্তিক্ষ নিয়ে  
রুশম মাজিন্দিৱান ত্যাগ কৰে এলেন।  
বাদশার সমীপে উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত ভাষায় তিনি  
মাজিন্দিৱানেৰ যাবতীয় ঘটনা আদ্যোপাস্ত বৰ্ণনা কৰলেন।  
তাৰপৰ বললেন, হে সন্ন্যাট, দ্বিধাতীন চিষ্টে  
দৈত্যদেৱ বিৰুদ্ধে অভিযান কৰুন।  
দৈত্য-ৱাজসভায় বীৱ ও রথিগণ আমাৰ চোখে তুছ।  
আমাৰ কাছে তাৰা ধূলিকণার মতো,  
এই প্ৰহৱণেৰ আধাতে তাদেৱকে আমি বধ কৰবো।  
আপনি তখন দেখবেন, কি কৰে আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে,  
আপনার মনোবেদনাৰ প্রতিকাৰ আমি অবশ্যই কৰবো।

## মাজিন্দিরান-অধিপতির সঙ্গে কায়কাউসের যুদ্ধ

রুস্তম মাজিন্দিরান ত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই  
মায়ীবীদের রাজা যুদ্ধায়োজনে মনোনিবেশ করলো।  
নগরীর বহিদুর্শে স্থাপিত হলো রাজকীয় শিবির,  
সৈন্যগণ এগিয়ে গেলো উপত্যকার পথ ধরে।  
তাদের পদ তাড়ানায় ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে  
সুর্মের সপ্ত বর্ণকে ঢাঁকের আড়াল করে দিলো।  
পর্বত, উপত্যকা ও প্রান্তর সৈন্যবাহিনীতে ছেয়ে গেলো,  
গজবাহিনীর পদাঘাতে অসহায় বোধ করলো ধরিত্বী।  
দেখতে দেখতে সারা দুনিয়া অঙ্ককারে ঢাকা পড়লো,  
সিপাহীদের পদধূলিতে আকাশ হলো মসীবর্ণ।  
ঝড়ো বাতাসের মতো সময়ের বৃক্ষে উত্তাল তরঙ্গ তুলে  
এগিয়ে চললো দৈত্য সৈন্যবাহিনী।  
বাদশা কাউস যখন সংবাদ পেলেন যে,  
দানব-সৈন্য নিকটে এসে গেছে  
তখন প্রথমেই তিনি জাল-পুত্র রুস্তমকে ডেকে  
শক্র-সংহারে উদ্যত হতে আদেশ দিলেন।  
তারপর তূস, গোদর্জ, কুশওয়াদ, গেও, গুরগীন  
প্রমুখ বীরগণকেও প্রস্তুত হতে বললেন।  
তাঁরা যথারীতি সৈন্য সজ্জিত করে  
ভল্ল, বর্ণা, তন্ত্রাণ ও অন্যান্য অস্ত্র প্রস্তুত করে রাখলেন।  
অতঃপর সম্মাটের শিবিরসহ সেনাপতিগণ  
অগ্রসর হয়ে চললেন মাজিন্দিরান উপত্যকার দিকে।  
সৈন্যবাহিনীর ডান দিকে রইলেন তূস নওজর,  
তাঁর দুন্দুভির নিনাদে পর্বতের বক্ষ কম্পিত হলো।  
গোদর্জ ও কুশওয়াদ বাহিনীর বাম ভাগ অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে  
সমগ্র পর্বতাঞ্চল ইম্পাতে মোড়া হয়ে গেলো।  
সম্মাট কাউস মধ্যভাগ থেকে গোটা সৈন্যবাহিনীর  
সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন,  
তাঁর চারদিকে রচিত হলো সিপাহীদের অস্ত্রালোহ বৃহ।  
সিপাহীদের সম্মুখভাগ রক্ষা করে চললেন সেই রুস্তম,  
কেন যুক্তেই যিনি পরাজয় প্রত্যক্ষ করেননি।

দুই দিক থেকে দুই পক্ষ এইভাবে পরম্পরের মুখোমুখী হলে  
বীরগণ যুক্তার্থ চঞ্চল হয়ে উঠলেন।  
এই সময় মাজিন্দিরানীদের পক্ষ থেকে  
এক বীর কাঁধে গদা নিয়ে এগিয়ে এলো।  
এই যুক্তান্বীর নাম জোয়া,  
গুরুভার প্রহরণের আঘাতে মস্তক বিচূর্ণ করাই তার কাজ।  
রাজকীয় চলন-ভঙ্গিমায় সে সিপাহস্লার কাউসের দিকে  
টগ্বগিয়ে এগিয়ে চললো।  
তার দেহে শোভা পাছে উজ্জ্বল তনুত্রাণ,  
তার ঘোড়ার খুরে আগুন জুলে উঠছে।  
ইরানীয় সৈন্যবাহিনীর সামনে এসে সে বীরদর্পে দাঁড়ালো,  
তার চিংকারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো পর্বত ও প্রান্তর।  
প্রতিপক্ষদের আহ্বান করে সে বললো, কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ  
করতে চাও ?  
কে পানি থেকে উথিত করতে চাও ধূলিরাশি, এগিয়ে এসো !  
এই বলে দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী খোলা জায়গায় সে দর্প্পভরে  
বিচরণ করে ফিরতে লাগলো,  
ক্রোধে ও উত্তেজনায় তার মুখে ফেনা ছুটছে।  
ইরানীয়দের মধ্যে থেকে কেউ তার সামনে এগিয়ে গেলো না,  
চিআর্পিতের মতো সবাই স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে রইলো।  
এমন সময় বাদশা কায়কাউস ইরানীয়দের সম্বোধন করে বললেন  
তোমরা কি সংগ্রাম থেকে নিজেদের শির বাঁচাতে চাও ?  
কেন তোমাদের মধ্যে থেকে কোন লোক জোয়ার সঙ্গে  
লড়তে এগিয়ে আসছে না ?  
ইরানীয়দের ধর্মনীতে কি রক্ত শুকিয়ে গেছে ?  
সম্বাট সরোষে সৈন্যদের প্রশঁ করলেন,—  
বীর ও পুরুষদের আজ কি হলো ?  
তোমরা কি এই দৈত্যকে দেখে ভয় পেয়েছ ?  
তার গর্জনে তোমাদের মুখ কি অঙ্কনার হয়ে গেছে ?  
কিন্তু সম্বাটের এই প্রশ্নের কোন জবাবই কেউ দিলো না,  
জোয়ার ভয়ে গোটা সৈন্যবাহিনীই যেন নির্বাক হয়ে গেছে।  
এই সময় রুস্তম অশু-বলগা বাগিয়ে ধরে  
কাঁধে তুলে নিলেন উজ্জ্বল ফলক বিশিষ্ট বর্ণ।

বললেন, বাদশার অনুমতি হলে  
আমি এই অসভ্য দৈত্যের সম্মুখীন হবো ।  
কায়কাউস রুস্তমের কথা শুনে বললেন, এ অপনারই কাজ,  
দেখতে পাছি ইরানীয়দের আর কেউ এই দৈত্যের সঙ্গে  
যুদ্ধ করতে এগিয়ে যাবে না ।

সুতরাং আপনিই যান, বিশ্ব-প্রষ্ঠা আপনার সহায় হবেন,  
সকল দৈত্য ও মায়াবী আপনার মণ্ডায় পরিগত হবে ।  
স্মাটের অনুমতি লাভ করে রুস্তম দুরাত্ম ব্যাখ্যের মতো  
সংগর্জনে সামনের দিকে ধাবিত হলেন ।  
যথারীতি রাখ্শকে উত্তেজিত করে  
ও বজ্রমুষ্ঠিতে বর্ণ ধারণ করে সম্মুখীন হলেন প্রতিপক্ষের ।  
যদমত হষ্টীর মতো তাঁর গতি হলো যুদ্ধস্থানের দিকে,  
যেন তাঁর আসন হয়েছে সিংহের উপরে ও হাতে ধরা রয়েছে তাঁর  
মৃত্যু-রূপী আজ্ঞাহা ।

রুস্তম অশু-বল্লা বাঁকিয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে  
উথিত হলো ধূলিরাশি,  
তাঁর গর্জনে প্রকম্পিত হলো সারা রণভূমি ।  
তিনি জোয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, হে অমঙ্গলরূপী দৈত্য,  
তোর নাম আমি উন্নতশিরদের তালিকা থেকে মুছে দেবো ।  
তোর নিরাপত্তা, শাস্তি ও স্বত্তির দিন শেষ হয়ে এসেছে ।  
আজ তোর উপর তোর জনক-জননীর,  
তোর মনোনয়ন দানকারীর ও প্রতিপালকের রোদনের দিন !  
প্রত্যুত্তরে জোয়া বললো, জোয়া ও তার খঞ্জরের  
শিরকর্তনকারী অব্যর্থতা থেকে নির্ভয় হোস্ত নে ।  
এখনই তোর মায়ের কলিজা ফাটিবে,  
এবং সে তোর অঙ্গাগ উষ্ণীধের উপর রোদন করবে ।  
জোয়ার বক্রব্য শেষ পর্যন্ত শুনে নিয়ে  
রুস্তম উথিত করলেন গর্জন ও রণধ্বনি  
এবং চলন্ত পর্বতচূড়ার মতো স্বস্থান থেকে গতিমান হলেন ;  
তাঁর আক্রমণের বেগ দেখে প্রতিপক্ষের বুক কেঁপে উঠলো ।  
রুস্তম তাঁর অশু-বল্লা ঘূরিয়ে জোয়ার দিকে মুখ করতেই  
মনে হলো জোয়ার রণকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হয়ে গেছে ।  
সে তৎক্ষণাত পৃষ্ঠ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়লো,

କୁନ୍ତମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହନାଦ କରେ ତାର ପିଚୁ ଧାଓୟା କରଲେନ ।  
ଏବଂ ପେଛନ ଥେକେଇ ତାର କଟିଦେଶେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ  
ବର୍ଣ୍ଣ ଛୁଡ଼େ ମାରଲେନ ।

ଦୂରନ୍ତ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣାଘାତେ ଜୋଯାର କୋମରବନ୍ଧ  
ଓ ତନୁଆଣ ଦୀର୍ଘ ହୟେ ଗୋଲୋ ।

ତାରପର ଦ୍ଵିତୀୟବାର ତିନି ଛୁଡ଼ଲେନ ତାଁର ଲେଜା,—  
ଏମନ ଅବ୍ୟର୍ଥ ସଙ୍କାନ ଆର ଦୁନିଆ କଥନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେନି ।  
ଚକ୍ରର ନିମେଷେ ଜୋଯା ଅଶ୍ଵପୃଷ୍ଠ ଥେକେ ନୀତେ ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼ଲୋ,  
ତୀରବିଦ୍ଧ ପାଖି ଯେମନ ଲୁଟିଯେ ପଡ଼େ ମାଟିତେ ।

ଏଇ ଦଶ୍ୟ ଦେଖେ ମାଜିନ୍ଦିରାନୀ ଦୀର ଓ ସିପାହିଗଣେର ମୁଖ  
ଭୟେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୟେ ଗୋଲୋ ।

ତାଦେର ସୈନ୍ୟଦଲେର ମନ ଭେଡେ ଗୋଲୋ ଓ ସାରା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଜୁଡ଼େ  
ପରମ୍ପର ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ତାରା କଥା ବଲତେ ଶୁରୁ କରଲୋ ।

ଏମନ ସମୟ ମାଜିନ୍ଦିରାନ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟଦେର ଡାକ ଦିଯେ ବଲଲୋ,—  
ତୋମରା ସବାଇ ଏକତ୍ରେ ଶକ୍ରବାହିର ଉପର ଝାପିଯେ ପଡ଼ୋ ।

ଶିର ଉଚୁ କରେ ତୋମରା ଯୁଦ୍ଧେ ଅଗସର ହୁଏ,  
ପ୍ରମତ୍ତ ସିଂହେର ରୀତି ତୋମରା ଅବଳମ୍ବନ କରୋ ।

ସୈନ୍ୟଗଣ ତାଦେର ବାଦଶାର ଆବେଦନ  
ଅନ୍ତରେ ବରଣ କରେ ନିଯେ

ଦଲେ ଦଲେ ଶକ୍ରଜୟ ସଙ୍କଳେପେ ବନ୍ଦପରିକର ହୟେ  
ରଣଭୂମିତେ ସକିନ୍ତି ହଲୋ ।

ଇରାନୀୟ ସେନାପତି ଏଇ ଦଶ୍ୟ ଦେଖେ  
ଶ୍ଵୀଯ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକେ ଓ କରଲେନ ତୃପର ।

ତାରା ସବାଇ ଟେନେ ନିଲୋ ତାଦେର ତରବାରି,  
ଓ ଏକସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧେ ଝାପିଯେ ପଡ଼ଲୋ ।

ଉଭୟ ଦଲେ ତଥନ ଏକସଙ୍ଗେ ବେଜେ ଉଠିଲୋ ରଣଦାମାମା,  
ଏଥିଂ ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଆକାଶ ଗାଡ଼ ନୀଲବର୍ଣ୍ଣେ ଚିତ୍ରିତ ହୟେ  
ଧରଣୀତି ପାତିତ କରଲୋ କାଳୋ ହ୍ୟା ।

କାଳୋ ମେଘେ ତରବାରି ଓ ବର୍ଣ୍ଣହଳକ ଫେନ ବିଦୁତେର ମତୋ  
ଆଗୁନେର ଚମକ ହାନତେ ଲାଗଲୋ ।

ବାତାସ ଯୁଗପ୍ରତିକାଳ, କାଳୋ ଓ ବେଶୁନି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ ଦରତେ ଲାଗଲୋ,  
ଉଡ଼ିତେ ଲାଗଲୋ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣର ପତାକା ଓ ବେଗ ବର୍ଷଣ କରେ ଚଲିଲୋ  
ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣଫଳକ ।

দৈত্যদের চিংকারে অঙ্ককার ধূলিরাশিতে,  
অশ্বের হেষায় ও দুন্দুভির নিনাদে  
আকাশ দীর্ঘ ও মৃতিকা ফেটে যেতে লাগলো ;  
এমন প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধ কেউ কখনো দেখেনি ।

দুনিয়া যেন বজ্জপাতের গুরুগত্তীর নিনাদে তলিয়ে গেছে,  
যেন দিবসের আলো ডুব দিয়েছে অমাবস্যার অঙ্ককারে ।  
এরই মধ্যে অবিরত চলতে লাগলো প্রহরণ, তীর ও তরবারি,  
যুদ্ধক্ষেত্রে বয়ে গেলো খুনের দরিয়া ।

মনে হলো পৃথিবী একটা নদীতে কুপাস্তরিত হয়ে গেছে,  
তাতে নকুসম ঘুরে ফিরছে তীর, তলোয়ার ও প্রহরণ ।  
অশ্বারোহীগণ সেই নদীতে চলন্ত নৌকার মতো  
প্রতিহিংসায় পরম্পরের মুখোমুখী হচ্ছে ।

পৃথিবীর এই নদীটার রং মসীরণ,  
শর, খঞ্জের ও গদার উর্মিতে নিয়ত সেই নদী উচ্ছুসিত ।  
বাযুতাড়নে নৌকাগুলি সতত সঞ্চারিত হচ্ছে,  
এবং দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে নিয়তি-নির্ধারিত নিমজ্জনের দিকে ।  
উষ্ণীষ ও শিরস্ত্রাণের উপর গদার বৰ্ষণ চললো  
যেন হেমন্তের বাতাসে ঝরে পড়ছে বিশুক্ষ পত্ররাজি ।  
গেদ্যুয়ার মতো লুটিয়ে পড়তে লাগলো কত না শির,  
বক্ষ কলিজা ছিন্ন হয়ে রক্তের ফিনকি ছুটলো ।

শক্রবৃহ দীর্ঘকারী সেনাপতি কুস্তম  
প্রাণ সংহারকারী ও প্রতিপক্ষের ক্পাণ ছিন্নকারী বীরবর কুস্তম —  
রাখশের উপর অবিচল পর্বতের মতো আসীন থেকে  
দলে দলে দৈত্যসৈন্য নিধন করে চললেন ।  
যেদিকেই তিনি প্রধাবিত করেন অশু  
সেদিকেই দৈত্যদের মধ্যে প্রলয়ের দুর্দিন নেমে আসে ।  
এক-এক আঘাতে তিনি দশটি দৈত্যের মস্তক দেহ থেকে  
বিছিন্ন করেন,  
এক-একটি ধমকে সিংহের অস্তর থেকে আকর্ষণ করে নেন  
সকল সাহস ।

তাঁর প্রহরণের আঘাতে আকাশের হৃদয় বিদীর্ঘ হয়,  
তাঁর ক্ষিপ্র আবর্তনে ধূলি-মলিন হয় গগনের মুখ ।  
তিনি যখন তাঁর ধনুকে তীর সংযোজন করেন,

তখন সিংহের পৃষ্ঠদেশ অস্থিতে আকুঞ্জিত হয়ে আসে !  
তিনি যথন তাঁর পাশ-রঙ্গু বিছুরণের জন্য প্রস্তুত হন,  
তখন ভয়ে আজ্ঞাহা তার লেজ গুটিয়ে নেয় উদরের তলে ।  
তাঁর পদযুগ ও জিনের রেকাব দেখে বিশ্ব বিস্ময় মানে,  
তাঁর তলোয়ার দেখে অভিজ্ঞতম ব্যক্তিও নিরাক্ষণ করেন  
শোণিতের ধার ।

দৈত্য-সৈন্যের বহু নামকরা যৌব্রা  
রপক্ষেত্রে নিধন হতে লাগলো ।  
এক সপ্তাহ ধরে এইভাবে দুই দল পরম্পরের মুখোমুখী হয়ে  
অবিরত সংগ্রাম করলো ।  
আঠম দিনে সম্রাট কায়কাউতস  
স্বীয় মন্ত্রকে তুলে নিলেন কেয়ানী তাজ ।  
তারপর কাঁদতে কাঁদতে বিশ্ব-প্রভুর শরণাপন্ন হয়ে  
মাটিতে মাথা রেখে বললেন,—  
ওগো, সত্য-প্রতিজ্ঞ প্রভু,  
ওগো, জল মাটির সৃষ্টিকর্তা,—  
এই নির্ভীক ও উদ্ভুত দৈত্যগণের উপরে —  
তুমি আমাকে বিজয় ও মাহাত্ম্য দান করো,  
তুমি উজ্জ্বালিত করো নতুন করে আমার রাজ্য ও সিংহসন !  
এই বলে তিনি আবার মন্ত্রকে মুক্ত ধারণ করে  
সৈন্যদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন ।  
সঙ্গে সঙ্গে রংভেরী ও দামামা বেঞ্জে উঠলো,  
চঞ্চল হয়ে উঠলো পর্বতসদৃশ অটল সৈন্যবাহিনী ।  
বাদশার আদেশে গেও ও তুস সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষকরাপে  
আবার এসে বৃহমধ্যে দাঁড়াতেই রংবাদ্য নিনাদিত হলো ।  
গর্বোদ্ধৃত শিরে এগিয়ে এলেন  
সেনাপতি গোদরঞ্জ, রাহম ও গুরগীন,  
তাঁদের আসার সঙ্গে সঙ্গে  
উড়ীন হলো আটটি কেয়ানী পতাকা ।  
এলেন বীরবর ফরহাদ, খাররাদ, বরজীন ও গেও,  
এলেন উন্নতশির বাহরাম ও গুন্তাহাম প্রমুখ বীর ।  
তাঁরা এগিয়ে চললেন শক্র-সৈন্যের দিকে,  
নব উদ্যমে আবার তাঁরা বৈরনির্যাতনে কোমর বাঁধলেন ।

সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগ আলো করে রাইলেন মহাবীর কুস্তম,  
যিনি বীরদের শোগিতে ধোত করেছেন ধরিত্বীর বুক।  
দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষার জন্য গোদরজ ও কুশওয়াদ  
অস্ত্রশস্ত্র ও রণভোরীসহ যথাস্থানে এসে দাঁড়ালেন।  
এবং দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে বাম পার্শ্ব পর্যন্ত রক্ষার জন্য  
বীরবর গেও মেষমুখের সামনে ব্যাঘের মতো টহল দিয়ে  
ফিরতে লাগলেন।

তারপর উষাকাল থেকে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত  
অবিরাম বয়ে চললো রাতের ধারা।  
সিপাহীদের চক্ষু থেকে করশা ও লজ্জার শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে  
আকাশ থেকে অবিশ্রান্ত প্রহরণের বারিবর্ষণ চললো।  
চারদিকে স্ফুরাকৃতি হয়ে উঠলো মৃতদেহ  
শুক্র ঘাস যোদ্ধাদের মগজে মিশে আর্দ্র হলো  
বজ্র নির্দেশে নিনাদিত হয়ে চললো রণবাদ্য ও দামামা,  
সূর্য কালো পর্দার অন্তরালে মুখ ঢাকলো।  
রশক্ষেত্রের যে স্থানে মাজিন্দিরান অধিপতি অবস্থান করছিল,  
একদল সৈন্যসহ কুস্তম এবার সেদিকে মুখ করলেন।  
মুহূর্তকাল বিলম্বও তাঁর অসহ্য হচ্ছিল,  
উত্তেজনায় তিনি পায়ে পা ঘষতে লাগলেন।  
তারপর একই সঙ্গে তিনি দৈত্যবাহিনী  
ও তার মদমত হস্তীদলের সম্মুখীন হলেন।  
এই সময় সম্ভাট সেনাপতিকে ডেকে বললেন,—  
হে যশবী যোদ্ধা ও বীরগণ,  
আজকে একটি দিনের জন্য আপনারা সর্বশক্তি নিয়োগ করুন,  
আপনাদের পৌরুষের বলে সংক্ষিপ্ত ও খজু করে আনুন  
ঘটনা ধারাকে।  
সম্ভাটের ডাকে সেনাপতিগণ একই সঙ্গে কোষেম্বুক্ত করলেন  
তাঁদের তলোয়ার,  
তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলো সকল সিপাহী।  
মহাবীর কুস্তম বিশু প্রভুকে স্মরণ করে  
উজ্জ্বল ফলকযুক্ত বর্ণায় হাত দিলেন।  
এবং স্বীয় সৈন্যদলসহ যুক্ষেত্রে ধূলিরাশি উঠিত করলেন,  
সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে গেলো সুর্যের মুখের রঙ।

তারপর পর্যামুক্তমে তিনি টেনে নিলেন প্রহরণ ও তলোয়ার,  
তাঁর গর্জনে বাতাস আর্তনাদ করে উঠলো।

তলোয়ারের অমোগ আঘাতে নিহত হতে লাগলো  
অগণিত শত্রু-সৈন্য।

রুস্তমের অপূর্ব বীরত্ব ও তাঁর সিংহনাদ শ্রবণ করে  
দৈত্যরাজ শ্বীয় সৈন্যবাহিনী ও হন্তীদল সন্ত্বেও প্রাণভয়ে  
ভীত হয়ে উঠলো।

কর্তিত হন্তীশতে ছেয়ে গেলো যুদ্ধের ময়দান,  
মৃত সৈন্যে ভরে উঠলো ক্রোশাস্তর।

রুস্তম এইবার দৈত্যরাজের দিকে  
মদমত্ত হন্তীর মতো ধাবিত হলেন।

এবং তাকে ডাক দিয়ে বললেন, রে দুরাচার,  
যুদ্ধের ময়দানে এবার তুই নিজেকে রক্ষা কর।

দৈত্যরাজ মহাযীরের এই ক্ষিপ্ততা দেখে  
দুরস্ত ব্যাস্তের মতো বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এলো।

রুস্তমের মুখোমুখী হয়ে সে সরোষে টেনে নিলো  
এক ভয়ানক প্রহরণ।

প্রতিপক্ষের ঔর্জত্য দেখে রুস্তমও নিলেন বর্ণা,  
এবং সোজাসুজি দৈত্যরাজকে আক্রমণ করলেন।

দৈত্যরাজ ও রুস্তম উভয়ে  
সগর্জনে একে অন্যের উপর আপত্তি হলেন।

রুস্তমের বর্ণাফলকে চোখ পড়তেই  
দৈত্যরাজের সাহস ও ক্রোধ উবে গেলো।

ওদিকে রুস্তমের ক্রোধ হয়ে উঠলো দ্঵িগুণ,  
তিনি তাঁর সিংহ-বিক্রম অব্যাহত রেখে

দৈত্যরাজের কোমরবন্ধ লক্ষ্য করে বর্ণা নিক্ষেপ করলেন,  
কিন্তু বর্ণা তার লক্ষ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ইন্দ্ৰজালের সাহায্যে মাঞ্জিদিৱান-অধিপতি  
রুস্তমের সামনে গড়িয়ে দিলো এক বিৱাট পৰ্বতচূড়।

ইৱানের সৈন্যগণ দূর থেকে এই দৃশ্য চেয়ে দেখলো,  
রুস্তম বিশ্বিত হয়ে তাঁর অমোগ অস্ত্র কাঁধে তুলে নিলেন।

সম্রাট কায়কাউস তখন সঙ্গে সঙ্গে হন্তীদল, সৈন্যদল,  
রণদুন্দুভি ও বিজয় পতাকা নিয়ে রুস্তমের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বাদশা রুস্তমকে লক্ষ্য করে বললেন,—  
 হে বীরশ্রেষ্ঠ, আর বিলস্ব কেন?  
 জবাবে রুস্তম বললেন, হে সম্ভাট এ—বড় নিরামণ যুদ্ধ,  
 এ—যুদ্ধ পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হচ্ছে, প্রজ্ঞালিত হচ্ছে ও  
 শেষ পর্যন্ত বিজিত হবে।  
 মাজিন্দিরান অধিপতি আমাকে দেখেই  
 কাঁধে তুলে নিয়েছিল বিরাট প্রহরণ।  
 তারপর অশ্ব—বল্লো উচু করে  
 শ্যেন পক্ষীর মতো তীর বেগে ধাবিত হয়েছে আমার দিকে।  
 আমিও তখন রাখ্শের গতিকে মুক্ত করেছিলাম,  
 এবং শাশিত ফলকযুক্ত বর্ণা নিক্ষেপ করেছিলাম রাজার কঠিবন্ধ  
 লক্ষ্য করে  
 ভেবেছিলাম এই মোক্ষম আঘাতেই সে ধরাশায়ী হবে,  
 কিন্তু দেখলাম, তার বদলে আমারই পথ রুক্ষ করে  
 গড়িয়ে পড়েছে এক পর্বত—চূড়া  
 সেই কঠিন পর্বত শিলা আমাকে  
 যুদ্ধের উত্থান—পতন সম্পর্কে অনবহিত করে রাখছে দীর্ঘক্ষণ ধরে।  
 এই কঠিন শিলা উত্সুক পর্বতের মতো  
 আমাকে পৌরুষ প্রদর্শনে বাধা দিচ্ছে।  
 প্রতিপক্ষের মুখোমুখী আমি হতে চাছি,  
 কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই বাধার পাহাড়।  
 বাদশার আদেশে সৈন্যদল তখন  
 সেই পর্বতশিলার নিকটবর্তী হলো।  
 শক্তিমান সেমানীবৃন্দ সমিলিতভাবে  
 শিলা অপসারণে সচেষ্ট হলো।  
 কিন্তু স্বস্থান থেকে তা এতটুকু বিচলিত হলো না,  
 তার আড়ালে সচ্ছন্দে আত্মরক্ষা করে রইলো দৈত্যরাজ।  
 এইবার রুস্তম স্বয়ং পাঞ্জা বিস্তার করে  
 ধারণ করলেন শিলা খণ্ডকে।  
 তাঁর শক্তি—প্রয়োগ দেখে  
 সৈন্যগণ বিস্ময়ে হতভস্ব হলো।  
 অবশেষে পর্বত শিলা পদাঘাতে স্থানচ্যুত করে  
 রুস্তম সগর্জনে দৈত্যবাহিনী আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন।

ইরানীয়গণ মিলিত কঠে বিশ্ব-স্থষ্টার নামোচ্চারণ করলো,  
উৎসর্গ করলো স্বর্ণ ও মণিমুক্তা রুপ্তমের মাথার উপরে ।  
রুপ্তম এবার বাদশার শিবির সম্মুখে এসে  
ইরানীয়গণকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে বললেন,  
ইন্দ্রজালের কারসাজিতে দৈত্যরাজ রক্ষা পাবে না,  
আমার কুঠারের সামনে তাকে আমি অসহায় প্রতিপন্থ করবো ।  
অপসারণ করবো সকল ইন্দ্রজালের বাধা,  
দৈত্যরাজকে নিধন করবো ।  
এই বলে রুপ্তম বিদ্যুৎগতিতে ধাবিত হলেন  
সংগ্রাম-চক্রের অভিমুখে ।  
কায়কাউস চেয়ে দেখলেন,  
মহাবীর শিলাস্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছেন ।  
প্রতিপক্ষ দৈত্যরাজের  
বিরাট ও ভীমদর্শন মূর্তি তাঁর চোখে জেগে উঠলো ।  
সম্মাটের মনে পড়লো, বিগত দিনের দুঃখ যত্নগার স্মৃতি,  
তাঁর হাদয় দীর্ঘ ও ওষ্ঠাধরে হিমনিঃশ্বাস প্রস্ফুরিত হলো ।  
রুপ্তম দৈত্যরাজের সম্মুখবর্তী হয়ে  
তাকে চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত হতে বললেন ।  
এবং পাঞ্চা বিস্তার করে তার শৃঙ্খল ধরে  
আকর্ষণ করে নিয়ে এলেন বাদশার সমীপে ।  
বাদশার আদেশে তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন রুপ্তম ।  
এইবার ইরানীয় সৈন্যগণকে প্রতিপক্ষের  
সকল সম্পদ, অস্ত্র ও মণিমুক্তা লুঠন করার আদেশ দেওয়া হলো ।  
সেনাপতির আদেশে তারা সম্পদরাজি  
স্থানে স্থানে পুঁজিভূত করে রাখলো ।  
রুপ্তম সেই সম্পদ সৈন্যবাহিনীর সবাইকে বণ্টন করে দিলেন,  
যুদ্ধে যারা অধিক দুঃখ বরণ করেছিল তারা বেশী পেলো ।  
দৈত্যদের মধ্যে যারা বশ্যতা স্থীকার করলো না,  
তাদের মস্তক কর্তিত করা হলো ।  
এইবার রুপ্তম মুখ করলেন উপাসনা-স্থলের দিকে  
এবং পবিত্র বিশ্ব-প্রভুর উদ্দেশে বললেন,—  
ওগো কর্মের স্বষ্টা পরম দয়ালু বিচারপতি,  
তুমি আমাকে দুনিয়ার সকল অভাব থেকে মুক্ত করেছ ।

তুমি আমাকে বিজয় দান করেছ দৈত্যদের উপরে,  
আমার গতায় ভাগ্যকে রাপাস্তরিত করেছ নবযৌবনে।  
এইভাবে বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসাকীর্তনের ভিতর দিয়ে  
তিনি এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন।  
অষ্টম দিনে ধনাগার উপ্যুক্ত হলো,  
ও তা থেকে অভাবগ্রস্তদের তিনি দান করে চলপেন।  
দানের পালা চললো আরো এক সপ্তাহ ধরে,  
প্রত্যেকে কুস্তমের হাত থেকে লাভ করলো তাদের আকাঙ্ক্ষিকত বস্ত  
তত্ত্বায় সপ্তাহের সূচনায় যখন দিকে দিকে শাস্তি নেমে এসেছে  
তখন তিনি সুর্যকাস্ত ও নীলকাস্ত মনি নির্মিত পান-পাত্রে  
সুরা পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন।

এইভাবে আরো এক সপ্তাহ ধরে  
মাজিন্দিরানে আনন্দের আসর অব্যাহত রইলো।  
সম্মাট কায়কাউস সিংহাসনে বসে  
কুস্তমকে সম্বোধন করে বললেন,—  
হে বিশ্বজয়ী মহবীর,  
আপনি সর্বত্র অনুপম পৌরুষের সঙ্গে আপনার যুদ্ধ-কৌশল  
প্রদর্শন করেছেন।

আপনারই সহায়তায় আমি ফিরে পেয়েছি আমার সিংহাসন,  
আপনার হৃদয়, আপনার ধর্ম ও জীবন নির্মল আলোকে  
আলোকিত হোক।

জবাবে কুস্তম বললেন, হে সম্মাট,  
সবাই নিজ নিজ ভূমিকার সাফল্য অর্জন করেছেন।  
আমার যুদ্ধ-কৌশল বহুলাঞ্ছে নির্ভর করেছে আওলাদের উপরে,  
কারণ, সেই আমাকে সর্বত্র পথ দেখিয়ে এনেছে।  
মাজিন্দিরান রাজ্যের উপর তার সকল আশা নিবন্ধ রয়েছে,  
কারণ এই প্রতিশ্রূতিই আমি তাকে দিয়েছিলাম।  
অনুগামীদের হৃদয়-রঞ্জক বাদশা যদি  
এই মহফিলে তাকে সম্মান দান করেন  
ও বাদশাহী খেলাত দ্বারা তাকে ভূষিত করে  
উপযুক্ত বশ্যতা ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেন  
তবে তা হবে সম্মাটের মাহাত্ম্যেরই পরিচায়ক।  
আওলাদকে মাজিন্দিরান রাজ্য দিয়ে

তাকে তার আধিপত্য দান করার অনুমতি দেওয়া হোক।  
আপনার এক অনুচর হিসেবে সে এই রাজ্য শাসন করবে,  
এবং নিয়মিতভাবে প্রেরণ করবে রাজস্ব।  
সামন্ত-পালক বাদশা রুস্তমের কথা শুনে  
তাঁর দিকে সম্মতিসূচক হস্ত প্রসারিত করলেন।  
এবং মাজিন্দিরানের সকল সামন্ত ও অভিজ্ঞাতদের তেকে  
আওলাদ সম্পর্কে দান করলেন কতিপয় উপদেশ।  
বললেন, তোমরা এঁর আদেশের অনুবর্তী থেকো,  
ঠিক অনুজ্ঞার বিরোধিতা কখনো করো না।  
তারপর আওলাদকে এক মূল্যবান খেলাত দান করে বললেন,  
গোপনেও এই সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করো।  
এইভাবে মাজিন্দিরান রাজ্য তাকে দান করে  
সৈন্যসামন্তসহ সম্মাট ইরানের দিকে মুখ করলেন।

## কায়কাউসের ইরান প্রত্যাবর্তন ও রুস্তমকে নীমরোজের পথে বিদায়-সংবর্ধনা

কায়কাউস সৈন্যদলসহ ধূলা উড়িয়ে  
বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে ইরানে প্রবেশ করলেন।  
জনগণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ সূর্যলোক পর্যন্ত উথিত হলো,  
নরনারী নির্বিশেষ সকলে এসে জমায়েত হলো  
বাদশার সমীপে।

ইরানের সকল নগরী উৎসব-সাজে সজ্জিত হলো  
সর্বত্র চলতে লাগলো সুরা পান ও নৃত্যগীত।  
বাদশার আগমনে ধরিব্রী যেন নবযৌবন লাভ করেছে,  
ইরানের আকাশে উদয় হয়েছে নতুন চাঁদ।  
বাদশা তাঁর গৌরব-দীপ সিংহাসনে উপবেশন করে  
সুপ্রাচীন ধনভাণ্ডারের দ্বারা উন্মুক্ত করে দিলেন।

রাজ্যের সকল দিক থেকে অভাবগ্রস্তগণ এসে  
উপবেশন করলো স্বর্ণমুদ্রার উপরে।  
রুস্তমের প্রাসাদ-দ্বারে উথিত হলো কোলাহল,  
মহাত্ম সেনাপতিগণ সেখানে এসে জমায়েত হলেন।  
তারপর সকলে রুস্তমকে নিয়ে  
হর্ষেৎফল্লিবদনে এসে উপস্থিত হলেন সিংহাসন সমীপে।  
রুস্তমের মাথায় তখন শোভা পাঞ্চে মাহাত্ম্য-সূচক তাজ ;  
এবং সিংহাসন পাশে নির্দিষ্ট হয়েছে তাঁর আসন।

রুস্তম এইবার সম্মাটের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন,  
যেন যথাশীত্ব তিনি পিতা জালের সমীপে গিয়ে  
উপস্থিত হতে পারেন।  
জবাবে সম্মাট রুস্তমের মাহাত্ম্যের উপযোগী  
এক খেলাত প্রস্তুত করার ছক্কুম দিলেন।  
সেই খেলাতে অস্তর্ভুক্ত হবে এক উন্নত সিংহাসন,  
মণিমুক্তা বিখচিত এক রাজকীয় মুকুট।  
স্বর্ণসূত্রে নির্মিত রাজকীয় অঙ্গ-সজ্জার সঙ্গে থাকবে  
মহামূল্য কুণ্ডল ও কঠহার।  
মহাবীরের এই খেলাতের অস্তর্ভুক্ত হবে একশত সুন্দর দাস বালক  
ও একশো কৃষ্ণকুস্তলা দাসী।

সোনার জিনগদীসহ একশত সৎ-কুলজীযুক্ত অশু  
ত্তির অনুগমন করবে,  
কৃষ্ণকেশরময় একশত খচরেকেও ভূষিত করা হবে স্বর্ণ-কল্পায়।  
সেইসব খচরের পিঠে বোঝাই করা হবে  
রোম দেশীয়, চীন দেশীয় এবং ইরানীয় মূল্যবান রেশমী বস্ত্র।  
শত শত থলিতে হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা ভরে  
বিচিত্র বাহনের পিঠে স্থাপন করা হবে।  
এতদ্বৃত্তীত সূর্যকান্ত মণিময় পানপাত্র, সুগন্ধি মণিনাড়ি,  
স্ফটিক-আধারে অনুপম সুগন্ধিত গোলাপজল  
বীরবরের সঙ্গে যাবে।  
সম্মাট এবার রেশমী কাপড়ের উপর  
কৃষ্ণবর্ণের মুশক দ্বারা লিখিত এক রাজ-লিপি  
বীরবরের হাতে দিলেন।  
সেই ফরমানে সম্মাট রুস্তমকে দান করলেন নতুন করে  
নীমরোজের সন্নিকটবর্তী কতিপয় রাজ্য।  
যাতে কায়কাউসের কাল অতীত হলেও  
সেইসব রাজ্যে অন্য কোন অধিপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়।  
অঙ্গপর রুস্তমের প্রশংসা উচ্চারণ করে বাদশা বললেন,  
চন্দসূর্যের দৃষ্টি চিরকাল পাতিত হোক আপনার উপরে।  
আপনার নাম শুনে মহস্তমগণের হাদয়ে আবেগের সঞ্চার হোক,  
আপনার হাদয়ে চিরবিবারাজ করক সুবিচার ও করশা।  
সম্মাটের প্রশংসা-বাক্য শুনে  
রুস্তম উঠে দাঁড়ালেন ও সিংহাসন চুম্বন করে  
যাত্রার জন্য রাজানুস্তা প্রার্থনা করলেন।  
যথাসময়ে যাত্রারভ-সূচক দামাচা নিনাদিত হলো  
নগরীর সকল নরনারী রুস্তমকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য  
নির্গত হলো গৃহ থেকে।  
দুদুভি পনব ও শানাই বাজতে লাগলো  
রুস্তম এগিয়ে চললেন নীমরোজের পথে।

আবার সম্মাটের সভা বসলো,  
ধরিত্রী আবার আইন শৃঙ্খলায় সুশোভিত হলো।  
মাজিন্দিরান থেকে ফিরে সম্মাট আবার নতুন করে

দেশের ভূমি বন্টন করলেন সামন্তদের মধ্যে ।  
তুসকে দান করলেন প্রধান সেনাপতিহের পদ,  
ইরানের সীমান্ত রক্ষার ভার পড়লো তাঁর হাতে ।  
গোদরজকে খাস ইরান ভূমির শাসন  
ও শাহী মহলের হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো ।  
তারপর আনন্দিত সুরা হাতে  
দুনিয়াকে তিনি দৃঢ়খরাপ ডাকাতের হাত থেকে অব্যাহতি দিলেন ।  
রোগ-শোক তাঁর তরবারির আঘাতে প্রাণ দিল,  
মানুষ ভূলে গেলো মৃত্যুর কথা ।  
দুনিয়ার বুক হলো সরস ও সবুজ,  
ইরাম- কাননের মতো তা সজ্জিত হয়ে উঠলো ।  
জনগণ স্ত্রাটের দানে হলো বিস্তারালী,  
সর্বত্র বাঁধা পড়লো শয়তানের হাত ।  
দিন রাত বৃক্ষের ফল ও পত্রাঞ্জি  
দেশের তাজ ও তখ্তের গুণকীর্তন করতে লাগলো ।  
সারাক্ষণ উচ্চারিত হতে লাগলো হাজারো প্রশংসা,  
জনগণ কামনা করলো বাদশার জন্য বিশৃঙ্খলার আশীর্বাদ ।  
তারা প্রার্থনা জানালো, বাদশার দানে ধরিব্রী যেন  
তার এই ফল-পুস্তি সজ্জা অব্যাহত রাখে ।  
দুনিয়ার সর্বত্র এই সংবাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো যে,  
বাদশা কায়কাউস মাজিন্দিরানের তাজ ও তখ্ত জয়  
করে এনেছেন ।  
তারা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করতে লাগলো,  
কি করে বাদশা এই মহত্ব গৌরবের অধিকারী হতে পারলেন !  
প্রজাগণ নানাবিধ উপটোকনসহ  
সারিবন্দী হয়ে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো ।  
দুনিয়া বেহেশ্তের মতো সজ্জিত ও  
পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো সর্ববিধ কান্তিখত বস্তুতে ।

তোমরা এতক্ষণ মাজিন্দিরান যুদ্ধের কথা কর্ণগত করছিলে,  
এইবার মন দিয়ে শোন হামাওরান-সংগ্রামের কাহিনী ।

---

\* বেহেশ্ত, স্বর্গ ।

## বার্বারিস্তানে কায়কাউসের কীর্তিকলাপ ও অন্যান্য কাহিনী হামাওরান অধিপতির সঙ্গে কাউসের যুদ্ধ

জ্ঞানীদের কাছ থেকে আমরা জ্ঞানতে পেরেছি,

এবং বৃক্ষ চাষীদের মুখেও শুনেছি যে,

অতঃপর বাদশা কায়কাউস

বিদেশ যাত্রার মনস্ত করলেন।

ইরান ছেড়ে তুরান ও চীনদেশ পর্যটন করে

অবশ্যে তিনি মাক্রানে এসে উপস্থিত হলেন।

এই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁকে কখনো তনুত্বাণ অঙ্গে ধারণ করতে হয়নি,

সৈন্যদেরকে কষে পরতে হয়নি তাদের কঠিবক্ষ।

সর্বত্র সামন্তগণ ও রাজ্বাগণ

কর ও রাজ্বস্ত দিয়ে সম্ভাটের অভ্যর্থনা করেছেন।

এইভাবে বাদশা কাউস তাঁর সৈন্যসামন্তসহ

যখন বার্বারিস্তানে এসে উপস্থিত হলেন,

তখন বার্বারদের রাজা আয়োজন শুরু করলেন যুদ্ধের,—

তাঁর এই প্রস্তুতি কালের রঙ পরিবর্তিত করে দিলো।

বার্বারগণ সৈন্যদল সজ্জিত করে নির্গত হলো,

বাদশার সৈন্যগণের মধ্যেও পড়ে গেল সাজ সাজ রব।

অগণিত তৌক্ষ বর্ণায় আকাশে অরণ্যের সৃষ্টি হলো,

অশু-খুরের ধূলায় অনিষ্টিত হয়ে উঠলো সূর্যের মুখ।

হস্তি ও অশু-বল্গায় অদ্র্শ্য হলো মৃতিকা,

অশুরোহীদের পদধূলিতে কঠিন পর্বত ঢাকা পড়লো।

রণবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো সৈন্যদল,

যেন জলোপরি উর্মিরাঙ্গি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

গোদৱর্জ এই দৃশ্য দেখে শিরে বেঁধে নিলেন

গিরিচূড়া সদশ বিরাট আমামা।

তূস, জও, শুন্তায়ম প্রমুখ সেনাপতিগণ

খর্বাদ, শুর্গীন ও গোও প্রমুখ মহাবীরগণ

সন্ত্রাট বাহিনীর দক্ষিণ ও বামপার্শ শোভিত করে দাঁড়ালেন,

অশুরোহীদের রণধ্বনি আকাশ বিদীর্ঘ করে চললো।

- 
- কৃকুকায় অবিবাসী অধূরিত আফ্রিকার রাজ্য বিশেষ।

দুই প্রতিপক্ষের সৈন্যগণই চিৎকারে আকাশ আলোড়িত করছে,  
তাদের পদতলে মৃত্তিকায় প্রবাহিত হচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গ।  
প্রহরণ ও তৌক্তু তীরের বর্ষণে,  
এবং অশুরোহীদের জীবন-পণ সংগ্রামে  
মনে হচ্ছে, দুনিয়া যেন ভীষণতম আজ্ঞাদাহার মল্লভূমিতে  
রাপাস্তরিত হয়েছে,  
আর কালের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঘৃণ্যতম অমঙ্গল।  
সৈন্যদের পদধূলিতে আকাশে মেঘ করে এলো,  
সেই মেঘে রণবাদ্য বজ্রখনি ও তরবারি বিদ্যুতের চমক।  
সেখানে চললো তীরের বর্ষণ ও খঞ্জরের শিলাবৃষ্টি,  
আর এই তুহিন শৈল্য ডেকে আনলো মৃত্যুকে।  
এইবার সেনাপতি গোদ্রবজ  
হাতে শক্র-বিধ্বংসী তরবারি নিয়ে  
মদমস্ত হস্তীর মতো গর্জন করে  
শক্র-সৈন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন।  
তাঁর তরবারির অমোঘ আঘাতে  
বার্বারদের মধ্যে উথিত হলো প্রলয়ের কোলাহল।  
অপর দিক থেকে ক্রোধোন্মত গেও  
তাঁর বাহর কৌশল অবারিত করে চললেন।  
এক-এক আঘাতে শক্রসৈন্যের দশটি মস্তক ধূলায় লুঁচিত  
হতে লাগলো।

মৃত্তিকার উপর দিয়ে বয়ে গেলো খুনের দরিয়া।  
সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে থেকে এই দৃশ্য দেখলেন মহাবীর তুস  
এবং শীঘ্রগতি যুদ্ধস্থানের দিকে এগিয়ে এলেন।  
তনুত্রাণে সঙ্গিত এক সহস্র যশস্বী যোদ্ধাসহ  
তিনি বর্ণা ও তীর নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন সংগ্রামে।  
দেখতে দেখতে শক্রবুহের বক্ষদেশ বিদীর্ঘ হয়ে দোলো,  
তারা প্রাণভয়ে পালাতে লাগলো দিগ্নিদিকে।  
কিয়ৎকাল পরেই মনে হলো, বার্বারদের কোন অশুরোহী  
ও বর্ণাধারী বুঝি কোন কালেই এখানে ছিল না।

বার্বারদের মধ্যে বয়স্ক ও জ্ঞানী লোকেরা  
যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে

ভগ্ন হৃদয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে  
 কায়কাউসের দরবারে এসে হাজির হলো।  
 তারা বললো, আমরা বাদশার অনুচর ও দাস,  
 বশ্যতামূলক কর আমরা বহন করে এনেছি আপনার সমীপে।  
 শৰ্মদ্বার বদলে আমরা দিছি সোনার তাল,  
 শাহী খাজাকীর সামনে আমরা নত করছি আমাদের শির।  
 বাদশা বর্ষামানদের এই আনুগত্য গ্রহণ করে তাদের ক্ষমা করলেন,  
 ও বার্ষারদের জন্য নির্দেশ করলেন নতুন আইন ও জীবন-রীতি।  
 এইভাবে সেই দেশকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে  
 এবং রাত্রিকে দিনে পরিবর্তিত করে  
 শাহী কাফেলা কোহকাফ ও প্রতিচ্যের  
 দ্বারদেশে এসে উপনীত হলো।  
 বাদশার আগমনের সংবাদ পেয়ে  
 সে-সব অঞ্চলের মানুষ কীর্তন করলো তাঁর প্রশংসা।  
 এবং তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সামন্তগণ  
 নতমন্তকে কর ও রাজস্ব বহন করে এগিয়ে এলো।  
 এখানেও বাদশা তাঁর ফরমান জারী করে  
 শান্তিতে প্রত্যাগত হলেন।  
 এইবার রাজকীয় বাহিনী এগিয়ে চললো জাবুলস্তানের দিকে,  
 বাদশা সেখানে জাল-তনয় রুম্নমের আতিথ্য গ্রহণ করবেন।  
 নীমরোজে এসে সন্ধাট একমাস বিশ্রাম নিলেন,  
 কখনো তিনি হাতে তুলে নিলেন পানপাত্র, কখনো চিতাবাঘের  
 লড়াই দেখে মনোরঞ্জন করলেন।

কিন্তু এই অবসর-বিনোদন দীর্ঘস্থায়ী হলো না,  
 শীঘ্রই গোলাপ বনে গজিয়ে উঠলো সুতীক্ষ্ণ কটক।  
 দুনিয়ার এই পরীক্ষাক্ষেত্রে মানুষের তৎফার পরিত্পত্তি নেই,  
 সম্মুক্তির পরেই সামনে আসে অবনতির গহ্বর।  
 বাদশার সামনে যখন মন্তক অবনত করছিল সারা দুনিয়া,  
 তখন আরবদের মধ্যে অবাধ্যতা মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছিল।  
 ধনবান ও খ্যাতিমান এক আরব-সর্দার

• অর্ধাং ইরানীয় সভ্যতার বিস্তার হলো সেখানে।

মিসর ও সিরিয়ায় উচু করে ধরলো বিদ্রোহের পতাকা।  
 সে মুখ ফিরিয়ে নিলো কায়কাউসের বশ্যতা থেকে,  
 এবং অনুগত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো ঘৃণাভরে।  
 বাদশার কাছে যখন খবর পৌছল,  
 এক আরব-সর্দার সম্মাটের সমকক্ষতা দাবী করছে;  
 তখন তিনি রণবাদ্য নিনাদিত করে নীমরোজ থেকে নির্গত হলেন,  
 বিজয় ও সাফল্যের আশায় স্ফীত হয়ে উঠলো তাঁর বক্ষদেশ।  
 ক্লস্টমকে এই যুক্ত্যাত্মায় সঙ্গী না করে  
 সম্মাট তাঁর হাতে তুলে দিলেন স্বীয় সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব  
 তারপর ইরানভূমির নির্বাচিত ধীরগণ সমভিব্যাহারে  
 তাঁর যুক্ত্যাত্মা শুরু হলো।  
 সৈন্যগণ ঢালচর্মে তাদের নাম লিখলো দিগন্তের পটে,  
 তাদের আবেগ অবারিত হলো নিষ্কোষিত অসির ফলকে।  
 ধরিত্বী জলে ভাসমান নৌকার মতো দূলে উঠলো,  
 সিপাহীদের পদধূলিতে মলিন হলো সূর্যের মুখ।  
 সৈন্যবাহিনী উপত্যকা ছেড়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করলো,  
 যাতে শক্র তাদের গতিবিধির খবর জানতে না পারে।  
 সেখানে তারা অগণিত নৌকা ও জলযান প্রস্তুত করে  
 সেগুলোতে আরোহণ করলো।  
 তাদেরকে অতিক্রম করতে হবে তিন হাজার মাইল পথ  
 স্থলপথেও এর দূরত্ব তার চেয়ে কম নয়।  
 চলতে চলতে সেই বাহিনী তিনটি রাজ্যের মধ্যস্থলে  
 এসে উপনীত হলো।

তাদের বাম দিকে মিসর ও ডানদিকে বার্বারদের রাজ্য,—  
 মাঝখান দিয়ে গেছে এক পথ।  
 সেই পথেই পড়ে হামাওরান রাজ্য  
 সেই রাজ্যে ও পার্শ্ববর্তী আরো দুটি রাজ্য অসংখ্য সিপাহী  
 যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করে আছে।  
 রাজ্যগুলিতে খবর পৌছলো, বাদশা কায়কাউস

• সত্ত্বত সম্মাটের রংতরী বাহিনী পারস্য উপসাগর ও লোহিতসাগর পথে না গিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে কোথাও নোঙ্গ করেছিল।

সমুদ্রপথে সৈন্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।  
 তিনটি রাজ্য সমকঠ হয়ে রণধ্বনি তুললো,  
 তাদের সৈন্যবাহিনী এসে জমায়েত হলো বার্বারিস্তানে।  
 এদিকে শাহী সৈন্য ও অশ্বারোহী দলের পদপাতে  
 নদী, মরুভূমি ও পর্বতমালা নিজেদেরকে অসহায় বোধ করনো।  
 হিস্ত ব্যাঘ ও সিংহাদির আস্তানাগুলি পড়লো শূন্য হয়ে,  
 বন্য গর্দভ মরুপথে চলবার আর পথ পেলো না।  
 পর্বত—কন্দরে ব্যাঘ ও নদীজলে মৎস্য,  
 আকাশের শূন্যতায় শক্ত—পাখা সৈগল,  
 এবং বনে বনাস্তরে হরিণাদি চতুষ্পদ  
 বাদশার সৈন্যদের পথ করে দিয়ে নিজেদের বাসস্থান  
     খুইয়ে বসলো।  
 কায়কাউসের বাহিনী স্থলপথে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে  
 পর্বত ও উপত্যকা দুনিয়া থেকে অদ্য হয়ে গেলো।  
 সর্বত্র বিচরণ করে ফিরতে লাগলো তনুত্রাণ ও কবচ,  
 বর্ণ ফলকে চমক উঠলো নক্ষত্রের দল।  
 স্বর্ণ মুকুট ও সোনালী ঢালচর্ম,  
 এবং স্কঙ্কোপরি বিলম্বিত কৃঠারই শুধু দৃষ্টিপথে  
     পতিত হতে লাগলো।  
 মনে হলো, ধরিত্রী প্রবহমান স্বর্ণস্মোতে রূপাস্তরিত হয়েছে,  
 এবং তাতে হিন্দুস্তানী তরবারির বারি বর্ষণ হচ্ছে।  
 রণ—শিঙার ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ঘ হতে লাগলো,  
 অশু—খুরের তাড়নায় ধরণীর পিঠ হয়ে গেলো কুক্ষ।  
 রণবাদ্যের নিনাদে বাবারিস্তানের ভূমি  
 সৈন্যদের বধ্যভূমিতে পরিবর্তিত হলো।  
 দুই সৈন্যবাহিনী পরম্পর নিকটবর্তী হতেই  
 যুদ্ধের উন্মাদনা ও জিঘাংসা প্রবলতর হয়ে উঠলো।  
 উভয় পক্ষেই শুরু হয়ে গেলো বৃহৎ রচনা,  
 সিপাহীদের হাত পড়লো তরবারির উপর ও তাদের মুখ থেকে  
     নির্গত হতে লাগলো ফেনা।  
 প্রথমে ইরানীয়গণ রণদামামা ও শিঙা বাজালেন,  
 এবং বৃহমধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন বাহরাম, তুস ও গুরগীন।  
 বৃহের অন্যপ্রাপ্ত থেকে এলেন

মহাবীর গোদরঞ্জ, কুশওয়াদ, গেও, শেদ্ধওশ ও ফরহাদ।  
 তাঁরা অশ্বের গ্রীবাকেশের উদ্বৃলিত করে  
 বিষাক্ত বর্ণ হাতে অগ্রসর হলেন।  
 সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠলো সারা রণভূমি,  
 সবদিক থেকে উথিত হলো রণধ্বনি ও কোলাহল  
 মনে হলো, পাথরে ও ইস্পাতে ঝন্দানানি শুরু হয়েছে,  
 আকাশ এসে মাথা কুটছে জমিনের উপর।  
 সত্রাট কায়কাউস বুহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে  
 বাহিনীর পর বাহিনী ঢালনা করেছেন।  
 যুদ্ধের মততায় মানুষের চোখ যেন অন্ধ হয়ে এসেছে,  
 পাথরের উপর হচ্ছে পাথরের বর্ষণ।  
 যেন শিলাবৃষ্টির ধারা পতন হচ্ছে সর্বত্র,  
 আর পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠছে রক্তবর্ণ লালাফুলের বাগিচা।  
 বর্ণ ফলকের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরকচে,  
 ধরণীতে বয়ে যাচ্ছে খুনের দরিয়া।  
 ইরানীয়দের তিনটি দলই স্বীয় মস্তকের পরোয়া না করে  
 শক্রসেন্যের গভীরতার মধ্যে ডুব দিতে লাগলো।  
 গেও সকলকে ডাক দিয়ে বললেন,—  
 সৈন্যগণ, তোমরা দুরাচারদের সঙ্গে সংগ্রামে তৎপর হও।  
 সেনাপতির ডাক শুনে ইরানীয় বীরগণ  
 একসঙ্গে তাদের সকল অশু উত্তেজিত করলো।  
 যুদ্ধরত সৈন্যদলের একপক্ষ যেন আজাদাহা আর অন্যপক্ষ শার্দুল;  
 একপক্ষ হস্তী অন্যপক্ষ সিংহ।  
 সকল প্রতিহিস্তা ও হিস্ত্রতা নিয়ে তারা যুদ্ধ করছে,  
 উভয় পক্ষে ছিটকে পড়ছে অগণিত শির।  
 কোলাহল উথিত হচ্ছে ও যুদ্ধ চলছে,  
 তীর ও ভল্লের বারিবর্ষণের যেন বিরাম নেই।  
 বর্ণ ফলক ও বিষাক্ত তরবারির চমক দেখে দেখে  
 যুদ্ধরত অস্ত্রধারীদের চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে।  
 ধূলার সঙ্গে এসে মিলিত হচ্ছে অন্ধকার বাদল,  
 ও তাদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চন্দসূর্যের মুখ।  
 বাতাস অঙ্গীন বর্ণফলকে আন্দোলিত বনশ্রেণীতে  
 রূপান্তরিত হয়েছে,

প্রত্যেকটি অশুরোহীর অন্তর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে  
সন্দেহ ও আশঙ্কায়।

রক্তবিন্দু ঝরে ঝরে যুদ্ধক্ষেত্রকে  
লালার বনে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।  
তীরের ইস্পাত ফলকে ও টেগলের উজ্জয়নে  
সূর্যের উজ্জ্বল মুখ হয়ে উঠলো মলিন।  
আকাশাকে অশুরোহী সৈন্যের পদধূলির কাছে উৎসর্গ করে  
বাতাস মাংসাশী পক্ষীদের নিয়ে মেতে উঠলো।  
হস্তহীন পদদৃষ্ট ও পদহীন হস্তদৃষ্ট ছাড়া  
এই বিরাট রণক্ষেত্রে আর কিছুই যেন দৃষ্টিগোচর নয়।  
সর্বত্র গড়ে উঠছে মৃতদেহের বড় বড় স্তুপ,  
সারা রণভূমি নররক্তে ভিজে স্যাঁৎসেতে হয়ে গেছে।  
অবশেষে দেখা গেল যুক্তে ইরানীয়দের তিন শত্রুরাজাই  
পরাণ্ত হয়েছে,

তিনজনই বাদশার কাছে পাঠিয়েছে প্রাণরক্ষার আবেদন।

প্রথমে হামাওরানের অধিপতি  
তরবারি ও ভারী প্রহরণ পরিত্যাগ করে  
ভগুচিত্বে বাদশার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলো,  
সে বুঝতে পারলো আজকার দিন সত্যই অমঙ্গলের দিন।  
সে প্রতিষ্ঠা করলো, হামাওরান রাজ্য  
প্রচুর করদানে চিরদিনের জন্য ইরানের বশ্যতা স্থীকার করে নিবে  
তারপর সে অশু, অস্ত্র, তখ্ত ও তাজ  
বাদশা কাউসের সমীপে যথারীতি নিবেদন করলো।  
তারপর বার্বার ও মিসর-সিরিয়ার অধিপতিদ্বয়  
দৃতের মধ্যস্থতায় সম্ভাটের নিকট সন্ধি ও বশ্যতার  
প্রস্তাব পাঠালো।

বাদশা কাউস দৃতের মুখে সব শুনে নিয়ে  
জবাব দিয়ে পাঠালেন : —

তোমরা সরাসরি আমার শরণাপন্ন হও  
এবং জীবনে কখনো তাজ তখ্তের বাসনা করো না।  
অতঃপর সম্ভাট সামন্তগণসহ  
হষ্টচিত্তে স্বীয় শিবিরে ফিরে এলেন।  
যথাসময়ে হামাওরান রাজ্য থেকে

বশ্যতার নির্দর্শনস্বরূপ সম্পদাদি ও বিপুল  
অস্ত্রশস্ত্র এসে হাজির হলো।

হামাওরানের দৃত তার সঙ্গে আনলো মূল্যবান মণিমুক্তা ও বাণী,  
তাতে বলা হলো, হে ক্ষমাপ্রবণ সম্ভাট,  
আমরা সবাই আপনার পদধূলির সমান ও দাস,  
যদিও আমরা অভিজ্ঞাত তবু আপনার সামনে সাধারণের অনুকূল।  
আপনি চিরজীবী ও চিরসূখী হোন,  
আপনার সামনে শক্তর শির ও ভাগ্য অবনত হোক।  
এই কথা জানিয়ে দৃত মৃত্তিকা চুম্বন করলো,  
ও সেনাপতি তুসের সমীপে এসে দণ্ডায়মান হলো।  
এবং কমবেশী অন্য সবাইকেও উপহারাদি দান করলো।

## କାୟକାଉସ କର୍ତ୍ତକ ହାମାଓରାନ-ରାଜେର କନ୍ୟା ସଓଦାବାର ପାଣିଗ୍ରହଣେର ଆକାଙ୍କ୍ଷା

ଅତ୍ୟପର ଏକ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା ଏସେ ସଞ୍ଚାରି କାୟକାଉସକେ ଜାନାଲୋ,  
ହାମାଓରାନ-ରାଜେର ମହଲେ ତାଁର ଏକ କନ୍ୟା ଆଛେ ।  
ସେଇ କନ୍ୟା ଦେଖିତେ ଅପରାପ ସୁନ୍ଦରୀ,  
ସୁଦୀର୍ଘ କଂକୁନ୍ତଲେ ସମାଜ୍ୟ ତାଁର ମନ୍ତ୍ରକ,  
ତିନି ଉନ୍ନତ ଦେହା, ତାଁର କେଶରାଜି ଅମୋଘ ପାଶେର ମତୋ,  
ତାଁର ରସନା ଯେନ ତରବାରି, ତାଁର ଓଷ୍ଠାଧର ମଧୁକ୍ଷରା ।  
ରାଜକନ୍ୟାର ସୁଦୀର୍ଘ କେଶକଳାପ ମୁତ୍ତିକା ସ୍ପର୍ଶ କରେ,  
ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୁର ଦିକ ଥିକେ ବାରେ ପଡ଼ୁକ ତାଁର ଉପର ଆଶୀର୍ବଦୀ ।  
ତାଁର ଦେହତନୁ ଆନନ୍ଦେର ଅପରାପ ପ୍ରତିମା,  
ତିନି ଯେନ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକିତ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମାସ ।  
ବାଦଶା ଛାଡ଼ା ତାଁର ଜୁଡ଼ି ଆର କେଉ ନେଇ ।  
ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର-ଦମ୍ପତ୍ତି ବାଦଶାରଇ ଉପଯୋଗୀ ।  
ବର୍ଣନା ଶୁଣେ କାୟକାଉସେର ହଦୟ ବିଚଲିତ ହଲୋ,  
ତିନି ବଲଲେନ, ଶୁଣ୍ଠର ତୋମାର ବିଚାର ସୁନ୍ଧର ଓ କଲ୍ୟାଣକର ।  
ଆମି ତାର ପିତାର କାହେ ତାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ,  
ଆମାର ମନ୍ଦିରେଇ ମାନବେ ଏହି ପ୍ରତିମାକେ ।  
ସଞ୍ଚାର ତଥନ ତାଁର ପାତ୍ରମିତ୍ରଦେର ମଧ୍ୟେ ଥିକେ  
ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ମନୋନୀତ କରଲେନ,  
ଏବଂ ସେଇ ସଦୃଶଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ  
ହାମାଓରାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରାର ଲୁକୁମ ଦିଯେ ବଲଲେନ,—  
ତୁମି ସେଥାନେ ଆମାର ପ୍ରତ୍ତାବ ନିଯେ ଗମନ କରବେ  
ଓ ତୋମାର ବାକ-କୁଶଳତାର ମଧ୍ୟେ ଥିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ  
ବେର କରେ ଆନବେ ଆମାଦେର ବାହ୍ନିତ କଥା ।  
ହାମାଓରାନ-ରାଜକେ ବଲବେ, ଦୂନିଯାର ଅଭିଜାତତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ  
ଯାଁର ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଅଭିଲାଷ ପୋଷଣ କରେନ ଆମି ସେଇ ଲୋକ ।  
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମାର ମୁକୁଟ ଥିକେ ଲାଭ କରେ ଆଲୋ,  
ଧରିତ୍ରୀ ଆମାରଇ ସିଂହାସନେର ପଦଚତୁଟ୍ଟୟ ବକ୍ଷେ ଧାରଣ କରେ ଗୌରବାନ୍ତିତା ।  
ଆମାର ଆଶ୍ରଯେର ଛାଯାଯ ଯାର ବାସ,  
ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ହାନି କଥନୋ ହୟ ନା ।  
ସେଇ ଆମିଇ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମୀୟତାର ବନ୍ଧନେ ବାଁଧା ପଡ଼ିତେ ଚାଇ,

আমাদের সন্ধিকেও তা দৃঢ়তর করবে।  
আপনার পুরী আলোকিত করে বিরাজ করছেন যে কন্যা  
আমি শুনেছি, তিনি সর্বদিক থেকে আমার পাশে বসার যোগ্য।  
তিনি পরমা সুন্দরী ও পবিত্র দেহা,  
সকল নগরী ও জনসমাবেশে তিনি সমভাবে প্রশংসিত।  
ভেবে দেখুন, কোবাদ-তনয়কে জামাতারূপে পাওয়া আপনার কাম্য কি না?  
মনে করুন, স্বয়ং সূর্য আপনার দ্বারে প্রার্থী হয়েছেন।  
সম্মাটের বাণী নিয়ে দৃত যথাসময়ে হামাওরান-রাজ সমীপে উপস্থিত হয়ে  
তার রসনার ঐশ্বর্যকে অবারিত করলো।  
আবেগ-তপ্ত হৃদয়ে বাগ্নিতার সঙ্গে  
সে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করে চললো সম্মাটের বাণী।  
প্রথমে সে কায়কাউসের দিক থেকে রাজাকে জানালো যথাযোগ্য অভিবাদন,  
তারপর নিবেদন করলো বৈবাহিক প্রস্তাবের কথা।  
কিন্তু সম্মাটের এই প্রস্তাব রাজার মনকে বিষণ্ণ করে তুললো,  
দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে এলো তাঁর মস্তক।  
তিনি মনে মনে বললেন, কায়কাউস দেশাধিপতি,  
বিজয়ী ও ফরমান দাতা।  
কিন্তু সওদাবা আমার একমাত্র কন্যা,  
সে আমার সব চাইতে প্রিয় ও সর্বাধিক মূল্যবান সামগ্ৰী।  
অথচ তাই বলে দৃতকে বিমুখ কিংবা অপমানিত করে ফিরিয়েও দিতে পারি না,  
কারণ, তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।  
অপর পক্ষে আমার চক্রের জ্যোতিঃকে দৃতের হাতে তুলে দিলে  
কন্যার অদৰ্শনে আমার চক্রবৃত্ত অঙ্ক হয়ে যাবে।  
তবে কি মনের দৃঢ়ত্বকে মনের মধ্যেই  
ঘূম পাড়িয়ে গোপন রাখতে হয়?

এই নিয়ে রাজার চিন্তার অবধি নেই,  
শেষ পর্যন্ত এক জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে তিনি তাঁর সমস্যা প্রকটিত করলেন।  
বললেন, এই চিন্তায় আদি-অন্ত আমি খুঁজে পাচ্ছি না।  
আমার দুটি মাত্র মূল্যবান বস্তু আছে,  
সে দুটি ছাড়া আর তৃতীয় কোন বস্তু আমার নেই।  
আমার রাজকীয় ক্ষমতা তন্মধ্যে একটি,  
অন্যটি আমার স্থান যে আমার অন্তরের সজ্জা।

ইরান-সম্মিলন যদি তাকেই আমার কাছ থেকে ছিনয়ে নেন,  
তবে সেই সঙ্গে আমার আত্মাও র্ধাড়া ছাড়া হবে।  
এই বলে রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সওদাবাকে ডেকে পাঠালেন,  
ও তার সামনে কায়কাউস সম্পর্কে উচ্চারণ করলেন কতিপয় বাক্য।  
তাকে বললেন, দিগ্নিজয়ী, দুনিয়াপত্তি  
ও প্রভৃতি ঐশ্বরের অধিকারী সম্মাটের সমীপ থেকে  
এক বাকপটু দূতের আগমন হয়েছে,  
সে সঙ্গে এনেছে এক পরিপাটি লিপিকা।  
সে আমার অস্তর থেকে হরণ করতে চাইছে আমার স্বপ্ন ও সুখ।  
এখন তোমার অভিমত আমি জানতে চাই,  
এ-সম্পর্কে তোমার কিছু বলার থাকলে বল।  
সওদাবা জ্বাবে বললো, যদি কোন উপায় না থাকে  
তবে, অনর্থক দুঃখ করে লাভ কি ?  
যে ব্যক্তি দুনিয়ার বাদশা, জল-স্তুলে যার আধিপত্য,  
তার সঙ্গে তো আত্মীয়তায় দোষ দেখি না,  
আনন্দকে কে রূপান্তরিত করতে চায় দুঃখে ?  
হ্যাওরান-রাজ বুঝতে পারলেন,  
সওদাবার কাছে এ সমস্যা গুরুতর নয়।  
কায়কাউসের ঘোরাশি হবে তার নিজেরই ক্ষতি,  
এবং তা কালেরই আবর্তনের সফল পরিণাম।  
সূতরাং যে কোন অস্তপূর্চারিনী কন্যার পক্ষে তিনি বরণীয়।  
রাজা দৃতকে কাছে ডেকে পাঠালেন,  
ও তাকে বসতে দিলেন তাঁর সামনে উচ্চাসনে  
তারপর তৎকালীন রীতি ও আইন অনুযায়ী  
তিনি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন।  
গোটা সপ্তাহ ধরে হ্যাওরানের অভিজাতদের নিয়ে  
তিনি সম্পূর্ণ করলেন বিবাহের আয়োজন।  
মনঃক্ষণ রাজা তিনশত দাসী  
ও চালিশটি শিবিকা প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন।  
রাজাদেশে এক সহস্র অশু ও অশুতর, এক সহস্র উষ্ট,  
প্রচুর কৌশিক বস্ত্র ও শর্পমুদ্রা এনে জড়ো করা হলো।  
শিবিকায় মূল্যবান ঝালরযুক্ত রেশমী বস্ত্র হলো দোদল্যমান।  
প্রস্তুত হলো দলে দলে যাত্রাকারী সৈন্যদল।

নতুন চাঁদের প্রথম দিনে সজ্জিত শিবিকার  
সামনে পেছনে চললো নানারূপ সম্পদের উপটোকন।  
যাত্রীদল উৎসবের আনন্দ নিয়ে এগিয়ে চললো,  
মনে হলো, বাতাস যেন মাটির উপর ছিটিয়ে চলেছে রঞ্জিনী লালা ফুল।  
যাত্রীদল বাদশা কাউসের সন্নিকটবর্তী হলে  
তিনি তার সমারোহ দেখে মুগ্ধ হলেন।  
তিনি দেখলেন, শিবিকা থেকে নতুন চাঁদের উদয় হয়েছে,  
বাদশার নতুন প্রাসাদ আলোকিত করতে এসেছেন রাজকন্যা।  
তাঁর কালো কেশরাজি গোলাপী আভাযুক্ত মুখ প্রসুনের উপর এসে পড়েছে,  
আর কর্ণকুণ্ডল সেই সুগন্ধী ফুলের লোভে হয়ে উঠেছে অমরের মতো আকুল।  
তাঁর দুই গাল দুটি সূর্যকান্তমণি, দুনয়ন আধো নিমীলিত নার্গিস,  
তাঁর কর্ণমূল স্পর্শ করে প্রলম্বিত রয়েছে দুটি অপরাপ কাকুল-গুচ্ছ,  
তাঁর দুই ভূকু দুটি সুবাঙ্গি ধনু,  
যাদের থেকে নিষ্কিপ্ত তীরে বিন্দ হয় পুরুষের বৃক।  
কায়কাউস সওদাবাকে দেখে বিশ্ময়ে অভিভূত হলেন,  
ক্রতৃজ্ঞতার সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করলেন বিশ্ব-প্রভুর নাম।  
তারপর সম্মাট জ্ঞানী ও প্রবুদ্ধদের এক সভা ঢেকে  
ধর্ম ও রীতি অনুযায়ী  
সওদাবাকে পত্তাইত্বে বরণ করে নিলেন।  
বাদশা এবার নিভৃতে প্রশ্ন করলেন সওদাবাকে,  
বললেন, প্রিয়তমা, এই স্বর্ণপুরী কি তোমার মনের মতো হয়েছে?

## হামাওরান-রাজ কায়কাউসকে বন্দী করলেন

হামাওরান-রাজ বিষণ্ণ-চিত্তে  
নানারূপ উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।  
সাত দিন গত হলে অষ্টম দিনের প্রভাতে  
সম্মাট সমীপে এক দৃতের আগমন হলো।  
সে হামাওরান-রাজের বার্তা  
সম্মাটের কাছে নিবেদন করে বললো,  
রাজা বলেছেন, বাদশা যদি সম্মানিত অতিথি রাপে  
সানন্দে আমার পূরীতে আগমন করেন  
তবে হামাওরান নগরী সম্মাটের উচু ব্যক্তিত্ব সন্দর্শনে  
নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করবে।  
রাজার এই ষড়যন্ত্র ছিল চমৎকার,  
ভিতরের অমঙ্গলকে সেখানে বাহ্যিক সৌজন্য দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।  
কিন্তু সওদাবা পিতার অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন,  
তিনি দেখলেন, উৎসবের আনন্দের নীচে গোপন রয়েছে নিদারণ বিদ্রুম।  
সওদাবা সম্মাটকে বললেন, মেহমান রাপে  
সেখানে যাওয়া আপনার উচিত হবে বলে মনে হয় না।  
কারণ উৎসবের ছলে যুদ্ধ ও হাতাহাতি  
কারো কাম্য হতে পারে না।  
কিন্তু সম্মাট সওদাবার কথায় কান দিলেন না।  
তিনি যথাসময়ে বীরগণ সমভিব্যাহারে  
হামাওরান-রাজের অতিথি গৃহণের জন্য যাত্রা করলেন।  
পথে শাহ নামে এক নগরী পড়লো,  
সেই নগরী উৎসব-সাজে সজ্জিত হয়ে বাদশাকে জানালো অভিনন্দন।  
বাদশার উপবেশনের জন্য সেখানে সাজানো হলো আসন,  
গোটা নগরী উৎসব-সাজে ঝলমল করে উঠলো।  
উচ্চশির সম্মাট শাহায় প্রবেশ করা মাত্র  
সেখানকার সকল অধিবাসী সম্ভর্মে অবনত করলো তাদের মস্তক।  
তারা সম্মাটের পথে মুক্তা ও জাফ্রান ছিটিয়ে দিলো,  
দীনার ও অম্বরের বারিবর্ষণ করলো।  
নগরীর স্থানে স্থানে বসলো নাচ ও গানের আসর।  
হামাওরান-রাজ সম্মাটকে স্বীয় রাজ্যে উপস্থিত দেখে

পাত্রমিত্রসহ পদব্রজে তাঁর প্রত্যন্দগমনের জন্য এগিয়ে এলেন।  
রাজ্বার প্রাসাদ থেকে নগরীর সিংহদ্বার পর্যন্ত  
সূর্যকান্ত মণি ও স্বর্ণের বারিবর্ষণ চললো।  
প্রাসাদ—কক্ষে স্বর্ণময় সিংহাসন প্রস্তুত করে রাখা হলো  
সম্ভাট তাতে সানন্দে উপবেশন করলেন,  
এক সপ্তাহ ধরে পান—পাত্র হাতে  
পুলকানন্দে নিঘণ্ডু রাইলেন সম্ভাট।  
এই সময় সারাক্ষণ ধরে হামাওরান—রাজ্ব  
ভৃত্যের মতো বাদশার সামনে দণ্ডবৎ রাইলেন।  
কটিবজ্জ্বল বৈধে সেন্যগণ প্রস্তুত রাইলো দৃঢ়ে,  
ইরানীয় বাহিনীর মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত রাইলো শত শত সুন্দরী দাসী।  
এইভাবে সম্ভাট অচিরেই কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থেকে  
সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহের সূচনায়  
সহস্রা শতগণ মাথা উঁচু করলো।  
পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বার্বারিস্তান থেকে  
আগেই যাত্রা শুরু করেছিল এক বিরাট সেনাবাহিনী।  
এইবার তাদেরকে নগরীর দ্বারপাত্তে উপস্থিত দেখে  
হামাওরান—রাজ্বের আনন্দের অবধি রাইলো না।  
রাত্রির অন্ধকার ঘন হলে সহসা রণবাদ্য নিনাদিত হলো,  
সম্ভাট—বাহিনী প্রস্তুত হওয়ার এতটুকু অবসর পেলো না।  
শক্র অতক্রিত আক্রমণে সম্ভাট কায়কাউস,  
গোও, তুস ও গোদৱজসহ বন্দী হয়ে পড়লেন।  
গুরগীন ও অন্যান্য মহারথিগণও  
ঠিক তেমনিভাবেই ধ্ত হয়ে কঠিন শৃতখলে আবদ্ধ হলেন।  
মুহূর্তমধ্যে শাহী সিংহাসনের গৌরব—রবি অস্তমিত হলো।

গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন এক বৃক্ষিমান ব্যক্তি কি সুন্দর বলেছেন,—  
হে কীর্তিমান, ঘটনার অন্তরে কি প্রচন্দ রয়েছে তা তুমি জান না।  
তুমি জানো না, তোমার নির্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কতটুকু শোশিত।  
আর সেই শোশিতের সঙ্গে বিশ্ব—প্রভুর করশাই বা কতটুকু সম্প্রস্তু  
একমাত্র আকাশের আবর্তনই একদিন প্রকাশ করতে পারে এসব কথা।

শক্রতা থেকে হয়তো সেদিন জন্ম নিবে এমন এক রহস্য  
অবলীলায় যা অতিক্রম করে যাবে অপমানের দ্বারদেশ।  
তাই ভাগ্যের করুণা যদি তোমার কাম্য হয়,  
তবে লাভ-ক্ষতির তাৎপর্য তোমার পরীক্ষা করে দেখা উচিত।  
অমঙ্গলের আকর এই পৃথিবী —  
কিন্তু তার অন্ধকার বায়ুর আবর্ত প্রতিনিয়তই স্থান পরিবর্তন করছে।  
কায়কাউস বন্দী হলে পর  
শক্রদল ভাবতে লাগলো, কোথায় তাঁকে রাখা নিরাপদ।  
হির হলো, জলের গভীরতা থেকে উঠে এসেছে  
যে মেঘচূর্ণী পাহাড়  
সেই পাহাড়ের উপর দিগন্তকে বুকে ধারণ করে  
প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে দুর্গ  
সেই দুর্গে কায়কাউস ও তার সঙ্গীদল —  
গেও, গোদরজ, তুস প্রমুখ বীরগণকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।  
তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য ইরানীয় সেনাপতিগণও  
সেই কঠিন দুর্গেই দুরহ শৃঙ্খলে আবক্ষ হয়ে থাকবে।  
দুর্গের পাহাড় নিযুক্ত হলো  
এক হাজার অস্ত্রধারী বীর।  
এইবার বাদশার শিবিরকে ছেড়ে দেওয়া হলো লুঠনের মুখে,  
বাদশার তাজ, তথ্ত ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্ৰী দেখতে  
দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেলো।

সর্বশেষে সম্মাটের অঙ্গপুর অধিকার করে  
সেখান থেকে সওদাবাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো অন্যত্র।  
দুই দল দাসী একটি আবরণীযুক্ত শিলিকাসহ  
সওদাবার সমাপ্তে এসে হাজির হলো।  
সওদাবা নারীগণকে এইভাবে আসতে দেখে  
মনোদৃঢ়থে স্বীয় সম্মাঞ্জীর পরিধেয় টান দিয়ে ছিড়ে ফেললেন।  
এবং দাসিগণকে বললেন, এইভাবে দৃঢ় দেওয়া ও বন্দী করার মধ্যে  
না আছে পৌরুষ না প্রশংসা।  
বন্দীই যদি করতে হতো তবে যুদ্ধের দিনেই কেন করা হলো না  
তখন সম্মাটের পরিধেয় ছিল তনুত্বাণ ও তাঁর আসন ছিল অশু ?  
যে-গোড়, গোদরঞ্জ ও তুসের মতো সেনাপতির তুর্যনিন্দাদে  
তোমাদের বক্ষ বিদীর্ণ হতো,

তাদের জন্য বুঝি আজ গুপ্ত ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়েছে স্বর্ণময় শিকলে  
বস্তুত্বের প্রসারিত হাত এমনি করেই বুঝি নির্মমভাবে টেনে নিতে হয় ?  
অতঃপর সওদাবা দাসিগণের কাছে  
স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করে বললেন,—  
আমি কায়কাউসের সঙ্গে বিছেদ চাই না,  
তিনি যদি মরণের পথেও গিয়ে থাকেন তবুও আমি তাঁর অনুষঙ্গী হবো।  
যদি কায়কাউসকে বন্দী করা হয়ে থাকে,  
তবে কর্তিত করা হোক বিনাপরাধে আমারও শির।  
দাসিগণ পিতাকে সওদাবার প্রস্তাব জানালে  
দুশ্চিন্তায় তাঁর মন্ত্রিক ভারাক্রান্ত হলো।  
কিন্তু অবশ্যে বেদনার শোণিতে হস্ত ধোত করে  
তিনি কন্যাকে প্রাচীরবেষ্টিত সেই দুগেই প্রেরণ করলেন।  
সওদাবা বেদনাহত বাদশার সমীপে গিয়ে উপবেশন করলে পর  
দাসিগণ চোখের জল মুছতে মুছতে সেখান থেকে ফিরে এলো।

## ইরান অভিযুক্তে আফ্রাসিয়াবের অভিযান

রাজ্যশুর কায়কাউস এইভাবে বন্দী হয়ে পড়লে  
তাঁর সৈন্যগণ নিরাশ হয়ে ইরানের দিকে মুখ করলো।  
জলযানে কিংবা নৌকায়  
মরুভূমির পথে কিংবা উপত্যকা ধরে —  
যে যে-ভাবে পারলো ফিরে চললো স্বদেশের দিকে।  
ইরানে প্রত্যাবর্তন করে  
তারা সারা রাজ্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।  
সেখানে কৃষিকার্য অবহেলিত হলো, উন্মূলিত হলো বিরাটকায় দেবদান্ত,  
সম্ভাটের সিংহসন শূন্য।  
শাহীত্বতে কাউকে না দেখে  
বহুলোক শিরে রাজ-মুকুট ধারণ করার স্বপ্ন দেখতে লাগলো।  
তুর্কীগণ ও বৰ্ষাধারিগণ<sup>১</sup> চারদিক থেকে  
বিরাট সৈন্যদল নিয়ে অভিযান করলো ইরানের দিকে।  
আহার নিদ্রা তুচ্ছ করে উঠে দাঁড়ালেন।  
ইরানের সর্বস্থান থেকে উথিত হলো কোলাহল,  
দেখতে দেখতে শাস্তি ও বিশ্রাস্তি যুক্তে ক্লান্তরিত হয়ে গেলো।  
আফ্রাসিয়াব কঠিদেশ বঙ্গ করে সরোষে  
আরবীয়গণের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন।  
শক্র নির্যাতন কামনায় তিনি প্রহরণের উপর হাত রাখতেই  
তাঁর অগণিত সৈন্য শক্রনিধিনে তৎপর হয়ে উঠলো।  
তারা একত্রিত হয়ে এক সঙ্গে  
পর্বত-সদৃশ প্রতিপক্ষের উপর আপত্তি হলো।  
সৈন্যদের তরবারির আঘাতে  
শত শত শক্রের শির ধূলায় লুটিয়ে পড়তে লাগলো।  
অশু-ক্ষুরের আঘাতে নিহত সৈন্যদের দেহ  
হীরকের স্তোতে সূর্যকান্ত মণির মতো ভাসমান হলো।  
আফ্রাসিয়াবের বীর সিপাহীগণের প্রহরণ ও তরবারির সামনে  
শীঘ্ৰই শক্র-সৈন্যে ভাস্তন দেখা দিলো।

---

আরবীয়গণের দিকে ইঙিত।

তারা দুর্ভ ব্যাপ্তির সামনে থেকে  
মেষদলের মতো পলায়নপর হাতে লাগলো।  
এইভাবে তিন মাস ধরে আফসিয়াব  
ইরানের রাজমুকুটের জন্য প্রাণপণ লড়াই করলেন।  
অবশ্যে চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্যে  
আরবীয়গণের সকল আশা-আকাশকা নির্মূল হয়ে গেলো।  
এইবার আফসিয়াব তাঁর সৈন্যদল ইরানীয়দের বিরুদ্ধে  
পরিচালনা করার সুযোগ পেলেন,  
দেখতে দেখতে ইরানের অসংখ্য নারী, পুরুষ ও বালক  
আফসিয়াবের হাতে বন্দী হয়ে পড়লো।

দুদিনের এই সরাইখানায় এইভাবে স্থার্থপরতা ও লোভ  
দৃঢ় ও বেদনা বহন করে আনে ;  
পরিণামের ভালোমন্দকে তুচ্ছ করে দিয়ে  
শবদেহে পূর্ণ করে তোলে সময়ের কুল-উপকুল।  
ইরানীয় সৈন্যগণ শক্তির হাতে মার খেয়ে রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত  
হয়ে পড়তে লাগলো,  
তাদের চোখে অঙ্ককার হয়ে এলো দুনিয়া।  
এমন সময় দুই দল ইরানীয় সিপাহী  
জাল-পুত্র রুস্তমের শরণাপন্ন হতে মনস্ত করলো।  
তারা বললো, আমরা বিপদ থেকে তাঁরই আশ্রয়ে প্রত্যাবৃত্ত হব,  
কারণ, কায়কাউসের শাহী গৌরব আজ অস্তিত্ব।  
ভাগ্য আমাদের উপর বিমুখ  
আমাদের সামনে এখন কঠিন বিপদের দিন,  
আফসোস ! ইরানভূমি আজ উঁজাড় হয়ে গেছে,  
সেখানে আজ সর্বত্র গড়ে উঠছে হিংস্র পশুদলের আস্তানা।  
সকল স্থান শক্ত-সৈন্যের কবলিত,  
বাদশার মহল দুশ্মনের অধিকারে চলে গেছে।  
চারদিকে শুধুই বিপদ ও অমঙ্গল,  
আজদাহার ভীষণ থাবা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে সর্বত্র।  
এখন উপায় শুধু রুস্তম,  
মন থেকে সকল আশকা দূরীভূত করে  
তাঁকেই আজ সকল্পবন্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে হবে,

এবং ইরানভূমিকে রক্ষা করতে হবে তুরানীয়দের হাত থেকে।  
 তাঁকেই স্থির হয়ে সিংহাসনে বসতে হবে,  
 তিনিই হবেন আমাদের সশ্রাট, আমরা তাঁর দাস।  
 তা না হলে বন্দী বালক ও নারীগণ  
 দৈত্যদের হাতে ছিন্নভিন্ন হবে।  
 আমরা অবশ্যই সে-লোকের শরণ নিব যাকে সিংহী সন্যদান করেছে,  
 আমাদের এই দুঃখের দিনে তিনিই হবেন আমাদের সহায়।  
 এই বলে তাঁরা এক বুদ্ধিমান লোককে দূত করে  
 কুস্তমের কাছে প্রেরণ করলো।  
 দূত সাবধানে দূর পথ অতিক্রম করে  
 বীর প্রবর কুস্তমের সমীপে এসে উপস্থিত হলো।  
 সে কুস্তমের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলো ইরানের দুরবশ্ব,  
 সে-কথা শুনে বিচলিত হলো; কুস্তমের বীর-হৃদয়।  
 তাঁর দুচোখ থেকে ঝারে পড়তে লাগলো অশ্রুর ধারা,  
 ও হৃদয়-মন সুতীব্র বেদনায় কবলিত হলো।  
 কুস্তম বললেন, আমি সৈন্যদলসহ  
 শত্রনির্ধন কামনায় কোমর বাঁধলাম।  
 কায়কাউসের সঙ্কান নিয়ে  
 আমি অবশ্যই ইরানকে তুরানীয়দের হাত থেকে মুক্ত করবো।  
 এই বলে তিনি সর্বত্র দূত প্রেরণ করলেন,  
 যথাসময়ে সকল জনপদ ও নগরী থেকে সৈন্যগণ আসতে লাগলো।  
 জ্বাবুল, কাবুল ও হিন্দুস্থান থেকে  
 সৈন্যদল ও বীরবৃন্দ এসে নীমরোজে জমায়েত হতে লাগলো।  
 রণত্র্য ও হিন্দী দামামা বেজে উঠলো,  
 বিপুল পরিসর স্থান জুড়ে আবেগ-তপ্ত সৈন্যবাহিনী উচ্ছ্বসিত হলো।  
 তাদের হৃদয়ে জন্ম নিলো যে স্ফুলিঙ্গ,  
 দেখতে দেখতে তা বায়ু তাড়নে রূপান্তরিত হলো লেলিহান অগ্নি-শিখায়।

হিন্দুস্থানের পক্ষনদ এলাকা সন্তুষ্টঃ ইরানের মিত্রাঞ্জ ছিল;

## হামাওরান-রাজের কাছে রুস্তমের বাত্তা প্রেরণ

রুস্তম এক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে গোপনে  
বাদশা কায়কাউসের সমীপে প্রেরণ করলেন।  
বাণী দিলেন, আমি এক বিরাট সৈন্যদলসহ  
হামাওরান-রাজের সঙ্গে যুদ্ধার্থ এগিয়ে আসছি।  
যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে না দিই,  
ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিশ্বাম গ্রহণ করবো না।  
আপনি নিশ্চিত থাকুন, দুঃখ করবেন না,  
আমি শীঘ্ৰই এসে উপস্থিত হচ্ছি।  
তাৰপৰ হামাওরান-রাজের কাছে  
একজন সামষ্টকে পাঠাবাৰ আয়োজন কৰা হলো।  
রুস্তম রাজাৰ কাছে ভৎসনা ও ধিক্কারপূৰ্ণ এক লিপিকা লিখলেন,  
তাতে প্ৰহৱণ, তৱবাৰি ও রণক্ষেত্ৰে উল্লেখ রাখলো।  
প্ৰথমেই স্মৰণ কৰা হলো বিশ্ব-স্মষ্টার মহিমা,  
তৎপৰ তাতে জ্ঞান ও বদান্যতায় সিংহ-দ্বাৰ উন্মুক্ত কৰা হলো।  
বলা হলো, হে হামাওরানেৰ অধীশ্বৰ,  
তুমি অবশ্যই নীচকূলোন্তৰ।  
তোমাৰ নীচতাৰ প্ৰমাণ, বিদ্ৰোহীদেৱ সঙ্গে তোমাৰ ষড়যন্ত্ৰ।  
নিৰ্বোধৰে মতো তুমি প্ৰাধান্য লাভেৰ চেষ্টায় রাত হয়েছ,  
তুমি অতি অধম কূল-সন্তুত, তুমি কুকুৰেৰ চেয়েও ঘণ্ট।  
সীয় কৃতকৰ্মেৰ জন্য তোমাৰ লজ্জিত হওয়া উচিত,  
হিম ও উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য তুমি জান না।  
তুমি কোন ন্যায়ধৰ্মেৰ বশে বাদশাৰ উপৰ গুপ্ত আক্ৰমণ পৰিচালনা কৰেছ?  
কোন নীতিৰ বশবতী হয়ে মিত্ৰতাৰ পৰিবেশে আনয়ন কৰেছ শক্ততা?  
তুমি পৌৰুষেৰ সঙ্গে রণক্ষেত্ৰে অবতীৰ্ণ হওনি,  
আগমন কৰোনি সাহসী নক্রেৰ মতো।  
প্ৰতিহিংসায় যাৰ অস্তৱ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে,  
সে কখনো সংগ্ৰামে গুপ্ত-ঘাঁটি রচনা কৰে না।  
তোমাকে জানিয়ে দিছি, তোমাৰ এই প্ৰাধান্য লাভেৰ প্ৰয়াস দুৱাৰ  
তুমি নিজেৰ অধোগতিৰ পথই প্ৰশংস্ত কৰেছ।  
জেনে রাখ, বাদশা কাউস মুক্ত হলৈই  
তুমি আজদাহাৰ হাত থেকে রক্ষা পেতে পাৱ।

অন্যথায় আমার রীতি অনুযায়ী  
আমি তোমার মস্তক তোমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করবো।  
তুমি কি জানো না, আমি যখন যুদ্ধে অবর্তীণ হই,  
তখন আমার তরবারির আঘাতে নদীবক্ষে ভশ্বিভূত হয় দুরস্ত নড় ?  
কাজেই বলছি সময় খাকতে নিজেকে ও নিজের দেশকে  
আমার হাতে সম্পর্ণ করো,

আর এইভাবে নিজেকে মুক্ত করো মহাদুঃখ থেকে।  
যদি তা না করো, তবে প্রস্তুত হও যুদ্ধের জন্য,  
আমার শক্তির আঘাতকে গ্রীবাদেশে ধারণ করার জন্য তৈরি হও।  
আমি আসা পর্যন্ত সৌম্য রাজ্য, ভাগ্য ও সুদীন,  
অস্ত্রসজ্জা, জমকালো আসু, শঙ্কা ও আশাসহ অবস্থান করো।  
হে নির্বোধ রাজা, আমি কায়কাউসের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য  
ইরানীয় সৈন্যসহ শীঘ্ৰই তোমার সঙ্গে মোকাবাত করবো।

তুমি নিশ্চয়ই তোমার সামগ্রণের যুথে শুনেছ,  
কি ভাবে আমি যাঞ্জিনিরানের যুদ্ধে লড়েছি;  
কি করে পুলাদগন্ডী ও বেদকে  
এবং সফেদ দৈত্যকে নিধন করেছি সংগ্রামে।  
এই পর্যন্ত লিখে লিপিকা মোহরাঙ্কিত করে  
দূতকে শীত্রগতি হামাওরান অভিমুখে রওয়ানা করা হলো।

দূত যথাসময়ে হামাওরান পৌছে  
রাজাকে দান করলো বিশু-বীরের বাণী।  
বাণী শুনে ও লিপিকা পাঠ করে  
রাজা স্থীয় কৃতকর্মের দিকে গর্বের দৃষ্টিতে তাকালেন।  
এবং পত্রের মর্ম স্মরণ করে ক্রোধে অধীর হয়ে,  
বিশু-সংসার আঁধার দেখলেন।

কুস্তমের উজ্জ্বল-লিপিকা রাজার ক্রোধকেই উত্তেজিত করলো,  
তিনি বঞ্জের মতো গভীরনাদে জবাব দিয়ে বললেন,  
কায়কাউস কোনদিন আর উপত্যকার পথে মুক্তি পাবে না।  
কুস্তম, তুমি যখনই বার্বারিশানে আসবে,  
তখনই আমাদের অশুরাইদের বল্লাধারী দেখতে পাবে।

তোমার জন্য কারাগার তৈরি আছে,  
যদি বাসনা করো তবে এসে তা বরণ করতে পার।  
আমি শীঘ্ৰই তোমার মোকাবেলায় এগিয়ে আসছি,

আমার সংগ্রাম-কৌশল অটীরেই তুমি দেখতে পাবে।  
সংবাদবাহক রাজার এই গবেষিত কথা শুনে  
রুস্তমের কাছে ফিরে যাওয়ার উপক্রম করলো।  
তার মনে হলো, হামাওরান-রাজ  
অবিবেচক ও দৈত্য-স্বভাব।  
তাই সাবধানবাণী থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলেন না,  
তাঁর পৈশাচিক মন ক্রোধের ধূম্রাজিতেই পূর্ণ হয়ে উঠলো।  
রোষ কশায়িত চক্ষে অগ্নিবৰ্ণ করে অবশেষে তিনি  
দৃতকে অপমানিত করে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন।  
এবং জমায়েত করলেন এমন সৈন্যদল,  
যাদের পদধূলিতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এলো।  
রাজার সৈন্যদল বর্ণ হাতে প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য,  
বীরগণ তরবারি নিয়ে আস্ফালন শুরু করলো।  
এদিকে বিতাড়িত দৃত শির উচু করে  
যথাসময়ে রুস্তমের সমীপে ফিরে এসে  
দুরাচারী রাজার ঔদ্ধত্যের কথা  
সবিস্তারে বর্ণনা করলো রুস্তমের কাছে।  
রুস্তম দৃতের মুখে রাজার জবাব শুনে  
সাহসী সৈন্যদল জমায়েত করার আদেশ দিলেন।  
ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা তাঁর মনে পড়লো,  
স্বীয় করুণা ও প্রতিহিংসা, দয়া ও বদান্যতার শরণ নিয়ে  
তিনি তখন ঘোষণা করলেন,—  
এই দুরাচারী কুকুরের হাত থেকে  
অবশ্যই গোটা হামাওরান রাজ্য আমি ছিনিয়ে নিব !  
যুদ্ধের ময়দানে তাকে আমি বধ করবো,  
লৌহ-শলাকায় বিন্দ করবো তাকে পাখির মতো।  
তারপর সৈন্যদল সজ্জিত করে  
যুদ্ধযাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন।  
যথারীতি বেজে উঠলো রণদামামা,  
রুস্তম আরোহণ করলেন তাঁর প্রিয় অশু রাখশের উপর।  
স্থলপথ ধরেই তিনি সৈন্য পরিচালনা করলেন।  
জলযান ও নৌকার সাহায্যে  
বিপুল সৈন্যবাহিনী শীঘ্ৰই হামাওরানের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হলো।

এইবার মন থেকে সকল দয়ামায়া মুছে ফেলে  
শত্রুজ্য লুঠনের আদেশ দিলেন রুস্তম।  
হামাওরান অধিপতি যথাসময়ে রুস্তমের আগমন  
ও শক্র সৈন্যের সংবাদ পেলেন।

স্বীয় রাজ্যের ধর্ষণ ও প্রজাদের কান্নার রোল  
যখন তাঁর কর্ণগোচর হলো, তখন তিনি  
সৈন্যে নির্গত হলেন রাজধানী থেকে,  
দিবসের আলো তখন পরিবর্তিত হয়েছে রাত্রির অঙ্ককারে।

রূপতূর্য ও হিন্দুস্তানী দুন্দুভির নিনাদে  
আকাশ কেঁপে উঠেছে।

বাম ও দক্ষিণ সারিতে সৈন্যবৃহৎ রচনা করে  
মশালী সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে এলেন।  
রুস্তম বললেন, যুদ্ধের কলা—কৌশল আমার আয়ত্তে,  
ধীরে সুস্থে আমি রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হবো।

এই বলে তিনি তনুত্রাণে দেহ সজ্জিত করে  
হৃতগামী রাখশের উপর আরোহণ করলেন।  
তারপর বীরদের সম্বোধন করে বললেন,—

হে ভাগ্যবান বীর সেনানীবৃন্দ,  
যুদ্ধে তোমরা সমবেতভাবে  
বর্ণ নিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করবে।

সেনাপতির আদেশ পেয়ে সৈন্যগণ বর্ণয় হাত রাখলো,  
ও মদমত হস্তীর মতো সগর্জনে অগ্রসর হলো।

বর্ণাধারী সৈন্যদলের বিপুলবিস্তারে বেণুবনের সৃষ্টি হলো,  
বর্ণ ফলকে ঢাকা পড়লো চন্দ্রসূর্য।

বীরপ্রবর রুস্তম সৈন্যদলের মধ্যভাগ আলোকিত করে  
সগৌরবে এগিয়ে চললেন।

তিনি স্কন্ধোপরি তুলে নিয়েছেন গুরুভার প্রহরণ,  
ও পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তেজিত করেছেন তাঁর অশু।

প্রতিপক্ষের সৈন্যদল রুস্তমের বীরত্ব-ব্যক্তিক আকৃতি দেখে,  
ও তাঁর হাতে উদ্যত গুরুভার প্রহরণ লক্ষ্য করে,

এবং সেই সঙ্গে জাবুল—সৈন্যবাহিনীকে দুর্ভেদ্য পাহাড়ের মতো  
বর্ণ হাতে অগ্রসর হতে দেখে  
ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো ;

তাদের আত্মা দেহছাড়া হওয়ার উপকৰণ করলো ।  
তারা রুষ্ম ও তাঁর সৈন্যদলের সম্মুখীন না হয়ে  
প্রাণভয়ে হামাওরান অভিমুখে পালাতে শুরু করে দিলো ।  
এইবার হামাওরান-রাজ স্বীয় পরামর্শদাতাদের নিয়ে  
সভা করে বসলেন ।  
সেই সভার মধ্যে উঠে দাঁড়ালো দুই উন্নত-শির তরুণ !  
তরুণদুয়কে অবিলম্বে মিসর ও বার্বারিস্তানে  
দৃতরূপে প্রেরণ করার যুক্তি স্থির হলো ।  
প্রত্যেকের হাতে দেওয়া হলো একটি করে লিপি,  
বেদনা-দীর্ঘ হৃদয়রক্ষে লেখা সেই লিপিকা !  
তাতে লিখিত ছিল, অবধান করুন, আমাদের দুই রাজ্য  
একে অন্যের থেকে দূরে নয় ।  
মঙ্গল-অমঙ্গল, যুক্তি ও উৎসবে  
আমরা যদি উভয়ে মিলে অগ্রসর হই  
তবে রুষ্মকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই ।  
আমরা এবং আপনারা একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করলে  
আজদাহাকেও আমরা অবলীলায় পরামর্শ করতে পারবো ।  
তা না হলে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল,  
অকল্যাণের হস্ত প্রলিপিত রয়েছে দুদিকেই ।  
রাজ্যদুয়ের অধিপতিগণ লিপি পাঠ করে  
রুষ্মের আগমন সম্পর্কে অবহিত হলেন ।  
রুষ্মের ভয়ে সেখানে সবাই প্রমাদ গল্পলো,  
উভয় রাজ্যের সৈন্যদলেই পড়ে গেলো সাজ সাজ রব ।  
যথাসময়ে সম্মিলিত সৈন্যদল মুখ করলো হামাওরানের দিকে,  
সারাদেশ একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত হয়ে উঠলো পর্বতের মতো বন্ধুর ।  
এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত  
ছেয়ে গেলো অগণিত সৈন্যদলে ।  
দুনিয়ায় যেন সারি সারি পিপীলিকার  
অস্তহীন স্মোত বয়ে চলেছে ।  
রুষ্ম এই দৃশ্য দেখে গোপনে এক বীরকে  
সংগ্রাটের কাছে প্রেরণ করলেন ।  
তাঁকে বলে পাঠালেন, তিনটি রাজ্যের যুদ্ধকামী সেনাবাহিনী  
একযোগে আমার দিকে মুখ করেছে ।

তবু যখন আমি যুদ্ধে মেতে উঠবো  
তখন তারা তার পরিধির উপর হারিয়ে ফেলবে সকল কঙ্গা।  
কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তাদের এই পরাজয়  
আপনার কোন অঙ্গলের কারণ হয় কি না ?  
সম্বাটের অঙ্গল হলে  
বার্বারিস্তানের সিংহাসনে আমার কোন প্রয়োজন নেই।  
প্রত্যুষের সম্বাট জানালেন, কোনরকম চিন্তা বা সংশয় করবেন না,  
কারণ, দুনিয়ার শয্যা কেবল আমার জন্যই বিছানো হয়নি।  
আবর্তনশীল আকাশের নির্দেশ এই :  
বিষ পান করেও ধৈর্য ধরতে হবে করুণার জন্য।  
সহিষ্ণুতাই আমার বন্ধু,  
এবং মহৃত্ত আমার রক্ষা-প্রাচীর।  
আপনি নিশ্চিন্তে উত্তেজিত রাখশের বক্ষা শুথ করুন,  
বর্ণা-ফলকে উদ্বীপিত করুন আপনার প্রয়াস।  
যেন শক্রসৈন্য নির্মূল হয়ে যায়,—  
ধ্বৎস হয় তাদের অন্তর ও বাহিরের সকল কৌশল।  
তার ফলে আকাশ যদি আমার প্রতি বিমুখ হন,  
আর আমার উপর নেমে আসে অঙ্গল,  
তবে আপনি ইরান-ভূমির রক্ষণে মনোযোগী হবেন,  
এবং মাহাত্ম্য ও বদান্যতার সঙ্গে সর্বদা তৎপর থাকবেন।  
দৃত সম্বাটের কথা শ্রবণ করে  
ভূরিতে বীরবেরের সমীপে প্রত্যাবর্তন করলো।  
রুক্ষম দৃতের কথা শ্রবণ করে  
অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মুখ করলেন।  
দুর্ঘত্ব অশু রাখশকে উত্তেজিত করে  
উল্লম্ফনে রণভূমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন।  
শক্র-সৈন্যের প্রথম সারির সামনে এখন রুক্ষম,—  
তারা চক্ষু বিস্ফারিত করে মহাবীরকে চেয়ে দেখলো।  
রুক্ষম প্রতিপক্ষকে জানালেন,  
সাহসীদের মধ্যে থেকে এক কিংবা একাধিক যোদ্ধা  
তাঁর সম্মুখীন হতে পারে।  
কিন্তু কেউ সাহসী হলো না,  
দীর্ঘক্ষণ ধরে রুক্ষম রংক্ষেত্রে একাই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে সূর্য পশ্চিম—সাগরে অস্ত গেলো,  
ধরণীতে নেমে এলো অঙ্ককার।  
সূর্যের লালিমা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
আকাশে ছড়িয়ে পড়লো অসংখ্য মুক্তা।  
তারাগগণ যেন ফুল আর আকাশ বাগিচা,  
চাঁদ প্রদীপ ও পারবীন প্রভৃতি নক্ষত্র পতঙ্গ।  
এইবার মহাবীর ক্রন্তম ধীরে ধীরে  
স্বীয় শিবিরের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।  
রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত  
তিনি স্বীয় শয়ন কক্ষে অতিবাহিত করলেন।  
তারপর সূর্যের উজ্জ্বল রঞ্জি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে  
আবার নতুন করে রচিত হলো বীরবন্দের ব্যুৎ।

## তিন দেশের রাজাৰ সঙ্গে রুক্ষমেৰ যুদ্ধ ও কায়কাউসেৱ মুক্তি

দিবসেৱ সূচনাৰ সঙ্গে সঙ্গে  
দ্বিমুখী বাণসহ প্ৰস্তুত হলো সৈন্যদল।  
তিন দেশেৱ রাজা দেখলেন,  
রুক্ষম যুদ্ধেৰ ময়দানেৰ দিকে সৈন্য চালনা কৱেছেন  
এবং সিপাহীদেৱ ডাক দিয়ে বলছেন,  
আজকেৰ দিনেৱ জন্য চক্ষু বিস্ফারিত রাখো।  
শিৱ উচ্চ কৱে হষ্টচিত্তে এগিয়ে যাও,  
এবং দৃষ্টি নিৰ্নিষেষ রাখো বৰ্ণা ফলকেৰ উপৱে।  
শত সহস্র অশ্বারোহী ও সৈন্যদলেৱ আচুষ্টি  
সফলতাৰ পক্ষে আপৰিহাৰ্য নয়।  
যদি বিশ্ব-প্ৰভু আমাদেৱ সহায় হন,  
তবে অবশ্য শক্তদেৱ শিৱ আমোৱা ধূলায় লুটাবো।  
ময়দানেৱ অপৱ পাৰ্শ্বে রাজাগণ হস্তীপৃষ্ঠে আৱোহণ কৱে  
দুই মাইল দীৰ্ঘ এক বুহ রচনা কৱলেন।  
বাৰ্বাৰিস্তান থেকে আগত একশত ষাটটি হস্তী,  
বৰ্মাজিতে সজ্জিত হয়ে নীল নদেৱ পানি বালসে তুলেছে।  
হামাওৰান-ৱাজ দিয়েছেন একশত মদমত কৱী,  
তাঁৰ বাহিনী বিস্তৃত রয়েছে ক্ৰোশাধিক পথ ধৰে।  
তৃতীয় বাহিনী মিসৱেৱ,—  
তাৱ সংখ্যাধিকে৯ বাতাস নীলাভ ও ধৱিতী অদ্ভুত হয়েছে।  
পৃথিবীৰ পৃষ্ঠদেশ যেন আজ ইস্পাতে মোড়া,  
কিংবা আলবুৰ্জ পাহাড় সারা অঙ্গে ধাৰণ কৱেছে সুকঠিন তনুত্বাণ।  
সৈন্যদেৱ আগে পিছে নানা রঙেৱ পতাকা,  
তাদেৱ বৰ্ণছটায় আকাশ লাল, হলুদ ও বেগুনীতে চিত্ৰিত হয়ে গেছে।  
বীৱবন্দেৱ চিংকাৰ ধৰনিত-প্ৰতিধৰনিত হচ্ছে পৰ্বতেৱ গায়ে,  
অশ্ব-খুৰেৱ তাড়নায় ধৰণী অসহায় বোধ কৱছে।  
সিংহেৱ পাঞ্চা ও বক্ষ বিদীৰ্ঘ হচ্ছে,  
সাহসী ইগল ভগ্নপক্ষ হয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে।  
রুক্ষম তাঁৰ বাহিনীৰ দক্ষিণ ও বাম বাহু  
সাহসী বীৱবন্দেৱ দ্বাৱা সুৱার্ক্ষিত কৱলেন।

দক্ষিণ বাহতে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ গুরাজকে নিয়োজিত করলেন।  
আর বাম পার্শ্ব রক্ষার ভার দিলেন  
সিংহ-হাদয় বীর জওয়ারার হাতে।

এবৎ স্বয়ং সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগ আলো করে বিরাজ করতে লাগলেন।  
হামাওরান-রাজ যখন দূর থেকে দেখলেন  
রুম্নম এগিয়ে আসছেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে,—  
তখন তিনি ভীত হয়ে  
যুক্ত বিলস্বের কৌশল অবলম্বন করলেন।

ইরানীয় সৈন্য দুদিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগলো,  
তাদের গর্জনে হামাওরান-বীরবৃন্দের গর্বিত শির অবনমিত হয়ে চললো।  
যুক্ত ঠেকিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে রাজা তার অগণিত সৈন্যের  
মাঝখানে অবস্থান করতে লাগলেন,  
তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকল স্থান  
আয়স-পর্বতশিলায় আচ্ছন্ন হয়েছে।

সৈন্যদলের পদধূলিতে অঙ্ককার হয়ে গেছে আকাশ,  
উজ্জ্বলিত সূর্য যেন বন্দী হয়ে পড়েছে।

এমন সময় রুম্নমের আদেশে যুদ্ধারঙ্গসূচক তৃৰ্য নিনাদিত হলো,  
সৈন্যবাহিনী বিচলিত হলো স্বস্থান থেকে।

শক্রগণও স্থীয় অধিকৃত ভূমি পেছনে ফেলে  
অগ্রসর হলো সামনের দিকে।

অবিরাম চলতে লাগলো তীর, তরবারি ও প্রহরণ,  
বীরগণের রক্তে যুক্তভূমি আর্দ্র হয়ে উঠলো।

বক্রমকে তলোয়ার ও প্রস্তরের বর্ষণে  
মাটিতে গজিয়ে উঠতে লাগলো লালাফুলের উপবন।

দূরস্থ রাখ্শ যে-দিকেই মুখ করলো  
সে-দিকেই ঝরে পড়তে লাগলো আগুন।

রক্ত জমাট বেঁধে বরফের নদীতে রূপান্তরিত হলো,  
শক্র-সৈন্য সর্বত্র রুম্নমকেই দেখতে লাগলো।

ক্রীড়াভূমির গেঁদের মতো লুটিয়ে পড়ছে ঘানুমের শির,  
আকাশ যেন ঢেলে দিচ্ছে মাথার উপর অমঙ্গলের ধারা।

এ কোন নির্বোধ সেনাপতির নির্দেশে  
এমন যুক্তে ঝাপিয়ে পড়েছে অগণিত সৈন্যদল।

হত সৈন্যের শবদেহে যুক্তের ময়দান যে পাহাড়ের মতো উচু হয়ে উঠলো,

সৈন্যদল পলাশনপর হচ্ছে রংভূমি ছেড়ে !  
কত যে শির কর্তিত হয়ে ইতশ্চ ছড়িয়ে পড়েছে তার হিসাব নেই,  
বীরগণের রক্তে কত যে ধারা প্রবহমান হয়েছে তারও নেই কোন ইয়ত্তা ।  
মুকুটধারিগণের করোটি ছড়িয়ে আছে সর্বত্র,  
খচিত হয়ে আসছে সারা ময়দান কত না তনুଆণে !  
রুক্ষম এবার তাঁর রাখশকে অন্যদিকে ধাবিত করলেন,  
ভীত-সন্ত্রস্তদের উপর থেকে গুটিয়ে নিলেন তাঁর হাত ।  
যোড়া ছুটিয়ে তিনি এবার সিরিয়ার নরপতির সামনে এসে হাজির হলেন,  
ও তাঁকে লঙ্ঘ করে হাওয়ায় ছুঁড়ে মারলেন অমোঘ পাশ ।  
মুহূর্তমধ্যে নরপতির কটিদেশ তার ফাঁসে আটকা পড়ে গেলো,  
ও তাঁর কোমরের অঙ্গ সেই চাপে গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম করলো ।  
রুক্ষম তখন তাঁকে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে আকর্ষণ করে এনে বন্দী করলেন ।  
ওদিকে বীরশ্রেষ্ঠ গুরাজের হাতে বন্দী হলেন  
বাৰ্বারিস্তানের নরপতি ও তাঁর চাল্লিশ জন সেনানায়ক ।  
অপর দিকে জওয়ারা দুরস্ত সিংহের গতিতে  
ধাবমান হলেন মিসরের অধিপতির দিকে ।  
এবং তাঁর মুখোমুখী হয়ে  
তাঁর মন্তকে হানলেন বিষাক্ত তরবারির আঘাত ।  
সেই আঘাতে রাজার দেহ মন্তক থেকে কটিদেশ পর্যন্ত  
দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়লো ;  
এবং তা যুদ্ধকারী সেনানীদের অন্তরকে করে তুললো ভীত ও সন্ত্রস্ত ।  
তারা জওয়ারার হাতে যশস্বী নরপতি ও বীরগণকে নিহত হতে দেখে  
চারদিকে পাগলা হাতীর মতো দলে দলে পালাতে শুরু করে দিলো ।  
দেখতে দেখতে তাদের মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পর্বত-প্রমাণ হয়ে উঠলো,  
সবাই বলতে লাগলো, আজ সত্যই কেয়ামতের দিন ।  
হামাওরান-রাজ চারদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন,  
যুদ্ধক্ষেত্রে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মৃতদেহে ভরে উঠেছে ।  
তিনি দেখলেন, বহু নামকরা যোদ্ধা নিহত হয়েছেন,  
বহু বীর হয়েছেন বন্দী ।  
দেখলেন, মহাবীর রুক্ষম তরবারি হাতে  
যুদ্ধক্ষেত্রে অবিরত প্রলয়ের সৃষ্টি করে চলেছেন ।  
তিনি বুঝলেন, আজ কেয়ামতের দিন ;  
দৃত পাঠিয়ে তিনি রুক্ষমের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন ।

তাঁকে বলে পাঠালেন, কায়কাউসকে তাঁর সেনাপতিগণসহ  
রুস্তমের কাছে আচরণই নিয়ে আসা হবে।  
তারপর রাজকীয় শিবির, সকল সম্পদ, তাজ ও তথ্ত,  
দাস-দাসী ও অন্যান্য যাবতীয় সামগ্ৰী রুস্তমকে সমর্পণ  
কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে

তিনি রাজ্যেৰ সম্বিলিত সৈন্যগণকে  
নিৱস্ত্ৰ হওয়াৰ আদেশ দিলেন।  
অতঃপৰ স্বীয় পূৰীতে ফিরে এসে  
পৱাৰ্ষদাতাগণকে নিয়ে তিনি সভা কৰে বসলেন;  
এবং দৃত পাঠিয়ে কায়কাউসকে ফিরিয়ে এনে  
তাঁকে যথাযোগ্য আসনে বসালেন।  
এদিকে তিনি রাজ্যেৰ সেনাৰাহিনী রুস্তমেৰ কাছে শাস্তি প্ৰাৰ্থনা কৰে  
তাঁৰ প্ৰশংসা উচ্চারণ কৰলো।  
তাদেৱ আচৰণে তখন এমন ভাৰ প্ৰকাশ পেলো, যাতে মনে হলো,  
তাদেৱ মধ্যে ও ইৱানীয়দেৱ মধ্যে শক্রতা কোনকালেই ছিল না।  
মহাৰীৰ রুস্তম তখন তিনি রাজ্যেৰ সৈন্যদেৱ কাছ থেকেই প্ৰতিজ্ঞা আদায় কৰে  
তাদেৱ বন্দীদেৱ মুক্ত কৱাৰ আদেশ দিলেন।  
তিনটি রাজ্যেৰ সৈন্যবাহিনী নিৱস্ত্ৰ হয়ে রুস্তমেৰ সামনে  
শৃঙ্খলাবদ্ধভাৱে দণ্ডয়মান হলো।  
এদিকে কায়কাউস, গেও, গোদৱজ ও তূস প্ৰমুখ বীৱিগণ  
দুৰ্গ থেকে মুক্ত হয়ে এলেন।  
রুস্তম তখন সন্ধাটেৰ হাতে সমৰ্পণ কৱলেন,  
বিজিত সকল সম্পদ।  
ইৱানেৰ রাজভাণ্ডারে যুক্ত হলো তিনটি রাজ্যেৰ সকল অস্ত্ৰ  
ও তিনি রাজাৰ সম্পদ,  
রাজাৰ দেহৰঢ়ী সৈন্যদল, রাজমুকুট ও অস্তপুৰ।  
এই সঙ্গে হন্তী-বাহিনী, মনিমুক্তাখচিত সিংহাসন,  
ৱেশঘৰী বস্ত্ৰৱাজি, মহামূল্য আসনসমূহ ও মুক্তজড়িত শিৱস্ত্রাণ,  
হিন্দুস্তানী তৱবাৰি, ভাৰী প্ৰহৱণ,  
সুলক্ষণে অশুৱাজি ও বিবিধ মনিমুক্তাও বাদশাকে সমৰ্পণ কৱা হলো।  
অসংখ্য লৌহ শিৱস্ত্রাণ ও তনুত্বাণ,  
এবং সহস্রাধিক জঙ্গী হাতী সব বাদশার সম্পদেৱ অস্তৰ্গত হলো।  
অতঃপৰ সন্ধাট কায়কাউসকে রোমদেশীয় কিংখাৰে ভূষিত কৰে

সূর্য-সমারোহে বসানো হলো স্বর্ণ-সিংহাসনে।  
এইবার অস্তপুর-বাসিনী সওদাবার সমীপে পাঠানোর জন্যে  
সজ্জিত করা হলো সংবর্ধনাকারী দল।  
যাকুতের তাজ, ফিরোজা পাথরের আসন,  
ও মুক্তাখচিত কালো যবনিকা প্রস্তুত করা হলো।  
একটি সুলক্ষ্মণে ঘোড়ার মুখে লাগানো হলো সোনার লাগাম।  
রং বেরৎ-এর মণিমুক্তা জড়ানো  
চন্দন কাঠের শিবিকা প্রস্তুত করা হলো।  
তারপর হামাওরান-রাজের  
অপরাধ মার্জনা করে তাঁকে দেওয়া হলো মুক্তি।  
এইবার রাজা কৃতজ্ঞচিত্তে নিজে এক উৎসবের আয়োজন করলেন।  
আকাশের মতো ঊচু এক সিংহাসন সজ্জিত হলো,  
তাতে খচিত করা হলো নক্ষত্রের মতো অসংখ্য মণিমুক্তা !  
সোনার তারে বুনট করা দুই শত কিংখাবের জামা  
ইরানীয় সেনাপতিগণের জন্য প্রস্তুত করা হলো।  
একশত চল্লিশ জন সুন্দরী দাসীকে সজ্জিত করা হলো কর্ত্তহারে।  
দুইশত দাস বালক প্রস্তুত হলো সোনার কটিবন্ধ পরে।  
অগণিত অশু ও উদ্ভ্রে পিঠে বোঝাই করা হলো  
অসংখ্য কাপেটি ও স্বর্ণমুদ্রা।  
আয়োজন সম্পূর্ণ হলে সম্মাটকে উৎসব-স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য  
দৃত পাঠানো হলো।  
সম্মাট নগর-প্রাচীরের বাইরে সুসজ্জিত উৎসব-স্থানের দিকে অগ্রসর হলেন।  
বিদেশ যেন আজ তাঁর জন্য কুপাস্তরিত হয়েছে ইরানে,  
যে-ইরানের দিকে হস্ত প্রসারিত করে আছে প্রতিহিংসাপরায়ণ শক্রগণ।  
উৎসব স্থানে এসে জমায়েত হলো বার্বারিস্তানের সৈন্যরা,  
তাদের সংগ্রাম-কামী বীর অশ্বারোহীগণ।  
সম্মিলিত হলো সেখানে বার্বার, মিসর  
ও হামাওরানের শত সহস্র বীরপুরুষ।  
বর্মধারী, তনুত্রাণধারী ও অশ্বারোহীগণ মিলে  
তিন লক্ষাধিক সিপাহীর সমাবেশে নদিত হয়ে উঠলো উৎসব-প্রাঙ্গণ।  
প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব রীতি অনুযায়ী  
বাদশাহের প্রতি তাদের আনুগত্য ও কল্যাণ-কামনা নিবেদন করলো।  
বীর রাজগণ নতমন্তকে সম্মাটের অনুসরণ করলেন।

## রোমের কায়সার\* ও আফ্রাসিয়াবের কাছে কায়কাউসের বাণী প্রেরণ

বাদশার সমীপ থেকে কায়সারের দরবারে এক দূতের আগমন হলো  
এই কায়সার ছিলেন জ্ঞানী ও চক্ষুচান নরপতিদের অন্যতম।  
তিনি বাদশার দৃতকে বললেন, রোমের এক ব্যক্তি  
দেশ-বিদেশ পর্যটন করে বেড়াতেন।  
তিনিই একদিন আমার অক্ষকার অনবহিতিকে  
আলোকিত করে দিয়ে বললেন,—  
ইরানের মিত্র ও অধীন রাজ্যগুলি সর্বত্র বিদ্রোহ করেছে।  
তারা ঘড়যন্ত্র করে হাতে তুলে নিয়েছে  
ইরানের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বশ্চা।  
এই সংবাদে রোমের সৈন্যদল  
আমার আদেশের অনুবর্তী হওয়ার প্রার্থনা জানালো।  
কিছুদিন পরে হামাওরান ও বর্ষাধারীদের মরণপ্রাপ্তর থেকে খবর এলো  
ক্রস্তম দুরস্ত বিক্রমে বার্বার ও মিসরের রাজাদের  
যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন।  
আরও শুনলাম, ক্রস্তম এবার  
তুরানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যে ইরান যাত্রার  
উদ্যোগ করছেন।  
বীরদল অশু-বল্গায় হাত রেখে  
বীরত্ব প্রদর্শনের নতুন সুযোগ লাভের জন্য উৎসুক হয়ে আছে।  
কায়সার দৃতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বিনিময় সমাপ্ত করে  
সম্ভাটের কাছে হন্দয়-গ্রাহী বাণীশোভিত এক লিপিকা লিখলেন।  
তাতে লিখা হলো, আমি বাদশার একান্ত অনুগত,  
তাঁর নির্দেশের ব্যক্তিগত আমার দ্বারা সন্তুষ্ট নয়।  
কিরণজিদের দিক থেকে যখন সৈন্যবাহিনী  
বাদশার রাজ্যাভিমুখে অভিযান করলো,  
তখন শক্রদের ঔজ্জ্বল্যের কথা স্মরণ করে  
আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলাম।  
আফ্রাসিয়াব আপনার সিংহাসনের লালসা করবে

---

রোম-সম্ভাটের উপাধি ছিল কায়সার বা সীজার।

এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ।

সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার যশস্বী যোদ্ধুগণকে নিয়ে

তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়লাম ।

আমার সুনীর্ধ বর্ণাধারীদের\* আক্রমণ

শক্রদের নিদ্রা ও বিশ্রান্তি হরণ করে নিলো ।

তাদের ও আমার পক্ষে হতাহত হলো অসংখ্য সিপাহী ।

এখন দৃতমুখে সংবাদ পেয়ে পরম আনন্দিত হলাম যে,

শাহী গৌরব পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ।

আপনি যখন বার্বারিস্তান থেকে ইরানের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হবেন,

তখন আমরাও তুলে নিব গ্রীবাদেশে বর্ণা ।

দুনিয়াকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রক্তে লাল করে দিব,

এবং শক্র-শোণিতে ধরিত্রী বক্ষে প্রবাহিত করবো জেহঁর ধারা ।

দৃত লিপিকা নিয়ে দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে

বার্বারিস্তানের দিকে মুখ করলো ।

লিপি পাঠ করে ইরান-সম্বাট অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন ।

রোম-সম্বাটের কীর্তিকলাপ তাঁর রাজকীয় অনুমোদন লাভ করলো,

এইবার তিনি আফ্রাসিয়াবের কাছে লিপিকা-প্রেরণে মনোনিবেশ করলেন ।

লিখলেন, অবিলম্বে আপনি ইরান-ভূমি পরিত্যাগ করুন,

অমিতাচার করবেন না

আপনার সমালোচনায় আমাদের ঘন ও মস্তিক আলোড়িত হচ্ছে ।

স্বীয় রাজ্য ত্বান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন,

নিরথক কেন ইরানের দিকে প্রসারিত করছেন আপনার হাত ?

অতিরিক্ত কামনা না করে, নির্ভরনার মধ্যে অবস্থান করাই শ্রেয় ;

অধিকস্তর প্রয়াস আপনার জন্য দীর্ঘ দৃঃখ্যের কারণ হবে ।

রাজ-রাজেশ্বর হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করাই আপনার জন্য মঙ্গলকর,

স্বীয় গাত্রচর্মের দিকে অবলোকন করা আপনার কর্তব্য ।

আপনি কি জানেন না যে, ইরান আমার দেশ,

আপনি কি অবগত নন যে, সারা দুনিয়া আমার করতলগত ?

দুরস্ত ব্যাঘ যদিও সাহসী,

তবু সিংহের সামনে সে তুচ্ছ ।

---

রোমক সৈন্যগণ প্রাচ্যদেশীয় বর্ণার চাইতে দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করতো বলে জানা যাচ্ছে ।

কাজেই এমন অসম সংগ্রাম থেকে বিরত হোন,  
বাসনা ও কর্মকে সীমিত করুন সীয় ক্ষমতার পরিধির মধ্যে।  
এখনও সময় আছে, মঙ্গল-অমঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করুন,  
এখনও কর্মে নিয়োজিত করুন শুভ বৃক্ষিকে।  
যখন জলে-স্থলে প্রলয় উথিত হবে,  
তখন আর অনুত্তাপ করার সময় পাবেন না।  
একদা এক সিংহ এক ব্যাঘাতকে বলেছিল,  
তোর আচরণের পরিণাম হবে ভাগ্যের তিমির ও সংকীর্ণতা।  
আমার সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল কি দাঁড়ায়  
আপনি নিজেই তা একবার চিন্তা করুন।  
আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,  
আপনার মাথায় মগজ বলেত কিছুই নেই।  
এখনও সময় আছে,  
পত্রের জবাবে প্রজ্ঞার শরণ নিন।  
যদি আমি সৈন্যে আপনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হই  
তবে আপনি অবশ্যই দুচোখে দুনিয়া অঙ্ককার দেখবেন।  
গুরুত্বার প্রহরণ ও তরবারির আঘাতে এবং বীরগণের শৌর্যে  
আপনার মস্তক আমি ধূলায় লুটিয়ে দিবো।  
আমার প্রহরণ ও তলোয়ার থেকে  
আপনি পালাবার পথ পাবেন না।  
যদি আমি সৈন্যে অগ্রসর হই  
তবে আপনার ও আপনার সেনাপতিদের শির  
আমার পদ্মতলে দলিত হবে।  
আপনি ও আপনার সেনাপতিদের মধ্যে  
কেউ মহাবীর রুস্তমের সমকক্ষ নয়।  
আপনি তৃণানের অধিপতি হতে পারেন,  
কিন্তু তাই বলে ইরানের বাদশার সামনে আপনার ক্ষমতা কতটুকু?  
এইভাবে লিপি সম্পূর্ণ হলে  
তা নিয়ে যাওয়ার জন্য এক দৃতকে মনোনীত করা হলো।  
দৃত জলস্তোত্রে মৌকার মতো দ্রুতগতিতে  
আফ্রসিয়াবের সমীপে গিয়ে পৌছলো।  
তৃণানীয় সৈন্যগণ দৃতকে যথাসময়ে  
নিয়ে গোলো তাদের সম্রাটের সমীপে।

দৃত প্রচুর বাণী বিনিময়ের পর  
লিপিকা তুলে দিল সম্মাটের হাতে।  
লিপি পাঠ করে আফ্রাসিয়াবের মস্তিষ্ক হিংসায় পূর্ণ  
ও হাদয় বিচলিত হলো।  
জবাবে তিনি লিখলেন,—  
দুর্মুখ ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারে না।  
ইরান-ভূমির আধিপত্যের যে বড়াই আপনি করছেন,  
তা সম্ভ্য হলে হামাওরানে এমন অবনতি সম্ভব হতো না।  
আপনি জানেন, আমি যখন যুদ্ধে অগ্রসর হই  
তখন জল-মধ্যে নক্র আমার তরবারির আঘাতে ভস্মীভূত হয়।  
ইরানের জল-স্থল আমার,—  
এই সত্য আপনি জেনে রাখুন।  
অবিলম্বেই আমি যুদ্ধের আয়োজন করছি,  
উজ্জীন করছি মহাত্ম পতাকা।  
কেউ আমার সংগ্রামের প্রচণ্ডতা বর্ণাশ্রত করতে পারে না,—  
সে অরণ্যের শার্দুল হোক কিংবা জলরাশির নক্র।  
আমি পরিকীর্তিত সিংহ-পুরুষ,  
পৌরুষের জোরেই আমি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।  
প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করুন,  
আমার পৌরুষের পরিচয় তখনই জানতে পাবেন।  
হে নীচ কুলোন্তর রাজা, এমন শিক্ষা তখন আপনাকে দিব  
যাতে কোন দিন আর ইরানের কথা আপনার মনে উদিত না হয়।  
জেনে রাখুন সারা ইরান দেশ আমারই লীলাভূমি,  
কারণ, ফারেন্দুন-পুত্র তূর আমার পিতামহ।  
চতুর্ষার্শের অন্যান্য দেশ বাহুবলে আমি  
আঁরবীয়গণের হাত থেকে জয় করে নিয়েছি।  
আমার তরবারির সাহায্যে পর্বতের বুক থেকে  
আমি ছিনিয়ে আনি অস্ত্র  
অঙ্ককার বাদল থেকে ধরে আনি শাণিত-চঞ্চু ঈগলকে।

আফ্রাসিয়াবের এই বাগ্নিতার সূত্র ধরে সৈন্যদল সজ্জিত হলো,  
তারা তুলে নিলো প্রহরণ, তরবারি, তীর ও বর্ণ।

তারপর রাজাদেশের অপেক্ষায়  
আফ্রাসিয়াবের সামনে এসে দাঁড়ালো।  
এই দৃশ্য দেখে দৃত বাযুগতি  
কায়কাউসের সমীপে এসে নিবেদন করলো সকল বার্তা।  
সম্বাট দৃতের মুখে তূরান-সম্বাটের ওদ্ধত্যের কথা শুনে,  
যুদ্ধের জন্য সৈন্যদল প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন,  
এবং যথাসময়ে বিরাট এক সেনাবাহিনীসহ  
বার্বার থেকে আরব ভূমিতে এসে অবতরণ করলেন।  
যুদ্ধের ময়দানে বাদশার সৈন্যদল  
লক্ষাধিক সংখ্যায় দুই সারিতে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ালো।  
রণতৃষ্ণের নিনাদে ও সৈন্যদলের পদধূলিতে  
কাল অঙ্ককার ও দেশ সংকীর্ণ হয়ে এলো।  
ওদিকে আফ্রাসিয়াবও সৈন্য সজ্জিত করলেন,  
সেনাবাহিনীর পদধূলি আকাশের মেঘকে আঘাত হানলো।  
তূরানীয়দের নিরন্তর জ মাঝেত  
দিনের আলোকে পরিবর্তিত করে দিলো সায়ৎকালের অঙ্ককারে।  
মনে হলো, সারা যুদ্ধক্ষেত্রে আঁধারের আবরণে অদৃশ্য হয়েছে,  
আফ্রাসিয়াব যেন আদৌ ইরানে আগমন করেন নি।  
তৃষ্ণ দুন্দুভির নিনাদে পরিপূর্ণ হলো বিশু,  
মৃত্তিকা ইস্পাতে ও আকাশ আবলুসে আবৃত হলো !

জিঘাংসায় মন্ত হয়ে উভয় সৈন্যদল পরম্পরকে আক্রমণ করলো,  
দেখতে দেখতে যন্দক্ষেত্রে প্রবাহিত হয়ে চললো রক্তের নদী।  
কুঠারের আঘাতে ও ধনুকের টংকারে  
খুনের দরিয়ায় অস্ত্রি তরঙ্গের সৃষ্টি হলো।  
এমন সময় ক্রম্পম সৈন্যদলের মধ্যভাগ থেকে সগর্জনে উঠিত হয়ে  
প্রতিপক্ষের বৃহ-বক্ষ বিদীর্ণ করে অগ্রসর হলেন।  
এক-এক আক্রমণে তিনি তার শক্ত সংহারক বর্ণা দ্বারা  
কালের যশস্বী বীরগণের প্রাণ হরণ করে চললেন।  
এইভাবে বহু বীর নিহত হয়ে গেলে  
তূরানীয়-বাহিনীর মধ্যে উঠিত হলো কোলাহল।  
আফ্রাসিয়াবের সৈন্যদলের ভাগ্য যেন  
নিদ্রায় অভিভূত হওয়ার উপক্রম করলো।

তূরানাধিপতি শীঘ বীরগণের এই অবস্থা লক্ষ্য করে  
উদ্দেশ্জিত কঠে তাদের ডাক দিয়ে বললেন,—  
হে আমার সাহসী ও বীরাগ্রণ্য সেনাপতিগণ,  
তোমরা আমার সুনির্বাচিত শার্দুল।

এইভাবে যুদ্ধ করার জন্যই কি এতদিন  
তোমাদেরকে বুকে করে লালন করেছিলাম ?  
এইভাবেই কি তোমরা আমার শক্তির সঙ্গে খেলা করবে ?  
এবং শ্লোথভাবে বিচরণ করবে যুদ্ধের ময়দানে ?

পূর্ণেদ্যমে সকলে মিলে আক্রমণ করো,  
দুনিয়াকে করে দাও কাউসের জন্য সঙ্কীর্ণ।  
বীরগণ, অগ্রসর হও বর্ণ ও তরবারি নিয়ে,  
ওই উজ্জ্বল প্রতিপক্ষের শিরকে দেহ থেকে বিছিন্ন করে দাও।

ওই কুকুরের ধৰ্মনীতে শার্দুলের শোণিত প্রবাহিত দেখে,  
ও তার তরবারির চমক অবলোকন করে আকাশ লজ্জিত হচ্ছে।  
তোমাদের সাহসকে বন্ধন-মুক্ত করে অগ্রসর হও,  
ও তার শিরকে আবদ্ধ করো তোমাদের পাশ-রঞ্জুর আমোঘ-বন্ধনে।

আমি ঘোষণা করছি, এই যুদ্ধে যে-বীর  
এই শার্দুল-পুরুষকে তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পাতিত করবে,  
তাকে দান করবো রাজ্য ও আমার কন্যা,  
মহাবীরের উপাধিতে তাকে ভূষিত করবো।

ইরান-রাজ্য তাকে দান করবো,  
বীরগণের শীর্ষে নির্দিষ্ট করবো তার আসন।

তুর্কী সৈন্যগণ আফ্রাসিয়াবের এই ঘোষণা শুবণ করে  
যুদ্ধের প্রমত্তার মধ্যে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়লো।  
যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে ফিরতে লাগলো আগুনের আবর্ত,  
বর্ণার মুখে ফুটলো আগুনের শিখা ও তরবারির মুখে

ছুটতে লাগলো স্ফুলিঙ্গ।

সৈন্যদলের এই ধ্বন্তাধ্বনিতে ধূলিরাশি ধূঘার মতো আকাশে উঠিত হলো,  
ব্যথায় বিলাপ শুরু করলো চন্দ্ৰ।  
এই সময় ইরানীয়গণ ভারী প্রহরণ নিয়ে শক্তিদলের মোকাবেলা করলো।  
তাদের দুর্দান্ত আঘাতে তূরানীয় সৈন্যগণ  
প্রাণহীন হয়ে যুক্তভূষি ভরে তুলতে লাগলো।  
ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তুর্কীদের ভাগ্য নির্জীব হয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে।

আফ্রাসিয়াব স্বয়ং কুস্তমের সামনে থেকে  
প্রাণভয়ে পলায়ন করলেন।  
তাঁর সঙ্গী হলো ধোরীয়\* সৈন্যদল,  
যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষতি থেকে তাদের গতি হলো পলায়নের  
নিরাপত্তার দিকে।  
কালের আবর্তনকে বিপরীতমুখী দেখে  
ধোরীয়গণ সরাসরি তুরানের দিকেই মুখ করলো।  
আফ্রাসিয়াবের হাদয় দীর্ঘ হলো হতাশায়,  
তিনি এখন বিষময় দুনিয়া থেকে ভিন্নতর পানীয়ের  
খোঁজে মগ্ন হলেন।

---

আফ্রাসিয়াবের সৈন্যদলকে কখনো তুরানীয় কখনো তুর্কী কখনো বা ধোরীয় বলা হয়েছে।  
তুরস্ক ও ধোরাদেশ হয়তো তুরান রাজ্যের অত্তর্ভূক্ত ছিল।

## କାୟକାଉସ କର୍ତ୍ତକ ଦୁନିଆକେ ସଜ୍ଜିତକରଣ

ସ୍ୱାଟ କାୟକାଉସ ପାରଶ୍ୟେ ପ୍ରତ୍ୟାବ୍ନ୍ତ ହୟେ  
ଦେଶକେ ନତୁନ ଆନନ୍ଦେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରଲେନ  
ଆବାର ତିନି ସଜ୍ଜିତ କରଲେନ ଶାହୀ ସିଂହାସନ,  
ଓ ସର୍ବତ୍ର ବିଛିଯେ ଦିଲେନ ବଦାନ୍ୟତାର ଶଯ୍ୟାସ୍ତରଣ ।

ଜାଗ୍ରତ୍-ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାଟ ଆଦେଶ କରଲେନ,  
ଦୁନିଆର ଦିକେ ଦିକେ ଦୂତ ପାଠାତେ ହବେ ।

ବାଦଶାର ଫରମାନ ନିୟେ ଦୂତ ଛୁଟଲୋ  
ନେଶାପୁର, ବାଲଖ, ମାର୍ଗ ଓ ହିରାତେର ଦିକେ ।

ତାଁର ଏଶ୍ୱର୍ୟ, ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ସୌଜନ୍ୟ  
ମାନୁଷ, ପରୀ ଓ ଦୈତ୍ୟ ସମଭାବେ ଦାସେର ମତୋ ଅନୁଗତ ହଲୋ ।

ସବାଇ ମନ୍ତ୍ରକ ଅବନନ୍ତ କରଲୋ କାୟକାଉସେର ସାମନେ  
ମୁକୁଟଧାରିଗଣ ତାଁର ସୈନ୍ୟଦଲେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ହଲୋ ।

ରତ୍ନମକେ ଦାନ କରା ହଲୋ ବିଶ୍ୱ-ବୀର ଉପାଧି;  
କାରଣ ବାଦଶାର ଏହି ସୁଦିନେର ଉତ୍ସଇ ରତ୍ନମ ।

ଏହିଭାବେ ସକଳ ପ୍ରତିଦ୍ଵାନୀ-ମୁକୁଟ ଓ ସିଂହାସନେର ଭୟ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ହଲେ ପର,  
ବାଦଶାର ଭାଗ୍ୟ ବାଁକା ପଥେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଶୁରୁ କରଲୋ ।

ଏଥନ ଶୋନ, ସେଇ ଆତ୍ମ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବାଦଶାର ବୁଦ୍ଧି  
କି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାହୁଣ୍ଟ ହଲୋ, ସେଇ କଥା ।

ବଶୀଭୂତ ଦୈତ୍ୟଗଣ ଯେ ଆଲୁବୁର୍ଜ ପାହାଡ଼େ ମନ୍ଦୁଳ୍ଗ ହୟେ ଅବଶ୍ଥାନ କରଛିଲ,  
ବାଦଶା ସେଥାନେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରଲେନ ନିଜେର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଥାନ ।

ତାଁର ହୃଦୟରେ ସେଥାନେ ଶକ୍ତ ପାଥର ଦିଯେ  
ଦୁଇ ସାରି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହଲୋ ।

ସେଇ ଗୃହକେ ଆଶ୍ରାବଲକ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ  
ଲୋହ ଓ ପ୍ରତ୍ସର ଦିଯେ ପ୍ରତ୍ସତ କରା ହଲୋ ତାର ଖିଲାନ ଓ ଛାଦ ।

ସେଥାନେ ମୁଖୋମୁଖୀ ଦୁଇ ସାରିତେ ବଁଧା ହଲୋ ଅଶ୍ଵଦଳ,  
ବହୁ ଉତ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିବିକାଓ ଏମେ ସେଥାନେ ରାଖା ହଲୋ ।

ଅତଃପର ଏକ ସ୍ଫାଟିକ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରେ  
ସେଟିକେ ସଜ୍ଜିତ କରା ହଲୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିମୁକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ।

ଏହିଭାବେ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦେର ଜନ୍ୟ ଥାନ ନିବାଚିତ କରେ  
ବାଦଶା ନିଜେକେ ବିଲାସେର ହାତେ ସମର୍ପଣ କରେ ଦିଲେନ ।

সেখানে সম্মাটের লীলার জন্য নির্মিত হলো  
সাদা ও কালো পাথরের এক রঞ্জমহল।  
অস্ত্রাদি সংরক্ষিত করে রাখার জন্য  
আরো দুটি গৃহ নির্দিষ্ট হলো।  
স্বর্ণ-বিমণিত করে প্রচুর সমারোহে  
সংস্থাপিত করা হলো সম্মাটের দরবার-কক্ষ।  
ফিরোজা পাথরের চিত্রে চিত্রিত হলো সেই মহল,  
ও সূর্যকাস্ত মণির বিখচনে তা সুশোভিত হলো।  
সেই স্থান বিষ্঵বরেখার উপর অবস্থিত বলে  
সেখানে দিন বর্ধিত হয় না, রাত্রিও হয় না হ্রাসপ্রাপ্ত।  
সেখানকার বাযু সুবাসিত ও বর্ষণ মাদকতাপূর্ণ।  
সারা বর্ষ ধরে সেখানে বিরাজ করে মধুমাস,  
গোলাপ সেখানে চির প্রস্ফুটিত।  
দুঃখ, শোক ও বিষণ্ণতা সে-দেশে অজ্ঞাত,  
দুর্কর্মকারী দৈত্যগণ তাই সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে সেখানে কাল কাটায়।  
রাত্রি শেষের নিদ্রায় সেখানে সুখাবহ স্বপ্নের আগমন হয়।  
সেখানেই দৈত্যগণ ক্লেশকর বন্দীত্বে আবদ্ধ রয়েছে,  
বাতাসে কখনো কখনো শোনা যায় তাদের বেদনা-চিৎকার।

## শয়তান দুরা কাউসের পথভ্রষ্ট হওয়া ও আকাশে বিচরণ করা

একদিন খুব সকাল বেলা

শয়তান বাদশার অগোচরে এক সভা ডাকলো।

দৈত্যদের সেই সভায় সে তাদের সম্বোধন করে বললো  
তোমরা কতদিন আর বাদশার অত্যাচার সহ্য করবে?

সভায় ছিল এক বিচক্ষণ দৈত্য,

সভার রীতি-নীতি তার সম্যক জানা ছিল।

সে বললো, কায়কাউসের আত্মা পথভ্রষ্ট হয়েছে,

এখন দৈত্যদের দৃঢ়খের অবসান হবে।

পবিত্র বিশু-প্রভূর দিক থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিমুখ করে  
পার্থিব মহিমা ও সমারোহের দিকে নিয়ে আসতে হবে।

সভাত্ত দৈত্যগণ তার কথা শুনে নীরব হয়ে রইলো,

কায়কাউসের ভয়ে তারা কোন মন্তব্য করতে সাহস পেলো না।

এক দৃষ্ট-বুদ্ধি দৈত্য তখন উল্লম্ফনে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,—

এ-কাজ আমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

আমিই তাকে বিশু-প্রভূর দিক থেকে বিমুখ করাবো;

এবং কি করে তা করতে হয় আমার তা সম্যক জানা আছে!

এই বলে সে এক দাসের সাজ পরে

সভাত্ত সকলের মনোরঞ্জক অনেক বাক্য উচ্চারণ করলো

এবং যথাসময়ে মহান স্ম্বাটের উদ্দেশে

মৃগয়ার আনন্দে গৃহ থেকে নিঞ্জাণ্ত হলো।

স্ম্বাট-সমীপে উপস্থিত হয়ে সে মৃত্তিকা চুম্বন করলো

এবং তাঁর পদপ্রাপ্তে রাখলো একগুচ্ছ প্রস্ফুটিত গোলাপ।

তারপর বললো আপনারই মাহাত্ম্য ও সমারোহের উপযুক্ত এই উপটোকন,

আবর্তনশীল আকাশই আপনার সিংহাসনের উপযোগী।

সারা পৃথিবী আপনার ইচ্ছার অনুবর্তী,

আপনার শক্ত ও উদ্ভুত-শির ব্যক্তিগণ আজ নতশির !

মানুষ, দৈত্য ও পরী আপনার সামনে করজোড়ে দণ্ডায়মান রয়েছে,

জামশেদের মতো আপনিও সারা দুনিয়ার অধীশ্বর।

হে স্ম্বাট, এ সত্য হলে সূর্য কেন তার উদয়াস্তের রহস্য

আপনার কাছ থেকে গোপন রাখবে?

আপনার কি জ্ঞানতে ইচ্ছা করে না, দিন-রাত্রি ও চন্দ্র কি বস্তু ?  
আকাশে বিচরণশীল এই প্রতাপান্বিত সূর্যই বা কেমন জিনিস ?  
সেই সব জ্ঞানের দ্বারা মহিমান্বিত করুন নিজের শির।  
আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী ধারণ করুন এই ধরিত্বাকে,  
আকাশকে আবক্ষ করুন আপনার জ্ঞালে।

দৈত্যের কথায় বাদশাহ পথপ্রষ্ট হলেন,  
ভুলে গেলেন তাঁর আত্মার সহজাত যে জ্ঞান তার নির্দেশ।  
তিনি বুঝলেন, এই আবর্তনশীল আকাশ  
সত্যই তাঁর সামনে দুনিয়ার রহস্য গোপন করে রেখেছে।  
তিনি বুঝতে পারলেন না, এই গগনমণ্ডল স্তুতিহীন নিরালস্ব,  
সেখানে নক্ষত্র সংখ্যাহীন কিন্তু প্রভু একজন মাত্র।

সেই পরম প্রভুর নির্দেশের সামনে সবাই অশক্ত  
মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই আবর্তিত হয় তাঁর ইচ্ছায়।

স্বষ্টি তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন,  
আকাশ ও ধরিত্বা তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য।  
অবোধ বাদশার মন উপায় চিন্তায় ঘন্ট হলো,  
কি করে পক্ষহীন হয়েও শূন্যে বিচরণ করা যায় ?  
তিনি জ্ঞানীদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন,—

জ্ঞানতে চাইলেন কিভাবে মাটি থেকে উড়েন হওয়া যায়  
আকাশের উচ্চতায় ?

নক্ষত্রবিদগ্ন স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করলো, বাদশা তা শুনলেন ;  
কিন্তু তাঁর মন্তিক্ষে জাগ্রত হলো অন্য এক অশুভ যুক্তি।  
তাঁর আদেশে লোকজন ঘূমন্ত সৈগলের  
নীড়ের দিকে ধাবিত হলো।

এবং সেখান থেকে নিয়ে এলো বছ-ঙেগল-শিশু।  
মাস বর্ষ ধরে সেই ঙেগল-শাবকগুলিকে  
পাখি ও মেষের মাংস খাইয়ে প্রতিপালন করা হলো।  
তারপর তারা যখন এক একটি সিংহ  
ও শার্দুলের মতো বলশালী হয়ে উঠলো,  
তখন বাদশা সুগন্ধী অগুরু কাঞ্চ দ্বারা এক সিংহাসন তৈরি করে  
তাকে সোনার পাতে মুড়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

চারটি দীর্ঘ বর্ণা সেই সিংহাসনের  
চার কোণায় বাঁধা হলো।



তবে সিয়াউশ কি করে জন্ম নিবে কেয়ানী বৎশে ?  
সম্রাট চীন দেশের এক নিবিড় অরণ্যে  
নিশ্চপু হয়ে প্রাণ-ভয়ে কাতর হলেন।  
মাহাত্ম্যের প্রতীক যে স্বর্ণ-সিংহাসন তাতে উপবিষ্ট হয়েও  
লঙ্ঘা ও অনুত্তাপে দাগ্ধিভূত হতে লাগলো তাঁর অন্তর।  
স্বীয় অপমানিত নিদারণ অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে  
বাদশা এবার বিশ্ব-প্রভুর উদ্দেশে উচ্চারণ করলেন সানুনয় প্রার্থনা।

## ରୁଷ୍ମ କର୍ତ୍ତକ କାଉସକେ ଫିରିଯେ ଆନା

ଶୀଘ୍ର କ୍ରତକର୍ମେର ଜନ୍ୟ କାଉସ କ୍ଷମାପ୍ରାଣୀ ହଲେନ ଆଲ୍ଲାହର ସମୀପେ,  
ଓଦିକେ ସୈନ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କେ ଖୁଜେ ଫିରତେ ଲାଗଲୋ ।

ରୁଷ୍ମ, ଗେତ୍ର ଓ ତୂସ ସଂବାଦ ପେଯେ  
ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୈନ୍ୟଦଲସହ ସମ୍ବାଟେର ଅଭିମୁଖେ ଧାବିତ ହଲେନ ।

ବୃକ୍ଷ ଗୋଦରଙ୍ଗ ରୁଷମକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲଲେନ,  
ମାତ୍ରମନ୍ୟନେ ପରିତ୍ରପ୍ତ ହବାର ପର ଥେକେ  
ଦୁନିଆୟ କତ ତାଜ ଓ ତଥ୍ତ ଆମି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେଛି,  
କତ କେଯାନୀ ବାଦଶାହ ଓ ଜାଗତ-ଭାଗ୍ୟ ମହାପୂରୁଷକେ ଦେଖେଛି,  
କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାତ କିଂବା ସାଧାରଣ କାଉକେଇ  
କାଯକାଉସେର ମତୋ ଆତ୍ମସର୍ବଶ ଦେଖିନି ।

ନା ଆଛେ ତାଁର ବୁଦ୍ଧି, ନା ଧର୍ମ ନା ଜ୍ଞାନ,  
ମନ୍ତ୍ରିକ ତାଁର ପ୍ରକଳ୍ପିତ ନଯ,— ହଦ୍ୟେବେ ନେଇ ଶାନ୍ତ ଭାବ ।

ମନେ ହୟ, ତାଁର ମାଥାଯ ମଗଜ ବଲତେ କିଛୁ ନେଇ  
ଏକଟି ଅଭିପ୍ରାୟଓ ତାଁର ସୁନ୍ଦର ଓ ଯଥାଧୋଗ୍ୟ ହତେ ଦେଖିନି ।

ଅଭିତେର କୋନ ଯଶସ୍ଵୀ ବ୍ୟକ୍ତିଇ  
ଆକାଶେ ଉଠାର ସନ୍ଧଳି କରେନନି ।

କଷ୍ମ ଦୈତ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକେ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେ  
ଆବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶେର ରହସ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେଛେ ?

ଦୈତ୍ୟଦେର ମତୋଇ ତିନି ନିର୍ବୋଧ ଓ ଯୁକ୍ତିହୀନ,  
ପ୍ରତିଟି ବାସନାର ତାଡ଼ନାୟ ତିନି ଚକ୍ରଲ ଓ ଅନ୍ତିର ହୟେ ଉଠେନ ।

ଏଇ ବଲେ ବୀରଗଣ ସମ୍ବାଟେର କାଛେ ଉପାଷ୍ଟିତ ହୟେ  
ତାଙ୍କେ ଖୁବ ଡର୍ଶନା କରଲେନ ।

ଶୋଦରଙ୍ଗ ବଲଲେନ, ଆପନି ମାନସିକ ଦିକ ଥେକେ ଅସୁନ୍ଦର  
ରାଜପୁରୀଇ ଆପନାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ଥାନ ।

ସର୍ବଦା ଆପନି ଦୁଶମନକେ ସୁଯୋଗ ଦିଯେଛେନ,  
ଅଥିନ ସନ୍ଧଳି ପ୍ରକାଶ କରେଛେନ ମାନୁଷେର କାଛେ ।

ତିନ ତିନ ବାର ଆପନି ନିଜେର ଉପର ଟେନେ ଏନେଛେନ ବିପଦ,  
ତବୁ ଆପନାର ହିଂଶ ହୟ ନା ।

ମାଞ୍ଜିନ୍ଦିରାନେ ଆପନି ପରିଚାଳନା କରେଛିଲେନ ଏକ ଅଭିଯାନ,  
କିନ୍ତୁ ଭେବେ ଦେଖୁନ, କି ଦୁଃଖେର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପନାକେ ହତେ ହୟେଛିଲ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଆପନି ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ଶକ୍ତର,

ଆକାଶେର ମତୋ ଯୁଦ୍ଧକର ହେଁଛିଲେନ ପ୍ରତିମାର ସାମନେ ।  
ହେ ସମ୍ରାଟ, ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୂର ସାନ୍ନିଧ୍ୟେ ଅବଶ୍ଵାନ କରନ୍ତ,  
ସ୍ଥିଯ ଉତ୍ସୁକ୍ତ ତରବାରିର ଗର୍ବ କରବେନ ନା ।  
ଯୁଦ୍ଧକାମୀ ହେଁ ଧରଣୀବକ୍ଷେ ଆପନି ବିଚରଣ କରେଛେ,  
ତାରପର ହାତ ବାଡ଼ିଯେଛେ ଆକାଶେର ଦିକେ ।  
ଏକଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜୟଳାଭ କରେ  
ଜଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛେ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଯୁଦ୍ଧ ।  
ଚିନ୍ତା କରେ ଦେଖୁନ, କତ ବିପଦେର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପନାକେ ହତେ ହେଁଛେ,  
ଏବଂ କତ ଦୃଢ଼ ଥେକେ ଆପନି ପରିଆଶ ପେଯେଛେ ।  
ଅତପର ଆପନାକେ ବଲା ହଲୋ,—  
ଜୈନେକ ବାଦଶା ଆକାଶେ ଆରୋହଣ କରେଛିଲେନ ।  
ତିନି ନିରୀକ୍ଷଣ କରେଛିଲେନ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟ,  
ଏବଂ ଗଣନା କରେଛିଲେନ ନଷ୍ଟତ୍ରଦଲେର ସଂଖ୍ୟା ।

ହେ ସମ୍ରାଟ, ଜାଗ୍ରତ ଚିତ୍ତ ନରପତିଗପ ଯା କରେଛେ ତା କରନ୍ତ,  
ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୂର ପ୍ରଶଂସା କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ ଓ ମାନୁଷେର ଶୁଭାକାଙ୍କ୍ଷଗପ  
ଯା କରେଛେ ତାଇ କରନ୍ତ ।  
କ୍ଷମତାର ଆସ୍ଫାଲନେର ବଦଳେ ଆଲ୍ଲାହର ଦାସତ୍ତ ହେକ ଆପନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ,  
ଆପନାର ହତ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେକ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୂର ଇଚ୍ଛାର ଦ୍ୱାରା ।  
ବୀରାଘ୍ରଗ୍ରହ୍ୟଦେର ଏହି ଭାସ୍ୟ ଶୁଣେ  
କାଉସ ଲଞ୍ଜିତ ଓ ଚିନ୍ତାନ୍ଵିତ ହଲେନ ।  
ତାଁଦେର କଥାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ତିନି ବଲଲେନ,  
ସତ୍ୟ ପଥ ଥେକେ ଆମି ଆର ବିଚ୍ଛୁତ ହବ ନା ।  
ଆପନାରା ଯା ବଲଲେନ ତା ଯଥାର୍ଥ,  
ଆପନାଦେର ଉପଦେଶ ଆମି ଭୁଲବ ନା ।  
ତାରପର ଅନୁତାପେର ଅଶ୍ରୁ ମୋଚନ କରେ  
ତିନି ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୂର ଶରଣପତ୍ର ହଲେନ ।  
ଯଥାସମୟେ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ ହଲେ  
ଦଶୀଭୂତ ଅନ୍ତର ନିଯେ କାଉସ ଶିବିକାୟ ଉଠେ ବସଲେନ ।  
ଉନ୍ନତ ସିଂହାସନ ସମୀପବତ୍ତୀ ହଲେ,  
ସମ୍ରାଟେର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଲଜ୍ଜାୟ ସଞ୍ଚୁଚିତ ହେଁ ଏଲୋ ।  
ତାରପର ଚତ୍ରିଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୂର ସମୀପେ  
ମଞ୍ଚକ ଅବନତ କରେ ଶମାପ୍ରାଣୀ ରହଲେନ ।

লজ্জায় রাজপুরীর দ্বার অতিক্রম করলেন না,  
আত্মগ্লানিতে নিজেরই মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রাইলেন।  
তাঁর চক্ষু থেকে দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো,  
দয়া ও পথ প্রদর্শনের প্রার্থী হয়ে রাইলেন তিনি আল্লাহর সমাপ্তে।  
এইভাবে অনুত্তাপ তাঁর দৃঢ়খ ও মনোবেদনকে দূর করে দিলো  
তিনি বহু ধনরত্ন দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার আদেশ দিলেন।  
তারপর মৃত্তিকায় ললাট ঘর্ষণ করে  
উচ্চারণ করলেন পবিত্র বিশু-প্রভুর গুণগ্রাম।  
এইবার তাঁর অবিরত কান্না  
বিশু-প্রভুর দয়াকে আকর্ষণ করে আনলো।  
দলে দলে দেশের চারদিক থেকে  
সম্মাট কায়কাউসের দিকে ছুটে আসতে লাগলো সৈন্যগণ।  
করুণাময়ের দয়ায় আবার আলোকিত হলো চতুর্দিক,  
বুঝা গেলো, সম্মাট অমঙ্গল থেকে রেহাই পেয়েছেন।  
এবার তিনি স্বর্ণ-সিংহসনে আরাড় হয়ে  
সৈনদের মধ্যে ধন বিতরণ করলেন।  
এবং দেশে জারি করলেন নব বিধান,  
ছেট বড় সবার মুখ আনন্দে উজ্জ্বলিত হলো।  
দুনিয়া যেন তাঁর দানে বিমঙ্গিত হলো রেশমের আস্তরণে  
সম্মাট আবার সর্বত্র তাঁর সিংহসনের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেন।  
প্রতিটি রাজ্যের সামন্ত  
সম্মাটের সামনে মস্তক অবনত করলো।  
কাল যেন নতুন করে শুরু করলো তার যাত্রা,  
করুণা ও শুভ প্রতিশ্রুতি সম্মাটের তাজ ও তথ্তকে  
ধূয়ে অমলিন করে দিলো।  
দেশের সকল অভিজাত ও দলপতি  
তাঁর সামনে আনুগত্যে কোমর বৈধে দণ্ডায়মান হলো।  
রত্ন-খচিত মুকুট ও গোমুখাক্ষিত প্রহরণে সজ্জিত হয়ে  
সম্মাট সিংহসনে বসলেন।  
নতুন করে যেন তাঁর যাত্রা শুরু,  
পরিপূর্ণ অস্তর, যশ ও সাফল্যে বিমঙ্গিত হলো তাঁর জীবন।  
সকল আসর ও প্রাস্তরে তাঁর সন্তা বিচরণ করে ফিরতে লাগলো,  
তূস ও রুক্ষমের মতো বীরগণ হলেন তাঁর সঙ্গী।

সর্বত্র বাদশার দান ঘরে পড়তে লাগলো,  
সমস্ত দুনিয়া পেলো তাঁর কল্যাণের পরশ।  
যশষ্মী বীরবৃন্দ ও অভিজাতগণের দ্বারা  
পৃথিবী আবার আবাদ হয়ে উঠলো  
সম্ভাট যেন জামশেদের স্থলাভিষিক্ত হলেন,  
হলেন ফারেদুনের প্রতিনিধি,  
তাঁর মতো বাদশা যেন কেউ কখনো দেখেনি।  
এইভাবে বাদশার অস্তর ধর্মে-কর্মে নিবিট হল  
তাঁর জয়জয়কারে পূর্ণ হয়ে উঠলো দশদিক।

## সপ্তরথীর যুদ্ধের কাহিনী

মৃত্যুর অমোদতার বিরুদ্ধে যেমন কিছু করা চলে না,  
তেমনি রুষ্মের জেদ,— সেই কাহিনী এখন শোন।  
কায়কাউসের কাহিনী মূলতুবী রেখে  
এখন বীরগণের যুদ্ধের কথা শুরু করছি।  
বীরগাথা কীর্তনকারী গায়ক কি সুন্দর বলেছেন,—  
প্রয়োজনের মুহূর্তে অবলম্বন করতে হয় সিংহের বিক্রম।  
যদি বীর নামের উপযুক্ত হতে চাও,  
তবে হিন্দুস্তানী তলোয়ারের রক্তে হস্ত প্রশ্নালন করো।  
যুদ্ধের মুখোমুখী হবে,  
বিপদ থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজো না।  
সময় যদি তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে  
তবে তুমি তার থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।  
জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্যুকেও যদি সঁপী করে নাও,  
তবেই তুমি বীর নামের যোগ্য।  
বিবেক ও ধর্মের অনুগত হও,  
সৎ প্রসঙ্গকে করো অস্তরের অলঙ্কার।  
আমার বয়স ষষ্ঠি বৎসর পূর্ণ হয়েছে,  
দুঃখ ও বিপদে আমি সর্বদা কোমর বেঁধে রেখেছি।  
পরলোকে যাত্রার সময় আমার হয়ে এসেছে,  
প্রভুর নৈকট্যেই আমি লাভ করবো সুখের হান।  
সেখানকার সুখ আমার তিক্ত স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিবে,  
আমার অতীতকে করে দিবে বিলুপ্ত।  
এখন যুধান রুষ্মের এক কাহিনী তোমাকে বলবো।

একদা রুষ্ম এক আনন্দিত আসরের আয়োজন করবেন।  
সর্বত্র তাঁর দৃত গিয়ে  
তাঁর সুউচ্চ প্রাসাদের আমত্রণ জানিয়ে এলো।  
যেন এক অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে  
আমত্রণ করা হলো আলোর।  
ইরানের মহস্তমগণ এসে সমবেত হলেন সেখানে।  
তৃস গোদরজ, বাহরাম ও গেও এলেন;

এলেন গুরগীন, শুস্তাহাম, বরঞ্জীন  
ও খার্দা-এর মতো যোদ্ধুগণ।  
তাঁরা প্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব সৈন্যদলসহ  
রুস্তমের আমন্ত্রণ রক্ষায় এগিয়ে এলেন !  
রুস্তম সেই বীরগণ সমভিব্যাহারে  
এমন এক উৎসবের আয়োজন করলেন  
যাতে উপস্থিত থাকার বাসনা করলো স্বয়ং চন্দ্রসূর্য।  
ইরানের সৈন্যদল দীর্ঘদিন ধরে  
রণবাদ্য, অশ্বসজ্জা ও মৃগয়া থেকে বক্ষিত।  
কয়েক দিন ধরে চললো উৎসবের আনন্দ,  
নৃত্যগীত ও সুরাবাদ্যে সকলে হৃদয় নন্দিত করে চললো।  
সহসা একদিন উৎসব-মন্ত্র গেও  
রুস্তমকে সম্বোধন করে বললেন, হে যশব্দী বীর,  
এখন যদি আপনি মৃগয়ার আয়োজন করতেন,  
যদি চিতাবাধের মতো প্রধাবিত হতেন শিকারের উদ্দেশে ;  
যদি বীরপ্রবর আফ্সিয়াবের মৃগয়া-প্রাণ্তরের দিকে  
আমরা সূর্যসদৃশ বর্ম পরে অগ্রসর হতাম ;  
এবং অশুরোহীদের পদধূলিতে আকাশ আচ্ছন্ন করে  
শ্যেনপক্ষীসহ বর্ণা উন্নীত করে দ্রুত ধাবমান অশু থেকে  
তরবারির আঘাত হানতে পারতাম ব্যাত্রুদলের উপরে ;  
এবং শ্যেনপক্ষী ও চিতা লেলিয়ে দিয়ে  
হরিণ ও হংসদল ধরে আনতে পারতাম, তবে কত না আনন্দ হতো !  
তৃত্বানের বন-প্রান্তর মথিত করে  
যদি এইভাবে মৃগয়া ধরতে পারতাম  
তবে আমাদের নাম অক্ষয় হয়ে থাকতো মানুষের স্মৃতিতে।  
বাদশাগণ আমাদের এই কৌর্তি উল্লেখ করে  
আমাদের প্রশংসা উচ্চারণ করতে পারতেন।  
কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে  
মৃগয়ার উদ্দেশে শুরু হবে আমাদের যাত্রা।  
দূর করে দিন সুরা ও পাত্র, বিপর্যস্ত করুন-আসবের আনন্দ।  
রুস্তমের মতের প্রতিধ্বনি করলেন সবাই,  
কেউ কোন প্রতিবাদ তুললেন না।  
পরদিন উষাকালে নিদ্রা ভঙ্গ হলে সবাই যাত্রার আয়োজন করলেন।

তাঁরা সঙ্গে নিলেন শিকারী বাজ ও চিতাবাঘ।  
আফ্রাসিয়াবের মৃগয়াভূমির একদিকে পাহাড় ও অন্যদিকে নদী।  
সেই প্রান্তরের অপর দিকে রয়েছে দূর-বিস্তৃত বনভূমি,  
ছাগল ও হরিণমৃথ সেখানে ঘুরে বেড়ায়।  
অভিযাত্রীদল নদীতীর অতিক্রম করে সেই প্রান্তরে এসে  
উপস্থিত হলেন,  
হরিণদল ভয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।  
প্রান্তর অতিক্রম করে বীরগণ  
পদরক্ষা করলেন মৃগয়াভূমিতে।  
সঙ্গে সঙ্গে ঘেরাও পড়লো মৃগয়াপূর্ণ বনপ্রান্তর,  
শিকারীদলের উচ্চ চিংকার-ধ্বনি বাযুস্তরে কম্পন জাগালো।  
ভয়ে আত্মগোপন করলো হিংস্র ব্যাঘদল,  
চঞ্চল হলো উজ্জীয়মান পক্ষীদল।  
চারদিকে শরজালে হন্যমান পশুপক্ষী  
চিংকার করে উঠলো।  
বীরগণ মৃগয়ার আনন্দে প্রফুল্লিত হয়ে উঠলেন।  
যথারীতি বীরগণের শিবিরে সঙ্গীতের আসর বসলো।  
সুরাপাত্র হাতে নিয়ে তাঁরা  
রুবাবের ঝঙ্কারে শ্রবণ নন্দিত করে চললেন।  
এইভাবে সুরা-সঙ্গীতে একটি সপ্তাহ গত হয়ে গেলে  
অষ্টম দিনের প্রভাত বেলায়  
সৈন্যদের কাছে রুস্তম এক প্রস্তাব করলেন।  
তিনি বললেন, হে বীরেন্দ্রবন্দ, হে বিজয়ভিলাষী সেনানায়কগণ,  
এতদিন অবশ্যই আফ্রাসিয়াব  
আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়েছেন।  
কাজেই সেই অপবিত্র দুষ্ট যাতে  
তার সেন্যদল নিয়ে এসে আমাদের মৃগয়ায়  
বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে তঙ্গন্য একদল সৈন্য  
পথে তাদের আগমন লক্ষ্য করে দেখবে।  
এবৎ সময় মতো এসে আমাদের খবর দিবে,  
যাতে শক্রগণ আমাদের পথ রোধ করতে না পারে।  
রুস্তমের প্রস্তাব শুনে  
একদল সাহসী সৈন্য তখনি কোমর বেঁধে এসে দাঁড়ালো।

তাদের প্রধান বললো,  
আমরা সানন্দে এই কাজে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।  
জবাবে রুক্ষম বললেন, ধন্য,  
এগিয়ে যান তবে নদীতীর পর্যন্ত  
এবং সেখান থেকে লক্ষ্য রাখুন পথের দিকে,  
ও আপনার অধীনস্থ সিপাহীদের রক্ষা করুন।

রুক্ষমের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য করে  
বীর নায়ক সৈন্যদলসহ এগিয়ে গেলেন।  
যশস্বী সেনানায়কগণ আবার  
মৃগয়ার আনন্দে আত্মনিয়োগ করলেন।  
এদিকে এক অঙ্ককার রাত্রে  
আফ্রাসিয়াব তাঁদের আগমন জানতে পেরে  
স্বীয় বীর সেনাপতিদের কাছে  
রুক্ষম সম্পর্কে অনেক কথা বললেন।  
ইরানের সপ্তরয়ীদের বীর্য  
ও সাহসের কাহিনীও বিবৃত করলেন।  
তারপর সৈন্যদের সম্বোধন করে বললেন,  
দেখো, আমাদের হাতে এক বিশ্বয়কর শিকার এসে পড়েছে  
এখন উপায় চিন্তা করে  
অকস্মাত তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে হবে।  
যদি এই সপ্তরয়ীকে আমরা পরাজিত করতে পারি,  
তবে কায়কাউসের জন্য আমরা দুনিয়াকে  
সংকীর্ণ করে দিতে পারবো।  
বাদশার এই প্রস্তাব তুরানের সৈন্য ও সেনাপতি  
সকলেরই মনপূত হলো।  
খ্যাতিমান সেনাপতিগণ বললেন,  
আর বিলম্ব করা আমাদের জন্য উচিত হবে না।  
শিকারীর মতো এখনই আমাদের এগিয়ে গিয়ে  
অতকিংত তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে হবে।  
ত্রিশ হাজার বীর সিপাহী  
তুরানের যশস্বীদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হলো।  
তারপর তাদেরকে বলা হলো, লক্ষ্য অভিমুখে

দিন-রাত্র এগিয়ে যেতে হবে।  
যথাসময়ে সৈন্যগণ মাথা উচু করে  
বনভূমির পথ ধরে অগ্রসর হলো।  
মৃগয়াভূমির নিকটে এসেই তারা  
ইরানীয়দের প্রতি দীর্ঘ ও জিঘাংসায় কোমর বাঁধলো।  
এমন সময় ইরানী রক্ষাদল  
দূরে দেখতে পেলো শত্রু-সৈন্যের পদধূলি  
সেই ধূলিতে যেন আকাশ-প্রান্তে মেঘ করে এসেছে।  
তারা তৎক্ষণাত কোলাহল উত্থিত করে  
মৃগয়াভূমিতে ফিরে এসে দেখলো,  
মহাবীর কুষ্টম সৈন্যগণসহ পানাহারে নিরত রয়েছেন।  
তারা কুষ্টকে সম্বোধন করে বললো, হে বীরপ্রবর,  
এখন আনন্দ থেকে বিরত হোন।  
বেশুমার শত্রু-সৈন্যে প্রাত্র উপত্যকা ছেয়ে গেছে।  
নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী আফ্রাসিয়াবের ঝাণা  
চমক দিয়ে উঠেছে সূর্যের মতো।  
কুষ্টম এই বার্তা শুনে অট্টহাসি করলেন,  
বল্লুন, সৌভাগ্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।  
তুর্কীদের বাদশা ও তুরানের সৈন্যবাহিনী দেখে  
তোমরা ভয় পেলে কেন?  
সৈন্যদল নিশ্চয় একশো হাজারের বেশী নয়,—  
অশুরোহী, বর্ধারী ও সশস্ত্র ?  
এই প্রান্তরে যদি একা আমিই থাকি  
আর থাকে আমার রাখ্শ ও বর্ষ মাত্  
তবু আফ্রাসিয়াব ও তার বিপুল সৈন্যসজ্জাকে  
তুচ্ছ জ্ঞান করি।  
যদি এখানে একাই আমাকে লড়াই করতে হয়,  
তবু সারা তুরান রাজ্যের সেনাবাহিনীকে আমি স্বল্প বলেই জ্ঞান করি।  
যুদ্ধ সংঘটিত হলে ইরান থেকে আমি সৈন্যবাহিনী তলব করবো না।

যথাসময়ে অস্ত্রধারী হয়ে  
সপ্তরথী এসে একত্রে জমায়েত হলেন।  
এক-একজনের সঙ্গে নির্দেশিত হলো

আড়াই হাজার করে বর্ণাধারী অশ্বারোহী।  
যদি অধিনায়ক আঙ্গুসিয়াব  
নদীতীরে যুদ্ধের সূচনা করে  
তবে অবশ্যই নিয়তি তার জন্য আজ প্রতিকূল হবে  
হে জাবুল-দেশীয় সুরাপায়ী, পাত্র সুরায় পূর্ণ করো।  
হে সাকী, দাও সুরা,  
রুপ্তম তোমার দানে আজ আনন্দিত হবে।  
এই বলে রুপ্তম উজ্জ্বল সুরাপাত্র হাতে নিয়ে  
প্রথমে উচ্চারণ করলেন কায়কাউসের নাম।  
বললেন, হে যুগ-সম্মাট, আপনার স্মৃতি অক্ষয় হোক,  
প্রফুল্লিত থাক আপনার দেহ-মন চিরকাল ধরে।  
মৃত্তিকা চুম্বন করে মহাবীর দ্বিতীয়-পাত্র হাতে নিলেন  
এবং উচ্চারণ করলেন বীরপ্রবর তূসের নাম।  
এইবার অন্যান্য রথী উঠে দাঁড়িয়ে  
মহাবীরকে যুদ্ধসাঙ্গে সজ্জিত করার বাসনা প্রকাশ করলেন।  
বললেন, এই সুরাপান আপনাকেই মানায়,  
স্বয়ং শয়তান আজ আপনার হাতে পরাজিত হবে।  
সুরা, প্রহরণ ও রণ-প্রাণ্তর  
আপনি ছাড়া আর কারো হাতে আসবার নয়।  
এইবার রুপ্তম জওয়ারার নামে  
লাল জাবুলী সুরা পান করলেন হলুদ পাত্রে।  
জওয়ারাও তার প্রত্যুভৱে সম্মাটের নাম স্মরণ করে  
সুরাপাত্র হাতে নিলেন ও মৃত্তিকা চুম্বন করলেন,  
রুপ্তম তাঁকে জানালেন তাঁর অভিনন্দন।  
বললেন, ভায়ের হাত থেকে ভাই যখন  
পান করে হৃদ্যতার সুরা  
তখন উৎসাহ পরিবর্ধিত হয়, ও দূরীভূত হয় শোক ও দৃঢ়খ !  
এইভাবে চললো সুরা পাত্রের আবর্তন,—  
তাতে আনন্দ পরিবর্ধিত হলো, দূরীভূত হলো দুশ্চিন্তা।

## তুরানীদের সঙ্গে রুস্তমের যুদ্ধ

রুস্তমকে সম্বোধন করে গেও বললেন,  
হে বাদশা ও বীরগণের গর্ব,  
আমরা আফ্রাসিয়াবকে নদীর এপারে আসতে দিব না।  
সেতু মুখেই আমরা সেই দুষ্ট-বুদ্ধি রাজাকে  
দীর্ঘক্ষণ বাধা দিয়ে রাখবো।

আমাদের বীরগণ ততক্ষণ  
সুরার মন্ততা অতিক্রম করে অস্ত্রসজ্জিত হবে।  
এবৎ সেতুমুখেই শরজালে শক্র গতিরোধ করবে।  
পরামর্শক্রমে ইরানীয়গণ সেতুমুখে উপস্থিত হয়ে  
দূরে আফ্রাসিয়াবের বাণ্ডা দেখতে পেলো।  
নদীতীরে ত্রুমে তুরানীয় সিপাহীদের সম্মুখভাগে  
আবির্ভূত হলেন আফ্রাসিয়াব।

অগ্রসরমান গেও তখন  
রুস্তমকে অবস্থা সম্যক অবগত করালেন।  
রুস্তম তৎক্ষণাত তাঁর ব্যাঘ-মুখাক্ষিত মুকুট পরে  
মদমত হস্তীর পিঠে আরোহণ করলেন।  
ইরানীয় বীরগণ রুস্তমের পরিচালনায় ভীষণ নক্তের মতো  
শক্র সম্মুখীন হলো  
আফ্রাসিয়াবের বর্ম চোখে পড়তেই  
বীরপ্রবর রুস্তমের সারাদেহে চক্ষল হয়ে উঠলো রক্তের ধারা।  
তিনি মন্তক উন্নীত করে কাঁধে তুলে নিলেন  
তাঁর বিখ্যাত প্রহরণ।

তৃস, গোদর্জ, গুরগীন, গেও, বাহ্রাম  
এবৎ মহারথী ফরহাদ ও বরজীন প্রমুখ  
ইরানের বিখ্যাত সেনানায়কগণ বর্ণা ও হিন্দুস্তানী তরবারি হাতে  
উদ্যত ব্যাঘদলের মতো যুদ্ধার্থ অগ্রসর হলেন।  
সেনাপতির আদেশে আক্রমণের সূচক  
দুর্দুতি ও বিষণ নিনাদিত হলো।  
তরবারি, বর্ণা ও প্রহরণ হাতে অশ্বারোহী বীরগণ  
ইরানীয় সৈন্যদলসহ রক্তের স্রোতে ঝাপিয়ে পড়লেন।  
যুদ্ধের ময়দানে গেওর অবস্থা এমন হলো যে,

ব্যাপ্ত যেন তার মৃগয়া হারিয়ে ফেলেছে।  
তিনি সামনে পেছনে প্রহরণায় আত্ম  
উন্নতির প্রতিপক্ষের পৃষ্ঠদেশ কুর্জ করে চললেন।  
ইরানীয় সৈন্যগণ ব্যাপকভাবে নিহত হতে লাগলো,  
তাদের যশস্বীদের ভাগ্য—সূর্য একটি—একটি করে হতে লাগলো অস্ত্রমিত।  
স্থীয় সৈন্যের এহেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন দেখে  
বিষাদিত হয়ে উঠলো তূরান—রাজের মন।  
এমন সময় বীরপ্রবর গুরগীন যেদিকে  
তরবারি ও প্রহরণসহ ইস্পাতের প্রাচীর রচনা করে রেখেছেন—  
সেদিকে গুরজম নামে এক তূরান সেনাপতি  
বীর—বিক্রমে ধাবিত হলো।  
গুরগীন শক্তকে সম্মুখবর্তী দেখে  
টেনে নিলেন তাঁর ধনুংশর।  
এবং নিদারণ টক্কারে বর্ষণ করে চললেন শরজাল,  
বসন্ত বায়ু যেন বৃষ্টি ধারায় আক্রান্ত হলো।  
গুরজম তখন ঢালচর্মে মস্তক রক্ষা করে  
গুরগীনের দিকে ধাবিত হলো।  
এবং মহারোষে নিষ্কিপ্ত করলো এক বর্ণা  
গুরগীনের অশ্বের শির লক্ষ্য করে।  
এমন সময় সেখানে গেও উপস্থিত হয়ে দেখলেন,  
গুরগীন তাঁর অশ্ব হারিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন।  
ক্রোধে তিনি গুরজমকে লক্ষ্য করে  
উথিত করলেন এক সিংহ—গর্জন।  
এবং অগ্রসর হয়ে তার কোমরবন্ধ ধরে টেনে,  
তাকে অশৃপৃষ্ঠ থেকে বিযুক্ত করে দিলেন।  
এবং সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জর দ্বারা বিদীর্ণ করে দিলেন তার বক্ষদেশ,  
সেই দৃশ্যে বীরগণের হৃদয় ভয়ে কেঁপে উঠলো।  
ভারী প্রহরণ নিয়ে  
সেনাপতি গোদৱ্রজ প্রতিপক্ষের শির বিচূর্ণ করে চললেন।  
তাজা দম নিয়ে তিনি এবার বীর—বিক্রমে  
পরিচালনা করলেন হামলা।  
তাঁর আক্রমণের তীব্রতায়  
তূরানী সৈন্যদলে কোলাহল উথিত হলো।

এইবার জওয়ারা ধনুতে শর সংযোজন করে  
বীর-দর্পে এগিয়ে এলেন।  
শূরশ্রেষ্ঠ গুরগীনও বাযুগতিতে  
স্থীয় বীর সৈনিকগণকে নিয়ে অগ্রসর হলেন।  
স্থনামধন্য ফরহাদ ও বরজীনও  
তরবারি উচ্চুক্ত ও প্রহরণ উদ্যত করে ধাবিত হলেন সামনের দিকে।  
মহাবীর গেও তখন বাদশা আফ্রাসিয়াবকে লক্ষ্য করে  
সিংহনাদ করলেন।

বললেন, হে হতভাগ্য অপমানিত তুর্কী-রাজ  
আবার কেন দৃঢ় টেনে আনছো ?  
বিগত যদ্দের কাহিনী কি এমন করেই ভুললে যে,  
আবার এগিয়ে এসেছো সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ?  
তবে শুনে নাও ইরানের বিখ্যাত বীরগণের নাম  
য়ারা আজ এই যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত।  
রুস্তমের মতো সেনাপতি তুসের মতো বীর,  
গোদর্জ ও গুরগীনের মতো অসমসাহসী অশুরোহী  
আজ তোমার সৈন্যদলকে দলিত করবেন,  
ধূলায় লুটিয়ে দিবেন তোমার সকল মান-মর্যাদা।  
এমন সময় প্রাস্তরের এক কোণ থেকে মহাবীর রুস্তম  
সগর্জনে বললেন, হে অলক্ষণে,  
কেন আমার সামনে প্রধাবিত করেছো অশুদল ?  
কেন দলবলসহ সজিত করেছ রণক্ষেত্র ?  
যেখানে জিঘাংসা-পরায়ণ রুস্তম উপস্থিত রয়েছেন  
সেখানে সৈন্যদল, সিংহাসন, শাহানশাহ কোন কাজেই আসবে না।  
এই যুদ্ধে আমার সৈন্যদলের প্রয়োজন নেই,  
তুরানের সকল সৈন্যবাহিনীর জন্য আমি ও গেও-ই যথেষ্ট।  
এই বলে তিনি উজ্জ্বল তরবারি কোয়োমুক্ত করে  
মেঘগর্জনসহ উঞ্চিত হলেন।  
এবং পুনরায় আফ্রাসিয়াবকে ডাক দিয়ে বললেন,  
রে উম্মাদ দুষ্ট-কুলজাত,  
তুই কি আবার পৌরুষের ময়দানে  
পরাজয়ের কানু কাঁদতে এসেছিস ?  
তার চেয়ে ভালো হতো যদি যবনিকান্তরালে মেঘেদের মধ্যে বসে

চরকায় বসে সুতা কাটতিস।  
যাক, যুদ্ধের ময়দানে এখন তুই  
নিজ কর্মের পরিণাম দেখতে পাবি।  
নরপুসবের হস্তধৃত খর করবাল  
এখুনি তোর রণপিপাসা চরিতার্থ করবে।  
আমার হাতের হিন্দুস্তানী তরবারির ঘা খেয়ে  
এখুনি তোর বর্ম ও শিরস্ত্রাণ তোর উপর রোদন করবে।  
রুস্তমের কথা শুনে আফ্রাসিয়াবের অন্তর বিষণ্ণ  
ও নিঃশ্঵াস রঞ্জ হয়ে আসার উপক্রম হলো।  
রুস্তমের ভয়ে স্তবু হয়ে গেলো তাঁর গতি,  
তিনি আর অগ্রসর হতে সাহস পেলেন না।  
একটু ছির হয়ে মনুষ্বরে তিনি তাঁর সেনাপতিদের ডাকলেন।  
রুস্তম এই দৃশ্য দেখে প্রহরণ হাতে নিয়ে  
তূরান-রাজকে যুদ্ধার্থ আহ্বান জানালৈঁ;  
তিনি এসে দাঁড়ালেন সৈন্যদলের সামনের সারিতে  
এবং ক্রোধে সিংহের মতো গর্জন করতে লাগলেন।  
তাঁর পিছনে সূদৃঢ় বর্মে ও লোহগদায় সজ্জিত হয়ে  
এসে দাঁড়ালো কুশওয়াদের পুত্র।  
ইরানের বীর অশ্বারোহিগণ  
প্রহরণ ও তাঁর ধনুক হাতে নিয়ে অগ্রসর হলো।  
তাদের খরশান তরবারির ভয়ে  
ধরণী যেন পাতালে প্রবিষ্ট হবার উপক্রম করলো।  
তূরানী সিপাহীদের চক্ষু ধার্ধিয়ে দিয়ে  
রুস্তম তাঁর মাথায় তুলে নিলেন তাঁর শিরস্ত্রাণ।  
আফ্রাসিয়াব তাঁর দলের প্রবন্ধদের জিজ্ঞাসা করলেন,  
আমরা কি যুদ্ধকামী বীর নই?  
আমি তো রণক্ষেত্রে শিবাদল প্রত্যক্ষ করছি,  
শক্র-বৃহ ও আমাদের মধ্যের স্থানও দেখছি সংকীর্ণ।  
তূরানের বীরগণের মধ্যে আপনারাই শ্রেষ্ঠ,  
বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ও সাহসিকতায় আপনারা অতুলনীয়।  
সুতরাং একযোগে অশু-বল্কা ধারণ করুন,  
এবং বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হয়ে রণক্ষেত্র শক্র-শূন্য করুন।  
যদি বিজয়ী হতে পারেন তবে ইরানদেশ আপনাদের;

হস্তীর বিশালতা ও সিংহের পাঞ্চা আপনাদের।  
আফ্রাসিয়াবের বাণী শুনে সেনাপতিগণ  
তৃণগতি বায়ুর মতো প্রধাবিত হলো।  
তাদের সঙ্গে নিলো দশ হাজার সশস্ত্র সাহসী বীর।  
এবং তারা ধাবন্ত অগ্নির মতো  
রুক্ষমের নিকটবর্তী হয়ে চললো।  
রুক্ষম তখন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগলেন,  
মনে হলো, তিনি যেন সূর্য থেকে আহরণ করে এনেছেন উজ্জ্বল  
তিনি অশু উত্তেজিত করে সগর্জনে ধাবিত হলেন  
যেন উচ্ছুসিত হয়েছে বন্যাক্রান্ত নদী।  
ঢালচর্মে শির আবৃত করে হিন্দী তরবারি হাতে  
তিনি দুদিকের শক্রসৈন্য নিহত করে চললেন।  
আফ্রাসিয়াব রণক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করে  
তাঁর বিখ্যাত সেনানায়কদের সম্বোধন করে বললেন,  
সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি এইভাবে যুদ্ধ চলে  
তবে একটি সিপাহী ও জীবিত থাকবে না।  
কোথায় তোমরা জিঘাংসা-পরায়ণ বীর সেনানীবৃন্দ ?  
ধাবিত হও ইরান-বীরগণের অভিযুক্তে।  
মন্দকুল-জাত রুক্ষমকে যে ধূলায় পাতিত করবে,  
তাকে দান করবো তাজ, তখত ও কটিবন্ধ।  
আফ্রাসিয়াবের এই উদ্ভিত বাণী তাঁর সৈন্যদের  
শ্রিয়মাণ ভাগ্যকে উত্তেজিত করলো।

## ইরানীয়দের সঙ্গে পীলসমের যুদ্ধ

পীলসম নামে এক বীর ছিল —  
সে ছিল রাজবংশোন্তুত ও যশস্বী।  
তার স্বনাম—খন্য পিতার নাম ওয়েসা,  
ও তার ভাতা বিজয়ী পীরান।

ইরান ও তুরানে একমাত্র রুস্তম ছাড়া  
তার সমকক্ষ বীর আর ছিল না।  
পীলসম আফ্রাসিয়াবের এই বাণী শুনে  
ক্রোধে জ্ব কুক্ষিত করে  
বাদশাকে সম্বোধন করে বললো,  
বীরবন্দের এই সারিতে আমি বীরোত্তম।  
শূরশ্রেষ্ঠ তুস আমার সামনে ধূলিবৎ,  
যশস্বী সিংহ—পুরুষ গেও আমার সামনে তুছ।  
বীরপ্রবর বাহুম ও বহু যুদ্ধজয়ী শুরায়া  
কাউকেই আমি পরোয়া করি না।  
বাদশা যদি আমাকে আদেশ করেন  
তবে এখনি ব্যাপ্তের মতো ঝাপিয়ে পড়ি শত্রু—বীরদের মধ্যে,  
এবং তরবারির আঘাতে ছিন্ন করি তাদের শির  
তাদের ভাগ্যের পূর্ণচন্দের মেবদলের অন্তরালে পাঠিয়ে দিই  
এবং তাদের প্রধানের শির লুটিয়ে দিই ধূলায়  
তরবারির এক মোক্ষম আঘাতে।  
পীলসমের কথা শুনে বাদশা বললেন,  
হে বীরোত্তম যৌবনশালী বীর,  
আপনি এই যুদ্ধে সকল শত্রুর উপর  
বিজয়ী হোন এই কামনা করি।  
এই যুদ্ধ আপনার সৌভাগ্যের কারণ হোক,  
জয় ও যশ নিয়ে আপনি প্রত্যাবর্তন করুন।  
সুফল প্রদানকারী বিশ্ব—প্রভু আপনার সহায় হোন,  
আর ঈর্ষাকামীদের শির হোক অবনত।  
যখন আপনি যশস্বী রুস্তমের সম্মুখীন হবেন,  
তখন পূর্ণ প্রতিহিস্পায় কোমর বাঁধবেন।  
লক্ষ্য রাখবেন যুদ্ধে সে অকৃতোভয়,

অত্যন্ত কুশলী ও রক্তপিপাসু।  
কিন্তু আপনি এই হতভাগ্য পাপিষ্ঠের উপর জয়যুক্ত হবেন,  
মনে রাখবেন, এই যুদ্ধের সকল সমারোহ তারই থেকে।  
বাদশার কথা শুনে পীলসম  
ঢকা-নিনাদে গর্জন করে উঠলেন।  
তারপর বাযুগতি কৃষ্ণাভ অশ্বে সওয়ার হয়ে  
নির্ভীক চিত্তে মুখ করলেন রণক্ষেত্রের দিকে।  
অবলীলায় ইরানী সৈন্যদলের রক্ষা-ব্যুহ বিদীর্ঘ করে  
তরবারি ও প্রহরণের আঘাতে তিনি স্বীয় পথ করে চললেন।  
ভিতরে প্রবেশ করেই পীলসম গুরুগীনকে দেখতে পেয়ে  
উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করে উঠলেন।  
এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অশ্বের মস্তকে তরবারির আঘাত হানলেন  
সে-আঘাতে বাযুগতি অশ্ব মুখ খুবড়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।  
গুস্তাহাম এই দশ্য দেখে  
অগ্নিগোলকের মতো স্বীয় অবস্থান থেকে বিচলিত হলেন,  
ও প্রমত্ত সিংহের মতো পীলসমের দিকে অগ্রসর হয়ে  
তাকে সংগ্রামে নিরত করলেন।  
তিনি পীলসমের কটিদেশ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন এক বর্ষা,  
কিন্তু সেই আঘাত তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারলো না।  
বর্ণাদণ্ড ভগ্ন হয়ে পীলসমের হাতে ধরা রইলো  
ও তিনি তা দূরে নিক্ষেপ করে দিলেন।  
এইবার পীলসম জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে  
টেনে নিলেন তাঁর তরবারি।  
এবং নিদারণ শক্তিতে গুস্তাহামের লৌহ-শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে  
আঘাত হানলেন।  
সেই আঘাতে গুস্তাহামের শিরস্ত্রাণ  
কন্দুকের মতো দূরে ছিটকে পড়লো।  
গুস্তাহাম শূন্যমস্তক ও বর্ণাহীন হয়ে  
রণক্ষেত্রে অসহায় বোধ করতে লাগলেন।  
এমন সময় ব্যুহের দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে  
বীরপ্রবর শাওর্বী তা লক্ষ্য করলেন  
ও দ্রুতগতি ভয়চকিত গুস্তাহামের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন।  
প্রমত্ত সিংহ কিংবা রণ-পাগল হস্তীর মতো

তিনি পীলসমকে আক্রমণ করলেন।  
সাহসী নক্রও তখন হিন্দুস্তানী তরবারি হাতে  
সেই আক্রমণের মোকাবেলায় এগিয়ে এলো।  
পীলসম তাঁর তরবারির আঘাতে ইরানীয় বীরের বর্ম  
হিন্ম করে তাঁর অশ্বের শির ধূলায় লুটিয়ে দিলেন।  
বীরবর তখন মাটিতে লাফিয়ে পড়ে  
বর্ম পরিত্যাগ করে বঙ্কন করলেন কঠিদেশ।  
ও মাটিতে থেকেই যশস্বী প্রতিপক্ষের সঙ্গে  
যুদ্ধে নিরত হলেন।  
পরম্পরের ভীষণ দৃন্দযুদ্ধে  
আকাশ ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।  
বুহের মধ্যভাগ থেকে গেও দেখলেন,  
ইরানী বীরদের ঢাখে ধরিত্বা অঙ্ককার হয়ে এসেছে।  
তিনি তখন গিরি শিরে সংলগ্ন মেঘের মতো  
কিংবা যুদ্ধরত সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন,  
ও বকুদ্রের সহযোগিতায় পীলসমকে চারদিক থেকে ঠেসে ধরলেন।  
সাহসী পীলসম তাতে এতটুকু বিচলিত না হয়ে  
বীরদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।  
কখনো তিনি তরবারির আঘাত হানছেন, কখনো চালনা  
করছেন প্রহরণ,  
এবং এইভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তাঁর হাত।  
তুরানীয় বুহের মধ্যভাগ থেকে পীরান তখন  
ভাইয়ের অসহায়তা দেখতে পেয়ে সগর্জনে ইরানীয়দের দিকে  
ধাবিত হয়ে গেওকে সম্বোধন করে বললেন,  
হে সুবিখ্যাত বীর, যুদ্ধের কৌশল তোমার অনায়ত।  
সিংহ-সদৃশ এক বীরের সঙ্গে  
তোমরা চার বীর যুদ্ধ করছো ?  
সত্যিকারের পৌরুষের অধিকারী যারা  
যুদ্ধে তারা একজনের মোকাবেলা একজনই করে  
এই বলেই তিনি ইরানীয় বীরগণকে আক্রমণ করলেন,  
রণক্ষেত্রে উথিত হলো অঙ্ককার ধূলিরাশি।  
এমন সময় রুষ্ম মহাবিকুম সিংহের ব্যক্তিত্ব নিয়ে  
রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

তরবারি ও প্রহরণের আঘাতে তিনি  
তুরানী সৈন্য নিধন করে চললেন।  
সহসা তাঁর দৃষ্টি পীলসমের দিকে আকৃষ্ট হলো,  
সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাখ্শকে উপ্তেজিত করে তার কাছে এসে  
উপস্থিত হলেন।

মুহূর্ত মধ্যে শুরু হয়ে গেলো যুদ্ধ,  
রুশমের তেজ পীলসম সহ্য করতে পারছেন না।  
পীলসম তখন ভীষণ নক্রের হাত থেকে  
অব্যাহতি লাভের জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন।  
এইবার ইরানী সৈন্যগণ প্রহরণাঘাতে  
তুরানীয় সৈন্যদের নিধন করে চললো,  
হত শক্রসন্দের দেহরাজি  
স্তূপাকার হয়ে আকাশ স্পর্শ করতে লাগলো।  
এই দৃশ্য দেখে আফ্সিয়াবের অন্তর থেকে  
বেরিয়ে এলো এক শীতল দীর্ঘশ্বাস।  
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জঙ্গী আল্কোস কোথায় ?  
এই যুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে তাকেই।  
রণমন্ত হয়ে তিনি আক্রমণ করুন গেওকে,  
সমস্ত যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিতে হবে রুশমের দিকে।  
চিরদিন ইরানীয়গণ তাকে স্মরণ করেছে,  
আজ তার চারদিকে অগ্নি ও বায়ু প্রবাহিত হোক।  
তুরান-অধিপতির বাণী আল্কোসের কানে পৌছা মাত্র  
তিনি তাঁর হস্তকে রক্ত দ্বারা ধোত করে,  
অশু প্রধাবনে সৈন্যশ্রেণীর মধ্যস্থলে  
তুরান-রাজের সমীপে এসে দাঁড়ালেন।  
এবং উচ্চস্থরে ঘোষণা করলেন, আমি সংগ্রামকামী,  
প্রতিপক্ষ পুরুষসিংহ আমারই অপেক্ষায় রয়েছে।  
বাদশা অনুমতি দিলে আমি একাই যুদ্ধে এগিয়ে যাব।  
আল্কোসের ঘোষণা শুনে তুরান-রাজ বললেন,  
সৈন্যদের মধ্যে থেকে বীরগণকে তুমি মনোনীত করো।  
এবং এক হাজারেরও বেশী অশুরোষী নিয়ে অগ্রসর হও।  
সেনানীগণ ধারণ করুক উজ্জ্বলিত-ফলক বর্ণা —  
নাইদ ও মুশতরী নক্ষত্রের মতো দীপ্তিমান।

আল্কোস যখন ইরানীয়দের মুখোমুখী হলেন  
তখন সূর্য পরিধান করলো ধূলির পোষাক।  
ইরানীয় পক্ষ থেকে জওয়ারা আল্কোসের সম্মুখীন হলেন।  
আল্কোস ভাবলেন, এই বুঝি রুস্তম,  
এই-ই নূরীমানের বিখ্যাত বংশধর।  
জওয়ারা সিংহ-বিক্রমে বর্ণা হস্তে  
প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধরত হলেন।  
প্রতিপক্ষের তীক্ষ্ণফলক বর্ণার আঘাতে  
জওয়ারার বর্ণা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো।  
জওয়ারার সন্তুষ্ট হয়ে টেনে নিলেন তীক্ষ্ণধার তলোয়ার  
যুদ্ধরত বীরদুয়ের পদধূলিতে দুনিয়া অন্ধকার হলো।  
প্রতিপক্ষের বিক্রমে তলোয়ারও ভেঙে খান খান হয়ে গেলো,  
জওয়ারা বাযু গতিতে টেনে নিলেন প্রহরণ।  
. এই সময় আল্কোস তাঁর পর্বত-প্রমাণ প্রহরণের আঘাতে  
জওয়ারাকে আহত করে ফেললেন।  
তিনি অশু-পৃষ্ঠ থেকে সংজ্ঞাহীন হয়ে  
মাটিতে গড়িয়ে পড়ে নীরব হয়ে গেলেন।  
এইবার আল্কোস অশু থেকে অবতরণ করে  
জওয়ারার বক্ষ বিদীর্ণ করার জন্য চড়ে বসলেন তাঁর বুকে  
রুস্তম ভাইকে\* এ-অবস্থায় দেখে  
শীত্র সেদিকে ধাবিত হলেন।  
এবং আল্কোসকে লক্ষ্য করে এমন এক তর্জন উপ্তীত করলেন যে,  
তাতে আল্কোসের হাত অবশ হয়ে তরবারি শুরু হয়ে গেলো।  
রুস্তমের গর্জন শুনে আল্কোসের হৃদপিণ্ড যেন  
চর্মভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এলো।  
ত্বরিতগতিতে পুনরায় তিনি অশু সওয়ার হয়ে  
বাযু-গতি রুস্তমের সামনে এসে বললেন,  
তুমই বুঝি রুস্তম,  
মনে করেছিলাম, তুমি আগেই পালিয়েছ।  
জবাবে রুস্তম বললেন, হে বীর,  
তুমি সিংহের পাঞ্জা কখনো পরীক্ষা করোনি।

---

জওয়ারা রুস্তমের ভাই ছিলেন

এই মুহূর্তে জওয়ারা অতি কষ্টে ঘোড়ার উপর উঠে বসলেন।  
আল্কোস রুস্তমের সঙ্গে দৃশ্যমানে প্রবৃত্ত হলেন,—  
আহা, তিনি যে অশুগঠে কাফন পরে এসে বসেছেন !  
আল্কোস রুস্তমের কটিদেশ লক্ষ্য করে বর্ণা নিক্ষেপ করলেন,  
কিন্তু সেই আধাত রুস্তমের কটিবক্ষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো !  
এইবার রুস্তম বর্ণা হালনেন আল্কোসের মস্তকে  
রক্তে রঞ্জিত হয়ে গড়িয়ে পড়লো তার শিরস্ত্রাণ।  
রুস্তম বর্ণাৰ খোচায় তাঁকে তুলে নিলেন অশৃষ্ট থেকে  
উভয় সৈন্যবাহিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলো সেই দৃশ্য !  
তারপর আল্কোসকে তিনি গিরিচূড়াৰ মতো  
মাটিতে নিক্ষেপ করলেন,  
তুরান সৈন্যের অস্তর্দেশ তা দেখে ভয়ে প্রকস্পিত হয়ে উঠলো।  
এই সংকেত অনুসরণ করে সপ্তরয়ী এক সঙ্গে  
দুর্বল সিংহের মতো তুরবারি উন্মুক্ত করলেন।  
তাঁদের পেছনে বীর সৈন্যদল কাঁধে তুলে নিলো ভারী প্রহরণ।  
আফ্রাসিয়াব এই বিস্ময় লক্ষ্য করে  
স্থীয় সৈন্যদের উপর এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।  
এবং তাদের ডাক দিয়ে বললেন,  
তোমরা যুদ্ধে দুর্জনদের উপর প্রভাব বিস্তার করো।  
সচেষ্ট হও ও ব্যাখ্যের রীতি অবলম্বন করো,  
এক মুহূর্তে তোমরা দীর্ঘ দিনের শক্রতার মোকাবেলা করো।  
সৈন্যরা আফ্রাসিয়াবের ডাক শুনে  
একযোগে রুস্তমের দিকে মুখ করলো।  
রুস্তম তখন সপ্তরয়ীদের সঙ্গে নিয়ে  
শত্রুদের আক্রমণ করলেন।  
দেখতে দেখতে শক্র—সৈন্য স্বস্থান থেকে বিচ্ছুত হয়ে  
দিগ্নিদিকে ছাড়িয়ে পড়লো।  
হত হলো বহু তুরানীয় বীর,  
রণ—ক্ষেত্র এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রক্তে লাল হয়ে গেলো।  
দেহহীন মস্তক ও মস্তকহীন দেহ  
ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রইলো।  
তুরানীয়গণ দেখলো, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার পথ নেই,  
সেদিকে মুখ বরাবৰ সকল সাধ ও সাধ্যও তাদের তিরোহিত হয়েছে।

## যুক্তক্ষেত্র থেকে আফ্রাসিয়াবের পলায়ন

তূরান সেনাপতি যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে  
শীঘ্রগতি রাগক্ষেত্র থেকে পলায়নপর হলেন।  
অশুবল্গা ঘূরিয়ে তিনি জলভারানত মেঘের মতো  
অপসৃত হয়ে চললেন।  
এদিকে রুষম রাখ্শকে উত্তেজিত করে  
রণ-পিপাসু আফ্রাসিয়াবের পিছু ধাওয়া করলেন।  
রাখ্শকে সম্বোধন করে রুষম বললেন, হে সতর্ক বাহন,  
যুক্তক্ষেত্রে মহুরতা অবলম্বন করো না।  
তূরান-রাজকে আজ আমি তোমারই উপর থেকে হত্যা করবো,  
তাপ রক্তে রঞ্জিত করবো ভূমিকে।  
বীরবরের কথায় অগ্নি-জ্বাত রাখ্শের উত্তেজনা এমন হলো যে,  
মনে হলো, তার দুনিকের বক্ষ-পঞ্চ থেকে গঞ্জিয়েছে ডানা।  
তূরান-রাজের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে রুষম ভাবলেন,  
এর আযুধারাকে রুক্ষ করে দিতে হবে চিরকালের জন্যে।  
এই ভেবে তিনি কোমর থেকে টেনে নিলেন পাশ।  
এবং তা আফ্রাসিয়াবের মস্তক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন।  
আফ্রাসিয়াব গ্রীবা নীচু করে এড়িয়ে গেলেন সেই বন্ধন।  
দ্বিতীয়বার রুষম পাশ হাতে নিয়ে  
ঘোড়া উত্তেজিত করে সামনে এগুলেন।  
তাঁর অমোঘ পাশ এবার  
তূরান-রাজকে আঢ়ে-পঢ়ে বন্দী করে ফেল  
এমন সময় সহসা পরাজিত ও পলায়নপর তূরান সৈন্যগণ  
আফ্রাসিয়াবের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো।  
সুযোগ বুঝে আফ্রাসিয়াবে বাযুগতি  
সে স্থান থেকে নিষ্কান্ত হয়ে গেলেন।  
তিনি এখন ভগ্ন-প্রাণ, ও তাঁর সৈন্যদল হত ও পরাজিত,  
তাই বিষের পেয়ালা পান করে তাঁর প্রস্থান শুরু হলো।  
তাঁর সংগ্রামী সৈন্যদল আর সদর্পে শিবিরে প্রত্যাগত হলো না।  
অগণিত তূরান সৈন্য হত হয়ে রণক্ষেত্রেই পড়ে রইলো,  
অসংখ্য বন্দী হলো।  
বহু ধনরত্ন, স্বর্ণ-সিংহাসন, মুকুট ও কটিবৰ্ক,

বহু তরবারি, সাঁজোয়া ও শিরস্ত্রাণ,  
বহু মূল্যবান অশু ও তাদের স্বর্ণ-নির্মিত সাজ,  
বহু অমূল্য অসি ও তাদের স্বর্ণ-কোষ,  
আরো বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্ৰী ইৱানীয়দের হাতে এলো ।  
তাই তারা মৃত সৈনিকদের দেহ থেকে আৱ কিছু লওয়াৰ চেষ্টা কৰল না,  
এমনকি আরো সম্পদের জন্য তাদের পিছু ধাওয়া  
থেকেও বিৱৰত রইলো ।

তাৱা এখন সানল্দে মৃগয়া-ভূমিতে প্ৰত্যাবৃত্ত হলো, —  
বিজিত সকল স্বৰ্ণ-সম্পদ ও অশুদিসহ।  
ইৱানীয় সপুৰথীদেৱ মধ্যে সবাই অক্ষত রইলেন,  
শুধু জওয়াৱাই একবাৱ গুৱানীকে সম্বোধন কৰে বললেন,  
চলুন এখন সানল্দে এখান থেকে প্ৰস্থান কৱা যাক ।  
এখন সম্ভাট কায়কাউসেৱ কাছে এক লিপিকা লিখে  
তাঁৰ সকল বৃত্তান্ত অবগত কৱানো আবশ্যক ।

অতঃপৰ সম্ভাট-সমীপে বিপুল উপটোকন প্ৰেৱণ কৱে  
সাহসী সৈন্যগণকে দান কৱা হলো পারিতোষিক ।  
মহাবীৱ দুই সপ্তাহ সেই অনুকূল প্ৰান্তৱে  
আনল্দোৎসবে অতিবাহিত কৱলেন ।  
তত্তীয় সপ্তাহে রুস্তম  
সৌভাগ্যশালী রাজমুকুটেৱ সন্নিধানে এসে উপস্থিত হলেন ।

দুনিয়াৰ এই সৱাইখানাৰ সনাতন বীতি হলো :  
একদিন সুখ অন্যদিন দুঃখ ।  
এই বাজিকৱেৱ হাতেৱ নৈপুণ্যও অপৰাপ, —  
প্ৰতিটি রঙ দিয়ে সে সৃষ্টি কৱে চলেছে অবিৱৰত ইন্দ্ৰজাল ।  
সুতৰাং আনল্দেৱ দিনে আত্মহারা  
ও দুঃখেৱ দিনে হতাশ হওয়া উচিত নয় ।  
সুখেৱ দিন ও দুঃখেৱ দিন দুই-ই চলে যায়,  
তাই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ থাকেন নিৰ্বিকাৱ ।  
যে-কাহিনী উপৱে বিবৃত হলো,  
তা এখন অন্য এক কাহিনীতে গিয়ে প্ৰবেশ কৱবে ।

## সোহরাব সোহরাবের কাহিনীর সূচনা

এবার শোন সোহরাব-রুক্ষমের যুদ্ধের কাহিনী,  
আরো অনেক শুনেছ, এবার একটি শ্রবণ কর।  
এই কাহিনী পরিপূর্ণ চোখের জলে,  
এই কাহিনী রুক্ষমের উদগ্র প্রকৃতির কোমলতার প্রকাশ।  
খরবায়ু প্রবাহিত হলে  
অপরিণত ফল যখন ধূলায় লুক্ষিত হয়,  
তখন সেই বাযুকে আমরা দানশীল না বলে বলি নির্মম,  
সৃষ্টিশীল না বলে অভিহিত করি ধূৎস বলে।  
যা মৃত্যু আনয়ন করে তাকে নির্মম ছাড়া আর কি বলা যায় ?  
তা যদি করশা হতো তবে এই শোক-সন্তাপ কেন ?  
কিন্তু তবু বলবো, প্রাণের এই রহস্য তুমি অবগত নও,  
এই যবনিকার পরপারে তোমার গতি রুক্ষ।  
কত লোক ধাবিত হয়েছে বাসনার দিকে !  
কিন্তু বাসনার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়নি তাদের জন্য।  
সেই যাত্রাই তোমার জন্য কল্যাণকর,  
যা তোমাকে দান করে পরলোকে শান্তি।  
মৃত্যু কাউকেই রেহাই দেয় না —  
যুবক-বৃক্ষ সবাইকে সে মিশিয়ে দেয় মৃত্যিকায়।  
অগ্নি যখন ভূমীভূত করে গৃহ  
তখন আশৰ্য নয় যে, গৃহ-সামগ্ৰীও তাতে পুড়ে খাক হবে।  
আগুন থেকে নির্গত হয় দহনই,  
তাতে যা আসে তাই পুড়ে ছারখার হয়।  
মৃত্যু-রূপ ভয়ানক অগ্নি থেকেও  
তরুণ-বৃক্ষ কারো রেহাই নেই।  
তরুণের জন্য দুনিয়া আনন্দের নিকেতন,  
কিন্তু মৃত্যু শুধু বার্ধক্যেরই লক্ষ্য নয়।  
এই দুনিয়া পথ বিশেষ — অবসর বিনোদনের স্থান নয়,  
নিয়তির অশু এখানে দ্রুত সঙ্কীর্ণ করে আনছে যাত্রাপথ।  
জেনে রাখ, মৃত্যুর কাছে দুই-ই সমান,  
তাই কদাপি বিচলিত হয়ো না ধৰ্মপথ থেকে।

ঈমানের আলোতে পূর্ণ করো অন্তর,  
বিনাবাক্যে অনুসরণ করো প্রভুর আদেশ, তুমি তাঁরই দাস।  
করশাময়ের আনুগত্যকে ছির করো তোমার কর্তব্য বলে,  
অতীতের সকল ধারণাকে করো তাঁরই অনুগত।  
তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যের রহস্য তুমি অবগত হতে পারবে না,  
দুনিয়ার সকল দৈত্যকে জমায়েত করলেও তুমি ব্যর্থ হবে।  
দুনিয়ায় অবস্থান করো এমনভাবে  
যাতে তোমার পরিণাম হয় ইসলাম বা আত্মসমর্পণ।  
এখন তামাকে আমি সোহজাবের শুক্রের কথা বলবো,  
পিতার সঙ্গে সে কি করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল  
সেই কহিনী ব্যক্ত করবো।

## ରମ୍ପତ୍ତମେର ମୃଗ୍ୟା ଯାତ୍ରା

ଚାଷୀଦେର ମୁଖ ଥେକେ ଶୋନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳେର ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ  
ଆମି ଏଥାନେ ବିବୃତ କରାଛି ।  
ଜ୍ଞାନୀଦେର ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ମୃତି ଥେକେ ଜାନତେ ପାରାଛି,  
ରମ୍ପତ୍ତ ଏକଦିନ ଭୋରବେଳେ ଯାତ୍ରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଜ୍ଜେନ ।  
ମୃଗ୍ୟାର ଜନ୍ୟ ତାଁର ମନ ଆକଲ,  
କଟିବନ୍ଧ କଷେ ନିଯେ ତିନି ତୁମୀର ତୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରଲେନ ।  
ତାରପର ବିପୁଲକାଯ ରାଖିଶେ ଆରୋହଣ କରେ  
ତାକେ ସ୍ଥାରୀତି ଉତ୍ୱେଜିତ କରଲେନ ।  
ଏବଂ ଶିକାର-ସନ୍ଧାନୀ ସିଂହେର ମତୋ  
ମୁଖ କରଲେନ ତୂରାନେର ଏକ ମୃଗ୍ୟା-ଭୂମିର ଦିକେ !

ତୂରାନ ଭୂମିତେ ପୌଛେ ତିନି ଏକ ପ୍ରାଚ୍ଵର  
ବନ୍ୟ ଗର୍ଦଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିତେ ପେଲେନ ।  
ଏହି ଦୃଶ୍ୟେ ମୁକୁଟଦାନକାରୀ ବୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ଲ ହୟେ  
ରାଖିଶକେ ଚାଲିତ କରଲେନ ସାମନେର ଦିକେ ।  
ତାରପର ତୀର, ଗଦା ଓ ପାଶ ଦିଯେ  
କଟିପଯ ମୃଗ୍ୟା ବଧ କରେ ଶୁକନୋ ପାତା ଓ ଗାଛେର ଡାଳ ଦିଯେ  
ପ୍ରଞ୍ଜଳିତ କରଲେନ ଏକ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ।  
ଆଶୁନ ଭାଲୋ କରେ ଜୁଲେ ଉଠିଲେ  
ରମ୍ପତ୍ତ ଏକଟି ଡାଳ ଥୁଙ୍ଗ ନିଯେ  
ତାତେ ଶିକେର ମତୋ କରେ ଏକଟି ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ୟ ଗର୍ଦଭକେ  
ବିନ୍ଦ କରେ ଆଗୁନେ ଧରଲେନ,  
ଓ ମାଂସ ପୋଡ଼ା ହଲେ ତା ଦିଯେ କରଲେନ କ୍ଷୁନ୍ନିବୃତ୍ତି ।  
ଆହାରେର ପାରିତ୍ସନି ପର ବୀରବର  
ନିଦ୍ରାର ବାସନା ନିଯେ ଉପାସିତ ହଲେନ ଏକ ଜଳାଶୟେର ତୀରେ ।  
ଦ୍ୱାସମଯେ ତାଁର ଚୋଇଖେ ନିଦ୍ରାକର୍ଯ୍ୟ ହଲୋ,  
ନିକଟସ୍ଥ ତଣକ୍ଷେତ୍ରେ ବିଚରଣ କରେ ଫିରିତେ ଲାଗଲୋ ତାଁର ରାଖିଶ ।  
ଏମନ ସମୟ ସାତ ଆଟ ଜନ ତୁର୍କୀ ଘୋଡ଼ସଓୟାର  
ସେଇ ମୃଗ୍ୟା-ଭୂମିର ପ୍ରାଚ୍ଚ ଦିଯେ ପଥାତିକ୍ରମ କରାଛି ।  
ତାରା ଦୂର ଥେକେ ରାଖିଶକେ ଜଳାଶୟେର ତଣକ୍ଷଳେ  
ବିଚରଣଶୀଳ ଦେଖିତେ ପେଯେ

দ্রুত জলাশয়ের দিকে ধাবিত হয়ে  
 রাখ্শের নিকটস্থ হলো।  
 এইবার সুলক্ষ্মণ অশুটিকে  
 ধরবার আয়োজনে মনোনিবেশ করলো তারা।  
 অশুরোহিগণ নিজেদের এক বৃত্ত রচনা করে  
 পাশ নিক্ষেপে তাকে বন্দী করতে সচেষ্ট হলো।  
 কিন্তু রাখ্শ অশুরোহীদের পাশ নিক্ষেপের উদ্যোগ দেখেই  
 সিংহের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো,  
 এবং পদতাঙ্গে প্রথমেই দুই ব্যক্তিকে ধরাশায়ী করে দিলো।  
 তারপর দস্তম্ভটনে আরেক জনের শির  
 তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলো।  
 এইভাবে তিন ব্যক্তি হত হওয়া সত্ত্বেও  
 যখন যুজ্ববাজ রাখ্শের শির পাশ—বন্ধনে আবদ্ধ হলো না  
 তখন অশুরোহিগণ চারিদিক থেকে দ্রুমান্বয়ে  
 তার উপর পাশ নিক্ষেপ করে অবশেষে তাকে আবদ্ধ করে  
 শহরের দিকে টেনে নিয়ে গেলো।

তারা রাখ্শের কাছ থেকে শক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে  
 তাকে নিয়ে গেলো অশু—যুথের বাসস্থানের দিকে।  
 শোনা যায় যে, চল্লিণটি ঘোটকী জমায়েত করে  
 তারা রাখ্শকে দিয়ে তাদের গর্ভবতী করালো।

এদিকে রুম্ভম সুখ—স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হতেই  
 রাখ্শের কথা তাঁর মনে এলো।  
 তিনি প্রান্তরের চারদিকে দৃষ্টিপাত করে  
 কোথাও তাকে দেখতে পেলেন না।  
 মন তাঁর বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো।  
 উৎকষ্টিত হয়ে তিনি সামান্যার দিকে মুখ করলেন।  
 মনে মনে তিনি বলতে লাগলেন, এইভাবে পদব্রজে  
 অপমানিত অবস্থায় আমি কোথায় যাব ?  
 তীর, তৃণীর, তরবারি ও ব্যাষ্ট—চিহ্নিত এই মুকুট নিয়ে —  
 বন—কাঞ্জার আমি কি করে অতিক্রম করি,  
 দুশমনের মুখোমুখী হলে তাদের মোকাবেলাই বা করি কি ভাবে ?

তবু, এই অসহায় অবস্থায়ই আমি যাবো,  
মন আমার দৃঢ়ত্বে নিমজ্জিত।  
এই বলে ক্লিশ্ম কটিবন্ধ দৃঢ় করে বাঁধলেন  
ও রাখ্শের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগলেন।  
ব্যথিত চিত্তে দেহকে বিপদের  
ও প্রাণকে সাঁড়াশির কবলিত করে  
তিনি পথাতিক্রম করতে লাগলেন।  
রাখ্শের জিন-গদী ঘাড়ের উপর তুলে নিয়ে  
ক্লিশ্ম মনে মনে বললেন, দুনিয়ার এই কঠিন ময়দানে  
আজ যে আরোহী কাল সে বাহন।  
এই বলে রাখ্শের কথা ভাবতে ভাবতে ক্লিশ্ম  
তার পদচিহ্ন ধরে এগিয়ে চললেন।

## ରକ୍ତମେର ସାମାନଗୀ ନଗରେ ଉପଶ୍ଥିତି

ସାମାନଗୀ ନଗରେ ଉପାସ୍ତବଟୀ ହତେଇ  
ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜାର କାହେ ଖବର ପୌଛଲୋ,  
ମୁକୁଟ-ପ୍ରଦାୟୀ ବୀର ପଦବ୍ରଜେ ଏଗିଯେ ଆସଛେନ,  
ମୃଗ୍ୟାଭୂମି ଥିକେ ତା'ର ଅଶ୍ଵ ରାଖଣ ଅପହତ ହୁଯେଛେ ।  
ବୀରବରକେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଗମନ କରେ ନିଯେ ଆସାର ଜନ୍ୟ  
ତଥନ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଜାତବର୍ଗକେ ଆଦେଶ ଦେଓଯା ହଲୋ ।  
ଅଭିଜାତଗଣେର ସର୍ଦ୍ଦାର ସକଳକେ ଡେକେ ବଲଲେନ, ମନେ ହଞ୍ଚେ  
ଇନି ରକ୍ତମ କିଂବା ସ୍ଵର୍ଗ ଉଦ୍ଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ !  
ରାଜ୍ୟ ନିଜେଓ ପଦବ୍ରଜେ ସଂବର୍ଧନାକାରୀଦେର ସନ୍ଦୀ ହଲେନ,  
ତୀକେ ଅନୁଗମନ କରିଲୋ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟଦଳ ।  
ସାମାନଗୀଧିପତି ରକ୍ତମକେ ସମ୍ବେଧନ କରେ ବଲଲେନ,  
ମହାତ୍ମନ, ଆମରା ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥ ଆଗମନ କରିନି ।  
ଆମାର ଏଇ ନଗରୀ ଆପନାର କଲ୍ୟାଣକାମୀ,  
ଆମରା ଆପନାର ପ୍ରଶଂସକାମୀ ଓ ଆଜ୍ଞାନୁବଟୀ ।  
ଆମାଦେର ଦେହ ଓ ସମ୍ପଦ ଆପନାର  
ଏଥାନକାର ସମ୍ମାନିତଗଣେର ଶିର ଆପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବନତ  
ରକ୍ତମ ଆମ୍ବର୍ଣ୍ଣକାରୀଦେର କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ  
ଅକଲ୍ୟାଣେର ଆଶଙ୍କା ମନ ଥିକେ ଦୂରୀଭୂତ କରେ ଦିଲେନ ।  
ତିନି ବଲଲେନ, ଓଇ ମୃଗ୍ୟାଭୂମି ଥିକେ ଆମାର ରାଖଣ  
ବିନା ସାଜେ ଆମାର ଥିକେ ବିଯୁକ୍ତ ହୁଯେଛେ ।  
ଆମି ସାମାନଗୀର ଦିକେ ତାର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖିତେ ପେଯୋଇ,  
ସେଇ ଜଳାଶୟ ଥିକେ ଆର କୋନ ଦିବେଇ ସେ ଯାଇନି ।  
ଆପନାର ଯଦି ତାକେ ଖୁଝେ ଦିତେ ପାରେନ  
ତବେ ଆମାର ସପ୍ରଶଂସ ଅଭିନନ୍ଦନ ଲାଭ କରିବେନ ।  
କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋନ କାରଣେ ଆମାର କ୍ରୋଧେର କାରଣ ହନ,  
ତବେ ଅନେକେର ଶିର ଆମି କର୍ତ୍ତନ କରିବୋ ।  
ଏଇ କଥା ଶୁଣେ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ତମକେ ସମ୍ବେଧନ କରେ ବଲଲେନ,  
ହେ ପୁରୁଷପ୍ରବର, କେଉଁ ଆପନାର କ୍ରୋଧେର କାରଣ ହବେ ନା !  
ଆପନି ଆମାଦେର ମେହମାନ, ଉତ୍ୟେଜିତ ହବେନ ନା,  
ଆପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଚରିତାର୍ଥ ହବେ ।  
ଏକଟି ରାତ୍ରି ଆପନି ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଅବଶ୍ଵାନ କରିଲ,

সকল সন্দেহ থেকে আমরা আপনাকে মুক্ত করবো।  
ক্রেতে ও উত্তেজনায় কোন কাজ সফল হয় না,  
বিনীত সপ্তহি ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়।  
রুন্ধমের রাখশ্চ কখনো গোপন থাকতে পারে না,  
এমন প্রসিদ্ধ ও খ্যতনামা অশ্বের পক্ষে তা অসম্ভব।  
আমরা অভিজ্ঞ ও তৎপর লোক দ্বারা  
আপনার রাখশ্চকে সম্ভব খুঁজে বার করে আনবো।  
রুন্ধম রাজার কথায় অত্যন্ত প্রীত হলেন,  
তাঁর মন থেকে সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়ে গেলো।  
তিনি আনন্দিত মনে রাজ-প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন।  
রাজা শীঘ্ৰ প্রাসাদে রুন্ধমকে স্থান করে দিয়ে  
নিজে তাঁর সামনে উপস্থিত রাইলেন।  
এবং শহর ও সৈন্যবাহিনীর গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে ডাকিয়ে এনে  
স্বয়ং আনন্দিত মনে সেখানে আসৱ করে বসলেন।  
পাচকগণকে আদেশ কৰা হলো,  
শীঘ্ৰ সুখাদ্য এনে বীরগণের সামনে পরিবেশন কৰো।  
তারপৰ সজ্জিত কৰা হলো, আনন্দিত পানের আসৱ।  
স্বর্ণপাত্রে পরিবেশন কৰা হলো সুৱা,  
গীত-বাদ্য ও কৃষ্ণ-চন্দু সুন্দরিগণের আগমনে  
জমজমাট হয়ে উঠলো আসৱ।  
যতক্ষণ পর্যন্ত না অতিথি স্বয়ং ক্লান্তি বোধ করলেন  
ততক্ষণ রাজা তাঁর পাত্রমিত্রসহ বসে রাইলেন সেই পানের আসৱে।  
সুৱার মাদকতার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার কাল সন্নিকটবর্তী হলে  
রুন্ধম আসৱ ছেড়ে উঠে দাঢ়ালেন।  
রাজার আদেশে যথোপযুক্ত শয়নকক্ষ সজ্জিত কৰে  
তাকে কস্তুরী ও গোলাপ গাঙ্কে সুবাসিত কৰা হলো।  
রুন্ধম শয়নকক্ষের সজ্জা দেখে প্রীত হলেন,  
পথের ক্লান্তি ও সুৱার মাদকতায় শীঘ্ৰ তাঁর চোখে নিদ্রাকৰ্ষণ হলো।

## সামানগাঁ-রাজের কন্যা তহমিনার রূপ্তম সকাশে আগমন

অঙ্ককার রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর গত হলে  
মণিশিরা নক্ষত্র আকাশে উদিত হলো।  
এমন সময় কে একজন চুপিসারে এসে রূপ্তমের  
শয়নকক্ষের দ্বার দিলো মুক্ত করে।  
সেই মুক্ত দ্বারপথে সুবাসিত দীপাধার হাতে  
মোহন চলন-ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো এক দাস-বালক।  
তার পেছনে এক চন্দ্ৰ-বদনা রমণী-রঞ্জ,  
সূর্যের কিৰণ যেন সেই বৰাঙ্গনাকে কেন্দ্ৰ করে বিছুরিত হচ্ছে।  
তাঁর ভূরুদ্বয় প্ৰসাৱিত ধনুকের মতো,

তাঁৰ কেশৱাজি যেন সমুদ্যত পাশ,  
সমুন্নতিতে তিনি অজ্ঞু দেবদৰু।  
তাঁৰ গণ্ডয় ইমনদেশীয় মূল্যবান আকীকের মতো রক্তবৰ্ণ,  
তাঁৰ ওষ্ঠাধৰ প্ৰেমিকের হাদয়ের মতো একাগ্ৰ।  
তাঁৰ চক্ষেৰ দুটি প্ৰকৃষ্টিত গোলাপ কিংবা কুন্দকুসুম  
যেন স্বয়ং স্বর্গেৰ দান।  
তাঁৰ দুই কণে দুটি কুণ্ডল যেন  
সূৰ্যেৰ প্ৰভ নিয়ে দেদুল্যমান।  
তাঁৰ ওষ্ঠাধৰে মধু, রসনায় শৰ্কৰা  
তাঁৰ মুখবিবৰ থেকে নিঃস্ত হচ্ছে মণিমুক্তা।  
তাঁৰ সৌন্দৰ্যেৰ ঘবনিকা ছিনু কৰে উদিত হয়েছে তাৱাদল,  
স্বাতী নক্ষত্রেৰ মতো তিনি কোমল ও লাজুক।  
তাঁৰ অস্তৰ বুদ্ধি ও বিবেচনায় পূৰ্ণ, তাঁৰ দেহ পৱন পবিত্ৰ,  
অকৰ্ষিত ভূমিৰ মতো সেই দেহ কাৰো দ্বাৰা স্পষ্ট হয়নি কোন কালে।  
সেই বৰাঙ্গনাকে দেখে সিংহ-হৃদয় রূপ্তম  
বিশ্ময়ে অভিভূত হয়ে উচ্চারণ কৱলেন বিশ্ব-প্ৰভুৰ নাম।  
তিনি সুন্দৰীকে সম্বোধন কৰে বললেন, বল কি নাম তোমাৰ,  
এই নিশীথ রাত্ৰে তোমাৰ এই আগমনেৰ অৰ্থ কি?  
জবাবে সুন্দৰী বললেন, আমাৰ নাম তহমিনা,  
মনোদৃঢ়খৈ হৃদয় আমাৰ ছিমুভিন্ন।  
সামানগাঁ-অধিপতিৰ একমাত্ৰ কন্যা আমি,

আমি সিংহ ও ব্যাষ্ট্রের কুল-জাত !  
দুনিয়ার কোন বাদশা আমার জুড়ি নয়,  
আকাশের তলে আমার সদৃশ অতি অল্পই আছে।  
যবনিকার বাইরে কেউ কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি আমাকে,  
কদাচ কেউ আমার কষ্টস্বর শ্রবণ করেনি।  
কাহিনীর আকারে লোকমুখে আপনার গুণগ্রাম আমি শুনেছি।  
শুনেছি সিংহ, ব্যাষ্ট্র, দৈত্য কিংবা নক্র  
কেউ পরাক্রমে আপনার সমকক্ষ নয়।  
নিকষ কালো আঁধার রাত্রিতে আপনি একাকী তুরানে আগমন করেছেন,  
সারা নগরীতে এ বার্তা গুঞ্জিত হচ্ছে লোকের মুখে মুখে।  
লোকে বলছে, এক বন্যগর্দভ আপনি একাই দগ্ধ করেন,  
আপনার তরবারির আঘাতে ক্রন্দন করে বায়ুরাশি।  
আপনার বাহুবলে ছিন্ন হয় সিংহ ও ব্যাষ্ট্রের গাঢ়ুর্ম,  
যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র বিচরণ করে আপনার প্রহরণ।  
আপনার উলঙ্ঘ তরবারির দীপ্তি দেখে  
শ্যেনপাখি তার শিবারের উপর ঝাপিয়ে পড়তে সাহসী হয় না।  
আপনার পাশের নিশানা হয় ভয়ঙ্কর মেকড়ে,  
আপনার বর্ণাঁ ভয়ে মেঘদল রক্ত বর্ষণ করে।  
আপনার এমনই সব কাহিনী শুনে  
কত্তবার আমি দংশন করেছি নিজের ওষ্ঠ।  
আপনার বাহু, কেশের ও বক্ষের প্রত্যাশী আমি,  
আমার সৌভাগ্য যে, স্বয়ং বিধাতা আপনাকে প্রেরণ  
করেছেন এই নগরীতে।  
যদি আমি আপনাকে লাভে বক্ষিত হই,  
তবে জীবনে কোন মীন-পঞ্চিও আমাকে দেখতে পাবে না।  
হে বীর, আমার এই শপথই আমাকে আকর্ষণ করে  
এনেছে তোমার কাছে,  
সে আমার শৈর্যকে বলিদান করছে বাসনার যুপকাণ্ঠে !  
আমার দ্বিতীয় শপথ, বিশু-প্রভূর ইচ্ছায়  
তোমারই থেকে এক শিশু আমি গ্রহণ করবো আমার কোলে ।  
সে তোমারই মতো শক্তিতে ও শ্পের রঘ  
দীর্ঘ করতে পারবে আকাশের সূর্য-নক্ষত্র।

ଆକ୍ରମିକ ଅର୍ଥେ ନାହିଁ । ଆଭିଜ୍ଞାତ୍ୟର ମୁଦ୍ରକ ।

ত্রুটীয় শপথ, তোমার রাখশকে ঝুঁজে আনবো,  
ও তদ্বারা ধরে রাখবো তোমাকে সামানগাঁ রাঙ্গে !  
এই বলে চন্দ্রবদনা তাঁর বাণী সমাপ্ত করলেন,  
রুক্ষম শুনে গেলেন তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ।  
পরীসদৃশ এই রাজকন্যার মুখ সন্দর্শনে,  
রুক্ষম সকল চিন্তা বিস্মৃত হলেন ।  
রাজকন্যার মুখেই তিনি শুনলেন তাঁর প্রিয় রাখশের সুসংবাদ,  
তিনি ভাবলেন, এই পরিণয়ের পরিণতি মন্দ হবার নয় ।  
এইবার তিনি রাজকন্যাকে কাছে ডাকলেন  
রাজকন্যা মনুপায়ে এগিয়ে এলেন বীরবরের বুকের কাছে  
এবৎ বললেন,  
যথাসময়ে এক জ্ঞানী তোমার কাছে আগমন করবেন ।  
তিনিই তোমার হয়ে পিতার কাছে পেশ করবেন  
আমার পরিণয়ের প্রস্তাৱ,  
ততক্ষণ তুমি ধৈর্য ধরে রাজ্ঞার কাছে অবস্থান করো ।

সামানঁগা-রাজের কাছে পরিণয়ের প্রস্তাব উঠাপিত হলে,  
 তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন।  
 কুন্তমের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে তিনি এত প্রীত হলেন যে,  
 দেবদারুর মতো তাঁর মন থেকে খসে পড়লো সকল ভার।  
 যথাসময়ে তিনি প্রচলিত রীতি অনুসারে  
 কুন্তমের হাতে কন্যা সম্প্রদান করার বাসনা করলেন।  
 তাঁর এই বাসনা রাজকীয় ফরমানরূপে সর্বত্র ঘোষিত হলো।  
 সকলেই এই আনন্দ-সংবাদে হৃদয়-মন অনুরঞ্জিত করে  
 কুন্তমের প্রশংসা কীর্তন করলো।  
 রাজা বীরবরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলে  
 উপস্থিত সকলেই প্রকাশ করলো তাদের আনন্দ।  
 যুবক-বৃন্দ সবাই কুন্তমকে বললো,  
     এই নতুন চাঁদ আপনার জন্য শুভ হোক,  
 আপনার ঔর্ধ্বাকাশীরা নিপাত যাক।  
 যথাসময়ে বরকন্যা নিভৃতে মিলিত হলেন,  
 তাঁদের জন্য অঙ্ককার রাত্রি দীর্ঘতর হলো।  
 শিশির-সিঞ্চনে ফুল হলো গোলাপ-কুঁড়ি,

অথবা বারি-বিন্দুতে যিনুকের বুকে জন্ম হলো মুক্তার।  
 কন্তু জানতে পেলেন, পত্নী অসংস্থতা হয়েছেন,  
 বীরবরের মনে স্ত্রীর প্রেম দ্বিগুণিত হলো।<sup>১</sup>  
 কন্তু মের বাহুতে এক কবচ ছিল,  
 ভূবন-বিশ্বাত সেই কবচ (অর্থাৎ সামের হাতের)।  
 তিনি পত্নীর হাতে দিয়ে বললেন,  
 ভাগ্য যদি আমাদের কন্যা দান করেন  
 তবে তার কেশে এটি ঝুলিয়ে দিয়ো,  
 এই কবচ মঙ্গলকর, শুভলক্ষণযুক্ত ও ভূবন-বিশ্বাত।  
 আর যদি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে  
 তবে তার বাহুতে পিতার এই স্মারক-চিহ্ন বৈধে দিয়ো।  
 আমি প্রার্থনা করি, সে সামের মতোই সমন্বিত ও সুগঠিত হবে,  
 পৌরুষে সে অতুলনীয় ও স্বভাবে মহান হবে।  
 সে মেঘের দেশ থেকে নামিয়ে আনবে উড়স্ত বাঞ্জপক্ষীকে,  
 সূর্যও তার উপর তেজোদৃপ্ত আলোকপাতে ভীত হবে।  
 সে খেলা করবে সিংহের সঙ্গে,  
 হাতীর সঙ্গে যুক্তেও সে পিছপা হবে না।  
 এইভাবে দীর্ঘাত জেগে বীরবর চন্দ্রমুখী তহমিনার সঙ্গে  
 অনেক কথা বললেন।  
**তারপর যখন উদীয়মান সূর্য**  
 ধরিত্রীকে আলোর সজ্জায় সজ্জিত করার উপক্রম করলো,  
 তখন কন্তু বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে পত্নীকে বুকে ধারণ করলেন,  
 ও অজস্র চুম্বনে নিষিক্ত করলেন তাকে।  
 সুন্দরী আসন্ন বিদায়-ব্যথায় ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে  
 পতিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

যথাসময়ে সামানগাঁ-রাজ এসে বীরবরের কুশল জিজ্ঞাসা করে  
 শয়নকক্ষ ও রাত্রির সুখ-নিদ্রার খবর নিলেন।  
 তারপর জ্ঞানালেন রাখশের প্রাপ্তির সুসংবাদ,

উপরের ঘটনাবলী এক রাত্রির ঘ্যাপার নয়। কবি তাদের অন্য অক্ষকার রাতি দীর্ঘতর হলো।  
 মুঠো দীর্ঘ এক সময়াক্ষের আভাস দিয়েছেন। কন্তু মের জীবনে গ্রোমান্ডের কর্ণনা কবির উদ্দেশ্য  
 নয়, তাই অতি সংক্ষেপে কাজ শেষ করা হয়েছে।

সংবাদ শুনে বৌরবর অত্যন্ত প্রীত হলেন।  
ক্রমত রাখশের গায়ে হাত রেখে তাকে জিন পরিয়ে দিয়ে  
রাজাৰ আতিথ্য ও সৌজন্যেৰ জন্য প্ৰকাশ কৱলেন স্বীয় ক্রতৃতা।  
তাৰপৰ বাযুগতিতে অশু ধাৰিত কৱলেন ইৱানেৰ দিকে,  
তহুমিনাৰ স্মৃতি তাঁৰ চিন্তায় গুঞ্জিৰিত হতে লাগলো।  
ইৱান থেকে যথাসময়ে তিনি জাবুলস্তানে এসে পৌছলেন  
কিন্তু সংঘটিত ব্যাপার সম্বন্ধে কাউকে কোন কথাই বললেন না।

## তহমিনার গর্জে সোহরাবের জন্ম

রাজকন্যার মাথার উপর দিয়ে নয় মাস গত হলে  
চাঁদের মতো সূন্দর এক শিশুর জন্ম হলো।  
দেখতে সে বীরবর রুম্ভমের মতো,  
কিংবা সামের মতো কিংবা নুরীমানের মতো।  
শিশুকে দেখে তহমিনা অত্যন্ত প্রীত হয়ে  
তার নাম রাখলেন সোহরাব।  
এক মাস বয়েস হতে না হতেই তাকে এক বৎসরের মতো  
বড় দেখাতে লাগলো,  
তার বক্ষদেশ হলো স্বয়ং রুম্ভমেরই মতো প্রশস্ত !  
তিনি বছর বয়েস হতেই সে শক্তি পরীক্ষার্থ মাঠে নামলো,  
ও বলশালী পুরুষকে আবজ্ঞ করলো পাঞ্চায় !  
দশ বছর বয়সে সে হলো অনুপম,  
তার সঙ্গে শক্তি—পরীক্ষায় সবাই অক্ষম হলো।  
তার দেহ হলো হস্তীর মতো শক্তিশালী,— মুখের রং রুতবর্ণ,  
তার বাল্দুয় হলো স্তনের মতো শুল ও বলয়িত।  
মৃগয়ার আনন্দে সে সিংহের পিছনে পিছনে ধাওয়া করে  
ও তার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।  
দ্রুতগতি অশ্বের পিছনে ধাবিত হয়ে  
লেজে ধরে সে তাকে আয়ত্তে আনে।

একদিন সে মাঘের কাছে এসে  
রোষভরে জিজ্ঞাসা করলো।  
মা, আমি আমার সাথীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ,  
শির আমার সম্মুখ আকাশে ;  
কিন্তু কোন্ কুলে ও বংশে আমার জন্ম ?  
কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে আমার পিতা কে, তবে কি বলবো ?  
যদি আমি ইই জিজ্ঞাসার জবাব না পাই  
তবে তোমাকে জীবিত রাখবো না।  
তহমিনা যুবক পুত্রের রোষ দেখে বিচলিত বোধ করলেন।  
তিনি বললেন, পুত্র আনন্দিত হও, রোষ প্রকাশ করো না।  
তুমি মহাবীর রুম্ভমের পুত্র,

সামের পৌত্র ও নুরীমানের প্রপৌত্র।  
এমন সুবিধ্যাত বংশে জন্ম বলেই  
তোমার শির আকাশে সমুদ্ভূত।  
বিশ্ব-প্রভু এই পৃথিবী সৃষ্টি করার পর থেকে  
রুক্ষমের মতো বীর আর জন্ম গ্রহণ করেনি।  
তাঁর হৃদয় সিংহের, তাঁর শক্তি মদমত হস্তীর,  
নীল নদের গভীরতা থেকে তিনি টেনে তুলেন নক্রকে।  
সামের মতো বীর তাঁর কালে দুনিয়ায় ছিল না,  
ঘূর্ণ্যমান আকাশও দলিত করতে পারেনি তাঁর শির।  
ইরান থেকে এক দৃত মহাবীর রুক্ষমের  
লিপিকা নিয়ে এখানে আগমন করেছিল।  
সে রুক্ষমের উপহারস্বরূপ তিনটি উজ্জ্বল সূর্যকান্ত মণি  
ও তিনি থলিভতি স্বর্ণমুদ্রা এনেছিল।  
তোমার জন্মের পর সেই দৃত  
তোমার পিতার কাছে নিয়ে গেছিলো সুসংবাদ।  
হে ধীমান, তুমি দেখতে পারো সেই মুদ্রা ও মণি  
যা তোমারই জন্মে প্রেরিত হয়েছিল।  
যদি তুমি এই উপহার স্বত্ত্বে রক্ষা করো,  
তবে তাতে তোমার প্রভুত্ব উপকার হবে।  
তহ্মিনা আরো বললেন, দেখো আফ্রাসিয়াব যেন  
এ কথা কিছুতেই জানতে না পারে।  
কারণ, সে স্বনাম-ধন্য রুক্ষমের শক্র,  
তাঁর থেকে তুরানের ভাগ্যে নির্ধারিত হয়েছে ত্রুদন ও বিলাপ।  
খোদা না করুন, সে তোমার অনিষ্টকামী হবে,  
পিতার প্রতি শক্রতায় পুত্রকে সে ধ্বংস করতে উদ্যত হবে।  
তোমার পিতা যদি তোমার এই বীরত্বের খবর পান,  
তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিবেন,  
বিচ্ছেদ বেদনায় তখন বিদীর্ণ হবে মায়ের অন্তর।  
জননীর বাক্য শুনে সোহ্রাব বললো, দুনিয়ায়  
এ কথা কেউ গোপন করে রাখতে পারবে না।  
আমি বীর বৎশোঙ্গুত —  
এ কথা গোপন করার প্রয়োজন কি ?  
আমার এই মহান ও সুসঙ্গত উৎস-গৌরব

কেন তুমি এতদিন গোপন রেখেছিলে ?  
মহস্তমগণ কল্পনের বীরত্ব-কৌর্তি কতই না ঘোষণা করেছেন !  
আমি তুকীদের মধ্যে থেকে  
এক বিরাট সৈন্যবাহিনী তৈরি করবো ।  
এবং রোষভরে ধাবিত হবো ইরানের দিকে —  
আমার সেই রোষের ধূলিরাশি স্পর্শ করবে চম্পের মুখ ।  
কায়কাউসকে আমি সিংহাসন থেকে উৎখাত করবো,  
খর্ব করবো তুসের মাহাত্ম্য ।  
গুরগীন, গোদরজ, গেও,  
কিংবা গুস্তাহাম, নওজর ও বাহ্বাম কেউ আমার সমকক্ষ নয় ।  
কল্পনকে দান করবো আমি ধন-সম্পদ, সিংহাসন ও রাজ-মুকুট  
এবং তাঁকে বসাবো কায়কাউসের প্রাসাদে ।  
ইরান থেকে তুরান পর্যন্ত  
আমি আবিশ্বাস্ত হয়ে যুদ্ধ করবো ।  
আফ্রসিয়াবের সিংহাসন করবো অধিকার,  
এবং আমার বর্ণা উন্নীত করবো সৌরলোক পর্যন্ত ।  
তোমাকে করবো ইরান রাজ্যের মহিষী,  
সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করবো সিংহের গৌরব ।  
কল্পনের মতো পিতা ও আমার মতো পুত্র হলে  
দুনিয়ায় একজন মুকুটধারীও অবশিষ্ট থাকবে না ।  
চন্দ্র সূর্যের আবিভাব হলে  
গ্রহ-নক্ষত্র কি তাদের আলো অব্যাহত রাখতে পারে ?

## সোহরাব কর্তৃক তার অশু মনোনয়ন

বীরাগ্রগণ্য সোহরাব মাকে বললো,  
মা, আমাদের সৌভাগ্য উত্তরোত্তর বৃক্ষি পাক।  
আমার বাহনকূপে একটি অশ্বের প্রয়োজন,  
তার ক্ষুর হবে প্রস্তর-বিদারী ইস্পাতের মতো।  
হস্তীর মতো সে বলবান হবে এবং পক্ষীর মতো পাখাযুক্ত,  
জলে সে মীনের মতো হবে, বনে হরিণের মতো দ্রুতগামী।  
আমার মতো আরোহী ও গুরুভার প্রহরণ বহন  
তাকে সক্ষম হতে হবে,  
যাতে ঘূঁঢ়ের সময় আমাকে পদব্রজে  
শক্রের সম্মুখীন হতে না হয়।  
মা, পুত্রের মুখে এই কথা শুনে  
গর্বে উন্মুক্ত করলেন তাঁর শির।  
তারপর অশু-রক্ষকগণকে ডেকে বললেন,  
অবিলম্বে রাক্ষিত অশুদল এনে উপস্থিত করো আমার সামনে।  
সোহরাব তাদের মধ্যে থেকে একটি বেছে নিয়ে  
যুদ্ধযাত্রা করবে।  
তহমিনার আদেশে অশু-শালার সকল অশু  
এবং পাহাড়ে ও প্রান্তরে যে-সব ঘোড়া মুক্ত ছিল সব আনা হলো।  
সকল অশু এনে নগরে জমায়েত করা হলে  
সোহরাব পাশ-রঞ্জু হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলো তাদের দিকে।  
যে-অশুকেই সে শক্তিশালী ও সুন্দর দেখলো  
তারই গলায় রঞ্জু পরিয়ে  
তার পৃষ্ঠদেশে ভর করে সে তার শক্তি পরীক্ষা করতে লাগলো,  
কিন্তু প্রতিটি অশুই বীর-পুত্রের ভাবে নুয়ে পড়তে লাগলো মাটিতে  
এইভাবে শক্তি প্রয়োগের পরীক্ষায় দেখা গেলো,  
একটি ঘোড়াও সোহরাবের মনঃপুত হয়নি।  
আশানুরূপ ঘোড়া না পেয়ে  
যখন ভেঙে গেছে তার মন  
তখন এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো,  
আমার কাছে রাখ্শের ওরস-জাত এক অশু-শাবক আছে,  
শক্তিতে সে সিংহের মতো ও গতিতে বায়ুর অনুরূপ।

সেই অশু-শাবক পর্বত-প্রান্তের ও উপত্যকা সর্বত্র  
পক্ষ-যুক্ত পাখির মতো ছুটে বেড়ায়।  
তার ক্ষমতা ও চলন সূর্যের মতো,  
এমন দ্রুতগতি অশু কেউ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।  
তার পদতাড়নার ভয়ে গবাদি পশু ও মৎস্য উভয়ে কম্পমান  
বিদ্যুতের মতো সে লম্ফ প্রদান করে; দেখতে সে পাহাড়ের  
মতো বিশালকায়।

গিরি শিরে সে বায়সের মতো উড়ে বেড়ায়  
জলে সে মৎস্য কিংবা মাছ-রাঙা পাখির মতো অনায়াস।  
মরুভূমিতে সে জ্যামুক্ত তীরের মতো,  
যেখানে শক্রের অবস্থান সেখানেই সে চক্ষের পলকে গিয়ে  
উপস্থিত হয়।

লোকটির কথা শুনে সোহৱাব অত্যন্ত আনন্দিত হলো,  
তার মুখমণ্ডল প্রস্তুতিত হলো হাসির রেখা।  
অশুপাল তখন সেই সুন্দর ঘোড়াটিকে  
সোহৱাবের কাছে নিয়ে এলো।  
সোহৱাব আদর করে তার পিঠে হাত রাখলো ও তার  
প্রশংসা করলো,  
তারপর তাকে জিন-গদীতে সজ্জিত করে তার উপর চড়ে বসলো।  
গিরিভূঢ়া সদৃশ সেই অশু আরোহণ করে  
সোহৱাব হাতে তুল নিলো শুন্তসদৃশ এক বর্ণ।  
তারপর বিশু-প্রভূর প্রশংসা উচ্চারণ করে সে বললো,—  
এই ঘোড়া সব দিক দিয়েই আমার অনুকূল হয়েছে।  
আমি এখন অশুরোহণে যুদ্ধযাত্রা করবো,  
এবং কায়কাউসের দিনকে পরিবর্তিত করবো রাখিতে।  
এই বলে সে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে  
ইরান অভিযানের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করলো।  
চারদিক থেকে আসতে লাগলো সৈন্যদল,  
সাহসী বীর ও তরবারিধারী সামন্তগণ এসে জমায়েত হলো।  
এইবার সোহৱাব মাতামহের কাছে গিয়ে  
তাঁর সাহায্য ও অনুমতি প্রার্থনা করলো।  
সামানঁা-রাজ সোহৱাবের এই প্রস্তুতি দেখে  
তাকে যুদ্ধের সববিধি সাজ-সরঞ্জাম দান করলেন।

তদুপরি তাকে দিলেন মুকুট, সিংহাসন, শিরস্ত্রাণ ও কঠিবন্ধ,  
অশু, উষ্টু, মুক্তা ও স্বর্ণাদি দ্বারা তাকে ভূষিত করলেন।  
সৈনিকদের উর্দ্ধি ও যাবতীয় যুদ্ধ-সরঞ্জাম দেখে  
কিশোর সোহৃদাব আনন্দে অধীর হলো।  
দৌহিত্রকে সর্ববিধ দানে ভূষিত করে ও রাজবেশে সজ্জিত করে,  
রাজা তার দিকে প্রসারিত করলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত।

## আফ্রাসিয়াব কর্তৃক বারমান ও হুমানকে সোহৱাব সমীপে প্ৰেৱণ

আফ্রাসিয়াবেৰ কাছে খবৰ পৌছলো যে,  
সোহৱাব জলে তৰী ভাসিয়েছে।  
সে প্ৰস্তুত কৱেছে এক বিৱাট সৈন্যদল  
যাব সৈনিকগণ দেবদাকুৰ মতো উন্মত-শিৱ।  
এখনো যে বালকেৰ মুখ থেকে আসে দূধেৰ গুৰু,  
সে-ই হাতে তুলে নিয়েছে তলোয়াৰ।  
অশ্বাধাতে সে ধোত কৱেছে মৃত্তিকা,  
কায়কাউসেৰ সঙ্গে যুৰ্জ কৱাৰ জন্য সে প্ৰস্তুতি নিচ্ছে।  
তাৰ অধীনে সে এমন সৈন্যদল জমায়েত কৱেছে,  
যাব তুলনা নেই।  
তাৰ মুখ থেকে যে-বাণী নিৰ্গত হয়  
তাতে বুদ্ধিৰ ও কলাকৌশলেৰ সকল পৱিচয় বৰ্তমান।

আফ্রাসিয়াব এই খবৰ শুনে অত্যন্ত প্ৰীত হলেন,  
তাঁৰ ওষ্ঠাধৰে জেগে উঠলো হাসিৰ রেখা।  
তিনি তাঁৰ সৈন্যদলেৰ মধ্যে থেকে বাবো হাজাৰ বীৱকে নিবাচিত কৱে  
তাদেৱকে ভাৰী প্ৰহৱণ দ্বাৰা সংজ্ঞিত কৱলেন।  
এবং হুমান ও বারমানেৰ মতো সেনাপতিদেৱ হাতে  
সেই বীৱদেৱ সমৰ্পণ কৱে বললেন,  
এমন ব্যবস্থা ও কৌশল কৱতে হবে যাতে  
কে কাৰ সঙ্গে যুৰ্জ কৱেছে সে-ৱহস্য গোপন থাকে।  
পুত্ৰ যেন পিতাৰ পৱিচয় না পায়,  
সম্পৰ্ক ও সেহ মহতাকে রাখতে হবে আড়াল কৱে।  
এক বিৱাট সৈন্যদল আমৱা সোহৱাবকে দিচ্ছি,  
যাতে সে সফলভাৱে ইৱান আক্ৰমণ কৱতে পাৱে।  
দুই প্ৰতিদুন্দী যোৰুজদল মুখোমুখী হলে  
কুন্তম তাৰ অজ্ঞাতেই এই বালকেৰ সঙ্গে যুৰ্জে প্ৰব্ৰত্ত হবে।  
যদি এই পুৰুষ-প্ৰবৱেৰ হাতে বৰ্ষীয়ান সেনাপতি নিহত হয়,  
তবে কুন্তম-শূন্য ইৱান সহজেই আমাৰ হাতে আসবে,  
এবং দুনিয়া কায়কাউসেৰ জন্য হবে সংকীৰ্ণ।

অপৰপক্ষে যদি পিতার হাতে পুত্র হত হয়  
তাহলেও যশস্বী রূপমের মন ভেঙে যাবে।

বাদশার উপদেশ শিরোধার্য করে দুই সেনাপতি  
সোহৰাবের অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন।  
তাঁদের সঙ্গে গেলো বালক—বীরের জন্য বাদশার উপহার,  
স্বর্ণ-সম্পদে বোঝাই দশটি আশু ও দশটি উষ্ট।  
সেই সঙ্গে মণিময় সিংহাসন ও মুক্তাখচিত রাজমুকুটও  
বাদশার উপটোকনরূপে প্রেরিত হলো।  
আর দেওয়া হলো সম্মাটের এক লিপি সেই ভাগ্যবান যুবকের কাছে,—  
সুলিখিত ও চিঞ্চাকর্ষক।  
তাতে লেখা হলো, যদি ইরানের সিংহাসন হস্তগত করতে পারো  
তবে কাল নন্দিত হবে তোমার বীরত্বে।  
তখন এ—রাজ্য থেকে ইরান আর বেশী দূরের পথ থাকবে না,  
সামান্গী, ইরান ও তুরান এক হয়ে যাবে।  
কতিপয় সিপাহী আমি প্রেরণ করছি,  
তারা তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে নব রাজমুকুট পরিয়ে দিবে।  
হৃমান ও বারমানের মতো বীর যশস্বী সেনাপতি  
সারা তুরানে আর একজনও নেই;  
সেই সেনাপতিদুয়কে ও  
নিবাচিত তিন লক্ষ সংগ্রাম-কুশলী বীরকে  
অনিদিষ্ট কালের জন্য তোমার আদেশের অনুবর্তী করে পাঠাচ্ছি।  
তুমি যদি যুদ্ধ করতে চাও, তবে  
এরাও তোমার সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করবে;  
এবং প্রতিদুন্দুদের সামনে  
দুনিয়াকে করে তুলবে অতীব সংকীর্ণ।  
এই লিপি ও স্বর্ণ-সম্পদ বোঝাই আশু ও উষ্টসহ  
সেনাপতিদুয় সামান্গীর নিকটবর্তী হতেই  
সোহৰাব প্রস্তুত হলো তাদের প্রত্যুদ্গমনের জন্য।  
তারপর মাতামহকে নিয়ে বাযুগতি সে হৃমান ও বারমানের নিকটবর্তী হলো  
বাদশার প্রেরিত সৈন্যদল দেখে তার আনন্দের অবধি রঞ্জিত না।  
হৃমানও সোহৰাবের বীরত্ব—ব্যঙ্গক চেহারা দেখে  
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

তিনি সোহৃদাবের হাতে দিলেন বাদশার লিপি  
ও তৎসঙ্গে সম্পদ বোঝাই উচ্চ ও অশুণ্ড তাকে সমর্পণ করলেন।  
এইবার সুচতুর সেনাপতিদ্বয়  
সোহৃদাবকে শোনালেন সম্ভাটের বাণী।  
সোহৃদাব লিপি পাঠ করে ও সম্ভাটের বাণী শনে  
সৈন্যদেরকে যুদ্ধযাত্রার জন্য আহ্বান জানালো।  
অভিজ্ঞ সৈন্যদল অগ্নিদেশ মাত্র দূর্দুতি নিনাদিত করে যাত্রার সূচনা করলো,  
তাদের কোলাহলে গুঞ্জিত হয়ে উঠলো দিক-দিগন্ত।  
লোকে বলতে লাগলো যুক্তে সোহৃদাবের সমকক্ষ কেউ নয়,—  
সে পশুরাজ সিংহ হোক কিংবা জল-শার্দুল নকৃ।  
ক্রমে সৈন্যদল তুরান-সীমান্ত অতিক্রম করে ইরানের দিকে এগিয়ে চললো,  
জন-শূন্য হয়ে উঠলো তাদের পথে সকল জনপদ।

## শ্বেত দুর্গ-পাদদেশে সোহরাব

শ্বেত দুর্গ নামে এক দুর্গ ছিল  
এই দুর্গই ছিল ইরানীদের ভরসা।  
দুর্গের রঞ্জক ছিলেন বীরবর হজীর,  
তিনি যেমন শক্তিশালী তীরন্দাজ ও গদাধারী ছিলেন  
তেমনি ছিলেন হৃদয়বান।

এই সময় বীরপ্রবর গুণ্ঠাহাম বালক মাত্র ছিল  
যুদ্ধের উচ্চাদানায় বাসনা তার স্ফূরিত হচ্ছিল পতাকার মতো।  
তার এক ভঙ্গী ছিল যেমন বীর  
তেমনি যশষ্বী ও রণ-কুশল।

সোহরাব দুর্গের নিকটবর্তী হলে সাহসী হজীর তাঁকে দেখতে পেলেন।  
ও সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে নির্গত হলেন দুর্গ থেকে।  
প্রতিপক্ষের সামনে এসেই তিনি  
তুর্কী সৈন্যদের বীরবৃন্দকে ডাক দিয়ে বললেন,  
কোন্ কোন্ সাহসী সংগ্রাম-কামী ও বীর যোদ্ধা,  
এই রণক্ষেত্রে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও  
এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো বীর সেনাপতিবৃন্দ।  
হজীরের ডাকে ও তাঁর সুউন্নত দেহভঙ্গি দেখে  
কেউ তাঁর সামনে আসতে সাহস করলো না।  
একমাত্র সোহরাব সেই সংগ্রামকামীকে লক্ষ্য করে  
জিঘাংসা-মত্ত তরবারি উন্মুক্ত করলেন;  
এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন সিংহের মতো।  
তাঁকে দেখে রণভিজ্ঞ হজীর বললেন,  
তুমি একা যুদ্ধে এগিয়ে এলে? বড় আশ্চর্য!  
পাগলের মতো এমন একাকী আসছো কেন?  
কেন নক্রের মতো এমন গুরু-গভীর চালে যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছ?  
কে তুমি, কি তোমার নাম, তুমি কোন্ বংশোদ্ধৃত?  
তোমার জননী যে তোমার উপর রোদন করবে।  
কিন্তু শুনে রাখো, যুদ্ধে আমি কারুর উপর দয়া করি না।  
আমি সেই বীর-গ্রাসী পুরুষ,  
যার সামনে নর-সিংহও শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয়।

আমি বীরবর হজীর, আমি সেনানায়ক,  
এখুনি আমি তোমার শির দেহ থেকে বিছিন্ন করবো।  
সেই শির প্রেরিত হবে সফ্যাটের সমীপে,  
ও তোমার দেহ এখানে গোপন করবে গৃহদল।  
সোহৃবাব এই কথা শুনে মৃদু হাস্য করলেন  
ও দ্রুতগতিতে এসে দাঁড়ালেন প্রতিপক্ষের সামনে।  
উভয়ের বর্ণার মুখ বিদ্যুত-বেগে  
পরম্পরের সঙ্গে প্রহত হলো;  
এবং তার থেকে নির্গত হলো অগ্নি,  
এইবাব হজীর স্থান পরিবর্তন করলেন।  
সোহৃবাব হজীরের কঠিদেশ লক্ষ্য করে নিষ্কেপ করলেন বর্ণা  
কিন্তু বর্ণার ফলা তিনি তাঁর দেহে বিন্দু করতে পারলেন না।  
এইবাব বর্ণা টেনে নিয়ে তার হাতল দিয়ে  
তিনি যহুয়ীর হজীরের বক্ষদেশে আঘাত করলেন।  
ও তাঁকে অশু-পৃষ্ঠ থেকে তুলে নিয়ে  
গিরিশঙ্কের মতো ছুঁড়ে মারলেন মাটিতে।  
তারপর দ্বারিত-গতি অশু-পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে  
সোহৃবাব তাঁর বুকের উপর চড়ে বসলেন দেহ থেকে শির বিছিন্ন করে নিতে।  
এই অসহায় অবস্থায় হজীর  
অত্যন্ত করুণভাবে সোহৃবাবের কাছে নিয়ন্ত্রিত প্রার্থনা জানালেন।  
সোহৃবাব তখন হজীরের প্রাণ হননে বিরত হয়ে  
গুটিয়ে নিলেন তাঁর অস্ত্র।  
এবং তাঁকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিলেন হৃমানের কাছে।  
হৃমান এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন,  
কেমন সহজে সোহৃবাব এত বড় বীরকে বন্দী করে ফেলেছেন !  
ওদিকে দুর্ঘের লোক সংবাদ পেলো,  
হজীর বন্দী হয়ে শক্র-শিবিরে নীত হয়েছেন।  
সংবাদ শুনে দুর্গ-মধ্যস্থ সকল নরনারীর মধ্যে রোদনের রোল উঠলো।

## ଗିରଦ୍ ଆଫ୍ରିଦେର ସଙ୍ଗେ ସୋହରାବେର ଯୁଦ୍ଧ

ଗାଜିଦ୍ଦମ୍-ରାଜେର କନ୍ୟା<sup>\*</sup> ଯଥନ ଜାନତେ ପେଲେନ ଯେ,  
ତାଂଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ କରେ ଗେଛେନ ଏକ ନାମଜାଦା ବୀର,  
ତଥନ ଶୋକେ ଦୁଃଖେ ତାଁର ଅସ୍ତର ଥେକେ ବେରିଯେ ଏଲୋ ଏକ ହିମ-ନିଃଶ୍ଵାସ ।  
ଯଦିଓ ତିନି ଏକ ମହିଳା, ତବୁ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ତେ  
ତିନି ଛିଲେନ ଏକ ଯଶସ୍ଵୀ ସେନାନୀୟକ ।

ତାଁର ନାମ ଛିଲ ଗିରଦ୍ ଆଫ୍ରିଦ,  
ତାଁର ମତୋ କୁଶଲୀ ଯୋଦ୍ଧା କେଉ କଥନୋ ଦେଖେନି ।  
ହୁଜୀରେର ଆଚରଣେ ତିନି ଏତ ଲଜ୍ଜିତ ହଲେନ ଯେ,  
ତାଁର ଗଣ୍ଡୁଯ ଶରମେ ଲାଲା ଫୁଲେର ମତୋ ଲାଲ ହୟେ ଉଠିଲୋ ।  
ତିନି ଆର କାଳବିଲମ୍ବ ନା କରେ ।

ଯୁଦ୍ଧ ସାଜେ ସଜ୍ଜିତା ହଲେନ ।

ଦୀର୍ଘ କେଶରାଜି ତିନି ବର୍ମେର ଅନ୍ତରାଲେ ଗୋପନ କରେ  
ଶିରେ ତୁଲେ ଦିଲେନ ରୋମଦେଶୀୟ ମୁକୁଟ ।

ଏହିବାର କୋମରେ କଟିବକ୍ଷ ପରେ ଓ ତାଜୀ ଘୋଡ଼ାଯ ଢପେ  
ତିନି ବୀରବିକ୍ରମେ ଦୁର୍ଗ ଥେକେ ନିଞ୍ଜନାସ୍ତ ହଲେନ,  
ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସାମନେ ଏକ ମେଘଥତେର ମତୋ ଉଦୟ ହୟେ  
ବଞ୍ଚ-ନାଦେ ବଲଲେନ,  
କୋଥାଯ ବୀରଗଣ, କୋଥାଯ ସେନାପତି ?

ଯୁଦ୍ଧକାମୀର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ କେ ଚାଓ, ଆସ !

ଆସ, ସାହସୀ ନକ୍ରେର ମତୋ ଏସେ  
ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରୋ ।

ତାଁର ଏଇ ଆହ୍ଵାନେର ମୋକାବେଲାୟ  
ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ଏକଞ୍ଜନ ସୈନିକ ଓ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଗିଯେ ଆସଛେ ନା ଦେଖେ  
ମହାବୀର ସୋହରାବ ଓଷ୍ଠେ ଦ୍ୱାତ୍ରମୁକୁଟ କରେ  
ମୃଦୁ ହାସ୍ୟେ ଅଗସର ହୟେ ବଲଲେନ,—

ଅନ୍ତର୍ଧାରୀ ଶକ୍ତିମାନେର ଜାଲେ ଆବନ୍ଦ ହେଁଯାର ନିମିତ୍ତ  
ଆବାର ବୁଝି ଏଗିଯେ ଆସଛେ ଏକ ଗର୍ଦଭ !

ତିନି ଯଥାଶୀୟ ବର୍ମେ ଆଛାଦିତ ହୟେ  
ଓ ଶିରେ ଚୀନଦେଶୀୟ ଶିରସ୍ତାଣ ପରେ

---

ପୂର୍ବ-ପ୍ରଦଙ୍କେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁର୍ଭାହାମେର ଡାକୀ ।

বাযুগতি পাশ-ধারিণী গিরদ্ আফ্রীদের দিকে ধাবিত হলেন।  
এবং বক্ষ প্রসারিত করে হাতে নিলেন ধনুঃশর,  
কোন বিহঙ্গ ও এখন তাঁর সামনে দিয়ে উড়ে যেতে পারে না।  
এইবার চারদিক থেকে সোহৃবাবের উপর  
শুরু হলো তৌরের বর্ষণ।  
প্রতিপক্ষের তৌর-বর্ষণ দেখে সোহৃবাব লজ্জা পেলেন  
ও মন্ত্রক ঢালচর্মে রক্ষা করে ধাবিত হলেন রাজকন্যার দিকে।  
গিরদ্ আফ্রীদ দেখলেন তাঁর প্রতিদুন্তী  
অগ্নি-গোলকের মতো ধাবিত হয়েছে তাঁর দিকে।  
তিনি তৎক্ষণাত্ স্কন্ধদেশে ধনুঃশর রক্ষা করে  
ও অশ্বের শির মেঘদলে উন্নীত করে  
বর্ণার মুখ সোহৃবাবের দিকে তাক করে ধরলেন,  
তাঁর অশ্ব-বক্ষা ও বর্ণাফলক সুযুকিরণে ঝলমল করে উঠলো।  
সোহৃবাব এই বিস্ময়কর আক্রমণ লক্ষ্য করে  
দূরস্থ ব্যাক্রের মতো স্বীয় অশ্ব উত্তেজিত করলেন,  
ও বিদ্যুৎ-গতিতে অগ্রসর হলেন সামনের দিকে।  
তাঁর হাতে প্রাণ-সংহারক বর্ণ  
ফলকের চমক হেনে ঘূর্ণিত হতে লাগলো।  
সোহৃবাব গিরদ্ আফ্রীদের কঠিদেশ লক্ষ্য করে বর্ণ ছুঁড়লেন,  
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তনুগ্রাম দীর্ঘ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।  
এইবার তিনি অশ্ব-পৃষ্ঠ থেকেই  
প্রতিদুন্তীকে ধরবার জন্য উদ্যত হলেন।  
গিরদ্ আফ্রীদ বীরের হাত থেকে গা বাঁচিয়ে  
কঠিদেশ থেকে টেনে নিলেন তরবারি  
ও তার আঘাতে সোহৃবাবের বর্ণ  
দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে অশ্ব-খুরে উথিত করলেন ধূলিরাশি।  
প্রতিদুন্তীর শৌর্য প্রকাশে অত্যন্ত উৎপন্ন হয়ে  
সোহৃবাব অশ্ব-বক্ষা শুরু করলেন  
ও সরোষে হরণ করলেন ধরণীর সকল আলো।  
প্রতিদুন্তী ও নিজের মধ্যেকার ব্যবধান  
সন্তুচ্ছিত করে সোহৃবাব গিরদ্ আফ্রীদের মুকুট খরে টান দিলেন।  
মুকুটের বাধা অপসারিত হতেই কেশরাজি মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো,  
সঙ্গে সঙ্গে সূর্যসদৃশ মুখের আলো বিকীরিত হলো চারদিকে।

সোহৰাব বুঝতে পারলেন, তাঁর প্রতিদুন্তী একজন নারী,  
এতক্ষণ সেই পরিচয় মুকুটের আবরণে গোপন ছিল।  
তিনি বিশ্বিত হয়ে বললেন, যে—ইরানীয়দের মধ্যে থেকে  
এইভাবে মেয়েরা যুদ্ধ করতে আসে,  
তাদের অশ্঵ারোহীদের পদধূলি অবশ্যই স্পর্শ করবে মেঘলোক।  
ইরানীয়দের নারীরা সত্যই যুদ্ধক্ষেত্রে বীর—বিক্রমশালিনী !  
এই বলে তিনি স্বীয় পৃষ্ঠদেশে রাক্ষিত পাশ টেনে নিয়ে  
নিক্ষেপ করলেন ও তাতে আবন্ধ করলেন গিরদ্ আফ্রীদের কটিদেশ।  
সোহৰাব বললেন, সুন্দরী, কেন বৃথা চেষ্টা করছো ?  
তুমি আমার হাত থেকে আর নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না।  
তোমার মতো কোন গর্ডভই  
আজ পর্যন্ত আমার জাল থেকে রেহাই পায়নি।  
গিরদ্ আফ্রীদ তখন স্বীয় মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ অনাবৃত করলেন,—  
দেখলেন যে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।  
তিনি বললেন, হে সাহসী বীর,  
সাহসীদের মধ্যেও আপনি সিংহ—সদশ।  
দুই পক্ষের সেনাদলই আমাদের যুদ্ধ অবলোকন করছে,  
প্রত্যক্ষ করছে আমাদের প্রহরণ, প্রয়াস ও তরবারি।  
আমি এখন আবারিত করেছি আমার মুখ ও কেশরাজি,  
ঐ দেখুন, সৈন্যগণ আপনার সম্পর্কে কি বলাবলি করছে।  
তারা বলছে, এক নারীর সঙ্গে যুদ্ধে  
এক বীর আলোড়িত করছে রণস্থল।  
আর বিলম্ব করবেন না,  
এমন যুদ্ধ আপনার জন্য কলঙ্ক—স্বরূপ।  
বীরের কর্ম হলো, এ সময়ে, যবনিকার অস্তরাল সৃষ্টি করা।  
সারিবন্ধ দুই সেনাদলের গোচরে  
আমার মতো হরিণের প্রত্যাশায় কোমর বাঁধবেন না।  
দুর্গ ও আমার সৈন্যদল এখন আপনার আদেশের অনুবর্তী,  
সক্রিয় মুহূর্তে সংগ্রামের জন্যে উত্লা হবেন না।  
দুর্গ, তন্মধ্যস্থ ধন—সম্পদ ও দুর্গ—রক্ষক সবই আপনার,  
আপনার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হলো।  
সোহৰাব যখন স্বীয় প্রতিদুন্তী সুন্দর মুখ আবারিত দেখলেন  
ও প্রত্যক্ষ করলেন তার ওষ্ঠাধর—স্খলিত বাক্যরাশি,

তখন তাঁর মনে হলো, স্বর্গ-সদৃশ এক ফুলবন বিকশিত হয়েছে,  
 এমন সুন্দর দেবদারু কোন চাষীই রোপণ করেনি কোন কালে।  
 রাজকন্যা হরিণাঙ্কি, তাঁর ভূরুদ্য বাঁকা ধনুক,  
 তাঁর মুখমণ্ডল বিকাশমান প্রসূন।  
 সোহৃব বললেন, স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মিত হবেন না,  
 যুক্তে আমার পরাক্রম আপনি দেখেছেন।  
 দুর্গ-প্রাচীর আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না,  
 কারণ, আকাশ থেকে তা উচ্ছতর নয়।  
 আমার প্রহরণের আঘাতে আমি তা জয় করে নেব,  
 অথচ আমার পরাক্রমকে কেউ স্পর্শও করতে পারবে না।  
 বীরবরের কথা শুনে গিরদ্ আফ্রীদ তাঁর অশ্বের মুখ  
 দুর্গের অভিমুখে ঘূরিয়ে নিলেন।  
 সোহৃবও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে  
 গাজদাহামের দুর্গ-দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন।  
 দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হলো,  
 গিরদ্ আফ্রীদ ভগু-হৃদয়ে বন্দী অবস্থায় তাতে প্রবেশ করলেন।  
 যথারীতি দুর্গ-দ্বার আবার রক্ষ করে দেওয়া হলো,  
 দুঃখিত ও ভগু-হৃদয়ে অবস্থান করছে।  
 গাজদাহাম সংবাদ পেয়ে যশস্বী বীরগণসহ  
 কন্যার কাছে দৌড়ে এলেন।  
 বললেন, হে পৃথ্বীতী সিংহ-হৃদয়া কন্যা আমার,  
 তোমার জন্যে আমি আর এই জনসমাবেশ অতীব দুঃখিত।  
 যুক্তে তোমার অপূর্ব বীরত্ব সংহেও  
 তুমি জয়ী হতে পারোনি।  
 কিন্ত উন্নত আকাশের প্রভুর অশেষ প্রশংসা,  
 দুশ্মন তোমাকে কোন আঘাত করতে পারেনি।  
 এমন সময় গিরদ্ আফ্রীদ রহস্যময় উচ্ছহাস্য করে  
 অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন,  
 ও সোহৃবকে লক্ষ্য করে বললেন, কেন আপনি কষ্ট করে  
 রণক্ষেত্র থেকে এখানে এসেছেন? যান, ফিরে যান।  
 সোহৃব অবাক হয়ে বললেন, হে সুন্দরী,  
 তাজ ও তথ্যতের অধিকারিণী!

জ্ঞেনে রাখো, এই দুর্গ আমি জয় করবোই  
এবং সেই সঙ্গে তোমাকেও করবো হস্তগত।  
যখন তুমি অসহায় বোধ করেছিলে ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলে  
এবং সকল গর্বের জন্য বোধ করেছিলে লজ্জা,  
তখন যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে সেই প্রতিজ্ঞা কোথায় গেলো ?  
সোহৃদাবের কথা শুনে গিরদ আফ্রীদি হাস্য করে বললেন,  
আফসোস, তুর্কীরা ইরানীয়দের সমকক্ষ নয়।  
যে—দিন গেলো, তেমন দিন আর তুমি কখনো দেখবে না,  
কাজেই সেজন্য মনে দৃঢ় নিয়ো না।  
আমার বিশ্বাস, তুমি তুর্কীদের কেউ নও,  
এবং তুমি বড়দেরও প্রশংসার যোগ্য।  
কিন্তু সেদিন দূরে নয়, যেদিন তুমি তোমার বাহ্বল  
তোমার সমকক্ষদের সামনে আটুট রাখতে পারবে না।  
যখন সম্রাট জানতে পারবেন যে,  
তুরান সৈন্যদের মধ্যে এক বীরের আবির্ভাব হয়েছে  
তখন সম্রাট ও রুপ্তম স্বস্থান থেকে বিচলিত হবেন,  
এবং তুমি কিছুতেই রুপ্তমের সমকক্ষ হবে না।  
তখন তোমার সৈন্যবাহিনী একজনও জীবিত থাকবে না,  
তোমার উপরেও না জানি সেদিন কি অঙ্গল নেমে আসে ?  
কাজেই, নিজের বাহ্বল ও বীরত্ব নিয়ে নির্ভয় থেকো না,  
বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতাকে আশ্রয় করো।  
তোমার জন্য মঙ্গলকর হবে যদি তুমি তোমার সৈন্যদেরকে  
তুরান ফিরে যাওয়ার আদেশ করো।  
সোহৃদাব গিরদ আফ্রীদের কথা শুনে দৃঢ় করে বললেন,  
এই দুর্গ আমি অনায়াসেই জয় করবো।  
তখন এখানকার কোন স্থানই অক্ষত রাখবো না।  
এই দেশের সারা ভূমি ও শস্য কেতু  
আমি লুঠনের মুখে প্রত্যপর্ণ করবো।  
আরো বললেন, আজকের দিন আমার বৃথা গেলো,  
যুদ্ধ থেকে আজ আমি বিরতই থাকবো।  
আগামী রাত্রি-শেষে আমি এই দুর্গ আক্রমণ করবো,  
এবং দুর্গমধ্যে উথিত করবো যুদ্ধের কোলাহল।  
এই বলে তিনি অশু-বল্কা ঘুরিয়ে স্বীয় শিবিরের পথ ধরলেন।

## কায়কাউস সমীপে গাজদাহামের পত্র

সোহৰাব চলে গেলে বৃন্দ গাজদাহাম

এক পত্রলিখককে ডেকে বাদশার কাছে পত্র লিখালেন ;

এবং এক ব্যক্তিকে সেই পত্র নিয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হতে বললেন ।

পত্রে প্রথমেই কীর্তন করা হলো সুমাটের গুণগ্রাম

তারপর তাতে লেখা হলো কালের পরিবর্তনের বিবরণ ।

বলা হলো, আমাদের উপর এক বিরাট

শক্র-সৈন্যের আগমন হয়েছে ।

সেই সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি এক বীর

যার বয়স চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম করেনি ।

উচ্চতায় সে সরল দেবদারুর মতো

তার মূর্তি যেন প্রজ্ঞলন্ত সূর্য ।

তার বক্ষদেশ সিংহের বুকের মতো প্রশস্ত,

তার বাহুর মতো বলশালী বাহু ইরানে আমি প্রত্যক্ষ করিনি ।

হিন্দুস্তানী তরবারি হস্তে সে যখন অগ্রসর হয়

তখন তার সাথে তুচ্ছ হয়ে যায় নদী ও পর্বতের বাধা ।

তার কঠস্বর জলদমন্দুকে শিমিত করে,

তার বাল্মীনিষ্পত্তি করে দেয় উজ্জ্বল তরবারিকে ।

ইরান ও তূরানে তার মতো পুরুষ আর নেই,

বীরগণের কেউই তার সমকক্ষ নয় ।

সেই সাহসী বীরের নাম সোহৰাব,

সে দৈত্য, হন্তী কিংবা সিংহ কাউকেই ভয় পায় না ।

সে যেন দ্বিতীয় রুস্তম, কিংবা নুরীমানেরই বৎশোষ্ণুত কোন বীর ।

যখন তূরান-রাজের এই সেনাপতি,

সৈন্যবাহিনীসহ এখানে এসে পৌছলো,

তখন সাহসী বীর ভজীর যুদ্ধার্থ সজ্জিত হয়ে

এক দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করে

সোহৰাবের সঙ্গে শক্তি পর্যোক্ষার্থ রণক্ষেত্রে অবর্তীণ হলেন ।

এবং রোষ কষায়িত দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাকে আক্রমণ করলেন ।

কিন্তু সোহৰাব তার বিস্ময়কর বাহুবলে

তুলে নিলো তাঁকে অশু-পৃষ্ঠ থেকে ।

এবং সে তাঁর বুকের উপর চড়ে বসতেই

বীরবর হজ্জীর বেদনায় কাতর হয়ে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিলেন।  
তার মতো রং-কুশলী হয়তো  
রুপ্তম ব্যতীত সারা দুনিয়ায় কেউ নেই।  
যুক্তে তার সমকক্ষ হতে পারে  
জাল-পুত্র রুপ্তম ছাড়া আর কাউকে দেখি না।  
তুরানের অনেক অশ্বারোহী বীর আমি দেখেছি,  
কিন্তু এমন বক্ষাধারী আর কখনো আমার চোখে পড়েনি।  
খোদা করুন এমন প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে যেন কোন দিন না আসতে হয়।  
যদি কঠিন পর্বতমালাও আমার সঙ্গী হয়,  
তবু যেন উন্মুক্ত ময়দানে তার সঙ্গে আমার মোকাবেলা না হয়।  
যুক্তের দিনে কে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে ?  
ধরিত্রী তাকে সকল দানে পর্বততুল্য করেছেন।  
সম্ভাট যদি কাউকে আদেশও করেন  
তবু সেই সেনানীর পা উঠবে না, গোপনেও তাকে  
কেউ আক্রমণ করতে সাহসী হবে না।

ইরানের সকল শৌর্য সে অপহরণ করবে,  
তার তরবারি দ্বারা বিজিত হবে সকল বিশু।  
আমাদের বীর্য তার শক্তিতে স্তুতি হয়ে থাকবে,  
কেউ তার বাহবলের মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে প্রস্তুব না।  
কোন লোক তার মতো বক্ষাধারী দেখেনি,  
মনে হয় সে যেন স্বয়ং অশ্বারোহী সাম।  
আমরা এমন বীরের শৌর্য সহ্য করতে পারিনি,  
এমন ভয়াবহ প্রহরণ ও এমন প্রয়াস আমাদের শক্তিকে অভিভূত করেছে।  
আমাদের বীরদের সকল সাহস আজ নির্দ্বাচন্ত হয়েছে,  
আমাদের মহত্বমগ্ন হয়েছেন দিগন্তের অভিসারী।  
আমরা আজ রাত্রেই আমাদের সম্পদাদিসহ  
গ্রামাঞ্চলের পথ ধরবো।  
আমরা ধৈর্য ধরে ও সংগ্রাম করে কি করবো ?  
এই দুর্গ তার তেজ সহ্য করতে অক্ষম,  
আমাদের বিলম্ব তার সিংহ-গতিকে দ্বরান্বিত করবে মাত্র।  
এইভাবে লিপি লিখে তা মোহরাক্ষিত করে  
দৃতের হাতে দিয়ে বৃক্ষ রাজা বললেন,  
এমনভাবে ধাবিত হও যেন কোন লোক

তোমাকে উষাকালে এখানে না দেখতে পায়।  
দৃত লিপি নিয়ে যাত্রা করার অন্তিকাল পরেই —  
দুর্গ-প্রাচীরের তলদেশ দিয়ে যে গুপ্ত পথ ছিল,  
যার অস্তিত্ব গাজদাহাম ব্যতীত আর কারো জানা ছিল না —  
সেই পথে সকল সম্পদ ও আত্মীয়-ব্রজনসহ  
গাজদাহাম গোপনে বেরিয়ে গেলেন।

## সোহ্রাব কর্তৃক শ্বেত দুর্গ দখল

সূর্য যখন উচ্চ পর্বত-চূড়া রঙ্গীন করছে,  
তখন তুরানী সৈন্য যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধলো ।  
সেনাপতি সোহ্রাব বর্ণ হাতে  
আরোহণ করলেন তাঁর দ্রুতগামী অশৈ ।  
তিনি আজ দুর্গ-মধ্যস্থ সকলকে  
দাসের মতো বন্দী করবেন ।

কিন্তু দুর্গের নিকটেবর্তী হয়ে তিনি দেখতে পেলেন সেখানে কেউ নেই ।  
তাঁর চিংকার শুনে দুর-রক্ষী এসে দুর্গ-দ্বার খুলে দিলো,  
কিন্তু সেখান থেকে দুর্গ-রক্ষক ও কর্তৃপক্ষ সবাই অদৃশ্য হয়েছে ।  
রাত্রি বেলায়ই তারা সকলে পলায়ন করেছে ।

সোহ্রাব তাঁর সৈন্যদলসহ দুর্গে প্রবেশ করে দেখলেন  
দুর্গের কোথাও গাজদাহামের কোন চিহ্ন মাত্র নেই ।  
যারা দুর্গ-মধ্যে রয়েছে, তারা সবাই নিষ্পাপ নাগরিক,  
অর্থচ করজোড়ে তারাই মার্জনা ভিক্ষা করছে ।

সেনাপতির আদেশে দুর্গবাসিগণ এসে  
নিজেদের প্রাণভিক্ষা ঢেয়ে নিলো ।

সোহ্রাব মনে মনে বললেন, হায়,  
উজ্জ্বলিত চন্দ্র বুঝি লুকিয়ে গেলো মেঘের আড়ালে !  
আমার চক্ষু আমাকে দেখিয়েছিল এক অত্যাশ্র্য আশার আলো,  
কিন্তু কাল তা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো ।

আমি আমার জালে আবদ্ধ করেছিলাম এক অমূল্য মৃগ,  
কিন্তু সে আমার জাল থেকে লাফিয়ে পড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো !  
অপূর্ব পরী-মূর্তি উন্মুক্ত করেছিল তার মুখ্যবরণ,  
কিন্তু হায়, সে আমার হাদয় হরণ করে আমার দুঃখকেই বাড়িয়ে দিয়ে গেলো !  
সেই প্রাণ আকর্ষণকারী অস্তর্ধান করলো কোন দূরে,  
আর আমি শোকের জালে আবদ্ধ হয়ে এখানে পড়ে রইলাম !

সেই আঁশি কি জানুই না জানে,  
আমার অনাহত হাদয়কে আহত করে বইয়ে দিলো শোশিত !  
তার মুখ-সন্দর্শন ছাড়া জীবন আমার বিস্বাদ হয়ে গেছে,  
আমার দেহ তার প্রত্যুষ্টরের আশায়ই বন্দী হয়ে রইলো ।  
জানি না কি মন্ত্র সে আমার উপর পাঠ করেছে,

সহসা রুক্ষ হয়ে গেলো আমার কাহিনীর সকল পথ।  
সেই যুদ্ধ, সেই মুখ, সেই বাক্যরাশি,  
আহা, কোন দিন আমি আর তাদের সাক্ষাৎ পাব না !  
আমার দুঃসাধ্য পরিশ্রমের পরিণাম হয়ে সে যেন দেখা দিয়েছিল,  
সাফল্য আজ আমার থেকে বহু দূরে সরে গেছে।  
আমার দুঃখে আমিই রোদন করবো,  
জানি না, কে হবে আমার রহস্যের পরিজ্ঞাতা — শোকের অংশভাগী ?  
সোহৃব এইভাবে বিছেদের আগ্নিতে দগ্ধ হতে লাগলেন,  
এই রহস্য তিনি কারো কাছে খুলে বললেন না।  
কিন্তু প্রেম কখনো গোপন থাকে না,  
অঙ্গ হয়ে তা মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়।  
প্রেমের বেদনা হাদয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে,  
যদি প্রেমিক তা কিছুদিন অন্তরে গোপন করে রাখে।  
সুন্দরী ও বীর্যবর্তী রাজকন্যার প্রেমও তেমনি করে  
সোহৃবাবের মুখভাবে পরিবর্তনের সূচনা করলো।  
হৃমান জানতেন না যে,  
সোহৃবাবের স্নাযুত্ত্বাতেও প্রবাহিত রয়েছে প্রেমের শোণিত।  
তবু সোহৃবাবের ভাবান্তরে তিনি অনুমান করে নিলেন যে,  
নিশ্চয় কোন ব্যাকুলতায় মন তাঁর অস্থির।  
হয়তো কোন সুন্দরীর কেশজালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন।  
অথচ মনোভাব গোপন করে অন্তরে আহত হচ্ছেন,  
তিনি হারিয়েছেন আকাঙ্ক্ষার পথ, ও তাঁর পদদুয়

পক্ষরাশিতে নিমজ্জিত হচ্ছে।

অবসর খুঁজে হৃমান একদিন নিভৃতে বললেন,  
হে সিংহ-হাদয় উন্নত-শির মহাবীর,  
অতীতের মহাপুরুষগণ প্রথাগত কিংবা নৈতিক  
কোন অথেই নিজের চেয়ে কাউকে শ্রেষ্ঠতর গণ্য করতেন না।  
তাঁরা কিছুতেই নিজের হাদয়কে করতেন না হাতছাড়া,  
এবং প্রেমের মদিরা পানে তাঁরা কখনো মন্ত হতেন না।  
তাঁরা শত শত কস্তুরীমৃগ পাশে আবক্ষ করতেন,  
কিন্তু নিজের মনকে বন্দী হতে দিতেন না।  
কোন বীরই যৌবনবর্তী সুন্দরীদের প্রবক্ষনায় হননি আত্মহারা।  
নেতৃত্ব ও মহত্বে যিনি উন্নীত হয়েছেন,

তিনি তাঁর প্রেমকে নিয়োজিত করেছেন আকাশে আরোহণের উপায় রূপে।  
আপনি সিংহ-হৃদয় ও দৈত্য-বন্দীকারী বীর,  
আর আপনিই বুঝি আহত হচ্ছেন প্রেমাঘাতে ?  
বিশ্ব-জয় ও নেতৃত্বের রীতি এ নয় যে,  
কেউ মৎস্যের প্রেমে রোদন করুক।  
আফাসিয়াব আপনাকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন,  
আপনি আজ জল-স্লের প্রভু রূপে বরিত।  
কর্মের জন্য আমরা তুরান থেকে বহিগত হয়েছি,  
রক্তের নদীতে আমরা এসেছি স্নান করতে।  
ইরান-দেশের এক প্রান্ত আমরা জয় করে নিয়েছি,—  
এমন যে দুর্ভেদ্য দুর্গ তাকেও আমরা হস্তগত করেছি সহজেই।  
আমাদের সামনে আজ বিরাট কর্তব্য,  
যদি তাতে সফল না হতে পারি তবে অনুশোচনার আর অন্ত থাকবে না।  
আমাদের দিকে ধাবিত হবেন স্বয়ং সম্মাট কায়কাউস,  
যুবরাজ তূস ও মহাবীর রুক্ষম ;  
আসবেন সেনাপতি গোদর্জ ও গেও,  
আসবেন বাহুরাম ও রুহামের মতো বীর ;  
গুরগীন, মীলাদ ও ফরহাদ প্রমুখ  
হস্তীদলনকারী বীরবৃন্দও আসবেন।  
এইসব সিংহ-পুরুষ যোদ্ধগণ  
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়ে আমাদের সঙ্গে লড়তে আসবেন,  
তাই ভাবুন, এখন আমাদের কর্তব্য কি হবে ?  
আপনিই আজ ময়দানের নেতা,  
সুন্দরীদের প্রেমে আপনার কি প্রয়োজন ?  
হে বীর, প্রেমের লীলা থেকে হৃদয়কে বিচ্ছিন্ন করুন,  
কারণ, আগামী কাল যুদ্ধ থেকে আপনি পিছপা হতে পারবেন না।  
হে নব যৌবনের অধিকারী বীর,  
এক কঠিন কর্তব্য আপনার সামনে।  
যদি এক মনে এক প্রাণে সেই কর্তব্য সমাধানে এগিয়ে না যান,  
তবে নিজের হাতে নিজের শিরকে করবেন অবনত।  
বিশ্বাস করুন, মহাত্ম কর্মই মানুষের নামকে আকাশচূম্বী করে।  
আপনার কর্ম হলো সংগ্রামের মাহাত্ম্য,  
কেন আপনি অন্য বক্ষের দিকে হাত বাড়াবেন ?

পৌরষের শক্তিতে আজ দুনিয়া অধিকার করুন,  
 সম্মাট্টের হাত থেকে ছিনয়ে নিন তাজ ও তখ্ত।  
 যদি রাজ্য জয় করতে পারেন,  
 তবে কত সুন্দরী আপনার ভজনা করবে !  
 নারীর প্রেমে যে মজে, সম্পদ ও শক্তি তার থেকে প্রয়াণ করে দূরে।  
 দুনিয়ায় যে সত্য সত্যই কৃতকার্য হয়,  
 অভিজাত ও জনতা উভয়ে করে তার আরাধনা।  
 হ্মানের এই বাণ্ঘিতা সোহৃদাবের মনোযোগ আকর্ষণ করলো।  
 তাঁর কথায় সোহৃদাবের অস্তর হলো সচকিত,  
 তিনি আসন্ন যুদ্ধের জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করে তুললেন।  
 সোহৃদাব বললেন, হে চীন-বাহিনীর নেতা,  
 আপনার সুন্দর ভাষণের শত প্রশংসা !  
 আপনার কথায় আমার প্রাণের পেয়ালায়  
 মদ্য আবার নতুন করে উচ্ছুলিত হলো।  
 এই দুনিয়ার জল স্থল সর্বত্র আমি  
 আফ্রাসিয়াবের আদেশ প্রচারিত করবো।  
 এই বলে সোহৃদাব স্বীয় মন থেকে প্রেয়সীর চিন্তা দূর করে দিয়ে  
 সুউন্নত সিংহসনে এসে বসলেন।  
 এবং দুর্গ-জয়ের সংবাদ প্রেরণ করলেন আফ্রাসিয়াবের কাছে।  
 এই সংবাদে তুরানাধিপতি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে  
 অশেষ প্রশংসা কীর্তন করলেন তরুণ বীর সোহৃদাবের।

এদিকে ইরান-সম্মাটের কাছে দৃত পৌছলো,  
 লিপি পাঠে সম্মাটের হাদয় পূর্ণ হলো দৃঢ়খের হাহকারে।  
 তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বীরবৃন্দকে ডেকে  
 তাঁদের কাছে সকল কথা বললেন।  
 তুস, গোদ্রজ, কুশওয়াদ, গেও,  
 গুরগীন, বাহুরাম ও ফরহাদ প্রমুখ সেনাপতিবৃন্দ  
 সম্মাটের সমীপে সমবেত হয়ে লিপিকা পাঠ করলেন।  
 এবং চিন্তিত হয়ে বললেন,  
 সমৃহ বিপদ আমাদের সামনে প্রলম্বিত দেখছি;  
 গাজ্দাহামের বর্ণনা পাঠ করে সন্দেহ মাত্র থাকে না যে,  
 এই বিপদের প্রতিকার অতীব দুরাহ;

ইরানে এমন সীর কে, যে তার মোকাবেলা করতে পারে ?  
মহামতি গেও তখন বললেন,  
শীঘ্র জাবুলস্তানে মহাবীরের সমীপে লোক পাঠানো হোক।  
রুষমকে সংবাদ দেওয়া হোক যে, সমাটের সিংহসন বিপদগ্রস্ত।  
এই যুক্তে এগিয়ে যেতে হবে রুশমকেই।  
ইরানের সহায় তো একমাত্র তিনিই হতে পারেন।  
প্রস্তাবদাতা আর দেরী না করে তৎক্ষণা লিপি-লিখককে নিয়ে বসলেন,  
ও অসম্ভবের মুখে বাঁধ-বাঁধবার জন্য নিবন্ধ করলেন স্থীর মনোযোগ।

## ରକ୍ତମେର ପ୍ରତି କାଯକାଉସେର ଲିପି ଓ ତାଁକେ ଜାବୁଲଙ୍ଘନ ଥେକେ ଆହ୍ଵାନ

সମ୍ମାଟ ମହାମତି ରକ୍ତମେର କାଛେ ଏକ ଲିପି ଲିଖାଲେନ ।  
ପ୍ରଥମେହି କୀର୍ତ୍ତନ କରଲେନ ମହାବୀରେର ପ୍ରଶାଂସା,— ବଲଲେନ,  
ଆପନି ଚିରକାଳ ଜାଗ୍ରତ୍-ଚିତ୍ତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ହୃଦୟ ନିଯେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ ।  
ଅବଗତ ହୋନ, ତୁର୍କୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି  
ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ଆମାଦେର ଦିକେ ଅଭିଯାନ କରେଛେ ।  
ସେ ଦୂର୍ଗ ଅଧିକାର କରେ ସମେନ୍ୟେ ସେଥାନେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରଛେ,  
ଦୂର୍ଗ-ବର୍ଷକ ପଲାଯନପର ହୟେଛେ ତାର ଭାଯେ  
ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୀର ଓ ସାହସୀ ;  
ଦେହେ ସେ ମଦମତ ହଣ୍ଡିର ମତୋ, ସାହସେ ସିଂହ-ସଦୃଶ ।  
ଇରାନେ ଏମନ କେଉ ନେଇ ଯେ ତାର ତାପ ହରଣ କରତେ ପାରେ,  
ଏକଥାତ୍ ଆପନିଇ ତାର ଔଜ୍ଜ୍ଵଳ୍ୟ ହରଣ କରତେ ସକ୍ଷମ ।  
ଆପନିଇ ସେଇ ବୀର-ପୁତ୍ର ବୀର,  
ଯେ ଶକ୍ତିର ସାହସ ଓ ତରବାରି ଛିନିଯେ ନିତେ ପାରେ ସବଲେ ।  
ଆପନି ଉନ୍ନତ-ଶିର ଶକ୍ତି-ଜୟୀ ଓ ଯଶସ୍ଵୀ,  
ଦୁନିଆର ବୀରଗଣେର ଉତ୍ତର୍ଧେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଆପନାର ଶିର ।  
ହେ ସର୍ବ-ଖ୍ୟାତ ଦେନାପତି ରକ୍ତମ,  
ଆପନି ମହତ୍ତମଗଣେର ସ୍ତର୍ମରାପ ଓ ଆସରେର ଗର୍ବ ।  
ଦୁନିଆଯ ଆପନାର ମତନ ଆର କେ ?  
ସକଳ କାଜେ କେ ଆର ଏମନ କରେ ପ୍ରାର୍ଥୀର ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ ?  
ଇରାନେର ବୀରଗଣେର ସହାୟ ଓ ସାହସ ଆପନିଇ,  
ସିଂହର ବାହୁ ଓ ବଲ ଆପନାରଇ ।  
ଆପନିଇ ମାଜିନିଦିବାନ ନଗରୀର ଅଧିକର୍ତ୍ତା,  
ଆପନିଇ ହାମାଓରାନେର ବନ୍ଧନ-ମୋଚନକାରୀ ।  
ଆପନାର ପ୍ରହରଣାଧାତେ ରୋଦନ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ,  
ଆପନାର ତହବାରିର ଘାୟେ ପୁଡ଼େ ଯାଯ ଶନି ଗ୍ରହ ।  
ଆପନାର ରାଖିଶେର ପଦତଳେ ଅସ୍ତିତ୍ବହୀନ ହୟ ନୀଳନଦ,  
ଆପନାର ସମକଳ୍ପ ହତେ ପାରେ ଏମନ ହଣ୍ଡିଓ ଦୁନିଆଯ ମେଇ ।  
ଆପନାର ପାଶେ ବନ୍ଦୀ ହୟ ସ୍ବୟଂ ସିଂହ,  
ଆପନାର ବର୍ଣ୍ଣଧାତେ ଅସହାୟ ବୋଧ କରେନ ଗିରିରାଜ ।  
ଆପନି ସର୍ବତ୍ରଇ ଛିଲେନ ଇରାନେର ସହାୟ,

আপনার শৌর্যেই বীরগণের শির গর্বন্ত।  
কালের প্রভুর সমীপ থেকে লাভ করুন আশীর্বাদ —  
আপনি স্বয়ং ও নুরীমান পুত্র মহাবীর সাম।  
আপনার কুল-গৌরব ধরিবী—খ্যাত,  
আপনার বৎস যেমন বিশ্ব-জয়ী তেমনি পুরিত।  
আমার ভাগ্য আপনার দর্শনে সমুজ্জ্বল,  
আপনার থেকেই আমার আনন্দ ও চিরযৌবন।  
উদ্যত বিপদ বিনাশের জন্য আপনার আগমন হোক,  
দুষ্টিসায় আমার অস্তর দীর্ঘ হচ্ছে।  
বীরগণ সমবেত হয়ে চিন্তিত মনে  
পাঠ করছে গাজদাহামের লিপি বীরগণের অভিপ্রায়ানুযায়ী  
আপনার কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে মহাপ্রাণ গেওকে।  
তিনি আপনার কাছে আমার এই লিপি নিয়ে যাচ্ছেন,  
এখানকার শুভাশুভ তাঁর থেকে আপনি অবগত হবেন।  
যদি বঙ্গ—সহবাসেও অবস্থান করেন তবু আসর ছেড়ে উঠবেন,  
এবং দ্রুতগতি মুখ করবেন ইরানের দিকে।  
যদি ঘূর্ণন অবস্থায় থাকেন, তবে জাগবেন,  
এবং স্বীয় গতিতে পরিমাপ করবেন সময়ের দূরত্ব।  
জাগ্রত—চিন্ত ও হঁশিয়ার অশ্঵ারোহিগণসহ  
যুদ্ধার্থ আপনি জাবুলস্তান থেকে নির্গত হবেন।  
গাজদাহাম আপনারই অপেক্ষায় রয়েছেন,  
আপনি ছাড়া কোন যুদ্ধই সন্তুষ্পন নয়।  
সুতরাং এই লিপি পাঠ করা যাত্র  
আপনি অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মুখ করবেন।  
এইভাবে প্রেম—পূর্ণ লিপিকা সিমাপ্ত হলো  
তাকে আম্বর ও আবীর দ্বারা সুবাসিত করে মোহরাম্প করা হলো।  
সম্ভ্রান্ত তখন ওই মোহরাম্পিত লিপি  
গেও—এর হাতে সমর্পণ করে বললেন,  
আপনি বায়ুগতি ধাবিত হোন,  
ও অশ্ব—বল্ঙা শুরু করুন লক্ষ্যের অভিমুখে।  
যতক্ষণ আপনি রুক্ষমের কাছে গিয়ে না পৌছবেন,  
ততক্ষণ আপনার চলা থাকবে অব্যাহত।  
যদি রাত্রিবেলায় সেখানে গিয়ে পৌছেন।

তবে দিবসের জন্য অপেক্ষা করবেন না,  
 মহাবীরকে বলবেন, যুদ্ধকাল সমৃপস্থিত।  
 কারণ, বীরবর অত্যন্ত উদার ও বেপরোয়া,  
 আশকাকে তিনি আমলেই আনতে চান না।  
 এই বলে সম্ভাট্ গেও-এর হাতে তুলে দিলেন লিপি,  
 গেও-ও স্বীয় শ্রান্তি ও নিদ্রা বিস্মৃত হয়ে তখনি পথ ধরলেন।  
 দিন রাত অবিরাম তাঁর যাত্রা অব্যাহত রইলো,  
 আহার ও পানীয়ের কথাও তাঁর মনে রইল না।  
 জাবুলস্তানের নিকটবর্তী হতেই  
 এক সীমান্তরক্ষী জাল-সমীপে উপস্থিত হয়ে বললো,  
 ইরান থেকে এক ব্যক্তি দ্রুতগতি অশ্বে আরোহণ করে  
 এদিকে এগিয়ে আসছেন।  
 সংবাদ পেয়ে রুষ্টম সৈন্যসামন্তসহ সেই আগস্তকের  
 প্রত্যুদ্গমনের জন্য এগিয়ে গেলেন।  
 তা দেখে গেও ও তাঁর সঙ্গীগণ অশ্ব থেকে অবতরণ করে  
 পদব্রজে এগুতে লাগলেন।  
 মহাবীরও অশ্ব থেকে নেমে এসে  
 ইরান ও সম্ভাটের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।  
 তারপর রুষ্টম গেওকে নিয়ে অগ্রসর হলেন স্বীয় প্রাসাদ অভিমুখে।  
 গেও যথাবিধি রুশ্মকে সকল কথা বলে ও লিপিকা প্রদান করে  
 সোহৱাব সম্পর্কে কতিপয় বাক্য উচ্চারণ করলেন।  
 অতঃপর সকল মঙ্গলমঙ্গল বর্ণনা করে  
 তাঁকে প্রদান করলেন সম্ভাটের প্রেরিত উপহার।  
 রুশ্ম দৃতের কথা শনে ও লিপি পাঠ করে  
 মন্দ হাস্য করলেন ও বিস্মিত হয়ে বললেন,  
 মনে হচ্ছে, সামের মতো এক বীরের  
 আবির্ভাব হয়েছে ধরণীতে।  
 মুক্তদের মধ্যে থেকে এমন হয়তো অসম্ভব নয়,  
 কিন্তু তুর্কীদের মধ্যে যে তা কিভাবে সম্ভব হলো বুঝতে পারছি না।  
 জানি না, বিশ্ব-প্রভুর কি ইচ্ছা,  
 জানি না, তুর্কীদের মধ্যে এমন ভাগ্যবান বীর কে ?

অর্থাৎ ইরানীয়দের।

সামানঁগা-রাজের কন্যার গতে আমার পুত্র আছে,  
কিন্তু সে তো বালক মাত্র।  
এখনও সে জানে না, যুদ্ধ কি বস্তু,  
সংগ্রাম ও শাস্তির রহস্য এখনও তার কাছে অজ্ঞাত।  
তার বয়স কিছুতেই চতুর্দশ বর্ষের বেশী নয়,  
পৌরুষের গৌরব আকাশচারী হওয়ার সময় এখনও তার হয়নি।  
সুতরাং এ সময়টি তার যুদ্ধের কাল হতে পারে না,  
বীরগণের মোকাবেলায় এখনও সে এগিয়ে আসবে বলে মনে হয় না।  
এখনও তার মুখ থেকে আসবে দুধের গন্ধ,  
তবে এ কথা ঠিক যে, অনতিবিলম্বেই সে যুদ্ধের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।  
তখন সংগ্রাম-ক্ষেত্রে সে বিচরণ করবে সিংহের মতো,  
বহু উন্নত-শির বীরকে সে করবে পরাভূত।  
কিন্তু আপনি যে বললেন,  
সেই বীর ইরানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধার্থ এগিয়ে এসেছে;  
হৃজীরের মতো বীরকে সে অশু-পৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পতিত করেছে,  
তারপর পাশ-রঞ্জুতে আবদ্ধ করেছে তাঁকে আষ্টেপঢ়ে ;  
এমন শৌর্য তো কোন বালকের উপযুক্ত নয়,  
যতই সে সাহসী ও শক্তিমান হোক না কেন ?  
দৃত তখন বললেন, হে সেনাপতি কাজেই বিলম্ব নয়,  
এমন বীরের মোকাবেলায় গৈগন্তা ক্ষতির কারণ হতে পারে।  
সে বীর উচ্চতায় দেবদারুর অনুরূপ,—  
হাতে তার প্রহরণ, পৃষ্ঠদেশে অমোঘ পাশ।  
তার বাহুতে অসীম শক্তি, দেহে অপরিমিত বল,  
অনায়াসে সে আকাশ থেকে পেড়ে আনে নক্ষত্র।  
অবশ্য তার শক্তি ও ক্ষমতার জন্য আমরা ভয় পাই না,  
কারণ, বিশু-প্রভুই হরণ করবেন শক্তির তেজ।  
গেওর কথা শুনে রুক্ষম বললেন,  
হে শক্র-নিধনকারী সেনাপতি,  
চলুন আমরা এখন পূরীর দিকে অগ্রসর হই,  
এবং মহামতি জালের প্রাসাদে সানন্দচিত্তে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।  
দেখি, এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ কি ?  
এই তুকী বীরের সম্পর্কে তিনি কি বলেন, চলুন তা গিয়ে শ্রবণ করি।  
যথাসময়ে মহাবীর রুক্ষম দৃতকে নিয়ে

জালের প্রাসাদে এসে উপনীত হলেন।  
দীর্ঘ সময় তাঁরা সেই প্রাসাদে  
আনন্দে অতিবাহিত করলেন  
দ্বিতীয় বার গেও রুস্তমের প্রশংসা উচ্চারণ করে বললেন,  
হে বিশ্ব-বিজয়ী বীর,  
উজ্জ্বলিত তাজ ও তথ্ত আপনার জন্য শুভ হোক,  
হে ভাগ্যবান, রাজমুকুট আপনাকেই সর্বতোভাবে শোভা পায়।  
আমাকে সম্মান বলে দিয়েছেন যে,  
জাবুলস্তানে যেন রাত্রি যাপন না করি।  
তিনি বলেছেন, যদি সেখানে রাত্রি হয়, তবে ভোরের জন্য অপেক্ষা করো না,  
সাধারণ, যুদ্ধ আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে।  
সুতরাং হে মহাসম্মানিত বীর,  
চলুন আমরা এখনই ইরানের দিকে যাত্রা করি।  
জবাবে রুস্তম বললেন, রোদন করে লাভ কি,  
সকল কিছুর পরিণাম তো মৃত্তিকা বৈ নয়।  
আজ আমরা আনন্দে আসুন বসাবো,  
ভুলে যাব কায়কাউস ও বীরবৃন্দের কথা।  
একদিন আমরা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে এখানে অবস্থান করবো ,  
ও শুক্র ও ষষ্ঠাধর সামান্য আর্দ্র করবো।  
তারপর গমন করবো সমাটের সমীপে  
ও ইরানীয় সৈন্যদেরকে পথ দেখাবো।  
কিন্তু হায়, উজ্জ্বলিত ভাগ্যকে আমি ঘুমন্ত দেখতে পাচ্ছি,  
তা না হলে এ কাজ আমার জন্য কঠিন কিছু নয়।  
নদী যখন বন্যাক্রান্ত হয় তখন তার সামনে আগনের পরাক্রম হয় পরাভূত।  
আমার পতাকা দূর থেকে দেখেই  
বীরদের মধ্যে উঠিত হয় শোকের নিনাদ।  
তরবারি ও প্রহরণধারী জাল-পুত্র রুস্তমের অনুরূপ ছিলেন  
যুদ্ধ-কুশলী সাম —  
সাহসী, সচেতন ও সঙ্কল্পে অটল।  
এমন সব গুণের অধিকারী যাঁরা  
তাঁরা ব্যস্ততায় কার্য নষ্ট করেন না।  
এই বলে রুস্তম গেওকে নিয়ে  
জালের সঙ্গে আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন ও সুরাপানে মন্ত্র হলেন।

ভোর হলেও তাঁর মদের নেশা ভাঙ্গলো না,  
আবার তিনি নতুন করে আয়োজন করলেন আসরের।  
আবার চললো সুরা পান ও মস্তকার পালা  
এইভাবে দ্বিতীয় দিনও বিগত হয়ে গেলো।  
রুক্ষম পাচকদের আদেশ করলেন,  
সুখাদ্য প্রস্তুতের আয়োজন করা হোক।  
ভোজপূর্ব সমাধা হলে আবার আসর সজ্জিত হলো,  
সুরা, সঙ্গীত ও গায়কগণ আমন্ত্রিত হলো আসরে।  
সেই দিনটিও এমনি করেই চলে গেলো।  
পরদিন আবার উজ্জ্বলিত আসরের আয়োজন হলো।  
পরদিন উষাকালে আবার এলো সুরা  
কায়কাউসের কথা রুক্ষমের মনেই রইলো না।  
চতুর্থ দিন গোও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে মহাবীরকে বললেন,  
কায়কাউস অত্যন্ত ক্রোধী, তিনি বিচক্ষণ নন,  
আমাদের এই বিলম্ব তাঁর বুকে কঁটাব মতো বিধবে।  
তিনি বিষণ্ণ, অবসন্ন ও অস্তরে বিচলিত হবেন,  
আহার নিদ্রা অস্তর্ধান করবে তাঁর থেকে।  
জ্বাবুলস্তানে আমরা আর বিলম্ব করলে  
কায়কাউসের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসবে ধরিত্রীর বিপুল প্রসার।  
ইরান-সম্বাট আমাদের উপর আপত্তি করবেন ক্রোধ,  
তাঁর দুষ্ট-বুদ্ধি আমাদের জন্য বিপদরূপে আবির্ভূত হবে।  
গেওর কথা শুনে রুক্ষম বললেন, চিন্তিত হবেন না।  
দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে।  
যা হোক, শেষ পর্যন্ত রুক্ষমের আদেশে রাখশ্বকে সজ্জিত করা হলো,  
এবং যাত্রাবন্ধুক বিষাণে প্রদান করা হলো ফুৎকার।  
জ্বাবুলস্তানের অশ্বারোহী বীরগণ বিষাণ-নাদ শুনে  
যথারীতি সাঁজোয়া ও অস্ত্র সজ্জিত হলো।  
বিরাট এক সৈন্যদল তৈরি হলে পর  
রুক্ষম তাঁর ভাতা জওয়ারাকে বরিত করলেন তাদের সেনাপতিত্বে।

## রুস্তমের প্রতি কায়কাউসের ক্রোধ প্রদর্শন

রুস্তম ইরানের রাজধানীর নিকটবর্তী হতেই,  
তাঁর প্রত্যুদ্গমনার্থ একদিনের পথ এগিয়ে এলেন —  
তৃস, গোদ্রজ প্রমুখ সেনাপতিগণ ;  
ও অশু পিছেনে রেখে তাঁরা পদব্রজে অগ্রসর হলেন।  
তাঁদেরকে আসতে দেখে রুস্তমও অশু থেকে অবতরণ করে পায়ে হেঁটে এসে  
ইরানের বীরগণের কুশল জিঞ্চাসা করলেন।  
তারপর সেখান থেকে উদার মনে রাজ্যের কল্যাণ কামনা করে  
শৈত্রগতি সম্ভাট সমীপে এসে উপস্থিত হলেন।  
এসেই তাঁর শির অবনত করলেন সিংহাসনের সামনে,  
কিন্তু ক্রোধান্বিত বাদশা নির্বিকার।  
সহসা রাগে ললাটদেশ কুঝিত করে  
অরণ্য—পরিবেশে এক ব্যাক্তের মতো গর্জন করে উঠলেন কায়কাউস।  
প্রথমেই তিনি গেওকে ধমক দিয়ে বললেন,  
দুচোখ থেকে বুঝি তুমি লজ্জা ধুয়ে এসেছো ?  
রুস্তম কে, যে তার জন্য  
আমার ফরমান তুমি অমান্য করেছ ?  
আমার হাতে এখন তরবারি থাকলে  
তোমার শির আমি দেহ থেকে বিছিন্ন করতাম।  
কে আছো তাকে ধরে এখুনি জীবিতাবস্থায় শূলিতে চড়িয়ে দাও ,  
তোমার একটি কথাও আমি শুনতে চাই না।  
সম্ভাটের কথা শুনে গেও অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে  
রুস্তমের দিকে তাঁর হস্ত প্রসারিত করলেন।  
এইবার গেও ও রুস্তম উভয়ের উপরই সম্ভাট প্রকটিত করলেন তাঁর ক্রোধ,  
এই দৃশ্য সভাস্থ সকলকেই বিস্ময়ে নির্বাক করে দিলো।  
তৃসকে সম্বোধন করে সম্ভাট বললেন,  
যাও, দুজনকেই ধরে শূলিতে চড়িয়ে দাও।  
এই বলে কাউস নিজেও আসন থেকে  
লাফিয়ে উঠে আগুনপারা হলেন।  
তৃস এগিয়ে এসে রুস্তমের হাত ধরতেই  
উপস্থিত বীরগণ আবার বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করলেন।  
তাঁরা ব্যস্ত হয়ে বললেন, কাউসের সামনে থেকে

তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাও, না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।  
রুস্তম সন্ধাটের ব্যবহারে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন,  
বুকে এতো ক্ষোধ রাখবেন না।  
আপনার সকল কর্মই একটি থেকে অন্যটি অপকৃষ্টের,  
সন্ধাটের মহান মর্যাদা আপনাকে শোভা পায় না।  
এই অমূল্য তাজ আজাদাহারণ শিরেও  
এর চেয়ে ভালো মানাতো।  
আমি জাল-পুত্র বিশ্ববিখ্যাত রুস্তম,  
আপনার মতো সন্ধাটের সামনে আমি শির অবনত করি না।  
আপনি পারুন সোহুরাবকে জীবন্ত শূলিতে চড়িয়ে দিন,  
রাজ্যের অমঙ্গলকারীকে অপমানিত ও বিনষ্ট করুন।  
মিসর, চীন, হামাওরান, রোম, সাকসার ও মাজিল্ডিরান  
সবাই আমার তীর ও তরবারির সামনে ভয়ে হতমান,  
তারা আমার রাখ্শের সামনে নতশির।  
আপনি নিজেই আমার বাহুবলে এখনো জীবিত আছেন,  
কোন্ মুখে আপনি আমার প্রতি শক্রভাব পোষণ করছেন ?  
এই বলে তিনি স্থীয় হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য  
তুসের হাতে এক নিদারণ ঝট্কা দিলেন।  
নতমুখে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন তূস,  
রুস্তমও দ্রুতপদে রাজ-সভা পরিত্যাগ করলেন।  
এবং ক্ষোধান্বিত অস্তর নিয়ে রাখ্শের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন,  
লোকে আমাকে রাজপদ প্রদানকারী বলে অভিহিত করে।  
যদি আমি ক্ষেত্রে অবলম্বন করি তবে কায়কাউস আমার সামনে কে ?  
কে এই তূস, যে আমাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে ?  
আমার শক্তি ও সাফল্য বিশ্ব-প্রভুর দান,  
সন্ধাট ও সৈন্যদল তার উৎস নয়।  
পৃথিবী আমার রাজাসুরীয়, শিরস্ত্রাণ আমার তাজ।  
বর্ণার ফলা ও প্রহরণ আমার সহায়,  
আমার দুই বাহু ও বুকের বল আমার বাদশা।  
অন্ধকার রাত্রিকে আমি তরবারি দীপ্তিতে উজ্জ্বলিত করি,  
রণক্ষেত্রকে মহিমান্বিত করি আত্মত্যাগের মহিমায়।

---

বাদশা জোহাক আজদাহা বলে পরিচিত ছিলেন।

কে আমাকে শাস্তি দিবে ? আমি তো কারো দাস নই,  
আমি একমাত্র আমার সৃষ্টিকর্তার দাস ।  
বীরগণ হাটচিত্রে কামনা করেন আমাকে,  
তাঁরা আমাকে বরণ করতে চান সিংহাসনে ও নেতৃত্বে ।  
কিন্তু আমার দৃষ্টি শাহী তথ্যের দিকে নয়,  
আইন, রীতি ও ধর্মই আমার লক্ষ্য ।  
যদি আমি তাজ ও তখ্তের প্রত্যাশী হতাম,  
তবে আপনি এই সৌভাগ্য ও মাহাত্ম্য অব্যাহত রাখতে পারতেন না ।  
আপনি যা বললেন তা আপনাকেই শোভা পায়,  
আপনার কাছে আমি এর বেশী কি আশা করতে পারি ?  
কায়কোবাদকে এই সিংহাসনে আমিই বসিয়ে ছিলাম,  
তখন কায়কাউসের এই ক্রোধ ও অহমিকা কি কারো জানা ছিল ?  
যদি আমি কায়কোবাদকে আলবুর্জ পাহাড় থেকে,  
জনতার মধ্যে এই ইরানভূমিতে না নিয়ে আসতাম,  
তবে আজ আপনি রাজাসনে বসে এই ক্রোধ প্রদর্শন করতে পারতেন না ।  
যদি আমি মুজিন্দিরানে অভিযান না করতাম,  
যদি কৰ্ত্তব্য প্রহরণ তুলে না নিতাম,  
এবং যদি সেই প্রহরণাঘাতে সপেদ দৈত্যের শির বিচূর্ণ না করতাম,  
তবে কার বাহুতে সঞ্চারিত হতো আত্মবিশ্বাসের বল ?  
সম্ভাটকে এই বলে বীরপ্রবর ইরানীয় বীরগণকে  
উপদেশছলে বললেন, .  
দেখুন, সোহৃদাব বিজয়ভিলাষ নিয়ে এসেছে,  
ছেট বড় কাউকে সে অব্যাহতি দিবে না ।  
আপনারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রাণের সংরক্ষণ করুন,  
বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাহায্যে মোকাবেলা করুন বিপদের ।  
আমাকে ইরান ভূমিতে আর দেখতে পাবেন না,  
শরজালের বর্মে আচ্ছাদিত করে রাখুন স্বদেশকে ।  
এই বলে তিনি অশুল্ক কষাঘাত করে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন  
মনে হলো, তিনি যেন নিগতি হলেন সীম গাত্রচর্ম বিদীর্ণ করে ।

তাঁর প্রয়াণে মহত্ত্বগণের হাদয় বেদনায় পূর্ণ হলো,  
তাঁদের মনে হলো তাঁরা ছিলেন পশুপাল ও রুক্ষম ছিলেন তাঁদের রাখাল ।  
তাঁরা গোদ্রজকে সম্বোধন করে বললেন ;

ভাঙাকে জোড়া দেওয়া কাজ আপনার।  
মহাবীর আপনার কথা শুনলে  
অবশ্যই মন থেকে দূর করবেন অপমানের প্লানি।  
সুতরাং অপ্রকৃতিস্ত বাদশার কাছে আপনি যান,  
এবং তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিন পূর্বকথা।  
আপনার বাণিজার দ্বারা আমাদের সৌভাগ্যকে আবার ফিরিয়ে আনুন।  
এই বলে গেও, গোদরজ বাহরাম  
রহস্য ও গুরগীণ প্রমুখ বীরগণ একত্রে বসে  
বলাবলি করতে লাগলেন যে,  
বাদশা যশষ্মী সেনাপতিদের  
মনের দিকে একটি বারও চাইলেন না।  
এই রুক্ষমই স্বাট কায়কাউসকে দান করেছেন প্রাণ।  
দুঃখ ও বিপদের দিনে তিনিই হয়েছেন সহায়,  
তাঁর মত সহায় ও বক্সু তো আর নেই।  
যখন মাজিন্দিরানের দৈত্যগণ  
বাদশাকে ও আমাদেরকে কঠিন বন্ধনে বন্দী করেছিল,  
যার জন্য আমাদেরকে অতিবাহিত করতে হয়েছে দীর্ঘ দুঃখের দিন,  
দুষ্ট দৈত্যদল আমাদের প্রাণ করেছে দীর্ঘ,  
তখন রুক্ষমই আবার বাদশাকে এনে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে,  
তাঁর জন্য মহত্তমগণের আনুগত্য আদায় করেছিলেন।  
আরেক বার যখন হামাওরান রাজ্য  
বাদশার পায়ে শক্ররা পরিয়েছিল কঠিন শিকল ;  
তখনও বাদশার জন্য রুক্ষম যুদ্ধ করেছিলেন,  
শক্রদের কঠিন আক্রমণের মুখেও তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি।  
সেখান থেকেও বাদশাকে মুক্ত করে এনে  
আবার তিনি তাঁকে সমস্মানে বসিয়েছিলেন সিংহাসনে।  
কিন্তু যখন প্রতিদানের সময় এলো,  
তখন আমরা বিরূপতা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যক্ষ করিনি।  
এখন আরো কঠিন মুহূর্ত সমাগত,  
কর্ম আমাদের সামনে শক্তির প্রতীক্ষা করছে।  
শক্রদল আমাদেরকে বাধা প্রদানে বিরত দেখলে  
শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসবে।  
কিন্তু আমরা কি যুদ্ধ করবো ?

রুস্তম যে আমাদের ত্যাগ করে জাবুলস্তানের পথে পাড়ি জমিয়েছেন ;  
তাঁকে ছাড়া সংগ্রামে আমরা কি সফলতা লাভ করবো ?

আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা যে পর্যন্ত বিফলতায় বিলীন হয়ে যাবে।

এখনও যদি কেউ দ্রুত ধাবিত হয়ে  
সেই মহাবীরকে ফিরিয়ে আনে, তবে হয়।

এহেন পরামর্শের পর গোদ্রজ ও কুশওয়াদ  
দ্রুতপদে সম্বাটের সমীপে গমন করলেন।

এবং কাউসকে বললেন, রুস্তম কি করেছিলেন যে,  
আপনি ইরানভূমি থেকে উত্থিত করলেন ধূলিরাশি ?

আপনি কি হামাওরানের কথা  
ও মাজিন্দিরানের দৈত্যদের কথা বিস্মৃত হয়েছেন ?

এবং তাই বলে কি, রুস্তমকে শূলিতে চড়াবার আদেশ দিয়েছেন ?

হে সম্বাট, অহমিকা বাদশাদের শোভা পায় না।

যেখানে প্রয়োজন রুস্তমের ক্রতৃকর্মের শুভ প্রতিদান,  
সেখানে বাদশার এহেন আচরণ কি শোভন হতে পারে ?

রুস্তম তো চলে গেলেন ; এখন যদি শক্ত  
বিরাট সৈন্যদল নিয়ে হিংস্ব নেকড়ের মতো আমাদের উপর আপত্তি হয়,  
তবে কে যুদ্ধক্ষেত্রে তার মোকাবেলা করবে ?

কে অপসারিত করবে অমঙ্গলের অঙ্কারা ?

আপনার বীরগণ সবাই গাজদাহামের অনুরূপ,  
তাদের শৌর্ষ-বীর্য আপনার অজ্ঞাত নয়।

এ অবস্থায় সবাই এড়াতে চাইবে সেই দুর্দিন,—

যেদিন প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে গিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে।

রুস্তমের মতো বীরকে অসন্তুষ্ট ও অপমানিত করা  
অল্প বুদ্ধির পরিচায়ক।

সম্বাটের মাথায় বুদ্ধি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়,  
অহমিকা ও ক্রোধের দ্বারা কোন কাজই হাসিল হয় না।

গোদ্রজের ভাষণ শুনে সম্বাট বুঝলেন,  
তিনি ন্যায় ও যুক্তির কথাই বলেছেন।

সম্বাট স্বীয় ক্রতৃকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে  
স্বীয় বুদ্ধির অসারতায় অনুতপ্ত হলেন।

তিনি তখন গোদ্রজকে সম্মোধন করে বললেন,  
আপনার বাক্য ও উপদেশ যথার্থ ও কল্যাণকর।

আপনারা ক্লন্তমের সমীপে গিয়ে তাঁকে তুষ্ট করে নিয়ে আসুন।  
আমার উপর তাঁর ক্ষেত্রকে আপনারা শান্ত করুন।  
তিনি না এলে আমার অঙ্ককার মনে আলোর আগমন হবে না।  
সম্মাটের কথা শুনে তৎক্ষণাত্মে গোদ্রজ উঠে দাঁড়ালেন,  
তাঁর অনুসঙ্গী হলেন অন্যান্য বীর।  
বিরাট এক সৈন্যদলসহ তাঁরা  
ক্লন্তমের অনুসরণ করে পথাত্তিক্রম করতে লাগলেন।  
ক্লন্তকে পথে ধাবমান দেখতে পেয়েই  
সকল বীর একত্রে জমায়েত হয়ে  
তাঁর প্রশংসা উচ্চারণ করে বললেন,  
আপনি চিরঞ্জীব হোন, উজ্জ্বলিত থাকুক আপনার অস্তঃকরণ।  
সমস্ত পৃথিবী আপনার পদানত হোক,  
সিংহাসন হোক আপনার চিরদিনের আসন।  
আপনি জানেন যে, কায়কাউসের মন্তিষ্ঠ নেই,  
রাগ হয়ে তিনি যখন কথা বলেন,

তখন তাতে রাষ্ট্রিত হয় না কোন শালীনতা।

তিনি এখন অনুত্পন্ন,  
আপনি হাষ্টচিত্তে ইরানে প্রত্যাবর্তন করুন।  
ক্লন্তম বাদশার উপর রাগ করতে পারেন,  
কিন্তু ইরান কি অন্যায় করছে,  
যার জন্য তিনি তাকে ত্যাগ করতে যাচ্ছেন?  
ও স্বীয় ভাগ্যে ফুল মুখমণ্ডলকে  
গোপন করতে চাচ্ছেন ক্রোধের গ্রানিতে।  
বাদশা এখন তাঁর কথায় লজ্জিত বোধ করছেন,  
স্বীয় ক্রোধের কথা স্মরণ করে তিনি দংশন করছেন নিজেরই হাত।  
জবাবে ক্লন্ত বললেন,  
কায়কাউসে আমার কোন প্রয়োজন নেই।  
অশুসন আমার সিংহাসন, শিরস্ত্রাণ আমার রাজমুকুট,  
আমার বর্ম ও হাদয় মৃত্যুর প্রতি উৎসৃষ্ট।  
কায়কাউস আমার সামনে একমুষ্টি মৃত্তিকা বৈ নয়,  
তাঁর ক্রোধ ও অহমিকাকে আমি পরোয়া করবো কেন?  
বাদশা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যে অশিষ্ট বাক্য  
আমার প্রতি উচ্চারণ করছেন, আমার জন্য তা প্রয়োজন ছিল।

কারণ, আমি তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেছি,  
ফিরিয়ে এনেছি তাঁকে সিংহাসন ও মুকুটের দিকে।  
কখনো মাজিন্দিরানের দৈত্যকুলের হাত থেকে,  
আবার কখনো হামাওরান রাজ্যের বন্দীত থেকে আমি তাঁকে মুক্ত করেছি।  
যখনই দেখেছি তাঁকে শক্তির কবলে  
তখনই এগিয়ে গেছি তাঁর সাহায্যার্থ।

তাঁর মস্তিষ্কে বুদ্ধি বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই,  
আছে শুধু ক্রোধ, উত্তেজনা ও নির্বুদ্ধিতা।  
আমি তাঁর থেকে খুবই ত্পিলাভ করেছি, আর নয়;  
পবিত্র বিশ্ব-প্রভু ব্যতীত আর কারো থেকে আমি কিছু প্রত্যাশা করি না।  
রুক্ষম তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করলে পর  
গোদৰজ তাঁকে সম্মোধন করে বললেন,  
হে বীর, আপনার এই সত্য ভাষণে  
বাদশা, তাঁর পাত্রমিত্র এমন কি শক্রদেরও কোন সন্দেহ নেই।  
তুর্কীরা আপনাকেই ভয় পায়,  
এ কথা প্রকাশ্যে ও গোপনে সবাই বলাবলি করছে।  
গাজদাহাম আমাদের যা অবগত করিয়েছেন  
তাতে মনে হয় ওদিকের গোটা অঞ্চল তুর্কীদের করতলগত হয়েছে।  
বাদশার দুষ্টিষ্ঠা ও তাঁর বাসনা আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে এসেছি,  
সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে বীর সোহৃদাবের কাহিনী;  
এ সময়ে বাদশা ও ইরানের প্রতি আপনি বিমুখ হবেন না।  
দুনিয়ায় আপনার যশ এমনভাবে পরিকীর্তিত যে,  
আপনার অনুগত বীরগণ থেকে আপনি মুখ ফিরাতে পারেন না।  
যুদ্ধকাল সমাগত,  
এমন সময় এই রাজ্য ও তার রাজমুকুটকে আপনি পরিত্যাগ করবেন না।  
তৃরানের আধিপত্য ইরানের পবিত্রভূমির উপর  
অসহ্য ও অপমানকর।

রুক্ষম গোদৰজের এই ভাষণ শুনে  
মস্তক অবনত করলেন;  
ও তাঁকে বললেন, এই দেশের সর্বত্র আমি চষে বেড়িয়েছি।  
আপনি জানেন যে, সংগ্রাম থেকে আমি কখনো মুখ ফিরাই না,  
কিন্তু বাদশার মর্যাদা আজ আমার চোখে তুচ্ছ হয়ে গেছে।  
তাঁর ব্যবহারে রুক্ষম এমন অশ্লীলতা প্রত্যক্ষ করেছে যে,

সভাস্থল ছেড়ে আসতে সে বাধ্য হয়েছে।  
এই বলে রুক্ষম বিবেকের অঙ্কুশ তাড়নায়  
বাদশার অভিমুখে ফিরে চললেন।

বাদশা ঠাঁকে দূর থেকে দেখেই পদব্রজে  
অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এসে বললেন,  
উত্তেজনা ও ক্রোধ আমার স্বভাবের অঙ্গ,  
বিশ্ব-প্রভু যে বীজ আমাতে বপন করেছেন তাই মাঝে মাঝে  
পল্লবিত হয়ে উঠে।

নতুন বিপদ ও দৃষ্টিগ্রহের ভয়ে  
আমি দুর্চিন্তায় দ্বিতীয়ার ঠাঁদের মতো ক্ষীণকায় হয়েছিলাম;  
এবং তারই প্রতিকারের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলাম আপনাকে,  
ও আপনার আগমনের গৌণতা আমাকে উৎসেজিত করেছিল।  
কিন্তু বস্তুত আমার সৈন্যদলের সহায় তো আপনিই,  
আমার রাজ্যের প্রধানতম ব্যক্তিও আপনিই।  
আপনার স্মরণেই আমি প্রত্যহ সুরা পান করি,  
সকাল-সক্ষ্য আপনারই ভালোবাসার পাঠ আবণ্টি করি।  
আমার সাম্রাজ্য, আমার সিংহসন ও মর্যাদা আপনারই,  
জ্ঞানসেদ থেকে প্রাণ্প এই সাম্রাজ্য আমাদের উভয়ের।  
আমি দুনিয়ায় আপনারই বন্ধুত্ব কামনা করি,  
সর্ব কর্মে কামনা করি আপনার সহায়তা।  
হে রুক্ষম, আপনি যখন বিরূপ হলেন,  
তখনই আমি লজ্জিত হয়ে মুখে প্রবিষ্ট করিয়েছি মৃত্তিকা।

জবাবে রুক্ষম বললেন, হে সম্মাট, এই দুনিয়া আপনার,  
আমরা সবাই আপনার অনুগত।  
আপনার দুরে আমরা সবাই দাসবৎ অপেক্ষমাণ রয়েছি।  
বলুন, আপনার কি আদেশ?  
আপনি বাদশা, আমরা আপনার আদেশানুবর্তী।  
উভয়ের কায়কাউস বললেন, হে মহাবীর,  
উজ্জল অস্তুকরণ আপনার চিরসঙ্গী হোক।  
এজ আমরা এক আনন্দিত আসরের আয়োজন করবো,  
গল অমরা যুক্তার্থ নির্গত হবো।

রাজাদেশে রাজোচিত সজ্জিত হলো সঙ্গীতাসর,  
শাহী প্রাসাদ বসন্তের মতো আনন্দে উষ্টাসিত হলো।  
নগরীর মহসুমগণ সেখানে আমন্ত্রিত হলেন,  
আনন্দে সর্বত্র বিচ্ছুরিত হলো মুকুদল।  
তারযত্রের ঝঞ্চারে ও বংশী-ধ্বনিতে  
সমাগত হলো সত্রাট সমীপে চামেলী—সদৃশ সুন্দরী ললনাগণ।  
মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সভাস্থ সকলে  
প্রাচীনগণের নাম নিয়ে পান করলেন সুরা।  
যে—পর্যন্ত তাঁদের চোখে দুনিয়া অঙ্ককার হয়ে না এলো  
ততক্ষণ পর্যন্ত সভাস্থ অভিজ্ঞাতগণ সুরা পানে মন্ত হয়ে রইলেন।  
সকলে মন্তব্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে পর  
আকাশ রাত্রির এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলো।

## রুক্ষমের সহযোগিতায় কাউন্সের সৈন্য পরিচালনা

সৃষ্টি যখন অঙ্গকারের যবনিকা  
ছিন্ন করে বাইরে এলো তখন কায়কাউন্স তূস ও গেওকে  
হস্তীপৃষ্ঠে দুন্দুভি সংস্থাপিত করার আদেশ দিলেন।  
অতঃপর রাজকোষ উন্মুক্ত করে সৈন্যদের রসদ  
ও যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম করলেন সরবরাহ।  
শত সহস্র সাঁজোয়া ও বর্ধারী সিপাহী  
সেনাপতিদের দুর্বা পরিচালিত হয়ে প্রস্তুত হলো।  
সগ্রাটের শিবির ও দেহরক্ষীগণে পূর্ণ হলো ক্রোশাধিক পথ,  
এবং ধরিত্রী স্বীয় অঙ্গে ধারণ করলো অশু ও হস্তী-পদচিহ্ন।  
সৈন্যদের পথ-চলনে বায়ুমণ্ডল নীল ও পৃথিবী কঢ়ওবর্ণ হলো,  
দুন্দুভি নিনাদে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো পর্বত-উপত্যকা।  
সৈন্যদল পার হয়ে চললো মঞ্জিলের পর মঞ্জিল,  
তাদের পদধূলিতে সূর্যের মুখ অঞ্চকার হলো।  
বশাৰ ফলক ও প্রহরণের চমক যেন  
পর্দার অস্তরালে আণন্দের উদ্ভাস।  
বশাৰ ফলক ও বিচ্ছিন্ন বর্ণের বৈজ্ঞানী  
সোনালী বর্ম ও স্বর্ণ পাদুকা,  
সব মিলে যেন কালো মেঘদল থেকে  
স্বচ্ছ বারিপতনের দৃশ্যের অবতারণা করলো।  
দিনের আলোতেও দুনিয়া রাত্রির কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছে না,  
মনে হচ্ছে যেন আকাশ ও সুরাইয়া নক্ষত্র উভয়ে হয়েছে অস্তিত্বহীন।  
এইভাবে সৈন্যদল ক্রমে দুর্গের নিকটবর্তী হলো ;—  
তাদের পদতাড়নায় বিদূরিত হয়েছে ধূলি ও উপলখণ।  
দুর্গমধ্যে তখন উথিত হলো এক উচ্চ কোলাহল,  
সোহৃতাবকে লোকে বললো, দেখুন ইরানীয় সৈন্যের আঃঃঃঃঃঃ হয়েছে।  
সোহৃতাবকে কোলাহল শুনে  
আশুরোহণে শক্তবাহিনী নিরীক্ষণ করতে লাগলোন।  
সৈন্যগণ তাঁকে আঙুলের ইশারায় দেখালো,  
আসন্ন সৈন্যবাহিনীর পশ্চাস্তাগ দৃষ্টিগোচর নয়।  
হৃমান দূর থেকে ইরান-বাহিনী লক্ষ্য করে

ভয়ে কম্পমান ও বিস্ময়ে বিমৃত হলেন।  
সোহৰাব হুমানকে ডেকে বললেন,  
অন্তর থেকে ভয় ও আশকা বিদূরিত করুন।  
অন্তহীন সৈন্যবাহিনীর দিকে না দেখে  
এক বীর যোদ্ধা ও তার ভারী প্রহরণের দিকে লক্ষ্য করুন।  
কে আমার সম্মুখীন হবে?  
সে যদি চন্দ্র-সূর্যেরও বন্ধু হয় তবুও তার নিষ্ঠার নেই।  
অনেক অস্ত্র ও বহু সৈন্য,—  
কিন্তু যশস্বী যোদ্ধা তো একজনও দেখছি না।  
ভয় নেই, বাদশা আফ্রাসিয়াবের সৌভাগ্য,  
চিচ্চেরেই আমি প্রান্তরকে নদীতে ঝুপান্তরিত করবো।  
এই বলে হুমানের সকল সঙ্কোচ বিদূরিত করে  
সোহৰাব হাস্য মুখে অশু থেকে অবতরণ করলেন।  
এবং সুরা পরিবেশনকারীর হাত থেকে চেয়ে নিলেন এক পাত্র সুরা;  
ও মনকে ভারমুক্ত করলেন।  
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিত হলো আসর  
ও উথিত হলো বীরগণের পানাহারের কোলাহল।  
ওদিকে দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে প্রান্তরের মধ্যে  
পড়লো সম্মাটের শিবির।  
দেখতে দেখতে সারা পর্বত-প্রান্তর ছেয়ে গেলো  
রাজকীয় শিবির, তাঁবু ও সৈন্যদলে।

## ରୁଷ୍ଟମ କର୍ତ୍ତକ ଝିନ୍ଦାରଜମେର ହତ ହୋଇଥା

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗେଲେ  
ସରତ୍ର ନେମେ ଏଲୋ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ।  
ରୁଷ୍ଟମ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରମ୍ତ୍ତ ହେଁ  
ବାଦଶାର ନିକଟେ ଏସେ ବଲଲେନ,  
ସମ୍ବାଟେର ଅନୁମତି ପେଲେ ଶିରମ୍ବାଣ ଓ କଟିବନ୍ଧ ରେଖେ  
ଛଦ୍ମବେଶେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ ଆସବୋ କେ ଏହି ନତୁନ ବୀର ?  
ଆରୋ ଦେଖବୋ କୋନ୍ କୋନ୍ ଶୂରଶ୍ରେଷ୍ଠ  
ଓ : ମନାପତି ରଯେଛେନ ତୂରାନ-ଶିବିରେ ?  
ଜ୍ବାବେ ସମ୍ବାଟ ବଲଲେନ, ଏ କାଜ ଆପନାକେଇ ସାଜେ,  
କାରଣ ଆପନି ଯେମନ ବିଚକ୍ଷଣ ତେମନି କର୍ମଦକ୍ଷ !  
ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଆପନାକେ ରଙ୍ଗା କରନ,  
ଆପନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବାସନ ସଫଳ ହୋକ ।  
ରୁଷ୍ଟମ ତଥନ ସାଧାରଣ ଏକ ସୈନିକେର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରେ  
ଚୁପି ଚୁପି ଦୂର୍ଘ-ପ୍ରାଚୀରେ ପାଦଦେଶେ ଏସେ ଉପାସ୍ତିତ ହଲେନ ।  
ସେଥାନେ ଏସେଇ ତିନି ଦୁର୍ଘ ମଧ୍ୟେ  
ତୁଳୀ ବୀରଗଣେର ବାକ୍ୟାଲାପ ଶୁନତେ ପେଲେନ ।  
ସିଂହ ଯେମନ କରେ ନିର୍ବିଘ୍ନେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୟ ହରିଗଦଳେ,  
ମହାବୀରଓ ତେମନି ନିର୍ଭଯେ ଦୁର୍ଗେ ପ୍ରବେଶ କରଲେନ ।  
ସହସା ତାଁର ଚୋଥ ପଡ଼ିଲୋ ସୋହରାବେର ଉପର,  
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦେ ଉତ୍ଥଫୁଲ ହେଁ ଉଠିଲୋ ତାଁର ଆନନ ।

ସୋହରାବ ଯଥନ ଯୁଦ୍ଧ-ୟାତ୍ରାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରେଛିଲେନ,  
ଓ ତାଁର ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତି ହେଁ ଉଠିଲୁଣ,  
ତଥନ ତାଁର ମା ଝିନ୍ଦାରଜମକେ ଡେକେ ବଲେଛିଲେନ,  
ବୀରଗଣେର ସମାବେଶେ ତୁମି ତାର ଉପର ନଜର ରେଖୋ ।  
ଝିନ୍ଦାରଜମ ସାମାନ୍ଗୀ-ରାଜେର ପୁତ୍ର,  
ଏବଂ ସୋହରାବେର ମାତୁଳ ।  
ସୋହରାବେର ଜନନୀ ତାଁକେ ବଲେଛିଲେନ,  
ହେ ଜାଗ୍ରତ-ଚିନ୍ତ ବୀର, ଆମାର ଏହି ତରଣ ସନ୍ତାନକେ  
ଆମି ତୋମାର ସଙ୍ଗେ ଦିଲାମ ।  
ଇରାନେର ସନ୍ନିକଟବତୀ ହେଁ

সে যখন বীরগণের সম্মাটের সমীপবর্তী হবে  
এবং যুদ্ধের ময়দানে পরম্পরের সামনে আসবে  
তখন কৌর্ত্তিমান পুত্রকে তার পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ো ।

রুক্ষম সোহরাবকে আসর-মধ্যে এক সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখলেন,  
তাঁর কাছেই বসা রয়েছেন খিল্দারজম ।  
এক পাশে বীরপ্রবর হুমান,  
ও অন্যপাশে স্বনামধন্য সিংহ-পুরুষ বারমান ।  
রুক্ষমের মনে হলো, সমস্ত আসর উজ্জ্বল করে বিরাজ করছে সোহরাব,  
সে যেন এক পল্লবিত দেবদাকু ।  
তার দুই বালু যেন অশু-জভ্যা,  
তার বুক সিংহের ও মুখমণ্ডল শোণিত-পারা ।  
তার চারদিকে শোভা করে আছেন  
সিংহের মতো শত বীর ।  
সেই বীরগণ আনন্দিত চিন্তে  
উচ্চারণ করছেন সোহরাবের গুণাবলী ।  
রুক্ষম দূরে থেকে গোপনে  
তুরান-বীরগণের সেই আসর নিরীক্ষণ করতে লাগলেন ।  
এমন সময় জিল্দারজম বাইরে এসে দেখলেন,  
দেবদাকু সদৃশ এক বীর সেখানে দণ্ডায়মান ।  
গোটা শত্রুবাহিনীর মধ্যে তেমন বলবান ও তেজস্বী একজনও নেই ।  
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি বলো,  
অঙ্ককার ছেড়ে আলোতে এসো,— মুখ দেখাও ।  
রুক্ষম তখন খিল্দারজমের গ্রীবাদেশে, এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন ।  
সঙ্গে সঙ্গে শুক্ষ হয়ে গেলো খিল্দারজমের জীবনের ধারা,  
শেষ হয়ে গেলো তাঁর জন্যে আসর ও যুদ্ধের দিন ।  
সোহরাব সেইভাবেই অনেকক্ষণ আসর আলোকিত করে অবস্থান করলেন,  
কিন্তু খিল্দারজম তাঁর কাছে ফিরে এলেন না !  
সহসা তিনি পাশে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন,  
খিল্দারজম জীবন ও জীবনের সুখ থেকে বহু দূরে চলে গেছেন ।  
বেদনায় তাদের কঠ থেকে নির্গত হলো এক চিৎকার,  
শোকে তাদের হৃদয় বিগলিত হলো ।  
তারা সোহরাবকে এসে জানালো,

খিল্দারজমের জন্য আসর ও যুদ্ধের দিনের চির অবসান হয়েছে।  
 শোনামাত্র সোহৱাব ধূম্রখণ্ডের মতো  
 জিন্দারজমের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।  
 তাঁর সঙ্গে আলো নিয়ে এলো পরিচালক ও সভাসদ,  
 তিনি এসে দেখলেন, খিল্দারজমের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেছে।  
 সোহৱাব এই আকশ্মিক ঘটনায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে  
 বীরগণকে সম্বোধন করে বললেন,  
 হে বীর ও সাহসী সেনানায়কবৃন্দ,  
 আজ রাত্রে আপনারা নিদ্রা যাবেন না,  
 সারা রাত আপনাদেরকে বর্ণ হাতে জেগে থাকতে হবে।  
 হরিণদলে নেকড়ের আগমন হয়েছে,  
 মানুষ ও কুকুরকে সে দুর্গ-মধ্যে প্রত্যক্ষ করে গেছে।  
 যদি বিশ্ব-প্রভু সহায় হন তবে কাল আমি  
 আমার অশ্বের পদতলে ধরণীকে দলিত করবো।  
 আমার অশ্বাসন থেকে টেনে নেব পাশ,  
 এবং ইরানীয়দের থেকে গ্রহণ করবো খিল্দারজমের প্রতিশোধ।  
 সোহৱাব এই বলে স্বাহানে প্রত্যাবর্তন করে  
 সেনাপতিদের তাঁর সামনে ডাকলেন।  
 বললেন, আমার যুদ্ধাদ্যোগ থেকে খিল্দারজমকে সরিয়ে দেওয়া হলেও  
 এই আসর অব্যাহত থাকবে।

এদিকে রুস্তম সম্মাট-শিবিরের দিকে প্রত্যাগত হচ্ছেন,  
 ইরান সৈন্যের রক্ষণে পাহারা দিচ্ছেন বীরবর গেও।  
 তিনি পথে রুস্তমকে দেখতে পেয়েই  
 কোষ থেকে টেনে নিলেন তরবারি।  
 এবং মন্ত-হস্তীর মতো গর্জন করে  
 হাত রাখলেন বর্মের উপরে।  
 রুস্তম চিনতে পারলেন, ইরানীয় বাহিনীর রক্ষার্থে  
 গেও পথে টহল দিয়ে ফিরছেন।  
 তিনি মৃদুহাস্য করে চিংকার উথিত করতেই  
 টহলদার গেও রুস্তমের কঠস্বর চিনতে পেরে  
 পদব্রজে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে  
 জিঞ্জাসা করলেন, হে শক্রজয়ী মহাবীর,

এই অন্ধকার রাত্রে পদব্রজে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?  
জবাবে রুষ্ম গেওকে জানালেন  
তূরান শিবিরে তিনি কি করে এসেছেন,—  
এবৎ কোন বীরকে তিনি হত করেছেন !  
বার্তা শনে গেও রুষ্মের প্রশংসা উচ্চারণ করে বললেন,—  
অশু, প্রহরণ ও সংজ্ঞা আপনার জন্য শুভ হোক !  
অতঃপর মহাবীর সম্বাট-সমীক্ষে উপস্থিত হয়ে  
তুর্কীদের সম্পর্কে ও আসন্ন যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করলেন।  
তারপর সোহৃদাবের উচ্চতা, তাঁর বাহ্যিক ও স্কন্দ  
তাঁর বক্ষদেশ ও পদযুগলের বর্ণনা দিলেন।  
বললেন, তুর্কীদের মধ্যে কোন কালেই এমন বীরের জন্ম হয়নি,  
সোহৃদাবের সম্মুতি ও দেহসৌষ্ঠব সরল দেবদারুর মতো।  
ইরান ও তূরানে তার মতো আর কেউ নয়,  
মনে হয়, সে যেন ছবছ মহাবীর সামের মতো হয়ে জন্মেছে।  
অবশ্যে বিন্দারজমের গ্রীবাদেশে মুষ্ট্যাঘাত  
ও তার ফলে তার প্রাণ নিখনের সংবাদ সম্বাটকে শুনিয়ে  
মহাবীর হাতে তুলে নিলেন সুরার পাত্র ;  
সারারাত ধরে চলতে লাগল সংগ্রামের আয়োজন।

## হজীরের কাছে সোহৱাবের ইরানীয় বীরগণের নাম জিজ্ঞাসা

সূর্য আকাশের স্বর্ণসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে  
কাল মন্ত্রক উত্তোলন করলো ।

সোহৱাব বর্ষ-সাঙ্গে দেহ আবৃত করে  
যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হলেন ।

তিনি কোমরে বেঁধে নিলেন হিন্দুস্তানী তরবারি,  
রাজকীয় শিরস্ত্রাণ তুলে নিলেন শিরে ।

পঞ্চে মৃগয়া-থলিতে কুণ্ডলায়িত দীর্ঘ পাশ রক্ষা করলেন ।  
তারপর দুর্গ-প্রাচীরের এক উচুস্থান নির্বাচিত করে  
ইরানীয় বাহিনী দেখবার জন্যে সেখানে এসে দাঁড়ালেন ।

তাঁর আদেশে হজীরকে ডেকে আনা হলো,  
সোহৱাব বললেন, তীরের গতি কখনো বাঁকা হয় না ।  
নিশানা যদি তার তৌরক হয় তবে তার লক্ষ্য হয় নিজেরই শির ।

ক্ষতি এড়িয়ে চলতে হলে,  
সকল কাজেই সত্যের আশ্রয় নেওয়া উচিত ।

সুতরাং যা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো তার সত্য জবাব দিবেন,  
কোনরূপ বাহনা কিংবা মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না ।

যদি আমার হাত থেকে মুক্তি প্রত্যাশা করেন,  
ও আশা রাখেন সর্বত্র সম্মানিত হতে,  
তবে ইরান সম্পর্কে আমি যা কিছু জানতে চাই  
তা সত্য করে বলবেন ।

যদি সব ঠিক ঠিক বলেন  
তবে তার যোগ্য প্রতিদান আমি আপনাকে দিব ।  
আপনাকে আমি দান করবো সুসংজ্ঞিত সম্পদ  
এবং উপযুক্ত খেলাত ও অর্থ ।

কিন্তু যদি মিথ্যা বলেন,  
তবে এই বন্দীত্ব আপনার চিরস্থায়ী হবে ।

জবাবে হজীর বললেন, রাজন,  
ইরানীয় সৈন্যদল সম্পর্কে যা কিছু আপনি জিজ্ঞাসা করবেন  
আমার জানা মতে সব বলবো,  
মিথ্যা আমি বলতে যাব কেন ?

সত্যের চেয়ে ভালো কাজ দুনিয়ায় নেই,  
মিথ্যার চেয়ে শক্তির বস্ত্রও কিছু নেই।  
সোহৃদাব বললেন, আপনার কাছে আমি  
ইরানীয় বীরগণ ও বাদশার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো।  
সেই দেশের সকল মহত্তম — গোও, তুস, গোদারঞ্জ,  
গুস্তাহাম, বাহরাম ও রুম্সুম প্রমুখ বীরবৃন্দ সম্বরক্ষে  
যা কিছু আমি আপনার কাছে জানতে চাব, সব বলবেন।  
যদি শির স্কর্কে ও প্রাণ অব্যাহত রাখতে চান  
তবে তাঁদের ঠিক ঠিক পরিচয় দিবেন।  
ওই যে রঙেরভের রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত শিবির,  
যার চতুর্শার্ষে রয়েছে বহু ব্যাহ্রের তাঁবু,  
যে-শিবিরের সামনে শত মন্ত হস্তী বাঁধা রয়েছে  
ও যাতে শোভা পাচ্ছে মণিমুকু—বিজড়িত এক নীল সিংহাসন ;  
যে শিবিরের চূড়ায় উড়ছে হলুদ বর্ণের সুর্যাক্ষিত পতাকা,  
এবং তাঁদের বর্ণযুক্ত ঝালর ঝুলছে  
সেখানে ইরানীয় বীরবৃন্দ  
ও সৈন্যদলের মাঝখানে অবস্থানরত ব্যক্তিটি কে ?  
জবাবে হজীর বললেন, তিনি ইরানের বাদশাহ,  
তাঁর চারদিকে টহল ফিরছে মদমত হস্তী ও সিংহ !  
সোহৃদাব জিজ্ঞাসা করলেন, আর ওই যে দক্ষিণে এক শিবির —  
যেখানে বহু অশ্বারোহী, হস্তী ও সাজ—সরঞ্জামের মাঝখানে  
খাটোনো রয়েছে কঢ়ুবর্ণ শামিয়ানা,  
যাকে ধিরে বিরাজ করছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁবু,  
ও স্বর্ণ—সাজ পরে প্রস্তুত রয়েছে বহু অশ্বারোহী,  
সেই শিবিরে যিনি অবস্থান করছেন, বলুন, কি তাঁর নাম ?  
আর বলুন, কোথায় রয়েছে তাঁর প্রাণের সিংহাসন ?  
হজীর জবাবে বললেন, হস্তী—চিত্রাক্ষিত পতাকাবিশিষ্ট  
ওই শিবির যুবরাজ তূসের।  
তিনি সেনাপতি ও স্বয়ং বাদশার পুত্র,—  
মহামান্য মহাবীর ও শক্তি—নির্ধনকারী।  
সিংহও তাঁর আঘাত সহ্য করতে অক্ষম,  
মহত্ত্বগণ তাঁকে দান করেন রাজস্ব ও উপটোকন।  
সোহৃদাব জিজ্ঞাসা করলেন, ওই যে লাল রঙের শিবির

যার সামনে জমায়েত রয়েছে একদল সৈন্য  
এবং সম্মুখে পশ্চাতে বিচরণ করে ফিরছে  
বর্ম ও বশিধারী সিপাহী,  
ব্যাঘ-চিত্রাঙ্কিত পাতাকায় যেখানে  
শোভা পাছে বহু মণিমুক্তা —  
কে অবস্থান করছেন সেই শিবিরে ?  
সত্য করে তাঁর নাম আমাকে বলুন।  
হজীর জবাবে বললেন, তিনি মুক্ত পুরুষদের গর্ব,  
তিনিই সেনাপতি গোদরঞ্জ।  
তিনি শক্র-বিনাশকারী ও জিঘাংসা-পরায়ণ,  
তাঁর আশিজন পুত্র সবাই সিংহের মতো সাহসী ও হস্তীর মতো বলবান।  
তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হাতীও ভয় পায়,  
প্রান্তের সিংহ ও পর্বতে ব্যাঘও তাঁর সমকক্ষ নয়।  
সোহৱাব বললেন, আর ওই যে সবুজ বর্ণের শিবির  
ইরানের মহস্তমগণ যার সামনে টহল দিয়ে ফিরছেন,  
আর তাঁদের মাঝখানে বিরাজ করছে এক মহামূল্য সিংহাসন,  
যাতে খচিত রয়েছে সৌভাগ্যসূচক তারকা,  
সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন  
মহাসমারোহে এক র্মাদাবান বলশালী বীর,  
একটি অশু যাঁর সামনে দণ্ডায়মান,  
উচ্চতার যাঁর অনুরূপ আমি কৃত্রিপি দেখিনি  
যিনি সর্বক্ষণ আপন মনে গর্জন করছেন,  
মনে হয় যেন উচ্ছুসিত হচ্ছে বন্যাক্রান্ত নদী ;  
বহু বর্ম-সঙ্গিত হস্তী যাঁর সামনে  
প্রমত্ত বৃংহণে উচ্ছুসিত হচ্ছে বারংবার ;  
ইরানে যাঁর সদৃশ উন্নত-শির বীর আর একজনও দেখছি না,  
যাঁর এক পার্শ্বে দোদুল্যমান এক নিদারশ্প পাশ ;  
যাঁর পতাকায় অঙ্কিত রয়েছে আজদাহার চিত্র,  
যাঁর বর্ণার অগ্রভাগে উৎকীর্ণ রয়েছে সিংহের মুখ,  
বলুন সেই মহাবীরের নাম কি,  
যিনি সর্বক্ষণ গর্জন করছেন সিংহের মতো ?  
এই সময় হজীর মনে মনে ভাবলেন,  
আমি যদি এখন রুস্তমের পরিচয় প্রদান করি,

তবে এই সিংহ-সদৃশ তরুণ বীর  
 অক্ষম্বাণ্ড রুপে আকৃতি করে বসবে।  
 কাজেই সঙ্গত হবে, এই পরিচয় গোপন করা,  
 তাঁর নাম না বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করছি।  
 প্রকাশে বললেন, ইনি এক চীন দেশীয় বীর,  
 সম্মাট-সমাপ্তে নতুন আগমন করেছেন।  
 সোহৰাব সেই বীরের নাম জিজ্ঞাসা করলে  
 হজীর বললেন, তাঁর নাম আমি জানি না।  
 আবার সোহৰাব বললেন,  
 চীন দেশীয় এই বীরের নামটি আমাকে বলুন।  
 জবাবে হজীর বললেন, হে জাগ্রত চিন্ত  
 সিংহ-দলনকারী বীর,  
 আমি যখন এই দুর্গে অবস্থান করছিলাম,  
 এই বীর তখন আগমন করেছিলেন সম্মাটের কাছে।  
 ঐর সাজ-সজ্জা দেখে অনুমান করছি,  
 ইনিই সেই চীন দেশীয় বীর।  
 এই জবাবে সোহৰাবের অন্তর বিষণ্ণ হলো,  
 কারণ তিনি রুপের কোন চিহ্নই কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না।

জননী পিতার যে-নির্দর্শন বলে দিয়েছিলেন  
 সব দেখতে পেয়েও তিনি তা বিশ্বাস করতে পারছেন না।  
 হজীরের মুখ থেকে তিনি জানতে চেয়েছেন নাম,  
 কিন্তু তাঁর আনন্দের নামটি হজীর বলতে পারেননি।  
 তাঁর উপর ভাগ্যের লিখন ছিল অন্যরূপ,  
 সেই লিখন অমোঘ — তাতে হাস-বৃক্ষি অসম্ভব।  
 মৃত্যুরূপ নিয়তি যখন আকাশে তার পক্ষ বিস্তার করে  
 তখন তার নীচে সব কিছুই হয় অন্ধকার।

সোহৰাব আবার জিজ্ঞাসা করলেন সেই সব বীরের নাম,  
 যাঁদের শিবির পড়েছে রণক্ষেত্রের বিভিন্ন কোণে।  
 তিনি বললেন, ওই যে শিবির যার সামনে বাঁধা রয়েছে হস্তী  
 ও সৈন্যদল টহল দিচ্ছে  
 এবং যেখান থেকে উঞ্চিত হচ্ছে বিষণ্ণ-ধ্বনি,

নেকড়ের চির্দি-সমন্বিত পতাকা যেখানে উড়ছে,  
আর সেই পতাকার স্বর্ণদণ্ড স্পর্শ করছে মেঘদল ;  
সেই শিবিরের মাঝখানে স্বণসিংহাসন  
ও দুপাশে সারি বেঁধে দণ্ডায়মান দাসবন্দ,  
বলুন সেই সিংহাসনারাত্ বীর কে ?  
তিনি কোন্ বংশোদ্ধৃত ও কি তাঁর নাম ?  
হজীর বললেন, ইনি গোদরঞ্জের পুত্র গেও,  
লোকে তাঁকে মহাবীর গেও বলে সম্বোধন করে !  
গোদরঞ্জের সন্তানদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ,  
ও ইরানীয়দের মধ্যে অধিক সম্মানিত।  
ইনি মহামর্যাদাশালী রুস্তমের আত্মীয়,  
ইরানে তাঁর মতো ব্যক্তি অল্পই আছেন।  
সোহরাব বললেন, ওই যে ওদিকে শুভ যবনিকা ছিল করে  
এক সূর্যের উদয় হয়েছে,—  
যাঁর অঙ্গে বলমল করছে কৌশিক পরিচ্ছদ,  
ও যাঁর সামনে সারি বেঁধে দণ্ডায়মান রয়েছেন সহস্রাধিক বীর,  
পদাতিক বর্ধারী ও বর্ণাধারী অগণিত সিপাহী  
যাঁর সামনে সমবেত ;  
মূল্যবান কাঞ্চ-নির্মিত উজ্জ্বল সিংহাসনে  
উপবিষ্ট যে সেনাপতির সামনে  
হিল্লোলিত রেশমী বস্ত্রধারিণী সুন্দরীরা  
ও দলে দলে দাসগণ বিরাজ করছে  
তিনি কে, কি তাঁর নাম ?  
কোন্ অভিজাত ও সেনাপতির তিনি বংশধর ?  
হজীর বললেন, এঁর নাম ফারেবুরজ,  
ইনি বাদশারই পুত্র ও বীরগণের তাজ।  
তারপর সোহরাব জিজ্ঞাসা করলেন, ওই যে হলুদ শিবির  
যার সামনে উড়ছে উজ্জ্বলিত পতাকা,  
যার আশে পাশে আরো নানা রঙের নিশান  
পত্ পত্ করে বাতাসে উড়ছে,  
এবৎ পতাকায় অঙ্কিত রয়েছে কোদালের চির,  
যার রোপ্যদণ্ড স্পর্শ করছে মেঘদল,  
বীরগণ তাঁকে কি বলে সম্বোধন করেন ?

তাঁর পরিচয় আপনি যা জানেন নিবেদন করুন।  
হজীর বললেন, এর নাম শুরাজ,  
ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে অশু বলশাহীন করেন।  
ইনি অত্যন্ত সচেতন ও গেওদেরই বংশোন্তৃত,  
ইনি দুঃখে কিংবা বিপদে কখনো আত্মহারা হন না।  
এইভাবে সোহৱাব অনুসন্ধান করে চলেন পিতার নির্দেশন,  
কিন্তু তাঁর কাছে গোপন রাখা হয় সত্যকে।  
দুনিয়াকে তুমি তোমার মনের মতো করে গড়তে পারো না,  
দুনিয়ার মালিক তাকে নিজের মতো করেই সজ্জিত করেন।  
কালের লিখন কিছু অন্যরূপই ছিল,  
যা ঘটবার তাই সংঘটিত হবে।  
তোমার হৃদয় যদি সন্নিবেশিত করো এই সরাইখানার উপর,  
তবে তার থেকে লাভ করবে দুঃখ, বেদনা ও হলাহল।

তরুণ বীর আবার জিজ্ঞাসা করলেন  
সেই মর্যাদাবান বীর সম্পর্কে।  
জিজ্ঞাসা করলেন, সেই সবুজ শিবির  
ও সেই মহিমান্বিত পুরুষ সম্বন্ধে, যাঁর পার্শ্বদেশে  
প্রলম্বিত রয়েছে অমোঘ-পাশ।  
জবাবে হজীর বললেন, হে বীর, আপনার কাছে  
আমি সত্য গোপন করবো কেন?  
যদি আমি এই চীন-দেশীয় বীরের নাম জানতাম তবে অবশ্যই বলতাম,  
কিন্তু তাঁকে আমি জানি না।  
সোহৱাব বললেন, কিন্তু এ কেমন হলো যে,  
আপনি রুস্তমের কথা বললেন না?  
বিশ্ব-বিখ্যাত বীর যিনি  
তিনি তো বীরগণের সমাবেশে গোপন থাকতে পারেন না।  
আপনিই বলেছেন, রুস্তম সমস্ত সেনাবাহিনীর প্রধান,  
তিনিই ইরানের সকল রাজ্যের রক্ষক।  
যেখানে কায়কাউস স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করেছেন।  
যেখানে তিনি সুসজ্জিত হস্তীদল ও সিংহাসন টেনে এনেছেন,  
যেখানে উত্থিত হয়েছে প্রান্তর প্রকম্পিত করে যুদ্ধের কোলাহল,  
সেখানে তো বিশ্ব-বিখ্যাত রুস্তমকেই সেনাপতিত্ব করতে হবে।

জ্বাবে লজীর সোহৃদাবকে বললেন,  
সম্ভবতঃ সিংহ-দলনকারী বীর  
কোন ফুলবলে বন্ধুদের নিয়ে আসর করে বসেছেন।  
সোহৃদাব বললেন, এমন কথা বলবেন না,  
যেখানে দুনিয়া-পতির সমীপে সকল দিক থেকে  
আগমন করেছেন মুকুটধারী সামন্তগণ,  
সেখানে বিশ্ব-বিখ্যাত রুস্তম গীতবাদ্য নিয়ে কাল যাপন করবেন না।  
এমন কথা শুনলে বালক-বৃন্দ সবাই তাঁর উপর হাস্য করবে।  
আজ আপনার সমীপে আমার একটি মাত্র প্রতিজ্ঞা —  
বেশী কথা নয়, একটি মাত্র অঙ্গীকার আমি করছি,  
যদি আপনি আমাকে দিতে পারেন মহাবীরের সন্ধান,  
তবে সর্বত্র আপনি সম্মুত্ত-শির হবেন।  
দুনিয়ায় আপনাকে আমি সর্ব অভাব থেকে মুক্ত করবো,  
খুলে দিব আপনার সামনে লুকায়িত ধনের আগার।  
কিন্তু যদি সেই রহস্য আমার কাছে গোপন করেন,  
যদি প্রকাশ করে না বলেন যা সত্য,  
তবে আপনি বিচার করুন কি হবে আপনার কর্তব্য ?  
আপনি কি শোনেননি জ্ঞানী ব্যক্তি বাদশাকে কি বলেছিলেন ?  
গোপন রহস্য যখন আপনি প্রকাশ করবেন,  
তখন অকথিত কথা মুক্তার মতো উত্তুসিত হবে,  
এবং বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তা  
অমূল্য সম্পদের মতো হাতে আসবে।  
লজীর জ্বাবে বললেন, হে মহামতি,  
সৌভাগ্য, তাজ ও সিংহাসন আপনার শুভ হোক !  
মদমত্ত হস্তীও যুদ্ধে সেই মহাবীরের সমকক্ষ নয়।  
যদি আপনি তাঁর পাঞ্জা প্রত্যক্ষ করতেন  
যদি দেখতেন তাঁর ভরঞ্চের সমারোহপূর্ণ চেহারা  
তবে নিজেই বলতেন, তার থেকে কারো রেহাই নেই —  
সে দৈত্য, সিংহ কিংবা নরপুংব যেই হোক না কেন ?  
তাঁর প্রহরণের আঘাতে চূর্ণ হয় স্বয়ং নেহাই,  
দ্বিশত জনের সমাবেশেও তিনি আনয়ন করেন মৃত্যু।  
রুস্তমের সঙ্গে যে যুদ্ধে এগিয়ে আসে তার আকাশ-চুম্বী শির হয় লুষ্টিত।  
তাঁর সমকক্ষ দুনিয়ায় কেউ নেই,—

সে মদমত্ত হস্তীই হোক, কিংবা বন্যাক্রান্ত নীলনদ।

তাঁর দেহে শত পুরুষের শক্তি,

তাঁর সমুন্নতি সুউচ্চ বৃক্ষেরও শীর্ষ ছাড়িয়ে যায়।

যুদ্ধের দিনে তিনি যখন প্রকট করেন উদ্ধা,

তখন তাঁর সামনে তুচ্ছ হয়ে যায় সংহ্র হস্তী ও মানুষ সকলে।

প্রতিদৃষ্ট্বী কঠিন পর্বত হলেও যেন একাকী তাঁর সম্মুখীন না হয়।

রুক্ষমের যুদ্ধ-কৌশলও দুনিয়ার সর্বত্র সকল বীরের জানা।

তিনি যদি হিন্দুস্তানী তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়ান,

তবে আপনিও তাঁর সম্মুখীন হতে ভয় পাবেন।

দুনিয়ায় কোন বীরকেই আপনি

তাঁর ভারী প্রহরণের মুখোমুখী হতে দেখবেন না।

চীনের অধিপতি স্বয়ং দুর্জৰ্ব আঙ্গাসিয়াব,

ও তুরানভূমির যশস্বী বীরবন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন,

কি করে অগ্নি বর্ষিত হয় রুক্ষমের অসি থেকে।

সোহৱাব বললেন, হে হজীর,

আপনি ইরানের বীরবন্দ, হতভাগ্য গোদরজ

ও অন্যান্য সেনাপতির শক্তি ও কৌশলের গুণকীর্তন করেছেন।

কিন্তু সত্যিকারের বীর আপনি কোথায় দেখেছেন?

কোথায় শুনেছেন মহাত্ম অশুরোহীর সংগ্রাম-হৃক্ষার?

আপনি রুক্ষম সম্পর্কে এত কথা বললেন,

সর্বক্ষণ তাঁর গুণকীর্তনে নিরত রইলেন।

যদি এখন আমি আপনাকে দেখাই কি করে বায়ু দ্বারা উদ্বেলিত হয় সমুদ্র,

তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে, অগ্নির প্রতিষ্ঠা

তরঙ্গিত জলধারার সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়।

সুর্যের তরবারি কোষমুক্ত হলে

অপ্রতিহত-প্রভাব অঙ্ককারের নিয়তি সুপ্ত হয়ে পড়ে।

সোহৱাবের এই কথা শুনে হজীরের অন্তর বিখণ্ণ হলো

অপরিণামদর্শী হজীর মনে মনে বললেন,

যদি আমি মহাবীরের পরিচয় জ্ঞাপন করি,

তবে এই মহাশক্তিশালী তুকী বীর,—

এই রাজকীয় মর্যাদা ও সামর্থ্যের ধারক,

সহসা সৈন্যদল থেকে বিযুক্ত হয়ে

তার বিশাল-বপু অশুকে উদ্ভেজিত করে  
ও তার এই আমানুষিক শক্তি ও বীর্য নিয়ে  
রুস্তমের উপর আপত্তি হয়ে তাঁকে হত করবে।  
তখন ইরানীদের মধ্যে এমন বীর আর কেউ থাকবে না  
যে এই তরুণ বীরের সম্মুখীন হতে পারে।  
অবশিষ্ট রইবে না আর কেউ,  
যে রক্ষা করতে পারবে কায়কাউসের সিংহাসন।  
জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন, যশের সঙ্গে মৃত্যুবরণ  
শক্তকে সফল হতে দেওয়ার চেয়ে শ্রেয়তর।  
যদি আমি সোহৃদাবের হাতে নিহত হই,  
তবে দিবস অঙ্গকার হবে না, কিংবা নদীতে বইবে না রক্তের ধারা।  
আমার মৃত্যু হলে বৃক্ষ গোদরঞ্জ, ও তাঁর অশীতি সংখ্যক পুত্র,  
বিশুজ্জ্বলী ও শক্রনিধনকারী গেও, সংগ্রাম-কুশলী শেদওয়াশ  
আমার জন্য দুঃখ করবেন —  
নিবেন তাঁরা শক্রের কাছ থেকে আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ।  
অপর পক্ষে যদি গোদরঞ্জ ও তাঁর শক্রিমান অশীতি সংখ্যক পুত্র  
এবং ইরানের স্বনাম-ধন্য বীরগণ  
জীবিত না থাকেন, তবে আমার বৈচে লাভ কি ?  
জ্ঞানিগণের সেই কথা আমার মনে আছে,—  
দেবদারু বৃক্ষ যখন মৃত্যুকা ভদ্র করে উন্নীত করে তার মস্তক  
তখন চকোর আর ত্ণশয্যায় অবস্থান করে না।  
মনে মনে এই চিন্তা করে হংজীর সোহৃদাবকে বললেন,  
আপনি বার বার কেন আমাকে রুস্তমের কথা জিজ্ঞাসা করছেন ?  
কেন আপনি শক্রভাবাপন্ন হয়ে  
অনর্থক আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছেন এতো কথা ?  
আমি রুস্তমের পরিচয় বলতে পারবো না,  
যদি ইচ্ছা হয় তবে কর্তিত করুন আমার শির।  
আমার রক্তপাতের জন্য ছল করে লাভ নেই,  
অনতিবিলম্বেই আপনি আমার রক্তে হস্ত রঞ্জিত করুন।  
আপনি রুস্তমকে পরাজিত করতে পারবেন না,  
তাঁকে বশ করা কিছুতেই আপনার দ্বারা সম্ভব নয়।  
তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ অন্বেষণ  
আপনার জন্য শোভন কিংবা আপনার সফলতার সহায়ক হবে না।

## সোহুরাব কর্তৃক কায়কাউসের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ

হুজীরের মুখে কঠিন কথা শুনে  
তরুণ সেনাপতি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।  
তারপর একটি কথাও তিনি বললেন না,  
শুধু সেই রহস্যময় কথাগুলি তাঁর মনে গুপ্তিত হতে লাগলো।  
তিনি সত্ত্বর দুর্গ-প্রাকার থেকে  
নীচে বস্থানে নেমে এলেন।  
তারপর বহু চিন্তা করে তিনি  
যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।  
জিঘাংসায় মনস্থির করে তিনি কষে বাঁধলেন কটিবন্ধ,  
ও শিরে তুলে নিলেন আধিপত্যের সূচক স্বর্ণ-মুকুট।  
তারপর উপযুক্ত সাঁজোয়া পরে  
বাযুগতি এক রোমায় অশ্বের দিকে মুখ করলেন।  
তাঁর হাতে ধরা রইলো বর্ণা, যথাস্থানে সন্নিবেশিত হলো ধনুংশার ও পাশ,  
গুরুভার প্রহরণও শোভা পেলো তার স্কন্দদেশে ?  
উত্তেজনায় তাঁর ধমনীতে রক্ত-প্রবাহ দ্রুততর হলো,  
দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মুখ করলেন।  
গিরিচূড়ার মতো স্বস্থান থেকে সচল হলো অশ্ব,  
এবং মদমত হস্তীর মতো যুদ্ধভূমির দিকে এগিয়ে চললো।  
সংগ্রামকামী তরুণ বীর এবার  
যুদ্ধের ময়দানে এসে তাঁর মুখ-চন্দ্র প্রকটিত করলেন।  
তাঁর দুর্বার গতি ইরানীয় সৈন্যবাহিনীর বক্ষদেশ ভেদ করে  
সম্যাট-কায়কাউসের লক্ষ্যাভিযুক্তি হলো।  
তিনি বর্ণা উদ্যোগ করে দ্রুত বেগে  
যাজকীয় শিবিরের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।  
সিংহের প্রচণ্ড থাবার সামনে থেকে গর্দভকুল যেমন করে পলায়নপর হয়,  
তেমনি করে বীরগণ এই তরুণের সামনে থাকে ইঙ্গিত বিক্ষিপ্ত হলেন।  
ইরানীয় সেনাপতিদের কেউই  
তাঁর দিকে চোখ তুলে চাওয়ার সাহস পর্যন্ত করলেন না।  
তাঁর ব্যক্তিত্ব, অশ্বারোহণ, বল্কা ধারণ  
ও তাঁর বলিষ্ঠ বাহুতে ধৃত বর্ণ দেখে

সেনাপতিগণ একত্রে জমায়েত হয়ে বলতে লাগলেন,  
এ যেন স্বয়ং মহাবীর রুশ্ম !  
এমন সময় বীরপ্রবর সোহৱাব  
স্বয়ং সম্ভাট্ কায়কাউসকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বললেন,  
হে মুক্তি-পুরুষ সম্ভাট্,  
মুক্তক্ষেত্রে আপনার এ কেমন আচরণ ?  
মিথাই আপনার নাম সম্ভাট্ কায়কাউস,  
মুক্তক্ষেত্রে আপনি সকল মর্যাদা খুইয়ে বসেছেন।  
আমার হাতে ধরা এই বর্ণ ঘূর্ণিত করে  
আপনার সকল সৈন্য আমি বধ করতে পারি।  
যে-রাত্রে ঝিন্দারজম্ হত হয়েছেন,  
সেই রাত্রে লোক-সমক্ষে আমি এক ভীষণ শপথ করেছি,—  
বলেছি, ইরানের একজন বর্ণাধারীকেও আমি অক্ষত রাখবো না,  
বাদশা কায়কাউসকে আমি শূলিতে ঢ়াবো।  
ইরানীয়দের মধ্যে এমন বলশালী কে আছে,  
যিনি এই যুক্তে আমার মোকাবেলা করবেন ?  
কোথায় গেও, গোদরং ও তৃস প্রমুখ বীরগণ ?  
কোথায় ফারেবুরজ, কাউস ও গুস্তাহাম প্রমুখ সিংহ-পুরুষেরা ?  
বিশ্ব-জয়ী বিখ্যাত রুশ্মহই বা কোথায় ?  
কোথায় অন্যান্য নামকরা ইরান-সেনাপতি ?  
আসুন, সবাই এই যুদ্ধের ময়দানে এসে  
স্বায় পৌরুষ পরীক্ষা করুন।

সোহৱাবের এই ডাক শুনে কেউ প্রত্যুষের করলেন না,  
সমগ্র রণভূমিতে বিরাজ করতে লাগলো এক নিশ্চলতা।  
সোহৱাব এইবার স্বস্থান থেকে  
সম্ভাটের শিবিরের দিকে অগ্রসর হলেন।  
সঙ্গে সঙ্গে প্রহরিগণের পৃষ্ঠদেশ কুজ হলো।  
ও উধর্মুখী বর্ণ হলো অবনত।  
রাজকীয় শিবিরের মর্যাদা ক্ষণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে  
সর্বত্র উথিত হলো বিষণ্ণ-ধ্বনি।  
কায়কাউস বিষণ্ণ হয়ে উচ্চস্বরে বললেন,  
হে যশস্বী অভিজাতগণ,

তোমাদের একজন রুস্তমের কাছে গিয়ে বল,  
এক তুর্কীর ভয়ে বীরগণের সাহস লোপ পেয়ে গেছে।  
তার সমকক্ষ ধীর আমাদের মধ্যে নেই;  
তার সম্মুখীন হয় এমন লোকের অভাব হয়েছে ইরানে।  
সম্বাটের বাণী নিয়ে তুস অবিলম্বে রুস্তম সমীপে উপনীত হলেন।  
শুনে রুস্তম বললেন, বাদশা সর্বদাই  
আমাকে আকশ্মিকভাবে ডেকে পাঠান।  
যুদ্ধক্ষেত্র হোক কিংবা আসুন  
সংগ্রামের বিপদ ছাড়া কায়কাউস থেকে আর কিছু লভ্য নয়।  
এই বলে তিনি রাখ্শকে সজ্জিত করার আদেশ দিয়ে  
স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।  
স্বীয় শিবির থেকে প্রাস্তরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখলেন,  
বীরপ্রবর গেও পথ অতিক্রম করেছেন,  
রাখ্শের পিঠে বাঁধা হচ্ছে নয়নমুগ্ধকর গদী,  
কে যেন বললেন, হাঁ গুরগীন সন্দৰ প্রস্তুত হও।  
ওদিকে রহস্যম প্রস্তুত হচ্ছেন ভারী প্রহরণ নিয়ে,  
তুস পরছেন তনুত্বাগ।  
শিবির থেকে এই রণপ্রস্তুতি লক্ষ্য করে  
রুস্তম মনে মনে বললেন শয়তানের যুদ্ধ এটি,  
হাশারের ময়দানের কোলাহল এ নয়।  
এই বলে তিনি তাঁর মাথায় তুলে নিলেন ব্যাঘ-মুখাঙ্কিত শিরস্ত্রাণ,  
এবং দৃঢ় করে বক্সন করলেন কটিদেশ।  
তারপর রাখ্শের উপর সওয়ার হয়ে প্রাস্তর অভিমুখে অগ্রসর হলেন,  
শিবির ও সৈন্যবাহিনী রক্ষণের ভার রইলো জওয়ারার উপর।  
সমুন্ত পতাকাসহ মহাবীর  
রোষভরে এগিয়ে এসে প্রাস্তরে পা রাখলেন।  
এমন সময় তাঁর চোখ পড়লো সোহরাবের উপর,  
যেমন তাঁর ব্যক্তিত্ব, তেমনি প্রশস্ত বক্ষ ঠিক যেন সামের মতো।  
রুস্তম তাকে ডাক দিয়ে বললেন, চলো,  
রণক্ষেত্র থেকে একটু দূরে যাওয়া যাক।  
রুস্তমের এই প্রস্তাব শুনে সোহরাবের চিন্ত বিচলিত হলো।  
তিনি প্রতিপক্ষের হাতে হাত রেখে  
সৈন্যবাহিনীর সহনে থেকে সরে এলেন।

এবৎ বললেন, চলুন আমরা নিভ্রতে  
পরম্পরার সঙ্গে একটু যত বিনিময় করি।  
আমি ও আপনি একত্র হলে  
ইরানে—তুরানে আর কোন লোকের প্রয়োজন নাই।

যুদ্ধ করে কোন ফল হবে না,  
আপনি আমার সমকক্ষ নন।

সমুন্নতি, পাঞ্জা ও বীরত্ব —  
এই বৃক্ষ বয়সে আপনার জন্য বিপদ্দৈ ডেকে আনবে।

রুস্তম উন্নতশির তরুণের দিকে চেয়ে দেখলেন,—  
কি শক্তিশালী, বিপুলকায় ও ব্যক্তিত্বশালী !

ঠাকে বললেন, হে তরুণ, একটু ধীরে,  
দেখ, শুভিকা শুক্ষ ও শীতল, বায়ুও মদুমন্দ।

এই বৃক্ষ বয়সে কত না যুদ্ধক্ষেত্র আমি দেখেছি,  
কত দেশে কত সৈন্যবাহিনী আমি পরাভূত করেছি।

কত দৈত্য আমার হাতে হত হয়েছে,  
কিন্তু কুত্রাপি আমি তেঙ্গে পড়িনি।

আমাকে চেয়ে দেখো, যুদ্ধক্ষেত্রে  
কোন নক্রকেই আমি ভয় করি না।

পর্বত প্রান্তরে কিংবা সমুদ্রে  
তুরানীয়দের সঙ্গে আমি কিভাবে যুদ্ধ করেছি

তা দেখেছে আকাশের নক্ষত্রদল,  
সর্বত্রই আমি তাদেরকে করেছি পরাভূত।

যে—সব লোক আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখেছে, তারাই বলেছে যে,  
যুদ্ধক্ষেত্র আমার জন্য আসরে পরিণত হয়েছে।

তোমার উপর আমার মায়া হচ্ছে,  
তোমার প্রাণকে আমি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই না।

তুরানীয়দের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব কারো নেই,  
ইরানীয়দের মধ্যেও তোমার সমকক্ষ কাউকে দেখছি না।

রুস্তমের এই বাক্যাবলী শ্রবণ করে  
সোহরাবের অন্তর বিগলিত হলো।

তিনি বললেন, আশা করি আপনি আমার প্রশ্নের  
ঠিক ঠিক উত্তর দিবেন।

আপনার বৎস পরিচয় আপনি স্বাপন করুন,

ও আপনার বাকেয় নন্দিত করুন আমার অস্তরাত্মা ।  
আমার মনে হচ্ছে আপনিই রুস্তম,  
যশষ্মী জবাবে বললেন, না আমি রুস্তম নই,  
এবং সাম ও নুরীমানের বৎশোস্তুতও আমি নই ।  
রুস্তম মহাবীর, আমি শুদ্ধাদপি শুদ্ধ  
আমার না আছে সিংহাসন না রাজপ্রাসাদ না সামন্ত ।  
রুস্তমের কথা শুনে সোহৃদাবের সকল আশা তিরোহিত হলো  
তাঁর চাঁধে অঙ্ককার হয়ে এলো উজ্জ্বলিত দিনের আলো ।

## সোহরাবের সঙ্গে রুক্ষমের যুদ্ধ

সোহরাব অবাক হয়ে মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে  
বর্ণা হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মুখ করলেন।  
সংকীর্ণ এক প্রান্তে দুই বীরের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হলো।  
বর্ণার যুদ্ধে কেউ কাউকে পরাস্ত করতে না পেরে  
উভয়ে অশু-বল্লা বাম দিকে ঘুরিয়ে ধরলেন।  
হিন্দুস্তানী তলোয়ারের ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্নি স্ফুরিত হতে লাগলো।  
দেখতে দেখতে মহাপ্রলয়ের প্রচণ্ডতায়  
ভেঙে খান খান হলো উভয়ের তরবারি।  
এইবার তাঁরা টেনে নিলেন শুক্রভার প্রহরণ,  
ও তা দিয়ে আধাত করে চাললেন পরম্পরাকে।  
শক্তির প্রচণ্ডতায় প্রহরণ বাঁকা হয়ে গেলো,  
আস্কন্দিত-অশু ও প্রতিদুষ্টীদ্বয় কৃমে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন।  
খুলে পড়লো অশ্বের সাজোয়া,  
বীরদুয়ের বর্মণ কোমর থেকে পড়লো খসে।  
অশুদ্ধ তাদের তৎপরতা হারালো, বীরদুয়ে হলেন অশক্ত  
তাঁদের দেহ ঘর্মে সিঞ্চ হলো ও মুখে ধূলা উড়তে লাগলো।  
পিপাসায় তাঁদের কষ্ঠ-তালু দীর্ঘ হওয়ার উপক্রম হলো।  
দুই বীর এবার পরম্পরাকে ছেড়ে দূরে সরে দাঁড়ালেন —  
একজন বেদনা-বিধুর পিতা, অন্যজন ক্লান্তিতে বিচূর্ণ পুত্র।

হে দুনিয়া, অস্তুত তোমার কীর্তি,  
তুমিই ভাণ্ডে আবার তুমিই গড়ো।  
সংগ্রামরত বীরদুয়ের কারো হাদয়ে কোন প্রীতির সঞ্চার হলো না,  
বুদ্ধি যেখানে রাহগ্রস্ত সেখানে প্রীতি কোথায়?  
পশুও তার নিজের সন্তানকে চিনতে পারে —  
জলস্ন্যোতের মংস্য কিংবা বনের গর্দভ।  
কেবল মানুষই লোভ ও উত্তেজনার বশে চিনতে পারে না শীঘ্র সন্তানকে,  
সে তাকে পৃথক করতে পারে না শক্ত থেকে।

রুক্ষম মনে মনে বললেন, কোন নক্রকেই  
যুদ্ধে এমন পরাক্রান্ত দোখি না।

সপেদ দৈত্যের সঙ্গে আমার যুদ্ধও এর সামনে তুচ্ছ হয়ে গেছে;  
যে-লোক কোন বীরের বংশোদ্ধৃত নয়, কিংবা

অভিজাততন্ত্রের কোন যশঙ্খী ব্যক্তি নয়,

সেইরূপ এক অজ্ঞাতকুলশীলের সামনে

আমার পৌরুষের গর্ব আজ মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে।

কালের আবর্তন থেকে আমি আজ লাভ করলাম অপমান,

দুই সৈন্যদলই প্রত্যক্ষ করছে আমাদের এই সংগ্রাম।

কিছুক্ষণ <sup>৩</sup> রব থাকার পর অশুদ্ধয় একটু সুস্থ হলে

তরুণ ও বয়োবৃদ্ধ দুই যোদ্ধাই

আবার তুলে নিলেন ধনুঃশর।

এইবার চললো অবিরত তীরের বর্ষণ,

মনে হলো, হেমন্তের তাড়নায় যেন বরে পড়ছে শুক্র তরু-পত্র।

তনুত্রাণ, বর্ম ও ব্যাঘ্রমুখাঙ্কিত শিরস্ত্রাণ

সবই তীরের ফলায় কঠকিত হয়ে উঠলো।

বীরদুয় এবার অস্ত্র চালনায় বীতশুক্র হয়ে

টেনে ধরলেন পরম্পরের কঠিবক্ষ।

রুস্তমের যে বজ্রমুষ্টির ঘর্ষণে

কষণবর্ণ কঠিন পাষাণ দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো,  
তাঁর যে-শক্তিতে মাটি থেকে সমূলে উৎপাটিত হতো পর্বত,

এবং শক্ত পাথর বিগলিত হতো মোমের মতো,

সেই বজ্রমুষ্টি আজ সোহৱাবকে তাঁর অশ্বাসন থেকে

তুলে আনবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে চললো।

কিন্তু তরুণের উপর তাঁর প্রভাব হলো নগণ্য,

মনে হলো, রুস্তম যেন তাঁর সকল নৈপুণ্য হারিয়ে বসেছেন।

রুস্তম অপারাগ হয়ে তুলে আনলেন তাঁর হাত সোহৱাবের কঠিবক্ষ থেকে,  
তিনি সেই কঠিবক্ষের দুর্লভতায় আশ্চর্য আবাক হয়ে রইলেন।

এইভাবে লড়তে লড়তে দুই বীরের যুদ্ধসাধাই পরিত্যন্ত হলো,

দীর্ঘ লড়াইয়ে উভয়েই বিরক্ত হয়ে পড়লেন।

তবু সোহৱাব আবার টেনে নিলেন প্রহরণ

ও পুনরায় রুস্তমকে যুদ্ধার্থ আহ্বান জানালেন।

সোহৱাবের প্রহরণাযাতে রুস্তমের বাহ্মূল বেদনার্ত হলে

সোহৱাব হেসে বললেন, হে বীর,

দেখতে পাচ্ছি, বীরের আঘাত আপনি সহিতে পারছেন না।  
আপনার উরুর নীচে যে-অশু তার অবস্থাও ভালো নয়।  
সুতরাং আপনার উপর আমার করশা হচ্ছে,  
আপনার রক্তপাত করতে ব্যথিত হচ্ছে আমার অন্তর।  
যদিও আপনি দেবদারুর মতো উন্নত ও বীর  
তবু বর্ষীয়ান নয় তরংগের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ।  
রুক্ষম এ কথার কোন জবাব না দিয়ে  
শুধু আবাক হয়ে তরং বীরের শক্তি ও নৈপুণ্যের কথা ভাবতে লাগলেন।  
উভয়ই উভয়ের দিক থেকে এমন বাধা পেয়েছেন যে,  
দুয়ের জন্যই জীবনের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে এসেছে।  
তাঁরা একে অন্যের দিক থেকে ফিরিয়ে নিলেন মুখ।  
রুক্ষমের গতি হলো তূরান বাহিনীর দিকে,—  
এতক্ষণে যেন ব্যাপ্ত খুঁজে পেয়েছে তার ঘৃণ্যা।  
ওদিকে সোহৃদাবও অশুবল্গা শুখ করে  
দ্রুত ধাবিত হলেন ইরান বাহিনীর দিকে।  
এবং নিজেকে সেই বুহের প্রাচীরে প্রত করে  
বহু সৈন্য নিহত করে চললেন।  
নেকড়ে পশুদলের উপর আগতিত হলে যেমন তারা ইতস্তত পলায়ন করে  
তেমনি ইরানী সৈন্যদলের ছেট বড় সবাই প্রাণভয়ে  
চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে লাগলো।  
রুক্ষম ভয় পোলেন, কায়কাউসের উপর হয়তো  
কোন অমঙ্গল নেমে আসতে পারে।  
তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে  
স্বীয় সৈন্যদলের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।  
দেখলেন, সোহৃদার রক্তের ধারায় মৃত্যুকা রঞ্জিত করে চলেছেন।  
তাঁর বর্ণার মুখ রক্তে লাল  
তিনি হরিণ-দলে সিংহের মতো বিচরণ করছেন।  
এই দৃশ্য দেখে রুক্ষমের সর্বদেহ ক্রোধে কম্পিত হলো,  
তিনি সিংহ-নাদ উথিত করে বললেন,  
হে রক্ত-পিপাসু তুর্কী যুবক  
তুমি ইরানীয় সৈন্যদলে আগতিত হচ্ছে ?  
আমার সঙ্গে যুক্তের মীমাংসা না করে  
তুমি বুঝি নেকড়ের মতো প্রবিষ্ট হয়েছো হরিণ-দলে ?

জবাবে সোহৃদাব বললেন, এই যুদ্ধে  
তুরানীয় সৈন্যগণ নিষ্পাপ ও দূরেই দাঁড়িয়েছিল।  
তুমই প্রথমে তাদের উপরে জিঘাংসা নিয়ে আপত্তিত হয়েছে।  
কৃষ্ণম বললেন, আজ দিনের আলো নিভে আসছে, সন্ধ্যা হয়ে এলো,  
তরবারির উজ্জ্বলতা আর এখন দৃষ্টিগোচর হয় না।  
আগামীকাল ভোরবেলা আমি তোমার সঙ্গে দৃশ্যমুক্ত প্রবৃত্ত হবো  
দেখবো, কোন্ সৈন্যবাহিনী তখন শোকে রোদন করে।  
এই প্রান্তরে এই জায়গায় আমি আসবো, তুমিও এসো,  
দুনিয়াকে আমরা এখানেই তরবারির আলোকে উজ্জ্বলিত করবো।  
ভোরের বেলা জিঘাংসার তরবারি উন্মোচিত করে আমরা আসবো।  
আর তখনই দেখতে পাব, বিশ্ব-প্রভুর ইচ্ছা কি?

## ରନ୍ତୁମ ଓ ସୋହରାବେର ସ୍ବ ସ୍ବ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଦିକେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଦୁଇ ବୀରେର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାର ହଲୋ,  
ତାରାମଣୁଳ ସୋହରାବେର କୌଠିତେ ବୋଧ କରତେ ଲାଗଲୋ ବିଷ୍ମୟ ।  
ଏକଟି ମାତ୍ର ବୀର-କୌଠି ସନ୍ଦର୍ଶନେ ଆକାଶ ଯେନ ପରିତ୍ରଣ ହୟନି ।  
ମେ ଯେନ ଦ୍ଵିତୀୟ ବାରେର ମତୋ ଏଇ ବିଷ୍ମୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରତେ ଚାଯ ।  
ରାତ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହଲେ ବୀରଦୂୟ ତାଁଦେର ସ୍ବ ସ୍ବ ଶିବିରେ ଫିରେ ଏଲେନ ।

ସୋହରାବ ହମାନକେ ବଲଲେନ, ଆଜକେର ପ୍ରଭାତ  
ଯୁଜ୍ନେର କୋଲାହଳ ନିଯେ ଆକାଶେ ଉଦିତ ହୟେଛିଲ ।  
ଆପନାକେ ଆମାର ପ୍ରତିପକ୍ଷେର ବୀରତ୍ରୈର କଥା କି ବଲବୋ ?  
ତିନି ବୀରଗଣେରେ ବୀର, ତାଁର ବାହୁଦୂୟ ସିଂହର ମତୋ ।  
ତାଁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପନି ଏଇ ଏକଟି ମାତ୍ର କଥାଯିଇ ବିବେଚନା କରନ ଯେ,  
ତିନି ସର୍ବତୋଭାବେଇ ଆମାର ସମକଳ ।  
ତିନି ଆମାଦେର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମଧ୍ୟେ ଯେ ପ୍ରଲୟ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ,  
ତାଁର ତୁଳନା ଆମି ଦେଖିନି ।  
ଏଇ ବୟୋବ୍ୱନ୍ଦ ସିଂହ-ପୁରୁଷ ରଣେ କିଛୁତେଇ ପରିତ୍ରଣ ହନ ନା ।  
ଆମି ସାରା ଦୁନିଆଯ ଏମନ ବୀର ଆର ଦେଖି ନାଇ,  
ଯିନି ଏମନ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳେପର ସଙ୍ଗେ ଯୁଜ୍ନେ କୋମର ବାଁଧେନ ।  
ହମାନ ବଲଲେନ, ବାଦଶାର ଆଦେଶ ଛିଲ,  
ସୈନ୍ୟଦଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ଥାନଚୂତ ହବେ ନା ।  
ଆମାଦେର ଗୋଟା ବାହିନୀଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶ୍ରଦ୍ଧିତଭାବେ  
ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ପରିଚାଳନାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେତ ଥାକବେ ।  
କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକାରେର ପ୍ରତୀକ ଆପନି ନିଜେଇ  
ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରେଖେ ଅଗସର ହଲେନ ।  
ଆପନାକେ ଦେଖେ ମନେ ହୟେଛିଲ ପ୍ରମତ୍ତା ଯେନ ମୁର୍ତ୍ତି ଧରେଛେ,  
ତାଇ ସେ ଏକା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୟେଛେ ସଂଗ୍ରାମେର ।  
ଦେଖଲାମ, ଆପନି ଅଶ୍ଵ-ବଞ୍ଚା ଘୁରିଯେ ନିଯେ  
ସରାସରି ମୁଖ କରେଛେ ଇରାନ-ବାହିନୀର ଦିକେ ।  
ଜବାବେ ସୋହରାବ ବଲଲେନ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀର  
ଏକଜନ ବୀରକେଓ ନଟ ନା କରେ  
ଆମି ଇରାନୀୟଦେର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ହତ କରେଛି,  
ଭୂମିକେ ରକ୍ତେର ସଂମିଶ୍ରଣେ ପରିଣତ କରେଛି କାଦାୟ ।

জেনে রাখুন সিংহও যদি আমার সম্মুখীন হতো,  
তবুও সে আমার প্রহরণের আঘাত সহ্য করে  
মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না।

সিংহ, ব্যক্তি ও নেকড়ে কারো সাধ্য নেই  
আমার তীরের বারিধারায় তিষ্ঠিতে পারে।  
আগামী কাল হবে এক মহৎ দিন,  
সেই মহৎ ব্যক্তি আবার আমার সম্মুখীন হবেন।  
বিশ্বের সুষ্ঠা প্রভুর নাম নিয়ে বলছি,  
কাল একজন বীরকেও আর ধরাপঢ়ে জীবিত রাখবো না।  
এখন খাদ্য ও সুরার ব্যবস্থা করুন,  
মন থেকে নিবারিত করবো দুঃখ ও ঝুঁতি।

ওদিকে রুপ্তম তাঁর সৈন্যদলে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে  
গেওকে জিজ্ঞাসা করলেন,  
সংগ্রামী সোহৃদাবের সঙ্গে আজ কেমন যুদ্ধ হলো ?  
জবাবে গেও বললেন, এমন বীর আমরা আর দেখিনি।  
তীব্র গতিতে সে যখন আমাদের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হলো,  
তখন তস তাকে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন।  
অশু-পৃষ্ঠ থেকে সে বর্ণা উদ্যত করে এগিয়ে আসতেই  
গুরগীন অশুরাচ্ছ হয়ে তার মোকাবেলা করলেন।  
কিন্তু সে এই দশ্য দেখে প্রমত্ত সিংহের মতো লম্ফ প্রদান করলো  
এবং চক্ষের নিমেষে গুরগীনের মস্তক লক্ষ্য করে প্রহরণের আঘাত হানলো।  
সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো গুরগীনের লোহ শিরস্ত্রাণ।  
বহু বীর তার সম্মুখীন হলেন,  
কিন্তু সবাই তার প্রতাপ সহ্য করতে অপারগ হলেন।  
একমাত্র রুপ্তম ব্যক্তিরেকে আর কেউ তার সমকক্ষ নয়।  
আমরা প্রাচীন যুদ্ধ-বীতির অনুসরণে  
সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষার আয়োজন করলাম।  
একা তার সম্মুখীন হওয়ার বাঁকি না নিয়ে  
রণক্ষেত্র তারই জন্য ছেড়ে দিলাম।  
একা কোন বীরই তার সম্মুখীন হলেন না,  
সে আমাদের সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ ও বাম প্রান্তে  
অবলীলায় বিচরণ করতে লাগলো।

সে তার গতিমান অশ্বে সওয়ার হয়ে  
সগজনে দলিল করে চললো সারা রণক্ষেত্র।  
রুক্ষম গেওর কথা শুনে ব্যথিতচিত্তে  
কায়কাউসের দিকে মুখ করলেন।  
কায়কাউস মহাবীরকে আসতে দেখে  
স্বীয় সিংহাসনের পাশে তাঁকে আসন দান করলেন।  
রুক্ষম প্রথমেই সোহৃদাবের  
বীরত্ব-ব্যঙ্গক চেহারার বর্ণনা দিয়ে বললেন,  
কোন বালকের মধ্যে এমন সিংহ-পুরুষ  
দুনিয়া আর কোন দিন প্রত্যক্ষ করেনি।  
উচ্চতাম্ব সে নক্ষত্রালোক স্পর্শ করে আছে,  
তার দেহের ভার বহন করতে অপারগ হচ্ছে ধরিত্রী।  
তার দুই বাহু ও জ্বর অশ্বের জ্বরার অনুরূপ,  
তাদের শুলভ অনুপম।

তরবারি, তীর, প্রহরণ ও পাশ  
সকল রকম অস্ত্র দ্বারাই আমি তাকে পরীক্ষা করেছি;  
কিন্তু তার পরিণাম সেই এক ; এর আগে  
কত বীরকে আমি পাতিত করেছি তাদের অশ্বাসন থেকে ;  
কিন্তু যখন তাকে আমি আকর্ষণ করেছি তার কটিবচ্ছ ধরে  
এবং প্রয়োগ করেছি আমার সর্বাধিক শক্তি,  
যাতে আমি তুলে নিতে পারি তাকে তার আসন থেকে  
এবং অন্য যে কোন প্রতিপক্ষের মতো পাতিত করতে পারি ভূমিতে, —  
তখনও দেখেছি সেই বীর অটল পর্বতের মতো  
স্থির রয়েছে তার ঘোড়ার পিঠে।

তখন এই বলে বাধ্য হয়ে প্রত্যাগত হয়েছি যে,  
আজ আর সময় নেই, রাত্রি সমাগত হয়েছে, অঙ্ককারে ছেয়ে গেছে সর্বদিক।  
আগামীকাল ভোরবেলায় আবার আমরা রণক্ষেত্রে মিলিত হবো,  
ও মল্লযুদ্ধে পরীক্ষা করবো নিজেদের শক্তি।

হে সম্রাট, আগামী প্রভাতে মল্লযুদ্ধে আবার আমরা মিলিত হচ্ছি;  
জানি না, বিশ্ব-প্রভুর কি ইচ্ছা ?  
সেই মল্লযুদ্ধেই চন্দ্র-সূর্যের প্রভু  
আমাদের জন্য বিজয় নির্ধারিত করবেন।  
কায়কাউস বললেন, পবিত্র প্রভু ঈর্ষাকামীদের দেহ ছিন ভিন্ন করুন।

আজ্জ সারা রাত আমি জগৎ-পিতার সমীপে  
মৃত্তিকায় ললাট রেখে প্রার্থনা করবো,  
তিনি যেন আপনাকে দান করেন তাঁর থেকে সাহায্য,  
যাতে আপনি এই অমঙ্গলকামী বিপ্রাণ্ত তুর্কীকে পরাণ্ত করতে পারেন।  
তিনি যেন আপনার বিশুক্ষ অস্তরকে দান করেন সজীবতা,  
আপনার যশকে সূর্যালোক পর্যন্ত উন্নীত করেন।

রুস্তম বললেন, সন্মাটের সৌভাগ্য  
এই মঙ্গল কামনাকে সার্থক করুক।  
এই বলে ব্যথিত ও নীরব সভাকক্ষ ছেড়ে  
রুস্তম উঠে দাঁড়ালেন।  
এইবার তাঁর গতি হলো স্বীয় সৈন্যবাহিনীর দিকে,  
শক্ত-নিধন চিন্তায় চিন্তিত হয়ে তিনি নিজ শিবিরের  
দিকে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।

জওয়ারা মহাবীরকে আগু বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে এলেন,  
বীরবরের আজ কি হলো? — সেই চিন্তায় তাঁর মন ব্যথিত।  
রুস্তম প্রথমেই ভায়ের কাছে চাইলেন খাদ্য,  
তারপর একটু আশুস্ত হয়ে সোহৃদাবের সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে  
সব তাঁকে আদ্যোপাস্ত বর্ণনা করলেন।  
তারপর ভাইকে সম্বোধন করে বললেন,  
উন্তেজিত না হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করো।  
কাল উষাকালে যখন আমি  
সেই সংগ্রাম-কামী তুর্কীর সঙ্গে লড়াই করতে যাব  
তখন তুমি আমার বর্ষ ও পতাকা,  
আমার সিংহাসন ও স্বর্ণ-পাদুকা নিয়ে এসো।  
এবং উজ্জ্বল সূর্য উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত  
শিবিরের সামনে পাহারারত থেকো।  
যদি আমি জয়ী হই, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি বিলম্ব করবো না।  
আর যদি অন্যরূপ কথা শুনতে পাও  
তবে আশাহত হয়ে রোদন করো না।  
একথা মেনে নিয়ো যে, রুস্তমের দিন শেষ হয়েছে।  
মনে করো যে, পবিত্র-বিশু-প্রভুর নির্দেশেই  
এক তরুণের হাতে সে নিহত হলো।  
তখন একাকী যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে

মুক্ত লিপ্তি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না ।  
সোজা জ্বালন্তানের দিকে মুখ করে  
পিতা জ্বালের সমীপে গমন করো ।  
আর ভাগ্যবতী মাতাকে বলো যে,  
আল্লাহ এই ভাগ্যই আমার জন্য নির্ধারিত করেছিলেন ।  
বলো, যা যেন আমার জন্য বিলাপ না করেন,  
প্রাণ তো আমার চিরঙ্গীব ছিল না ।  
দুনিয়ায় কোন মানুষই চিরকাল বেঁচে থাকে না,  
আকাশ নিয়মিতভাবে সবারই মাথার উপর আবর্তিত হয় ।  
আমার হাতে হত হয়েছে কত দৈত্য, সিংহ এবং নকু,  
কত প্রাচীর ও দুর্গ-প্রাকার আমি অবনমিত করেছি,  
আমাকে পরাভূত করতে কেউ পারেনি ।  
কিন্তু মৃত্যুর দ্বার কে জয় করতে পারে ?  
জীবনের অশুকে সেই দ্বার-পথে প্রবিষ্ট হতেই হবে ।  
সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হলেও,  
পথ এই থাকবে — জীবনের রীতিও থাকবে এই ।  
ভেবে দেখো, সম্মুত সম্মাট জামশেদের কথা,  
ভেবে দেখো, দৈত্য-বন্ধনকারী তহমুরসের কথা ; —  
দুনিয়ায় তাঁদের মতো বাদশা ছিল না,  
কিন্তু পরিণামে তাঁদেরকেও যেতে হয়েছিল ।  
পৌরুষের দিক থেকে গারাসাসপের অনুরূপ বাদশা ছিল না,  
তবুও আবর্তমান আকাশ তাঁর সিংহাসনকেও ঘর্ষণে ক্ষয় করেছে ।  
উন্নতশির নুরীমান ও সাম  
বীরত্বে এই দুনিয়ায় যাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না,  
তাঁরাও দুনিয়ায় বেঁচে থাকেন নি, আমাকেও তেমনি যেতে হবে ।  
তুমি মহামতি জ্বালকে বলো তিনি যেন বিশ্ব-পতির বিধানে সম্মত থাকেন,  
কোন অবস্থায়ই যেন সেই নির্দেশের প্রতি বিমুখ না হন ।  
মূবক-বৃক্ষ সবাই জীবনকে ভালোবাসে,  
কিন্তু তাই বলে কেউ চিরঙ্গীব হতে পারে না ।  
এইভাবে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত রুস্তম অনেক কথা বললেন ;  
এবং বাকি অর্ধরাত্রি সম্পূর্ণ করলেন নিদ্রার হাতে ।

## সোহরাবকে রুশ্মের ভূপাতিত করা

সূর্য তার উজ্জ্বল পাখা বিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে  
আকাশে উজ্জীয়মান হলো কালো কাক ।  
রুশ্ম তাঁর ব্যৱধূখাক্ষিত শিরস্তাগ পরে  
আজদাহারপী অশ্বে সমাসীন হলেন ।  
সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দুই ফরসংগ ব্যবধান রেখে  
একাই তিনি প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্য ।  
এবং পূর্ব নির্ধারিত সেই রণক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন ।

ওদিকে সোহরাব দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত  
আসরে সুরাপানে ও নারী কঠের সঙ্গীতে মগ্ন থেকে  
হ্মানকে সম্বোধন করে বললেন,  
হে বীর বলুন সেই সিংহ-পুরুষ কে যাঁর সঙ্গে আমার যুদ্ধ হলো ?  
তিনি সমন্বিতভাবে শক্তিতে আমার চেয়ে কম নন,  
তিনি সংগ্রামে বোথ করেন বা এতটুকু ক্লান্তি ।  
তাঁর স্ফুঙ্গদেশ ও অঙ্গ-বিন্যাস আমারই মতো,  
বলুন তিনি কে ? জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যবধানের সঠিক পরিমাপ করতে পারেন ।  
তাঁর চলন ও ভঙ্গিমা আমার ভঙ্গি ও প্রীতি আকর্ষণ করে,  
তাঁর গতিমাত্র আমার সর্বদেহে আনয়ন করে লজ্জা ও সঙ্কোচ ।  
মায়ের বর্ণিত চিহ্নসমূহ আমি তাঁর মধ্যে দেখতে পাই,  
আমার হৃদয়ের একাংশ স্বতঃস্ফূর্তিতায় ব্যাকুল হয়ে উঠে ।  
আমার অনুমান আমাকে বলছে, তিনিই রুশ্ম,  
কারণ তাঁর মতো বীর দুনিয়াতে খুব কমই হয় ।  
পিতার সঙ্গে যেন আমার যুদ্ধ না হয়ে যায়,  
তেমন হলে দৃঢ়খ ও অনুতাপের আর অবধি থাকবে না ।  
তাহলে আমার প্রত্বুর সামনে আমি লজ্জিত হবো,  
এবং কালো মুখ নিয়ে আমাকে বিচরণ করতে হবে ধরণী-তলে ।  
রাজ-রাজড়াদের সামনে আমার মুখ কলাক্ষিত হবে,  
ইরান ও তূরানের সৈন্যদের সামনে আমি হবো হতমান ।  
আমার দুর্নাম ছাড়া তখন আর কিছুই কীর্তিত হবে না,  
ইহ-পরকালে কোথাও আমি সফলকাম হতে পারব না ।  
পরকালের সকল আশা ও আমার মাটি হয়ে যাবে,

সুতরাং পিতার সঙ্গে যেন আমার যুদ্ধ না হয়।  
তেমন কোন যুদ্ধ যদি অজানিতেও সংঘটিত হয়  
তবে সেই রক্তপাত অমঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করবে না।  
জবাবে হ্মান বললেন, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে  
কয়েকবার আমি রুস্তমকে দেখেছি।  
আপনি নিশ্চয় শুনেছেন মাজিন্দিরানের যুদ্ধে  
রুস্তম তাঁর প্রহরণ দ্বারা কী কীর্তি সংঘটিত করেছিলেন।  
বর্তমান বীরের অশু রাখ্শের মতো দেখতে হলেও  
রাখ্শের দুরস্ত বীর্য তার মধ্যে নেই।  
এইরূপ কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে রাত্রির এক প্রহর বিগত হলে  
প্রাত্তরে পাহারাদারের প্রহর ঘোষণা শোনা গেলো।  
মহাবীর সোহ্যাব যুদ্ধের উন্মাদনায় মন্তিক্ষ পূর্ণ করে  
আসর থেকে উঠে গেলেন শয়নকক্ষের দিকে।

শেষ রাত্রিতে পূর্ব দিকে উষার ক্ষণিগালোক প্রকাশ পেতেই  
যুদ্ধকামীদের নেতা নিদ্রা থেকে উঠিত হলেন।  
সোহৃদাব তাঁর বর্ষ পরে প্রস্তুত হলেন যুদ্ধের জন্য  
কিন্তু তাঁর মনে লেগে রইলো আসরের মধুরিমা।  
যথাসময়ে তিনি হাতে গোমুখাক্ষিত প্রহরণ নিয়ে  
যুদ্ধক্ষেত্রে এসে অবতীর্ণ হলেন।  
রুশমকে দেখেই সোহৃদাব মদুহাস্যে জিঙ্গাসা করলেন,—  
মনে হলো তাঁরা যেন সম্প্রীতির সঙ্গে বিগত রাত্রি একত্রে  
যাপন করে এসেছেন—  
রাত্রি জ্ঞান ছিল, তেমনি স্বাভাবিকভাবে দিনের উদয় হয়েছে,  
কেন তবে আমরা যুদ্ধে মেতে উঠবো ?  
পরিত্যাগ করুন ধনুংশুর ও জিঘাঃসা-মত্ত তরবারি,  
অকরুণ বীণা ছুড়ে মারুন কঠিন মৃত্তিকায়।  
চলুন, নিরস্ত্র হয়ে আমরা উপবেশন করি,  
ও সুরাপানে বিশুষ্ক অস্তরে দান করি সঙ্গীবত্তা।  
চলুন বিশু-প্রভূর সামনে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই,  
ও সংগ্রাম থেকে লজ্জিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করি শাস্তির দিকে।  
আন্দেরা যদি চায় তবে করুক তারা যুদ্ধ,  
কিন্তু আমরা স্থিত থাকবো সম্প্রীতির মধ্যে।

আমার মন আপনার প্রতি-প্রীতি-পরবশ হয়ে উঠেছে,  
আমার দুচোখ ছেয়ে নামছে লজ্জা।  
আপনি কোন্ বীরেন্দ্রবন্দের বৎসর  
অবশ্য করে তা আমার কাছে প্রকাশ করুন।  
আপনার নাম জানতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি,  
কিন্তু কেউ আমাকে তা বললেন না, আপনি বলুন।  
আমার সঙ্গে যখন যুদ্ধ করতে নেমেছেন  
তখন আপনার নাম আমার কাছে বলা আপনার উচিত।  
কিন্তু এই কথা শুনে সাম-পৌত্র বিশু-বিখ্যাত জাবুলবাসী ক্লন্তম  
সোহৃবকে বললেন, হে নামের প্রত্যাশী, আমি উঠলাম,\*  
এমন কথোপকথন আর এতটুকু করতেও আমি রাজি নই।  
মল্লযুক্তে মিলিত হওয়ার কথা ছিল কাল,  
কাজেই বিরত হও প্রবঞ্চনা থেকে, তোমার প্রতারণা আমি গ্রহণ করবো না।  
তুমি যুবক হতে পারো কিন্তু আমি বালক নই,  
মল্লযুক্তের জন্য আমি প্রস্তুত।  
চল, পরিগামের জন্য আমরা চেষ্টা করে যাই,  
কারণ, এই হলো বিশু-কর্তার নির্দেশ ও ইচ্ছা।  
সত্যিকারের পুরুষ যারা তারা যুদ্ধক্ষেত্রে  
সংগ্রাম ছাড়া আর কোন কিছুই চিন্তা করে না।  
জীবনে বহু উচু-নিচুতে আমার যাত্রা অব্যাহত রয়েছে,  
আমি প্রতারণা কিংবা লোভে বশীভূত হওয়ার মতো লোক নই।  
এই কথা শুনে সোহৃবার বললেন, হে বয়োবৃন্দ,  
আমার আবেদন আপনার মনঃপুত্র হলো না ?  
আমার বাসনা ছিল, আপনার শয়ন-শয্যাতেই  
আপনার প্রাণবায়ু বক্ষবাস ছেড়ে নির্গত হোক ;  
এবং আপনার কোন আপনজন সমাধি তৈরি করে  
আপনার প্রাণহীন দেহকে সেখানে স্থাপন করুক।  
কিন্তু আপনার মৃত্যু যদি আমার হাতেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে  
তবে বিশু-প্রভুর ইচ্ছায় সেই প্রাণ এখনই আমি হরণ করছি।

---

মূল আছে ক্লন্তম অর্থাৎ আমি উঠলাম। মূল যদি ক্লন্তম থাকতো তবে অর্থ হতো  
আমিই ক্লন্তম। কবি এখানে ক্লন্তমের মুখ দিয়ে ক্লন্তম নামটি উচালিত করিয়েছেন বটে তবে  
তার অর্থ — ‘আমি উঠলাম’। তুলনায় ‘অশুধামা হত ইতি গজ’ — মহাভারত।

এই বলে দুই বীর স্থীয় অশু থেকে বীরদর্পে অবতরণ করে  
ও ঘোড়াগুলিকে পাথরের সঙ্গে বেঁধে রেখে  
ব্যথিত চিন্তে পরম্পরের দিকে অগ্রসর হলেন।

তারপর তাঁরা দুই সিংহের মতো পরম্পরাকে জাপটে ধরে  
বুকের রঞ্জ ঝরাতে লাগলেন।

উষার প্রদোষান্ধকার থেকে সূর্যের উদয়কাল পর্যন্ত  
এইভাবে তাঁরা একে অন্যের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করে চললেন।

অবশেষে সোহরাব মন্ত্র হস্তীর মতো  
আস্ফালনকারী সিংহের উপর হানলেন আঘাত।

এবং রুস্তমের কটিবন্ধ ধরে এমন ভাবে আকর্ষণ করলেন যে,  
মনে হলো, সেই শক্তিতে ভূমি বিদীর্ণ হবে।

তারপর ক্রোধ ও জিঘাংসা-দৃপ্তি এক রণনাদের সঙ্গে সঙ্গে  
সোহরাব রুস্তমকে ভূমি পরে আছড়ে মারলেন।

প্রমত্ত হস্তীর সেই অমোঘ আকর্ষণে  
স্থানচ্যুত হয়ে রুস্তম মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সোহরাব চড়ে বসলেন রুস্তমের বুকের উপর,  
রুস্তমের হাত মুখ ও কেশরাজি ধূলায় ধূসরিত হলো।

ঠিক যেন বন্য গর্দভকে ধরাশায়ী করে  
তার বুকের উপর চড়ে বসেছে সিংহ।

সোহরাব কোমর থেকে তীক্ষ্ণধার খঙ্গের টেনে নিয়ে  
ভূপাতিত প্রতিদৃন্দীর শির দেহ থেকে বিছিন্ন করবার জন্য উদ্যত হলেন।

রুস্তম এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সোচারে বললেন,  
রহস্য উন্মোচিত করতে হচ্ছে;

হে বীর, তুমি সিংহ আবদ্ধকারী,  
তুমি পাশধারী, প্রহরণ ও তরবারির অধিকারী !

অবধান করো, আমাদের রীতি অন্যরূপ, —

আমাদের ধর্মের বিধান বিলক্ষণ।

মল্লযুদ্ধে যদি কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধরাশায়ী হন,  
তবে দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরাশায়ী করতে পারলেই

তাঁর শিরশেদ বিধিবন্ধ হয়, —

এই—ই আমাদের ধর্মের বিধান।

এই কথা বলে রুস্তম নক্ররূপী বীরের হাত থেকে রক্ষা পালেন।

তরুণ বীর বয়োবৃক্ষের কথায় তাঁকে দান করলেন শির

স্থীয় বীরত্ব, কালের তাগিদ ও নিজের তারুণ্য  
এই তিনি বস্তুর সমবায়ে সোহৃদাব প্রতিপক্ষকে মুক্তি দিয়ে  
উচ্ছ্বলিত হরিণে পরিপূর্ণ এক প্রাস্তরে এসে উপস্থিত হলেন।  
সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্যাপ্ত রাইলেন মৃগয়ায়,  
কে তাঁর সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল,

সে কথা তাঁর মনেই রাইলো না।

এইভাবে অনেক বিলম্ব করে তিনি হুমানের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন  
হুমান তাঁকে যুদ্ধের বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন।  
জবাবে সোহৃদাব তাঁর মৃগয়ার কথা  
ও রুস্তমের সঙ্গে যা ঘটেছিল সব বললেন।  
শোনা মাত্র হুমান চিংকার করে বলে উঠলেন,  
হে তরুণ আপনি একি করলেন ?

তাকে আপনি প্রাণে বাঁচতে দিলেন ?  
আপনার এই সামর্থ্য ও সমুদ্রতি  
আপনার শক্তি, সাহস সব যে ব্যর্থ হয়ে গেলো !  
নেকড়েকে আপনি জালে আবদ্ধ করেও  
মুক্ত করে দিলেন ? ভালো ! করেন নি।  
আপনার এই ক্রতৃকর্মের জন্যে  
না জানি এই যুদ্ধে আমাদের কত দুর্ভোগ পোহাতে হয়।  
এক কিংবদন্তীতে আছে, এক বাদশা উপদেশছিলে বলেছিলেন,  
শক্তকে কখনো তুচ্ছ ঝান করো না।  
এই কথা বলে হুমান স্থীয় বক্ষে হাত দিয়ে  
অত্যন্ত বিমর্শ হয়ে পড়লেন।  
সোহৃদাব তাঁকে সাহস ও সাত্ত্বনা দিয়ে বললেন,  
মন থেকে দুঃখ বিদূরিত করুন।  
কাল যখন সেই বীর আমার সঙ্গে লড়তে আসবে  
তখন আপনি তাঁর গ্রীবাদেশ পাশ-রজ্জুতে আবদ্ধ দেখতে পাবেন।  
এইবাবে সোহৃদাব স্থীয় সৈন্যবাহিনীর দিকে চেয়ে দেখলেন,  
তাঁরাও তাঁর ক্রতৃকর্মে দৃঢ়ু খিত ও উত্তেজিত।

ওদিকে রুস্তম প্রতিপক্ষের হাত থেকে রেহাই পেয়ে  
নিজেকে ইস্পাতের পাহাড়ের মতো ভারী বোধ করলেন।  
ধীরে ধীরে তিনি অদূরবর্তী এক বহতা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন,

তিনি এখন এক প্রাণহীন চলমান বস্তু বিশেষ।  
প্রথমে তিনি নদীর পানিতে পিপাসা নিবৃত্তি করে  
ও হাত মুখ ধূয়ে বিশ্ব-প্রভুর সমীপবর্তী হলেন।  
তারপর মনুষ্ঠরে সর্ব অভাবহীন বিশ্ব-প্রভুর কাছে  
নিবেদন করলেন স্বীয় প্রার্থনা।

তাঁর কাছে এমন বিজয় ও সাহায্য প্রার্থনা করলেন  
দান হিসাবে চন্দ্ৰ সূর্যেরও যা অজানা।  
কাল তাঁর উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়  
ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল তাঁর মুকুট;  
কিন্তু আমরা শুনেছি, রুষ্টম এই সময়  
প্রতিপালকের নিকট থেকে এমন বীর্য লাভ করলেন যে,  
কাল তাঁর হাতে পরাভূত হয়ে  
স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

রুষ্টম সৃষ্টিকর্তার সমীপে রোদন করতে করতে এই প্রার্থনা জানালেন,  
হে প্রভু, তুচ্ছ ধূলিকণা তোমারই শক্তিতে উজ্জীয়মান,  
ক্ষুদ্র হরিণশিশু তোমারই সহায়তায় উচ্ছুল।  
প্রভু হে তোমার ইচ্ছা থাকলে যে কেউ  
শক্তিতে ও সাফল্যে পর্বততুল্য হতে পারে।  
এইভাবে প্রার্থনা করার পর  
রুষ্টমের মন থেকে সোহৃদাবের ভয় বিদূরিত হলো।  
তিনি যখন আবার রোদন করে বললেন, হে প্রভু,  
তুমি তোমার এই দাসের প্রতি দৃষ্টি দাও।  
তুমি আমাকে দান কর সেই শক্তি  
যার ফলে আমি আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পারি।  
এহেন প্রার্থনার পর সহসা রুষ্টম বুঝতে পারলেন,  
তাঁর মধ্যে যে-শক্তি ও সাহসের ন্যূনতা ছিল তা যেন পূর্ণ হয়ে গেছে।  
প্রার্থনা সমাপনাত্তে পানাহার করে  
মহাবীর রণক্ষেত্রের দিকে মুখ করলেন।  
এমন সময় সোহৃদাব অশৃপ্তে প্রমত হস্তীর মতো  
বাহুতে পাশ ও হাতে ধনুংশের ধরে অগ্রসর হলেন।  
রুষ্টম দূর থেকে সোহৃদাবকে আসতে দেখে  
অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।  
ব্যথিত অস্তঃকরণে তিনি এই দৃশ্য দেখে

প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না  
সোহৃদাব নিকটবর্তী হলে রুস্তম দেখতে পেলেন যে,  
তারুণ্যের হাওয়ায় তাঁর হাদয় স্ফূরিত হচ্ছে।  
আরো নিকটে এসে সোহৃদাব রুস্তমের  
বীরত্ব-ব্যঙ্গক মুর্তি অবলোকন করে বললেন,  
হে, সিংহের হাত থেকে মুক্তি প্রাপ্তবীর,  
আবার কেন আপনি আমার বীরত্বের সম্মুখীন হচ্ছেন ?  
কেন আবার আমার সামনে ফিরে এসেছেন বলুন,  
সোজা পথ কি আপনার নজরে পড়েনি ?  
আপনি কি ভাবছেন, দ্বিতীয়বার আপনাকে আমি ছেড়ে দিব ?  
আপনার বার্ধক্যের উপর আবার আমি করুণা করবো ?  
রুস্তম জবাবে বললেন, হে যশস্বী শক্রজিৎ !  
পরিণত পুরুষ এমন বাক্য উচ্চারণ করেন না,  
তোমার তারুণ্য তোমাকে এক ক্ষণদীপ্তি দান করেছে।  
তুমি এখনি দেখতে পাবে, বৃক্ষ বীর কেমন করে  
পুরুষ-সিংহের সম্মুখীন হয় !

## ରୁଷମେର ହାତେ ସୋହରାବେର ନିଧନ

ଦ୍ଵିତୀୟବାରେର ମତୋ ବୀରଦୂୟ ଅଶ୍ଵଗୁଲିକେ ଶକ୍ତ କରେ ବାଁଧଲେନ,  
ତାଁଦେର ମାଥାର ଉପର ଚକ୍ର ଦିଯେ ଫିରିତେ ଲାଗଲୋ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ।  
ଯେଥାନେଇ କ୍ରୋଧ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟକେ ଆନୟନ କରେ  
ସେଥାନେଇ କଠିନ ପାଷାଣ ବିଗଲିତ ହୟ ମୋମେର ମତୋ ।  
ବୀରଦୂୟ ପରମ୍ପରକେ ମଳ୍ଲୁକୁଙ୍କେ ଆବନ୍ଧ କରେ  
ଏକେ ଅନ୍ୟେର କଟିବନ୍ଧ ଟେନେ ଧରଲେନ ।  
ସୋହରାବ ଓ ଶକ୍ତିମାନ ରୁଷମେର ବଳ ପ୍ରଯୋଗେ  
ସ୍ଵୟଂ ଆକାଶେର ଦମ ବନ୍ଧ ହୁଯାର ଉପକ୍ରମ ହଲୋ ।  
ଏବାର ରୁଷମ ତାଁ ପାଞ୍ଜା ବିଷାର କରେ  
ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟି ବୀରେର ଚାଲ ଧରେ ଆକର୍ଷଣ କରଲେନ ।  
ଆକର୍ଷଣେର ଶକ୍ତିତେ ତରଣ ବୀରେର ପଢ୍ଟଦେଶ ବାଁକା ହୟେ ଏଲୋ,  
ଯେନ ଅସହାୟ ଭାବେ ସଙ୍କୁଳିତ ହଲୋ ଦୀର୍ଘାୟତ କାଳ ।  
ରୁଷମ ତଥା ସିଂହରେ ଶକ୍ତିତେ ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟିକେ ମାଟିତେ ଆଛଡ଼େ ମାରଲେନ,  
ଏବଂ ଦେଖଲେନ, ଏମନଭାବେ ନିଚେ ତାକେ ବୈଶିକ୍ଷଣ ଧରେ ରାଖା ଯାବେ ନା,  
ତାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟିଦେଶ ଥିକେ ତୀଙ୍କୁଧାର ତରବାରି ଟେନେ ନିଯେ  
ଯଥାଶ୍ରୀସ୍ତ ତରଣ ପୁତ୍ରେର ବନ୍ଧ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦିଲେନ ।  
ଏବଂ ବଲଲେନ, ତୁମି ଶୋଣିତେର ଜନ୍ୟ ତ୍ରଣାର୍ତ୍ତ ଛିଲେ,  
ନାଓ, ଏଥିନ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଖଞ୍ଜରେର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୟେ ତା' ପାନ କରୋ ।  
କାଳ ଛିଲ ତୋମାର ରତ୍ନେର ପିଯାସୀ,  
ତୀଙ୍କ ଖଞ୍ଜର ତୋମାର ଦେହେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୟେ ତାର ବ୍ୟବହା କରଲୋ ।  
ସୋହରାବ ଶରୀରଟାକେ ମୋଢ଼ ଦିଯେ ଆକ୍ଷେପସୂଚକ ଧବନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରଲେନ,  
ସବ ଯଙ୍ଗଲାମଙ୍ଗଲେର ଓ ଦ୍ଵିଧା-ଦୂନ୍ଦ୍ରେର ଆଜ ଅନ୍ତ ହୟେ ଗେଲୋ ।  
ତିନି ବଲଲେନ, ଏହି ଦୂର୍ଘଟିନା ଆମାରଇ ହାତ ଥିକେ  
ଆମାର ଉପର ଆପତିତ ହଲୋ,  
ଆମିହି ତୋମାର ହାତେ ତୁଲେ ଦିଯେଛିଲାମ କାଲେର ଚାବିକାଠି ।  
ତୁମି ଆମାକେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଭାବେ ଉବୁ ଅବସ୍ଥାୟ  
ଏମନ ବ୍ୟନ୍ତତାର ସଙ୍ଗେ ହତ୍ୟା କରଲେ ।  
ଆମାର ଧେଲାର ସାଥୀରା ଏକଦିନ ଆମାକେ ବଲେଛିଲ,

---

ମଳ୍ଲୁକୁଙ୍କେର ନିଯମାନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷକେ ତିଥ କରେ ମାଟିତେ ଫେଲାନେ ହୟ ।

এই সুঠাম দেহ একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।  
মা আমাকে পিতার অনুক্তি বাংলে দিয়েছিলেন,  
প্রীতির আকর্ষণই আমার জীবনান্ত ঘটলো।

তাঁকে আমি কত খুঁজেছি, কিন্তু তাঁর দেখা পেলাম না,  
আহা, সেই কামনা অন্তরে নিয়েই বিদায় হচ্ছি।

হায়, আমার অন্ত্রশেণের বেদনা তার পরিগাম দেখতে পেলো না,  
পিতার মুখ সন্দৰ্শন আর ঘটলো না আমার ভাগ্যে।

তুমি যদি নদীতে ঘৎস্য হয়ে কিংবা রাত্রির বুকে অঙ্ককার হয়েও লুকাও,  
কিংবা প্রয়াণ করো সুদূর নক্ষত্রলোকে,  
কিংবা সূর্যমণ্ডলে অন্তর্ধান করো,

তবু আমার পিতা তোমার থেকে গ্রহণ করবেন আমার প্রতিশোধ  
যে-আমাকে তুমি প্রস্তুর-সিথানে শায়িত করেছ।

যশষ্মী সেনাপতিদের মধ্যে কেউ  
রুস্তমের কাছে এই সংবাদ নিয়ে যাবে যে,  
সোহৱাব তোমারই দর্শনের আশায় প্রতীক্ষা করে করে  
নির্মত্বাবে হত হয়ে গেছে।

এই কথা শোনামাত্র রুস্তমের মাথা ঘুরে গেলো,  
তাঁর চোখের সামনে অঙ্ককার হয়ে এলো ধরিত্বী।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সকল তেজবীর্য ও শক্তি কোথায় অন্তর্ধান করলো,  
মাথা ঘুরে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

তারপর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সরবে রোদন করে জিজ্ঞাসা করলেন,  
বলো, রুস্তমের কোন নিশানা কি তোমার কাছে আছে ?

কি করে তার নাম হারিয়ে গেলো তুরানী সেনাপতিদের স্মৃতি থেকে ?  
কারণ, আমিই রুস্তম, এই নামের তিরোধানেই সাম-পুত্র রোদন করবেন,  
এই বলেই তিনি চিংকার করে স্বীয় কেশরাজি টেনে ছিড়তে লাগলেন।

সোহৱাব রুস্তমকে এবংবিধ অপ্রকৃতিশ্চ অবস্থায় দেখে বললেন,  
যদি আপনিই রুস্তম তবে আগে কেন তা ব্যক্ত করলেন না।

কত না ভাবে আপনাকে আমি  
জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনার পরিচয় !

তবে এখন উন্মোচিত করুন আমার বর্ম,  
এবং অবলোকন করুন আমার নিরাবরণ ঘোর তনু।

আমার বাহ্যে নিজেরই মোহর প্রত্যক্ষ করে বিবেচনা করুন,  
পুত্র পিতার কাছে কি প্রত্যাশা করেছিল ?

আমার প্রাসাদে যখন বেজে উঠেছিল যাত্রারঙ্গসূচক দুন্দুভি,  
তখন মা আমার সজল চক্ষে বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর থেকে।

আমার বিদায়ে বিদীর্ণ হচ্ছিল তাঁর অন্তর —

তিনি আমার বাহুতে পরিয়ে দিয়েছিলেন এই কবচ।

এবং বলেছিলেন, এটি তোমার পিতার স্মারক,

একে সঙ্গে রেখো, এটি তোমার কাজে লাগবে।

শেষ বারের মতো তা কাজে লাগলো বটে,

পুত্র পিতার সামনে রক্ষা পেলো অপমান থেকে !

রুস্তম বর্ম খুলে দেখতে পেলেন সেই কবচ,

মনোদৃঢ়ে ছিন্ন করলেন তিনি স্থীয় বক্ষবাস।

এবং বললেন, হে সর্বত্র-প্রশংসিত বীর পুত্র আমার,

আমারই হস্তে হত হলে তুমি !

এই বলে তিনি স্থীয় গাত্রচর্ম নথে দীর্ঘ করতে ও কেশরাঙ্গি  
টেনে ছিড়তে লাগলেন,

তাঁর দুচোখে বয়ে চললো অশ্রুর ধারা।

সোহৃদাব বললেন, এমন করা ভালো নয়,

এমনভাবে রোদন করা অনুচিত।

নিজেকে আহত করে এখন কি লাভ ?

জীবন তো এমনই বিস্ময়ে পরিপূর্ণ !

সূর্য তখন মধ্যাহ্ন-রেখা অতিক্রম করেছে,

কিন্তু রুস্তম এখনও ফিরে আসছেন না তাঁর সৈন্যবাহিনীতে।

রণক্ষেত্রে কি ঘটলো তা জানবার জন্যে

বিশজন সেনানী বহিগতি হলেন।

তাঁরা দেখলেন দুটি অশু শুধু দাঢ়িয়ে আছে,

আর রুস্তম ভুলুষ্টি হয়ে পড়ে আছেন অন্যএ।

রুস্তমকে অশু-পৃষ্ঠে দেখতে না পেয়ে

সেনানিগণ ভাবলেন যে, মহাবীর হত হয়েছেন।

তাঁরা সন্ধর কায়কাউসকে এসে খবর দিলেন,

সম্রাটের সিংহাসন আজ থেকে রুস্তম-শূন্য হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে সারা সৈন্যবাহিনীতে কোলাহল উঞ্চিত হলো,

সহসা কালের ধারায় উচ্ছ্বসিত হলো উর্মি।

কায়কাউসের আদেশে নিনাদিত হলো রণ-দুন্দুভি,

প্রস্তুত হয়ে এলেন সেনাপতি তুস।

তারপর সম্মাট-সৈন্যদের সম্বোধন করে বললেন,

এখন থেকেই তোমারা মুখ করো যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে,

উত্তেজিত করো তোমাদের অশু, দেখি কে এই সোহৃবাব ?

দেখি কে সে, যে উথিত করেছে ইরান-ভূমিতে রোদনের ধ্বনি ?

মহাবীর রুস্তম যদি হত হয়ে থাকেন

তবে ইরান থেকে কে তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য উথিত হবে ?

আমরা জামশ্দের মতো ছড়িয়ে পড়বো পাহাড় প্রান্তর সর্বত্র।

সমবেত ভাবে আমরা আঘাত করবো

এবং হেয়ে ফেলবো সারা রণক্ষেত্র।

এদিকে যখন সৈন্যবাহিনীতে সাজ সাজ রব উঠেছে

তখন সোহৃবাব রুস্তমকে সম্বোধন করে বললেন,

আমার অস্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে,

তূরানীয়দের অবস্থা ও এখন অনুরূপ।

সুতরাং দয়া করে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে সম্মাট-

তূরানীয়দের দিকে আর সৈন্য পরিচালনা না করেন।

কারণ এরা আমারই জন্য সংগ্রামমুখী হয়েছিল

এবং ধাবিত হয়েছিল ইরান-ভূমির দিকে।

আমিই তাদেরকে সাফল্যের ছবি প্রত্যক্ষ করিয়েছিলাম,

আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম আশা।

কে জানতো যে আমি আমার পিতার হাতেই প্রাণ দিব ?

সুতরাং হে মহাপ্রাণ তারা যেন আর, দুঃখে পতিত না হয়।

এই দুর্গের রক্ষক এখন আমারই বন্দী,

নিদারণ পাশ-রজ্জুতে আমি তাকে বন্দী করেছিলাম।

তাঁর কাছে কত জিজ্ঞাসা করেছি আপনার পরিচয়,

আপনাকে দেখবার আশায় দৃষ্টিপাত করেছি কত দিকে।

কিন্তু সেই ব্যক্তি শুধু এক কথাই বলেছেন,

তিনি আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন না।

তাঁর কথায় হতাশ হয়ে দেখলাম,

দুনিয়া আমার চোখে অকুকার হয়ে এসেছে।

মা আমাকে দে-নিশানা দিয়েছিলেন

তা দেখেও আমি চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

এই নিয়তিই আমার ভাগ্যে নির্ধিত ছিলো,—

আমি পিতার হাতে হত হব।

আহা, বিদ্যুতের মতো আমি আগমন করেছিলাম, বাতাসের মতো ফিরে যাচ্ছি,  
পরলোকে আবার আপনাকে দেখবার সাধ রইলো।

বেদনায় ক্রস্তমের দম বন্ধ হওয়ার উপকৰ্ম হলো,  
তাঁর অন্তরে দাউ দাউ করে জুলতে লাগলো আশুন ও

দূচোখে বয়ে চললো অশ্রু-ধারা।

তিনি এক লাফে চড়ে বসলেন রাখ্শের পিঠে,

অন্তরে তাঁর খুন বরতে লাগলো ওঠাখারে স্ফুরিত হলো হিম নিঃশ্বাস।

সৈন্যবাহিনীর সন্নিকটে আগমন করেই

স্থীয় কৃতকর্মের জন্য তিনি উথিত করলেন ব্যথিত চিৎকার।

ইরানীয়গণ তাঁকে দেখতে পেয়েই

মাটিতে রক্ষা করলো তাদের শির।

বিশ্ব-প্রভুর প্রশংসা উচ্চারণ করে তারা বললো,

ওই তো তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু যখন তারা দেখলো যে, তাঁর শিরে ধূলি

তাঁর বক্ষবাস দীর্ঘ ও তিনি ব্যথিত,

তখন তারা জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে?

কার জন্য আপনি এমন ব্যথিত?

জবাবে তিনি তাঁর কৃতকর্মের কথা জানালেন,

বললেন, কিভাবে তিনি নিধন করেছেন স্থীয় কৃতি পুত্রকে।

শুনে সবাই রোদনে ফেটে পড়লো,

মহাবীর সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

তারপর তিনি সেনাপতিদের লক্ষ্য করে বললেন,

আজ থেকে আমি তনুমন-হারা হলেম।

আপনারা কেউ আর তূরানীয়দের সঙ্গে

যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না।

এমন সময় বক্ষবাস ছিন্ন করে ধূলি-ধূসরিত অবস্থায়

জওয়ারার আগমন হলো।

ক্রস্তম ভাইকে দেখে সরোদনে জানালেন,

কি করে তিনি স্থীয় পুত্রকে হত করে এসেছেন।

বললেন, আজ আমি নিজের কৃতকর্মে অনুত্ত

আমি তার প্রতিশোধ নেব নিজেরই কাছ থেকে।

এই বৃদ্ধকালে আমি আমার পুত্রকে বধ করেছি,

যশোর্বী বক্ষের মূল আমি করেছি কর্তন।  
তরুণ পুত্রের বক্ষ আজ দীর্ঘ,  
হে আকাশ, তুমি চিরকাল তার উপর রোদন করো।  
হৃমানের কাছে দৃত পাঠিয়ে জানিয়ে দেওয়া হোক,  
বৈরিতার তরবারি কোশবন্ধ করো।  
আজ তুরান-বাহিনীর অধিপতি তুমিই,  
তাদের উপর তোমাকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।  
তোমার সঙ্গে আজ আর যুদ্ধ নয়,  
এর বেশী বলার অবসর আমার নেই।  
দুষ্ট স্বভাবের বশে তুমি তাকে আমার পরিচয় বলোনি,  
তুমি আমার চক্ষু দুটিকে নিক্ষেপ করেছ আগুনে।  
তারপর ভাইকে ডেকে বললেন, হে সরলাস্তকরণ বীর,  
তুমি এখনি নদীতীরে তার কাছে যাও,  
পথে কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করো না।

জওয়ারা হৃমানের কাছে এসে  
মহাবীরের বাণী তাঁকে অবগত করলেন।  
বীরবর হৃমান জবাবে বললেন,  
সোহরাব কোথায় ? আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।  
সন্দিহান হজীর মহাবীরের পরিচয় জানতো।  
সোহরাব তার কাছে কতবার পিতার পরিচয় জানতে চেয়েছেন,  
কিন্তু অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে সে তাঁকে তা বলেনি।  
তারই জন্য আজ আমরা এই বিপদের সম্মুখীন,  
এ-অন্যায়ের জন্য তার শিরশে দ করা উচিত।  
জওয়ারা হৃমানের বাক্য নিয়ে রুস্তমের কাছে ফিরে এসে  
হজীর স্মৰকে যা কিছু শুনে এসেছেন প্রকাশ্যে বললেন।  
বললেন, সংশয়িত হজীরের কৃতকর্মের জন্যই  
সোহরাব আজ এমন ভাবে হত হয়েছেন।  
রুস্তম ভাইয়ের মুখে এই ঘটনা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন,  
তাঁর চোখের সামনে দুনিয়া আবার অন্ধকার হয়ে এলো।  
তিনি তৎক্ষণাত হজীরের কাছে এসে  
তাঁর গলবস্ত্র ধরে টান দিয়ে যাচিতে পাতিত করে  
এক তীক্ষ্ণধার খণ্ডের টেনে নিলেন।

এবং তাঁর শির দেহ থেকে বিছিন্ন করে ফেলার জন্য উদ্যত হলেন।  
কিন্তু বয়োবৃদ্ধগণের অনুরোধ উপরোধে  
শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেলো হজীরের আণ।  
রুস্তম সেখান থেকে সোজা  
আহত পুরের কাছে এসে দাঁড়ালেন।  
তাঁর সঙ্গে এলেন তুস, গোদর্জ, গুস্তাহাম  
প্রমুখ সেনাপতি ও বীরবৃন্দ।  
তরুণ বীরের জন্য ইরানীয় বাহিনীর মধ্যে রোদনের রোল উঠলো।  
তারা বলতে লাগলো, বিশ্ব-প্রভু  
এই অসহনীয় শোকের প্রতিবিধান করুন।  
সহসা রুস্তম এক খঙ্গ হাতে  
নিজের শির দেহ থেকে বিছিন্ন করার জন্য উদ্যত হলেন।  
উপস্থিত মহাত্মগণ তা দেখে তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে  
তাঁরে বিরত করলেন।  
তাঁদের চোখ দিয়ে বেদনার রক্ত অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।  
গোদর্জ রুস্তমকে সম্মোধন করে বললেন,  
যদি দুনিয়ার মুখ আপনি ধূঁয়ায় আচ্ছন্ন করেন,  
তবে আর এখন কি লাভ হবে ?  
আপনি যদি আপনার নিজের উপর শত দুঃখও আনয়ন করেন,  
তবু এই তরুণের উপর কি তা উপশম হয়ে দেখা দিবে ?  
কাল যদি এই তরুণের উপর বিরাপ হয়েই থাকে,  
তবে কি করবেন ? ভাবুন, কে এখানে চিরঞ্জীব ?  
মুকুটধারী কিংবা শিরস্ত্রাণধারী  
আমরা সবাই মৃত্যুর মৃগয়া বই নয়।  
সময় যখন আসবে তখন সবাইকে যেতে হবে,  
কোথায় যাবে, তা ও কেউ জানে না !  
হে সেনাপতি, মৃত্যুতে কে শোকাচ্ছন্ন না হয় ?  
তাই চোখের জল ফেলতে বাধা নেই আপনার।  
পথ একদিন শেষ হবেই  
একসঙ্গে যারা পথ চলছি তারাও একদিন পরম্পর থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়বো।

## କାୟକାଉସେର କାହେ ରୁଷମେର ନୋଶାଦାରଙ୍କ\* ପ୍ରାର୍ଥନା

রুস্তম গোদর্জকে স্মৰ্দান করে বললেন,  
 হে স্বনামধন্য প্রাঞ্জলি বীর, আপমি আমার দিক থেকে বাণী নিয়ে  
 কায়কাউসের কাছে গমন করুন,  
 ও তাঁকে বলুন আমার উপর কি ঘটেছে !  
 তাঁকে বলুন যে, খণ্ডের দ্বারা শীয় পুত্রের বক্ষ  
 বিদীর্ণ করতে এতটুকুও বিলম্ব করেনি রুস্তম।  
 রুস্তমের অতীত কীর্তি যদি তাঁর মনে থাকে  
 তবে এই দুঃখের সময় তিনি যেন আমার শোকের প্রতিবিধান করেন।  
 তাঁর কাছে নওশাদারু নামে যে বিষয় আছে,  
 যার দ্বারা আহতদের সুস্থ করে তোলা যায়  
 তা যেন এক পাত্র সুরাসহ অবিলম্বে আমার কাছে  
 তিনি পাঠিয়ে দেন।

তাঁর সৌভাগ্যের সূচক আমিই ছিলাম,  
অথচ তাঁর সিংহাসনের সমীপে অবস্থান করেছি বিনীতের মতো।  
সেনাপতি গোদরজ বাযুগতিতে কায়কাউস সমীপে  
উপস্থিত হয়ে মহাবীরের বাণী নিবেদন করলেন।  
জবাবে কায়কাউস বললেন, রুস্তম ছাড়া  
এমন সম্মানিত ব্যক্তি আর কে আছেন,  
যাঁর মর্যাদা আমার কাছে সর্বাধিক ?  
তাঁর অমঙ্গল কিছুতেই আমার কাম্য হতে পারে না।  
কিন্তু আমার নওশাদারু যদি আমি তাঁকে দিই  
তবে তরুণ বীর বৈচে উঠবেন।  
রুস্তম তখন আপনাদের সকলের বীরত্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন  
এবং আমারও কববেন অমঙ্গল।  
যদি কোন দিন তাঁর খেকে আমি লাভ করি এমন বিপদ,  
তবে এই বিষয় ব্যতীত কেমন করে আমি নিজেকে রক্ষা করবো  
আপনি কি শোনেননি রুস্তম আমাকে কি বলেছিলেন ?  
যদি স্বয়ং সম্মাটকে তিনি একপ বলতে পারেন তবে যুবরাজ তুম  
তাছাড়া ভাগ্যহীন সোহরাব তাজ ও তথ্তের শপথ করেছিল।

এক প্রকার বিষয় পদাৰ্থ। সম্ভবতঃ তা অত্যন্ত দুশ্চাপ্য ছিল।

ଆମାକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲେଛିଲ, ତୋମାର ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁରାଇ ତୋମାକେ  
ନିଧନ କରବୋ,

ଚଡ଼ାବୋ ତୋମାକେ ଶୂଳିତେ ।

ଏହି ସମାରୋହ ଏହି ତେଜ-ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁନିଆର କୋଥାଯି ଧରବେ ?

ମେ କି ବିନୀତ ହବେ ମନେ କରନ୍ତ, ଆମାର ସିଂହସନେର ସାମନେ ?

ମେ କି ଆମାର ଫରମାନ ମାନ୍ୟ କରେ ଚଲବେ ?

ଆମି ତାର ପ୍ରତି କିଛୁତେଇ ସଦୟ ହତେ ପାରି ନା ;

ଯଦି ମହାଦୀର ରକ୍ଷମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାମୀ ମେନାପତିଗଣ

ଆମାର ଦୂର୍ନାମଓ କରେନ ଏବଂ ସୈନ୍ୟଦଲେର ସାମନେ

ଆମାର ଅର୍ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହୟ, ତୁବୁଝ ନା !

ରକ୍ଷମେର ଏହି ପୂତ୍ର ଜୀବିତ ହୟେ ଉଠିଲେ

ଆମାର ହଞ୍ଚଦ୍ଵୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବେ ମୃତ୍ତିକାଯା ।

ଆପନି କି ସୋହାବେର ଘୋଷଣା ଶୋନେନ ନି ?

ଆପନି କି ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ନନ ?

ମେ ବଲେଛିଲ, ଆମି ହାଜାରେ ହାଜାରେ ଇରାନୀ ସୈନ୍ୟ ବଧ କରବୋ,

ଆମି କାଉସକେ ଜୀବିତାବଶ୍ଯାମ ଶୂଳିତେ ଚଡ଼ାବୋ !

ମେ ଯଦି ଜୀବିତ ହୟେ ଉଠେ

ତବେ ଦୁନିଆର ଛୋଟ ବଡ଼ ସବାଇ ତାର ଥେକେ ଲାଭ କରବେ ଦୁଃଖ ।

ଶକ୍ରକେ କେ ନିଜେର ହାତେ ଲାଲନ କରେ ?

କେ ଦୁନିଆଯା ଛଡ଼ିଯେ ଦେଇ ତାର ସୁନାମ ?

ଗୋଦରଙ୍ଜ ବାଦଶାର କଥା ଶୁନେ ଧୂର୍ମଗତିତେ

ରକ୍ଷମେର କାହେ ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ହଲେନ ।

ଏବଂ ବାଦଶାର ଅସଂ ପ୍ରକୃତିର କଥା ତାଁକେ ଜାନିଯେ ବଲଲେନ

କୁଟ୍ଟଫଲେର ବକ୍ଷ ସର୍ବଦା ଫଲଭାରେ ଆଛନ୍ତି ଥାକେ ।

ତାର ଏହି କୋପନ ସ୍ଵଭାରେର ଜନ୍ୟ ଦୁନିଆଯା ତାର କୋନ ବକ୍ଷୁ ନେଇ,

ତାର ଦୁଃଖେରେ ସମସ୍ୟାଯୀ କେଉଁ ନେଇ ପୃଥିବୀତେ ।

ଆପନି ସ୍ଵୟଂ ତାର କାହେ ଗମନ କରନ୍ତ, ଦେଖୁନ,

ତାର ଅନ୍ଧକାର ମନେ ଆଲୋ ଦାନ କରାତେ ପାରେନ କି ନା !

## সোহৃবাবের জন্য রুস্তমের বিলাপ

রুস্তমের আদেশে জনৈক কর্মচারী  
এক সুদৃশ্য পরিধেয় নিয়ে এলো।  
তরুণ বীরকে সেই স্বর্ণ-খচিত পরিধেয়ের  
আবরণে শায়িত করে বাদশার সমীপে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।  
রুস্তম যাত্রার জন্য পথে পা বাড়াবেন  
এমন সময় এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো,  
সোহৃবাব এই জগৎ-সংসার ছেড়ে প্রয়াণ করেছেন,— তাঁর মৃত্যু হয়েছে,  
তিনি আপনার কাছে আর প্রাসাদ কিংবা সিংহাসন চান না,  
মাত্র একটি শবাধারের প্রার্থী তিনি।  
সংবাদ শুনেই রুস্তম নথের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করতে  
লাগলেন স্বীয় মুখমণ্ডল,  
করাঘাত করতে লাগলেন বুকে ও কেশ টেনে ছিড়তে লাগলেন।  
তাঁর অস্তর্দেশ মথিত করে বেরিয়ে এলো হিম নিঃশ্বাস,  
চোখের পাতা সিঞ্চ করে বয়ে চললো অশ্রুর ধারা।  
রুস্তম অশু-পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে পায়ে হেঁটে চললেন,  
মুকুটের বদলে তিনি শিরে তুলে দিলেন ধূলিরাশি।  
সৈন্যদলের মহত্তমগণ ও তেমনিভাবে  
রোদন ও বিলাপ করতে করতে তাঁর সঙ্গে চললেন।  
রুস্তম বলতে লাগলেন, হে তরুণ বীর,  
হে মহত্তম ও বীরেন্দ্রবন্দের বৎসধর !  
কেউ দেখেনি তোমার বর্মের মতো বর্ম ও তোমার মুকুটের মতো মুকুট।  
কে এমন সফলতার সঙ্গে আমার সম্মুখীন হয়েছে ?  
হায়, আমি বৃদ্ধ হয়েও বিমুড়ের মতো হত করেছি নিজের সন্তানকে !  
তুমি অনুপম বীর সামের প্রশঊত,  
মায়ের দিক থেকেও তুমি বীর বৎশোভূত !  
আমার মতো এমন হতমান কি দুনিয়ায় আর আছে,  
যে পৌরুষ প্রদর্শন করেছে এক বালকের সামনে ?  
আমার জন্য উপযোগী শুধু মৃত্যিকার আসন।  
কারণ আমি সোহৃবাবের মতো পুত্রকে হত করেছি,  
যে এক মহত্তম বৎশের ধারা-রক্ষক ছিল।  
নাম-করা বীরগণ এমন কি সাম ও গারশাসপের চেয়েও

সে বীরত্বে মহত্ত্ব ছিল।

তার মা যখন এই সংবাদ পাবে তখন তাকে কি করে বুঝাবো?  
কি করে আমি তাকে পাঠাবো এই দৃশ্যসংবাদ?

কি করে বলবো যে, তাকে আমি অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি,  
কোন পাপে তার চোখে অঙ্ককার করেছি দিনের আলো?

কোথায় কোনু পিতা এমন কাজ করেছে?  
আমি যে শুধু ভর্তসনারই পাত্র।

এই দুনিয়ায় এমন আর কে যে জ্ঞানী ও যুবক পুত্রকে হত্যা করেছে?  
লোকে যখন শুনবে যে, বীর পিতা  
তার নিষ্পাপ যুবক পুত্রকে হত্যা করেছে,  
তখন তারা সাম্ভ-বংশের নিন্দা করবে,  
এবং আমার নামোচারণ করবে নির্দয়তা ও অধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে।  
কে জানতো যে এই বালক

একয় বছরেই দেবদারুর মতো এমন সুউন্নত হয়ে উঠবে?  
এবং বীরত্বের সঙ্গে প্রস্তুত করবে সৈন্যবাহিনী?

ও এমনভাবে আমার দিনকে পরিবর্তিত করবে রাত্রির অঙ্ককারে?  
এইবলে রুস্তম রাজযোগ্য কৌশিক বস্ত্রে  
পুত্রের মুখ আচ্ছাদিত করলেন।  
শববাহী যাত্রীদল নগরে পৌছে এক শবাধার প্রস্তুত করে আনলো।  
এবং সেখান থেকে প্রাস্তুর-পথে  
রুস্তমের শিবিরের দিকে মুখ করলো।

শিবির ত্যাগ করে যাওয়ার প্রাক্তালে তাতে দেওয়া হলো অগ্নি।  
দাউ দাউ করে শিবির ও তন্ত্যধ্যস্তু

রং বেরত্তের কৌশিক বস্ত্র ও যবনিকা জুকে উঠলো।

এবং মূল্যবান আসন ও পর্যঙ্গ  
সব বিসর্জিত হলো অগ্নিতে।

চারদিকে উঠলো শোকের কোলাহল,  
মহাবীর সরোদনে বলতে লাগলেন,  
তোমার মতো বীর আর দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেনি,  
যুদ্ধক্ষেত্রে এমন বীর্য কেউ কোনদিন দেখেনি।  
কিন্তু হায়, বথা হলো তোমার বীরত্ব ও বিবেচনা,  
হায়, বথা হলো তোমার সুন্দর মুখ ও সুষ্ঠাম ঘোবন।  
হায়, এই পরিতাপের যে অস্ত নেই,

তুমি তোমার মায়ের থেকে হয়েছো বিচ্ছিন্ন, তোমার পিতার  
বুকে রেখে গেছো শোকের দাগ।

এইভাবে রুক্ষম অনুক্ষণ বিলাপ করতে লাগলেন,

ও তাঁর রাজকীয় বক্ষবাস করলেন ছিন্ন।

বললেন, মহিয়সী ও বৃদ্ধিমতি মাতা রূদাবা

আমাকে তিরঙ্কার করে বলবেন,

রুক্ষম, তুমি কি শক্রতার বাহু প্রসারিত করে

এই তরুণ বীরের বক্ষ বিদীর্ঘ করেছো ?

তখন কি জবাব আমি তাঁকে দিব ?

কি বলে করবো আত্মপক্ষ সমর্থন ?

ধীরগণ যখন সোহ্রাবকে এই অবস্থায় দেখবেন

তখন তাঁরা কি বলবেন ?

তাঁদের মনের অবস্থা তখন কি হবে ?

যখন তাঁরা জানবেন যে এই কুসুমিত কানন আমিই করেছি বিধ্বস্ত ?

সম্রাট্ কায়কাউসের সকল সেনাপতিই রুক্ষমের সঙ্গে পথে নেমে এলেন।

তাঁরা বহুবিধ উপদেশ ও সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন, আবর্তমান আকাশের এই ব্যবহার চিরদিনের,—

তার এক হাতে রাজমুকুট, অন্যহাতে পাশ।

রাজমুকুট পরে যে আনন্দে বসে আছে

তারই মুকুট সে সহসা হরণ করেছে তার নিদারুণ পাশ-নিক্ষেপে।

সে সবার সঙ্গেই পথ পর্যটন করে কিন্তু কারো উপর নেই তার কোন দয়া।

বিরাট এক সীমার মধ্যে সে রচনা করে অসংখ্য বৃত্ত।

সকল সম্রাট্ ও সকল দাস সকল জ্ঞানী ও সকল জ্যোতিষ —

প্রত্যেকের জন্মই তৈরী করছে সে এক-একটা কাহিনী —

বিচিত্র ও কৌতুকময়।

যখনই দীর্ঘ কোন আশা নিয়ে মানুষ অগ্রসর হয়

তখনই হয়তো তার আবর্তন ছেদ টেনে দেয় সেই কাহিনীতে।

অবগত হোন, তার আবর্তন স্মৰক্ষে কারো কিছুই জ্ঞান নেই,

কি এবং কেন এ প্রশ্ন তাকে কেউ করতে পারে না।

সুতরাং রোদন ও বিলাপ করে কোন ফল নেই,

এরই বা পরিণাম কি তাও আমাদের অজ্ঞাত।

সোহ্রাবের শব-যাত্রার খবর পেয়ে

সম্রাট্ সেনানীগণসহ এগিয়ে এলেন।

তিনি রুম্পকে সম্বোধন করে বললেন,  
আলবুর্জ পাহাড়ের মাথা থেকে বেণুবনের পত্রাঞ্জি পর্যন্ত,  
আকাশ একইভাবে আবর্তিত হয় ;  
সে কারো উপর করে না কোন করুণা ।

কাউকে সে দেয় দীর্ঘ অবসর, কাউকে সময় দেয় না,  
কিন্তু সবাই পরিণাম মৃত্যু ।

কালের এই চলনকে স্বীকার করে নিতে হয়,  
জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথায় দিতে হয় কান ।

যদি আকাশকে পাতিত করা হয় মৃত্যুকায়  
কিংবা সারা দুনিয়ায় প্রজ্জ্বলিত করা হয় অগ্নি  
তবুও এই চলন নিবারিত করা যাবে না

সুপ্রাচীন কাল থেকে এর যাত্রা পরকালের পথে অব্যাহতই থাকবে ।

আমি দূর থেকে সোহৃদাবকে দেখেছিলাম,  
দেখেছিলাম তার সমন্বত ও দীর্ঘবান চেহারা ।

তখনই আমি বলেছিলাম, তুরানের লোক বলে তাকে মনে হচ্ছে না,  
সন্তুষ্ট সে কোন বীর বংশের ধারা-রক্ষী ।

কালে সে সৈন্য পরিচালনা করলো ও আপনার হাতে হলো তার জীবনাস্তি ।  
এর প্রতিকার কি আর সন্তুষ ?

আপনি আর কত রোদন করবেন ?

রুক্ষম সন্ত্রাটকে বললেন, সে তো গেলো,  
এখন এই প্রাঙ্গনে ভূমান অপেক্ষা করছেন ।

তাঁর সৈন্যদলের কিছুটা অংশ তুরানের, কিছুটা চীনের,  
এদের উপর আর বৈরীভাব পোষণ করবেন না ।

তখন বাদশার ফরমান নিয়ে  
জওয়ারা হুমানের কাছে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন ।

বাদশা মহাবীরকে সম্বোধন করে বললেন, হে যশস্বী,  
এই সংগ্রাম আপনার গভীর মনোদৃঢ়খের কারণ হয়েছে ।

এই সৈন্যদল যদিও আমার অনেক ক্ষতি করেছে  
এবং ইরান-ভূমিতে উত্থিত করেছে ধূম্ররাশি

তবু আপনার যথন ইচ্ছা যুদ্ধ বন্ধ হোক,  
তখন আমারও যুদ্ধে কোন অভিপ্রায় নেই ।

আমার হৃদয় আপনার দৃঢ়খে দৃঢ়খিত,  
এদের সঙ্গে শক্রতার কথা আমি আর মনে স্থান দিব না ।

## ରୁଷ୍ଟମେର ଜାବୁଲନ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ସପ୍ରାଟ୍ ସେଥାନ ଥେକେ ସୈନ୍ୟଦଳସହ ଇରାନେର ଦିକେ ଯାଆ କରଲେନ ।  
ରୁଷ୍ଟମ ଜାଓୟାରାର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ ରାଇଲେନ,  
ଜାଓୟାରା ଖୁବ ଭୋରେ ଏସେ ଯଥନ ଖବର ଦିଲେନ ଯେ,  
ତୁରାନ-ସୈନ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଗେଛେ ତଥନ ଶୁରୁ ହଲୋ ରୁଷ୍ଟମେର ଯାଆ ।  
ଯାତ୍ରୀଦିଲେର ସଙ୍ଗେ ଚଲିଲୋ ସହସ୍ର କର୍ତ୍ତି-ପୂଛ ଅଶ୍ଵ,  
ଶିରେ ଧୂଲି ଲେପନ କରେ ବହୁ ଯଶସ୍ଵୀ ଅଭିଜ୍ଞାତଓ ସଙ୍ଗୀ ହଲେନ ।  
ଯାତ୍ରୀଦିଲ ଏଗିଯେ ଚଲିଲୋ ଜାବୁଲନ୍ତାନେର ଦିକେ ;  
ଆବଶ୍ୟକେ ଜାବୁଲନ୍ତାନେ ସଂବାଦ ପୌଛିଲେ  
ଗୋଟା ସୀମାନ୍ତ ବେଦନାର୍ତ୍ତ ହୟେ ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାଯ ଏଗିଯେ ଏଲୋ ।  
ସୈନ୍ୟଦଳ ଶବାଧାରେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚଲିଲେ ଲାଗଲୋ,  
ମହାତ୍ମମଣି ଶୋକେ ଶିରେ ଧୂଲି ନିକ୍ଷେପ କରତେ ଲାଗଲେନ ।  
ନାମକରା ଅଶ୍ଵଗୁଲିର ପୂଛ କର୍ତ୍ତି ହଲୋ,  
ଉଚ୍ଚନିନାଦ-ଉତ୍ସୋଲନକାରୀ ଦୁନ୍ଦୁଭିଗୁଲି ଦୀର୍ଘ କରା ହଲୋ ।  
ଶବାଧାର ଦେଖାମାତ୍ରି ମହାମତି ଜାଲ  
ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ-ବଳଗାଧାରୀ ଅଶ୍ଵ ଥେକେ ଅବତରଣ କରଲେନ ।  
ରୁଷ୍ଟମ ତଥନ ଛିନ୍ନ ଜାମା ଓ ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତର ନିଯେ  
ନୟ ପାଯେ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ ପିତାର ଦିକେ ।  
ବୀରଗଣ ତାଁଦେର କୋମରବନ୍ଧ ଶିଥିଲ କରେ  
ସମବେତଭାବେ ଶବାଧାରେର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହଲେନ ।  
ସକଳେର ମୁଖ ହଲୋ ନୀଳ, ପରିଧେଯ ଛିନ୍ନ,  
ସକଳେଇ ଶୋକେର ଆତିଶ୍ୟେ ମଞ୍ଚକେ ଧୂଲି ନିକ୍ଷେପ କରତେ ଲାଗଲେନ ।  
ମହାମତି ଜାଲ ଏଗିଯେ ଏସେ ଶବାଧାରେର ନିଚେ ରଙ୍ଗା କରଲେନ ତାଁର ମଞ୍ଚକ ;  
ରୁଷ୍ଟମ ଓ କାନ୍ଦତେ କାନ୍ଦତେ ପିତାର ସଙ୍ଗେ  
ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ-ବସ୍ତ୍ରାଚ୍ଛାଦିତ ଶବାଧାରେର ନିଚେ ସ୍ଵିଯ ମାଥା ରାଖଲେନ,  
ଓ ପିତାକେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲଲେନ,  
ପିତାଙ୍କ ଦେଖୁନ, ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶବାଧାରେ ଶାୟିତ ରଯେଛେନ ସ୍ଵୟଂ ବୀରପ୍ରବର ସାମ ।  
ଜାଲେର ଦୁଚୋଥେ ଅନ୍ତର ଧାରା ବହିତେ ଲାଗଲୋ,  
ତିନି ସରୋଦନେ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରଭୂର ନାମୋଚନ କରତେ ଲାଗଲେନ ।  
ରୁଷ୍ଟମ ବଲଲେନ, ହେ ଯଶସ୍ଵୀ ପିତା,  
ଆମି ଯେ ଶୋକାହତ ଅପମାନିତ !  
ଜାଲ ବଲଲେନ, ଆମି ଆଶର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅବାକ ହଞ୍ଚି ଏଇ ଭେବେ,

বালক সোহ্রাবের কি করে তুলে নিয়েছিল শুরুভার প্রহরণ ?  
আহা, সে ছিল মহত্বমগণের নির্দশন,  
দুনিয়ায় এমন আর কেউ মাত্রগৰ্ভ থেকে জাত হয়নি,  
এই বলে তিনি আবার চোখের পাতা অশ্রসিঙ্গ করলেন  
এবং বলে চললেন সোহ্রাবের কথা ।  
শবাধারবাহিগণ যখন রুস্তমের প্রাসাদে এসে থামলো,  
তখন সর্বত্র উথিত হলো কানুন রোল ।  
সোহ্রাবের শবাধার দেখে রুদাবার দুচোখে অশ্রুর প্লাবন জাগলো  
তিনি বলতে লাগলেন, হে তরুণ, তুমি বুঝি  
এই সংকীর্ণ শয্যায় ঘুমিয়ে রয়েছো ?  
ওগো বীরগণের বীর, ওঠো ক্ষণিকের জন্য শিরোত্তলন করে  
বলো মর্মপূর্ণী ভাষায় সেই রহস্য,  
যা তোমার উপর সংঘটিত হয়েছে !  
এই বলে তিনি শুরু করলেন করশ শোক-বিলাপ,  
তাঁর অন্তর মধ্যিত করে বেরিয়ে এলো হিম নিঃশ্঵াস ।  
ওগো বীরপুত্র সিংহ-শাবক,  
তোমার মতো শক্তিমান দুনিয়ায় আর জন্মগ্রহণ করেনি ।  
তুমি তোমার মায়ের কাছে কি সেই রহস্য বলে গেলে না,  
তোমার আনন্দের\* পরম মুহূর্তটি কেমন করে এসেছিল ?  
যৌবনের কালেই তোমাকে হতে হলো চিরবন্দী,  
আর এই শোকাগার নির্দিষ্ট হলো তোমার জন্য ?  
তুমি বললে না কি কি ঘটেছিল পিতার সঙ্গে,  
কেমন করে সে দীর্ঘ করেছিল এমন বক্ষ ?  
রুদাবার এহেন বিলাপ প্রাসাদ থেকে শনি গ্রহ পর্যন্ত উথিত হলো,  
যে-কেউ এই রোদন শুনলো সে-ই কেঁদে ভাসালো তার বুক ।  
রোকন্দ্যমানা রুদাবা অবশ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন অন্তঃপুরে,—  
তাঁর মুখমণ্ডল অশ্রুপূর্ণ ও শির ধূলি ধূসরিত ।  
রুস্তম এই দৃশ্য দেখে আবার কাঁদলেন  
আবার তাঁর দুচোখ থেকে ঝরতে লাগলো রক্তের ধারা ।  
মনে হলো কেয়ামত প্রত্যাসনু হয়েছে,  
সকল হৃদয় থেকে প্রয়াণ করেছে সকল আনন্দ ।  
সোহ্রাবের শবাধার এখন দ্বিতীয়বারের মতো

ମୁତ୍ୟର ସମୟଟାକେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥେ ଆନନ୍ଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳା ହେଲେ ।

বীরদের সম্মুখে রাখা হলো ।  
শবাধারের আবরণ উন্মোচিত করে  
শেষ বারের মতো পিতাকে দেখানো হলো তাঁর মুখ ।  
উপস্থিতি বীরগণকে প্রদর্শন করা হলো তাঁর দেহ,  
মনে হলো আকাশ থেকে যেন উত্থিত হচ্ছে ধূম্রাজি ।  
নর-নারী যুবক-বৃন্দ যত লোক সেখানে উপস্থিতি ছিল  
সবাই এ দৃশ্য দেখে রোদনে ফেটে পড়লো ।  
সকলের মুখ নীলবর্ণ হলো, তারা দীর্ঘ করলো তাদের বক্ষবাস,  
হাদয় তাদের পরিপূর্ণ হলো বেদনায়, স্বীয় মন্ত্রকে তারা  
নিক্ষেপ করলো ধূলিরাশি ।  
সারা প্রাসাদ যেন আজ পরিবর্তিত হয়েছে একটি শবাধারে,  
আর সেখানে নিদ্রা যাচ্ছেন এক সিংহ-পুরুষ ।  
মনে হয়, তিনি যেন সেই বীর্যবান সাম,  
এইমাত্র যেন যুদ্ধ করে ঝুস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন ।  
লোকে সোহাগের এই মুখ দেখে  
শিরে করাঘাত করে মাতম করতে লাগলো ।  
রুক্ষম বললেন, আমি যদি এখন সোনার সমাধিও তৈরি করি,  
কঢ়-কস্তুরীভূতা উপাধানও ন্যস্ত করি তার শিথানে,  
তবু সে-সব তার মর্যাদার উপযুক্ত হবে না,  
দুনিয়া থেকে যাবে তেমনি বিবর্ণ ও শোকাহত ।

অশু-খুরের অনুরূপ করে সমাধি নির্মিত হলো,  
সারা দুনিয়া নিমজ্জিত হলো শোকের সাগরে।  
সুগন্ধিত অগুরু কাষ্ঠে সজ্জিত করা হলো শবাথার  
তাতে সোনার কারুকাজ উৎকীর্ণ করা হলো।  
কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্ব,—  
কি করে হত হয়েছে এক পুত্র তার পিতার হাতে।  
যে শুনলো সেই বেদনার্ত হলো,  
আর সে চেষ্টা করলো নিজেকে প্রবোধ দিতে।  
রুস্তমের দিন কাটতে লাগলো,  
কিছুতেই শাস্ত হয় না তাঁর মন।  
শেষ পর্যন্ত ধৈর্য তাঁর হৃদয়কে অধিকার করলো,  
কারণ, এ ছাড় আর অন্য উপায় নেই।

এমন অনেক কাহিনী দুনিয়ার স্মরণে রাখিত আছে,  
প্রতিটি মানুষের অস্তরেই প্রচন্ড রয়েছে এমন অনেক দাগ।  
দুনিয়ায় কে আছে সম্পূর্ণ অক্ষত?  
এমন কোন লোক আছে যে কাল থেকে ল্যাভ করেনি দৃঢ়খ?—  
ইয়ানের জনসাধারণ যখন এই খবর শুনলো,  
তখন তারাও দৃঢ়খের আগুনে দগ্ধ করলো তাদের অস্তর।  
ওদিকে হৃষান তূরানে প্রত্যাগমন করে  
আফ্রাসিয়াবকে সকল কথা বললেন।  
আফ্রাসিয়াব অবাক হয়ে শুনলেন এই কাহিনী,  
এক বিস্ময়কর অবশ্য তাঁর মনকে অধিকার করলো।

## জননী সোহরাবের হত হওয়ার সংবাদ শুনলেন

তুরানে রোল উঠলো, সোহরাব পিতার হাতে হত হয়েছেন।  
সামানগাঁ-রাজ এই খবর শুনতে পেয়ে  
শোকে দীর্ঘ করলেন তাঁর বক্ষবাস।  
মায়ের কাছে সংবাদ গেলো,  
সোহরাব পিতার হাতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।  
মা চিৎকার করে স্থীয় বসন দীর্ঘ করলেন,  
ও বালক-পুত্রের জন্য বিলাপ করতে লাগলেন।  
তাঁর রোদন, চিৎকার ও বিলাপ তাঁকে করে তুললো অপ্রক্রিয়।  
তিনি নথের আঁচড়ে স্থীয় নয়নদুয় ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন,  
এবং শয়ন কক্ষে দিলেন আগুন।  
ফে-কেশগুচ্ছ ছিল একদিন কুঞ্চিত ও উর্মিল,  
তা এখন আঙুলে বিজড়িত হয়ে মূলশুন্দ উৎপাটিত হতে লাগলো।  
চোখ থেকে বইতে লাগলো রক্তের ধারা।  
ক্ষণে ক্ষণে তিনি সংজ্ঞা হারাতে লাগলেন।  
শিরে নিষ্কেপ করতে লাগলেন ধূলিরাশি  
ও স্থীয় বাহ্যদুয় অবিরত দংশন করে চললেন।  
তাঁর সুন্দর কেশরাজি  
আগুনে দগ্ধভূত হলো।  
বললেন, ওগো মায়ের প্রাণ, তুমি এখন কোথায় ?  
কোথায় তুমি রক্তে ও মণিকায় গড়াগড়ি যাচ্ছা ?  
পথের দিকে চোখ রেখে আমি ভাবছিলাম  
সোহরাব ও রুস্তমের সংবাদ নিয়ে বুঝি লোক আসছে।  
মনে করেছিলাম বলবো, দুনিয়ায় খুঁজে নিয়েছিলে তুমি পিতাকে,  
তাঁকে পেয়েছ, এবার ফিরে আসো।  
কিন্তু হায়, আমি একি শুনলাম,—  
রুস্তম খঞ্জের দিয়ে বিদীর্ঘ করেছেন তোমার বক্ষদেশ ?  
হায়, তুমি ফিরে এলে না তোমার সুন্দর মুখ নিয়ে !  
ফিরে এলে না সেই বাহু ও সমুন্তির গৌরব বহন করে ?  
হায়, সেই আনন্দ কি আর ফিরে এলো না ?  
রুস্তমই কি তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন তরবারির আঘাতে ?  
আহা, সেই তনু কত না আদরে

লালন করেছিলাম দিন রাত্রি ধরে।  
হায়, সে এখন গড়াগড়ি যাচ্ছে শোণিত-পক্ষে !  
তার দেহে উঠেছে এখন কাফনের বস্ত্র-বাস ?  
কাকে আমি আর বুকে ধরবো ?  
কে আমার দুঃখের হবে সঙ্গী ?  
তোমাকে রেখে আর কাকে ডাকবো ?  
কার কাছে বলবো আমার দুঃখের কথা ?  
তুমি ছিলে আমার তনু, প্রাণ ও চোখের আলো,  
হায়, আমার রাজ-নিকেতন ও ফুলকানন আজ ধূলায় অবসিত হলো !  
সেনাদলের রক্ষক বীরপুত্র আমার, তুমি তোমার পিতাকে  
খুঁজতে গিয়েছিলে ?

কিন্তু পিতার বদলে বুঝি তোমার সামনে এলো কবরের অতল গহবর ?  
আহা তোমার আশা বুঝি পরিবর্তিত হলো নিরাশায় ?  
তাই বুঝি এখন ক্লান্ত হয়ে ধূলায় লাভ করেছে বিশ্রাম !  
তিনি যখন খঞ্জে টেনে নিয়ে তোমার রঞ্জত-বক্ষ  
এমন করে দীর্ঘ করার উপক্রম করলেন তখনই কেন  
মায়ের দেওয়া পিতার স্মরণ-চিহ্ন তাঁকে দেখিয়ে  
স্মরণ করিয়ে দিলে না পূর্ব-কথা ?  
এখন তোমার মাঝে তোমাকে হারিয়ে হয়েছে বন্দিনী,  
তার দৃঢ়খ-বেদনার যে আর অন্ত নেই।  
কেন তুমি আমাকেই সঙ্গে নিয়ে গেলে না ?  
কেন তুমি বলতে গেলে তোমার কাহিনী দুনিয়ার লোকের কাছে ?  
কুস্তম তো দূর থেকে দেখেই আমাকে চিনতে পেতেন  
তাহলে হে পুত্র আমার, কত সহজেই তুমি হতে পারতে কৃতকার্য !  
তাহলে তিনি তৎক্ষণাত্ম ত্যাগ করতেন অস্ত্র,  
এবং এমন করে দীর্ঘ হোত না তোমার বক্ষ।  
এই বলে তহমিনা তাঁর কেশ টেনে ছিড়তে লাগলেন,  
ও হস্তদ্বারা আঘাত করতে লাগলেন স্থীয় সুন্দর মুখে।  
তিনি বলতে লাগলেন, হে পুত্র, তোমার অভাগিনী মার বুক  
তুমিই বিদীর্ঘ করে দিয়ে গেলে না কেন ?  
সারা রাজপুরী এসে জড়ে হলো রাজকন্যার পাশে,  
এবং তারাও তাঁর সঙ্গে নিমজ্জিত হতে লাগলো শোকের সাগরে।  
তাঁর এই বিলাপ ও রোদন সারা দুনিয়ার চোখে অঞ্চ ঝরাতে লাগলো।

কাঁদতে কাঁদতে বেহঁশ হয়ে যান তহমিনা,  
 তাঁর সঙ্গে সকল দুনিয়ারও ভেঙে যায় বুক ।  
 তিনি সংজ্ঞাহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েন ভূমিতে  
 মনে হয় বুঝি ম্লান হয়ে ঝরে পড়লো তাঁর জীবন-প্রসূন ।  
 সংজ্ঞা ফিরে এলে আবার শুরু হয় রোদন,  
 আবার তিনি দোষারোপ করেন স্থীয় পুত্রের উপর ।  
 তিনি বলে উঠেন, বুকের রক্তে লাল  
 সোহৃবাবের শিরস্ত্রাণ আমার কাছে নিয়ে এসো ।  
 তারপর সেই তাজ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন,  
 ওগো কে আছ রাজপুরীতে !  
 নিয়ে এসো সোহৃবাবের সেই অশু  
 সুখের দিনে যার উপর সে আরোহণ করেছিল ।  
 সেই অশুর মুখ তিনি চেপে ধরেন স্থীয় বুকে,  
 এই দৃশ্য দেখে সারা দুনিয়ার বুক ভেঙে যায় যথায় ।  
 কখনো তিনি তার মন্তকে চুম্ব খান, কখনো তার মুখে  
 তার ক্ষুরের কাছে ঝরতে থাকে মায়ের চোখের জল ।  
 আবার বলেন তহমিনা, নিয়ে আয় আমার পুত্রের রাজকীয় বসন,  
 পোষাক এলে, তিনি সেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরেন পুত্রের মতো করে ।  
 এমনি করে এলো সোহৃবাবের বর্ম, সাঁজোয়া ও ধনুক,  
 এমনি করে এলো তাঁর বর্ণা, তরবারি ও প্রহরণ ।  
 তহমিনা প্রহরণ দ্বারা স্থীয় শিরে আঘাত করে  
 স্মরণ করেন পুত্রের শৌর্য ও বীরবত্তার কথা ।  
 তারপর সোহৃবাবের ঘোড়ার জিন ও লাগাম এলে  
 তিনি সেগুলোতেই মাথা কুটে মরেন ।  
 তাঁর সন্তুর হাত দীর্ঘ পাশটি  
 মা নিজের সামনে প্রসারিত করে দেখেন ।  
 সোহৃবাবের তনুত্রাণ ও শিরস্ত্রাণ —  
 মা বলেন, কোথায় গেল আমার বীরপুত্র ?  
 একবার সোহৃবাবের তরবারি কোষোন্মুক্ত করে মা নিজেই  
 তাঁর অশুর অর্ধেক পুচ্ছ কর্তিত করে দেন° ।

রস্তমের শোকের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কর্তিত অশুপুচ্ছ শোক প্রকাশের নকশের ধর্য  
 গণ্য ।

অবশেষে এইসব সম্পদ তিনি দান করলেন দরিদ্রকে,  
আরও দিলেন স্বর্ণ রৌপ্য ও সুসজ্জিত অশুদ্ধ।  
অতঃপর মা লোকজনের জয়ায়েত ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন,  
যেমন করে সোহৃদাব যাত্রা করেছিল যুক্ত।  
তারপর স্থীয় দেহে তুলে নিলেন শোকের নীল বাস,  
নীলাকাশ নিমজ্জিত হলো সন্ধ্যার রক্তরাগে।  
সোহৃদাবের মৃত্যুর পর এক বছর  
এমনি বিলাপ ও রোদনের ভেতর দিয়ে তহমিনা বেঁচে রইলেন।  
তারপর এই শোক তাঁর ঘরণকেও ডেকে আনলো,  
যথাসময়ে তাঁর আত্মা গিয়ে মিলিত হলো সোহৃদাবের সঙ্গে।

সত্য-দ্রষ্টা বাহ্রাম বলেছিলেন,  
মানুষের মধ্যে লিপ্তি করো না প্রীতিকে।  
এখানে কামনা করো না দীর্ঘ দিনের অবসর,  
যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করো ; দেরী করো না।  
দুনিয়ার এই সরাইখানার  
আদি অস্ত কিছুই তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।  
একদিন তোমার দুয়ারেও নহবত বাজবে,—  
তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।  
জীবনের এই রহস্য নিগঢ় হয়েই থাকবে,  
শত খুঁজলেও এ রহস্যের চাবি তোমার হস্তগত হবে না।  
অর বক্ষ দুয়ার কারো সামনে উন্মুক্ত হয়নি,  
তোমার জীবনও এমনি করেই দুঃখের মধ্যে দিয়ে কেটে যাবে  
মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই করতে হবে যাত্রা,  
মৃত্যুই আমাদের জীবনের মালিক।  
সুতরাং দুনিয়ার এই মুসাফের খানায় মগ্ন হয়ে পড়ো না,  
এই সরাইখানা খুব সুখের স্থান নয়।  
এখন এই কাহিনী থেকে চলো আমরা  
সিয়াউশের কাহিনীর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হই।  
এই কাহিনী পরিপূর্ণ চাথের জলে,  
রুস্তমের উদগ্র প্রকৃতির কোমলতার প্রকাশ এই কাহিনী।